NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PGBG

PAPER 7C (1,2,3,4)

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of The University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় ঃ বাংলা

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম : পর্যায় : PGBG : 7C(1, 2, 3, 4)

রচনা

ড. শিবানী ঘোষ

ড. সোমা পাল চাকী

পাপিয়া জয়সওয়াল

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

সম্পাদনা

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

অধ্যাপক পবিত্র সরকার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG : 7C

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়
1

একক 1 ❑ বাংলাদেশের সাহিত্য : প্রেক্ষিত ও বিবর্তন
দুই বাংলার সাহিত্যের নিজস্বতার পটভূমি 7-9

একক 2 ❑ বাংলাদেশের কবিতা : নির্বাচিত পাঁচজন কবির রচনা 11-43

একক 3 ❑ বাংলাদেশের উপন্যাস : 'লালসালু' : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 44-65

একক 4 ❑ 'কবর' : মুনীর চৌধুরী 66-89

একক 5 ❑ 'কি চাহ শঙ্খচিল' : মমতাজউদ্দীন আহমদ 90-120

পর্যায়
2

একক 1 ❑ পূর্বসূত্র 123-124

একক 2 ❑ 'ক্রীতদাসের হাসি' : পূর্ণাঙ্গ পাঠ : শওকত ওসমান 125-202

একক 3 ❑ 'নীল ময়ূরের যৌবন' : পূর্ণাঙ্গ পাঠ : সেলিনা হোসেন 203-332

পর্যায়
3

একক 1 ❑ সাহিত্যের পথ ও সাধনা : আবুল ফজল 337-344

একক 2 ❑ সাহিত্যের স্বরূপ : আহমদ শরীফ 345-351

একক 3 ❑ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য : বদরুদ্দীন উমর 352-358

একক 4 ❑ স্বরূপের সন্ধানে : আনিসুজ্জামান 359-387

একক 5 ❑ বিশ্বাসের জগত : হুমায়ুন আজাদ 388-414

পর্যায়
4

একক 1 ❑ শকুন 417-429

একক 2 ❑ পরীবানুর কাহিনী 430-442

একক 3 ❑ একটি তুলসীগাছের কাহিনী 443-453

একক 4 ❑ মাটির আদম 454-463

একক 5 ❑ পরজন্ম 464-480

একক 6 ❑ একটি দিন 481-485

একক 7 ❑ তাস 486-498

একক 8 ❑ সাদা কফিন 499-507

একক 9 ❑ অপঘাত 508-530

একক 10 ❑ লোকটি রাজাকার ছিল 531-541

একক 11 ❑ প্রশ্নাবলী 542-548

একক ১ ❑ বাংলাদেশের সাহিত্য : প্রেক্ষিত ও বিবর্তন
দুই বাংলার সাহিত্যের নিজস্বতার পটভূমি

০.১ বাংলাদেশের সাহিত্য ১৯৪৭ সালে দেশবিভাজনের পরবর্তীকালীন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান এবং ১৯৭১সালে সে দেশের উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র—এই দুয়ের সমন্বিত পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। বিগত প্রায় ছয় দশক সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং উভয়েই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও বৈভবে এখন সুপরিণত। তাই এখন সামগ্রিকভাবে আধুনিক 'বাংলা' সাহিত্য নিয়ে পর্যালোচনা করতে হলে দুটি ধারার সম্পর্কেই অনুধ্যান প্রয়োজন।

০.২ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন এই বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যকৃতির উত্তরাধিকার দু তরফেই যথাযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্যে বর্তেছে; তবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষার পার্থক্যের জন্য, বহুক্ষেত্রেই উপজীব্য বিষয়ের ভাবে এবং রূপে অনেক সময়েই ফারাক দেখা যায়। একই ইংরেজি ভাষায় রচিত হলেও যেমন ইংলণ্ড-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া-কানাডা, এমন কি ভারতের ইংরেজি-সাহিত্যও যেমন ভাবে রূপে-এক নয়; স্পেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশের সাহিত্য যেমন একই হিস্পানি ভাষায় লিখিত হওয়া সত্ত্বেও দেশ-কাল-ভেদে তাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়; পর্তুগাল আর ব্রাজিলের ভাষা এক বটে, কিন্তু তাদের সাহিত্যধারা দুটি পৃথক; ফ্রান্সের সাহিত্য আর ফরাসীভাষী আফ্রিকি দেশগুলির সাহিত্যে বিরাট ফারাক যেমন, ঠিক ততখানি না হলেও (যেহেতু একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে উভয়ে), তেমনই পুবের বাংলা এবং পশ্চিমের বাংলার (ওরফে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এবং পশ্চিমবঙ্গের) সাহিত্যও আপন-আপন স্বকীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

১.১ ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করা হলেও, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকদের কাছে পূর্ব বাংলা বস্তুতপক্ষে এক রকমের উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যবিধান ছাড়াও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ওপরেও প্রবল ভাবে আঘাত নেমে এল কিছুদিনের মধ্যেই। শুধুমাত্র উর্দুকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের রাষ্ট্রভাষা করা হবে, এমনই ঘোষণা করেন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান মহম্মদ আলি জিন্না। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকার ছাত্রসভায় তিনি এই ফতোয়া উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। আর এই প্রতিবাদই বিশাল, বিপুল গণবিক্ষোভে পরিণত হয় চার বছরের মধ্যেই। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন যার লব্ধফল। মাঝের চারটি বছরে ঐ বৃহৎ গণ-আন্দোলন দেশ জুড়ে দানা বাঁধে।

১.২ বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবীতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক বিশাল মিছিল নিয়ে মহানগরীর পথে বেরোলে সরকারের পক্ষ থেকে সেটিকে প্রতিহত করতে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়, যাতে শহিদ হন রফিক, বরকত, সালাম ও জব্বর নামে চারজন উজ্জ্বল তরুণ। তাঁদের এই নির্মম হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ববাংলার মানুষ নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ক্ষোভে ও বিক্ষোভে সংহত হয়ে উঠল এবং সেই উত্তাল আন্দোলনের সামনে শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত রকমের দমন-পীড়ন-অত্যাচারই নিষ্ফল বলে প্রতীয়মান হল।

২.১ বাংলা এবং বাঙালিকে এইভাবে বঞ্চনা ও উৎপীড়ন করা ব্যর্থ হল কিছুকাল পরেই। উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে মেনে নিতে হল সরকারকে। বাংলাভাষার এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সাফল্যের অভিঘাত হয় সুদূর প্রসারী : এক কথায়, এর ফলে গড়ে উঠল সুকঠিন বাঙালি-জাতীয়তাবোধের আবেগ—যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি ১৯৭৯ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

২.২ সেটা অবশ্য বহু রক্ত-অশ্রু-মৃত্যু-অত্যাচারকে অতিক্রম করেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, দু-দশক পরে ১৯৭১-র ষোলই ডিসেম্বরে পাকিস্তানী বাহিনীর চূড়ান্ত পরাভবে তার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।' ৭১-এর পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষকে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা জনসাধারণের ওপর বীভৎস দমন ও পীড়ন শুরু করল। শেখ সাহেব বন্দি হলেন। রাতারাতি প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীরা হয় তাদের হাতে নিহত হলেন অথবা তাঁদের আর কোনও দিন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই নৃশংসতায় সহায়তা করে রাজাকার, আল-বদর প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এবং সেই মৌলবাদীরা, যারা এতদিন ধরে বাঙালির স্বাভিমান ও স্বাধিকারের দাবী ও সংগ্রামকে "ভারতীয় তথা-হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদের" চক্রান্ত বলে প্রচার করতে চেয়ে এসেছে।

২.৩ '৭১-এর পঁচিশে মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকদের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘোষণা করলে একটি স্বাধীন বাংলা সরকারও গঠিত হয়, যাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করেন একদিকে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি অর্জন এর সাহায্য লাভের প্রয়াসী হন। তাঁদের অনুরোধে, ভারত সরকার সাড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য স্থল ও বিমান বাহিনীকে নিযুক্ত করেন এবং ভারতীয় সেনাপতি মেজর জেনারেল এ. এস. অরোরার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফট্যান্যান্ট জেনারেল নিয়াজি অসংখ্য পাক সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন ১৬ ডিসেম্বর তারিখে। নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র তখন থেকে বিশ্বের মানচিত্রে নিজের স্থান অধিকার করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

৩.১ এই সমস্তটুকু পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রথম সাড়ে তিন দশকের (১৯৪৭-১৯৮০) মুখ্য উপজীব্য বিষয় বলে গণ্য হয়। পরবর্তী পঁচিশ বছরে অবশ্য ভাষা-আন্দোলন, মৌলবাদ-বিরোধিতা, মুক্তিসংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় হিসেবে ধীরে-ধীরে অপসৃয়মান হয়ে গেছে। যদি কোনও উৎসাহী গবেষক ১৯৪৭-২০০৫—এই প্রায় ছয় দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যের যুগ-বিভাজন করতে চান, তাহলে তাঁকে মোটামুটি এইভাবেই করতে হবে সেটা

ক. ১৯৪৭-'৫১ ❑ অবিভক্ত বাংলার সহস্র বছরের সাহিত্যধারার সহজাত উত্তরাধিকারের উদ্বর্তন;

খ. ১৯৫২-'৭০ ❑ ভাষা-আন্দোলন এবং বাঙালি হিসেবে জাতিগত স্বাভিমান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে; ধর্মীয় এবং সামাজিক মৌলবাদের বিরোধিতা;

গ. ১৯৭১-'৮০ ❑ মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনের আবেগ;

ঘ. ১৯৮০—❑ মনস্তাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন।

এই বিভাজনের পরিপ্রেক্ষায় বিচার করলেই, সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আর বাংলাদেশের সাহিত্য ভাবে রূপে পৃথক কেন, সে কথা বোঝার অসুবিধা হবে না।

৩.২ এই ছয় দশকে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে অন্যান্য ধরনের অজস্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অনিবার্যতা। দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ এই তিনটি বিপুল বিপর্যয় এই বাংলার সাহিত্যকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এবং সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলমোচন-পরবর্তী কালে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, সেটা পূর্ব-পাকিস্তান/বাংলাদেশের সাহিত্যে মেলেনা। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং দাঙ্গা-দেশভাগ নানাভাবেই এই বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে; তার অভিঘাত এখানকার লেখকদের ভাবনা ও সৃষ্টিকেও ব্যাপকভাবে

আলোড়িত করেছে। দাঙ্গা ও দেশভাগের লব্ধফল—সুবিশাল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষের সীমান্তের ওপার থেকে এদিকে চলে আসাটা সেই আলোড়নের একটা খুব বড় অংশভাক্। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এর ফলে আরও ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ থেকে একদিকে চলে-আসা ছিন্নমূল মানুষদের যেভাবে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার তুলনায় বাঙালি বাস্তুহারাদের জন্য প্রায় কিছুই তাঁরা করেননি। এর ফলে, এখানে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য টলে যেতে বাধ্য হল, তারই অনুষঙ্গে বহুধরনের নূতন সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হল, অনেক পুরানো মূল্যবোধও হল রূপান্তরিত। সাহিত্যেও তার প্রতিভাস দেখা গেল অনিবার্যভাবে।

৪.১ পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটিভাবে দেড়শ বছর ধরে গড়ে-ওঠা একটা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজে ঐ সব নূতন মূল্যবোধের উৎসর্জন একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে সামাজিক উদারতা এবং রাজনৈতিক প্রগতিশীলতাকে ত্বরান্বিত এবং উত্তরোত্তর সংহত করতে লাগল। ১৯৪৭-এর আগে থেকেই যে-সব বামপন্থী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গণমানসে অভিঘাত সৃষ্টি করে আসছিল, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই তার ব্যাপ্তি বহুদূর-প্রসারী হল মূলত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। এরই ফল-পরিণাম, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী মতাদর্শের এত দৃঢ়প্রোথিত অবস্থান। তেভাগা আন্দোলন-উদ্বাস্তু আন্দোলন-খাদ্য আন্দোলন-যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা ও পতন-নক্সালবাড়ি আন্দোলন-জরুরি অবস্থা জারি-বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা ও অনবচ্ছিন্নভাবে রাজ্য পরিচালনা—ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার—এই বৃহৎ, বিপুল পরিপ্রেক্ষিত ছয় দশকের পশ্চিমবঙ্গকে যেভাবে গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে ঐ সময়কালের পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিপুল পার্থক্য।

৪.২ ঠিক এই কারণেই দুই বাংলার সাহিত্য এখন সমান্তরাল অথচ অন্যনিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠেছে, উঠছে। তাছাড়াও আর একটা কথা আছে। পশ্চিমবাংলায় কল-কারখানা-খনি-ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে-অর্থনীতি বহুদিন ধরেই বিকশিত হয়েছে তার পাশাপাশি মূলত কৃষিনির্ভর পূর্ব-পাকিস্তান ছিল অন্য বর্গের আর্থনীতিক কাঠামোর ওপর অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ শিল্প-অর্থনীতিতে আগের চেয়ে বেশ কিছুটা অগ্রসর হলেও এখনও বেশির ভাগটা কৃষি-অর্থনীতির ওপরই নির্ভরশীল। এ জন্যও দুই দেশের মধ্যে সামাজিক ভাবনায় কিছুটা পার্থক্য আছে। বাংলাদেশের লেখকদের ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলির মোকাবিলা যেমনভাবে করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োজন হয় না বিশেষ, কারণ এখানে ধর্মীয় মৌলবাদীরা নেহাতই সংখ্যাল্প এবং নখদন্তহীন। এই পার্থক্যও দুই বাংলার সাহিত্যের ওপর অভিঘাত ফেলেছে।

৪.৩ সবশেষে আরও একটি বিষয় একান্তভাবেই প্রণিধানযোগ্য। পশ্চিমবাংলার বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত হতে হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয়তার পরিমণ্ডলের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সীমানার মধ্যে। অন্যপক্ষে, বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই বহুত্বের বন্ধন-স্বীকৃতির অপরিহার্যতা নেই। সেটা একান্তই, একশৈলিক ('মনোলিথিক' অর্থে)। দুই বাংলার সাহিত্যের ভাবরূপ-ভিন্নতার সেটাও একটি বড় কারণ নিঃসন্দেহে।

একক ২ □ বাংলাদেশের কবিতা : নির্বাচিত পাঁচজন কবির রচনা

২.১ আল মাহমুদ
- ২.১.১ কবি পরিচিতি
- ২.১.২ কাব্য পরিচিতি
- ২.১.৩ নির্বাচিত কবিতা
  - ২.১.৩.১ 'বিষয়ী দর্পণে আমি'
  - ২.১.৩.২ 'লোক-লোকান্তর'
  - ২.১.৩.৩ 'হে আচ্ছন্ন নগরী'
  - ২.১.৩.৪ 'প্রত্যাবর্তন'
  - ২.১.৩.৫ 'স্বপ্নের সানুদেশে'
  - ২.১.৩.৬ 'সোনালি কাবিন'

২.২ শামসুর রাহমান
- ২.২.১ কবি পরিচিতি
- ২.২.২ কাব্য পরিচিতি
- ২.২.৩ নির্বাচিত কবিতা
  - ২.২.৩.১ 'আসাদের শার্ট'
  - ২.২.৩.২ 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'

২.৩ হাসান হাফিজুর রহমান
- ২.৩.১ কবি পরিচিতি
- ২.৩.২ কাব্য পরিচিতি
- ২.৩.৩ নির্বাচিত কবিতা
  - ২.৩.৩.১ 'বারুদ'
  - ২.৩.৩.২ 'বীর নেই, আছে শহীদ'

২.৪ মহাদেব সাহা
- ২.৪.১ কবি পরিচিতি ও কাব্য পরিচিতি
- ২.৪.২ নির্বাচিত কবিতা
  - ২.৪.২.১ 'একদিন তার জন্য'
  - ২.৪.২.২ 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি'

২.৫ সিকানদার আবু জাফর
- ২.৫.১ কবি পরিচিতি ও কাব্য পরিচিতি
- ২.৫.২ নির্বাচিত কবিতা
  - ২.৫.২.১ 'সংগ্রাম চলবেই'
  - ২.৫.২.২ 'সেই রাত্রি'

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
২.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

২.১ আল মাহমুদ

২.১.১ কবি পরিচিতি

১৯৩৬ সালে কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর জন্ম হয়। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্টের কিছু পর থেকেই পূর্ববাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি দ্বারা নিজেদের শোষিত মনে করেন, করতে থাকেন। এই সময় নানারকমের চাপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পরিবর্তে উর্দুভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও চলতে থাকে। ১৯৫২-র ২১ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ভাষা আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। দশম শ্রেণীর ছাত্র আল মাহমুদ 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাষা আন্দোলন কমিটির' আহ্বানে স্কুল ছেড়ে দিয়ে সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই দেশকালের আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য গ্রামে গ্রামে তিনি পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের মুসলিম লীগ পরাস্ত হলে আল মাহমুদ ঢাকায় ফিরে এসে পত্র-পত্রিকায় নানা রকম কাজ করে ও লিখে দিন কাটাতে থাকেন। কবি নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি লিখতে শুরু করি মধ্য পঞ্চাশ অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ র দিকে'। ১৯৫৮ থেকে ৬৮—পূর্ব বাংলার ইতিহাসে কালোদশক বলে চিহ্নিত। আল মাহমুদ এই সময়ে 'ইত্তেফাক'-এ চাকরি করতেন। ১৯৬৮-তে এই কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৯ এ 'সমকাল' পত্রিকায় 'সোনালি কাবিন' এর সনেটগুচ্ছ প্রকাশিত হতে থাকে। এই বছরেই 'ইত্তেফাক' আবার প্রকাশিত হলে আল মাহমুদ পুনরায় যোগ দেন। ১৯৭১-এ আত্মগোপন করে কলকাতায় এসে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাজে যোগ দান করেন। ১৯৭১-এ 'গণকণ্ঠ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে হাতে দেন। এই পত্রিকায় নানান মন্তব্য করার কারণে তিনি ১৯৭৪-এ কারারুদ্ধ হন। অতঃপর শেখ মুজিবর রহমান-এর নির্দেশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হয় 'সোনালি কাবিন'। ১৯৭৬-এ তাঁর জেল থেকে লেখা কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯-তে তিনি সৌদি আরব যান। সেখানে 'মিনা' নগরে বাসকালে আলফাতাহ নেতা আরফাতের 'ইসলামের শক্তি' সম্পর্কিত অসাধারণ ভাষণে মুগ্ধ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এরপর থেকেই তাঁর কবিতায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনুরাগ প্রকাশ পেতে থাকে। বুদ্ধিজীবী মানুষের গতি যখন ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে তখন আল মাহমুদের কবিতায় ধর্মীয় আবেগ ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এই কারণেই ঢাকায় তিনি প্রায় ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং প্রবাহমান ধারা থেকে হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন।

তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হলো :

'লোক-লোকান্তর' (১৯৬৩)
'কালের কলস' (১৯৬৬)
'সোনালি কাবিন' (১৯৭৩)
'মায়াবি পর্দা দুলে ওঠো' (১৯৭৬)
'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০)
'বখতিয়ারের ঘোড়া' (১৯৮৪)
'আরব্যরজনীর রাজহাঁস' (১৯৮৭)
' প্রহরান্তের পাশ ফেরা' (১৯৮৮)

২.১.২ কাব্য পরিচিতি

১.২.১ কাব্যজগতে আল মাহমুদের আবির্ভাব মধ্য পঞ্চাশ অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫। প্রথম জীবনে তাঁর কবিতায় কাব্যবিষয় রূপে প্রেম, প্রকৃতি এবং স্বদেশভূমিই স্থান পেয়েছিল। নিজের কাব্যবিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : 'প্রেম প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই আমার রচনার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে আমার ভালো লাগতো।' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর'। এই সংকলনটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে কবির প্রেরণা কোন আন্দোলন বা বিপ্লব, অথবা সমাজচেতনা নয়, প্রেরণা ছিল আত্মচেতনা—কবি যেন নিজেকেই নিজে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। তাই লেখেন—

'ক'বার তাড়িয়ে দিই, কিন্তু ঠিক নির্ভুল রীতিতে
আবার সে ফিরে আসে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে
তার সেই মুখখানি কুটিল আয়না হয়ে যায়
নিজেকে বিস্মিত দেখি যেন সেই মুহূর্ত মুকুরে।'

'ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে কবি আপন আত্মপ্রতিকৃতি দেখে বলেন 'আমাকে পশুর মতো মনে হতে থাকে।' নিঃসঙ্গতার বোধ এই কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে কবি নিঃসঙ্গতায় কাতর নন, বরং পথ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে কবি একাত্ত হতে চাইছেন। আল মাহমুদের কবিতায় প্রকৃতি তার নিজস্ব রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। অনেকটা যেন জীবনানন্দের প্রকৃতি-চেতনার মত। প্রকৃতি তার স্বাদ-গন্ধ-সৌন্দর্য-মানবেতর প্রাণী—সব নিয়ে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়—

'অরণ্যে স্বাধীন সবাই, জোঁক ব্যাঙ, তরুণ হরিণ-
বাঘের দারুণ চোখ, ঝোরার সচল জলে সাপ
আর এই আগাছার বন্য ফুল তাও যে রঙিন।'

এই পর্বের কাব্যে আরো দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা হলো ধর্ম ও মানুষের জীবনকামনা এবং প্রেম। নারী ও ফসল—এ দুটি উপাদান তাঁর কবিতায় বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে, এ কাব্যেই যেন তার সূত্রপাত। শুধু তাই নয়, এ দুটি উপাদানের মাধ্যমে গভীর জীবনবোধও তুলে ধরেছেন কবি। প্রেম ভাবনাও একাব্যের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রেম ভাবনা ও শরীর চেতনা একই সঙ্গে অকপটভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

১.২.২ কবির দ্বিতীয় কাব্য 'কালের কলস', প্রকাশকাল ১৯৬৬। ১৯৫৮ থেকে ৬৮—এই দশবছর পূর্ব বাংলার ইতিহাসে 'কালো দশক' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই সময়ে কবি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'ইত্তেফাক'-এর সঙ্গে জড়িত। সামরিক শাসন তখনও বহাল; ফলে আপন অনুভূতিকে প্রকাশের পথে রাজনৈতিক বাধা; তবু সেই বাধা কবিকে পরাস্ত করতে পারেনি। সমকালের অস্থিরতার মধ্যে দাঁড়িয়েও কবির 'ফিরে যেতে সাধ জাগে', 'প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারে' উড়তে উড়তেও কবি আশা রাখেন 'যদি কোনদিন/আদিম উদ্ভিদ রেখা দেখা দেয়', ঘোষিত হয় 'দিগ্বিজয়ী মাটির মহিমা'। সমকাল ও স্বদেশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চেতনা ধরা পড়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। পূর্ববর্তী কাব্যে যা ছিল শুধু বোধমাত্র, এখানে এসে তা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে, শাসক বিরোধী প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে। 'আমার সমস্ত গন্তব্যে' কবিতাটি পাঠ করলে তা অনুমিত হবে—

'এখন কোথায় যাওয়া যায়?
শহীদ এখন টেলিভিশনে। শামসুর রাহমান
সম্পাদকীয় হয়ে গেলেন। হাসানের বঙ্গজননীর
নীলাম্বরী বোনা
আমার দ্বারা হবে না।'

কবির এই মনোভাব আরও পরিষ্কার হয় যখন এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :—"আমাদের বামপন্থী প্রগতিবাদী *বুদ্ধিজীবী এবং কবি সাহিত্যিকগণ.......২৫ শে মার্চের রাতে পাকবাহিনীর গোলাগুলির আওয়াজে ভীত হয়ে পরদিন* ভোরবেলায় স্ব স্ব গ্রামে সপরিবারে পালিয়ে যান, লুকিয়ে ন' মাস কাটিয়ে আবার ঢাকায় সাবেক জীবনে ফিরে এসে মুক্তি যুদ্ধের চেতনা নামক তত্ত্ব, 'বন্দি শিবির থেকে' জাতীয় কাব্যগ্রন্থ উপহার দেন।" মুক্তিযুদ্ধে কবি তাঁর আপন ভূমিকা সম্পর্কে বললেন, 'হাতে গোনা যে দু' একজন কবি মুক্তিযুদ্ধে সামিল হতে ঢাকা ছেড়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় গিয়ে পৌঁছোন এবং যুদ্ধের প্রোপাগান্ডায় সাধ্যমত অবদান রাখেন তাদের একজন আমি নিজে।' মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কবি যিনি ভাষা আন্দোলনেরও শরিক ছিলেন, তাঁর লেখনী থেকে অনবদ্য এক কবিতা জন্ম নিলো 'রবীন্দ্রনাথ' নামে। এখানে কবি লিখছেন—

'বুঝিনা রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন
গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।'

আল মাহমুদ রচিত এই কবিতাটি জনগণের সামনে এক শানিত অস্ত্র যার সাহায্যে প্রতিবাদ গর্জে ওঠে। এই ধরনের কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে কবির সংগ্রামী মনোভাব ধরা পড়ে। তবে সংগ্রামী কবি কোন রাজনৈতিক শিবিরে প্রবেশের পক্ষপাতী যে নন তা বোঝা যায় তাঁর 'পথের বর্ণনা' কবিতা পাঠে। কবি জানেন, নিঃসঙ্কোচে হেঁটে যাওয়ার মতো কোন পথই আজ প্রশস্ত নয়। কারণ ঃ

'বামে যদি যাও তবে শোন পান্থ, বামের বিধান :
বড়ই ভীষণ রাস্তা ভয়ানক তৃষ্ণার সড়কে
উদ্ভিদ শোষক রৌদ্র ঝরে যাবে দারুণ নিয়মে।'

আর দক্ষিণে?—'.....দারুণ দক্ষিণ—

এও তো পিচ্ছিল পথ, ঝড়জলে তেমনি দুর্গম,
নিষ্প্রদীপ নেমে গেলে সূর্যহীন শীতের সড়কে
দানব হাওয়ার মধ্যে অতিশয় বৃষ্টির শায়ক
প্রাগৈতিহাসিক রোষে সারা দেহে কামড় বসাবে।'

তাই রাজনৈতিক কোন আশ্রয়কে নয়, কবি অবলম্বন করেছেন আপন প্রাণের বিশ্বাসকে এবং সেই বিশ্বাসে স্থিত থেকেই সংগ্রামী কবি লেখনী চালনা করেছেন। বস্তুতঃ 'কালের কলস'-এর কবি তাঁর স্বদেশভূমির সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে কবি-দায় পালন করেছেন। অবশ্য কবি-দায়ই তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য কবিতার জন্য বহুদূর অগ্রসর হওয়া।

১.২.৩ তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ' সোনালি কাবিন', প্রকাশ ১৯৭৩। এই পর্বে কবি অনেক বেশি স্থিতধী এবং বিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাসের সুর তাঁর কণ্ঠে। স্বাধীনতার উদ্দীপনায় রচিত তাঁর এই পর্বের কবিতাগুলি। এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রকৃতি'। এখানে কবি বর্ষণসিক্ত উর্বরা ভূমির চিত্রকল্প রচনা করেছেন। ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে কবি তাঁর প্রিয়তা কিষানি মৃত্তিকায় ধানের চারা রোপণ করেছেন, কখনো বা জমির কিনারা ঘেঁষে পলাতক মাছের পিছনে নিঃশব্দে সাপের পদচারণা লক্ষ্য করেছেন, কখনো বা তাঁর বাহুতে ফড়িং চমকে লাফিয়ে উঠছে। সব মিলে কবি একটা সুখস্পর্শ অনুভবের ছবি এখানে তুলে ধরেছেন। একই অনুভব লক্ষ্য করা যায় 'বাতাসের ফেনা' কবিতাতেও। কবি সবকিছু

হারিয়ে যাওয়ার মাঝেও 'আদিগন্ত' ফসলের সবুজ চিৎকার' শুনেছেন। 'অবগাহনের শব্দ' কবিতায় আছে অন্ধকার পার হয়ে আসার কথা, আছে জন্মান্ধ পশ্চাৎকে বিদায় জানানোর দৃশ্য। 'সোনালি কাবিন'-এর সনেটগুলি অধিকাংশই অতীতের মহিমা বিজাড়িত, বর্তমানের প্রতি হতাশ এবং ভবিষ্যতের আশায় উজ্জ্বল। 'দায়ভাগ', 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' কবিতায় আছে সেই অতীত স্মৃতিচারণ, 'স্বপ্নের সানুদেশে', 'সোনালি কাবিন' প্রভৃতি কবিতায় আছে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা—কবি যখন বলেন—'স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো' তখন সেই আশার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। 'বাতাসের ফেনা', 'অন্তরভেদী অবলোকন', 'পালক ভাঙার প্রতিবাদে', 'খড়ের গম্বুজ' প্রভৃতি কবিতায় আছে বর্তমানের প্রতি অনাস্থা। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা হলো নাম কবিতা। 'সোনালি কাবিন' (বিবাহ-চুক্তি) কবিতায় বর্তমান সম্পর্কে কবির তিক্ত মনোভাবের প্রকাশ আছে, আছে আপন অন্তরানুভূতির স্বীকৃতি প্রকাশ। তাই কবি বলেন—'সোনার দিনার নেই, দেন-মোহর চেয়োনা হরিণী/যদি নাও দিতে পারি কাবিন বিহীন হাত দুটি/আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি/আহত বিক্ষত করে চারিদিকে চতুর ভ্রুকুটি', এবং 'দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা'।

১.২.৪ আল মাহমুদের পরবর্তী কাব্য 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' (১৯৭৬)। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের থেকে একটু পৃথক ধরনের। এই কাব্যের কবিতাগুলি কবির কারাবাসে বসে লেখা। ফলে সমাজ ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটা বেদনা, তিক্ততা ও একাকীত্ববোধ এই সময়ের কবিতায় ধরা পড়েছে। 'প্রাচীর থেকে কথা', 'জেলগেটে দেখা', 'আমার মাথা' প্রভৃতি কবিতাতে কবিমনের নৈরাশ্যের ছাপ আছে। তবে পরের দিকের কবিতাগুলিতে এই নৈরাশ্য তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। 'কিশোরীর ভাঙাচুড়ি', 'পাগলা মৌমাছি', প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই কাব্যে কবির ধর্মবিশ্বাসের সুর একটু বেশি উচ্চগ্রামেই প্রকাশ পেয়েছে।

১.২.৫ পরবর্তী কাব্যগ্রন্থটির নাম 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' (১৯৮০)। এই কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতায় কবির ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের আকুতি ধরা পড়েছে। এছাড়া এই কাব্যে মিশে আছে নানা ধরনের অনুভূতি। বাংলার জনজীবন, গ্রামের প্রতি টান, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ—এগুলি তাঁর অন্যান্য কাব্যে যেমন ছিল এখানেও তেমনি আছে। কবি নিজেই তাঁর কাব্য-ভাষা সম্পর্কে জানিয়েছেন 'কবির বিষয়' নামে কবিতাটিতে—

'আমার বিষয় তাই, যা গরীব চাষীর বিষয়
চাষীর বিষয় বৃষ্টি ফলবান মাটি আর
কালচে সবুজে ভরা খানাখন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।'

সমালোচকদের মতে, এই কাব্যগ্রন্থে কবি ইসলাম ধর্মের দিকে একটু বেশি ঝুঁকেছেন। এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'হজরত মোহাম্মদ', এবং শেষ কবিতা 'নীল মসজিদের ইমাম'-এ অবশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কবির ধর্মবিশ্বাসের কথা স্থান পেয়েছে। তবে একথাও সত্য যে, এই কাব্যের এই দুটি কবিতা ছেড়ে দিলে বাকি চৌত্রিশটি কবিতায় কবির স্বাভাবিক অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে।

১.২.৬ 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ ১৯৮৪। এই কাব্যেও আছে মানুষের কথা, তার ঘরসংসারের কথা, জীবন-যাপনের কথা। 'ভারতবর্ষ' নামক কবিতাতে আছে নির্বাণ দর্শন ও বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ। কৃষকের কথা এখানেও আছে—'প্রজ্জ্বলিত উনোনে এখন/চাষীদের অন্ন উথলায়। ঘরে ঘরে দুহিত গোধনে/পরিতৃপ্ত জনপদ।' এই কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় ইসলাম ধর্মের কথা আছে। 'নাতিয়া', 'নীল মসজিদের ইমাম' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে

স্মরণীয়। কবি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা বোঝা যায় 'বোশেখ, পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতায়। এখানে কবি রামায়ণ প্রসঙ্গ এনে বলেছেন—'রামায়ণে পড়েছি যার কীর্তিকথা সেই মহাবীর হনুমানের পিতা তুমি?' বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা আছে 'ভারতবর্ষ' নামক কবিতায়।

১.২.৭ 'আরব্যরজনীর রাজহাঁস' বা 'প্রহরান্তের পাশ ফেরা' কাব্যগ্রন্থ দুটি পূর্বের কাব্য জগতেরই কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে সে জগৎ-ও ক্রমশঃ ছোট হয়ে এসেছে। এদুটি কাব্যগ্রন্থেও তাঁর নিজস্ব শব্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রেয়সীর প্রেম এবং মানবিকতা নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে কবি দেখলেন ঃ

'মানুষের রক্ত, বিষ্ঠা অতিরিক্ত ঘামে ও বমনে হায় খোদা
শেষমেষ তোমার এ শুদ্ধতম শিল্প ভেসে যায়।'

কিন্তু এসব নিয়ে কবির কোন মাথাব্যথা নেই, এসবের মধ্যে দিয়েই কবি লিখে চলেন তাঁর কবিতা।

২.১.৩ নির্বাচিত কবিতা

২.১.৩.১ 'বিষয়ী দর্পণে আমি' ('লোক লোকান্তর')

ক'বার তাড়িয়ে দিই, কিন্তু ঠিক নির্ভুল রীতিতে
আবার সে ফিরে আসে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে
তার সেই মুখখানি কুটিল আয়না হয়ে যায়
নিজেকে বিস্মিত দেখি যেন সেই মুহূর্ত মুকুরে।

ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে
আমাকে পশুর মতো মনে হতে থাকে। ধূসর হাওয়ায়
পাশব কেশর ওড়ে, অনাচারী বিষয়ী নখর
নষ্ট করে গাছপাতা নারীশিশু জনতা শহর!

কখনো অসৎ থাবা অকস্মাৎ উত্তোলিত হলে
দেখি সেই বিস্মিত পশুর
দর্পিত হিংস্র চোখ আমাকেই লক্ষ্য করে জ্বলে;
চিবুক লেহন করে, সেই অলীক মুহূর্তের ক্রোধ
জয় করে দেখি আমি, কেবলই আমার মধ্যে যেন এক
শিশু আর পশুর বিরোধ।

২.১.২ 'বিষয়ী দর্পণে আমি' কবিতাটি তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত। 'লোক-লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা এটি। এখানে সংগ্রাম বা বিপ্লব নয়, বরং আত্মচেতনা বা আত্মমগ্নতাই প্রকাশ পেয়েছে। কবি নিজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজতে চেয়েছেন। কবি নিজেকে বিস্মিত দেখেন দর্পণে, সে যেন ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরে ঘুরে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে, বিষয়ী মানুষের মত কুটিল হয়ে যায় তার মুখ—এভাবেই তিনি নিজেকে বিস্মিত হতে দেখেন নিজেরই মনোমুকুরে।

দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলছেন 'ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে' আত্মপ্রতিকৃতি দেখে তাঁর নিজেকে পশুর মতন মনে হচ্ছে। মানুষের মধ্যেকার পাশবিক সত্তার জাগরণ দেখেছেন কবি, দেখেছেন বিষয়ী মানুষের অনাচারে কিভাবে নষ্ট হয় 'নারী-শিশু-জনতা-শহর'। ধূসর হাওয়ায় ওড়ে 'পাশব কেশর'। অনাচারী মানুষ তাদের বিষয়ী বুদ্ধি দিয়ে (যাকে কবি

'বিষয়ী নশ্বর' বলেছেন) কিভাবে প্রকৃতি-সংসার সমাজকে আঘাত করছে তা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তাই বিষয়ী মানুষের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে আপন প্রতিকৃতি দেখে চমকে উঠেছেন দর্পণে। বস্তুতঃ নিজেকেই তিনি সেই সব অসৎ মানুষের প্রতিনিধি করে দেখেছেন। কারণ তারাও তো তাঁরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ, তবু কেন তাঁর থেকে পৃথক।

তৃতীয় স্তবকে কবি সেই সকল বিষয়ী মানুষের অসৎ থাবা উত্তোলিত হতে দেখেছেন। সেই অসৎ থাবা আকস্মিকভাবে এগিয়ে এলে দর্পণে প্রতিবিম্বিত পশুর দর্পিত চোখ তাঁকে লক্ষ্য করে জ্বলে ওঠে, আর তৎক্ষণাৎ কবি তাঁর মুহূর্তের ক্রোধ জয় করে উপলব্ধি করেন, 'কেবলই আমার মধ্যে যেন এক/শিশু আর পশুর বিরোধ'।

বস্তুতঃ এই কাব্যের একটি অন্যতম সুর হ'ল নিঃসঙ্গতা। আলোচ্য কবিতাটিতেও সেই একাকীত্বের সুর যেন অস্পষ্টভাবে হলেও ধ্বনিত হয়েছে। কবির মনের এক বিশেষ অনুভূতি ধরা পড়েছে এই পর্বের কবিতায়। 'বিষয়ী দর্পণে আমি' কবিতাটির নামকরণের মধ্যেই তার বিষয়বস্তুর তির্যকতা ধরা পড়ে। যে-কবির জন্মমুহূর্ত থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত কেটেছে মর্মান্তিক প্রতিকার চিন্তায় সেই কবিই নিজেকে 'ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে' দেখার মত স্পর্ধা করতে পারেন। আলোচ্য কবিতাটি এই নারকীয় সমাজের বুকে একটা তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ।

২.১.৩.২ '**লোক-লোকান্তর**' ('লোক লোকান্তর')

আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার ওপরে নীচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দু'টি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রঙ, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।

তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তর আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

২.১.৪ 'লোক-লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা এটি। দুটি স্তবকে বিন্যস্ত এ কবিতায় কবি এক বিশুদ্ধ চেতনার জাগরণের কথা বলেছেন। আপন চেতনায় বিশ্বস্ত কবি তাঁর চেতনাকে একটি সাদা পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার গন্তব্য লোক থেকে লোকান্তরে। একদা কবি জানিয়েছিলেন তাঁর কাব্যবিষয় সম্পর্কে—'প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই' আমার রচনার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে ভালো লাগতো।' এ কবিতাতেও কবির সেই প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় আছে। কবি তাঁর চেতনাকে একটি সাদা পাখির সঙ্গে তুলনা করে তাকে সবুজ অরণ্য প্রান্তরে একটি চন্দনের ডালে উপবিত

করিয়েছেন। যার মাথার ওপরে নীচে সর্বত্র বন্য বাতাসের দোল, দোল বন্য পানলতার। কবি কল্পনা করেছেন পানলতার সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে চেতনা-রূপ পাখিটির ঠোঁট। তার চোখের কোটরে আছে সুপারির রঙ, সবুজে ঢাকা তার পা, নখ তার লাল, আর তার সমস্ত দেহে ভরে আছে চন্দনের সুবাস।

প্রথম স্তবকে তার রূপের বর্ণনা দেওয়ার পর দ্বিতীয় স্তবকে কবি জানাচ্ছেন, সেই উজ্জ্বল রূপের দিকে তিনি তাকাতে পারেন না। কিন্তু যখন সেই চেতনার মণি উজ্জ্বল হয় তখন যেন মনে হয় সমস্ত বন্ধন সে ছিঁড়ে দেবে, কেটে দেবে; সংসার, সমাজ, ধর্ম সব তুচ্ছ হয়ে যাবে, তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়। অর্থাৎ কবি তাঁর শুভ্র চেতনার উজ্জ্বল আলোয় ভর করে এই সমাজ-সংসারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবেন—যেখানে তুচ্ছ হয়ে যাবে ধর্ম। ধর্মবোধ। কবি আশা করেন ভেঙে যাবে সমস্ত শৃঙ্খল—আর লোক থেকে লোকান্তরে ধ্বনিত হবে কেবল কবির গান,— ঘোষিত হবে 'কবিতার আসন্ন বিজয়'। এভাবেই কবি কাব্যের জয় ঘোষণা করলেন তাঁর এ কবিতায়।

বস্তুতঃ প্রকৃতির রাজ্যেই প্রাণের জয়। মানুষ আজ প্রকৃতিকে ভুলেছে, সঙ্গী করেছে রাজনীতিকে অথবা বলা যায় রাজনীতির নামে সন্ত্রাসবাদকে। ওপার বাঙলার অন্যতম কবি আল মাহমুদের জীবন কেটেছে আপনদেশের প্রতিকার চিন্তায়। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার, মাতৃভাষাকে কণ্ঠরোধ করার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। ফলে স্বভাবতই কবিমন আহত তাঁর। এই পরিস্থিতিতে তিনি মানুষের বিশুদ্ধ চেতনার জাগরণ কামনা করেছেন, কামনা করেছেন শিল্পসৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশের।

২.১.৩.৩ 'হে আচ্ছন্ন নগরী' ('কালের কলস')

'আমিও যখন এসেছি নগরে একি!
তোমার শরীরে আভরণ নেই কোনো
পশুর থাবায় বিঁধে আছে চেয়ে দেখি,
নাভিমূল আর কামনার অঙ্গনও।

সবুজ শাড়িটি জীর্ণ মালার মতো
পড়ে আছে পায়ে নিটোল উরুর কাছে,
জীবন যেন বা হয়েছে কণ্ঠাগত
পাতা-ঝরা এক তরুণ সেগুন গাছে!

চারিদিকে কাঁপে দুঃখের হাহাকার
হৃদয় বিতানে শুকায় জীবন-লতা,
পাপ প্রাঙ্গণে বেঁধেছো কি সংসার
হাতে নিয়ে শুধু বয়সের পেলবতা?

বাতাস কাঁপছে অসুস্থ আলোড়নে
পত্রে পুষ্পে স্পর্শ লেগেছে তার,
শতধা দীর্ণ তোমার লাজুক মনে
হেনেছো তোমার হতাশার তলোয়ার।

কখন আমার ইচ্ছাকে মেলে ধরি
আশার কুসুম যখন পশুর হাতে?

সুন্দরী, তুমি যত হও সুন্দরী
তোমাকে চাইনি মাতাল ঝড়ের রাতে।'

২.১.৬ 'কালের কলস' কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম কবিতা 'হে আচ্ছন্ন নগরী'। সমকালের বিপন্নতাবোধ ও ক্ষোভকে এই পর্বেই কবি অনুভব করেছেন। আলোচ্য কবিতার মধ্যে সেই সমকাল চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত এ কবিতার প্রথম চরণ শুরু হয়েছে বিস্ময়বোধক চিহ্নের মধ্য দিয়ে—'আমিও যখন এসেছি নগরে একি।' কবি নগরের বুকে পা রেখে দেখেছেন তার শরীরে কোন আভরণ নেই। শাসকদলের হাতে সমগ্র নগরটি আজ বিবস্ত্র প্রায়। পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন তার সারা দেহে—

'পশুর থাবায় বিঁধে আছে চেয়ে দেখি,
নাভিমূল আর কামনার অঙ্গনও।'

দ্বিতীয় স্তবকে কবি জানাচ্ছেন, 'সবুজ শাড়িটি জীর্ণ মালার মতো' অর্থাৎ নগরের শস্যক্ষেত্র বিপর্যস্ত, জীর্ণ মালার মত পড়ে আছে, জীবন হয়েছে কণ্ঠাগত, 'পাতাঝরা' এক তরুণ সেগুন গাছে।' সেগুন গাছটি 'তরুণ' অথচ তা পাতা-ঝরা। সর্বত্র একটা শূন্যতা, একটা রিক্ততার ছবি ফুটে আছে।

তৃতীয় স্তবকে কবি লিখলেন, 'চারিদিকে কাঁপে দুঃখের হাহাকার।' সমগ্র নগরটি দুঃখের কান্নায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। জীবনে যেন শুষ্ক লতা। সর্বত্র অনাচার ও পাপে ছেয়ে আছে। কবি প্রশ্ন করেছেন—'পাপ প্রাঙ্গনে বেঁধেছো কি সংসার/হাতে নিয়ে শুধু বয়সের পেলবতা?'

নগরের এই অসুস্থ পরিবেশ বাতাসকেও করেছে অসুস্থ। আকাশ, বাতাস, এমন কি পত্র-পুষ্পেও তার স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। কবির মন আজ শতধা দীর্ণ—'হেনেছো তোমার হতাশার তলোয়ার।' পরিবেশ যখন অসুস্থ, বৃক্ষ যখন পত্র-পুষ্প হীন, জীবন যখন শুষ্ক লতার ন্যায় তখন কবিমনে হতাশা ছাড়া আর কিই বা বাসা বাঁধতে পারে।

কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি একরাশ হতাশার সুর বুকে নিয়ে বললেন—'কখন আমার ইচ্ছাকে মেলে ধরি/ আশার কুসুম যখন পশুর হাতে?' পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনব্যবস্থা ওপার বাংলার ওপর এমনভাবে চেপে বসেছিল, যেখানে মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হয়েছিল। কবি এই অবস্থাকে 'পাশবিক' অত্যাচারের সমতুল মনে করেছিলেন। আর তাই লিখলেন—তাঁর সমস্ত 'আশার কুসুম পশুর হাতে' যখন, তখন কি করে তিনি মেলে ধরবেন তাঁর ইচ্ছাকে?

বস্তুতঃ এ কবিতায় খুব স্পষ্টভাবে কবি সমকাল চেতনা এবং রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়কে বাঙ্ময় রূপ দিলেন, যা তাঁর পূর্বের কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়নি। মাতৃভূমি যখন বিপর্যস্ত, পাশবিক অত্যাচারের শিকার তখন কবি-মানস কোন আশার স্বপ্ন দেখবেন! কবিতার অন্তিম চরণটির মাধ্যমে কবির নান্দনিক বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবি, তাঁর স্বদেশভূমি যত সুন্দরীই হোক, তার নগ্ন রূপ তিনি দেখতে চাননি, চাননি তার বিপর্যস্ত রূপকে মাতাল ঝড়ের রাতে দেখতে। এ কবিতায় শুধু যে সমকাল চেতনা ধরা পড়েছে তাই নয়, রাষ্ট্রীক অবক্ষয় এবং স্বদেশ চেতনাও সেই সঙ্গে বাঙ্ময় হয়েছে।

২.১.৩.৪ 'প্রত্যাবর্তন' ('কালের কলস')

আমরা কোথায় যাবো, কতদূর যেতে পারি আর
ওইতো সামনের নদী, ধানক্ষেত, পেছনে পাহাড়।

বাতাসে নুনের গন্ধ, পাখির পাঁপড়ি উড়ে যায়
দক্ষিণ আকাশ জুড়ে সিক্তডানা সহস্র জোড়ায়;
তবে কি বৃষ্টির দেশে এসে গেছি আমরা তাহলে
তরঙ্গের মধ্যে শান্ত লোকালয়, খাল বিল জলে।
দুঃখের রাজত্বে তবে পলাতক আমরা ক'জন।
আবার এসেছি ফিরে; আমাদের ক্লান্তিহীন মন
একদিন জনপদ ছেড়ে এই ক্লান্ত কান্নাময়
পরিণাম চিন্তা করে দেশত্যাগী কবির হৃদয়
নিয়ে যেন পার হয়ে গিয়েছিলো নিজের এ কূল,
কিন্তু আজ মাছ পাখি নাও নদী মাটির পুতুল
বহমান মানুষের অনিবার্য প্রতীকের কাজে
আবার এসেছে ফিরে অনুতপ্ত, নিজের সমাজে।

দেখলো নতুনভাবে ফুলগাছে বসন্তের পাখি
লাফিয়ে বেড়ালো তার মিষ্টি শব্দে করে ডাকাডাকি।
নষ্ট একতারা নিয়ে মনে মনে গুন গুন গেয়ে
দেখলো যে কৃষ্ণচূড়া সবুজের অন্তরাল চেয়ে
সমস্ত শক্তির মূল্যে জ্বেলে দিল ফুলের অনল;
একটু বাতাসে কাঁপে ঝোপঝাড় পাখির মহল।

দ্যাখো, জয়নুলের ছবির মত ঘরবাড়ী, নারী
উঠোনে ঝাড়ছে ধান, ধানের ধুলোয় ম্লান শাড়ি;
গতর উদোম করে হাতে লেপা মাটির চত্বরে
লাঞ্ছিত নিশেন হয়ে পড়ে আছে যেন অনাদরে।
প্রাণের রঙের মত পরাজিত প্রেমের কেতন
আবার তুলতে চাই পলাতক আমরা ক'জন।
মানুষের বাসস্থান, লাউ মাচা, নীলাম্বরী নিয়ে
আমরা থাকতে চাই; এ হৃদয় যেন ঝিলকিয়ে
কখনো উঠতে চায়, আমাদের পূর্বপুরুষের
তাড়ির আসরে গিয়ে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে নিজের
আদিম সাহসে বলে, আমাদের হাতে হাতে দিন
কর্পূর গন্ধের বিন্দু ফোঁটা ফোঁটা বাসনা রঙিন।

কবি আল মাহমুদ তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় আপন কাব্যবিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন : 'প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই আমার রচনার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে আমার ভালো লাগতো।' আলোচ্য কবিতাটিও প্রকৃতি প্রেমের উজ্জ্বল নির্দশন বহন করে।

কবিতার শুরুতেই কবি তাঁর গন্তব্য কতদূর তার সীমানা নির্দেশ করেছেন—

'আমরা কোথায় যাবো, কতদূর যেতে পারি আর
ওই তো সামনে নদী, ধানক্ষেত, পেছনে পাহাড়।'

মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব নির্ভর করে তার প্রকৃতির ওপর। সেই প্রকৃতি ছাড়া মানুষ সত্যিই তো আর কতদূর যেতে পারে! তাই তো কবি এই কবিতায় বর্তমান সময়কে পিছনে ফেলে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন বৃষ্টির দেশে—'তবে কি বৃষ্টির দেশে এসে গেছি আমরা তাহলে/তরঙ্গের মধ্যে শান্ত লোকালয়, খাল বিল জলে।' বাতাসে পেয়েছেন তিনি নুনের গন্ধ, আকাশে পাখির ঝাঁক, শান্ত লোকালয়, খাল-বিল—সব মিলে এক শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ। অথচ এইসব ছেড়ে কবিরা দুঃখের রাজত্বে পলাতক হয়ে ছিলেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিনের জন্য নয়। তাই লিখলেন—'আবার এসেছি ফিরে'। একদিন ক্লান্তিহীন মন নিয়ে কবিরা ক'জন 'ক্লান্ত কান্নাময়' পরিণামের কথা চিন্তা করে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। কিন্তু মাছ, পাখি, নাও, নদী, মাটির পুতুল— তথা বহমান মানুষের সমাজে আবার ফিরে এসেছেন তাঁরা অনুতপ্ত চিত্তে।

কবি যেন নতুনভাবে দেখলেন ফুলের গাছে বসন্তের পাখিকে, যে মিষ্টি শব্দ করে ডাকাডাকি করছে, আদিগন্ত সবুজের অন্তরাল ছেয়ে কৃষ্ণচূড়ার ফুল সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করে জ্বেলে দিল আগুন, বাতাসের কম্পনে দুলছে ঝোপঝাড় এবং 'পাখির মহল'।

তৃতীয় স্তবকে কবি প্রকৃতিকে দেখছেন ছবির মত। জয়নুল যেভাবে ঘরবাড়ি, নারী, উঠোনের ধান ঝাড়ার ছবি এঁকেছে, ধানের ধুলোয় ম্লান শাড়ি লাঞ্ছিত নিশানের মতে যেভাবে পড়ে আছে অনাদরে, ঠিক সেইরকম ঘর, বাড়ি, ধানের ধুলোয় উড়ে পড়া ম্লান শাড়ি প্রভৃতি জীবনের সহজ ছবিগুলো দেখলেন কবি, প্রত্যক্ষ করলেন সেই শান্ত পরিবেশ, আর ভাবলেন, প্রাণের রঙের মত প্রেমের কেতনকে আবার তাঁরা তুলে ধরবেন।

কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি যেন তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন—'মানুষের বাসস্থান, লাউ মাচা, নীলাম্বরী নিয়ে/ আমরা থাকতে চাই।' তাঁর হৃদয় ঝলমলিয়ে উঠতে চায়, পূর্ব-পুরুষদের তাড়ির আসরে হাজির হতে চায়, আর প্রাণ চায় বিন্দু বিন্দু 'বাসনা রঙিন'।

'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটি কবির প্রকৃতি প্রীতির পরিচায়ক। কবিতাটি পড়লে সহসা জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। বাস্তবের যন্ত্রণায়, বিপন্নতায় কাতর কবি 'রূপসী বাঙলার' প্রকৃতি প্রান্তরে অবগাহন করেছিলেন একটু শান্তির আশায়। কবি আল মাহমুদও বাস্তবের গ্লানি, চিন্তার জ্বর ভুলতে আপন কূল ছেড়ে পলাতক হয়েছিলেন। কিন্তু একসময় তাঁকেও প্রকৃতি রাজ্যের শান্ত লোকালয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তাই তো কবিতার নাম 'প্রত্যাবর্তন'।

২.১.৩.৫ 'স্বপ্নের সানুদেশে' ('সোনালি কাবিন')

একদা এক অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে আমাদের যাত্রা
তারপর দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বাতাসে ধানের গন্ধ,
পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যানী।

আমাদের সবার হৃদয় নিসর্গের এক অপরূপ ছবি হয়ে
ভাসতে লাগলো।

নদী, নদী—
সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিমরেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।
দেখো সেই পুণ্যতোয়া, .
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে
দেখো, দেখো।

আমরা যেখানে যাবো, সেই বিশাল উপত্যকার ছবি
আমাদের সমস্ত অন্তরকে গ্রাস করে আছে। আমাদের পতাকায়
রূপকথার বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ
আমাদের আকাশে দোলাচ্ছে সোনালি দোলকের মতো,
বার বার।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
রওনা দিয়েছি। দুঃখ
আমাদের ক্লান্ত করে না।
দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে
মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।
চীৎকার, কান্না ও হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে
আমরা বেরিয়ে যাবো। মৃত্যু
আমাদের স্পর্শ না করুক।

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো
বাম দিকে বয়ে যাবে রূপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণ তৃষিত পর্বত।

২.১.৯ 'সোনালি কাবিন' কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা 'স্বপ্নের সানুদেশে'। পূর্বেও বলেছি, এই পর্বে কবি অনেক বেশি স্থিতধী এবং আত্মবিশ্বাসী। আলোচ্য কবিতায় সেই আত্মবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে। কবিতার শুরু হয়েছে অস্পষ্ট কুয়াশাময় পরিবেশের কথা স্বীকার করে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসক দলের অত্যাচার, মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ—সমকালীয় এই কুয়াশাময় পরিবেশের মধ্যে কবি যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থার কথাই

কবি বলতে চান নি। সমকালের এই অবস্থাকে কেন্দ্র করে যখন অন্যান্য কবিরা নৈরাশ্যের কথা বলছেন, বলছেন জীবন-যন্ত্রণার কথা, ঠিক তখন আল মাহমুদ আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কণ্ঠে আশার কথা শোনালেন এখানে—

'একদা এক অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে আমাদের যাত্রা
তারপর দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।'

সেই আলোক রাশির মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে কবি বাতাসে ধানের গন্ধ, পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যপ্রান্তরকে প্রত্যক্ষ করলেন। নিসর্গের অপরূপ শোভায় কবি তাঁর আপন হৃদয়কে শুধু মুগ্ধ করেননি, নিসর্গের অপরূপ ছবি তাঁর হৃদয় মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয় স্তবক শুরু হয়েছে দুটি শব্দ দিয়ে। 'নদী, নদী'—চরণটি-র শেষে একটা 'ড্যাশ' চিহ্ন থাকায় নদীর অশেষত্ব বোঝাচ্ছে। এই জলধারাই আমাদের প্রাণ। নদী দেখে সন্তানদের উল্লাস, কবির চোখে পড়েছে, কবি উপলব্ধি করেছেন এই স্রোতস্বিনীর নকশায় রমণীরা কাপড় বোনেন, নদীর বাঁকের অনুকরণে ভগিনীরা দেহ আবৃত করেন। এই পুণ্যতোয়ার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে। অর্থাৎ নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, সেই নদীর প্রভাব মানুষের সমগ্র জীবনে, তার কথাই বললেন কবি এখানে।

কবি এক স্বপ্নের সানুদেশে যেতে চেয়েছেন, সেই বিশাল উপত্যকার ছবি কবির সমস্ত অন্তরকে ছেয়ে আছে। রূপকথার সমস্ত সুখের ছবি, মাধুর্যের সুর আমাদের পতাকাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর বারংবার আদের স্বাধীনতার আশাকে দোলায়িত করছে সোনালি দোলকের মতো।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে কবি স্বপ্নের দিকে যাত্রা করেছেন। দুঃখ কবিকে ক্লান্ত করেনি, ক্লান্ত করে না। আসলে দুঃখ তো বাস্তব সত্য, তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়না। কিন্তু শত দুঃখেও কবি ক্লান্ত নন, কারণ তাঁর অন্তরে আছে আশাবাদ, স্বপ্নের দেশে পৌঁছানোর সংকল্প। দুর্যোগের রাতে দাঁড়িয়েও কবি এক উজ্জ্বল আলোকিত দিনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, বিঘ্ন তাঁকে বিবশ করেনি। সমস্ত বাধা, বিঘ্ন, দুঃখ স্বীকার করেই কবি এক সফল নতুন প্রভাতকে দেখতে চান। চীৎকার, কান্না ও হতাশার ক্লিষ্ট পরিবেশ ছেড়ে কবি তই বেরিয়ে যেতে চান, যেখানে মৃত্যুও তাদের স্পর্শ না করে।

অন্তিম স্তবকে কবি তাঁর স্বপ্নের সঞ্চরণ ঘটিয়ে বলেছেন—'স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো।' অর্থাৎ শুধু আশাবাদ নয়, সেই আশাকে বাস্তব সত্যের রূপ দিতে কবি অঙ্গীকার করেছেন, সেই স্বপ্নের সানুদেশে শস্যের বীজ বপন করবেন, অর্থাৎ ভূমিকে উর্বর করবেন। সেই উর্বরা ভূমির বাম দিকে বয়ে যাবে রূপোলি নদীর জল, ডানে থাকবে 'তৃষিত পর্বত'।

'স্বপ্নের সানুদেশে' কবিতাটি একটি সার্থক সৃষ্টি। এ কবিতায় কবির আবাল্য প্রকৃতি প্রীতির প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে রাষ্ট্রীক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন এক সফল শতক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও।

২.১.৩.৬ 'সোনালি কাবিন' ('সোনালি কাবিন')

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবি সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,

এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোক ধর্মে আর ভেদাভেদ।
তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ,
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ,
সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পট্টময় শাড়ি
সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।

২.১.১১ 'সোনালি কাবিন' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতার দশম (১০) সংখ্যক কবিতা এটি। চোদ্দটি স্তবকে বিধৃত একটি দীর্ঘ এবং বিখ্যাত কবিতা সোনালি কাবিন। কবিতাটি একই সঙ্গে যেমন বাস্তব তেমনি ভীষণভাবে প্রতীকী। কবিতার দশম স্তবকে কবি শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন। একজন কমিউনিস্ট কবির মতই তার দৃপ্ত কণ্ঠ ঘোষণা করেছে—

'আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ
এমন প্রেমের বাক্য সুহাসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।'

কবি এখানে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করেছেন চীনদেশের কথা, যেখানে সাম্যবাদ শান্তি আনয়ন করেছে। এশিয়ায় যারা এই কর্মজীবী সাম্যাবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কবি তাদের বীর আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাদের পোশাকে তিনি বীরের তকোমা এঁটে দিতে চেয়েছেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেছেন, 'আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন।' আমরা সাধারণ মানুষ ধর্ম বলতে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় বুঝি। আর এই রকম বোঝার ফলেই আমাদের ভেতর যতকিছু বিভেদ আমরা রচনা করি। কবি এখানে সেই বিভেদকে মুছে দিতে চেয়েছেন এবং আমাদের ধর্ম হিসেবে 'ফসলের সুষম বন্টন'কে অঙ্গীকার করতে বলেছেন। কবি জাত-ধর্ম-শ্রেণী সব কিছুকে দূরে সরিয়ে মনুষ্যত্বের এক উদার মহিমা জ্ঞাপন করেছেন এখানে। কৃষি প্রধান দেশের মানুষের ধর্মইতো হওয়া উচিত 'ফসলের সুষম বন্টন'। কিন্তু আমরা সেখানে জাত-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করি, গড়ে তুলি লোকধর্মের ভেদাভেদ। কবির তাই প্রথম প্রেম আপন জনগণের সঙ্গে, ফসলের সুষম বন্টনের সঙ্গে, তারপর তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে। দেশ সম্পর্কে, জাতি সম্পর্কে এই সকল দায়িত্ব পালনের পর কবি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন; তবে সেখানেও শর্ত একটাই—

'শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ।'

বস্তুতঃ আল মাহমুদের কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশভূমি সব একত্রে সহাবস্থান করেছে। প্রেমের আবেশে তাঁর স্বদেশভূমি অথবা স্বদেশপ্রেম তাঁর প্রেমচেতনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; বরং একে অপরের পরিপূরক হয়ে আছে। এত স্পষ্টভাবে সাম্যবাদ সম্পর্কে বোধহয় কেউ বলেন নি, এমনকি কমিউনিস্ট কবিরাও নয়। আপন দেশ সম্পর্কে, দেশের মানুষ সম্পর্কে তিনি যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। 'উপমা' আল মাহমুদ সংখ্যা
২। আল মাহমুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (দে'জ পাবলিশিং)

২.২ শামসুর রাহমান

২.২.১ কবি পরিচিতি

১৯৫০-এ প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' নামাঙ্কিত কাব্যসংকলনে যে-কবিরা বাংলাদেশের কাব্যজগতে নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি শামসুর রাহমান এক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর কবিতায় প্রতিবাদ আছে, আছে প্রতিরোধ কিন্তু এই প্রতিবাদই একমাত্র কথা নয়। সেই সঙ্গে তাঁর কবিতায় আছে ঐতিহ্যে অনুরাগ, গভীর দেশপ্রেম, আছে বৈপ্লবিক চেতনা, আছে মাতৃভাষা সম্পর্কে আকুলতা এবং অস্তিত্বের জন্য কম্পমান এক অসীম ব্যাকুলতা।

ঐতিহ্যে অনুরাগ শামসুর রহমানের কবিতাকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। এর সূত্রেই, বিশেষতঃ রবীন্দ্রানুরাগ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় রূপ নিয়েছে। অবশ্য শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, স্মরণ করেছেন তিনি মাইকেল মধুসূদনকে, নজরুলকে এবং জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তিরিশের দশকের কবিদের। ঐতিহ্যের পথ বেয়ে চলেছেন তিনি সুদূরে,—এদেশ থেকে ওদেশে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। অবলম্বন করেছেন দান্তে, আরাগঁ, পাবলো নেরুদা, এলিয়টকে। 'প্রাদেশিক জলাভূমি ছেড়ে' যখন কবি যাত্রা করেছেন ইতালীতে তখন তাঁর মনে পড়েছে কবি শ্রীমধুসূদনকে :

> 'সতত আপন নদে তোমার মতই কী ব্যাকুল
> আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কপোতাক্ষ আছে।'
>
> ('আমিও তোমারই মত'/'শূন্যতার তুমি শোকসভা'।)

আবার যখন শব্দের সন্ধানে তৃষ্ণা জেগেছে প্রাণে, যখন চতুর্দশপদী রচনায় কবি আত্মনিয়োগ করেছেন, তখনও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন মধুসূদনকে। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন তাঁর আত্মার আত্মীয় হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিনকে দিয়েছেন 'কাব্যের বর্ণচ্ছটা', রাত্রিকে রেখেছেন 'ভরে গানের স্ফুলিঙ্গে।' কবির সঙ্গে কবিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হলো চল্লিশের দশকের গোধূলি বেলায়। হাতে এলো 'সঞ্চয়িতা'। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের প্রত্যুষে পা দিয়েই কবি-কর্ণে প্রবেশ করল 'তিরিশের কবিসংঘে'র প্রবল ডাক, 'পোড়ো জমি থেকে হাতছানি দিলেন এলিয়ট।' ফলে 'সঞ্চয়িতাকে ধুলোয় মলিন হতে দিয়ে' রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এলেন তিনি ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নামক সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিভাকে কি সত্যিই লঙ্ঘন করে যাওয়া যায়? তিরিশের দশকের কবিরাও কি পেরেছিলেন সর্বতোভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হতে? পারেননি, কারণ সম্ভব ছিলো না। পারেননি শামসুর রাহমানও। তাই 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' কবিতায় কবি জানালেন :

> 'কিন্তু, সরে গেলেই কি যাওয়া যায়?
> বয়স যতই বাড়ছে, ততই আমি সেই সমুদ্রের দিকে
> যাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ যার নাম....।'

যেকোন সচেতন স্রষ্টাই পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে অবশেষে গড়ে তোলেন আপন ভুবন। কোন স্রষ্টার যেমন এক অর্থে স্বদেশ নেই, তিনি বিশ্বময় অস্তিমান, তেমনি কোন স্রষ্টার পক্ষেই অঋণী থাকা অসম্ভব। দেশ-বিদেশের ঐতিহ্যে সংশক্ত থেকেই তিনি নবীনের স্রষ্টা। ওপার বাংলার শামসুর রাহমান এদিক থেকেও নবীন; নবীনতার স্রষ্টা। নব্যতার প্রতি এই অঙ্গীকারবদ্ধতার সূত্রেই তাঁর কবিতায় ১৯৫২-র ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ছায়াপাত ঘটেছে।

১৯৫২-র মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে কবি বললেন :

'শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।'

পরাধীন বাঙলাদেশের অবস্থায় কাতর কবি লিখেছেন 'টেলেমেকাস' নামক কবিতা। কবিতা তাঁর কাছে নিছক বিলাস নয়, কবিতাই তাঁর জীবন। তিনি শখের কবি সেজে ছন্দের দোলায় মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করতে চাননি, হরবোলা সেজে মাঠ-ঘাটে বাহবা কুড়োতে চাননি, চাননি মনোরম যাদু প্রদর্শন করে মানুষকে আকর্ষণ করতে। 'আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতায় কবি জানিয়েছেন সেই আপন প্রত্যয়—'আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাসভূমে।' আপন পরিচয়দান প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তাতে বোঝা যায় শামসুর রাহমান শুধু কোন এক কবির নাম নয়, সমাজ-চৌহদ্দিতে ঘুরে বেড়ানো এক দায়িত্বশীল মানবিক সত্তা।

তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হলো : 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (১৯৬০), 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬৩), 'বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), 'নিরালোকে দিব্যরথ' (১৯৬৮), 'নিজ বাসভূমে' (১৯৭০), 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২), 'দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), 'আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি' (১৯৭৪), 'এক ধরনের অহংকার' (১৯৭৫), 'আমি অনাহারী' (১৯৭৬), 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৬), 'শূন্যতায় তুমি শোকসভা' (১৯৭৭), 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' (১৯৭৭), 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' (১৯৭৮), 'প্রেমের কবিতা' (১৯৮১), 'ইকারুসের আকাশ' (১৯৮২), 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' (১৯৮২), 'মাতাল ঋত্বিক' (১৯৮২), 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' (১৯৮৩), 'যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে' (১৯৮৪), 'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই' (১৯৮৫), 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৮৫)।

২.২.২ কাব্য পরিচিতি

৩.২.১ কবি শামসুর রাহমান শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট কবি নন, তিনি আমাদেরও কবি, এপার বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের সহমর্মী। দেশ-বিভাজন শ্যামল বঙ্গকে দ্বিধাবিভক্ত করলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর আত্মার বন্ধনকে সামান্যতম শিথিল করতে পারেনি। জাতিসত্তার বিবেকী কণ্ঠের মানবিক প্রকাশ তাঁর কবিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, সর্বজনীন প্রত্যয়ের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'। এই পর্বে কবির প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় আছে। 'মেঠো চাঁদ লিখে/রেখে যায়' যে 'গভীর পাঁচালী' তা কবি চোখভরে দেখেন, 'হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ' তা কবির হৃদয়ে গভীর সুর তোলে। কিন্তু এই প্রকৃতি প্রীতির মাঝেও কবির কালচেতনা ছুঁয়ে যায় তাঁর কবিতাকে—'...যদিও আমার দরজার কোণে অনেক বেনামি/প্রেত ঠোঁট চাটে সন্ধ্যায়, তবু শান্ত রূপালি স্বর্গ-শিশিরে স্নান করি আমি।'

৩.২.২ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে'। এই পর্বে কবির মধ্যে একটা একাকীত্ব বোধ লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর কবিতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য। এখানে সেই ঐতিহ্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিতে—'প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে? গেছি আনন্দের/মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।'

৩.২.৩ পরের কাব্যগ্রন্থ 'বিধ্বস্ত নীলিমা'। কবি যে পরাধীন বাংলাদেশের অবস্থায় কাতর তার পরিচয় আছে এখানে। কবি প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন। কবিতা লেখা শামসুর রাহমানের কেবল শখ নয়, কবি দায়ও বটে। পরাধীন দেশের কবি সর্বত্র তাই অন্ধকার দেখেন। 'শৈশবের বাতিঅলা আমাকে' কবিতায় কবি লিখলেন—' তোমরা কি অন্ধকার প্রিয়?/চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে চায় তাকেই পৌঁছে দিও।' সমস্যায় কবি জর্জরিত হয়েছেন,

পরাধীনতা কবিকে কাতর করেছে, কিন্তু তাই বলে তিনি নৈরাশ্যে অবগাহন করেন নি অথবা অন্ধকারকেই শেষ সত্য বলে মানেন নি। বরং 'আলোর কথা'ই বলে ফেলেন তিনি, অভ্যাসবশতঃ বলেন স্বপ্ন গিলে ফেলার কথাও—'রূপালি স্রোতের মতো স্বপ্ন কতিপয়/আমার শরীরে মেশে, আমি মিশি, স্বপ্ন মেশে, আমাকে নিয়ত/ একটু একটু করে স্বপ্ন গিলে ফেলে।'

৩.২.৪ 'নিরালোকে দিব্যরথ' একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই পর্বে কবি যথেষ্ট পরিণত। কবিতা তাঁর কাছে নিছক বিলাস নয়, কবিতাই তাঁর জীবন। বাস্তবতা তাঁর কবিতার প্রাণ। এই কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'টেলেমেকাস'। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। পরাধীন বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কবি নিজেকে রাজা অডিসিয়ুসের ভাগ্যহত পুত্র টেলেমেকাসের প্রতীকে দেখেছেন। দেবতার অভিশাপে রাজা অডিসিয়ুস সমুদ্রে দিক্‌ভ্রষ্ট হলে তাঁর রাজ্য 'ইথাকা' আক্রান্ত হয়। সেই সময় টেলেমেকাস পিতার প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। এই পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে কবি নিজেকে ভাগ্যহত পুত্র 'টেলেমেকাস' রূপে, 'স্বাধীনতাকে' পিতারূপে এবং আপন দেশমাতাকে 'ইথাকা' রূপে কল্পনা করে এক অনবদ্য কবিতা লিখেছেন 'টেলেমেকাস' নামে ঃ

'ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দরজা আগলে পিতা, অধীর তোমারই প্রতীক্ষায়।'

ভাষার মূল বর্ণমালা। ভাষা-প্রেমিক কবি ১৯৫২-র মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে লিখলেন বিভিন্ন কবিতা। এই সকল কবিতা স্থান পেয়েছে তাঁর 'নিজ বাসভূমে' নামক কাব্যগ্রন্থে। 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'আসাদের শার্ট' এই পর্বের বিখ্যাত কিছু কবিতা। ভাষা প্রেমিক কবির আকুতি ধরা পড়েছে এভাবে—

'তোমাকে উপড়ে নিলে
বল তবে
কি থাকে আমার।'

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় কবি বলছেন :

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে বনপোড়া একটি হরিণী
ছোটে দিগ্বিদিক, তীব্র তৃষ্ণায় কাতর, জলাশয়ে মুখ রেখে
মরুর দুরন্ত দাহ মেখে নেয়....।'

এতো স্বাধীনতার তৃষ্ণা। বাংলাদেশের পরাধীন মানুষ বনপোড়া হরিণীর মতো স্বাধীনতার তৃষ্ণায় কাতর। সেই পরাধীন দেশের মানুষ হিসেবে কবির কামনা স্বাধীনতা; এক দুরন্ত বিপ্লব—বস্তুতঃ মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসংকট, চার চার বার সামরিক অভ্যুত্থান সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। সেই সংকটের ছবি আছে কবির কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমানের কাছে আপন দেশ-ই অন্যতম ভালোবাসার বিষয়। তাই ভয়ার্ত সময়কে দেখে কখনো তিনি মুখ ঢাকেন নি, বরং বলেছেন :

'হোক না যতই অন্ধকার
ঘর, সেখানেই ফিরে আসি, আসতেই হয়।'

কবি 'সর্বপ্রকার কারাগার থেকে মুক্তি' চান, চান 'শান্তি আর কল্যাণময় অব্দ', 'দয়িতাকে ভালোবাসার মতন লগ্ন' চান, চান কবিতার জন্য 'তারার মতোন শব্দ' এবং সর্বোপরি 'অশুভের সাথে আপোসবিহীন দ্বন্দ্ব'। বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের কবি শামসুর রাহমানের একমাত্র চাওয়া আপন জন্মভূমি : 'হৃদয়ে চাই জন্মভূমিকেই।'

২.২.৩ নির্বাচিত কবিতা

২.২.৩.১ 'আসাদের শার্ট' ('নিজ বাসভূমে')

'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষীয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে
ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে

উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'

৩.৩.২ 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থের একটি অসাধারণ কবিতা 'আসাদের শার্ট'। কবিতাটির শুরুই হচ্ছে আসাদের শার্ট-কে রক্তকরবীর ফুল এবং 'সূর্যাস্তের জ্বলন্ত মেঘের' সঙ্গে উপমিত করে। সেই রক্তাভ শার্টটি আকাশের গায়ে যেন হাওয়ায় উড়ছে।

এই সেই শার্ট যাতে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে বোন তাতে নক্ষত্রের মত বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল অত্যন্ত সুক্ষ্মতায়, জননী সেই শার্ট কেচে পরিষ্কার করে মেলে দিয়েছিলেন রৌদ্রে। ডালিম গাছের স্তিমিত ছায়ায়, রোদ্দুরে-শোভিত সেই শার্ট আজ জননীর উঠোন ছেড়ে শহরের প্রধান সড়কে উড়ছে, উড়ছে কারখানার চিমনি- চুড়োয়, গমগম করা জনবহুল এভেন্যুর আনাচে-কানাচে। কবি লিখছেন—

'উড়ছে উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।'

বস্তুতঃ পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আনয়নে (অথবা ভাষান্দোলনে) সাহসী আসাদ তার জীবনকে উৎসর্গ করেছে, সেই গৌরবগাথা 'রক্তকরবীর মত কিম্বা সূর্যাস্তের/জ্বলন্ত মেঘের মতো' আসাদের শার্ট প্রতীকায়িত হয়েছে। সেই শার্ট

যা একদিন জননীর হাতে স্পর্শ পেয়েছিল তা আজ প্রেরণারূপে আকাশের নীলিমায়, শহরের প্রধান সড়কে, কারখানার চিমনির চুড়োর 'উড়ছে অবিরাম'। এই একখণ্ড 'মানবিক বস্ত্র' শত মানুষের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা নিবারণে সফল হয়েছে। সেই কারণে কবির কাছে 'আসাদের শার্ট' তাঁর তথা তাঁর দেশবাসীর 'প্রাণের পতাকা'র মর্যাদা লাভ করেছে। দেশমাতৃকা কবির সমস্ত অন্তর জুড়ে বিরাজমান। যখনই তিনি লেখনী চালনা করেছেন, তখনই দেশমাতৃকার রক্ষাকল্পে কবিমন ব্যাকুল হয়েছে।

২.২.৩.২ 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' ('বন্দী শিবির থেকে')

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রচুর বাস্তভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক থুত্থুরে বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন—তাঁর চোখের নীচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
ব'সে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্টদাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে—
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।'

৩.৩.৪ 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এটি। কাব্যের নামকরণ এবং কবিতার নামকরণ থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় এ কবিতা কবির প্রাণের মর্মলোক থেকে উত্থিত হয়েছে। পরাধীন দেশের কবি স্বাধীনতার গৌরব সূর্য উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা আনয়নের জন্য কত মানুষের কত ভাগ্যের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে এ কবিতায় কবি তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'—এই দীর্ঘ কবিতা। কবি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মাধ্যমে প্রথম স্তবক শুরু করেছেন এইভাবে—'তোমাকে পাওয়ার জন্যে/আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়/আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?' বাঙলা (পূর্ব বাংলা) দেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারে তাদের রক্ত ঝরিয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, কিন্তু তবু তাদের হয়ে কবি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলছেন, এই স্বাধীনতাকে পাবার জন্য সাকিনা বিবির কপাল ভেঙেছে, হরিদাসী সিঁথির সিঁদুর হারিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর, ছাত্রাবাসের ওপর অত্যাচার চালানোর জন্য শহরে মিলিটারী ট্যাঙ্ক এলো, বস্তি উজাড় হলো; রাইফেল এবং মেশিনগানের খই দামামা বাজলো। এই স্বাধীনতার জন্য ভস্মীভূত হল অজস্র গ্রাম, প্রভুর বাস্তভিটার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটা কুকুর আর্তনাদ করলো কাতর হয়ে একটানা, এবং 'তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা/অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।'

তৃতীয় স্তবক শুরু হলো 'রক্ত গঙ্গার' উল্লেখ করে। কত মানুষের রক্ত ঝরেছে তার কোন হিসেব নেই; তাই কবি পুনরায় বললেন 'আর কত বার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়?' সব হারিয়েও এক থুথুরে বুড়ো উদাস নয়নে, চোখের তলায় একরাশ দুঃস্বপ্নের কালি নিয়েও প্রতীক্ষা করছে স্বাধীনতার জন্য, মোল্লাবাড়ির এক বিধবা বধূ দাঁড়িয়ে আছে তার দগ্ধ ঘরের নড়বড়ে খুঁটি ধরে, হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা নিয়ে বসে আছে পথের ধারে। এই পরাধীনতার হাত থেকে উদ্ধার পেতে শাহবাজপুরের জোয়ান কৃষক সগীর আলী, জেলে পাড়ার সাহসী লোক কেষ্ট দাস, মেঘনানদীর দক্ষ মাঝি মতলব মিয়া, মাঝি রুস্তমশেখ, ঢাকার সেই রিকশাওয়ালা যার 'ফুসফুস পোকার দখলে' এবং 'সেই তেজী তরুণ যার পদভারে/একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে'—এরা সকলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে চলেছে 'তোমার জন্যে হে স্বাধীনতা।'

পরাধীন দেশের মানুষ হিসেবে কবি মর্মাহত, কিন্তু তবু তিনি এই অত্যাচারকেই একমাত্র সত্য বলে মানতে চান না। হাজার মানুষের রক্ত ঝরানো সংগ্রাম, বাস্তুভিটা হারানো মানুষের লাঞ্ছনাই শেষ কথা হতে পারে না। তাই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবির সেই স্থির বিশ্বাস ধ্বনিত হলো এভাবে—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জ্বলন্ত ঘোষণার দাবি তুলে, নতুন নিশানা উড়িয়ে, চারিদিকে দামামা বাজিয়ে—

> 'এই বাঙলায়
> তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।'

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। রবীন্দ্র ভারতী বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা : সংখ্যা (১৯...)

২.৩ হাসান হাফিজুর রহমান

২.৩.১ কবি পরিচিতি

হাসান হাফিজুর রহমান একাধারে বিশিষ্ট কবি, প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন মহান কর্মী, মননশীল প্রবন্ধকার, খ্যাতিমান অধ্যাপক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কথাশিল্পী, সমালোচক এবং অসাধারণ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠক।

য়ুরোপে এজরা পাউন্ডের দাক্ষিণ্য যেমন ইংরেজি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, হাসান হাফিজুর রহমান তেমনি ওপার বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা কবিতায় রুচিবোধের পরিবর্তনে তাঁর অবদান অসামান্য। একুশের প্রথম সংকলন সম্পাদন করে তিনি যে অসামান্য দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প' সম্পাদনা করে তিনি তাঁর গভীর সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রণয়ন করেছিলেন 'আধুনিক কবি ও কবিতা।'

১৪ই জুন ১৯৩২ সালে জামালপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সাল থেকেই ছাত্রাবস্থায় তিনি মাসিক সওগাত ও দৈনিক ইত্তেহাদের সহকারী-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৭ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে জগন্নাথ কলেজে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস তিনি আত্মগোপন থাকার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে দৈনিক বাংলার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে তিনি মস্কোয়

বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর নিযুক্ত হন। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন প্রকল্পের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮২ সালের মধ্যে ষোল খণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্পাদনা সমাপন করেন।

তিরিশটির বেশি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল : ১। 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩), ২। 'আর্ত শব্দাবলী' (১৯৬৮), ৩। 'অন্তিম শরের মত' (১৯৬৮), ৪। 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' (১৯৭২), ৫। 'বজ্রচেরা আঁধার আমার' (১৯৭৬), ৬। 'শোকার্ত তরবারি', ৭। 'আমার ভেতরের বাঘ' (১৯৮৩), ৮। 'ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী' (১৯৮৩)।

সমালোচনা গ্রন্থ : 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৬৫)।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ : 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯৭০), 'মূল্যবোধের জন্য' (১৯৭০), 'আলোকিত গহ্বর' (১৯৭৭), 'দক্ষিণের জানালা' (১৯৭৫)

এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের বই হল—'আরো দুটি মৃত্যু'।

২.৩.২ কাব্য পরিচিতি

বাংলাদেশের অন্যতম কবি হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণ ঘটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে। প্রথম থেকেই তিনি দুঃসাহসী এবং স্পষ্টভাষী। ভাষান্দোলন হাসান হাফিজুর রহমানের কবিচৈতন্যে দেশাত্মবোধের যে বীজ পতন করেছিল, পরবর্তী কালে তাঁর সমস্ত কাব্যপ্রয়াসেই তার ফল ফলতে দেখা গিয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যে অবমাননা, ব্যক্তিপরাজয়, রাজনৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, এ সমস্তই তাঁর কবিতায় বিষয়রূপে স্থান পেয়েছে। তবে দেশাত্মবোধ তাঁর কাব্যপ্রেরণার অন্যতম উৎস বলা যায়। একুশের রক্তপাতকে উপলক্ষ্য করে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যে ছিল ঘৃণা, ধিক্কার ও গাঢ় বেদনাবোধের এক বিচিত্র সমাবেশ।

কবি হাসানের কাব্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ ঘটে 'বিমুখ প্রান্তরে'-র কবিতাগুলিতে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপের দুর্দশা দেখে টি. এস. এলিয়ট যেমন আতঙ্কিত হয়েছিলেন, অনুরূপ আতঙ্ক ধরা পড়েছিল ওপার বাঙলার কবিদের কবিতায়। এলিয়েটের ধারায় ওপার বাংলায় সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন কবি আবুল হোসেন। অতঃপর শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। এঁরা সকলেই সমাজ সচেতন এবং সমাজ জীবনের সকল স্তর থেকেই সর্বপ্রকার জুলুমের অবসান কামনা করেছিলেন একান্তভাবে।

কবি এই পৃথিবীর ভণ্ডামি, নোংরামি সহ্য করতে পারছেন না—

'তবুও তাদেরই হাতে সময়ের রশি,
বাঁচবার শব্দ বলে, অঙ্গুলি হেলনে
ভাঙ্গে গড়ে আর মারে রাজা উজির।'

তাঁর একাধিক কবিতায় নিরাশার সুর ফুটে ওঠে। 'বিমুখ প্রান্তর'-এর 'সোনার হরিণ' কবিতায় সেই নিরাশা ধরা পড়ে—তবে এই অবক্ষয়ের মধ্যেও ঐতিহ্যকে কবি ভোলেন নি। 'অমর একুশে' কবিতায় কবির সেই ঐতিহ্য চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

'দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান
কুলে এবার এলাম।'

এই পর্বে কবির প্রকৃতি প্রীতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। নদী, উন্মুক্ত মাঠ, প্রভৃতি জুড়ে আছে তাঁর বেশ কিছু কবিতায়।

'আর্তশব্দাবলী' কাব্যগ্রন্থটি অনেকটা 'বিমুখ প্রান্তরে'র পরিপূরক। সময়ের প্রবঞ্চনায় মানুষের হাহাকার ঠিক কতটা তার পরিমাপ করা যায় না। দুর্ভাগ্যে নির্যাতিত মানুষ নিশ্চল থেকেই তার সমস্ত অসহায়ত্বকে মেনে নেয়। বর্তমান কালের সেই অবস্থাকে কবি হাসান তাঁর সমস্ত কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রায় সব কবিরই বড় বৈশিষ্ট্য হল নিঃসঙ্গতা। হাসান হাফিজুর রাহমানের 'অন্তিম শরের মত' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই সেই নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার উচ্চারণ। কবির লক্ষ্য হয়ত অবসাদকেই তুলে ধরা, তাই বেশির ভাগ কবিতাতেই অবসাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'জীবনের ঘন্টা রোলে', অথবা 'চিরাচরিত ছায়াছবি' বা 'আমার নিয়তি', 'তুমি' সবকটি কবিতাই একই মেজাজের। এ কবিতা পাঠ করলে মনে হয় দুঃখই কবির আশ্রয় এবং দুঃখের সঙ্গেই তাঁর সম্প্রীতি।

'যখন উদ্যত সঙ্গীন' অনেকটা প্রচারধর্মী প্রতিবাদের মতো। বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও শাণিত এবং আক্রমণকে অনাবৃত করার তীব্র বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। কবি হাসান অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে নিজের সাধনাকে সচল রেখেছেন। বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয়েছে 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' ও 'বজ্রচেরা আঁধার আমার' কাব্যগ্রন্থদুটি। এখানে তাঁর কাব্যের বলিষ্ঠতা, জীবননিষ্ঠ ঋজু চিত্রকল্প এবং দৃপ্ত সাহসী উচ্চারণ সমকালীন অনেক কবির থেকেই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে সমস্ত বেদনা, বঞ্চনার মাঝে অগ্নিমুখী জীবনের দ্যুতি ঝলসে উঠেছে তাঁর কবিতায়—

'মৃত্যুকে ডরাইনা মোটেও, মৃত্যুর নীলকান্ত তরুণে
আমিও হেঁটে যেতে চাই।'

২.৩.৩ নির্বাচিত কবিতা

২.৩.৩.১ 'বারুদ' ('বজ্রে চেরা আঁধার আমার')

বাংলার মানুষগুলোর কী শান্ত শরীর যে ছিল
স্নেহের প্রগাঢ় রসে চিকেন শ্যামল কান্তি
জুড়িয়েছে চোখের পরম সাধ চিরকাল, যেন ঘন ত্বকে
শুধু ভালোবাসা ঘন হয়েছিল। বাঙালিনী
আঁচলের ছায়া মায়া ছাড়া ছড়ায়নি কিছু,
আবার হাসির বল্লরীতে কলকল প্রাণের ঢল
অবিকল ঝর্ণার মতোই ঝরাতো বর্ণালী শোভা। ছিল
দৃষ্টিতে অবাধ নিমন্ত্রণ সর্বক্ষণ। পারতো না কেউ তো বলতে
খালি হাতে গেছে ফিরে আপামর সাদর বাংলার ঘরের আদর থেকে,
কোনোদিন কোনো কালে কেউ।

আজকাল এমন সরসশ্যামলিমা কোথাও পাই না খুঁজে
যে দিকে ফেরাই চোখ বারুদের মতো খরতপ্ত মানুষেরা
গনগন করে। সমস্ত বাংলাই বুঝি
গরম বারুদ হয়ে গেছে ফের। কী স্বপ্নের বিষ
সকলের রক্ত নষ্ট করে দিল, চিকন ননীর মতো মায়াবী দেহের শোভা
পরিণামে আগুনের মুখ হয়ে গেছে। কিংবা বুঝি

স্বপ্ন নয়, স্তরে স্তরে ঘৃণা জমে ঘৃণার প্রবল রোষ
স্নেহমায়া ভালোবাসা পুড়িয়েছে নির্বিশেষে।
হতাশ্বাসে হয়তো বা মনুষ্যত্ব শেষবার
মরিয়ার হয়ে গরজায়।

৪.৩.২ 'বজ্রেচেরা আঁধার আমার' কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম কবিতা বারুদ। দুটি স্তবকে লেখা এই কবিতায় 'বারুদ' প্রতীক হয়ে এসেছে। সাধারণভাবে হাসানের কবিতা অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় লেখা শান্ত জীবনের স্নিগ্ধ উচ্চারণ। তারই মাঝে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সবই ধরা দিয়েছে। 'বারুদ' কবিতার প্রথম স্তবক বাংলাদেশের অতীতের স্নিগ্ধ সঞ্চরণ, সেখানে স্নেহের প্রগাঢ় রস সিঞ্চিত। দ্বিতীয় স্তবকে বর্তমান বাংলাদেশের ভয়াবহতার ছবি আছে। আসলে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতকে অথবা অতীতের পাশে বর্তমানকে Contrast হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন কবি।

কবিতাটির শুরু হয়েছে বাংলার মানুষগুলোর শান্ত রূপের বর্ণনা দিয়ে। তাদের জীবনে জড়িয়ে ছিল ভালোবাসা ঘন হয়ে, সর্বত্র সুখস্পর্শ ছিল। বাঙালি মায়ের স্নেহমাখা আঁচল ছিল ছড়িয়ে। সেখানে সকল সময় হাস্যকলরোলের ঢল নামত। যেন 'অবিকল ঝর্ণার মতই ঝরাত বর্ণালী শোভা।' তাদের দৃষ্টিতে ছিল অবাধ নিমন্ত্রণ। বাংলাদেশের আদর থেকে বঞ্চিত হতো না কেউ। অথচ বাংলার ঘরের ছেলে হয়েও কবি দেখেছেন অতীতের এই চলচ্চিত্রের বদল হয়েছে কেমনভাবে।

দ্বিতীয় স্তবক শুরু হয়েছে শ্যামল বঙ্গভূমির শ্যামলিমা-হারানো রূপ দিয়ে—'যে দিকে ফেরাই চোখ বারুদের মত খরতপ্ত মানুষেরা গনগন করে।' সমস্ত বাংলাই যেন গরম বারুদে রূপ নিয়েছে। যেন কোন এক স্বপ্নের বিষ সকলের রক্তকে কলুষিত করে দিলো, চিকন শরীর, মায়াবী শোভা সব নষ্ট হয়ে গেল। আজকে মানুষের সেই দেহে, চোখে, মুখে শুধুই আগুনের প্রকাশ। হয়তো স্বপ্ন নয়, স্তরে স্তরে বাসা বেঁধেছে প্রবল ঘৃণা। আর সেই ঘৃণার আগুনে স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু শেষবারের মত মনুষ্যত্ব মরিয়া হয়ে গর্জে উঠেছে।

বস্তুতঃ কবি অতীতের পাদপীঠে বর্তমানকে দাঁড় করিয়েছেন, সমকালকে কাব্যের বিষয় করেছেন। বর্তমানের আগুন ছারখার করে দিয়েছে শ্যামল বঙ্গভূমিকে। কবিমন তাই আহত। কবিতার নাম 'বারুদ' তাই সার্থক হয়েছে।

২.৩.৩.২ 'বীর নেই, আছে শহীদ' ('আমার ভেতরের বাঘ')

যখন একদিন শোকসভায় উঠব আমি,
করতালিতে নয়, অবিরাম দীর্ঘশ্বাসে
মুহূর্তেই জান্তব হয়ে যাবো ফের।
তোমরা বলবে, বড্ড প্রয়োজনীয় ছিলো লোকটা।
এখন দরকারের ফর্দে আছি উদ্বাহু, ফিরেও তাকাও না
তোমরা বলবে, অপূরণীয় ক্ষতি হলো
লোকটার তিরোধানে।
এখন সকল ক্ষতি পুরিয়ে দিতে আছি এক পায়ে দাঁড়িয়ে
ফিরেও তাকাও না।
মড়া ছাড়া তোমাদের কিছুই রোচে না।
তোমাদের হিসেবী খাতায়
বীর নেই, শহীদ রয়েছে শুধু।

৪.৩.৪ 'আমার ভেতরের বাঘ' কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা 'বীর নেই, আছে শহীদ'। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই কবিতাটি পাঠ করলে কাব্যগ্রন্থের নামকরণটিও পরিস্কার হয়ে যায়। মানুষের দুটো সত্তা—একটা ভেতরের, অপরটি বাইরের। মানুষের ভেতরে যে সাহস সুপ্ত অবস্থায় থাকে তা যখন কোন সৃষ্টি কর্মের রূপ ধরে বাইরে প্রকাশিত হয় তখনই তা যেন বিপ্লবের আকার নেয়। কবি হাসান তাঁর ভিতরের সাহস তথা 'বাঘ' কে উস্কে দিয়ে যেন বিপ্লব ঘটালেন।

হাসান হাফিজুর রহমান ওপার বাংলার একজন বলিষ্ঠ কবি। সাহিত্যই তাঁর কর্ম এবং সাহিত্যই তাঁর ধর্ম। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তিনি দেশপ্রেমকে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাকে বিকশিত করেছিলেন। আলোচ্য কবিতায় কবি তির্যক ভঙ্গীতে সেই সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন, যারা প্রকৃত ভালো মানুষের কদর করে না। কবি চান না মৃত্যুর পরে কোন মানুষের মূল্যায়ন করতে, চান না শহীদের গায়ে বীরের তকমা এঁটে দিতে। শহীদ যে, সে শুধুই শহীদ—মৃত্যুতেই তার সমাপ্তি। কিন্তু যার প্রাণ আছে তার সম্ভাবনাও অনন্ত। সেই সম্ভাবনাময় মানুষের গুণাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। জীবতাবস্থাতেই একজন বীরের মর্যাদা রক্ষিত হওয়া উচিত। একটু Satiric (স্যাটায়ারিক) ভঙ্গীতে লেখা এ কবিতায় জীবনের চরম সত্যকেই কবি প্রকাশ করেছেন।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের এ কবিতায় কবি সমাজ-মানসের দুর্বলতার দিকটিকে তুলে ধরেছেন। ঘুণ ধরা এই সমাজ মানুষের মূল্য দিতে জানে না। দেশপ্রেমিক বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। অথচ জীবিত থাকাকালীন তার যা প্রাপ্যমূল্য তাকে দেওয়া হয় না। এইজন্য কবি তির্যক ভঙ্গীতে লিখলেন—'মড়া ছাড়া তোমাদের কিছুই রোচে না।'

বস্তুতঃ 'বীর নেই আছে শহীদ' শিরোনামাঙ্কিত এই কবিতায় একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে কবি সেই সমাজের ত্রুটিগুলিকে তুলে ধরে তাঁর কবিতায় দায়িত্ব পালন করলেন। হাসান হাফিজুর রহমান শুধু মাত্র একজন উল্লেখযোগ্য কবি নন, তিনি সমাজ সচেতন কবিও বটে।

২.৪ মহাদেব সাহা

২.৪.১ কবি পরিচিতি ও কাব্য পরিচিতি

ওপার বাংলার একজন বিশিষ্ট কবি হলেন মহাদেব সাহা। তাঁর 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি' একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি পাঠ করলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে তিনি একজন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। প্রকৃতির সর্বস্তরে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ওপার বাংলার কবি হলেও এপার বাংলার তথা পশ্চিম বাংলার কবিদের সঙ্গে তাঁর যেন ঘনিষ্ঠ যোগ, অন্তত কবিতা পাঠ করলে তাই মনে হয়। জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়—এঁদের সঙ্গে কবি মহাদেব সাহার কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগ লক্ষ্য করা যায়।

২.৪.২ নির্বাচিত কবিতা

২.৪.২.১ 'একদিন তার জন্য' ('ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি')

একদিন যাকে আমি ভালোবাসিতাম—কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা,
ভালোবাসিতাম মানে ভালোবাসি, ভালোবাসা চিরবর্তমান
এখন বুঝেছি আমি অতীত হয় না ভালোবাসা
মনে হয় আজো তাকে হৃদয়ে কোথাও ভালোবাসি
কোথাও নিশ্চয় তুলে রেখেছি তাকেও এই বুকে
একদিন সে ছিল মূর্তি আজ সে প্রকৃতি;

একদিন তাঁর জন্য ইস্টিশনে ভিজেছি বৃষ্টিতে
খুব নিচু স্বরে গলবস্ত্রে করেছি নিজেকে সমর্পণ
ঘুরে বেড়িয়েছি পথে, বহুদিন ধরেছি লোকাল
দেখেছি বাহিরগোলা থেকে ছেড়ে গেছে সেই রেলগাড়ি;
একদিন ভালোবাসিতাম তাকে আজো ভালোবাসি
এখনো মাঠের প্রান্তে বাজে যেন বিজন ব্যথিত সেই বাঁশি।

একদিন তার জন্য ভিজেছি বৃষ্টিতে সারারাত
একদিন তার জন্য কাঙাল করেছি আমি এই দুটি হাত।

১২.২.৯৮

৫.২.২ 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি' কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা 'একদিন তার জন্য'। কবিতাটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এটি একটি প্রেমের কবিতা। কবিতাটি শুরু হয়েছে অতীতের হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে কেন্দ্র করে—'একদিন যাকে আমি ভালোবাসিতাম'। কিন্তু একথা বলার পরেই কবি লিখলেন—'কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা/ ভালোবাসিতাম মানে ভালোবাসি, ভালোবাসা চিরবর্তমান।' আসলে ভালোবাসা এমন এক বিশুদ্ধ অনুভূতি যার কোন ক্ষয় নেই, তা কোন পাত্র বা পাত্রীর উপর নির্ভর করে না। ভালোবাসা 'চিরবর্তমান' তথা চিরন্তন। ভালোবাসা কখনো অতীত হয় না—একথা কবি এখন বুঝেছেন। কবি আজো তাকে হৃদয়ে ভালোবাসেন, বুকের মাঝে কোথাও যেন তুলে রেখেছেন। একদিন 'সে ছিল মূর্তি আজ সে প্রকৃতি।'

দ্বিতীয় স্তবক শুরু হয়েছে সেই প্রেমের স্মৃতি চারণ দিয়ে। অতীতের কোন একদিনে কবি তাঁর প্রিয়ার জন্য ইস্টিশনে ভিজে ছিলেন বৃষ্টিতে, তার কাছে নিজেকে করেছিলেন সমর্পণ, ঘুরে বেড়িয়েছেন বহুদিন, বহুদিন ধরেছেন লোকাল ট্রেন, কখনো দেখেছেন ট্রেন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বাহিরগোলা থেকে। সেই তাকে একদিন কবি ভালোবাসতেন এবং আজও বাসেন। এখনো মাঠের প্রান্তে যেন সেই ব্যথিত বাঁশি বাজে। প্রেমিকাকে হারানোর বেদনা এই একটি মাত্র চরণে পরিস্ফুট হয়েছে তীব্রও তীক্ষ্ণভাবে—'এখনো মাঠের প্রান্তে বাজে যেন বিজন ব্যথিত সেই বাঁশি।'

কবিতার শেষ দুই চরণে কবি যেন ধ্রুবপদের মতো আবার উচ্চারণ করলেন—

'একদিন তার জন্য ভিজেছি বৃষ্টিতে সারারাত
একদিন তার জন্য কাঙাল করেছি আমি এই দুটি হাত।'

অনবদ্য এক রোমান্টিক কবিতা 'একদিন তার জন্য'। কিন্তু কোথাও রোমান্টিকতা আবেশে ভেসে যাননি কবি। খুব সংহত বলিষ্ঠ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতায়। সহজ, সরল ভাষায় অনুভবের গাঢ়তায় কবিতাটি রঞ্জিত।

২.৪.২.২ 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি' ('ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি')

দূরের আকাশখানি আজো আমি খুব ভালোবাসি
ভালোবাসি অশ্রুজল, ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি;
তোমাকেই ভালোবাসি ঝরাপাতা, বিষণ্ণ বকুল
পুকুরের সাদা হাঁস, বৃষ্টিভেজা এই নদীকূল,
ভালোবাসি সন্ধ্যাতারা ভালোবাসি রাত্রির আকাশ
গহন বর্ষার মেঘ, বিজন দুপুর, মধুমাস;

এই ব্যথিত জীবন আজো আমি খুব ভালোবাসি
ভালোবাসি প্রিয়তমা, তোমাকেই হে বিরহী বাঁশি।

৫.২.৪ 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা এটি। কবিতাটির জন্ম তারিখ ২৩.২.৯৮। কয়েক বছর আগে লেখা এ কবিতা পড়লে সহসা যেন জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে যায়। সেই দূরের আকাশ, ঝরাপাতা, বিষণ্ণ বকুল, পুকুরের সাদা হাঁস, বৃষ্টিভেজা নদী, বর্ষার মেঘ, বিজন দুপুর সব নিয়ে যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে বাংলাদেশের ছবি। কবি মহাদেব সাহা প্রকৃতি প্রেমিক কবি। প্রকৃতির স্বাদ-গন্ধ সব কিছুই তিনি আস্বাদ করেছেন। ভালোবেসেছেন প্রকৃতিকে, প্রকৃতির নির্জনতাকে, তার বিজন দুপুরকে। কবি রোমান্টিক বলেই নির্জনতা তাঁর প্রিয়, বিরহ তিনি ভালোবাসেন।

স্বল্পাক্ষরে লেখা 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি' কবিতাটি একটি রোমান্টিক প্রকৃতি প্রেমের কবিতা। কবি-চিত্ত বিরহী, কিন্তু বিরহ কবিকে ব্যথিত করলেও সেই ব্যথিত জীবনকে তিনি ভালোবাসেন। দূরের আকাশ আজো তাঁকে হাতছানি দেয়, রাতের অন্ধকারকেও তিনি ভালোবাসেন। এই কবিতাটিকে পাঠ করলে অনুমিত হয় যে, কবি প্রেমিকাকে হারানোর বেদনায় ব্যথিত চিত্ত। কবিমনে তাই বিরহী বাঁশির অনুরণন; চোখে অশ্রুজল, প্রকৃতিতে ঝরাপাতার সমারোহ, বিষণ্ণ বকুলের সমাহার। কিন্তু তবু কবি এই ব্যথিত জীবনকে ভালোবাসেন, অশ্রুজল সত্য হলেও তাকে কবি ভালোবাসেন, ভালোবাসেন বিরহী বাঁশির সুরকে। প্রকৃতির ঝরারূপ, বিষণ্ণ রূপ এবং বৃষ্টিভেজা রূপের প্রতি কবির তাই মোহ। বিরহ আছে বলেই এই জীবন তাঁর কাছে ভারাক্রান্ত নয়। কবি এখানে ভীষণভাবে জীবনবাদী। কবি আজও তাঁর হারানো প্রিয়তমাকে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন বিরহী বাঁশিকে। এখানে যেন 'প্রিয়তমা' এবং 'বিরহী বাঁশি' একাকার হয়ে গেছে অনুভবের গাঢ়তায়। বিষণ্ণতার সুর সমগ্র কবিতাটিতে থাকলেও জীবনকে ভালোবাসার আন্তরিক তাগিদ কবিকে সব বিষণ্ণতা তথা ব্যর্থতার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই কারণেই কবিতাটি একটি সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

২.৫ সিকানদার আবু জাফর

২.৫.১ কবি পরিচিতি ও কাব্য পরিচিতি

১৯১৯ সালের ৩১ শে মার্চ খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় তেঁতুলিয়া গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর কেটেছে খুলনা জেলার 'তালা' গ্রামে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা লেখায় হাত দেন। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৪০ সাল থেকেই তিনি প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রসন্ন প্রহর'-এর কবিতাগুলি লিখতে শুরু করেন। কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা লেখাও চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে কলকাতায় তিনি কিছুদিন সরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। ১৯৪৩ সাল থেকে ৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তাঁর 'প্রসন্ন প্রহর' কাব্যগ্রন্থ লেখা শেষ হয়।

১৯৪৭ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তিমিরান্তিক' রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচনাকার্যের সঙ্গে চলতে থাকে নানা ধরনের ব্যবসার কাজও। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ শেষ হয় ১৯৫৩ সালে, ১৯৫৬ সাল থেকে শুরু হয় তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বৈরী বৃষ্টিতে' লেখার কাজ। কবি তাঁর জীবনের বৃহত্তর একটা পরিসর পর্যন্ত সাংবাদিকতা করেন। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পরে তিনি 'দৈনিক সংবাদ' ও 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। ভাষাআন্দোলনের

সময় তিনি 'দৈনিক মিল্লাত'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। দৈনিক 'সংবাদ'-এর প্রথম সম্পাদকীয় তাঁরই লেখা। তাঁর 'বৃশ্চিক লগ্ন' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে ১৯৬৪-৭০ পর্যন্ত লেখা কিছু কবিতা। ১৯৫২ সালের ভাষাআন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর শেষ দুটি কাব্যে।

১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিলে, ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ শুরু হয় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নির্বিচার গণহত্যা। কবি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলস্বরূপ তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়। তাঁর বহু বিপ্লবাত্মক গান ও কবিতা এই সময়ে লেখা হয়। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' গানটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একই সময়ে তাঁর সম্পাদনায় 'মুজিবনগর' থেকে সাপ্তাহিক 'অভিযান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন হানাদার বাহিনী ও পাকিস্তানী স্বেচ্ছাচারী সরকারকে অভিযুক্ত করে 'অভিযোগ' শিরোনামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তিনি, তাতে ব্যক্তি সিকান্দার আবু জাফরের দেশপ্রেম ও দুঃসাহসিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। হানাদার বাহিনীকে অভিযুক্ত করে কবি লিখেছিলেন : 'মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় সংযোজনের অপরাধে বিশ্বমানুষের কাছে নরাধম ইয়াহিয়া চক্রকে আমরা অভিযুক্ত করছি।' বস্তুতঃ ১৯৭১-এ ২৬ শে জুলাই ঢাকায় বসে অভিযোগ ছাপানো এবং বিতরণের মাধ্যমে দুর্জয় সাহস, ঋজু, বলিষ্ঠ চরিত্র হিসেবে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এককথায় অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান ভোলবার নয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। বাংলাদেশের প্রায় সব শিল্পী-সাহিত্যিক ও তাঁদের কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। কবি স্বয়ং সাংবাদিক ছিলেন বলে সাংবাদিক নির্যাতন ও পত্রিকার কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন। ১৯৭৩ সালে 'গণকণ্ঠ' ও 'হলিডে' প্রকাশের ফলে প্রত্যক্ষ সরকারি হুমকির মোকাবিলা করতেও পিছপা হন নি তিনি। এমন কি পত্রিকা দুটি ছাপাবারও সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি 'সমকাল' মুদ্রায়ণ থেকে। এর জন্য তাঁকে প্রত্যক্ষ ঝুঁকি নিতে হয়েছে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও। এই হুমকির উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 'জেলে দিতে পারো কিন্তু গণতন্ত্রের নামে এ প্রহসন সিকানদার আবু জাফরকে দিয়ে বরদাশ্‌ত করতে পারবে না।' (সৈয়দ জাহাঙ্গীর, জাফর ভাই : 'আমার দাদাভাই'—সমকাল, সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা)।

১৯৭৪ সালে যখন সমগ্র বাংলাদেশে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস, তখন কবি 'মনন্তর প্রতিরোধ' নামক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদে মুখর হন। এরই ফল স্বরূপ 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি' নামে তিনি একটি কমিটি গড়ে তোলেন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ থেকেই তিনি অসুস্থ হতে থাকেন এবং ১৯৭৫-এ ৫ই আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো : 'প্রসন্ন প্রহর' (১৯৬৫), 'তিমিরান্তিক' (১৯৬৫), 'বৈরী বৃষ্টিতে' (১৯৬৫), 'কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), 'কবিতা ১৩৭৪' (মুদ্রিত, কিন্তু অপ্রকাশিত), 'বৃশ্চিকলগ্ন' (১৯৭১)।

২.৫.২ নির্বাচিত কবিতা

২.৫.২.১ 'সংগ্রাম চলবেই' ('কবিতা')

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই।

হতমানে অপমানে নয়, সম্মুখে সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক কাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপন যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হোক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা ত সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।

দিয়েছি ত' শান্তি আর দেব স্বস্তি
দিয়েছি ত' সম্ভ্রম আরো দেব অস্থি
প্রয়োজন হলে নেবো এক নদী রক্ত
হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

হতে পারি পথভ্রম আরও বিধ্বস্ত
ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আশায় ত সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।

আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নী
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।

এই কালোরাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনোদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানাবোই।

আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন অগ্নিশিখা জ্বলবেই
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

৬.২.২ 'সংগ্রাম চলবেই' কবিতাটি 'কবিতা ১৩৭২' কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি সিকান্দার আবু জাফর যে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এ কবিতাটি তার প্রমাণ। দীর্ঘ এ কবিতায় প্রচন্ড বিক্ষোভ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এমন প্রত্যক্ষভাবে, এরূপ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভঙ্গীতে এবং আত্মবিশ্বাসের সুরে এভাবে আর কোথাও কবি বলেন নি। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কবি এখানে জনতার হয়ে লেখনী চালনা করে বললেন : 'জনতার সংগ্রাম চলবেই।'

সপ্তম স্তবকে বিন্যস্ত কবিতাটি শুরু হয়েছে 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' এই অঙ্গীকার দিয়ে। কবি স্পষ্ট জানিয়েছেন 'বাঁচার অধিকার' কাড়তে অগণিত মানুষের এই প্রাণপণ সংগ্রাম চলবে। সর্বত্র প্রতারণা, প্রলোভন হাতছানি দেখেছেন কবি, দেখেছেন নিশ্চিদ্র অন্ধকারকেও কিন্তু তাতেও কবি নিরাশ নন; কারণ তিনি জানেন তাঁরা সকলেই এই 'সময়ের সারথী'; সুতরাং নিশিদিন বিনিদ্র থাকতেও তাঁদের অসুবিধা নেই।

কবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন, মানুষকে শান্তি দেবেন, স্বস্তি দেবেন। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা 'দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরো দেব অস্থি।' প্রয়োজন হলে এর জন্য তিনি নেবেন 'এক নদী রক্ত।' আগামীর পথকে প্রশস্ত করতে যত শক্ত, যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন, কবি বিশ্বাস করেন, নিয়ত সংঘর্ষে সে বাধার পাহাড় একদিন টলবেই। আর সেই বাধা দূরীকরণের জন্য কবিরও সংগ্রাম চলছে এবং চলবেই।

সংগ্রামের পথে চলতে চলতে কখনো কবির পথভ্রম হয়, অথবা তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন ক্লান্তিতে, কিন্তু তাই বলে তাঁর চিত্ত কখনও দিগ্‌ভ্রান্ত হয় না। সে চিত্ত আগামী ভবিষ্যৎ গড়বার আশায় উজ্জ্বল এবং স্থির। এক সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী তাঁরা, এবং 'চলবার আবেগেই তৃপ্ত'।

কবি জানাচ্ছেন তাঁদের চলবার পথ ভীষণ দুস্তর এবং দুর্গম; কিন্তু এই ক্ষুরধার পথে চলার জন্য তাঁদের সঙ্গে আছেন অনেক সঙ্গী, কোটি কোটি বেদনার্ত মানুষের সহাবস্থান এবং তাঁদের চোখের লেলিহান শিখা সব বিরোধকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

কবিতার একেবারে শেষ স্তবকে এসে কবি বলছেন, কালোরাত্রির তথা দুর্যোগময় রাত্রির কঠিন অর্গল একদিন তাঁরা ভাঙবেনই এবং মুক্ত প্রাণের সাড়া ধ্বনিত করে তুলবেন। তাঁদের 'শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে' আগামীর অগ্নিশিখাও জ্বলবে। আর এভাবেই কবির—সংগ্রাম চলবেই—'জনতার সংগ্রাম চলবেই/আমাদের সংগ্রাম চলবেই।'

কবি সিকান্দার আবু জাফরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, হতাশায় নয়, নৈরাশ্যে নয়, আত্মসমর্পণেও নয়। আবার জীবনের পরাজয়কে অদৃষ্টের করুণায় সমাহিত করার মধ্যেও নয়। জীবনের স্বরূপ তাঁর কাছে যেমন সত্য, তেমনি সত্য জীবন-সংগ্রামের রূপও। আর সেই সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কেও তাঁর কোন সংশয় নেই। কবি নিশ্চিতভাবে জানেন, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একদিন জয় আসবেই। সংগ্রামী কবি সিকান্দার আবু জাফর সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন যে, 'মৃত্যু ভর্ৎসনা উপেক্ষা করে আঁধার গোরের ক্ষেত্রে ভোরের বীজ বপন করতে পারেন বলেই, ক্লান্তিহীন যত্নে প্রাণের পিপাসাটুকু জাগিয়ে রাখতে সক্ষম বলেই সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা আমাদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।' ('আধুনিক কবিতা'/রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত)।

২.৫.২.২ 'সেই রাত্রি' ('প্রসন্ন প্রহর')

সেদিন ছিলো না কোনো বিধান শাসন
স্বৈরাচার ভেঙেছিল ন্যায়ের সীমানা।

কুণ্ঠহীন যৌবনের ঘৃণিত আশ্লেষে
ভেঙে গেছে কুমারীর মর্যাদার বাঁধ
মিটেছে সে নিশীথের নগ্ন পরিবেশে
অনিবার্য কুককুরের শোণিতের সাধ।

সে রাত্রির অভিশাপ নিশ্চল করেছে
দুরাস্তৃত জীবনের কল্যাণের ধারা
অক্ষম লজ্জায় শুধু মুখ লুকিয়েছে
মানুষের শক্তিহীন বংশধর যারা।'

(অংশ)

৬.২.৪ 'প্রসন্ন প্রহর' সিকানদার আবু জাফরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এখানে মূলতঃ সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজকে কেন্দ্র করে তাঁর কবি মানস উৎসারিত। কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যরচনা সম্পর্কে জানিয়েছেন—'সমাজের সঙ্গে কথা বলাতেই আমার বেশি আনন্দ।' ফলতঃ এই সমাজকে কেন্দ্র ও আবর্তিত করেই তাঁর কাব্যজগৎ গড়ে উঠেছে। অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পাশাপাশি আশ্বাসের আভাসও আছে তাঁর কবিতায়। অন্যদিকে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে সাম্যবাদী চিন্তাধারা। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বেশ কয়েকটি কবিতাতেই বর্তমান। আলোচ্য কাব্যের প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কবির তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ ব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির হৃদয় বেদনাও। আমাদের আলোচ্য কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

'প্রসন্ন প্রহর' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সেই রাত্রি'। এখানে কবির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কবির ঘৃণা ও ক্ষোভ এখানে স্পষ্টতই প্রতীয়মান—

'সেদিন ছিলো না কোনো বিধান শাসন
স্বৈরাচার ভেঙেছিল ন্যায়ের সীমানা।'

কবি এখানে দ্বিধাহীন ভাষায় তাদের বর্বরতার চিত্র উদঘাটন করে লিখলেন—

'কুণ্ঠহীন যৌবনের ঘৃণিত আশ্লেষে
ভেঙে গেছে কুমারীর মর্যাদার বাঁধ।
মিটেছে সে নিশীথের নগ্ন পরিবেশে
অনিবার্য কুককুরের শোনিতের সাধ।'

কিন্তু শুধু অত্যাচার, নারীর প্রতি লাঞ্ছনা এসবের কথাই কবি বলেন নি, তার প্রতিকারের চেষ্টাও করেছেন। কবি লক্ষ্য করেছেন 'সেই রাত্রির অভিশাপ' মানুষের জীবনের কল্যাণের ধারাকে ব্যাহত করেছে। মানুষ অক্ষম প্রতিকার চেষ্টায়। সেই অক্ষমতা লজ্জিত করেছে কবিকেও।—কবি তাই লিখলেন :

'অক্ষম লজ্জায় শুধু মুখ লুকিয়েছে
মানুষের শক্তিহীন বংশধর যারা।'

কবিতার শেষ স্তবকে প্রতিকারে অক্ষম কবি আগামী দিনের প্রত্যাশায় থেকেছেন। ভাবীকালের কবির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন বর্তমান কবি এই বলে যে—এ পরাজয়, অত্যাচার ও অবিচারের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা যেন তাঁরা তাঁদের কাব্যে, গাঁথায় লিখে রেখে যায়—

'আগামী দিনের কবি গাঁথায় কথায়
সংগীতে জাগিয়ে রেখো সে দুঃসহ ব্যথা
আগামীকালের শিল্পী শোনিত স্বাক্ষরে
হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে এঁকো সেই কথা।'

বস্তুতঃ সিকান্দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় পাকিস্তানী স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। বেদনার্ত কবি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন, প্রতিবাদী কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন অসন্তোষের কথাও। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবিতা রচনা সিকান্দার আবু জাফরের শখ নয়। এক প্রবল দায়িত্ববোধ থেকে তিনি এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন।

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। আল মাহমুদের কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

২। কবি আল মাহমুদ জানিয়েছেন 'প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই' তাঁর কাব্যের বিষয়—এ সম্পর্কে আপনার ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

৩। আল মাহমুদের কবিতায় প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় দিন।

৪। আল মাহমুদের কবিতায় কাল চেতনার যে নগ্নরূপ ভাষা পেয়েছে তার সুস্পষ্ট পরিচয় দিন।

৫। 'হে আচ্ছন্ন নগরী' কোন কাব্যের অন্তর্গত? কবিতাটির বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৬। 'আল মাহমুদের কবিতার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে তাঁর স্বদেশ চেতনা'—আলোচনা করুন।

৭। 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটির মূলভাব বিশ্লেষণ করে তার নামকরণ যথার্থ কিনা বিচার করুন।

৮। 'সোনালি কাবিন' (১০) কবিতায় কবি যে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেছেন তার পরিচয় দিন।

৯। 'স্বপ্নের সানুদেশে' কবিতাটি কোন কাব্যের কবিতা? এই কবিতায় কবির যে আত্মবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

১০। শামসুর রাহমানের কবিতার রূপনির্মিতি ও বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।

১১। শামসুর রাহমানের কবিতায় ভাষা প্রীতির পরিচয় দিন।

১২। শামসুর রাহমানের কবিতায় যে ভাষা প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

১৩। 'অস্তিত্বের সংকটে কম্পমান শামসুর রাহমানের কবিতা'—আলোচনা করুন।

১৪। 'আসাদের শার্ট' শামসুর রাহমানের একটি বিশিষ্ট কবিতা—ব্যাখ্যা দিন।

১৫। 'আসাদের শার্ট' কবিতায় 'আসাদের শার্ট' কিসের প্রতীক? কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবির স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিন।

১৬। 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি স্বাধীনতা আনয়নের যে স্বপ্ন দেখেছেন তার পরিচয় দিন।

১৭। কবি হাসান রহমানের কবিতায় যে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় দিন।

১৮। কবি হাসানের কাব্যবিবর্তনের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করুন।

১৯। 'বারুদ' কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে নামকরণ সার্থক হয়েছে কিনা দেখান।

২০। 'কবি হাসানের কবিতা অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় লেখা শান্ত জীবনের স্নিগ্ধ উচ্চারণ'—উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করুন।

২১। 'বীর নেই আছে শহীদ'—একটা Satiric ভঙ্গীতে লেখা এ কবিতায় জীবনের চরম সত্যকেই কবি প্রকাশ করেছেন।— কবিতাটি বিশ্লেষণ করে সমালোচকদের এই মন্তব্যের যথার্থ নির্ণয় করুন।

২২। ওপার বাঙলার কবিদের মধ্যে কবি মহাদেব সাহা একেবারে স্বতন্ত্র ধারার কবি—বুঝিয়ে দিন।

২৩। 'একদিন তার জন্য' কবিতাটি কার রচনা? কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করুন।

২৪। 'একদিন তার জন্য' একটি বিশিষ্ট প্রেমের কবিতা—আলোচনা করুন।

২৫। 'ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি' একটি রোমান্টিক প্রকৃতি প্রেমের কবিতা।—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

২৬। সিকান্‌দার আবু জাফর বাংলাদেশের (ওপার বাংলার) একজন সংগ্রামী কবি।—তাঁর কবিতা আলোচনা করে এই মন্তব্যের সত্যতা পরিস্ফুট করুন।

২৭। সিকান্‌দার আবু জাফরের 'সংগ্রাম চলবেই' কবিতাটির মধ্যে সংগ্রামী কবির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

২৮। 'সেই রাত্রি' কবিতায় সিকান্‌দার আবু জাফরের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

২.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। 'কালের কলস' কাব্যগ্রন্থের কবি কে? কাব্যগ্রন্থটির পরিচয় দিন।

২। আল মাহমুদ একজন জীবনবাদী কবি—আলোচনা করুন।

৩। কবি আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্টতা নিরূপণ করুন।

৪। আল মাহমুদের কবিতায় প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় দিন সংক্ষেপে।

৫। 'আসাদের শার্ট'—এই ইমেজের মধ্য দিয়ে কবি কি বলতে চেয়েছেন?

৬। কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রতিবাদ আছে, প্রতিরোধ আছে; সেই সঙ্গে আছে প্রবল আশাবাদও—সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭। ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ শামসুর রাহমানের কবিতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য—আলোচনা করুন।

৮। 'তোমাকে উপড়ে নিলে/বল তবে/কি থাকে আমার?'—ব্যাখ্যা করুন।

একক ৩ □ বাংলাদেশের উপন্যাস : 'লালসালু' : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

৩.১ লেখক পরিচিতি

৩.২ উপন্যাসের পরিচয়

৩.৩ নামকরণের তাৎপর্য

৩.৪ কাহিনি-সংশ্লেষ

৩.৫ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত বিশ্লেষণ

৩.৬ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ

৩.৬.১ মজিদ

৩.৬.২ জমিলা

৩.৬.৩ রহীমা

৩.৬.৪ খালেক ব্যাপারী

৩.৬.৫ আমেনা বিবি

৩.৬.৬ আক্কাস আলী

৩.৬.৭ হাসুনির মা

৩.৭ উপন্যাসের মূল দুই চরিত্রের সংঘাত : মজিদ বনাম পীর

৩.৮ উপন্যাসের ভাষা

৩.৯ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

৩.১০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৩.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ লেখক পরিচিতি

১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে পূর্ববাংলার এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর পিতা ছিলেন আহমদউল্লাহ্, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম.এ এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। পিতা সরকারি কর্মচারী হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার ফলে লেখকের অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর এবং বিচিত্র।

ওয়ালীউল্লাহ্'র প্রথম-গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ Annual-এ। পাক্-ভারত উপ-মহাদেশে সৃজনশীল কথাশিল্পী হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর কাছে নাম-যশ-অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়। সাহিত্যসৃষ্টি হল তাঁর ভাষায় 'সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা— সে ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা!' আপন মতাদর্শে অবিচলিত এই কথাশিল্পীর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'। রচনারীতিতে ও বিষয়বস্তুতে 'লালসালু' বাংলাসাহিত্যের সম্পদ। এছাড়া 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী

কাঁদো' উপন্যাস দুটি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিক রচনারীতির স্বাক্ষর বহন করছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশ-ই তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। ১৯৭০ সালের ১০ই অক্টোবর মাসে এই মহান সাহিত্যিক পরলোক গমন করেন।

৩.২ উপন্যাসের পরিচয়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'লালসালু'। এই উপন্যাসটিই তাঁকে প্রায় বিশ্ববিখ্যাত করেছে। 'লালসালু' একটি নায়ক প্রধান উপন্যাস। নায়ক মজিদ একদা নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করে মহাব্বতনগরে। শীর্ণ উজ্জ্বল চেহারা তার, মুখে ক'গাছি দাড়ি; কোটরাগত নিমীলিত চোখ। গারো পাহাড়ের অসফল জীবন থেকে ধূর্ত, কর্মঠ মজিদ মহাব্বতনগরে প্রবেশ করে একটা জনগোষ্ঠীকে 'সাম্রাজ্যে' পরিণত করার অভিলাষ নিয়ে। সম্রাট হবার মতলব তার মাথায় ঘোরে, 'এখানকার অশিক্ষিত কাফের' মানুষগুলোর মধ্যে সে 'আলো ছড়াতে এসেছে'। তাই জঙ্গল সাফ করে প্রাচীন কবরকে নতুন করে তুললো সে, ঝালরওলা লালসালুতে আবৃত করে তুললো কবরকে। মানুষ জানলো ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার। মহাব্বতনগরী সহ গ্রাম-গ্রামান্তের মানুষের আগমনে ভর্তি হতে লাগল মজিদের তহবিল। বিপুল পরিমাণ অর্থ, জমি, সম্পদ হস্তগত হলো তার। এইবার মজিদ তার জীবনে নারীর প্রয়োজন অনুভব করলো। শক্তিমতী, কর্মঠ, নরম মনের মানুষ রহীমা বিবি হয়ে এলো তার ঘরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'হাসুনির মা-র উন্মুক্ত গলা-কাঁধের ও বাহুর উজ্জ্বলতা দেখে মজিদের চোখ চকচক করে'।

ধর্মের অনুশাসনে জনগোষ্ঠীকে বাঁধতে চায় মজিদ; তার জন্য তাকে কঠোর হতে হয়। সরল মানুষগুলোর মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের বীজ পুঁতে দেয় মজিদ। মাজারকে ঘিরে মজিদের প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চলে। গ্রামবাসীরা মনে করে, ঐ পবিত্র মাজারের সঙ্গে মজিদের একটা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে এবং মাজারটি মজিদের অলৌকিক বা ঐশী শক্তির উৎস। তাই তারা মজিদের কথা মান্য করে, তার বিচার মেনে নেয়। এদিকে, মহাব্বত-নগর ও তার পাশাপাশি গ্রামগুলোর মান্য এক পীর আছেন, যিনি ফসল ওঠবার পর কিছুদিনের জন্য সেবা ইত্যাদি আদায় করতে আসেন। এই আওয়ালপুরের বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মজিদ বুঝতে পারে, এই পীরের আগমনে তার পায়ের তলার মাটি সরতে বসেছে। কারণ এই পীর ও মজিদ দুজনেই অসাধু দুজনেই বুজরুকির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সাধারণ অসহায় মানুষগুলোর ওপরে। মহাব্বতনগরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি খালেক ব্যাপারী। তার বন্ধ্যা স্ত্রীকে নিয়ে মজিদ ধর্মীয় আচারের নাটক ফাঁদে। খালেকের স্ত্রী আমেনা পাল্কি থেকে মাজারের সামনে এসে নামে। মজিদ তার পা-খানি দেখার পর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে ঘোষণা করে আমেনা অসতী, তাকে তালাক দেওয়া ধর্মীয় বিধান। ফলে আমেনাকে ছেড়ে চলে যেতে হয় সংসার ফেলে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামে আসে শিক্ষিত আক্কাস। কিন্তু মজিদ তাকেও পরিকল্পনা করে সরিয়ে দেয়। সে বোঝে জ্ঞানের আলো ছড়ালে তার জালিয়াতি ধরা পড়ে যাবে। তাই সে বিদ্যালয়ের পরিবর্তে গ্রামে পাকা মসজিদ গড়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গ্রামের সমাজ ও ব্যক্তি মজিদের এই একচ্ছত্র আধিপত্য নীরবে মেনে নেয়।

প্রথমা বিবি রহীমার পাশাপাশি সে দ্বিতীয়া বিবি জমিলাকে ঘরে আনে। জমিলা অল্প বয়সী, সে তার বুদ্ধিবলে বোঝে যে মজিদ মিথ্যার বেসাতি করে সকল গ্রামবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছে। ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলে সে মহাব্বত নগরের মানুষকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু জমিলা তার বশ্যতা স্বীকার করে না। নীরবে সে মজিদের সকল কথাকে অমান্য করে; মজিদের কাছে মাথা নত করে না। মজিদ হাজার চেষ্টাতেও জমিলাকে তার আয়ত্বে আনতে পারে না। ব্যর্থ, রুষ্ট মজিদ মাজারের একটি খুঁটির সঙ্গে জমিলাকে বেঁধে রেখে শাস্তি দেয়। জমিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মজিদ

দেখে—'...লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে শুয়ে আছে জমিলা...তার একটা পা কবরের গায়ে লেগে আছে।' জমিলাও এইভাবে উপন্যাসে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। মজিদের ভেতরেও একটা ওলোট-পালোট শুরু হয়। ঝালরওলা লালসালুর গাঢ়তর রঙের আড়ালে বাঙালি-মুসলমান সমাজের সংকট মুখ থুবড়ে পড়ে।

৩.৩ নামকরণের তাৎপর্য

উপন্যাসের নামকরণ সাধারণত কয়েকটি বিষয়ের ওপরে নির্ভর করে। ঔপন্যাসিক সেক্ষেত্রে বিষয়কে প্রাধান্য দেন, কখনও বা চরিত্রকে অবলম্বন করেন, অথবা ব্যঞ্জনাধর্মী বা প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে নামকরণ। 'লালসালু' উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর পটভূমি গড়ে উঠেছে ধর্মীয় বাতাবরণে। যদিও ধর্মের নামে এখানে অধার্মিক কার্যকলাপ প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্মকে অস্ত্র করে নায়ক মজিদ এখানকার সাধারণ মানুষগুলোর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। অসহায় মানুষগুলো তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার দ্বিতীয়া স্ত্রী জমিলা অনুভব করেছে, লালসালু দিয়ে ঢাকা মাজারটিকে কেন্দ্র করে তার স্বামী মিথ্যার ব্যবসা করছে। ফলে ঐ লালসালুর চাদরটি শেষ বিচারে এই উপন্যাসে প্রতীকী হয়ে উঠেছে, যা ধর্মের নামে মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে ঢেকে রাখে, রাখতে চেষ্টা করে।

৩.৪ কাহিনি-সংশ্লেষ

'লালসালু' একটি মিতায়তন উপন্যাস। উপন্যাসের শুরু হয়েছে শস্যহীন জনবহুল মধুপুর গড়ের ছবি দিয়ে। শস্যহীন এ দেশ ধর্মের আগাছায় ভর্তি। ভোরবেলায় এমন মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যেন মনে হয় এটা খোদাতা'লারই দেশ। খোদাতা'লার ওপর এদের প্রগাঢ় ভরসা। শস্যশূন্য মাঠ দেখেও তারা রঙিন কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়। কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। এইভাবেই একদিন শ্রাবণের শেষে তাহের এবং কাদের যখন নৌকা নিয়ে মতিগঞ্জের দিকে পাড়ি দেয়, তখন মতিগঞ্জের সড়কের ওপরে একটা অপরিচিত লোককে আকাশের দিকে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িতে থাকতে দেখে। এই অপরিচিত ব্যক্তিই মজিদ। মহব্বতনগরে তার প্রবেশও নাটকীয়ভাবে। এখানকার লোকেরা অবশ্য নাটক পছন্দ করে। তাই মজিদের আগমন সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। সে চীৎকার করে গালাগালি দেয় সকলকে, বলে, 'আপনারা জাহেল, বেএলেম, আন্‌পাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?' সে জানালো, গারো পাহাড়ে সে খুব সুখেই ছিল, কিন্তু একদিন সে স্বপ্ন দেখলো, সেই স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে মহাব্বতনগরে। দূরে একটা বাঁশঝাড় ছিল, সেই বাঁশ ঝাড়ের ওধারে একটা পুকুরের পাশে ছিল কিছু গাছপালা, তারই একাধারে একটা প্রাচীন কবর মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। মজিদের চোখ পড়েছে তার ওপর। এখানকার মানুষগুলো ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠলেও খোদার প্রতি তাদের নজর কম। মজিদ এই সত্য অনুভব করেছিল এবং একথাও বুঝেছিল যে, 'দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু'বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে খেলা সাংঘাতিক।' কিন্তু মানুষগুলোর 'অধোবদন' চেহারা দেখে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

জঙ্গল সাফ হয়ে প্রাচীন কবর নতুন দেহ ধারণ করলো। ঝালরওলা লালসালু দ্বারা তা আবৃত হলো। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, রাতদিন জ্বলতে লাগল মোমবাতি। সমস্ত গ্রাম থেকে মানুষ আসতে লাগলো। তাদের কান্না, হতাশা, আশা, ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত হতে লাগলো দিনের পর দিন। সেই সঙ্গে পয়সা-আধুলি-সাচ্চা টাকা-নকল টাকা

ছড়াছড়ি যেতে লাগল। মিথ্যার বেসাতি করে মজিদের ঘরবাড়ি হলো, গোয়ালঘর, আওলাঘর, জমি, গৃহস্থালী সব হলো। ফসল কাটার দিন তার ঘরে মগরা-মগরা ধান আসত। এই সব কিছু যার জন্য সেই মাজারটিকে ঘিরে তার মনে কখনো যে ভাবনা হতো না, তা নয়, কিন্তু সে জানত তারও বাঁচবার অধিকার আছে। বিশেষ করে গারোপাহাড়ের শ্রমক্লান্ত দিনের কথা মনে হলে সে শিউরে উঠতো। সে ভাবত, 'তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।' ফলে কোন ভুল হলে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন।

একদিন মজিদের ঘরে বিবি এলো, নাম তার রহীমা। রহীমা লম্বা-চওড়া মানুষ, তার শক্ত-পোক্ত দেহ দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিল। কিন্তু আসলে তার ওপরটা শক্ত-সবল হলেও ভেতরে সে ঠান্ডা-ভীতু প্রকৃতির। মজিদের প্রতি তার শ্রদ্ধা, সম্মান, ভয় সবই আছে। তাকে নিয়ে মজিদের সংসার জীবন সুখেই কাটতে থাকে। মজিদ চায় রহীমার মত এ গ্রামের সবাই তাকে ভয় করুক, মান্য করুক। গ্রামের মানুষগুলো কাস্তে নিয়ে ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গান গায়। মজিদ ভেবে পায় না কিসের এত গান, কিসেরই বা আনন্দ! শ্যেন দৃষ্টিতে মজুরদের সে পরখ করতে থাকে, সেও চায় ধানে তার গোলা ভরে উঠুক, কিন্তু তাদের গান, হাসি তার ভালো লাগে না। তার কেবলই মনে হতে থাকে, এই গান-হাসি যেন লালসালু দ্বারা আবৃত মাজারটিকে অবজ্ঞা করে। তাই মজিদ তাদের জানায় যে, এই মাটির প্রতি পূজার ভাব দেখানোয় মুসলিম ধর্ম অনুযায়ী তারা গুনাহ্ করেছে— 'তারা গুণাগার'। জমায়েত মাথা নিচু করে লজ্জায়। এইভাবে মজিদ তাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে, তারাও মজিদের অধীনতা মেনে নেয়। কখনো সে সাত ছেলের বাপ দুদুমিঞাকে 'কলমা' শিখতে বলে, কখনো বা বড় বড় ছেলেদের ধরে জিজ্ঞাসা করে তাদের 'খৎনা' হয়েছে কিনা। না-হলে তাদের খুঁটিবন্দি করে সে নিজেই খৎনা দেবার ব্যবস্থা করে। এমনিভাবে সে মহাব্বতনগরে শক্তির শিকড় গাড়ে। আর এই শক্তি ক্রমে শাখা-প্রশাখা মেলে সমগ্র গ্রামকে আচ্ছন্ন করে। মজিদের এই শক্তি প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। গ্রামের মেয়েরা আসে তার কাছে, কারণ তারা জানে মজিদ ধরাছোঁয়ার বাইরে; ফলে যোগসূত্র হল রহীমা। রহীমাও ওদের জন্য ভাবে, সমস্ত মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। বিধবা হাসুনির মার জন্য তার দুঃখ হয়। বুড়ো বাপ তাকে মারধোর করে, সে কাঁদতে কাঁদতে মজিদের বাড়িতে আসে, বিচার চায় তার কাছে। মজিদ আড়চোখে হাসুনির মার দিকে তাকায়, তার মুখটা দেখার জন্য কৌতূহল বোধ করে। অপরাহ্নে মাতব্বর মজিদ বিচারে বসে। কোরানের স্তবক পড়ার মত করে সে আরম্ভ করে। কখনো গলার সুর কঠিন, কখনো মিহি—ঋজু ভঙ্গীতে বলে যাওয়া মজিদের সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা। দুদুমিঞা, যে খালেক ব্যাপারীর মত ধনী মানুষের মুখের ওপর কথা বলতে পারে, মজিদের প্রশ্নে সেও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ক্রমে মজিদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা।

মহাব্বতনগর ও তার আশপাশের গ্রামগুলোর এক মহামান্য পীর আছেন। তিনি ফসল ওঠার পর আসেন কিছুকালের জন্য সেবা ইত্যাদি আদায় করতে। তিনি নাকি মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলেন। এই জাঁদরেল পীরের আগমনে মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে বোঝে তারই মত আর এক ভণ্ডের আগমন ঘটেছে সেখানে। মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে তাঁর কাছে। দেখে তার মাথা গরম হয়ে যায়, শরীরে রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে। 'এক সময় ভাবে ঝালর-দেওয়া সালু-কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান'। তাই অবশেষে একদিন সবাই যখন পীরসাহেবের কাছে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, তখন সেখানে মজিদ উপস্থিত হয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে শুরু করে। সে সকলকে বোঝাতে থাকে যে, এই পীর খোদার সঙ্গে মস্করা করছে। শেষ পর্যন্ত তার কথা শুনে মহাব্বতনগরের মানুষেরা আর পীরের ওদিকে পা বাড়ায় না। কিছুদিন পর মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস আসে বিদেশ থেকে। তার ইচ্ছা গ্রামে সে একটা স্কুল করবে, ছেলে মেয়েদের

ইংরাজি শেখাবে। কিন্তু একথা শুনে কঠিন হয়ে ওঠে মজিদের মুখ; সে বুঝতে পারে এই স্কুল হলে তারই বিপদ সর্বপ্রথম দেখা দেবে, তাই সে সভা ডেকে আক্কাসের প্রস্তাবকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে জানায় গ্রামে একটা পাকা মসজিদ হবে, এবং এটাই খোদার মর্জি। শেষ পর্যন্ত একটা পাকা মসজিদও গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমে মজিদ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কবরের অনাবৃত অংশটাকে তার মৃত মানুষের খোলা চোখের মত মনে হয়। একযুগ ধরে যে কবরের পাশে তার বসবাস, যার জন্য তার মান-যশ-আর্থিক প্রতিপত্তি, সে নিজেও জানে না এই কবরের তলায় চিরঘুমে কে শায়িত আছে। এক প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতা তাকে ক্লান্ত করে, বিষণ্ণ করে তোলে।

এই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে রক্ষা পেতে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলো। ঘরে এলো জমিলা। তাকে দেখে মজিদ মনে করেছিল সে খোদাকে কেন, সবকিছুকেই ভয় করবে—'মানুষ হাসি মুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।' কিন্তু মজিদের এ ভাবনা যে কত ভুল তা দিন কয়েক বাদেই সে বুঝতে পারল। প্রথমে সে ঘোমটা খুললো, তারপর হাসতে শুরু করলো, তারপর সে এত কথা বলতে লাগলো যে বিস্মিত হতে হয়। অর্থাৎ জমিলা হল রহীমার একেবারে উল্টোপিঠ। মুসলিম মেয়ের আওয়াজ করে হাসি মজিদের পছন্দ নয়, কিন্তু তাতে জমিলার কি! সে আবার হাসতে থাকে! এই ভাবে জমিলা মজিদের সমস্ত অনুশাসনকে উপেক্ষা করতে থাকে, ভাবিয়ে তুলতে থাকে মজিদকে। তার মনের হদিস পায় না মজিদ। মহাব্বতনগরের দীর্ঘ রাজত্বকালে তার হুকুম এমনভাবে কেউ অমান্য করেনি যা করছে জমিলা। তাই মজিদ ফুঁসতে থাকে। কিন্তু তখনো ক্ষমতার অহংকারে সে বুঝতে পারে না যে তার পায়ের তলার মাটিটা সরতে শুরু করেছে, তার মিথ্যা ভণ্ডামির দিন শেষ হয়ে আসছে! নামাজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে জমিলা—এই তার অপরাধ। মজিদ সেই ঘুমন্ত জমিলাকে হ্যাঁচকা টান মেরে তোলে এবং তারপর বাড়ি থেকে বার করে এনে মাজারের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে জমিলা মজিদের মুখের মধ্যে থুথু ফেলে। এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ যে দেখাতে পারে তা ভাবাটাই অস্বাভাবিক। ক্রুদ্ধ মজিদ জমিলাকে মাজারের কাছে একটা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো। জমিলার তাতেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মজিদ ভাবে এইবার জমিলার মনে তার প্রতি ভক্তি আসতে বাধ্য। শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি। রহীমা আশঙ্কিত হয় জমিলার জন্য। শিলাবৃষ্টি থামলে মজিদ মাজারের কাছে এলো, দেখলো, 'লালকাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা।' তার 'মেহেদি দেওয়া একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।'

যে মাজারকে নিয়ে মজিদের এত ধর্মানুশাসন, সেই মিথ্যা মাজারের গায়ে জমিলার উত্তোলিত পদপাত যেন ধর্মের নামে সকল ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। এ যেন মিথ্যার বুকে সত্যের পদাঘাত। 'লালুসালু' আবৃত মাজারটি যে এখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ঔপন্যাসিক 'লালসালুর' ব্যঞ্জনায় ধর্মের নামে যারা অধর্মের ব্যবসা করে তাদের প্রকৃত চরিত্রকে তুলে ধরেছেন এখানে। সুতরাং, 'লালসালু' এই নামকরণটি সার্থক হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

৩.৫ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত বিশ্লেষণ

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্রাজেডির ছ'টি অঙ্গের মধ্যে প্লটকে দিয়েছিলেন সর্বাধিক গুরুত্ব। তিনি আরও বলেছিলেন, 'Plot is the soul of tragedy.' অর্থাৎ কাহিনিবৃত্তই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গঠনের বিচারে এই প্লট জটিল অথবা সরল হতে পারে। আবার ঘটনার বিন্যাস, অগ্রগতি ও পরিণতি বিচার করে উপন্যাসের কাহিনি বৃত্তাকার বা রৈখিকও হতে পারে। ওপার বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'লালসালু'র কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা সরল, একমুখী। এই উপন্যাসের নায়ক মজিদ মিথ্যা মাজারের ব্যবসা করে

কিভাবে মহাব্বতনগরের মানুষদের ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তারই স্পষ্ট ছবি বিধৃত হয়েছে এখানে। মজিদকে কেন্দ্র করে নানান episode গড়ে উঠেছে এখানে। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মজিদের জীবন কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। কোন উপকাহিনি স্থান পায়নি এখানে; ফলে কাহিনির একমুখীনতাই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'লালসালু' উপন্যাসের মূল বিষয় হল উত্তরবঙ্গের গারো পাহাড় অঞ্চল থেকে মজিদ নামক এক ধর্মধ্বজী সুযোগসন্ধানী মানুষের মহাব্বতনগরে আসা এবং লালসালু আবৃত মাজারকে কেন্দ্র করে মিথ্যার বেসাতি করা। এই কাহিনিকে বিধৃত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসটি শুরু করেছেন এইভাবে—"শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে।" সমগ্র অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষদের অসহায়তার ছবি দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হওয়ার পর লেখক জানাচ্ছেন যে, এখানে শস্যের চেয়ে ধর্মের আগাছা বেশি। শস্যশূন্য এদেশের মানুষ তাই খোদার ওপর বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে। দেশত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে বিভিন্ন জীবিকার খোঁজে। মজিদও এইভাবে একদিন এই শস্যশূন্য গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল ত্যাগ করে শ্রাবণের শেষাশেষি কোন একসময়ে মহাব্বতনগর গ্রামে এসে উপস্থিত হয়।

উপন্যাসটিতে মাজার ব্যবসয়ী মজিদ এবং তার প্রতিপক্ষদের মধ্যে সূক্ষ্ম সংঘাতের চিত্র আছে। ফলে উপন্যাসের বৃত্তগঠন অনেকটাই নাটকীয় হয়ে উঠেছে। অনেকটা যেন **Flash back**-বা অতীত-উদ্ভাসন রীতিতে মজিদের পূর্ব জীবনের একটা ছবি উপন্যাসের শুরুতে নাটকীয় অবতরণিকার সৃষ্টি করেছে। মহাব্বতনগরে আসার পূর্বে এক শস্যহীন দেশ থেকে মজিদ ভাগ্যান্বেষণে গারো পাহাড়ে উপস্থিত হয়। সেখানে চরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে একটি বাঁশের মসজিদে সে ইমাম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন একসময় দুঃসহ হয়ে ওঠায় নতুন করে পথ চলতে শুরু করেছিল সে, এবং অবশেষে উপস্থিত হলো শস্যসমৃদ্ধ পূর্ববাংলার মহাব্বতনগর গ্রামে। এইখান থেকে শুরু হল মূল কাহিনিবৃত্ত বা উপন্যাসের প্লট।

মহাব্বতনগরে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করার পর মজিদের চোখ গেল গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে পড়ে থাকা এক পরিত্যক্ত কবরের দিকে। গ্রামবাসীদের সে জানালো, এটি মোদাচ্ছের পীরের মাজার। আরবী ভাষায় 'মোদাচ্ছের' শব্দটির অর্থ হল 'অজ্ঞাতপরিচয়'। মজিত তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে ঐ অজানা কবরকে মোদাচ্ছের বলে উল্লেখ করে। সে মনে করে গ্রামের মূর্খ, জাহেল, আনপড় মানুষগুলো মহান পীরের মহাত্ম্য না জেনেই এই পবিত্র মাজারকে অবহেলায় দীর্ঘকাল ধরে ফেলে রেখেছে। মজিদের তিরস্কারে সমগ্র গ্রামবাসী নিজেদের অপরাধী বোধ করে এবং তাদের সকলের চেষ্টায় মাজারের দ্রুত সংস্কার হয়। ঝালরওলা লালসালুতে আবৃত হল নতুন কবরটি।

মাজারটিকে ঘিরে মজিদের প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। গ্রামবাসীরা মনে করল ঐ পবিত্র মাজার এবং মজিদের মধ্যে একটা গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ আছে। মাজারটি মজিদের অলৌকিক বা ঐশী শক্তির উৎস বলে ভাবে তারা। মাজারের দৌলতে মজিদের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়, শস্য সঞ্চিত হতে থাকে; এককথায় তার অবস্থা ক্রমে স্ফীত হয়। এবার সে একটি শক্ত সমর্থ নারী রহীমাকে বিবাহ করে। যে মজিদ পূর্বে ছিল ঝড়ের মুখে উড়ে চলা অস্থির এক পাতা বিশেষ, সেই আজ পরিণত হয়েছে অস্তিত্বে কম্পমান এক বটবৃক্ষে। ঘটনাধারার এই পর্যন্ত বিবরণকে আমরা মূল কাহিনির সূচনা বিন্দু বলতে পারি। অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এ হল প্লটের আদি ভাগ বা মুখবন্ধ।

'লালসালু' উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মজিদ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে একে একে চারটি বাধাকে পর্যুদস্ত করে। তার জীবনরেখা চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছোট ছোট উপবৃত্তের মধ্যে দিয়ে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে। সুযোগসন্ধানী ও কুটকৌশলী মজিদের প্রথম বাধা তাহের ও কাদেরের ব্যক্তিত্বশালী একগুঁয়ে বৃদ্ধ পিতা। তাই মজিদ কাদেরের বৃদ্ধ পিতাকে গ্রামের প্রকাশ্য জমায়েতে অপদস্থ করে, নিজকন্যা হাসুনির মায়ের কাছে

ক্ষমা চাওয়ায় এবং শেষপর্যন্ত তাকে গ্রামছাড়া করে। কারণ ঐ বৃদ্ধ তার কঠিন উদ্ধত ব্যক্তিত্বে মজিদের সামাজিক নেতৃত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছিল।

মজিদের দ্বিতীয় বিজয় আওয়ালপুরের প্রৌঢ় পীরের বিরুদ্ধে। মজিদ তার ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী দ্বিতীয় পীরকে সহ্য করতে পারেনি। তাই তার অনুগত অনুচরদের সেই পীরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত রক্তারক্তি কান্ডে পরিণত হয় এবং প্রৌঢ় পীর গ্রাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। "শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথচালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায়" মজিদের সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মজিদের এই কাজকে পছন্দ করেনি একমাত্র খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি। সন্তানহীনা রূপসী আমেনা তার সন্তান কামনার জন্য গোপনে তার ভাই ধলা মিঞাকে দিয়ে আওয়ালপুরের পীরের কাছ থেকে দৈবপানি পড়া আনতে চেয়েছিল। এতেই মজিদ রুষ্ট হয়। সে মনে করে তার মত খোদার খাস বান্দা থাকতে আমেনা বিবি আওয়ালপুরের পীরের দ্বারস্থ হবে কেন? ফলে আমেনা বিবি হল তার তৃতীয় বাধা, যাকে সে অপসারণের জন্য এক নতুন ফন্দি তৈরি করল। মজিদের ঐশী শক্তিকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার শাস্তিস্বরূপ সে আমেনা বিবির চারিত্রিক বিশুদ্ধির এক মিথ্যা পরীক্ষার আয়োজন করে। উপবাসী আমেনা বিবি মাজার প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে টলে যায়। এই ঘটনাকে মজিদ আমেনা বিবির গোপন অপরাধের ফল বলে চিহ্নিত করে। বিনাদোষে কুচক্রী মজিদ আমেনাকে তালাক দেওয়ায়—অথচ আমেনার রূপের প্রতি সেও আসক্ত হয়ে পড়ে।

মজিদের চতুর্থ বিজয় তরুণ আক্কাস আলীর বিরুদ্ধে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস ইংরেজিতে নব্যশিক্ষিত যুবক। গ্রামবাসীদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামে একটি ইংরেজি স্কুল খুলতে চায় সে। মজিত বুঝতে পারে ইংরেজি শিক্ষা তথা আধুনিক ধ্যানধারণার প্রসার হলে তার মধ্যযুগীয় ধর্মাচারের গুরুত্ব কমে যাবে, এবং ধর্মের নামে সরলবিশ্বাসী গ্রামবাসীদের কাছে তার এতদিনের প্রতারণা ফাঁস হয়ে যাবে। তাই সে গ্রামের জমায়েতে কৌশলে গ্রামে স্কুল খোলার পরিবর্তে মসজিদ বানাবার কথা বলে। অবশেষে সকলের মিলিত প্রয়াসে একটা মসজিদ গড়ে উঠলো। এই চারটি ঘটনাবৃত্তের মধ্য দিয়ে মজিদের ক্রমোত্থান ঘটে, এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়।

কিন্তু বাইরের জগতে এই আপাত প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও মজিদ অন্তর জগতে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। রহীমা মজিদের অনুগতা হলেও সে সন্তানহীনা। নিঃসন্তান মজিদও তাই মর্মপীড়া অনুভব করে। তাই সন্তানের আশায় এবং দ্বিতীয় নারীর লালসায় মজিদ বিবাহ করে তার থেকে বয়সে অনেক ছোট জমিলাকে। জমিলা এক প্রাণচঞ্চলা কিশোরী। সে মজিদের তথাকথিত ঐশী শক্তিতে বিশ্বাসিনী নয়। মজিদ জিকিরের আয়োজন করলে জমিলা তাকে না মানায় সে তার স্ত্রীকে পাগলিনী রূপে প্রতিপন্ন করতে চায়। জমিলা স্বামীর কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে এবং তার মুখে থুথু ছেটায়। এই অপরাধে মজিদ জমিলাকে তুলে নিয়ে মাজারের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। উপন্যাসের ঘটনাধারা এই পর্যন্ত অনুসরণ করলে মনে হয় মজিদের আত্মপ্রতিষ্ঠা যেন সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু এরপরই আসে মজিদের আত্মপরাভবের সেই চরম মুহূর্ত। শিলাবৃষ্টি ও ঝড় শুরু হয়। কন্যাসমা সতীন জমিলার জন্য রহীমার অন্তর উদ্বেগে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সে স্বামীকে নির্দেশ দেয় বন্দিনি জমিলাকে মুক্ত করে আনতে—"তারে লইয়া আসেন।" মজিদ মাজারে গিয়ে দেখে কিশোরী জমিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তার মেহেদি দেওয়া একটি উদ্ধত চরণ মাজারের গায়ে লেগে আছে। মিথ্যা মাজারের গায়ে জমিলার এই উত্তোলিত পদপাত যেন ধর্মের নামে সকল ভন্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত মজিদ বাধ্য হয়ে জমিলাকে মুক্ত করে আনে। তার অন্তরে একটা ভাবান্তর আসে। তার সারা জীবন হঠাৎ যেন টাল খেয়ে যায়, সে এক সত্যের মুখোমুখি হয়। মজিদের এই রূপান্তরের মুহূর্তটিকে পরিভাষায় climax বলা যেতে পারে।

কিন্তু মুহূর্তের এই দুর্বলতা মজিদ সামলে নেয়, এবং পূর্বের মিথ্যাঘেরা জীবনে সে ফিরে যায়। গ্রামবাসীরা শিলাবৃষ্টিতে তাদের চাষের ক্ষতির কথা ভেবে হাহাকার করে, দিশাহারা হয়ে বেরিয়ে পড়ে। মজিদের কাছে এসে তারা এর প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু মজিদের এমন কোন ঐশী শক্তি নেই যার দ্বারা সে প্রকৃতির এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে। উপন্যাসের শেষে রহীমাও যেন মজিদের বিপক্ষে চলে যায়, প্রকৃতিও তার প্রতি বিরূপ; গ্রামবাসীরাও যেন তার প্রতি আর বিশ্বাস রাখতে পারে না। সবমিলে মজিদের সার্বিক পরাজয় ঘটে। একেই কাহিনির falling action বলা যেতে পারে। আর উপন্যাসের শেষ লাইনটি যখন ঔপন্যাসিক লেখেন এই বলে যে, 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ' তখন দ্রুত নেমে আসে উপন্যাসের অন্তিম পরিণতি (বা Castastrophe)। এখানেই কাহিনির বৃত্তবন্ধ সম্পূর্ণ হয়।

বস্তুতঃ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত বা প্লট আলোচনা করে দেখা গেল যে, এখানে মজিদ নামক এক ব্যক্তির জীবন কাহিনি বিধৃত। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে আপন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য। এই কাহিনিকে গড়ে তুলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক খুব সচেতনভাবেই কাল ঐক্যকে ব্যবহার করেছেন, ব্যবহার করেছেন স্থান ঐক্যকেও। উপন্যাসের শুরু হয়েছে শস্যহীন জনবহুল মধুপুর গড় অঞ্চলের বর্ণনা দিয়ে। তারপর গারো পাহাড়ের এই দুর্গম অঞ্চল ছেড়ে মজিদ এক শ্রাবণের শেষে এসে উপস্থিত হয় মহাব্বতনগর গ্রামে—"নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়াশূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ের আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো।" তার এই চলার পথকে গতিশীল করে তুললো কালীয় চেতনা।

শ্রাবণমাসের শেষে এসে যে মজিদ মহাব্বতনগরে প্রবেশ করেছিল, পৌষের শীতের রাতে আত্মপ্রতিষ্ঠ মজিদ রহীমাকে ডাকে—ঔপন্যাসিক লিখছেন—"ডাকের স্বরে প্রভুত্ব। দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন।" এরপর কাহিনি এগিয়ে চলে। একে একে মজিদ পীরকে পরাস্ত করে, খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবিকে শায়েস্তা করে এবং অবশেষে গ্রামে স্কুল করার যে প্রস্তাব আক্কাস দিয়েছিল তাকে ধূলিস্যাৎ করে সেখানে সে মসজিদ গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে তার মসজিদ গড়া শেষ হয় এবং তার দ্বিতীয় বিবাহও নিষ্পন্ন হয়। জমিলা ঘরে আসে তার। কিন্তু মজিদের সব হিসেব ভুল হয়ে যায়। জমিলা রহীমা নয়; স্বামীর প্রভুত্ব সে মেনে নেয় না। মজিদ ভাবে, 'যার কচি কোমল লতার মত হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল—তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে?' এই জমিলাই মজিদের পরাভবের কারণ হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক সেই পরাভবের ছবি আঁকতে গিয়ে ঝড়-বৃষ্টি, আলো-অন্ধকার, মেঘগর্জন প্রভৃতি ইমেজগুলিকে সময়ের সঙ্গে ব্যবহার করে কাহিনিকে গতিশীল করে তুলেছেন। মজিদের জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে এ যেন তারই পূর্বাভাস। উপন্যাস শেষে পরাভূত মজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক যেন তাই লেখেন—'মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিধারা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়।'

৩.৬ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ

৩.৬.১ মজিদ

'লালসালু' একটি নায়ক প্রধান উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক এক ধর্মব্যবসায়ী, নাম তার মজিদমিঞা। শীর্ণ উজ্জ্বল চোয়াল, মুখে ক'গাছি দাড়ি, কোটরাগত নিমীলিত চোখ, কিন্তু সে চোখে কম্পন নেই। গারো পাহাড় অঞ্চলের অসফল

জীবন থেকে ধূর্ত, কর্মঠ মজিদ এক শ্রাবণের শেষে নাটকীয়ভাবে মহাব্বতনগরে প্রবেশ করে। এখানে সে মৌলবাদের শিকড় গাড়তে চায়। চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত নিপুণভাবে রূপ দিয়েছেন। জীবনসংগ্রাম, অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা, ব্যবসায়িক বুদ্ধি, ধূর্ততা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, কামনা, প্রতিহিংসা, নিঃসঙ্গতা এবং আত্মপরাভব—এতগুলো বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সৃষ্ট মজিদ চরিত্রটি উল্লেখের দাবি রাখে।

উপন্যাসের প্রথমেই দেখা যায় মজিদ আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শস্যহীন মধুপুর গড় থেকে গারো পাহাড় অঞ্চলে একটি বাঁশের মসজিদের ইমাম হয়ে আসে। সেখানকার নিঃসঙ্গ জীবন সহ্য করতে না পেরে পূর্ববাংলার মহাব্বতনগর গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক চরিত্রটিকে বাস্তববাদী করে গড়ে তুলেছেন। সুবিধাবাদী মজিদ মিথ্যাভাষী, মহাব্বতনগরের গ্রামবাসীদের সে মিথ্যে করে বলেছে—'গারো পাহাড়ে সে সুখেই ছিল, সেখানেই গোলা ভরা ধান, গরু-ছাগল সব ছিল। তাদের খাতিরযত্নে, স্নেহ-মমতায় তার দিন কাটছিল সুখেই। কিন্তু একদিন সে স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এতদূরে।' তার একথা যে কত মিথ্যে তা বোঝা যায় যখন সে 'গারো পাহাড়ে শ্রমক্লান্ত হাড় বের ক'রা দিনের কথা স্মরণ' করে শিউরে ওঠে। এই গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজাকে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে চিহ্নিত করে সে। তারপর গ্রামবাসীদের অকৃপণ অর্থদানে মাজারের সংস্কার হয়। মাছের পিঠের মত নকল মাজারের উপর নতুন লালসালু আবৃত হয়। এই মাজারকে ঘিরে মজিদের ঘর, বাড়ি, অর্থ, সম্পত্তি সব গড়ে ওঠে। প্রতারক মজিদ গ্রামবাসীদের বোঝায়, ঐ মাজার থেকে সে ঐশী শক্তি সঞ্চয় করেছে। 'মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু-কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার 'শক্তির মূল।'

মজিদের কামনা-বাসনা এবং যৌনতা যথেষ্ট তীব্র। যে-নিঃসঙ্গতার কারণে মজিদ চলে এসেছিল গারো পাহাড় থেকে, সেই নিঃসঙ্গতা কাটাতে মজিদ এই গ্রামেরই একটা শক্ত-সামর্থ প্রশস্ত যৌবনাবতী বেওয়া (বিধবা) মেয়েকে বিবাহ করে ঘরে আনে। রহীমাকে দেখে শীর্ণ মজিদ কামনায় জ্বলে উঠেছিল, আগুন ধরেছিল তার বুকে। তবে তার চওড়া দেহ, শক্তি সবই তার বাইরের খোলস মাত্র, ভেতরে সে ভীতু মানুষ। মজিদ তাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে। রহীমার মত এ গ্রামের মানুষগুলোকেও সে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। হাসুনির মাকে দেখেও তার মনে কামনা জাগে, অন্ধকারে তার চোখ চক্চক্ করে। গ্রামের সম্পন্ন ব্যবসায়ী খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবিকে মজিদ বিনা দোষে স্বামীকর্তৃক তালাক দেওয়ায়। নকল মাজারে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে এসে আমেনা বিবি যখন পাল্কি থেকে নামে, তখন 'সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টিবিদ্ধ হয় সে পায়ে।' এখানেই শেষ নয়, কামনার তাড়নায় এবং সন্তান কামনায় বয়সে অনেক ছোট কিশোরী জমিলাকে বিবাহ করে মজিদ। জমিলাকেও সে রহীমার মত আপন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। কিন্তু জমিলা তার বশ্যতা স্বীকার করে না। বরং মজিদের সব কথাকে সে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে শুরু করে। ক্রমে ঘনিয়ে আসে মজিদের আত্মপরাভব।

মজিদের কামনা যেমন তীব্র, তার ক্রোধও তেমনি ভয়ঙ্কর। মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ ধান কাটা দেখে। কিন্তু তাদের হাসি, গান পছন্দ হয় না তার। সে বলে, 'মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী।" অর্থাৎ তারা মূর্তিপূজক, তাই 'গুনাগার'। সাত ছেলের বাপ দুদুমিঞাকে সে ব্যাপারীর কাছে কলমা শেখবার নির্দেশ দেয়। গ্রামের ধাড়িধাড়ি ছেলেগুলোকে পাকড়াও করে মজিদ, জানতে চায় তাদের 'খৎনা' হয়েছে কিনা। মজিদ বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছে যে তাদের 'খৎনা' হয়নি, তাই সে রাগের বশে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে তাদের। দাড়ি গোঁফ ওঠা ছেলেগুলো ভয়ে কাঁপতে থাকে, কিন্তু দাঁত কড়মড় করতে থাকে মজিদ। সে নিজেই তাদের 'খৎনা' করে দেয়। তার ক্রোধ আরও তীব্র হয় আওয়ালপুরের পীরকে কেন্দ্র করে। নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সে

এই পীরকে লোক দিয়ে আঘাত করে গ্রাম থেকে তাড়ায়। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান কামনায় তার কাছে না এসে আওয়ালপুরের পীরের কাছে তার ভাই ধলা মিঞাকে পাঠিয়েছিল পানিপড়া আনতে। সেই অপরাধে মজিদ খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে আমেনা বিবিকে তালাক দেওয়ায়। আবার সুশিক্ষিত যুবক আক্কাস আলি গ্রামে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য স্কুল খুলবে বলায় সে উপহাস করে তার কথা উড়িয়ে দেয় এবং পরিবর্তে গ্রামে মসজিদ গড়ার প্রস্তাব দেয়। সুতরাং ছলে-বলে-কৌশলে মজিদ সকল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে তার মৌলবাদী কাজকর্মকে সচল রাখে।

আপাতভাবে দেখলে মনে হয়, মজিদ এক সফল ব্যক্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তরের দিক থেকে সে এক পরাভূত সত্তা। নকল মাজারটিকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে সে নিজেই ভীত হয়ে পড়ে। কল্পিত সেই মোদাচ্ছের পীরের সঙ্গে সত্যিই যে তার কোন সম্পর্ক নেই, একথা ভেবে সে অন্তরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিঃসন্তান মজিদ ভেতরে ভেতরে নিজেকে নিঃস্ব মনে করে। 'পাথরের মতো ভারী' একটা নিঃশব্দতা তাকে ঘিরে ধরে। এতকিছু পেয়েও তার মন ভরে না। ফাল্গুনের বাতাসে সে কখনো উজ্জীবিত হয়নি। 'সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ হয়েছিল যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি?' ভেতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে মজিদের। তার এই ব্যর্থতা ও নিঃসঙ্গতা ধরা পড়ে রহীমার কাছে তার কাতর আর্তি প্রকাশে। জমিলাকে কোন মতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে মজিদ রহীমার কাছে করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—'বিবি কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলা নি?' কিংবা সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে, 'কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।'—মজিদের একথার মধ্যে তার অসহায়ত্বই ফুটে ওঠে।

উপন্যাসের শেষে মজিদ জমিলাকে শিক্ষা দিতে শুরু করে। ফজলের নামাজ পড়া, কোরান শরীফ পাঠ করা—নানা তামিল ধার্য হল তার ওপর। কিন্তু কোন শিক্ষাই শিক্ষিত করে তুলতে পারলো না জমিলাকে। জমিলা ভয়ডর হীন, কিন্তু তবু হাল ছাড়ে না মজিদ। সজ্ঞানে ও সুস্থ দেহে সে মিথ্যা গল্প শোনায় জমিলাকে। রাতে তারাবির নামাজ পড়ার হুকুম করে মজিদ। কিন্তু জমিলা জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে। রাগে ফেটে পড়ে মজিদ, তাকে মাজারের পাশে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখে। শুরু হয় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। রহীমার কথায় মজিদ জমিলাকে মুক্ত করতে গিয়ে দেখে, জমিলা হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। 'আর মেহেদি দেওয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।' এ যেন মিথ্যা মাজারের বুকে সত্যের পদাঘাত। অথবা প্রতারক মজিদের প্রতারণার এক মোক্ষম জবাব। অন্যদিকে, শিলাবৃষ্টিতে গ্রামের শস্য ধ্বংস হয়, নারী মজিদের বিরুদ্ধে চলে যায়, নিসর্গও তার প্রতি বিরূপ হয়। এক শস্য শূন্যতার মধ্য থেকে মজিদ নিক্ষিপ্ত হয় আর এক রিক্ততার দিকে। এ যেন তারই পাপের ইঙ্গিত। খাঁ খাঁ প্রান্তরে গ্রামবাসীদের হাহাকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মজিদ অবশ্য তার বিশ্বাসে ফিরে আসবার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীদের উদ্দেশে সে বলে, 'নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।' উপন্যাসের অন্তিম বাক্য লিখছেন ঔপন্যাসিক এই বলে যে, 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।' অর্থাৎ তার ভণ্ডামির শেষ হবে না, বেঁচে থাকার এই সংগ্রামশীলতা চলবে—মৌলবাদের এই ভয়ঙ্কর পরিণামকেই ঔপন্যাসিক মজিদ চরিত্রে তুলে ধরেছেন।

৩.৬.২ জমিলা

ওপার বাংলার শক্তিমান কথা সাহিত্যিক ওয়ালিউল্লাহের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'লালসালু'। এই উপন্যাসের মূল বিষয় হলো জনৈক কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের নকল মাজারকে কেন্দ্র করে ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম এবং পরিণামে তার পরাভব। মজিদের এই পরাভবকে যে সম্ভবপর করে তুলেছে, সে হলো তারই অন্তঃপুরিকা দ্বিতীয়া স্ত্রী জমিলা। যদিও উপন্যাসে মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমার অনন্ত উপস্থিতি, এবং উপন্যাসের শেষ পর্বে কিশোরী

জমিলার আবির্ভাব; তথাপি মজিদ চরিত্র উন্মোচনে এবং তার আত্মিকপরাভবে দ্বিতীয়া স্ত্রী জমিলারই প্রাধান্য। ফলে নায়িকার দাবিদার নেই। মাজার ব্যবসায়ী মজিদের সমস্ত নেতিবাচক অমানবিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে জমিলার নীরব কঠোর প্রতিবাদ উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে। মজিদ এক প্রাণধর্মবিরোধী চরিত্র, জমিলা তাকে পরাভূত করেছে সহজ প্রাণধর্মের প্রবল শক্তিতে। জমিলা বাইরে দুর্বল, কিন্তু অন্তরে প্রবল শক্তিশালী। এই চরিত্রটির গুরুত্ব বিচারের দিক থেকে উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার সে যথার্থ দাবিদার।

ঔপন্যাসিক যদিও জমিলার কোন পিতৃপরিচয় দেননি তথাপি অনুমান করা যায় যে সে দরিদ্র পিতার কন্যা। দারিদ্র্যের জন্যই প্রৌঢ় কুদর্শন মজিদের সঙ্গে কিশোরী কন্যা জমিলার বিবাহ হয়। জমিলা যখন মজিদের সংসারে আসে, তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিল নিতান্ত ভীরু বেড়াল ছানাটির মত। মজিদ এমন বৌ ঘরে আনতে চেয়েছিল যে খোদাকে এবং খোদার প্রতিনিধি স্বরূপ স্বামীকে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে। জমিলাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, তাকে 'মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে' সে। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভুল তা দিনকয়েক বাদেই প্রমাণিত হল। প্রাণময়ী জমিলা কাউকেই ভয় করে না। সে উচ্ছল হাসি হাসে, কৌতুক করে। সপত্নী রহীমাকে সে কৌতুকছলে জানিয়েছে যে, মজিদ যখন তাকে বিয়ে করতে যায়, তখন ভাবী স্বামীকে দেখে তার মনে হয়েছিল, 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' আর শ্বশুরবাড়িতে এসে রহীমাকে দেখে তার মনে হয়েছিল শাশুড়ি। কৌতুকোচ্ছল এই কিশোরী মেয়েটি প্রতিপদে স্বামীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছে। নকল মাজারের ঐশী শক্তিতে তার কোন বিশ্বাস নেই। স্বামীর প্রতিও নেই কোন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। স্বামীর শয্যা পরিহার করে সে সপত্নী রহীমার বিছানায় শয়ন করে। মজিদের আদেশ সত্ত্বেও সে নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার সমস্ত আচরণের মধ্যে যেন একটা বিদ্রোহের ভাব।

হাস্যমুখরা-চপলা জমিলা এবং নীরব বিদ্রোহিনী জমিলা—জমিলার দুই রূপই মজিদের কাছে ভয়ের কারণ। জিকিরের দিনে অন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙে প্রকাশ্য জমায়েতের সামনে জমিলার আসা তাই মজিদকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। এরজন্য মজিদ তিরস্কার করলেও জমিলা তা গ্রাহ্য করে না। ভীত হয় রহীমাও; তার মনে হয় লতার মতো কোমল এই মেয়েটি তাদের সংসারে ফাটল ধরাতে এসেছে। যে প্রতারণা, কুসংস্কার এবং আত্মগর্ব মজিদকে প্রাণধর্মের বিপরীতে চালনা করে, আপন প্রাণধর্মের উচ্ছলতা দিয়ে জমিলা তাকে আঘাত করে। জমিলা তার সহজ প্রাণধর্ম দিয়ে একসময় স্বামী মজিদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

সহজাত প্রাণধর্মে বলীয়ান জমিলা সাহসী এবং প্রতিবাদী চরিত্র। স্বামীর সমস্ত অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদ জানায় সে। শুধু তাই নয়, জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য মজিদ যখন তাকে কঠোর শাস্তিদানে উদ্যত, তখন সে স্বামীকে উপেক্ষা করে তার মুখের ওপর থুথু নিক্ষেপ করে। জমিলার এই প্রতিবাদ যেন সমস্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মজিদ বজ্রাহত হয়, যার কথায় সমগ্র মহাব্বতনগর গ্রাম ওঠে বসে, যার কথায় খালেক ব্যাপারী তার নির্দোষ স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, যার কাছে আওয়ালপুরের পীর থেকে শুরু করে ইংরেজি শিক্ষিত আক্কাস আলী পরাভব মানে, তার প্রতি জমিলার এই চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ দুঃসাহস ছাড়া আর কী হতে পারে। এই ঘটনায় মজিদ তাকে শিক্ষা দিতে মাজারের ঘরে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখে। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা—জমিলা নিঃশঙ্কচিত্তে মাজারে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। রহীমার নির্দেশে মজিদ মাজার থেকে জমিলাকে মুক্ত করে আনতে চায়। মাজারে প্রবেশ করে মজিদ ঝাপটা খুলে দেখে লালকাপড়ে আবৃত কবরের পাশে জমিলা চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, তার একটি পা কবরকে স্পর্শ করে আছে। নকল মাজারের উপর জমিলার এই পদাঘাত যেন প্রতীকী হয়ে ওঠে। জমিলাকে বন্ধনমুক্ত করে রহীমার কাছে নিয়ে গেলে তার প্রতি রহীমার স্নেহ শুশ্রূষা দেখে মজিদের অন্তরশায়ী অবরুদ্ধ সহজ মানব প্রকৃতি এই প্রথম জেগে ওঠে—মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরে একটা

ওলোট-পালোট শুরু হয়ে যায়—'একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।' অতঃপর মজিদ নিজেকে সামলে নেয়।

বস্তুতঃ 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা চরিত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জমিলার এই ভূমিকা আমাদের 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে নন্দিনী ও জমিলা কখনই স্বগোত্রীয় নয়। নন্দিনীর ভূমিকা অনেক বেশি সক্রিয় এবং ব্যাপক। জমিলা সেই অর্থে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও প্রতিবাদের সূচনা করে দিয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজের নারী হিসেবে জমিলার এই প্রতিবাদ যথেষ্ট সাহসের দাবি রাখে। সমগ্র উপন্যাসে জমিলা হয়ে উঠেছে অন্যায়, শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রাণধর্মের প্রতীক। ফলে জমিলাই এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা।

৩.৬.৩ রহীমা

'লালসালু' উপন্যাসের নায়ক মাজার ব্যবসায়ী মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমা। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মজিদের পাশেই তার স্থান। শক্তিময়ী লম্বা-চওড়া দেহের অধিকারিনী রহীমাকে দেখে একদা মজিদের বুকে আগুন ধরেছিল। কিন্তু এ তার 'বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠান্ডা, ভীতু মানুষ'। রহীমার রক্তে রাগ নেই, মজিদের প্রতি তার অটুট শ্রদ্ধা-ভক্তি। এককথায়, রহীমা স্বামীর একান্ত অনুগতা। 'সে যেন মহাব্বতনগর গ্রামের মানুষের সশ্রস্ত মানসের শরীরী রূপ।' শক্তিমত্তা নারীর চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। রহীমা সুর করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, গলা তার ভালো, পড়ার ভঙ্গীটিও সুন্দর। সে যখন তেলাওয়াৎ (ধর্মগ্রন্থ পাঠ) শুরু করে তখন 'একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।'

রহীমা সহজ, সরল। স্বামী মজিদ এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তার অনন্ত বিশ্বাস। স্বামীর কোন কথার প্রতিবাদ করে না সে। মাজার সম্পর্কে বা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা সব কিছুকে নির্বিচারে মেনে নেয় সে। রহস্যময় মাজারটির নিচে এক অলৌকিক শক্তি আছে বলে সে বিশ্বাস করে। আর এই বিশ্বাসের সূত্রেই তার ধারণা যে, মাজারের খাদেম, আল্লাতালার বান্দা তার স্বামী মজিদ একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। রহীমা বিশ্বাস করে, 'পৃথিবীর কোন সমস্যার সমাধান করাই' তার স্বামীর অসাধ্যসাধন নয়। মজিদের এই শক্তিই প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। গ্রামের মেয়েরা আসে তার কাছে সমস্যা নিয়ে। সরাসরি তারা যে কথা মজিদকে বলতে পারে না, সেকথা তারা রহীমা মারফৎ জানায়। মজিদ তাদের কাছে ধরা ছোঁয়ায় বাইরে। রহীমাই যেন গ্রামের নারীদের সঙ্গে মজিদের সংযোগ সেতু।

সন্তানহীনা হলেও রহীমা স্নেহপরায়ণা। গ্রামের দুঃখী, দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য তার চোখ ছলছল করে ওঠে। মাজারের সামনে গিয়ে কত সময় সে দাঁড়িয়ে থাকে ঘোমটা টেনে, মহাশক্তির কথা ভেবে তার বুকটা কেঁপে ওঠে। কখনো কখনো সে গোপনে সন্তান কামনা করে সেই মহাশক্তির কাছে, আবার কখনও সমস্ত মানবজাতির জন্য দোয়া করে। ছুনুর বাপ মরণ রোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে তার জন্য, অথবা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে খেতানির মা— তার জন্য শান্তি প্রার্থনা করে, করুণা ভিক্ষা করে। নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন আল্লা করুণা করেন—এই প্রার্থনা তার। স্বামীহারা হাসুনির মার দুঃখের একমাত্র সমব্যথী রহীমা। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান কামনায় রোজা রেখে মজিদের কূটকৌশলে মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে সেবা-শুশ্রূষার জন্য রহীমাই ছুটে আসে। নারীর জীবনে সবচেয়ে ঈর্ষার পাত্রী তার সতীন। কিন্তু রহীমা, সতীন হওয়া সত্ত্বেও জমিলাকে গভীর

স্নেহমমতায় জড়িয়ে ধরে এবং স্বামীর সমস্ত রোষ থেকে রক্ষা করে। কিশোরী জমিলাকে কেন্দ্র করে রহীমার মাতৃত্ব যেন এখানে ব্যক্ত হয়েছে। জমিলাকে কেন্দ্র করে মজিদ সন্ত্রস্ত হলে, রহীমা তাকে তার স্থির বুদ্ধির সাহায্যে আশ্বাস দেয় এই বলে যে, 'জমিলা ছেলে মানুষ, পরে অভিজ্ঞতা বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে। সে স্বামীর উদ্দেশে আরো বলে—'তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবো নি সব।'

রহীমার এই মাতৃত্ব উপন্যাসের শেষাংশে তার ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে পূর্ণতা দেয়। অবাধ্য জমিলাকে শাস্তি দিতে মজিদ তাকে মাজারের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে আসে। কিন্তু ক্রমে প্রকৃতি ও নারী মজিদের বিরুদ্ধে চলে যায়। রাতে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। যে রহীমা জীবজন্তু একদিন না খেলে অস্থির হয়ে ওঠে, অযথা ভাত নষ্ট হলে আফশোশ করে, সে রহীমা মাঠে মাঠে কটি ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। শুধু তাই নয়, যে-রহীমার স্বামী মজিদের প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, সেই রহীমা এইবার যেন স্বামীর বিপক্ষে চলে গিয়ে প্রতিবাদ করে বসে—'ধান দিয়া কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।'—এইখানেই নিঃসন্তান রহীমা তার স্নেহে এবং ব্যক্তিত্বে নারীত্বের পূর্ণতা পেয়ে যায়।

৩.৬.৪ খালেক ব্যাপারী

'লালসালু' উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্র খালেক ব্যাপারী। উপন্যাসের নায়ক মজিদ চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য এই চরিত্রটির বিশেষ ভূমিকা আছে।

মহাব্বতনগর গ্রামের সম্পন্ন ব্যবসায়ী হল এই খালেক ব্যাপারী। সে গ্রামের প্রধান মাতব্বর। মহাব্বতনগর গ্রামে এসে অস্তিত্বের সন্ধানে মজিদ প্রথম এই খালেক ব্যাপারীর বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। একটি পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে মজিদ প্রতিষ্ঠিত করে। মাজারের সংস্কার হয়। লালসালুতে তা আবৃত হয়। এই মাজারকে ঘিরে মজিদের অর্থ-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ ব্যাপারে খালেক ব্যাপারী তার কোন বিরোধিতা করেনি। বরং ধর্ম বিশ্বাস ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলায়। আসলে ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন যে, গ্রামের ভূমিমালিকরা সবক্ষেত্রেই এক, তারা শোষণের প্রতিভূ। তারা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে জিইয়ে রেখে সাধারণ মানুষকে তার দ্বারা শোষণ করে; তাদের মুক্ত চেতনার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

খালেক ব্যাপারী মজিদকে মেনে চলে, হয়ত বা কিছুটা ভয়ও করে। তাই তার স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান কামনায় আওয়ালপুরের পীরের কাছ থেকে পানিপড়া আনাতে চাইলে খালেক ব্যাপারী গোপনে তার শ্যালক ধলামিঞাকে দিয়ে তা আনাবার চেষ্টা করে। নির্বোধ, ভীরু ধলামিঞা ব্যাপারটা মজিদের কাছে ফাঁস করে দিলে মজিদ ক্রুদ্ধ হয় এবং চরম প্রতিশোধ নেয়। খালেক ব্যাপারী মজিদের সেই সিদ্ধান্তকে নির্দেশ মনে করে স্ত্রী আমেনাকে তালাক দেয়।

গ্রামের সমস্ত সামাজিক বিচারব্যবস্থায় খালেক ব্যাপারী মজিদের সহযোগী। উদ্ধত তাহের-কাদের-এর বাবাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে সে মজিদকে সাহায্য করে। ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ আক্কাস আলীর স্কুল খোলার প্রস্তাবকে মজিদ নাকচ করে দেয় খালেক ব্যাপারীর সঙ্গে আলোচনা করেই। এমনকি মজিদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আমেনা বিবিকে তালাক দিতে বললেও খালেক ব্যাপারী তার স্ত্রী নির্দোষ জেনেও তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। আসলে খালেক ব্যাপারী এক দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। গ্রামের মাতব্বর হলেও সে মজিদের অন্যায় নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। ফলে তার মত চরিত্রের পাশে সুযোগসন্ধানী ক্রুর মজিদ চরিত্র যেন অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩.৬.৫ আমেনা বিবি

সৈয়দ ওয়ীলাউল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'লালসালু'তে আমেনা বিবি একটি পার্শ্বচরিত্র। কিন্তু পার্শ্বচরিত্র হলেও উপন্যাসে তার গুরুত্ব কম নয়। ঔপন্যাসিক চরিত্রটিকে এনেছেন নায়ক মাজার ব্যবসায়ী ধর্মধ্বজী মজিদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এবং তার কাম প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে।

পূর্ববঙ্গের মহাব্বতনগর গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন ব্যবসায়ী খালেক ব্যাপারীর প্রথমা স্ত্রী আমেনা বিবি। শুভ্রবর্ণা রূপসী তরুণী আমেনা বিবি দাম্পত্যজীবনে সুখীই ছিল। স্বামীর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে তার কোন ত্রুটি বা ফাঁক ছিল না। তাঁর একমাত্র বেদনা ছিল সে নিঃসন্তান। আওয়ালপুরে যখন নতুন এক পীরের আবির্ভাব হয় তখন আমেনা খালেকের দ্বিতীয়া স্ত্রীর ভাই ধলামিঞাকে দিয়ে ঐ পীরের পানিপড়া আনতে চায়। আমেনার বিশ্বাস ছিল পীরের পানিপড়া খেয়ে সে সন্তান লাভ করবে।

কিন্তু ধলামিঞা এই পানিপড়া ব্যাপারটি মজিদের কাছে বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপিত করে। শুনে মজিদ ক্রুদ্ধ হয়। সে বুঝতে পারে আমেনা বিবির তার ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস নেই। তাই সে পীরের পানিপড়া খেতে চায়। মজিদের প্রতিহিংসা দুর্বার হয়ে ওঠে। সে খালেক ব্যাপারীর মনে সন্দেহ জাগায় এই বলে যে, আমেনা বিবির কোন গোপন গুনাহ্ বা পাপ আছে। তাই তাকে উপবাসী থেকে মাজার প্রদক্ষিণ করতে হবে। আমেনাকে নিয়ে পাল্কি করে ব্যাপারী মাজারের কাছে আসে। আমেনা যখন পাল্কি থেকে নামে তখন মজিদ তার রূপের অংশমাত্র, তার সুন্দর পা দুখানি দেখে কামনায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার মনে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য—'আবছা আলোয় দেখা কালোপাড়ের নীচে একটি সাদা কোমল পা'। আমেনা বিবির সুন্দর পা মজিদের ভেতরকার কামনার সাপটাকে জাগিয়ে তোলে। তাকে চাপা দিতে সে কণ্ঠে দোয়াদরূদের মিহি সুর তোলে।

উপবাসী আমেনা বিবি মাজার প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে ক্ষীণ দেহে জ্ঞান হারায়। মজিদের প্রথমা স্ত্রীর রহীমা তাকে আশ্রয় দেয়, বুকে টেনে নেয়। মজিদ ব্যাপারীকে বোঝায় আমেনার গুনাহ্ আছে। তাই সে মাজার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। তাকে তালাক দিতে হবে। বিপন্ন ব্যাপারী তার এতদিনের ঘর করা অপাপবিদ্ধ স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়।

বস্তুতঃ আমেনা বিবির তালাক দেওয়ার ব্যাপারটা মজিদ চরিত্রকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরে। মজিদ প্রতিহিংসাপরায়ণ এক ক্রুর চরিত্র এবং কামলোলুপ। তার চরিত্রের এই অন্তরস্বরূপকে উদ্ঘাটনের জন্য আমেনা বিবি চরিত্রের প্রয়োজন ছিল উপন্যাসে।

৩.৬.৬ আক্কাস আলী

'লালসালু' উপন্যাসে আক্কাস আলী একটি প্রতিবাদী চরিত্র। এই চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের নায়ক নকল মাজার ব্যবসায়ী মজিদমিঞার সংঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক চরিত্রের কপট রূপটি উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, খুব ক্ষীণভাবে হলেও, একটি প্রতিবাদী শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

মহাব্বতনগর গ্রামের মোদাবেরমিঞার সন্তান স্বাধীনচেতা যুবক এই আক্কাস আলী। মোদাব্বেরমিঞা মজিদের মুরিদ। কিন্তু মোদাব্বেরমিঞার মজিদের প্রতি যে আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে তা একান্তই মধ্যযুগীয়। আক্কাস আলী আধুনিক চেতনাসম্পন্ন ধ্যান ধারণার তরুণ যুবক। মাজারকে কেন্দ্র করে মজিদের সুযোগসন্ধানী কাজ করবার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা সে মেনে নিতে পারে নি। মজিদের নির্দেশে মহাব্বতনগরের অধিবাসীরা যে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসের

ঘেরা টোপে বন্দী আছে তা আক্কাসের পছন্দ নয়। সে গ্রামের মুরুব্বিদের মাথা গরম করবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলো। সে ঠিক করলো গ্রামে একটা স্কুল করবে। ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই বলে সে মনে করে। তার একথায় মুরুব্বিরা নড়েচড়ে বসে। তাদের বক্তব্য হল, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তারাও তো দু-একটা মক্তব বসিয়েছে। কিন্তু তরুণ আক্কাস এসব যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। ইস্কুলের জন্য সে দস্তুর মত চাঁদা তুলতে লাগলো। করিমগঞ্জের কাউকে দিয়ে একটা জোরালো আবেদন পত্র লিখিয়ে এনে সেটা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল, কারণ স্কুল করতে সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে, ফলে এসব কথা মজিদের কানে গিয়ে পৌঁছাল। মজিদ সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকল। সেখানে আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাব্বেরমিঞা এলো। সব রকমের প্রশ্নের জন্য আক্কাস তৈরি হয়ে এসেছিল। কিন্তু এরকম একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য সে তৈরি ছিল না। নীরব সভায় মজিদ অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলো এই বলে যে, 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?' আক্কাস ভেবে পেলো না স্কুল হবে কি হবে না সে আলোচনার মধ্যে দাড়ি রাখা না রাখার প্রসঙ্গ আসে কোথা থেকে। কিন্তু কূটকৌশলী মজিদ এই দাড়ি সম্পর্কিত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, গ্রামের সমস্ত সাচ্চা ইমানদার মুসলমান পুরুষের দাড়ি আছে, শুধু ইংরেজি শিক্ষায় বিপথগামী আক্কাসের দাড়ি নেই। আক্কাস একথার প্রতিবাদ করতে চাইলেও মুরুব্বিদের সামনে সংযত হয়ে নতমস্তকে চুপ করে রইল। এবার মজিদ আসল কথায় এলো। সে বললো—আক্কাস নাকি একটা ইংরেজি স্কুল খোলবার চেষ্টা করছে, একথা সত্য? আক্কাস অম্লান বদনে তা স্বীকার করে নিলো। মজিদ তার দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে—'তা এই বদ মতলব কেন হইল?' মজিদের এই প্রশ্নে আক্কাস চাবুকের মত জবাব দিয়ে বললো—'বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ কাইল ইংরাজি না পড়লে চলবো ক্যামনে?' কিন্তু একথা মজিদ হেসে উড়িয়ে দেয়, তারপর গম্ভীর হয়ে বলে—'ভাই সকল! পোলা মাইন্‌ষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকেছে—তা নিয়া আর কী কমু!' একথার বলার পর সুযোগসন্ধানী মজিদ নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করে বললো—'খোদার ফজলে এই গ্রাম যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী। অথচ এমন একটা গ্রামে পাকা মসজিদ নেই'। সভার সকলে মজিদকেই সমর্থন জানাল। 'আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।' আক্কাস ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল—'তয় ইস্কুলের কথাডা?' সকলে চমকে উঠে তার দিকে তাকায়। তার বাপ রেগে উঠে বলে, 'চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তজিমের মতো কথা কইস না।' এরপর সকলে মসজিদ নির্মাণের আলোচনায় মেতে ওঠে। আক্কাস তার পরাজয় স্বীকার করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বস্তুতঃ আক্কাস আলী চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন যে, মজিদ কিভাবে গ্রামবাসীদের আপন নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে চেয়েছে। ইংরেজি শিক্ষায় আধুনিকতার আলো আসলে মক্তব-মুখ্য মধ্যযুগীয় শিক্ষার ধারা মুখ থুবড়ে পড়বে। মজিদ চায় না, গ্রামবাসী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, তারা মধ্যযুগীয় অচলায়তন থেকে মুক্তি পাক। কারণ তাহলে তো মজিদের মত মিথ্যা মাজার ব্যবসায়ীর দিন শেষ হয়ে যাবে। তাই আক্কাসকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে তাকে বিপথগামী প্রতিপন্ন করে তার ইংরেজি স্কুল খোলার সংকল্পকে ধূলিসাৎ করে আপন কায়েম শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। মৌলবাদের কুফল দেখানোর জন্য ঔপন্যাসিক এই আক্কাস আলী চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন। স্বল্প রেখার আঁচড়ে হলেও চরিত্রটি কিন্তু পাঠকের মন কাড়ে।

৩.৬.৭ হাসুনির মা

'লালসালু' উপন্যাসে হাসুনির মা এক গৌণ চরিত্র। তবে চরিত্রটি গৌণ হলেও উপন্যাসের নায়ক ভণ্ড মাজার ব্যবসায়ী মজিদের জীবনে তার একটা ভূমিকা আছে।

হাসুনির মা পূর্ববঙ্গের মহাব্বতনগর গ্রামের এক জেদি বৃদ্ধের কন্যা এবং তাহের ও কাদেরের ভগিনী। যুবতী হাসুনির মা ব্যক্তিজীবনে ভীষণ দুঃখী। সে অল্পবয়সে স্বামীকে হারিয়েছে, শিশুপুত্র হাসুনিই তার সংসার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বিধবা হাসুনির মা শ্রমজীবিনী, সে পরের বাড়িতে ধান ভানে এবং নিজের রোজগারে জীবন নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সে স্বনির্ভর রমণী। তবুও বাবা-মায়ের আশ্রয়ে থাকে। বাবা খিটখিটে জেদি বুড়ো, মা প্রচণ্ড ঝগড়াটি। ফলে পারিবারিক জীবনে তার সুখ নেই। তাই সে শান্তির আশায় মজিদের প্রথমা পত্নী রহীমার কাছে আসে, তার দুঃখের কথা বলে—'ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।.....জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।' তার একথায় রহীমা, হাসুনির কি হবে জিজ্ঞাসা করলে সে হাসুনিকে তাকে দিয়ে দিতে চায়। সে রহীমার বাড়িতে ধানভানা ও সেদ্ধর কাজ করে। আগুনে সেদ্ধরত হাসুনির মার অনাবৃত কাঁধ ও বাহু দেখে রাতের অন্ধকারে মজিদ কামাসক্ত হয়ে পড়ে। মজিদ চরিত্রের এই কাম প্রবৃত্তিকে দেখাতে ঔপন্যাসিক হাসুনির মা চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন।

উপন্যাসে হাসুনির মাকে আমরা প্রথমে দেখি তাদের পারিবারিক বিবাদে, বাবা-মা'র ঝগড়ার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে সে রহীমার কাছে এসেছে মুক্তি প্রার্থনা করতে। রহীমার কাছে সে আর্জি জানিয়েছে তার অশান্তিকারী বাবা-মাকে যেন খোদাতালা নিয়ে যান—'ওনারে কইবেন—বুড়াবুড়ী দুই গারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতালা।' হাসুনির মা যৌবনবতী। যৌবনের সব আকাঙ্ক্ষা তার মেটেনি স্বামীর অসময়ে মৃত্যুতে। তাই প্রকৃতিতে যখন পূর্ণতা আসে তখন হাসুনির মায়ের মনেও চঞ্চলতা জাগে। দ্বিতীয় বিবাহের স্বপ্ন জাগে তার। নিজের সঙ্গে নিজে সে ঠাট্টা করে—এই বলে—'নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?' মানুষ নিজের সঙ্গে মশকরা তখনই করে যখন সে ভাগ্যের কাছে হেরে বসে থাকে। হাসুনির মা এরকমই একটি অসহায়া নারী চরিত্র। এই হাসুনির মাকে বৃদ্ধ পিতা মারে। এ সম্পর্কে মজিদ একদিন বুড়োকে ডেকে পাঠায় এবং এই কাজের কৈফিয়ত তলব করে। অসন্তুষ্ট মজিদ ফতোয়া দেয় কন্যা হাসুনির মায়ের কাছে বৃদ্ধকে ক্ষমা চাইতে হবে। বৃদ্ধ ভেঙে পড়ে, বাড়ি গিয়ে হাসুনির মায়ের কাছে ক্ষমাও চায় এবং শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়।

৩.৭ উপন্যাসের মূল দুই চরিত্রের সংঘাত : মজিদ বনাম পীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন নিপুণ দক্ষ চরিত্রশিল্পী, জীবনাভিজ্ঞতার রূপকার তিনি। তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসটি এক জীবনবীক্ষকের ভূমিকা থেকে লেখা। জাতিতে মুসলিম হয়েও মৌলবাদী ধ্যান-ধারণার এমন নগ্ন প্রকাশ তাঁর যথেষ্ট মুনশিয়ানার দাবি রাখে। এই উপন্যাসে নায়ক মাজার ব্যবসায়ী এক ধূর্ত চরিত্র মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ তিনি আওয়ালপুরের এক পীরের চরিত্র অঙ্কন করেছেন কাহিনিতে contrast সৃষ্টির জন্য।

উপন্যাসকাহিনির মধ্য পর্বে যখন নায়ক মজিদ নকল মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দৌলতে ধর্মভীরু মুসলমান সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করেছে, তখন সাময়িক ভাবে সেই প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরেছে অপর আর এক পীরের আগমনে। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন, "দিন কয়েক হল, তিন গ্রাম পরে এক পীরসাহেব এসেছেন।' ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর "পুরানো মুরিদ"। এই পীরসাহেবের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এক কালে নাকি তার চোখে আগুন ছিল, আর কণ্ঠে ছিল বজ্রনিনাদ। তার পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক স্থান থেকে খোদার বাণী প্রচার করতে এদেশে আসেন। তাঁর খড়্গনামা গৌরবর্ণ চেহারায় মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে একটা দূর সংযোগ অনুভব করা যায়। তিনি উত্তর ভারতের উর্দুভাষাও এস্তেমাল করে এসেছেন। তাঁর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে নানা কথা জনসমাজে প্রচলিত আছে। পীরসাহেবের আগমনে তাই মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার "ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো

মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।" পীরসাহেবের অলৌকিকতা সম্পর্কে কৌতূহল জাগে মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমার মনেও। রহীমা মজিদকে প্রশ্ন করে, "তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?"—একথায় মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে, ক্রুদ্ধ হয় সে। রহীমা চুপ করে যায়, একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মজিদ বোঝে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে, আজও তার চোখে পড়েছে মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে দলে দলে মানুষের আগমন। ফলে আর চুপ করে থাকা যায় না। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য তার ক্রোধ আর ঘৃণা রক্তের মধ্যে টগবগ করে ফুটতে থাকে। একসময় ভাবে তার তৈরি নকল মাজারটির কথা সকলকে বলে দিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে হাসবে। তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান নেওয়া হবে তার, তৃপ্ত হবে তার মন। কিন্তু সব ক্রোধ রাতের অন্ধকারে নিষ্ফল হতাশায় পর্যবসিত হয়। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে একটি 'চিকন বুদ্ধি-রশ্মি' তার মাথায় খেলে যায়।

পরের দিন মজিদ যখন আওয়ালপুরে এই পীরের তত্ত্ব জানবার জন্য পৌঁছলো, তখন সূর্য প্রায় হেলে পড়েছে। এক বটগাছের তলায় পীরসাহেব বসে আছেন। তাকে ঘিরে আছে একরাশ জনতা। পীরসাহেবের মুরিদ মতলবমিঞা তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে যে, 'তিনি প্রয়োজনে সূর্যকেও থামিয়ে দিয়ে নামাজের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে পারেন।' একথা শুনে জনতা আহা আহা করে ওঠে, কেউ বা উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেলে। এরপর পীরসাহেব ক্ষীণস্বরে ওয়াজ করেন আধঘন্টা ধরে এবং শেষে ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ শেষ করেন। ভক্তরা তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে। পীরসাহেব তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বটগাছের একটি ডালে উঠে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি নেমে আসেন এবং জোহরের নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নেন।

বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে, পীরসাহেবের নির্দেশে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় "খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায়" আর্তনাদ করে উঠলো মজিদ। বলতে লাগল—"যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজ কারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা!" মজিদ পীরের এত ভক্তকে দিয়ে গাছের ছায়া মাপিয়ে দেখায় জোহরের নামাজ পড়ার সময় চলে গেছে। সে জনতাকে গালিগালাজ দিয়ে প্রশ্ন করে—"....তোগো পীর ধইরা রাখবার পারল না সুরুয়টারে?" এইভাবে মজিদ সবার সামনে প্রতিপন্ন করতে চাইলো যে, পীরের কোন অলৌকিক শক্তি নেই, সব বুজরুকি। এইভাবে সে মহাব্বতনগরের মানুষগুলিকে পীরের কাছ থেকে সরিয়ে আনলো এবং নিজেও গ্রামে ফিরে এলো।

কিন্তু এইখানেই শেষ হ'ল না মজিদের প্রতিহিংসা। সেই রাতে মজিদের প্রধান মুরিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে এক জরুরি বৈঠক বসে। সেখানে মজিদ পীরকে শয়তান প্রতিপন্ন করে, তার বিরুদেধ মহাব্বতনগর গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করে তোলে। সে আরও বলে, ঐ পীরের উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে চালিত করা, খোদার পথ থেকে তাদের সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। এইসব শুনে পরদিন দুপুরে একদল যুবক মহাব্বতনগর গ্রাম থেকে অতিয়ালপুর গ্রামে যায়, একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীরসাহেবের সভায় উপস্থিত হয়। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা উভয়পক্ষের মারামারি রক্তারক্তি কাণ্ডে গড়ায় এবং মহাব্বতনগরের আহত মানুষদের আশ্রয় নিতে হয় করিমগঞ্জের হাসপাতালে। মজিদ নিজে গিয়ে আহত মানুষগুলোকে দেখে আসে এবং গ্রামের ফিরে তাদের আত্মীয়দের সান্ত্বনা দেয়।

আওয়ালপুরের পীরের প্রতি মজিদের বিতৃষ্ণা দ্বিতীয়বার দেখা দেয় খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবিকে কেন্দ্র করে। নিঃসন্তান আমেনা বিবি আওয়ালপুরের পীরের পানিপড়া খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে কথা মজিদের কানে গিয়ে পৌঁছয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ মজিদ আমেনা বিবির নিঃসন্তান থাকার একটি কাল্পনিক কারণ দেখায়। কোন গোপন অপরাধের জন্য আমেনা বিবির পেটে সাতবেড়ির প্যাঁচ পড়েছে। এই প্যাঁচ খোলার জন্য মজিদের পানিপড়া খেয়ে

বিবিকে মাজার প্রদক্ষিণ করতে হবে। মাজার প্রদক্ষিণকালে উপবাসী আমেনা বিবি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মতলববাজ মজিদ এই ঘটনাকে আমেনা বিবির চারিত্রিক ত্রুটিরূপে নির্দেশ করে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তার এই নিরপরাধ প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায়। আওয়ালপুরের পীরের প্রতি ক্রোধ শেষ পর্যন্ত অসহায়া একটি নারীকে বিনাদোষে বিবাহ-বিচ্ছিন্না রমণীতে পরিণত করে।

বস্তুতঃ আওয়ালপুরের পীরের সঙ্গে মজিদের সংঘাত থেকে উভয়ের চরিত্ররূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে নিজে দুর্বল হলেও মহাব্বতনগরের ধর্মভীরু সরলবিশ্বাসী মানুষগুলিকে সহজেই সে তার বশীভূত করে। তুলনা করলে দেখা যাবে ওয়ালপুরের পীরের চরিত্রটি মজিদের তুলনায় অনেক শান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁর কিছু কিছু আছে। তার চেলাদের সঙ্গে মজিদের ভক্তদের সংঘাতের পর তিনি কিন্তু প্রতিশোধ নিতে মহাব্বতনগরে কাউকে পাঠান না। বরং তিনি নিজেই গ্রাম ছেড়ে চলে যান। ফলে মজিদের প্রতিষ্ঠার ভিত আরও শক্ত হয়।

এক পৌষের সন্ধ্যেবেলায় হাসুনির মা রহীমার বাড়িতে ধান ভানতে ও সেদ্ধ করতে যায়। খড়কুটো আগুন জ্বালিয়ে হাসুনির মা ও রহীমা ধান এলানো, সেদ্ধ করা ইত্যাদি কাজ করতে থাকে। মজিদ তাকে একটি কালোপাড় বেগুনী রঙের নতুন শাড়ী এনে দেয়। কাজ করতে করতে রাত গভীর হয়। শেষরাতে মজিদ একবার ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে আসে। তার চোখে পড়ে খড়ের আগুনের রক্তিম আলো হাসুনির মায়ের দেহে প্রতিফলিত হয়েছে— 'সেই ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরণে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃন উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।' মজিদ ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে আশপাশ করে। হাসুনির মায়ের অনাবৃত আগুনে রাঙা শরীর দেখে তার বুকের রক্ত তোলপাড় করে ওঠে। হাসুনির মাকে কেন্দ্র করে তার অভ্যন্তরের কামার্ত মানুষটির আত্মপ্রকাশ ঘটে, খসে পড়ে তার ধর্মপন্থী সত্তার আবরণটি। বস্তুতঃ উপন্যাসে মজিদ চরিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য হাসুনির মা চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল।

৩.৮ উপন্যাসের ভাষা

উপন্যাস হলো গদ্যে লেখা মহাকাব্য। ফলে তার বাণীরূপকে হতে হয় সহজ, সরল নিপাট গদ্য, যেখানে জীবনের সবটুকু রূপই ধরা পড়বে। তবে ঔপন্যাসিক যদি হন শক্তিমান কথাশিল্পী তাহলে তাঁর রচিত সাহিত্যে ভাষার গায়ে লাগে চাকচিক্য। সাধারণতঃ উপন্যাসে বর্ণনা এবং সংলাপ—এই দুইভাবে কাহিনি দানা বেঁধে ওঠে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচিত 'লালসালু' উপন্যাসেও আমরা ভাষার এই দুই রূপকেই প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এই দুইরূপের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় তাঁর নিজস্ব কিছু বৈচিত্র্য-ব্যবহার দেখার মত। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় 'মেটাফোর' বা রূপকঅলঙ্কারের ওপর ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, মেটাফোর বা রূপকঅলঙ্কার চর্চা সাপেক্ষ নয়, তা প্রতিভা নির্ভর। ফলে চর্চা করে তাকে আয়ত্ত করা যায় না, তার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হয়। ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু' উপন্যাসটি পাঠ করবার সময় আমার ঠিক একথাই মনে হয়েছিল। যিনি দক্ষশিল্পী, ভাষা তাঁর প্রতিভার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।

'লালসালু' একটি সামাজিক উপন্যাস। কৌশলী মজিদ ধর্মের নামে মৌলবাদের শিকড় গাড়তে চায় মহাব্বতনগর গ্রামে। সে বেশকিছুদিন শস্যহীন জনহীন প্রান্তরে কাটিয়েছে। তারপর সেখান থেকে সে গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে ইমাম হয়ে বসতি স্থাপন করে। সেখানকার নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপিয়ে উঠে সে একদিন মহাব্বতনগর গ্রামে এসে উপস্থিত

হয়। মজিদের উপস্থিতি বোঝাতে ঔপন্যাসিক একটা প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টি করলেন এইভাবে—'একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই।' অর্থাৎ একটা স্থির দিগন্তভূমির ছবি তৈরি করে লেখক একটা শান্ত জনজীবনের পরিচয় দিলেন। এই রকম একটা পরিবেশে একটি লোক মোনাজাত শেষ করে গ্রামে প্রবেশ করে—এই লোকটিই মজিদ। অর্থাৎ মজিদের প্রবেশটা যে নাটকীয় তা বোঝাতে লেখকের এই ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি জানাচ্ছেন, 'নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।' অর্থাৎ শীর্ণ, কোটরাগত আঁখি বিশিষ্ট মজিদ যে খুব সুবিধের মানুষ নয়, এবং তার চোখে যে একটা তীব্র কটাক্ষ আছে তা বোঝাতে এখানে 'আগুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ভণ্ড মজিদ মহাব্বতনগর গ্রামের সরল মানুষগুলোকে ক্রমে নিজের আয়ত্তে আনে। একটা ভাঙা ইঁটের পাঁজারকে মিথ্যা মোদাচ্ছের পীরের মাজার তৈরি করে সেখানে যে কায়েম হয়ে বসে। সে জানায় একটা স্বপ্নই তাকে এখানে টেনে এনেছে। এ গ্রামের লোকগুলোর অবস্থা এখন অবস্থাপন্ন হয়েছে, কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম—একথা সুযোগসন্ধানী মজিদ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল এবং তারই পূর্ণ সুযোগকে সে সদ্ব্যবহার করল। উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা এবং সংলাপে ক্রমে এগিয়ে চলতে লাগলো। মজিদের ঘর, বাড়ি, অর্থ সব হলো। একদিন সে রহীমা নামে এক নারীকে বিবাহও করল। শক্তিমত্তা রহীমার 'উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়'। অর্থাৎ মজিদ সেই নারী কামনা করেছিল যে তার প্রভুত্বকে মেনে নেবে। এ গ্রামের মানুষগুলোও যেন রহীমারই সংস্করণ।

এরপর উপন্যাসে আছে মাঠের বর্ণনা। এ গ্রামের মানুষগুলো নিজেরে মধ্যেকার হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে মাঠে নামে। বুকের রক্ত দিয়ে তারা জমিকে রক্ষা করে। রাত-দিন তারা জমিতে হাল দেয়। এই মাঠের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক লিখলেন—'....মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ।' অথবা যখন রোদ চড়া হয় তখন 'শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলে পুড়ে মরে।'—এ বর্ণনা অবশ্যই কাব্যিকতাকে মনে করিয়ে দেয়।

উপন্যাসে তাহেরও কাদেরের বৃদ্ধ বাপের একটি চরিত্র আছে। সে ভীষণ বদমেজাজী; তার কন্যা হাসুনির মার ওপর সে অকথ্য অত্যাচার করে, স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন ঝগড়া-ঝাঁটি করে। হাসুনির মা বিধবা নারী, সে এই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মজিদের স্ত্রীর রহীমার কাছে এসে নালিশ করে। মজিদ সভা ডেকে সেই বৃদ্ধকে মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেয়। ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে আসে। সে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো কথা কয় না, চুপ করে পড়ে থাকে। দুদিন পর প্রবল ঝড় ওঠে, 'আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহাব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখীর মতো আছড়াতে থাকে।' 'সর্বোচ্চ তালগাছটি' যেন মহাব্বতনগরের সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটি অর্থাৎ হাসুনির বাপের প্রতীক হয়ে ওঠে। মান-সম্মান হারিয়ে সে তখন 'বন্দী পাখীর মতোই' আছড়াতে থাকে এবং সেই দিন সন্ধ্যায় সে চিরদিনের মতো চলে গেল। উপন্যাসের নায়ক মজিদ এক কপট ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী, কামলোলুপ চরিত্র। বিধবা হাসুনি কাজের সূত্রে তার বাড়িতে এসেছে। হাসুনিকে সে একটা কালোপাড় বেগুনি রং-এর শাড়ি দিয়েছে। লেখক মজিদের কামুক চরিত্র বর্ণনার পটভূমি হিসেবে গভীর পৌষের শীতের রাতকে বেছে নিয়েছেন। সারা রাত ঠাণ্ডায় রহীমা এবং হাসুনির মা ধান সেদ্ধ করে। খড়কুটোর আগুন জ্বালায় তারা, গনগনে সেই আগুনের শিখা যেন আকাশটাকে গিয়ে ছোঁয়—'ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের।' যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।' এখানেও অনবদ্য অলংকারের ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। সেই আলোয় মজিদের চোখ 'অন্ধকারে চক্ চক্ করে'। বিছানায় শুয়ে মজিদ কামনায় ছট্ ফট্ করে। রহীমাকে ডাকে।

লেখক রহীমার বর্ণনা দিলেন এভাবে— 'রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে।...তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোঁকে।' এ বর্ণনা আমাদের যেন জীবনানন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মজিদ শুধু ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, কামুক চরিত্র নয়, সে অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণও বটে। আওয়ালপুরের পীরসাহেব এসেছেন গ্রামে। মানুষের দলে দলে তাঁর কাছে যাওয়ার ছবিটা মজিদকে ক্রমশঃ বিভ্রান্ত করেছে। মজিদ ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং একসময় এইসব শয়তানির প্রতিবাদ করতে সে পীরসাহেবের জমায়েতে অংশ নিয়েছে। নামাজ শুরু হয়েছে, এমন সময় মজিদের চীৎকারে নীরবতা ভঙ্গ করে সমগ্র মাঠটা কেঁপে উঠলো। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখলেন—'শতশত নামাজ-রত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠলো।' মজিদ কতটা হিংস্র এটা বোঝাতে লেখক 'খ্যাপা কুকুরে তীক্ষ্ণতায়' এই উপমা ব্যবহার করলেন। আবার আমেনা বিবির রূপে মুগ্ধ মজিদের বর্ণনা দিতে গিয়েও তিনি লিখলেন—'সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে-পায়ে।' এই সুন্দর পা-ই মজিদের মনে 'বিষ' সৃষ্টি করে। 'তার জিহ্বা লিক্‌লিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ।' বেশকিছুদিন কেটে যায়। একদিন সকালে যখন ফাল্গুনের হাওয়া বইছে তখন মজিদ চলেছে মাঠের দিকে। এমন সময় আকস্মিক একটা দমকা হাওয়া মজিদের মনের এক অতল অঞ্চলকে যেন মথিত করে তুললো। ধুলোওড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের মনে হল তার অতিক্রান্ত জীবনের কথা। প্রায় দশ-বারো বছর হল সে এসেছে মহাব্বতনগরে। যেদিন এসেছিল সেদিন সে ছিল দুঃস্থ ভাগ্যান্বেষী মানুষ। কিন্তু আজ সে 'সম্মান প্রতিপত্তির মালিক'। অথচ তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। সন্ধ্যায় দরদ পড়তে থাকে মজিদ। তারপর মাজারের দিকে তাকায়। একটা শূন্যতা বুক ঠেলে উঠে আসে। মৃত মানুষের এই কবরটা কার তাও সে জানে না। অথচ এই কবরই তার অর্থ-প্রতিপত্তি-মান-যশের কারণ। মজিদের এই আত্মবিশ্লেষণকে লেখক এক অভাবনীয় উপমার আশ্রয়ে বাণীরূপ দিলেন—'ভেতরটা কিসের ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়।' এ উপমা যেন রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষার কথা মনে করিয়ে দেয়। এইভাবে ওয়ালীউল্লাহ্ মজিদের নিঃসঙ্গতার ছবি ফুটিয়ে তুললেন উপন্যাসে। 'পাথরের মতো ভারী নীরবতাকে' ভাঙতে মজিদ দ্বিতীয় বিবাহ করল, ঘরে এলো কিশোরী জমিলা।

কিশোরী জমিলা ক্রমে মজিদকে ভাবিয়ে তুললো। সে মজিদের প্রভুত্বকে উপেক্ষা করল। জমিলাকে কেন্দ্র করে মজিদ যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সেইসময় একদিন সকালে একটা খ্যাংটাবুড়ী পুত্রশোকে আকুল হয়ে মাজারে এসে আর্তনাদ শুরু করলো। তার নালিশ খোদার বিরুদ্ধে, কেন তিনি তার একমাত্র পুত্রকে কেড়ে নিয়েছেন। এই বুড়ীর আর্তনাদ প্রসঙ্গে লেখক লিখলেন—'তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেলো।' আর এই বিলাপই কাল হলো মজিদের কাছে। মজিদ যখন বুড়ীকে অনেক বুঝিয়ে মাজার থেকে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরলো, তখন দেখলো জমিলা দাঁড়িয়ে আছে—'পাথরের মতো মুখ-চোখ' তার। এই বর্ণনাই বুঝিয়ে দেয় জমিলা মাজারকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না তার স্বামীর ঐশী শক্তিকেও। সেই থেকে জমিলা পুরো বদলে গেল—'তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।' চোখের এ বর্ণনা অনবদ্য। জমিলার প্রতিবাদ চরমে ওঠে। মজিদ তাকে বোঝায়, মানুষের রূপ দিয়ে কিছু হয় না, গুণই তার আসল কথা। মজিদের একথায় জমিলা যেন বিপদের আভাস পায়—'শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।' এ উপমার তুলনা কোথায়। উপন্যাসের একে বারে শেষে যখন প্রকৃতি এবং নারী উভয়েই মজিদের বিপক্ষে চলে যায়, তখন একান্ত অসহায় মজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক লিখলেন তার অনবদ্য লেখনীতে— 'মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়।'

বস্তুতঃ 'লালসালু' উপন্যাসটি মজিদ নামক একটি ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীর চরিত্র উদ্‌ঘাটনের উপন্যাস। এই চরিত্রটিকে রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্ দক্ষ ভাষাশিল্পীর নিপুণতায় তাকে পরিস্ফুট করলেন। কতগুলি সার্থক ইমেজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্তরূপ দিলেন। মনে হয় একজন কথাশিল্পী তখনই সার্থক হন যখন তাঁর মধ্যে একজন কবি বাসা বাঁধে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ক্ষেত্রে তেমনটি হওয়াতে তাঁর উপন্যাসটি যেন বাস্তবকে স্বীকার করেও কবিত্বের কোন সুদূরে পাঠককে পৌঁছে দিতে পেরেছে। ভাষাশিল্পী হিসেবে এখানেই তাঁর সার্থকতা।

৩.৯ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। উপন্যাসের নামকরণ কতখানি সার্থক আলোচনা করুন।

২। উপন্যাসের নায়ক মজিদ চরিত্রের বিশ্লেষণ করুন।

৩। উপন্যাসের নায়িকা কে—রহীমা না জমিলা?—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৪। 'উপন্যাসের একমাত্র প্রতিবাদী চরিত্র জমিলার'—আলোচনা করুন।

৫। রহীমা চরিত্র আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন সে জমিলার একেবারে বিপরীত একটি চরিত্র।

৬। উপন্যাসের নায়ক মজিদের সঙ্গে আওয়ালপুরের পীরের যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল তা বর্ণনা করে মজিদ চরিত্র উদ্‌ঘাটন করুন।

৭। উপন্যাসে 'আক্কাস আলী' চরিত্রের গুরুত্ব কতখানি—ব্যাখ্যা করুন।

৮। উপন্যাসে আমেনা বিবির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৯। মজিদের জীবনে হাসুনির মার স্থান কতটুকু?

১০। উপন্যাসে মজিদ-জমিলার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

১১। 'লালসালু' উপন্যাসটি এক দক্ষভাষা শিল্পীর রচনা—উপন্যাসের ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের যথার্থ নিরূপণ করুন।

১২। উপন্যাসের প্লট সম্পর্কে আলোচনা করে দেখান যে এটি একটি সার্থক উপন্যাস।

১৩। উপন্যাসে খালেক ব্যাপারী চরিত্রের পরিচয় দিন।

৩.১০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। 'মোনাজাত' শব্দের অর্থ কি? মতিগঞ্জের সড়কের ওপরে কাকে 'মোনাজাত' করতে দেখা গিয়েছিল? তার চেহারার বর্ণনা দিন।

২। 'আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিনদিনের পথ।'—কার কথা? সেখান থেকে সে চলে এসেছিলো কেন?

৩। কাদের ও তাদের-এর পরিচয় দিন।

৪। 'বুত-পূজারী' কথার অর্থ কি? যারা বুত-পূজারী তারা গুনাগার কেন?

৫। 'মজিত ধরাছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা'—একথা কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে? কেন তাদের কাছে মজিদ ধরাছোঁয়ার বাইরে বুঝিয়ে বলুন।

৬। 'মহাব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে।'—কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? এই শক্তির মূল উৎস কি?

৭। খালেক ব্যাপারী কে? তার পরিচয় দিন।

৮। মতলুব খাঁ কে? তাঁর আশ্রয়ে কে এসে উঠেছিল? তাঁর পরিচয় দিন।

৯। ধলামিঞা কে? তার পরিচয় দিন।

১০। আক্কাস কে? সে কোন ভাবনা নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেছিলো? তার ভাবনা কি ফলপ্রসূ হয়েছিল?

১১। 'পাগলী ঝিটা'।—কার সম্বন্ধে কে এই উক্তি করেছে এবং কেন করেছে বুঝিয়ে বলুন।

১২। 'আর মেহেদি দেওয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে'—একথার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কোন সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

১৩। 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ'—কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে এবং কেন বলা হয়েছে?

৩.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

'বাংলাদেশ : সংস্কৃতি ও সাহিত্য' □ ক্ষেত্র গুপ্ত; কলকাতা, ২০০১

'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' □ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; কলকাতা, ১৯৮৭

'বাংলাদেশের উপন্যাস: চার দশক' □ কল্যাণ মিরবর; কলকাতা, ১৯৯২

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্' □ আবদুল মান্নান সৈয়দ; ঢাকা, ১৯৮৬

'একুশে ফেব্রুয়ারী' সম্পাদনা : □ জিয়াদ আর্লি; কলকাতা, ১৯৮০

'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা' সম্পাদনা : □ নির্মল দাশ; কলকাতা, ১৯৯৪

'বাংলাদেশের সাহিত্য' □ বিশ্বজিৎ ঘোষ; ঢাকা, ১৯৯১

'পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা' □ সাঈদ-উর রহমান; ঢাকা, ১৯৮৬

'রাজনৈতিক চেতনা, বাংলাদেশের কবিতা' □ আমিনুর রহমান সুলতান; ঢাকা, ১৯৯২

'বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ' □ রফিক উল্লাহ্ খান; ঢাকা, ১৯৯৭

একক ৪ ❑ 'কবর' : মুনীর চৌধুরী

[মঞ্চে কোনরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

দৃশ্য ঃ গোরস্থান। সময় ঃ শেষ রাত্রি।

তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কাল কাপড়ের মজবুত পর্দার দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কি ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চের ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্লাস, খালি। একটি রুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এই মাত্র তাহার উপর কেহ বসিয়াছিল। এই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবার ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতরে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল—]

নেতা। গার্ড! গার্ড!

[নীল কোর্তা, পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরী ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক; কিন্তু আপাততঃ একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্তভাব। হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ]

গার্ড। জী-হুজুর! [দ্রুত নিঃশ্বাস]

নেতা। কি রকম গার্ড দিচ্ছ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা? ছিলে কোথায় এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ডাক্‌ছি কোন সাড়া নেই।

গার্ড। পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠাণ্ডা আর আন্ধার হুজুর যে, কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা। তোমার পোস্টিং কোথায় ছিল?

গার্ড। ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারের শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা। ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছো? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন?

গার্ড। [চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে।] ওহ! এ্যা পইড়া গ্যাছলাম। তারাতারি কইরা আইতে গিয়া পইড়া গ্যাছলাম। গর্তের মধ্যে।

নেতা। গর্তে?

গার্ড। কবর। পুরান কবর হইব। একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই একদম ভস্ কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা। Idiot! চোখ মেলে পথ চলো না? খেলার মাঠ পেয়েছ না কি? এটা গোরস্থান! সাবধানে পা ফেলতে পার না? যাও ডিউটিতে যাও।

[অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোট-মাফলার-চাদরে জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।]

গার্ড। জী-হুজুর। [স্যালুট]

নেতা। যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে গোড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোন কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম। বাতিটা জ্বালিয়ে নিও।

গার্ড। জী হুজুর। [স্যালুট। প্রস্থান]

ব্যক্তি। [নেতার পিছন হইতে] তখনই বলেছিলাম স্যার এসব আজেবাজে লোক—

নেতা। [চমকাইয়া] কে? তুমি কে?

ব্যক্তি। আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা। ওহ্। আপনি! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চম্‌কে উঠেছিলাম। ভবিষ্যতে এরকম আর করবেন না। না, ভয় পাই নি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারে নি। তবু ডাক্তার বলেছে আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কি বলছিলেন বলুন—

[বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে। ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতের দিকে।]

হাফিজ। এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পণ্ড করাতেই বেটারা বেশী পটু।

নেতা। তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটতো না।

হাফিজ। এ'টা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এ জন্যেই ত আজকাল কোন অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এ-গুলো খুঁজে পাবেন না স্যার!

নেতা। হুম্ [ব্যাগটা আবার দেখেন। চারিদিকে কি যেন খুঁজিতেছেন।]

হাফিজ। তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তাছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোন দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর! গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার ওপর শীতের মধ্যে মধ্যে আপনি কষ্ট করে—

নেতা। কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন! [দাঁড়াইয়া পড়িয়া খুঁজিতে থাকে]

হাফিজ। কিছু খুঁজছেন স্যার?

নেতা। হাঁ। একটা বোতল, ঐ গ্লাসটার পাসেই ছিল। ভূত জিনে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করলেও, তারা কেউ এসে একেবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে—মনে হয় না। একটু আশে-পাশে খুঁজে দেখুন ত, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি!

হাফিজ। ব্যাগের ভিতর পুরে রাখেননি ত?

নেতা। না। ওগুলো ভরা বোতল। এটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ। ওহ! তাইতো এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা! না না। ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতলটা কি রকম স্যার?

নেতা। না খেয়ে থাকলে বোঝান যাবে না।

হাফিজ। না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ—গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা। ওহ্! খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ। [দর্শকদের দিকে পিছন দিয়া, মঞ্চের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কি খোঁজে। তারপর মাটিতে একবার হাত ঠেকাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠে।] পেয়েছি! পেয়েছি! স্যার! এই যে! এইটে না স্যার? [একটা খালি মদের বোতল তুলিয়া দেখায়।]

নেতা। অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে কোন দিন ভয় পাইনি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্থান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে। আপনাকেও বলেছি একবার। দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ। কিন্তু, মানে, একদম খালি যে স্যার!

নেতা। তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতল শুদ্ধো সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্যে—এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্ততঃ ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ। ভয়? কি যে বলেন স্যার! মানে আমি ভেবেছিলাম হয়ত এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগেই ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরই হয়ত আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামী জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার!

নেতা। আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েৎ সরকারী কর্মচারী। এত দরদী লোক বুঝিনি।

হাফিজ। সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা। আপনার এ চাকরী নেয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আপনার পা শুদ্ধো কাঁপছে।

হাফিজ। অ্যা! পা? টলছে—মানে, কাঁপছে? ওহ! হ্যাঁ, তাইতো ইস কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা? [নেতা তখন হোৎকা পোর্ট ফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।]

নেতা। ওদিককার কাজ কত দূর এগুলো? আর কতক্ষণ দেরী হবে?

হাফিজ। প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে যেত। দু-একটা গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে—কখন সব শেষ করে ফেলতাম!—

নেতা। গোলমাল! এখানেও গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ। কি যে বলেন স্যার! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু' একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরী হয়ে গেল।

নেতা। আপত্তি? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোন গোলমাল করেন নি তো? আপনাকে তো বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেবো। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ। সে কি স্যার আমি বুঝিনি? সরকারের কাজে সরকারী টাকা খরচ করতে আমি পেছ-পা হব কেন? তবে ঐ ছোটলোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা—তাইতেই 'ত যত ফ্যাকড়া বাদে। মজুরী ত ষোল আনা আদায় করবেই, তার ওপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টিনষ্টি! কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার!

নেতা। আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কি ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ। হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে হেঁচড়ে গাড়ীতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায়নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা। এসব কাজে নার্ভাস হলে এতবড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি, আমার হার্ট একটু উইক। বেশী স্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ। যা হবার তাই হয়েছে। টানা হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ীর মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরোগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বোঝবার উপায় নেই, কোনটার সঙ্গে কোনটা যাবে।

নেতা। তাতে কি হয়েছে। [নূতন বোতল খুলিবে]

হাফিজ। আরেকটা খাচ্ছেন স্যার? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বল্লাম আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কি দরকার। একটা বড় মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা। Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতেই হবে! সকাল বেলাই একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেণ্ডেশন লিখে দেবো।

হাফিজ। মেহেরবানী স্যার! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনও সেই দশা! যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কি করে? আমাদের তো কোন রাজনীতি নেই স্যার! সরকারই মা বাপ! যখন যে দল হুকুমত চালায়, তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা। এর মধ্যে গোলমালটা কিসের? আপত্তি উঠলো কোথায়?

হাফিজ। এ্যা? ওহ্! ইয়ে—মানে, ঐ গোরখুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা "কভি নেহী।" বলে কিনা 'মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই!—তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না-এ হ'তে পারে না, কভি নেহী!" গোঁ ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা। আহাম্মকী করেছেন। সরকারী কাজ করেন কিনা! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশীমত কাজ করতে দিলে আপনার ইজ্জত ডুবত? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে—আজান পড়বে—কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন?

হাফিজ। আমি স্যার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা। তা'হলে এতক্ষণ দেরী হচ্ছে কেন?

হাফিজ। ঐ তখনই ত স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাকড়া বাধল। কোত্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা। কে? তোমাকে এতবার করে বলছি, দম্‌কা দম্‌কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবে না। ধড়াক করে বুকে লাগে। যা বলবার তা অত নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পার না। [বুকে হাত বুলাইয়া] এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি। কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কি করে? গার্ডগুলো কি করছিল?

হাফিজ। এখানেই থাকে স্যার। গোরস্থানের বাইরে কখনও যায় না বলেই ত ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল! বদ্ধ পাগল!

নেতা। হুম!

হাফিজ। লোকটা এমনিতে ভাল লেখা পড়া জানে। ভাল আলেম। গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে মেয়ে মা বৌকে মরতে দেখেছে! কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্র্যাজিক স্যার।

নেতা। অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ। চাকরি। চাকরি স্যার। চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন। মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি গোলমালটা কিসের! লাশগুলো মাটি চাপা দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ঠাণ্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এমোমেলা বকছেন। নিন। [বোতলটা আগাইয়া দিয়া] এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ। আপনার সামনে স্যার? তার ওপর স্যার এখন অন ডিউটি—

নেতা। তাকাল্লুকের সময় নেই। লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চট্‌পট্ কাজটা শেষ করে ফেলুন?

হাফিজ। বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার?

নেতা। কেন, চুস্‌নি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি?

[হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক্ করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া—]

হাফিজ। এ মালটা স্যার আরো ভাল। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা। মুর্দা ফকির লাশগুলো দেখেছে?

হাফিজ। এ্যা! ওহ হ্যা, মানে না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলা ফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোত্থেকে হঠাৎ হুস্‌ করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধ হয়, আড়াল থেকে গোর-খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কি তুখোড় বক্তৃতা। আমি ত গোর-খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ ব্যাটাই না কোত্থেকে উড়ে এসে ওদের বোঝাতে শুরু করলো ঃ—কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুনতো কি সব বিদঘুটে কথা।

নেতা। ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন?

হাফিজ। কি যে বলেন স্যার। মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফয়দা কি? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এলো। ওকে এই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হোলো না! [ঘড়ি দেখিয়া] এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা। [গ্লাসে চুমুক দিয়া] না। কাজটা ঠিক হয় নি। এ সব ফকির দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোত্থেকে কি উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে।

হাফিজ। লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারতো না। রক্ত মাংসের স্তূপ। দেখে ও কি বুঝবে? এরকম লাশ তো ট্রেন-চাপা মড়ারও হতে পারে।

নেতা। গুলি চলেছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড় ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক—শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌছায়নি তা ভাবতে আমি রাজী নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ। মুর্দা ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ওত এক রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবীতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে—এত কথা বোঝবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়—কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে—খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল!

নেতা। কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তাত ও দেখেছে। সকাল বেলা যদি কাউকে আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

হাফিজ। আপনারা লীডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি-অফিসার, হুকুম তামিল করেই খালাস। কি করতে হবে? (স্তব্ধতা)

নেতা। ওটাকে শুদ্ধো পুঁতে দাও।

হাফিজ। এ্যা? কি বলছেন স্যার? আপনি এক্‌সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার। আর খাবেন না এখন।

নেতা। আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো-বিশ পঁচিশ হাত—যত নীচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোন দিন যেন আর ওপরে উঠতে

না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ। আপনি বড় একসাইটেড স্যার। এ সব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার! এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এ জন্য অন্য রকম। কোন সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা। পুঁতে ফেল!

হাফিজ। ভুল, খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যার খুব কুল্‌লি করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমত প্র্যাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা। যান তাড়াতাড়ি যান। আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশীক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ। এ্যা। ওহ্‌—হে হে হে! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক—কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড় ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাবো। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারবো। এই নূতন বোতলটা কেমন স্যার?

নেতা। [চোখ তুলিয়া] আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু দিলাম। [গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।]

[নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।]

ফকির। [হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া] বুটা। [হাফিজ ও নেতা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।]

নেতা। কে?

হাফিজ। এ্যা। ওহ্‌! আপনি? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর।

ফকির। বুটা, মিথ্যাবাদী, আমাকে চিনতে পারে না এ গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝো? দেখলে চিনতে পারবে?

হাফিজ। সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির। বুটা! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না, কিছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমীকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না! তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নীচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।

হাফিজ। আপনি তো এই দিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন?

ফকির। বাবা! তোমরা শহরের অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নীচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরী করেছি। হো হো হো। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারবো কেন?

হাফিজ। হে হা হা। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির। এই ত ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা! তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে! পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি।

হাফিজ। সালাম হুজুর! আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির। সাবাস বেটা! তোর নজর খুলছে।

হাফিজ। তা হুজুর এখন অনুমতি দিন ওদের পার করে দি।

ফকির। না! আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে একেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়ীর ভেতর গিয়ে উঠলাম!

নেতা। ইন্সপেক্টর!

ফকির। প্রথমে দেখে মনে হলো ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্‌ত নেই, কোনটার ফাটা খুলি দিয়ে কি সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল শকুনে খামছে কামড়ে একটু খারাব করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দিখি—না'ত, ঠিকত নাই! উহুঁম!

হাফিজ। সে কি হুজুর! ঠিক। সব ত ঠিকই আছে।

ফকির। চোপরও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারী। আমি শুঁকে দেখেছি গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ। গন্ধ?

ফকির। বাসি মড়ার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ পঁচিশ ত্রিশ হাত, যত নীচেই মাটি চাপা দাও না কেন—এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ। ওহ্? তা'হলে বলুন কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক গন্ধ থাকুক। মাটির নীচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির। ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ। খোদা হাফিজ।

[ফকির কিছু দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কি শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরেও শুঁকিয়া দেখে।]

ফকির। নাঃ আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি—[আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখচোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া] উহ্! তাই বলো! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কি ভুলই না করেছে!

নেতা। ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির। গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি কোরছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদেরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। [গন্ধ শুঁকে] তোমাদের গায়ে মুখে পাই মরার গন্ধ! তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ এরকম ফাঁকি দেয় না! আমি

ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরী হয়ে নাও। ইস্! গোরখুঁড়েরা কি ভুলই না করেছে! না না এ'ত হতে পারে না—

[বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বেসামাল]

হাফিজ। হে হে হে হে স্যার! সব খতম স্যার। আমরা এখন ফ্রী! দেখলেন তো, পাগলটাকে কি রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে অত হুজুর হুজুর না বললে হয়ত গাঁয়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা। ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ। ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না, স্যার। তা হলে আমিও আপনার সম্পর্কে দু'একটা হক্ কথা বলে ফেলবো কিন্তু।

নেতা। যেমন।

হাফিজ। যেমন? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দোবো।

নেতা। মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মত উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কি করে?

হাফিজ। অনেক দিন হোলো এ লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝবো না?

নেতা। সবটা ঠিক ধরতে পারেননি। উঠতে হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কি, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হাফিজ। বিশ্বাস? হ্যাঁ! পারবেন! তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে এখনও ডিউটি ঠিক করে যেতে পারবো। তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামোকাই একটু বেশী কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা। ভয়? ভয় কিসের? তুমি মনে করেছো ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাবো! কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন—ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে!

হাফিজ। কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়—কি করবেন তখন আপনি?

নেতা। সব্বাইকে, আপনাকে শুদ্ধো, এক সঙ্গে পুঁতে ফেলতাম!

হাফিজ। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করি নি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসেও আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসবো। দেখবো। এগিয়ে যাবো। হাত মেলাবো। ভয় কিছুতেই পাবো না। [নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া] গ...লা টিপে ধরে রাখবো। যাতে বুকের মধ্যে ভ....য় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন স্যার? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে।

[ততক্ষণে পার্টিশানের ঐ পাশ হইতে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমোজ্জ্বলিত আলোক শিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল ও মস্তক পরিবেষ্ঠিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ। মূর্ত্তি নিশ্চল; নেতা যখন শেষবারের মত ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন তখন ঐ স্তব্ধ মূর্ত্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কি যেন ছুঁড়িয়া মারিল। কাচের গ্লাসের ঝন্ ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চীৎকার।]

হাফিজ। গুলি! গুলি স্যার! শুয়ে পড়ুন শীগ্‌গীর! গুলি! [দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিষ্পন্দ মুখ। কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা।]

নেতা। [চাপা স্বরে] গুলি যে বুঝলে কি করে?

হাফিজ। দেখেছি!

নেতা। কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছো?

হাফিজ। না। তবে কি ছুঁড়েছে দেখেছি।

নেতা। কোথায়?

হাফিজ। বেশী নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কি না? [উপুড় হইয়া একটু চারিদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কি তুলিয়া দেখে] ধরুন, পেয়েছি।

নেতা। [হাতে লইয়া] এ কি? এ যে বুলেট! রক্তমাখা!

হাফিজ। কুল্‌লি! কুল্‌লি! ভয় পাবেন না স্যার। ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড! ট্রাকের ভিতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়ত খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা। ও! তা' হলে বলো কিছু না! মুর্দা ফকির—সেত জ্যান্ত আদমী। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ। এখন উঠে পড়া যাক স্যার! মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কি!

নেতা। ইন্সপেক্টর।

হাফিজ। জী।

নেতা। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ। এ্যাঁ!

নেতা। তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ। [ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থির কণ্ঠে] উঠে এসেছে।

নেতা। কে?

হাফিজ। সেই লাশটা।

নেতা। লাশ? কোন লাশটা?

হাফিজ। বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নেই।

নেতা। ওহ্!—কি চায়?

হাফিজ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব?

নেতা। কি জিজ্ঞেস করবে?

হাফিজ। এই, কি চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি—এই সব?

নেতা। আমাদের কথা বুঝবে?

হাফিজ। ট্রাই করতে হবে। সব লাইনই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লি অগ্রসর হ'তে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হ'তে বাধ্য। কিন্তু অন্যরকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে [উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্টে। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।]

নেতা। আপনি কিচ্ছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাকা।

হাফিজ। খবরদার, অমন কাজও করবেন না। [ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া] পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার। বুঝতে পারছেন না—এটা—ঠিক, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ্য করুন আমি কি রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেবো। [ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে। বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করতে চেষ্টা করে।] এই!—এই! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই। হেই! [মূর্তি নীরব। নিশ্চল] [ঘুরিয়া] স্যার, কোন সাড়া দিচ্ছে না যে?

নেতা। বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোন কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চলো আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ। তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাবো? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার।

মূর্তি। আমি যাবো না। আমি থাকবো। [দু'জনে হতবাক। ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়]

হাফিজ। কোথায় যাবে না? কোথায় থাকবে?

মূর্তি। কবরে যাবো না। এখানে থাকবো।

হাফিজ। অবুঝের মত কথা বোলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি। মিথ্যে কথা। আমরা মরি নি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না।

হাফিজ। [নেতার কাছে আসিয়া] বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার? যদি কিছু আছর হয়! পারবেন না স্যার? আপনি তো বলেছিলেন—যাই হোক—বক্তৃতা দিতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না।

নেতা। [ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া] দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এ দেশের রাজনীতি আঙুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি! কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে—

মূর্তি। কবরে যাব না।

নেতা। আগে কথাটা ভাল করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাশে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি। ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা। জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাও নি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্ব্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি—তাদের নামে—মিনতি করছি—তুমি যাও, যাও, যাও।

মূর্তি। আমি বাঁচবো।

নেতা। কি লাভ তোমার বেঁচে? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কি লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। [মূর্ত্তি মাথা নাড়ে] আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবী অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবী এ্যাসেম্বলীতে পাশ করিয়ে নেবো। দেশজোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো। দোহাই তোমার তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্ত্তির মত আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকোনা। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

[সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুদ্ধ রক্তরেখা।]

কে? তুমি কে?

মূর্তি [২] নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানী ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোকা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা। তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্তি [২]। গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আলগা হতে পারবো না।

নেতা। তুমি আমাকে চেন?

মূর্তি [২]। চশমাটা আর খুঁজে পাই নি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা। আমার কথা শুনেছ? এই মাত্র যা বলছিলাম?

মূর্তি [২]। শুনেছি। আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি। আমরা কবরে যাবো না।

মূর্তি [২]। আমরা বাঁচবো। [বিড়বিড় করিতে করিতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।]

[নেতা মাথা নীচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্ ফিস্ করিয়া]

হাফিজ। হবে না। এই লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলবো। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। [হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মত মাথার উপর তুলিয়া দিল।]

নেতা। ঢং ছাড়ো। মেয়েলোকের মত ঘোমটা দিয়েছ কেন?

হাফিজ। [ফিস্ ফিস্ করিয়া] চুপ! আমি এখন স্ত্রীলোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছি, কিচ্ছু ধরতে পারবে না। [আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রী লোকের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।] খোকা! খোকা!

মূর্তি। [চঞ্চল। বেদনাহত।] কে? কে ডাকে?

হাফিজ। খোকা কোথায় গেলি তুই? খো—কা!

মূর্তি। কে? মা? মা! তুমি কোথায় মা! [শূন্যে হাতড়ায়]

হাফিজ। এই যে যাদু, আমি এইখানে।

মূর্তি। তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে না মা? তুমি বারণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকলো। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও—সেই জন্যে তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কি করে জানলে মা?

হাফিজ। মা হ'লে সব জানতে হয়। মা হ'লে জানতিস, মার কষ্ট কি! মার বুক খালি হ'লে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি। তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে এল। আমার তখন খালি কি মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে—ঠিক তেমনি। আর আমার নাক মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

হাফিজ। তবু তো কোন কথা শুনিস না। তোরা কেবল মার দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস। এ তোদের কি নতুন নেশা! এত মরণপাগল কেন তোরা?

মূর্তি। মিছে কথা মা। আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব পড়ব পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বার বার এসে বকবে—কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারির ফাঁক দিয়ে ছায়ামূর্তির মত ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীরটা দেখবো—দেখবো—মা, চলে যেও না—মা! তোমায় আমি দেখবো—তোমায় আমি আদর কোরবো মা—তুমি কোথায় মা?—মা!

হাফিজ। ঘুমের ঘোরে কি বকছিস? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? অনেক রাত হয়েছে। লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার শুতে যা।

মূর্তি। আমাকে শুতে যেতে বলছো মা? না। না। আমি শোব না। আমি আর কোনদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা—না, না আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা। ইন্সপেক্টর! তোমার এ ভূতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে?

হাফিজ। ছিঃ বাবা! জিদ কোরো না। লক্ষ্মীটি শুতে যাও। মার কথা শোনো।

[দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়]

মূর্তি [২]। [অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া।] মিন্টু। মিন্টু। মিন্টু ঘুমায়নি এখনও?

হাফিজ। [সুর পাল্টাইয়া] তোমার কোলে আসার জন্য কাঁদছে।

মূর্তি [২]। দাও, আমার কোলে দাও। [বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে] ইস্! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো।

নেতা। খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। চলে যাও সব।

মূর্তি। আমি যাবো না। আমি বাঁচবো মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরো হাঁটবো মা। ঠাণ্ডা রূপোর মত পানি চিরে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটবো মা!

মূর্তি [২]। কাঁদিসনে মিন্টু। তোর বাপ কি কম চেষ্টা করেছে? দুষ্টু মুদী কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকী দিল না! বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে! এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে!

নেতা। সকাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি? না আমি তা পারব না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট! ডেভিল্‌স্! যাও বলছি।

হাফিজ। উত্তেজিত হবেন না স্যার। কুল্‌লি! কুউল্‌লি!

মূর্তি। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিছু ভেব না মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়া মূর্ত্তির মতো বার বার আসবো। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ো, দরজায় এসে টোকা দেবো। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা কোরবো। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো মা।

মূর্তি [২]। [কোলের কল্পিত সন্তানকে] দূর বোকা। তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কি আছে! তুই ত আমার কোলে। আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। [সামনের দিকে ইশারা করিয়া] ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা। ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানিনা। আমি স...ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলি করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবো। যাতে কোন দিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলি, সবগুলোকে আবার গুলি করো। গার্ড! গার্ড! [হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।]

ফকির। জী হুজুর।

নেতা। [লক্ষ্য না করিয়া] গুলি করো।

ফকির। গুলি? ওহ! হ্যাঁ। আছে! আমার কাছে আরো কয়েকটা আছে। এই নিন। বুলেট। খুব তাজা! টাট্‌কা। এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন।

[স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে]

লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি। [হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।]

[নেপথ্যে মুর্দা ফকির চীৎকার করিতেছে ঃ তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি গুলি হবে! স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব! কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলি—গুলি হবে আজ! কবর খালি করে সব উঠে আয়!]

[মঞ্চের উপরের লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন—ক্রমে আরও অনেকে—সারি দিয়া চলিয়া যাইবে। এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।]

[হাফিজ ও নেতা লক্ষ্য করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে]

নেতা। [বিবর্ণ মুখে] ইন্সপেক্টর! হার্টটা জানি কেমন করছে। বড় ভয় পেয়ে গেছি। একটু ধরে রেখো আমাকে। আর আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফিজ। না আপনার এখনও হুঁশ নেই। আমার নিজেরও হয়ত নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না।

[পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।]

নেতা। [চমকাইয়া] কে? এটা কে আবার?

হাফিজ। [দেখিয়া] ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউণ্ড নাকি? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি! কি চাও?

গার্ড। গাড়ীতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শেষ হইতেও আর দেরী নেই।

হাফিজ। [প্রথম লক্ষ্য করিল যে মঞ্চ খালি। ভাল করিয়া কয়েকবার চোখ কচলায়] গুড! সব কাজ খতম ত? গুড! সব কাজ খতম স্যার? নীট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার? ভাল করে দেখুন না নিজেই।

নেতা। [ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে] হুম!

গার্ড। কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর! খুঁইজা দেখুম?

নেতা। না চলো।

হাফিজ। কিছু না স্যার। এসব কিছু না। গোরস্থানে এরকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার—মানে—

নেতা। হুম! চলো। আর দ্যাখো, মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক। [বুকে হাত চাপিয়া ধরে]

হাফিজ। এ্যাঁ? মুর্দা ফকির? ওহ্ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ইয়েজ স্যার।

[সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস-বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।]

যবনিকা

'কবর' : মুনীর চৌধুরী

৪.১ 'কবর' নাটক রচনার উৎস
৪.২ নাটকের উৎস ও পরিপ্রেক্ষিত
৪.৩ 'কবর' নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ ও গোত্রনির্ণয়
 ৪.৩.১ বিষয়সংক্ষেপ
 ৪.৩.২ গোত্র নির্ণয়
৪.৪ চরিত্রবিচার
৪.৫ নাটকের দৃশ্য-বিশ্লেষণ
৪.৬ ঘটনার তাৎপর্য বিচার
৪.৭ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
৪.৮ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী
৪.৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৪.১ 'কবর' নাটক রচনার উৎস

'কবর' নাটকের সৃষ্টি এক বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে। পূর্ব-পাকিস্তানের শাসকদের বিষনজরে-পড়ার পরিণামে জেলবন্দী অবস্থায় মুনীর চৌধুরী এই নাটক রচনা করেছিলেন ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, সহবন্দীদের সঙ্গে অভিনয় করে একুশে ফেব্রুয়ারির বর্ষপূর্তি পালন করতে। সেই সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে আর যাঁরা, তাঁরা হলেন আবদুল মতিন, অজিত গুহ, অলি আহাদ, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল হাশেম মৌলানা, মনোরঞ্জন ধর, মোহাম্মদ তোহা প্রমুখ অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী এক রাজনীতিবিদ্। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এঁরা কম্যুনিস্ট—ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনছেন।

ঐ বছর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রনেশ দাশগুপ্ত কারারুদ্ধ মুনীর চৌধুরীকে চিঠি লেখেন, যার মর্ম একটি তাৎপর্যময় নাটক লিখে জেলের মধ্যে গত বছরে (১৩৫২) একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে যেন সেটি অভিনয় করা হয়। দ্রুত নাটকটি রচিত হল, গোপনে মহলাও দিলেন সবাই। তারপরে কর্তৃপক্ষের অগোচরে লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়ে অভিনয় করা হল 'কবর'। কারাগারে প্রথম অভিনীত হবার এমন দুর্লভ সম্মান আর কোনও নাটক পৃথিবীতে পেয়েছে বলে কখনও শোনা যায়নি।

৪.২ নাটকের উৎস ও পরিপ্রেক্ষিত

১৯৫২ সালের মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মূলত প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাস যে দ্বন্দ্ব ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর থেকেই আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ

অঞ্চলসমূহ নিয়ে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমবায়' গঠনের তাগিদ প্রাচীনপন্থী মুসলমানেরা অবাঞ্ছিত বিবেচনা করলেন। পক্ষান্তরে, জাতীয় স্বাধীনতার এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজকে চুম্বকবৎ আকর্ষণ করল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাদের আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশাসকরা হঠাৎ ঘোষণা করলেন—পাকিস্তান হবে এক ধর্ম, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির দেশ এবং "Urdu and Urdu only shall be the State Language of Pakistan."

এরপর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে ভেঙে দু'টুকরো হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রাচীনপন্থী মুসলিম পেয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তির উৎসাহ, নবীনেরা পেয়েছে সাংগঠনিক শক্তির হাতিয়ার ও উন্নততর আদর্শের বর্ম। কাজেই এদের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকল। ২১ ফেব্রুয়ারির ('৫২) পথিকৃৎ ১১ মার্চের ('৪৮) আন্দোলন ছিল এই দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। "একমাত্র উর্দু"-র প্রতিবাদে "না"-ধ্বনির ঢেউ লেগেছিল সমগ্র প্রদেশে। তরুণদল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এল পথে, পুলিশের মুখোমুখি। চারদিন সংগ্রামের পর এরা জয়ী হল ত্যাগের পরীক্ষায়, ঈমানের পরীক্ষায়, চেতনার অগ্নিপরীক্ষায়।

কিন্তু '৪৮ এর ১১ মার্চ বৃথা যায় নি। দমননীতির চাপে সাময়িকভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও তরুণসমাজ তথা সমগ্র প্রদেশবাসীর অধিকারচেতনা ও সংগ্রামী দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী লিয়াকত আলীর রিপোর্ট ('উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা') নাকচ করে বিকল্প রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য এক মহাসম্মেলন আহূত হল ১৯৫০ সালে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো প্রণীত হল এই সম্মেলনে। সাড়ে চার কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে দাবী করা হল বাংলাকেও উর্দুর পাশাপাশি সমানভাবে রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষার-মর্যাদা দিতে হবে....পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে অনেক টানাপোড়েনের পরে জনাব লিয়াকতের রিপোর্টটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল, বাংলাভাষা-বিরোধী পরম কুটিল একটি চক্রান্তের মৃত্যু হল এইভাবেই।

কিন্তু পরবর্তী চক্রান্তটি শুরু হতে বেশি দেরি হয় নি। নতুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আবার এক ফতোয়া জারি করলেন, বাংলাভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। এর কিছুদিন বাদে, ২৬ জানুয়ারি তারিখে ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ ফরমানে ক্ষোভে উদ্দাম হলেন। দৃঢ়প্রত্যয়িত হয়ে তাঁরা বাংলা ভাষার দাবিতে সূচনা করলেন মরণপণ প্রতিরোধের।

১৯৫২-র ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ ধর্মঘটের আয়োজন করেন। বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট বার লইব্রেরি হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। '৪৮ এর আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবর রহমান তখন জেলে ছিলেন। বর্তমান সম্মেলন সভাতেই স্থির হয় হরতাল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে।

সারা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই চলতে থাকে ধর্মঘট পালন, ছাত্র-জনতার সভা-শোভাযাত্রা, অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে পতাকা-দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছটায় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহর উত্তেজনায় থম্‌-থম্‌ করতে লাগল। কেউ চাইলেন সমর্থন করতে, কেউ বা ভঙ্গ করতে। ২১ তারিখ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বেলতলায় পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমবেত হয়। সর্বদলীয় কমিটি বলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করতে। কিন্তু ছাত্ররা পূর্ব-নির্ধারিত শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে এবং 'দশজনী মিছিল' বের করার জন্য শ্লোগান দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল পুলিশবাহিনী। যথারীতি ছাত্ররা গ্রেফতার হয় এবং একের পর এক ট্রাকে চালান হতে থাকে।

তবু বাকি ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। কেউ কেউ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে, বাকি ছাত্ররা গুরুতরভাবে আহত হয়।

বেলা দুটোর পর সমস্ত পরিস্থিতিটা চলে যায় আয়ত্তের বাইরে। পুলিশ হোস্টেল প্রাঙ্গনে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররাও বাধ্য হয় ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে। এরপর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য পুলিশ চালাল গুলি। ঘটনাস্থলেই আবদুল জব্বার এবং রফিকউদ্দীন আহমেদ শহীদ হন, সতের জন গুরুতর আহত। রাত আটটা নাগাদ হাসপাতালে মারা যান আবুল বরকত। পরদিন প্রয়াত হন সালাম।

এই ঘটনায় বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায় সমস্ত ঢাকা শহরে। সেদিন মানুষের মন থেকে যেন সমস্ত আশঙ্কা, ভয় মুছে গিয়েছিল বরং সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকান্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ নিয়েছিলেন তাঁরা। ভাষার দাবিতে ছাত্রদের উপর গুলিচালানোর প্রতিবাদে গ্রাম থেকে দলে দলে কৃষক-মজুর-ছাত্র-শিক্ষকেরা এসে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। অফিস আদালত, কল-কারখানা, দোকান-পাট, যানবাহন সেদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সব দিক থেকে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন অসহায় হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হয়।

এই ছিল ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। ইতিহাসে অমর ২১ ফেব্রুয়ারির প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সমকালে বা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা। শামসুর রহমানের মত কবিরা লিখেছেন কবিতা, গান রচনা করেছেন জসীমউদ্দিন, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, আবদুল লতিফ প্রমুখ, একুশের গল্প 'মৌন নয়', 'হাসি', 'দৃষ্টি', 'পরিমাটি', রচিত হয়েছে যথাক্রমে শওকত ওসমান, সৈয়দ আতিকুল্লাহ্, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রধান-প্রধান গল্পকারদের কলমে এবং সর্বোপরি রয়েছে আমাদের পাঠ্য নাটক 'কবর' যার রচয়িতা অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

এরপর থেকেই বাংলাদেশ এবং ভারত, দুই প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-রাষ্ট্রের বাংলাভাষীদের কাছে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' একটি বিশেষ তাৎপর্যময় তারিখ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে এই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে শুরু-হওয়া ভাষা-আন্দোলনের সূত্রেই প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মনে যে তীব্র জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়, সেটিরই চূড়ান্ত পরিণামে দু-দশক পরে ১৯৭১ সালে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

কিছুকাল আগে ইউনেস্কো (U.N.E.S.C.O) এই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন।

৪.৩ 'কবর' নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ ও গোত্র-নির্ণয়

৪.৩.১ বিষয়-সংক্ষেপ

১৯৫২-র ২২শে ফেব্রুয়ারির শেষ রাত্রিতে এক গোরস্থানে গড়ে উঠেছে এ-নাটকের দৃশ্য-ঘটনা সংবলিত কাহিনী। আগের দিন ২১ ফেব্রুয়ারির দুপুরে ঢাকা শহরের বুকে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠান দাবিতে মিছিল বার করে সেদিন যাঁরা নিহত হয়েছিলেন সেইসব শহীদদের কবর দেওয়া হয়েছিল যে গোরস্থানে, এ-কাহিনী যেন সেখানকারই। দৃশ্য একটিই শুধু মাঝে মাঝে চরিত্রবদল ঘটেছে। গোরস্থানের গার্ড, ইনস্পেকটর হাফিজ এবং কোনও এক গণ্যমান্য নেতাকে প্রথম দেখা যায়।

রাত্রে প্রচুর লাশ কবর দেওয়া হয়েছে। (এখানে একটা কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র মিছিলে গুলি চালানোর ফলে মারা গিয়েছিলেন চারজন তরুণ; রফিক, বরকত, সালাম এবং জব্বর। কিন্তু এই নাটকে দেখানো হচ্ছে যে, অসংখ্য শহীদের মরদেহ এনে জড়ো করা হয়েছে কবরখানায়। আসলে, এই অসংখ্য, অনামা শহীদের রূপকে নাট্যকার সারা জাতিরই বিপন্ন, মর্মান্তিক অবস্থাটাকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন।) ইন্সপেক্টর হাফিজ বেগতিক দেখে বলেছিল একটা বড় মতন গর্ত খুঁড়ে অনেকগুলো লাশ ঢুকিয়ে কোনক্রমে মাটি চাপা দিয়ে দিতে। তাহলে পরিশ্রম কিছুটা লাঘব হত। এই নেতাটি বেশ ভীরু প্রকৃতির মানুষ, হৃৎপিণ্ড দুর্বল। এসব সরকারি কাজে সরকারের টাকা খরচ করাতে তিনি কুণ্ঠিত নন। তিনি নির্ভয়ে, নির্বিবাদে থাকতে চান। পোস্টমর্টেম করবার পর লাশগুলোর যা চেহারা হয়েছিল, নেতা ভাবলেই শিউরে ওঠেন। বিভীষিকা ভুলতে পোর্ট ফোলিও ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বার করে গলায় ঢালতে দেখা যায় তাঁকে, সঙ্গ দেয় ইন্সপেক্টরও। কেননা খানিক আগে তার সঙ্গে কবর-খোঁড়া শ্রমিকদের বচসা বেধেছিল। তাদের বক্তব্য : "মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেহি, জানাজা নেই! তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হ'তে পারে না, কভি নেহী!" অথচ বহু তর্কাতর্কির পর ইন্সপেক্টর যখন রাজি হয় তখন কোথা থেকে হঠাৎ ছুটে আসে 'মুর্দা' ফকির!

এমন একটা উদ্ভট ভয়ানক নাম শুনেই নেতা চমকে ওঠেন। আসলে লোকটা মুর্দা নয়, জিন্দা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে-মা-বউকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কেউ কবর পায় নি, মৃতদেহগুলো পচেছে, খাদ্য হয়েছে শকুন আর শেয়ালের। সেই থেকে এই এককালের স্কুল-মাষ্টারটি উন্মাদ, ফকির, ঘুরে বেড়ায় গোরস্থানের নানা প্রান্তে।

নির্বিবাদী নেতার ইচ্ছে ফকিরকে শুদ্ধ পুঁতে ফেলা হোক। কিন্তু ইন্সপেক্টর হাফিজ জানে কীভাবে মন ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয়। ভাষার দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকজনকে খতম করে দিয়েছে—এত কথা বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি মুর্দা ফকিরের নেই। কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধুমাত্র একটি কারণেই মরে—অনাহার। তবে লাশগুলোকে কোথায় কবর দেওয়া হচ্ছে তা ও দেখেছে। যদি সকালবেলা ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাতে এখানেও আসে আর ও জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? ভয়ার্ত নেতা সবাইকে পুঁতে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত হন, দশ-পনের-বিশ-পঁচিশ হাত, প্রয়োজনে পাতাল পর্যন্ত গভীর গর্ত খোঁড়া হোক, "কোন দিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাচাতে ভুলে যায়।"!!

কিন্তু মুর্দা ফকির যেন বিবেক, সে নাট্যকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সে দেখেছে লাশগুলোর গায়ে গ্যাসের আর বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা না কি কবরে থাকবে না, যতই মাটি চাপা পড়ুক না কেন। তারপর হাফিজ আর নেতার কাছে গিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে বলে—"তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও।....ইস্! গোর-খুঁড়েরা কি ভুলই না করেছে"!

নেতা ও ইন্সপেক্টর হাফিজ বুকে সাহস আনার জন্য মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে প্রায় বেসামাল হয়ে পড়ে। হঠাৎ পার্টিশানের অন্য পাশ থেকে একটি বীভৎস নিশ্চল মূর্তি ভেসে ওঠে, ছুঁড়ে মারে একটি কাঁচের গ্লাস। ভয়ার্ত নেতা এবং হাফিজ দেখে ওটা বুলেট খাওয়া ছাত্র, খুলিহীন লাশ! শুরু হয় সেই মৃত মূর্তির সঙ্গে দুই জীবিতের কথোপকথন এবং এখানেই নাটকটি প্রতীকী হয়ে ওঠে, নিয়ে আসে গভীরতর কিছু ব্যঞ্জনা। উঠে আর দ্বিতীয় একটি মৃত মূর্তি, নাটকে যাদের পরিচয় 'মূর্তি' এবং 'মূর্তি |২| বলে। নেতারা দুজনকেই মন-ভোলানো কথায় কবরে পাঠাতে চাইছেন, কিন্তু এরা যাবে না। জীবিতাবস্থায় প্রথমজন ছিল প্রতিবাদী ছাত্র এবং দ্বিতীয়জন কোনও অনাহারে মৃত শিশুর জন্মদাতা। হঠাৎ যেন এদের জীবিত সত্তা জেগে ওঠে আর হাফিজ কণ্ঠস্বর বদলে দুজনের সঙ্গে অভিনয় করে যায়

যথাক্রমে মা ও স্ত্রীর ভূমিকায়। ওদিকে মুর্দা ফকির কবর খালি করে সব লাশগুলোকে উঠে আসতে বলে—"গুলি গুলি হবে! আজ গুলি গুলি হবে।"

মঞ্চে তখন দেখা যায় লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের আহ্বান কান পেতে শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন—ক্রমে আরও অনেকে সারি দিয়ে চলে যায়। মঞ্চে তখন হতচকিত, অসুস্থ নেতা এবং ইন্সপেকটর হাফিজ। ভোর হোয়েছে। কারফিউ শেষ হতে বেশি দেরি নেই। ওরা গাড়িতে ওঠে, গার্ড গ্লাস-বোতল ইত্যাদি গুছিয়ে নেয়।

৪.৩.২ গোত্র নির্ণয়

'কবর'-কে ঠিক ট্র্যাজেডি কিংবা পোস্টার ড্রামা হিসেবে গণ্য করা যায় না। আসলে একটা মহান সংগ্রামের প্রেক্ষাপট কী, তার মুখবন্ধ হিসেবেই এই নাটকের গুরুত্ব সর্বাধিক। মৃত্যু যদি সংগ্রামী শহীদদের মহীয়ান করে তোলে, তাহলে তাকে ট্র্যাজিক বলে ধার্য করা যায় না, করা বাঞ্ছিত নয়। এর মধ্যে প্রতীকী-সংকেত যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (মূলত 'মুর্দা' ফকির এবং ১ম ও ২য় মূর্তির মাধ্যমে), তাতে একে প্রতীক-নাট্য বলারও হয়ত একটা অবকাশ থাকে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে এটি একটি রাজনৈতিক নাটকই—যদিও প্রচারধর্মী সোচ্চার তীব্রতা এর অভিব্যক্তিতে নেই। আবার প্রতীক-প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার প্রকাশ এখানে ততটা নেই—যতটা আছে এক ধরনের মৃদু বিদ্রূপ মর্জি, যা আসলে ধিক্কার এবং প্রতিবাদকেই বাঙ্ময় করেছে। এই সমস্ত কারণগুলির জন্যই 'কবর'-কে বিশেষ কোনও নাট্যগোত্রভুক্ত করা দুরূহ; আর সেটাই হল এর অনন্যতা।

৪.৪ চরিত্র-বিচার

'কবর' নাটকটি মূলত আবর্তিত হয়েছে দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। প্রথমজন হলেন এক নেতা এবং দ্বিতীয়জন ইন্সপেকটর হাফিজ। নাটকটি পাঠকালে যে চরিত্রগুলি সামনে আসে তাদের ক্রমান্বয়ে সজ্জিত করলে এরকম দাঁড়ায়—নেতা, গোরস্থানের গার্ড, ইন্সপেকটর হাফিজ, মুর্দা ফকির, মূর্তি এবং মূর্তি (২)। একমাত্র 'গার্ড' চরিত্রটিকে বাদ দিলে বাকি প্রত্যেকেই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আমরা একে একে তাদের ওপর আলো ফেলতে পারি।

নেতা

নাট্যকার নেতার আবির্ভাবেই চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : 'হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গন্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ'। প্রথমাবধিই তাঁকে আমরা একজন দুর্বলচিত্ত মানুষ হিসেবে পেয়েছি। গার্ডের সঙ্গেই তাঁর প্রথম সংলাপ, যেখানে তাঁকে বেশ প্রভু বা নেতাসুলভ মেজাজে কথা বলতে শোনা যায়। কিন্তু ইন্সপেকটর হাফিজের সঙ্গে দীর্ঘ সময় জুড়ে কথোপকথনে নেতার বিভিন্ন 'মুড' লক্ষ্য করা যায়। দুজনেই সরকারের লোক, তাই মতাদর্শগত কিছু মিল রয়েছে। তাঁরা একসঙ্গে মদ্যপানও করেছেন। কিন্তু হাফিজের কোনও কোনও কথায় নেতা ভয় পান, বুকে ব্যথা হয়। তাঁর নিজের কথায় : "না, গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারে নি। তবু ডাক্তার বলেছে, আমার না কি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে।" এই দুর্বলতা বা ভীরুতাকে ঢাকবার চেষ্টাও তিনি করেছেন প্রাণপন, কেননা তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা, ভোলেন কি করে!

কিন্তু গোরস্থানের বাসিন্দা 'মুর্দা' নাক জীবিত ফকিরটি আসার পরে সব গোলমাল পাকিয়ে যায় নেতার, ফকিরের অনর্গল কঠিন সত্য ভাষণে বিব্রত নেতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ফকিরকে জ্যান্ত কবর দিতে চাওয়ার মধ্যে যেমন তাঁর নিষ্ঠুর

রূপ প্রকাশ পায়, হাফিজকেও একই হুঙ্কার দেওয়ার মধ্যে প্রকাশ পায় তাঁর ক্ষমতাবান রূপটি। কবর থেকে উঠে আসা লাশ-মূর্তির কাছে ভয় পেয়ে তিনি অনেক 'ওয়াদা' করেন : "তোমাদের দাবী অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবী এ্যাসেম্বলীতে পাশ করিয়ে নেবো। দোহাই তোমার.... সরে যাও.... কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না।"

নাটকের একেবারে শেষদিকে দুই মূর্তির সঙ্গে হাফিজের অভিনয় চলাকালীন তিনি আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান সকলকে, গুলি করে। কিন্তু তা আর করতে হয় না, ভোর হয়ে আসে। নেতা ফিরে যান। এ নাটকে এই চরিত্রটি পুরোপুরি শাসক তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। দুর্বলচিত্ত করে চরিত্রটিকে নাট্যকার আরও বেশি বাস্তব করে তুলেছেন।

ইন্সপেকটর হাফিজ

হাফিজ একজন ইন্সপেকটর, শাসনের রক্ষক। সে পারত জনসাধারণের বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করে নিতে, কিন্তু করে নি, তার পথ বিপরীত। 'কবর' নাটকের শুরুর কিছু পরেই এই চরিত্রটির আবির্ভাব, যখন নেতা ও গার্ডের কথোপকথন চলছিল। নাট্যকারের ভাষায় সে 'প্যান্ট-কোট-মাফলার চাদরে জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার এক ব্যক্তি।' দায়িত্বজ্ঞানহীন, অযত্নবান হাফিজ চেয়েছিল ভাষা আন্দোলনের শহীদ লাশগুলোকে কোনওক্রমে একটা বড় গর্তের মধ্যে পুরে দিতে, মৃত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক কবর তৈরির 'ঝামেলা'-য় সে যেতে রাজি নয় এই শেষ রাত্রে। কিন্তু কবর-খুঁড়িয়েদের এবং মুর্দা ফকিরের প্রবল বাধায় সেটা আর সম্ভব হয় নি। তাই সে যথেষ্ট বিরক্ত। তবে নেতার মত হাফিজ ভীরু নয়, বরং নেতার সামনে অবলীলাক্রমে সে পূর্বাপর লঘু চালে কথা বলে গিয়েছে, একসঙ্গে মদ্যপান করেছে, তাঁবেদারি করেছে পদোন্নতির জন্য। গোরস্থানে সে-ই যেন নেতার বল-ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাফিজ স্পষ্টবাদী, নিজের কৃতকর্মও সে আড়াল করতে চায় না। তাই নেতার সামনে নিজেকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে সে কোনও অভিনয় করে নি। নাটকের মধ্যপর্বে যখন কবর থেকে লাশগুলো উঠে আসার প্রতীকী দৃশ্য তৈরি হয়েছে তখনও হাফিজ অসম্ভব 'কুল্লি' পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, বলেছে—

> "এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্লি অগ্রসর হ'তে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হতে বাধ্য। কিন্তু অন্যরকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতে হবে।"

তারপর আশ্চর্য পেশাদারিত্বে হাফিজ সেই দুই মৃত মূর্তির সঙ্গে যথাক্রমে তাদের মা ও স্ত্রী-র ভূমিকায় বাচিক অভিনয় করে যায়।

সবশেষে বলা যায়, চরিত্রে ও স্বভাবে সজ্জন না হলেও ইন্সপেকটর হাফিজই 'কবর' নাটকের প্রাণকেন্দ্র, সেই প্রতিটি ঘটনার সঞ্চালকের কাজ করেছে।

মুর্দা ফকির

মুনীর চৌধুরী এই চরিত্রটিকে সচেতনভাবেই প্রতীকী করে তুলছেন। যে-উৎস থেকে নাটকের কাহিনী উৎসারিত, তার সঙ্গে কিন্তু মুর্দা ফকিরের ব্যক্তিগত কোনও যোগসূত্র নেই। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নিজেদের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য সংঘটিত আন্দোলনে শহীদ হয় কিছু তরুণ প্রাণ। গোরস্থানে কবর দিতে পাঠানো হয় পোস্টমর্টেম হয়ে আসা সেই লাশগুলোকে। সেই একই গোরস্থানের সর্বক্ষণের বাসিন্দা ফকিরকে তাই স্থানীয়রা মজা করেই নাম দিয়েছে 'মুর্দা' ফকির। হাফিজের কাছ থেকে পাঠক তার পরিচয় পায়। লোকটা নাকি ভাল লেখাপড়া জানে। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করত। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে-মা-স্ত্রীকে মরতে দেখেছে, কিন্তু কাউকেই স্বচক্ষে কবরে যেতে দেখেনি। চোখের সামনে ওই মৃতদেহগুলোয় পচন ধরেছে, খাদ্য হয়েছে শকুন-শেয়ালের। সেই থেকে নাকি

মাষ্টার পাগল, গোরস্থান থেকে কিছুতেই সরতে চায় না, "পাগল! বদ্ধ পাগল!" অথচ এই বদ্ধ পাগলই কিন্তু হাফিজকে বলে (অনেকটা নাটকের বিবেকের মতো) : "আমি ওদের (লাশ) ভাল করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরে নি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নীচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।" বরং পাঠককে আমূল চমকে দিয়ে ফকির বলে ফেলে : "তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও।.....ইস্! গোর 'খুড়েরা কি ভুলই না করেছে!" এই সংলাপের পরই মঞ্চ থেকে মুর্দা ফকিরের প্রস্থান ঘটে এবং শেষবারের মত আসে একেবারে নাটকের শেষে। দুই মৃত মূর্তিকে যখন ভয়ার্ত নেতা আবারও গুলি করে হত্যা করতে উদ্যত, সেসময় মুর্দা ফকির টাটকা খুনে রাঙা তাজা বুলেট নিয়ে এসে বলে—"যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি।" ফকির চলে যায় আর নেপথ্য থেকে চিৎকার করে মৃত ছাত্রদের আহ্বান করতে থাকে। কেননা "আজ গুলি গুলি হবে!" বস্তুত লোকটির এই উল্লাসের সঙ্গে দর্শক-পাঠকও যেন মুহূর্তে একাত্ম হয়ে যায়।

এই চরিত্র এক অদ্ভুত সৃষ্টি। জীবিত এক মানুষকে প্রথম থেকে 'মুর্দা' হিসেবে পরিচিত করেছেন নাট্যকার, অথচ তার মানবিক বোধ বা হার্দিক অনুভূতিগুলোকে কিন্তু 'মুর্দা' করে দেখান নি। 'কবর'-এর মতো রাজনৈতিক নাটকে তাই সে প্রতীকী ও সার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

মূর্তি

'কবর' নাটকের মধ্যপর্বে হঠাৎই আবির্ভূত হয় দুই আশ্চর্য চরিত্র, দুজনেই গুলিতে মৃত, যাদের প্রথম জনকে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন 'মূর্তি' বলে। জীবিতাবস্থায় এ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র। এখন তার খুলি উড়ে গেছে তবু বাঁচতে চায়, কবরে যেতে চায় না, কেননা 'কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা' তাকে 'ভর' করেছিল। ইন্সপেক্টর হাফিজ ছাত্রটির মায়ের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে। মূর্তিও যেন ফিরে পায় তার সদ্য হারানো জীবন, মায়ের স্নেহ, স্মৃতিচারণায় ফিরিয়ে আনে মায়ের তত্ত্বাবধানে, মমতায় কাটানো তার ছাত্রাবস্থা। এই চরিত্রের নিজস্ব কোনও গুরুত্ব নেই, তবে নাটককে সে প্রাণ দিয়েছে, পশুবৎ মৃত ছাত্রদেরও যে একটা সুন্দর জীবন ছিল, বাঁচবার তাগিদ ছিল—সে কথাই বোঝা যায় এই মূর্তি চরিত্রের অবতারণায়।

মূর্তি (২)

এই মূর্তি [২] ও প্রথমজনের সঙ্গেই পার্টিশানের ওপাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রথমজনকে ঘুমোতে পাঠিয়েই হাফিজ শুরু করে তার দ্বিতীয় ভূমিকায় অভিনয়—মূর্তি [২] এর সঙ্গে তার স্ত্রী হয়ে। প্রথমজনের এ যেন পিতা। জীবিতাবস্থায় অভাবে পড়ে সে হয়ত তার কোলের সন্তানকে খাদ্য দিতে পারে নি, বেতন ছিলনা দেড় মাস। তাই বাঁচাতে পারে নি শিশুকে। তারপর মরে গেছে নিজেও।

এই দুই মূর্তিকে দেখে নেতাকে ভয় পাইয়ে দেয়াটাও হয়ত নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। কেন না নেতা তো প্রচুর আশ্বাস দেন—অন্নের, বস্ত্রের, দিনবদলের। কিন্তু আশ্বাস তো কখনই বাস্তবায়িত হয় না। তাই চোখের সামনে নিজের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতার রূপ দেখে নেতা ভয় পেয়ে যান। দুই মূর্তি চরিত্রকে প্রতীক রূপেই সৃষ্টি করে নাট্যকার এভাবেই কাহিনীর চাহিদা পূরণ করে তাকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন।

৪.৫ নাটকের দৃশ্য বিশ্লেষণ

'কবর' নাটকে বস্তুতপক্ষে কোনও দৃশ্যান্তরই ঘটে নি। গোটা নাটকটিই একটি মাত্র দৃশ্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে বারে বারেই যেখানে চরিত্রবদল ঘটেছে, বদল ঘটেছে দৃশ্যকল্পেরও। শুরুতে মঞ্চসজ্জার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পরেই

নাট্যকার বলে দেন—'দৃশ্য : গোরস্থান। সময় : শেষ রাত্রি'। এরপর আর একবারও এমনভাবে দৃশ্য সম্পর্কে বলা হয় নি নাটকে। এই যে একটা দীর্ঘ দৃশ্য জুড়ে একটা গোটা নাট্যকাহিনী উপস্থাপিত হল, শেষে মনে হয় পুরোটাই যেন নেতার দুঃস্বপ্ন ছিল। আমরা দেখি, পার্টিশানে বিভক্ত মঞ্চের অন্যপাশ থেকে মাঝেমধ্যেই মৃত মূর্তিরা বেরিয়ে এসেছে এবং বাকি সময় জীবিতরা পার্টিশানের এপাশে থেকে নাটককে এগিয়ে নিয়ে গেছে। একেবারে শেষে শুধু গার্ডের কথামতো আমরা জানতে পারি, বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। নেতা, হাফিজ সকলে উঠে পড়বে সেখানে। কিন্তু তা বাদে শুধুমাত্র গোরস্থানের পটভূমিতে, একটি মাত্র দৃশ্যেই নির্মিত হয়েছে 'কবর' নাটকটি।

৪.৬ ঘটনার তাৎপর্য বিচার

সাল ১৯৫২, তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি। পাঁচ বছর আগে ধর্মের ভিত্তিতে যখন এক-দেশ ভেঙে দু'টুকরো হয়, তখন মনে করা হয়েছিল যে সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু না, ধর্মকে ছাপিয়ে উঠল ভাষা এবং অর্থনীতির গুরুত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারি প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার অধিকাররক্ষা-দিবস। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এক গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান দাবি করলেন, বাংলাভাষা লেখা হবে আরবী হরফে! কিছুদিন বাদে ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভে উদ্দাম হলেন। দৃঢ়-প্রত্যয়িত হয়ে তাঁরা বাংলা ভাষার দাবিতে সূচনা করলেন মরণপণ প্রতিরোধের। শেষপর্যন্ত সত্যিই নিহতও হলেন বেশ কয়েকজন। তাঁরা মাতৃভাষা রক্ষার শহীদ!

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এই পরিপ্রেক্ষিতেই লেখেন নাটক 'কবর'। পটভূমি শেষ রাত্রির গোরস্থান। রাত্রে প্রচুর লাশ কবর দেওয়া হয়েছে। ইনস্পেকটর হাফিজ বেগতিক দেখে বলেছিল একটা বড় মতন গর্ত খুঁড়ে অনেকগুলো লাশ একসঙ্গে ঢুকিয়ে কোনক্রমে মাটি চাপা দিয়ে দিতে। এ হল সরকারি সিদ্ধান্ত! একটিই দীর্ঘ দৃশ্য-সম্বলিত কবর নাটকের একাধিক ঘটনাবলীর মধ্যে এটিই প্রথম চমকপ্রদ ঘটনা। তারপরের চমক, যখন রাজনৈতিক নেতা হাফিজকে সমর্থন করেন না, কেননা এমনটি ঘটলে তাঁর প্রাপ্য ভোটে ঘাটতি হবে! সরকারি কাজে সরকারের টাকা তিনি খরচ করতে কুণ্ঠিত নন।

মুর্দা ফকিরের চরিত্র-বিশ্লেষণ করেই দেখানো হয়েছে তার দ্বারা সংঘটিত ঘটনাবলীর তাৎপর্য।

৪.৭ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'কবর' নাটকের রাজনৈতিক পটভূমিটি বিশ্লেষণ করুন।
২. 'কবর' নাটকের কাহিনিগত অভিনবত্ব কী, আলোচনা করুন।
৩. 'মুর্দা' ফকির এবং ১ম ও ২য় 'মূর্তি'-কে প্রতীকী চরিত্র রূপে গণ্য করার তাৎপর্য বিচার করুন।
৪. নেতা এবং ইনস্পেকটরের এই নাটকে গুরুত্ব কতটা বলুন।

৪.৮ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'কবর' নাটক রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।
২. 'কবর' নাটক থেকে ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির ঢাকা শহরের ছবি কতটা মেলে, বলুন।
৩. 'কবর' ঠিক কোন্ বর্গের নাটক, বুলন।
৪. 'কবর' নাটকের মঞ্চদৃশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

৪.৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'কবর' কোন্ উপলক্ষে কোথায় রচিত হয়েছিল?
২. ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় মাতৃভাষা আন্দোলনে যোগদান করে শহিদ হন যাঁরা, তাঁদের নাম কী?
৩. একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো কীভাবে পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন?
৪. মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'মুর্দা' ফকির কী জানত?
৫. হাফিজ এবং নেতার গায়ে 'মুর্দা' ফকির কিসের গন্ধ পেয়েছিল?
৬. কবর-খোঁড়া শ্রমিকদের কী বক্তব্য ছিল?
৭. 'মুর্দা' ফকির আগে কী পেশায় নিযুক্ত ছিল?
৮. কাদের "চ্যাঁচাতে" ভুলে-যাওয়া চেয়েছিল নেতা?
৯. কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে ভেঙেছিল কে?
১০. মৃত (১) এবং মৃত (২) মরার আগে কী ছিল?

চরিত্র

নাম	বয়স
রৌশনারা	২৮
ডাক্তার	৩২
আতরালী	৬০
নার্স	২৫
আলী সাহেব	৬০

প্রথম দৃশ্য

(মানসিক হাসপাতালে ডাক্তার হান্নানের চেম্বার। ডাক্তার হান্নান নিবিষ্ট মনে মাইক্রোস্কোপে প্লেট পরীক্ষা করছেন। হাসপাতালের রোগী রৌশনারা আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে।)

রৌশন ডাক্তার এর একটা শেষ দেখবেন কিনা, শেষবারের মতো বলুন। কতবার আপনাকে বলেছি, সব বারই আপনি বলেছেন—দেখব। কিন্তু একবারও তো সে দেখাটা দেখালেন না। আপনার প্রিয় নার্স আমাকে জ্বালাতন করছে। কেন? আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এ মেয়েটার এত আগ্রহ কেন? ডাক্তার আজ আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমি চাই আপনি আর ন্যাকামী না করে নার্সটাকে বারণ করেন। কি হলো? ঐ যন্ত্রটা ছেড়ে আমার দিকে একবার তাকান।

[রৌশন ডাক্তারের সামনে এল। ডাক্তার যন্ত্র থেকে চোখ তুলে একবার তাকালেন আবার যন্ত্রে চোখ দিলেন।]

আমার জ্বালাটা... আমি আপনার হাসপাতালে বন্দী। কেন বন্দী—তার একটা ভারী কারণ আপনারা নিজেরাই পরামর্শ করে স্থির করে নিয়েছেন। আমার শত চিৎকারেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি বেশ সুস্থ স্বাভাবিক একজন মেয়ে। আমার কোন রোগ নেই, অসুখ নেই। আপনি এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন চমৎকারভাবে রটনা করে দিয়েছেন—আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার মাথার মধ্যে কতকগুলো অস্থির চিন্তা ঝাঁপাঝাঁপি করছে—হাসপাতালের বাইরে থাকলেই যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে আমি একটা কিছু নাটকীয় তামাশা . . . পারি . . . আমার সুখের নীড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে, পারি, আমার গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে পারি, আমার প্রিয় স্বামীর গলায় ধারাল চকচকে ছুরি—

[রৌশন খলখলিয়ে হেসে উঠল।]

পাগলে যা যা পারে এক এক করে সেই সব কথা নির্বিকার জন্তুর মতো চিন্তা না করেই আমার আত্মীয় পরিজনেরা আপনাকে বলেছে আর আপনি ডাক্তার, দেহ ও মনের মস্ত বড় খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ

নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে আমাকে আপনার হাসপাতালের একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রেখে দিয়েছেন। রেখে দিয়েও শান্তি নেই, একটা নার্সকে আমার পেছনে ফেউ লাগিয়ে রেখেছেন। সেই আহাম্মক মেয়েটা, আহা কি চেহারা! মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, মরার মতো ফ্যাকাশে মুখে নকল হাসির সোহাগ নিয়ে দিনরাত আমাকে পাহারা দিতে বসে আছে। আচ্ছা, মেয়েটার চোখে কি ঘুম নেই, মনে কি একটা মানুষের প্রাণ নেই? মেয়েটা কি মরতে আর বাঁচতে ভুলে গেছে? ডাক্তার আপনার নার্সটাকে আমার অসহ্য লাগে। ও ডাক্তার ঐ নার্সটা আপনার কে হয় জানি না, মেয়েটাকে আমি একদিন ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দেব কিন্তু। মেয়েটা আমাকে তিলে তিলে মারছে, আমি ওকে এক ধাক্কাতেই মেরে গুঁড়ো করে দেব না? ও ডাক্তার, পাগলের সাত খুন মাফ। না?

(রৌশন খলখলিয়ে হেসে উঠল।)

তোমার প্রিয় নার্সটাকে তুমি সাবধান কর। মেয়েটাকে সাপের মুখে ছেড়ে দিয়েছ কিন্তু বিষের মন্ত্র শেখাওনি, তুমি কেমন ডাক্তার হে!

চলি, আমার বেড়াতে যাবার সময় হলো। আজ আমি খোলা বাতাসে নাচব, আমার দু'পায়ে নাচের মুদ্রা ভীষণ কথা বলছে। ওগো ডাক্তার, লোকে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে, আমি শুনতে পাই—তুমি নাকি আমাকে ভালোবাস। আমার ভালোবাসায় তুমি এতই মগ্ন যে আর কোন রোগীর দিকে তোমার কোন নজর নেই। আচ্ছা দিনরাত আমার কথা কি এমন চিন্তা কর ডাক্তার। আমার কথা চিন্তা করে তোমার কোথায় সুখ সঞ্চার হয়? হৃদয়ে না মাথায়? কোথায়, কোনখানে তুমি আমাকে সঙ্গোপনে বসিয়ে রেখেছ বলো ত? কি দেখছ অমন করে? আমার কথার সাগরে যদি তুমি ডুবে থাক, তাহলে তোমার দফারফা, তুমি মরবে। মরতে যদি চাও তাহলে আমাকে দ্যাখ, আপত্তি করব না।

(ডাক্তার এবার রৌশনকে দেখছেন।)

আপত্তি করলেও তো তুমি শুনছ না। ও ডাক্তার আপনার শ্রবণ ইন্দ্রিয়গুলো আমি রূপ দিয়ে ভোঁতা করে দিয়েছি। আমি জাদু জানি, বুঝলে, জাদুর জালে তোমাকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছি। বেশি কথা বলবার সময় নেই, চল্লাম।

(রৌশন চকিতে নাটকীয়ভাবে চলে গেল। ডাক্তার তাকিয়েই আছেন, যেন মজা পেলেন, হো হো করে হেসে দিলেন।)

ডাক্তার — তবু আজ কিছু কম কথা বলে গেল। এই যে সিস্টার—

(নার্স এল।)

কি ব্যাপার! তোমার রোগী আজ যেন কিছু বেশি ক্ষিপ্ত। কড়া পাহারা বসিয়েছে মনে হচ্ছে। খুব চালাক বুঝলে, ওকে যে কয়েক দিন থেকে ক্লোজ অবজারভেশনে রাখা হয়েছে, ঠিক ধরেছে। তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?

(নার্স মৃদু হাসছে।)

এমন নির্মল সুন্দর মহিলা, সব কিছুই তো ঠিক আছে, ঠিক মতো চলছে। তবু কোথায় কি যেন, একটা কিছু—তোমার আমার জানাশোনা জগতে যেন একটা খাপছাড়া পাখি এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। এমনি

কি আর ঝাপটাচ্ছে? মানুষ শখ করে, রাগ করে, কাঁদে, নদীতে সাঁতার কাটে, কিন্তু এলোমেলো হয় না সিস্টার। শখ করে রাজা সাজে, একদিনের জন্য ফকির সাজে কিন্তু শখ করে মানুষ তার মনের ডানা ঝাপটায় না। রৌশনারার সেই ডানার কান্নাগুলোর সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। ওকে ভালোবেসে ভালোবাসার তথ্য ফিরিয়ে দিতে হবে। ভালো না বেসে ওকে শান্ত করা যাবে না সিস্টার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হাসপাতালে রৌশনারার কেবিন। হাসপাতালের বৃদ্ধ ঝাড়ুধার আতরালী কেবিনের মেঝে ধোয়ামোছা করছে।)

রৌশন — তাহলে তোমার নাম হইলো গিয়া আতরালী।

আতর — জে, আতরালী।

রৌশন — আর তোমার বিবির নাম হইল গিয়া গুলমোহর।

আতর — গুলমোহর।

রৌশন — ভয় আতরালী! তুমি দুনিয়ার মধ্যে যাইট বছর কাটাইয়া দিলা, বেশ করলা। কিন্তু তুমি দুনিয়াডার তো কিছু দেখলা না।

আতর — দেখছি, মেলা কিছু দেখছি।

রৌশন — হ দেখছ! তুমি কইলা আমি শুনলাম। তুমি একশ বাইশ তলার বাড়ি দেখছ?

আতর — জে?

রৌশন — পানির নীচে দিয়া জাহাজ চলে দেখছ? দ্যাখ নাই। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা দেখছ? দ্যাখ নাই। তাহলে তুমি কী দেখলা আতরালী। এই হাসপাতালের ঘর মুছতে মুছতেই নিজের জীবনডারে শ্বাস কইরা দিলা।

আতর — দেখি নাই বলতে পারেন না। হরেক রকম মানুষ দেখলাম, আপনার এই ঘরে কত রকম মানুষ আইল আর গেল।

রৌশন — মানুষের যাওন আওনই দেখলা? বসন্ত কালের কোকিল দেখছ? গাঙ্গের পাড়ে শঙ্খচিল দেখছ? যে নদীতে এক সময় উথাল পাথাল ঢেউ আছিল, সেই নদী শুকাইতে কেমন মরুভূমি হইয়া যায় দেখছ? দ্যাখ নাই আতরালী, তুমি কিচ্ছু দ্যাখ নাই। হরেক রকম মানুষের যাওন আওন দেইখ্যা তোমার দুই চক্ষু আন্ধার। তুমিও নদীও দ্যাখ নাই, ঢেউও দ্যাখ নাই আর মাছের রাক্ষস শঙ্খচিলও দ্যাখ নাই। তোমার দুই চোখ আন্ধার। তুমি একটা অমাবস্যার ভূত। অমাবস্যার ভূত। অমাবস্যার আন্ধারে ভূতরা কেমন কাঁদন করে দেখবার চাও, দেখাইতে পারি। কদম গাছের মগডালে নিশুতি রাইতে ভূতরা কেমন ডাওর করে শুনবার চাও, শুনাইতে পারি আতরালী। শুনবা? মরুভূমির মধ্যে মায়ের বুকের বাচ্চা বালির গহ্বরে মুখ লুকায়া কেমন কইরা মাকে মা বইলা ডাকে, তুমি যদি একবার শুনতে চাও আতরালী আমি তোমারে শুনায়া দিতে পারি।

আতর — আইজ আপনে বেশি কথা কন। অত কথা কইলে আপনার রোগ ভালা অইব না।

রৌশন — আমার রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে অহনতরি তেমন ডাক্তার দুনিয়ার মধ্যে জন্ম লয় নাই। তোমার হাসপাতালের ডাক্তারডা ভালা মানুষ। আমার চোখের ওপর চোখ রাইখ্যা কতদিন আমার মনের মধ্যে

পরবেশ করতে চাইছে। আমার এই আলো অন্ধার চুলের মধ্যে ঢাকা মাথার দপদপানীরে ঘুমের ওষুধ দিয়ে শ্রান্ত করতে চাইছে। কিন্তু কিছুই তো হলো না আতরালী। ডাক্তার আমার মনের মধ্যে চোখ রাখতে পারল না, আমার মাথার আগুন কমাতে পারল না।

আতর — আপনের কী, কি হইছে কী?

রৌশন — আমার কিছু হয়নি আতরালী। আমার কিছু একটা হতে পারত, সেই একটা কিছু কবে যে হবে তাই ভেবে ভেবে আমার আর ভাবতে ভালো লাগে না। আমার মনের ভিতর থেকে একটা উথাল পাথাল নদীর ঢেউ যে হারিয়ে যায় না, বালুর সমুদ্রের মধ্যে আমি হাঁটতে পারি না। আমার যে পাগল সেজে আর এই বন্দীশালায় থাকতে মন চায় না। ডানা ঝাপটিয়ে আমার শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে এল আতরালী।

তৃতীয় দৃশ্য

(ডাক্তারের কক্ষ। ডাক্তার রোগীর রিপোর্ট পরীক্ষা করছিলেন। টেলিফোন বেজে উঠল।)

ডাক্তার — হ্যালো। হ্যাঁ বলছি। দয়া করে জোরে বলুন। হ্যাঁ এবার শুনছি। নিশ্চয় চিনতে পেরেছি। কেমন আছেন? ভালো থাকলেই ভালো। এখানে, হ্যাঁ এখানেও সবকিছুই ভালো। আগের চেয়ে অনেক ভালো। বলুন। তাতো বটেই আপনার অবস্থা, জটিল অবস্থা। এত চিন্তা করবেন না। এখানে একবার আসবেন? একবার কেন একশ বার আসবেন।

(রৌশন নিঃশব্দে এসে ঢুকল)

আপনার ছেলের বৌ, পুত্রবধূ? কে বলল রাগ করবে? না, না, রৌশনারা খুব ভালো মেয়ে। ভাগ্য? কি জানি আলী সাহেব, ভাগ্য আবার কি জিনিস। আদাব, আদাব।

(ডাক্তার রিসিভার রাখলেন।)

রৌশন — আমি ভাবছিলাম।

ডাক্তার — কে?

রৌশন — আজ বোধহয় ঘন্টার পর ঘণ্টা টেলিফোনে কথাই বলে যাবেন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন নাকি? সবাই ভালো আছে? আপনার ছেলেমেয়ে?

ডাক্তার — রৌশনারা—

রৌশন — বলুন।

ডাক্তার — তুমি আমার হাসপাতালের একজন প্রিভিলেজড রোগী। যখন তখন আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়ে গেছ। কিন্তু সুবিধা ভোগ করলে দায়িত্ব বেড়ে যায় তাতো জান।

রৌশন — ডাক্তার কি এর পরে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করবেন?

ডাক্তার — তুমি আমাকে মূল কথাটা বলতে দিতে চাইছ না রৌশনারা।

রৌশন — আমি এক ঘন্টার ছুটি চাই, বেড়াতে যাব।

ডাক্তার — যাও।

রৌশন	হাসপাতালের বাহিরে যাব।

ডাক্তার	কোথায়?

রৌশন	ন্যাকামী করছেন? কোথায় যেতে চাই সেকথা বুঝি আপনি জানেন না?

ডাক্তার	রৌশনারা, তুমি কয়েকদিনের মধ্যে খুব দুর্বার হয়ে উঠেছ। তিন মাস আগে যেদিন তুমি প্রথম এ হাসপাতালে এলে—

রৌশন	আমি আসিনি, আমাকে জোর করে হাসপাতালে বন্দী করা হয়েছে।

ডাক্তার	বেশতো, তাই যেন হলো। যখন তোমাকে প্রথম আনা হলো, তুমি একটিও কথা বলতে না, আত্মীয় স্বজন দেখলে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতে। যেদিন পুলিশ এল, তুমি আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। আর সেই তুমি কয়েক দিনের মধ্যেই কত বদলে গেছ। দাঁড়াও, আচ্ছা রৌশনারা সতি করে বলোত, তুমি কি একটা ভয়াবহ সত্যকে অস্বীকার করার জন্য, এমন ছলনাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছ? আমাদের এত চেষ্টা এত সতর্কতাকে তুমি চতুরালি করে রিডিকিউল করছ। তুমি সত্যিই কি পাগল নাকি?

(রৌশন খলখল করে হেসে উঠল।)

রৌশন	সত্যি যদি সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন আমি চলে যাই। আমার তো যাবার জায়গা এখনো আছে। আমার বুড়ো শ্বশুর আমার জন্য কাঁদছেন। আমার স্বামী আমার করুণা ভিক্ষা করে হাজতে ফরিয়াদ করছে আর আমার—আমার সোনার সংসারের প্রত্যেকটা জানালা দরজা উদোম হয়ে পড়ে আছে। আমি কখন যাব কখন আবার সাজিয়ে গুছিয়ে সব ঠিকঠাক করব। এমনিভাবে সেই ডিসেম্বরে যখন ফিরে এলাম, একটা একটা করে ভাঙা দরজা জোড়া লাগালাম, জানালায় রামধনু পর্দা ঝুলল, ঘরের মেঝে হাসল, শোবার ঘরে রাতের বাতি জ্বলল, আমার স্বামী আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল,

রৌশন! তুমি ফিরে এসেছ, ভাবতে পারি না, বিশ্বাস হয় না। তুমি এলে আমাদের স্বাধীনতা এল। ও রৌশন যদিও আমার যথাবিহিত সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার সাজানো বাগানের শ্যামল গোলাপটাকে জন্তুরা সব দলে পিষে ছারখার করে দিয়েছে তবু আমি সুখী রৌশন, দারুণভাবে সুখী যে তুমি ফিরে এসেছ। আমার বুকের মধ্যে বুক রেখে তুমি কাঁদছ, উষ্ণ নিশ্বাসে আমার হিম করা বুকে জীবনকে সঞ্চার করছ, রৌশন, আমি আর কিছু চাই না, আর কিছু না। আমার স্বাধীনতার মতো তুমি পবিত্র।

ও ডাক্তার তুমি সত্যি আমারে যাইতে দিবা? দাওনা, তোমার খাঁচার বন্দী পাখিডারে একবার ছাইড়া দাও। বাতাসের ঘোড়ায় চইড়া একবার ছুইট্টা যামু, উথাল পাথাল নদীডার বালুর মধ্যে একবার—বালুর বুকের মধ্যে আমার বুকডা রাইখ্যা শুইয়া থাকমু ডাক্তার, আমার জ্বালা যদি কিছু কমে ডাক্তার, তুমি সীমারের লাহান পাষাণ হইও না; বুঝ, বোঝবার চেষ্টা কর।

ডাক্তার	আজ তুমি যেও না রৌশনারা—

রৌশন	ক্যান? আজ আমি যমুনা ক্যান?

ডাক্তার আজ তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর আসবেন। তোমার স্বামী তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।

রৌশন ও। তাহলে তো আমার আর কোনখানে যাওয়ার উপায় নেই। শ্বশুর! শ্বশুর তো হলো আমার বাপের তুল্য। আর স্বামী। স্বামীর পায়ের নীচে বেহেস্ত। শ্বশুরকে অস্বীকার করে বালুর বুকে বুক রেখে শুয়ে থাকব তেমন বেহুদা বউ আমি নই ডাক্তার। তাহলে, আমি এখন কি করব! ছেলের বউ হিসেবে আমার করণীয় কি আছে? ডাক্তার, আমি আমার কেবিনে গিয়ে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকি আর এক এক করে চিন্তা করে দেখি, শ্বশুরকে কী ভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। চিন্তা করতে করতে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে আপনার নার্সকে বলবেন আমাকে জাগিয়ে দিতে। শ্বশুরের মুখে শুনব, আমার প্রিয় স্বামী আমাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য এমন আকুলিবিকুলি করছে কেন।

(রৌশনারা কক্ষ ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(ডাক্তারের কক্ষ। রৌশনারার শ্বশুর আলী সাহেব এসেছেন। ডাক্তার তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন।)

ডাক্তার আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন? কিন্তু দেখা না করে চলে যাবেন সেটা কি ভালো হবে জনাব আলী? ঘুম থেকে জেগে যখন জানবে, আপনি এসে চলে গেছেন, ওর খুব কষ্ট হবে। হবে না? আপনার ছেলে কেমন আছে? ভালো। আরে, সেকি তাহলে সত্যিই উঠছেন?

(আলী সাহেব যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।)

না, না খুব একটা বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। যা সত্যি তার জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা তো কিছুই জানি না ঐ ছেলে লালন, লালনকে সত্যি সত্যি কে বিনাশ . . . আপনার ছেলে?—না, না সে তো অসম্ভব। এও কি সম্ভব। আপনার ছেলে আলী নেওয়াজ এতখানি নৃশংস—আর নৃশংস হওয়ার তো কোন দরকার ছিল না। কিছু বলবেন—যাবেন—চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। আপনি দেখবেন, নিশ্চয় রৌশনারা সত্য কথা বলবে। সত্য তাকে স্বীকার করতেই হবে।

(নার্স এল।)

কি খবর সিস্টার? তোমার রোগী...জেগেছে। আলী সাহেব আপনার পুত্রবধূ,...এই যে রৌশনারা!
(রৌশনারা এসে ঢোকে।)

রৌশন আমি খুব ভালো আছি আব্বা। আমার জন্য এক ফোঁটাও চিন্তা করবেন না। আপনাদের ডাক্তার সাহেব লোকটা খুব নিষ্ঠুর। জানে যে, আমার কোন রোগ নেই, অসুখ নেই, মাথার মধ্যে কোন পাগলামী নেই, আমি মোটেই পাগল নই। তবু আমাকে জোর করে ধরে রেখে দিয়েছে। আব্বা, আপনি দু কলম খসখস করে লিখে দিন না, ডাক্তারের সাধ্য কি আমাকে আটকে রাখে। আব্বা, আপনি খেজুরের গুড় দিয়ে পায়েস খাচ্ছেন তো? রান্নার চুলোর ফিতেটা বদলাতে হবে আব্বা। ছেঁড়া ফিতার শিসে কেরোসিনের বাজে গন্ধ হয়। গরুর বাচ্চাটার রঙ শেষে কালো হলো না লাল? আমি বলেছিলাম লাল, আপনার ছেলে বলেছিল কালো, কে সত্যি হলো আব্বা, আপনার ছেলে না আমি, আপনার ছেলের বৌ?

ডাক্তার রৌশনারা—

রৌশন থামুন তো ডাক্তার। শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলছি, আপনি মাঝখানে কথা বলেন কেন? আব্বা আমার কিন্তু হাসপাতালে থাকতে খুব ভালো লাগছে। এখানে ডাক্তার নার্স আর রোগী, বাইরের কোন ঝামেলা নেই, কোলাহল নেই। বাতাসে ওষুধের কড়া গন্ধ, আকাশে রৌদ্রের জ্বালা, সাধে কি মানুষ অসুখ হলে হাসপাতালে আসে—আরাম নিকেতন। ওর বন্ধুরা এখন বুঝি আর আসে না? কি চমৎকার এক একজন বন্ধু। আমাকে সবাই খুব ভালোবাসত। আব্বা, আমি তো বিরাট কিছু একটা করে ফিরে এলাম। আমার গৌরবে ওর বন্ধুদের কত গৌরব। আমাকে মাথায় রাখবে না সিংহাসনে বসাবে, এত উৎসাহ ওদের। সেদিনের কথা মনে আছে আব্বা! ঐ যে ঐ যে সেবার আপনার ছেলে নতুন গাড়ি কিনল—সেই গাড়িতে চড়ে বেশ সাজগোজ করে আমাকে যেতে হলো একটা অভ্যর্থনা সভাতে। আমি সেই সভার প্রধান অতিথি। একটা ইয়া বড় ঢাউস চেয়ারে আমি বসলাম, আমার রূপে সভার মঞ্চ উজালা হয়ে উঠল। হল-ভর্তি নারী পুরুষ আহা সে কি উদার হাততালি যখন আমার এই গলায় প্রকাণ্ড এক মালা ঝুলিয়ে দিলেন সভার সভানেত্রী। আমার রূপ আরো খোলতাই হয়ে জ্বলজ্বল জ্বলজ্বল করতে লাগল, ডাক্তার। বুঝলাম, আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছি—এমন মহান এমন মহৎ একটা ঘটনা আমি ঘটিয়েছি, না হলে আমাকে ঘিরে এত আলো, এত রঙ, এত করতালি কেন? বিশালাকার সভানেত্রীর কণ্ঠে সেদিন এত বাছাই বাছাই শব্দের মেলা কেন? আব্বা, সেই মহতী সভা আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিল। আর আপনার ছেলে সেই টাকা বাড়ি ফিরে আপনার সামনে ধরে কি যেন বলতে চেয়েছিল, আমি দেখলাম, আপনি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আপনার ঘরে গিয়েছিলেন। আব্বা, আপনি সেদিন আবার কাঁপলেন কেন এবং সৃষ্টিছাড়া দুর্বল দুঃস্থ মানুষের মতো বিমূঢ়তা প্রকাশ করলেন কেন? আব্বা আমার গৌরবে আপনি এতখানি মুষড়ে পড়েন কেন?

(আলী সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠছেন)

আব্বা আপনি উঠছেন নাকি? সেকি! আপনার এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। আমি তো ভাবলাম আমার এত কথা শোনার জন্য আপনি এই পড়ন্ত বিকেলে হাসপাতালে এসেছেন। আপনার ছেলের বৌ—ওর জীবন বৃত্তান্তের যে পাতাটা আগুনের হল্‌কায় দগ্ধীভূত হয়ে কালো অঙ্গার হয়ে আছে সেই কালো অঙ্গারে আপনার কাঁপা কাঁপা হাত বুলিয়ে দিতে এসেছেন।

(আলী সাহেব যাচ্ছেন। রৌশনারা দরজায় দাঁড়াল।)

আব্বা, আপনি যাবেন না। আমি জানি, আপনি আমার কাছে কি চান। আমি এও জানি আপনার ভেতরে যে বাপের মনটা জটিল গ্রন্থির গিঁটে গিঁটে এই ক'বছর এলোমেলো অরণ্যের রহস্য হয়ে উঠেছে সেই মনে এখন একটা ছোট্ট পাখি একটা ভাঙা ডালে বসে আপনাকে নাড়া দিয়েছে। আপনি আর সহ্য করতে পারছেন না। আপনার চারদিকে ধুলোবালির উন্মাদ ঝড় বইছে, তবুও একটা প্রদীপের আলো আপনাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আপনার ছেলের জীবন প্রদীপ আপনাকে জ্বালিয়ে রাখতেই হবে। আব্বা, আপনার ছেলে—আমার স্বামী, আমার করুণা ভিক্ষা করে আপনার হাতে একটা প্রদীপ পাঠিয়েছে। এই প্রদীপে আগুন দিতে হবে আমাকে। আমি সেই আগুন কোথায় পাব। কোন হাহাকার মরুভূমির ধূলিকণা থেকে আগুন এনে আপনার ছেলের প্রদীপে ঢালব। আমার সব আগুন যে পুড়ে

ছাই হয়ে গেছে আব্বা। আমার লালনের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার সব বৈভব, সব ঐশ্বর্য, সব নীরবতা যে হিম হয়ে গেছে। আমি আর পারছি না। এ জীবন, এ সুখ, এ বন্দী খাঁচা, এই ডাক্তার, এই নার্স, এরা আমার কেউ নয় আব্বা। এরা আমার কাছে চৈত্রের শুকনো পাতা—রঙ নেই, সুবজ নেই, প্রাণ নেই—যন্ত্র—বিকট এক একটা যন্ত্রের পুতুল।

(রৌশনারা কাঁদছে। আলী সাহেব এবার সত্যিই যেতে চাইছেন)

আব্বা, যাবার আগে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করতে ভুলে যাচ্ছেন কেন! মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণার গারদে আপনি বন্দী আর এক বন্দীর কাছে এসেছেন সান্ত্বনা ভিক্ষা করতে। হায়, হায়রে মানুষ। এ গভীর অসুস্থ পান্ডুর পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে আর কি দেবে আর কতবার নদী সাগরে ছুটবে, আর কতদিন শরতের আকাশ নীল হবে! মানুষের চাওয়া শেষ হয় না কেন আব্বা? এ সুন্দর উদার পৃথিবীতে মানুষ কিছুকাল নীরবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না কেন!

(রৌশনারা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আলী সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চাইছেন কিন্তু সঙ্কোচে অস্থির হচ্ছেন। ডাক্তার নীরবে বেরিয়ে গেলেন।)

পঞ্চম দৃশ্য

(হাসপাতালে ডাক্তারের কক্ষ। নার্স টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। ডাক্তার প্রবেশ করলেন। এখন রাত তিনটা।)

ডাক্তার সিসটার। সিসটার।

(নার্স ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।)

এতরাতে আমি তোমার কর্মে অবহেলা দেখবার জন্য আমার কোয়ার্টার থেকে হাসপাতালে ছুটে আসিনি। রৌশনারা এখন এই রাত তিনটায় কি করছে, কেমনভাবে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে তা দেখবার জন্য এসেছি তা যদি মনে করে থাক তাহলে . . . তুমি কি জান রৌশনারা এখন তার কেবিনে কি করছে—

(নার্স বাইরে যেতে চাইছে।)

দাঁড়াও। রৌশনারা এখন তার কেবিনে থাকুক আর নাই থাকুক আমি সেজন্য মোটেই চিন্তিত নই। কি হলো, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দুরারোগ্য ব্যাধি আবিষ্কারের চেষ্টা করছ? সিস্টার, তোমাদের অতন্দ্র প্রহরায় রোগীর যন্ত্রণা অথবা দুর্বোধ্য ছলনাকে সপে দিয়ে আমি যদি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম গ্রহণ করতে চাইতাম তাহলে আমার এই সামান্য হাসপাতালে রোগীর ভীড় দিনকে দিন বাড়ত না। বলতে পারবে এই রোগীটার মূল আর্তনাদ কোথায় গোপন হয়ে আছে? কথা বলবার চেষ্টা করো না, চেষ্টা করলেও বলতে পারবে না। আমিও এই তিন মাস অন্ধকারের মধ্যে সূত্র সন্ধান করেছি। কখনো মনে হয়েছে রৌশনের পর্দার আড়ালে একটা মিথ্যা লুকোচুরি খেলছে, কখনো মনে হয়েছে রৌশন নিজেই সে লুকোচুরি। এখন আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মা হয়ে নিজে, নিজের হাতে তার গর্ভজাত সন্তানকে . . . যুদ্ধ মহৎ সত্যগুলোকে ধ্বংসও করে। ঐ ছেলে লালন তো ওদের যুদ্ধোত্তর জীবনে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব। লালন তো যুদ্ধের ক্রোধ। লালনকে ধারণ করা যায় কিন্তু আপন করা

যায় না। লালনকে আমরা কেউ চাই না। এই আবাঞ্ছিত অভিশপ্ত মানব সন্তানের মা হয়ে পরিচিত হবার দুঃসাহস হবে কেন? প্রথমেই ওরা এই শিশুকে পরিত্যাগ করেনি কেন? তাহলে তো—তখন স্বাধীনতার উল্লাসে মাঠঘাট মুগ্ধ, মহিমায় আকাশ নন্দিত। কখনো আবেগের তাড়নায় লালনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, কখনো করতালি মুখরিত জনপদের মোহে লালনকে স্লোগানের জন্য ব্যবহার করেছে। লালন রাজনীতি আর অর্থনীতির সফল সমাচার। কিন্তু নীরব একাকীত্বে লালনের জন্য মায়ের হৃদয়, পিতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কে বসে থাকবে? তুমি—আমরা? অসম্ভব। আমাদের এতকাল পরেও চিনতে পারলে না। সিস্টার, তুমি কি আমার কেতাবী বুলি শুনে হাসছ? নাকি—আমি জানি রৌশনারাকে নিয়ে আমি একটু চোখে পড়ার মতো হাঁকাহাঁকি করছি। আমি তো বলছি এই রৌশনারা আমার অপরিচিতা মেয়ে নয়। আমি আর সে—আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইতিহাস উদ্ধার করে তোমাকে উপন্যাস পাঠের আনন্দ দেয়ার জন্য এখানে আসিনি। আমি এসেছি তোমাকে আর একবার সাবধান করতে—তোমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য আমার একান্ত মনোযোগের রোগী রৌশনারা যে কোন মুহূর্তে আরো বিপথগামী হতে পারে। রৌশনারার কোন ক্ষতি সহ্য করার মতো সহিষ্ণু আমি নই। রৌশনারা এখন তার কেবিনে নেই। হ্যাঁ আমি জানি সে এখন হাসপাতালে নেই। সেইজন্য রাত তিনটায় কোয়ার্টার থেকে আমাকে হাসপাতালে ছুটে আসতে হয়েছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রাত তিনটা। ডাক্তারের কোয়ার্টারে শোবার ঘর। মানুষের কঙ্কাল আছে।)

রৌশন আতরালী, তোমার ডাক্তারটা একটা পাগল, তুমি কি কও। কিন্তু কইবা না। পাগল না হইলে, আমি দ্যাখ, এই নিশুতি রাতে তার লগে কত বিপদ আপদ ভেদ কইরা দেখা করতে আইলাম আর সে কিনা আমারে একলা এই কোয়ার্টারে রাইখ্যা চইলা গেল। আতরালী তুমি কিন্তু আমারে ছাইড়া দৌড় দিওনা।

আতর চলুন, আপনারে এহন হাসপাতালের কেবিনে রাইখ্যা আহি।

রৌশন ক্যান? আমারে এহানে রাখবার চাও না? আমারে খুব ডর করে? যদি তোমারে গলা টিইপ্যা মাইরা ফেলি হেই ডর। ডরাইওনা আতরালী, আমি তোমার গুলমোহর বিবিরে অমন মসিবতের মধ্যে ফালামু না। ও আতরালী নির্ভয়ে আমার কাছে আইস্যা আমার এই হাত দুটার আঙ্গুলগুলান পরীক্ষা কইরা দেখতো। এই আঙ্গুল দিয়া ধর এক সময় সেতার বাজাইতাম, এই আঙ্গুল দিয়া কতদিন ফুলের তোড়া বাঁধছি, এই আঙ্গুল দিয়া মাগুর মাছের মাথা কাটছি আর এই আঙ্গুল দিয়া আমার লালনের মুখে চামচে চামচে দুধ তুইল্যা দিছি। আতরালী এখন ধর, এই আঙ্গুল দিয়া আমি আর কি করবার পারি। ও আতরালী, আমারে দেখলে তোমার কি মনে হয় কওতো। ঠিক ঠিক কইবা কিন্তু—

আতর আপনে লোক ভালা। তয় আপনার মগজের মধ্যে বৃহৎ জ্বালা যন্ত্রণা।

রৌশন তয়! তুমি যদি আমার মগজ সম্পর্কে এত কথা জানলা, তা হইলে এহন আমার কি করা দরকার মনে কর?

আতর আপনার জ্বালা যন্ত্রণার কথা ডাক্তার সাহেবেরে মন হাল্কা কইরা কইয়া ফ্যালান। শান্তিতে ঘুমাইতে পারবেন।

রৌশন — হ তুমি কইলা আর আমি শুনলাম। শান্তিতে ঘুম কেমন কইরা মানুষে ঘুমায় সে খবর আমার হারায়া গেছে আতরালী। কিন্তু কথান হলো মনের কথা। নিঃসংশয়ে বললে তোমার ডাক্তার কি আমাকে বিশ্বাস করবে? হেই ডাক্তাররে তুমি চেন নাই, হেই ডাক্তারডা একটা মানুষ না, পাষাণ। এই যে দ্যাখছ, এই যে ঘরের মধ্যে মানষের কঙ্কালডা খাড়া হয়্যা আছে। দেহ আছে, মন নাই। এই যে দ্যাখ, দ্যাহ না, চোখের গহ্বর আছে দৃষ্টি নাই, এইহানে বুক আছে হৃদয় নাই, তোমার ডাক্তারডা এইরকম একটা কঙ্কাল বুঝলা, মানুষ নয়।

(আতরালী যেতে চাইছে)

আতরালী তুমি যাইওনা। হেই কঙ্কালডার লগে এক সঙ্গে বাস করতে পার আর আমার লগে বইস্যা দুডা কথা কইতে পার না। কঙ্কালের লগে কথা কইয়া দ্যাখছ কোনদিন, কঙ্কালের কথা বুঝতে পার?

আতর — আপনারে হাসপাতালে থুইয়া আহি। এসব কথা কওন ভালা নয়।

রৌশন — (খলখল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে) বুঝছি বুঝছি আতরালী, তোমার দেহের মধ্যে ডর ঢুকছে, কারে ডর? আমারে না এই কঙ্কালডারে? আর যাই কর, এই মরা মানুষের কঙ্কালডারে ডর করো না। এর মতোন সুখী আর কেউ নাই। দেখছনা, কেমন নির্বিকার নিশ্চিন্তি খাড়া হয়্যা আছে। শত প্রশ্ন কর কোন উত্তর পাইবা না।

(কঙ্কালকে উদ্দেশ্য করে বলছে)

এই যে শুনছ। তুমি ছেলে না মেয়ে?

উত্তর নাই।

তুমি মরলা ক্যান?

উত্তর নাই।

এইখানে কেমন কইরা আইলা? আমি তোমার সুখকে হিংসা করি বুঝলে। তোমার কোন দুঃখ নাই, সুখও নাই। তুমি মানুষও না জন্তুও না। তুমি একটা কঙ্কাল।

(আবার খলখল করে হেসে উঠল)

আতরালী, দেখছ, দ্যাহ দ্যাহ কঙ্কালডা বাতাসে কেমন সুন্দর দুলত্যাছে। যহন জীবিত ছিল তখন নিশ্চয় যাত্রাদলে রাজা সাজত!

এই যে, তুমি কতবার রাজা সেজেছ? আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, বাহাদুর শাহ। কথার উত্তর দাও। কথা না বললে তো আলাপ পরিচয় হবে না। আমি মানুষের পৃথিবী থেকে কথা বলছি। আমরা নাছোড়বান্দা, মরা মানুষকেও ছেড়ে কথা বলি না। অত লুকোচুরি আমাদের সঙ্গে চলবে না, বুঝছ। এই! তুমি পরিচয় না দাও আমরা তোমার পরিচয় নিয়ে ছাড়ব।

অই আতরালী। তুমি এর লগে কথা কও তো দেহি।

আতর — আপনের মাথা সত্যিই খারাপ—

রৌশন — আতরালীর সঙ্গে কথা কও।

আতর ডাক্তার সাহেবের খবর দেই।

(আতরালী ছুটে পালাতে চাইছে, রৌশন ধমক দিয়ে তাকে দাঁড় করালো।)

রৌশন চোপ। আর একটা কথা বলেছ কি আমি তোমার কণ্ঠ ছিঁড়ে নেব।

(রৌশনারা হিংস্র হয়ে উঠেছে।)

এইখানে বসে থাক। বস। মানুষের মনের যদি মরণ না তাকে তাহলে দেহও কখনো মরে না বুঝলে। (কঙ্কালকে উদ্দেশ্য করে) এই যে তোমার পরিচয় নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের অনেকেই মরে গেছে। মারা হয়েছে। যুদ্ধ হলেই মানুষকে মারা হয়। তুমি কি তাদের একজন? শহীদ না দালাল? তোমার সঙ্গে একটা জায়গায় আমার খানিকটা মিল আছে। আমি মরতে মরতে বেঁচে আছি। মরতে চেয়েছিলাম কিন্তু মরা হয়নি। আমার স্বামীর প্রেমের জোর আর গুণিজনদের প্রবল আগ্রহে আমি বেঁচে আছি। বুঝলে, দুশমনরা, কতকগুলো জানোয়ার আমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেল। তোমার কি হয়েছিল? কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছিল। তখন তো ঘটনার অন্ত ছিল না।

(কঙ্কালের আরো কাছে এসে ফিস করে বলছে)

এই এই, লালনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়। শান্ত ছেলে। কিন্তু খুব জেদী। কবি নজরুল ইসলামের মতো। তোমাকেই বলছি কাউকে আবার বলে দিও না—আমাদের, মানে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা আর স্নেহের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করে আমরা দুজনেই ওকে বুঝতে দেইনি আমরা কে? আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি? রাতের বিছানায় একপাশে আমার স্বামী আর একপাশে আমি মাঝখানে লালন। আমার কব্জির চুড়ি নিয়ে লালন খেলা করত, আমার স্বামীর ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে নরম হাত ঢুকিয়ে লালন খেলা করত। আর আমরা, স্বামী স্ত্রী, নীরব পাথরের মতো ওর খেলা সহ্য করতাম। আমার প্রিয় স্বামী জনাব আলী নেওয়াজ সকালে প্রচুর নাস্তা খেয়ে এবং লালনের কপালে চুমু খেয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতালা থেকে নীচে নামত। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার স্বামী তার ঠোঁট দুটো হাতের তালু দিয়ে বার বার মুছে ফেলত। লালনের কপালের দাগ ঠোঁট থেকে অসহ্য ঘৃণায় তাড়িয়ে রেখে নতুন গাড়িতে উঠত। আমি ব্যালকনীতে ফুলের টবের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার স্বামীর তাড়া খাওয়া মুখটা দেখতাম আর হাল্কা হাসিতে চোখ নাচিয়ে আমার প্রিয় স্বামীকে দিনের প্রথম শুভেচ্ছা উপহার দিতাম। লালন আমার আঁচলের প্রান্ত ধরে আলী নেওয়াজকে দেখত। লালন সকালের ঝরে পড়া শিউলির মতো আমার বুকে মাথা রেকে আমাকে মা বলে ডেকে ওঠার আগেই আমি ওর মুখটা বুকের মধ্যে নির্মমভাবে পিষে ফেলে ওর কপালে অসংখ্যবার আদর ছাড়িয়ে দিতাম। অসহ্য বেদনায় লালনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে উঠত। আমার লালন একটুখানি বাতাসের জন্য আমাকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে দূরে সরিয়ে প্রাণভরে নিশ্বাস সংগ্রহ করত। মরতে মরতে লালন বেঁচে উঠত, তারপর ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে বিছানায় পড়ে থাকত। এই! এই যে! শুনছ, একটা মরা মানুষের কঙ্কাল! তোমারও তো এক সময় হাসি ছিল, কান্না ছিল, নদীর মতো উথাল পাথাল হৃদয় ছিল। তুমি আর আমি আজ কতকগুলো ঘটনার স্রোতে ছুটতে ছুটতে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে তুমি না চেনার ভান করো না, আমি

এই রাত্রির শেষ প্রহরের অসংখ্য নক্ষত্রকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমার জন্য শুভকামনা করি। আমার লালনের সঙ্গে যদি কখন দেখা হয়, বলো, মা ওকে ভালোবাসা জানিয়েছে। মা ওকে আদর করেছে, মা ওর মাথার ওপর থেকে একটা রাক্ষস পাখিকে তাড়াবার জন্য লক্ষ্যভেদী অব্যর্থ অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুকনো নদীর বালুচরে যেখানে আমার লালন শুয়ে আছে সেখানে, সেই নদীর মরাস্রোতে কর্কশ কাকেরা চীৎকার করে কেন, তুমি জান? এ গাঙ্গের মাথায় একটা অমানুষ শঙ্খচিল উড়ে বেড়ায় কেন, তুমি জান? এই, এই যে, শুনতে পাচ্ছ, মন্বন্তরের লাশ! তুমি যদি বাংলার স্বাধীনতার জন্য নিহত সৈনিক হও, আমি, তোমার কঙ্কালটাকে ধরে বলছি, কাকের অশুভ চীৎকার আর শঙ্খচিলের রাক্ষস ঠোঁটে আঘাত করতে হবে—প্রচণ্ড আঘাত। মরা গাঙ্গে উথাল পাথাল ঢেউ আনতে হবে। মরলেই হয় না বুঝেছ, রক্ত ঢাললেই জোয়ার আসে না। স্রোতের বাধা উপরে ফেলতে হবে। তোমার এই কঙ্কালটাকে সূর্যের আগুনে তাতাব। তোমার হাতটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারব, রাক্ষস পাখিটার কলজে ছিন্নভিন্ন হবে। দাও, দাও তোমার হাত। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে—

(কঙ্কালটা সশব্দে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। রৌশনারার প্রচণ্ড হাসিতে বাড়িটা যেন কাঁপছে।)

আতর — ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব—

(দ্রুত বেরিয়ে গেল। রৌশনারা হাসছে।)

রৌশন — এইবার, এইবার তোমার উচিত সাজা হয়েছে। এই পৃথিবীর মানুষ, দিন নাই, রাত নাই ছুটছে আর ছুটছে আর তুমি কঙ্কাল হয়ে শান্তিতে দাঁড়িয়ে থাকবে? এমন সুখের দিন আর নেই। থাক, থাক, ছত্রখান হয়ে মাটিতে পড়ে থাক।

(ডাক্তার ঘরে ঢুকেছে)

এই যে ডাক্তার, আসুন আসুন। স্বচ্ছন্দে, মনের আনন্দে নিজ গৃহে প্রবেশ লাভ করুন। আপনার মরা মানুষটার লগে বাক্য বিনিময়ে করিতেছিলাম এবং তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় যুগলে কিছু কিছু মধুর ধ্বনি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। হতভাগা, সহ্য করিতে না পারিয়া হুড়মুড় করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং আমিও তাহার সঙ্গ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কি গো ডাক্তার, তোমার আবার কি হলো? আষাঢ়ের মেঘ, বিষ্টি ফিষ্টি হবে নাকি? গর্জন ফর্জন করো না ডাক্তার। তোমার হাঁকাহাঁকি শুনে শুনে আমার হাসপাতালের জীবনের ঘেন্না ধরে গেছে। যাই, রাত ভোর হলো, এবার বোধ করি ঘুম আসবে।

(রৌশন যেতে চাইছে।)

ডাক্তার — রৌশন, দাঁড়াও। আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান?

রৌশন — কি মনে হচ্ছে!

ডাক্তার — তুমি সত্যকে এড়াবার জন্য আমার আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়েছ।

রৌশন — আর কি মনে হচ্ছে ডাক্তার?

ডাক্তার — অনেক কিছুই মনে হচ্ছে। তুমি, জানোয়ারদের ছাউনী থেকে ফিরে এসে খুব যত্নের সঙ্গে অভিনয়ের ভঙ্গিটা রপ্ত করে একজন নির্লজ্জ মহিলাতে রূপান্তরিত হয়েছ।

রৌশন — আর কি মনে হচ্ছে হান্নান?

ডাক্তার আর মনে হচ্ছে, তোমার নিরাপরাধ স্বামী তোমার কৃতকর্মের জন্য কাঠগড়ায় আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার পাগলামীর জাল এ হতভাগ্য মানুষটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকটার হয়তো ফাঁসি হবে।

রৌশন লোকটা মরে গেলে আমি সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠব এবং তোমার এই জনশূন্য কোয়ার্টারে চিরদিনের জন্য উঠে এসে সুখনীড় রচনা করব।

ডাক্তার ছিঃ!

রৌশন (অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে) ছিঃ কেন হান্নান? মহানুভবতার প্রতিযোগিতায় তোমার মতো একজন মানুষকে আবিষ্কার করার সুযোগ থেকে দশজনকে বঞ্চিত করো না। মনে নেই তোমার? জন্তুদের বাংকার থেকে ফিরে এলাম লাঞ্ছনা আর লজ্জার আকণ্ঠ বিষপান করে। ঘৃণাতে সূর্যের দিকে তাকাতে পারতাম না, চাঁদের আলো পাছে ঘরে ঢোকে সেজন্য জানালা কপাট বন্ধ করে নিজেকে লুকিয়ে রাখছিলুম। কিন্তু তোমাদের সহানুভূতি আর উদারতা ঘোষণার প্রয়োজনে আমাকে বার বার অসংখ্যবার প্রদর্শনী মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হলো। আমি যেন একটা লেজকাটা শৃগাল, পোকা খাওয়া টকটকে ডালিম। তবু তোমাদের কৌতুক মেটে না, বিশালাকার মহিলাদের কান্না থামে না। শিবিরের ঘৃণ্য বিষ, আর তোমাদের গদগদ অমৃত পান করছি। আমার প্রিয় স্বামী এ সভার সভাপতি, সে কমিটির সাধারণ সম্পাদক। হায়, হায়রে মানুষ, কার লগে কার কথা কব। যারা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা আনল তাগোর কোন খবর নাই আমার ল্যাজকাটার খবরটা বিস্তার করার জন্য মাইক ভাড়া করার সেকি ধুম। আমার পুনর্বাসনের জন্য কত টাকা আর কত উপঢৌকন। এমন সময় একদিন নিরালা রাতে মৃদুকণ্ঠে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে আমার প্রিয়তম স্বামীকে চুপি চুপি জানতে দিলুম, ওগো শুনছ। বল। আমি সন্তান ধারণ করেছি। আমার প্রিয় স্বামী সংবাদটা শ্রবণ করে মনে করেছ খুব বিচলিত হয়েছিল। না, মোটেই না। তখন তো তেনার বাজি জেতার ঘোড়াটা তুরঙ্গ গতিতে ছুটছে। আমার পবনগতি পতি তাঁর কোটের ছোট ছোট বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, রৌশন, সংবাদটা চাপা রাখা যখন যাবে না, তখন ছড়িয়ে দিই, ছিটিয়ে দিই, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, শরমের শাড়ী খাটো করতে নেই।

সরষের দানা ছিটোলে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর আসে, আমার সংবাদটা শুনে আবার ওর চমৎকার চমৎকার বন্ধুরা এসে গেল। আমার স্বামীর ছোট বাড়ি থেকে বড় দালানে পদোন্নতি হলো, নতুন গাড়ি এল, রোজ রোজ বসে টইটম্বুর আঙুর খেতে লাগলাম। আমার লালন আমার অন্ধ জঠরে নিরাপদ সৌভাগ্যে বড় হতে লাগল। এমন সময় একদিন তুমি এলে, আমার বয়ঃসন্ধিক্ষণের বন্ধু। শুনছি তুমি ইউরোপের কোন একটা দেশে ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছ। আমাদের স্বাধীনতার ঝড়জলের আঁচ তোমার লাগেনি। তুমি এলে এক আলোকিত সন্ধ্যায় আমাকে সবিস্তার সহানুভূতি জানাতে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে।

সপ্তম দৃশ্য

(রৌশনারার দোতালা বাড়ির ড্রইংরুম। ডাক্তার হান্নান চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। রৌশনারা রূপবতী মহিলা, তার সামনে বসে আছে।)

ডাক্তার বিদেশে বসে সবই শুনতাম। তোমাদের সঙ্গে যে দেখা হবে। উঃ কী সব ট্র্যাজিক ঘটনা এক একটা। তোমার মতো ভিকটিম আরো অনেক আছে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের এরকম বেশ কয়েকজন

মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয়। তাদের সন্তানদের পিতৃপরিচয়—এসব এখন আর কোন প্রবলেমই নয়, অবশ্য আমাদের দেশের সামাজিক এ্যাটিচুড, তবে যে শিশু আসছে তার তো কোন অপরাধ নয়

রৌশন হান্নান, তুমি কি দেশেই থেকে যাবে নাকি আবার—

ডাক্তার আর নয়। দেশ ছেড়ে কোথায় যাব? ভাবছি এখানেই নিজের একটা চেম্বার, ছোট খাটো হসপিটাল—

রৌশন বিয়ে করছ কবে?

ডাক্তার বিয়ে? ও সিওর। বিয়ে তো—একটা মেয়ে দেখে দাও না। ঠিক তোমার মতো চমৎকার স্নিগ্ধ মেয়ে—

রৌশন ঠিক আমার মতো চমৎকার মেয়ের খোঁজতো আমার জানা নেই। শুনেছি আমার মতো হাজার হাজার মেয়ে আছে কিন্তু চোখে দেখিনি, আছে আড়ালে আবডালে। নিজেকেই আয়নাতে ভালো করে দেখতে পারি না। আমার এক হিতাকঙ্ক্ষী বান্ধবী বলছিল আমি নাকি দেখতে খুব সুন্দরী হয়েছি।

ডাক্তার হ্যাঁ, তুমি খুব অপূর্ব হয়েছ। তোমার সন্তানও খুব সুন্দর হবে। রৌশন, তোমার সন্তানকে তো কাছে রাখতে পারবে না। নিশ্চয় বিলিয়ে—

রৌশন কেন বিলিয়ে দেব কেন?

ডাক্তার এ শিশুকে কি আর ঘরে রাখতে পারবে? সামাজিক কত সব—তোমার শিশুকে আমি নেব। এই ধর, লালন পালন করব—তবু যে, দেশের জন্য, আমাদের স্বাধীনতার জন্য কিছু একটা করতে পারব—

রৌশন আমার একজন ঘনিষ্ঠ পরিচিত বান্ধবীর স্বামী মারা গেছে হান্নান। ঘরে ফোঁটা খাবার পানি ছিল না, রাস্তার কল থেকে বাধ্য হয়েই কলসী ভর্তি করতে গেল—কল থেকে পানি অবিরাম গড়িয়ে কলসীতে পড়ছে আর আমার বান্ধবীর স্বামীর বুক থেকে রক্ত। গুলি খেয়ে মারা গেছে। স্বামীর লাশ একা টানতে টানতে ঘরে আনল, সমস্ত রাত আঙ্গিনাতে নিজে কবর খুঁড়ল, শাড়ি দিয়ে স্বামীর শরীর ঢেকে দিল তারপর কবরে শুইয়ে দিল। আমার বান্ধবী বলছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছুই তো করতে পারিনি, নিজের হাতে স্বামীর কবর খুঁড়েছি আর কি করতে পারতাম জানি না রৌশন। ডাক্তার, ডাক্তার তুমিও বুঝি দেশের জন্য কিছু একটা করতে চাও—

ডাক্তার হ্যাঁ তোমার যুদ্ধের চিহ্নকে গ্রহণ করতে চাই।

রৌশন ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তুমি আরো মহানুভব হয়েছ ডাক্তার—

ডাক্তার রৌশন এটা আমার মহানুভবতা নয়, আমার কর্তব্য। কিম্বা ধর তোমার প্রতি আমি যে অন্যায় করে, রৌশন আমি অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করার জন্য আজ আবার ফিরে.....

(রৌশনারা প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল।)

অষ্টম দৃশ্য

(স্মৃতিচারণ দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়ে পূর্ব দৃশ্যে ফিরে এল দু'জনে।)

রৌশন অপরাধ! কে কার অপরাধের শাস্তি বহন করবে ভেবে দ্যাখ ডাক্তার। ধর, ধর যদি আমি সর্বসমক্ষে বলি আমার ছেলে লালনকে আমার প্রিয় স্বামী আলী নেওয়াজ শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে, করুণা

ভিক্ষাকারী আমার স্বামী মারা যাবে এবং মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে আমি তোমার ঘরে এসে উঠব—ডাক্তার তুমি তো কর্তব্য করতে বড়ই উৎসাহী, পারবে না আমাকে গ্রহণ করতে? তুমি তো অনেকদিন আগে বার বার বলতে তুমি আমাকে ভালোবাস। আমি পারব ডাক্তার, দেখে নিও আমি পারব। সৈন্যদের ছাউনিতে বারদিন থাকতে পারলাম, ছ'বছর প্রিয় স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে পারলাম, আমার ছেলের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে পারলাম, স্বামীকে বাঁচাবার জন্য তোমার মানসিক হাসপাতালে পাগল সেজে দিন কাটাতে পারছি আর তোমার মহানুভবতার আবিষ্কারের জন্য আর একবার বাসরশয্যা রচনা করে নম্র বধূ হতে পারব না ভেবেছ? ডাক্তার আমি তোমাদের ভালোবাসা আর স্বাধীনতার ইতিবৃত্তের একটা খুব বড় চরিত্র। ভয়ঙ্কর বড় এক ঘটনার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

(রৌশনারা আবার প্রবলকণ্ঠে হাসছে। এ হাসিতে কান্না এবং বিদ্রূপের মিশ্রণ।)

নবম দৃশ্য

(হাসপাতালে রৌশনের কেবিন। আতরালী বিব্রত। বাইরে একটা কাক কর্কশ চীৎকার করছে।)

আতর — এত কথা কওন ভালা না, বাইরে তাই ফের ঘন ঘন কাউয়া ডাকতাছে। কাউয়া ডাক দিলে মন্দ আহে।

রৌশন — মন্দ কোহান দিয়া আহে আতরালী—জানলা খুইল্যা না দরজা ভাইঙ্গা?

আতর — মন্দ আহনের পথ কি আর একটা? যহন আহে তহন ঘরদুয়ার সব ভাইঙ্গাই আহে।

রৌশন — এহন ধর যদি আমার ঘরও নাই, দুয়ারও নাই তাহলে মন্দটা আহিবে কেমন কইরা?

আতর — উঃ রে আল্লা। হাসেন ক্যান, এটা হাসনের কথা নয়। কাকের ডাক, শিয়ালের ডাক উড়ায়া দিবার নয়।

রৌশন — আতরালী তাহলে সেদিন একটাও কাক ডাকে নাই কেন?

আতর — কোনদিন?

রৌশন — সেদিন ছিল শুক্কুরবার। জুম্মার নামাজ পইড়া আমার শ্বশুর খাইয়া দাইয়া শুয়া আছে। আমিও নামাজ পড়লাম, ভাত খাইলাম, একটা মিসকিন আইস্যা খাইতে চাইল তারে মনের আরমান মিটাইয়া খাওন দিলাম। মাছ, ভাত, ডাইল খাইয়া মনের খুশীতে আমারে জান ভইরা দোয়া করল। তখন তো কাউয়া ডাকে নাই। আমার মনের মধ্যে তখন যে কি হইত্যাছিল আতরালী, আমি যেন বেহেস্তের বাগানের মধ্যে হাঁটত্যাছি, যা মনে হয় তাই খাইত্যাছি, মন আমার মনপবনের নৌকার লাহান ভরা নদীর স্রোতের ওপর ভাসত্যাছে। আমি যে কি করব, আর কি না করব। বড় আয়নার সামনে বইসা চুল বাঁধলাম, মুখে পাউডার লাগাইলাম। ঠোঁটে কি রং দিছিলাম আতরালী, না দিই নাই, নাকি দিছি, থাক গিয়া অত কথা মনে নাই, অনেক দিনের কথা তো, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস, তিন তারিখ। দিনটা শুক্কুরবার। এত কইরা ভুলতে চাই, দিনটা ভুলতে পারি না আতরালী। সেদিন তো কোন কাউয়া ডাকল না, শকুন ঘরের ছাদে বসল না, হাত থাইকা পিরিচ পইড়া ভাঙ্গল না, তাহলে সেই ঘটনাটা ক্যান ঘটল আতরালী?

আতর — কোন ঘটনাটা?

রৌশন আমার স্বামী সেদিন ঘরে ফিরতে এত দেরী করছিল কেন? আমি যে তাকে একটা মনোরম খবর দিতে চেয়েছিলাম—কানে কানে, চুপ-চুপ করে বলতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামীর গাঢ় সোহাগে নিষ্পেষিত হবার ভাগ্য চেয়েছিলাম। যদি আসত, হাল্কা বাতাসে নীল চন্দ্রমল্লিকার মতো হাসতে হাসতে তাকে বলতাম, ওগো শুনছ, আমি জেনেছি, আমি আজ নিশ্চিত ধ্রুবতারার মত বুঝতে পেরেছি, আমি শুধু আর আমি নই আমি একটা ফুল পেয়েছি। ওগো তোমার সুন্দর ইচ্ছাকে আমি ধারণ করেছি। আতরালী। সেদিন একটা কাকও তো আকাশে ছিল না, গাছে ছিল না, রান্নাঘরের আস্তাকুঁড়ে ছিল না। তবে আমার স্বামী ঠিক সে সময় এল না কেন? আমার স্বামী এত দেরী করল কেন? তুমি বলতে পার আতরালী, তখনই অনেক কটা ভারী বুটের শব্দ আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল কেন? বুটের শব্দ আমাদের বাড়িটার দরজা ভাঙতে চাইল কেন? ঘরে ঢুকে আমার চন্দ্রমল্লিকার বাগানে হাত দিল কেন? ফুলের পাপড়িগুলো একটা একটা করে দলে পিষে দিল কেন? আতরালী আমি আল্লার কসম খাইয়া কইতে পারি, সেদিন আমি কাউয়ার ডাক হুনি নাই, শিয়ালের দৌড় দেখি নাই। খালি, অজগর সাপের নিশ্বাস পাইছি, কেউটের ছোবলে জারেজার হয়্যা গেছি, কারবালার ময়দানে সীমারের হুঙ্কার হুনছি আর কিচ্ছু শুনি নাই। যদি আমি একটা বর্ণও মিথ্যা কয়্যা থাকি তাহলে আমারে হাবিয়া দোজখের আগুনে ফেইল্লা বিচার করতে কইও আল্লারে।

(ইনজেকশন দেয়ার জন্য নার্স এসেছে। তার হাতে সিরিঞ্জ। তাকে দেখে রৌশন হিংস্র হয়ে উঠেছে)

আবার তুমি আইছ? নার্স, তুমি কি চাও? ঘুমের সূঁচ ফুটাইয়া তুমি আমারে ঠাণ্ডা করতে চাও। আমার জ্ঞান বুদ্ধি হরণ কইরা তুমি আমারে চুপ করবার চাও? ভালা মানষেরে পাগল বানাইতে চাও কোন সাহসে?

(ক্ষিপ্ত হয়ে নার্সের হাত থেকে সিরিঞ্জ নিয়ে ফেলে দিয়ে উন্মত্ত চীৎকার করে উঠল।)

আমি পাগল না। আমাকে আর পাগল করো না তোমরা। আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।

(কান্নায় ভেঙে পড়ল।)

দশম দৃশ্য

(ডাক্তার তাঁর কোয়ার্টারে শুয়ে আছেন। পাশে টেলিফোন। আতরালী ধীরে ধীরে ঢুকল।)

আতর হুজুর। হুজুর। অনেক বেলা হলো। কিছু মুখে দ্যান।

ডাক্তার আতরালী!

আতর বেলা ভাটি হইয়া গেল। আরো শুইয়া থাকবেন?

ডাক্তার যাও, ঘুমাতে দাও।

(টেলিফোন বাজল।)

টেলিফোন! উঃ রিসিভারটা উঠিয়ে রাখতো।

আতর আরো দুবার আইলি হুজুর। বলছি আপনে শুইয়া আছেন।

ডাক্তার থাম। দাও। হ্যালো। হ্যাঁ। না। সন্ধ্যার আগে যেতে পারব না। জানি না। কী? কখন থেকে। হোয়াট ননসেন্স। সিস্টার, তোমরা কোথায় ছিলে? তামাশা দেখেছ? চুপ কর। দারোয়ান, বাবুর্চি, আরদালী কেউ জানে না? সব আমাকে জানতে হবে,

(রিসিভার রেখে দিল।)

আতর হুজুর—

ডাক্তার আতরালী। তুমি জান, রৌশনারা কোথায় গেছে?

একাদশ দৃশ্য

(রৌশনারার বাড়ি। জনাব আলী নির্বাক বসে আছেন। ডাক্তার তাকে কোন কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন না। এক কোণে আতরালী দাঁড়িয়ে।)

ডাক্তার তাহলে, জনাব আলী আপনিও জানেন না, আপনার ছেলের বৌ রৌশনারা কোথায় গেছে? আপনি অবশ্য অনেক কিছুই জানেন না। সরল বিশ্বাস নিয়ে নতুন ঝকঝকে বাড়িতে বসে আছেন। আর আপনার ছেলে আলী নেওয়াজ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আপনাদের সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িটাতে কয়েক মাস আগে একটি বছর পাঁচেকের ছেলে—আচ্ছা সেই মিষ্টি মুগ্ধ করা ছেলেটাকে কি আপনি আদর করতেন? ছেলেটাকে দেখলে আপনার মনের কোনখানে স্নেহ মমতা জেগে উঠত কি? লালনকে খুব ঘন আদর দিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করতো না? আপনি আজ আর কোন উত্তরই দিতে পারবেন না। আমার তো মনে হয় আপনি লালনকে নিজের বলে ঘোষণা করতে চাইতেন। বার বার মনে হতো এ ছেলে আপনার সন্তানের সন্তান। কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ—জনাব আলী লালন নামের এ ছেলেটি যেদিন মারা গেল, সেদিন কি আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার ঘরে কেঁদেছিলেন? লালনকে শুকনো নদীর বালুচরে ঢেকে দেয়ার জন্য আপনার ছেলে আলী নেওয়াজ যখন রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরুল তখন একবারও কি আপনার একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেনি সুস্থ ছেলেটা হঠাৎ মারা গেল কেন? আপনার মনে কোনদিন কোন প্রশ্ন কেন জাগে না? সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন আপনার ছেলের বৌকে জন্তুরা নিয়ে যায়, স্বাধীনতার পর আপনার সাধারণ ছেলে অসাধারণ হয়ে ওঠে এবং আপনার লাঞ্ছিত পুত্রবধূ নিজের হাতে নিজের জঠরের সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করে এবং পাগল হয়। কিম্বা যদি বলি আপনি একজন প্রবীণ নীরব পিতা, দুর্দান্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিষয়ী মানুষ, সবই জানেন সবই বোঝেন কিন্তু কিছুই—জনাব আলী আমি সমস্ত প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে এবং সূত্র বিন্যাস করে জেনেছি আপনার অসাধারণ পুত্র আলী নেওয়াজ লালনকে খুন করেছে। না, সচকিত হবার দরকার নেই। আপনি তো জানেনই রৌশনারা পাগল নয়। ওকে পাগল বলে প্রমাণ করার জন্য আপনাকে তৎপর হতে হয়েছে। আইনের আদালতে আপনি এখন কি বলবেন গবেষণা করুন। আমার ফাইন্ডিংস আমি যথাসময়ে হাজির করব। না আপনাকে উঠতে হবে না, আমরা এখন যাব। রৌশনারা কোথায় গেছে সে কথা আপনি বলতে পারলেন না। আমি আপনার কাছে সে সংবাদ নেবার জন্য আসিনি—আর একটা কেনর উত্তর কি সন্ধান করেছেন? আপনার ছেলে তার নিজের ছেলেকে অস্বীকার করল কেন? লালন তো ছাউনির ছেলে নয়। কিছু

বলবেন? আর কি বলবেন—আপনার আলী নেওয়াজের রাজনৈতিক মূলধন তো লালন। লালন তো নতুন বাড়ি বানাবার উপাদান। যথেষ্ট তো হয়েছে আর নয় তাই লালনকে মরতে হলো। হতবাক দৃষ্টিতে তাকাবেন না আলী। আপনার প্রবীণ দৃষ্টির মধ্যে নির্বোধ এবং চতুর লালসা চকচক করছে—

(জনাব আলী মুখ ঢেকে কাঁদছেন।)

আমরা চাই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্য যা তা প্রকাশ করবেন।

(ডাক্তার ও আতরালী বেরিয়ে গেল। আলীর চোখে মুখে ভয়।)

দ্বাদশ দৃশ্য

(নদীর প্রান্তর। দূরে নদী। শুকনো বালুচর। আকাশে পাখির ডাক। শঙ্খচিলের ডাক বিশেষ করে শোনা যাচ্ছে। রৌশনারা এ আসন্ন সন্ধ্যায় বালুচরে ঘুরে ঘুরে মরছে।)

রৌশন আয়, একবার নীচে নাইমা আয়, নদীর চরে নাইম্যা আয়। তোর বুকে কত সাহস তোর রাক্ষুসে ঠোঁটে কত ধার—আয় না! ছোঁ দিয়া পানিতে ঝাঁপ দে, দূর থাইক্কাই ডাক পাড়তাছ্স, ডাক ছাড়। তোর ডাক শুইন্যা পাঁজরে ধাক্কা খামু সেদিন আর নাইরে রাক্ষুস। এই উথাল পাথাল নদী শুকায়া যাইত্যাছে, শুকনা গাঙ্গে মাছ ধরতে খুব সুখ তোর তাই না? তয় আয় না? লোট খাইয়া আকাশ থাইক্কা নাইমা আয়। এই, দেখ আমার হাতের মুঠার মধ্যে কি ধইরা রাখছি দ্যাখ। কী দ্যাখ হে শঙ্খচিল। সাদা দুধের লাহান ফকফইক্কা সাদা। এইটা কি জান তুমি! মানুষের হাড়। এক্কেবারে তলোয়ারের মতোন বাঁকা। সাবধান হ, কইয়া দিই। এই নদীর চরে অগুণতি মানুষের লাশ শুইয়া আছে। এই যে ভরা নদী দেখতে দেখতে বোশাখের খনখইন্না রোদ, এই নদীর পানিতে কত মানষের রক্ত, তুই জানিস নাকি শঙ্খচিল? না জানলে শুইনা রাখ সময় থাকতে সাবধান হ, এ নদীর বুকে তুই লাফ দিস না, বিষের জ্বালায় জ্বইল্যা মরবি, তোর অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ব। যা, যারে রাক্ষস। এই আকাশ বাতাস ছাইড়া জান লয়া পলায়া যা। যা, যা যা যা যা যারে যা। এহনও দিনের আলো আছে যাবার পথ ভুলবি না। আন্ধার হলে পথ খুঁজা পাবি নারে যা। আন্ধার হলে, অগুনতি মানুষের লাশ জাইগ্যা উঠব, বালুর সমুদ্রের তুফান হইব তুফান। উথাল পাথাল নদীতে ঝড়—

(যেন ঝড় এসেছে, ঝড়ের শব্দে ও দোলায় রৌশনারা ছুটে বেড়াচ্ছে।)

লালন, লালন একবার কথা বল। লালন, কোথায় তুই? মায়ের কাছে একবার আয় না লালন। শঙ্খচিলের ঠোঁট আমি ছিঁড়ে ফেলব। একবার কথা বল লালন।

(দূর প্রান্তে ডাক্তার এবং আতরালী এসেছে।)

আতর হুজুর, ঐ যে তিনি বালুর ঝড়ে ছুটত্যাছেন—

ডাক্তার রৌশন, রৌশন, দাঁড়াও।

(রৌশন মঞ্চে আসছে।)

রৌশন কেউ কথা বলো না। লালন তাহলে আসবে না। ঝড়ের বুকে নাচতে নাচতে লালন আমার বুকে ছুটে আসছিল তোমরা থাকলে ছেলে আমার আসবে না।

ডাক্তার পাগলামী করো না, ফিরে চল।

রৌশন পাগলামী করুম না? আমার লালনরে তুমি কাইড়া নিবা, আমার নদীরে তুমি শুকায়া ফেলবা, আমার আকাশে তুমি জঙ্গী জাহাজের মতোন রাক্ষুসে পাখি উড়ায়া রাখবা আর আমি নীরব থাকব? ঐ যে দ্যাহ, যতদূর দৃষ্টি যায় বালু আর বালু। এহানো হাজার হাজার মানুষ শুয়া আছে। এদের তুমি মরা ভাইব না। জিন্দা, দিনরাত জিন্দা। মায়ের ডাক পাইলে জাইগ্যা উঠব। অগুনতি মানষের কোলে বইসা আমার লালন কথা বলবে। মা বলে ডাকবে। লালন একবার মা বল-লালন—

ডাক্তার লালনকে তুমি ভুলে যাও।

রৌশন না। যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর, পৃথিবীর রঙকে মলিন কর আমিতো প্রতিবাদ করিনি—আমি তো সূর্যের আলোতে মুখ দেখাতে চাইনি—কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য গড়তে চাও কেন? আমার সন্তানের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?

ডাক্তার চল।

রৌশন আবার তোমার বন্দীখানায়? আবার জনসভায়? আমাকে নিয়ে তোমাদের এত উল্লাস কেন? কি পেয়েছি আমি?

ডাক্তার স্বাধীনতা।

রৌশন স্বাধীনতা (প্রবল কণ্ঠে অট্টহাসিতে উন্মত্ত হয়ে উঠল)।

ডাক্তার খাটো গলায় কথা কও, দুনিয়ার মানুষ শুনলে তোমাকে পাগলা গারদে নিক্ষেপ করবে। স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতা? কেমন স্বাধীনতা?—মায়ের কোলে বাচ্চা নাই, মানুষের চোখে নিদ নাই, নদীর বুকে পানি নাই। কেমন স্বাধীনতা? তোমার মাথার উপর থাইকা উড়া জাহাজের মতোন জল্লাদ পাখি তাড়াইতে পারবা, তোমার বইনের মুখ থাইক্কা লাঞ্ছনা মুছতে পারবা? আমার মাথার আগুন নিভাইতে পারবা? কে? ও ডাক্তার শোন শোন—আমার ছেলে কাঁদছে লালন, লালন—

(রৌশনারা দুরে মিলিয়ে গেল।)

আতর হুজুর দুরে চলে গেল যে—

ডাক্তার আর যেতে দেব না। ওর জ্বালা ভাগ করে নেব। ভাল করে তুলব। ওকে বাঁচাব।

(আতরালী এবং ডাক্তার মঞ্চের দু'দিকে স্থির দাঁড়িয়েছে। রৌশনারা এল, মাঝখানে দাঁড়াল। তাঁর কণ্ঠ গাঢ় আবেগে সিক্ত বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ এবং মমতায় আচ্ছন্ন।)

রৌশন ও ডাক্তার। ভালো করার ওষুধ কি তোমার হাসপাতালে আছে? জোড়াতালি দিয়া আর কতদিন লজ্জা নিবারণ করবা? প্রথমে রোগ নির্ণয় কর, তারপর না ওষুধের আবিষ্কার। কিন্তু সাবধান। ছলাকলা করে সত্যকে ঢাকতে যেও না। তাহলে মরণ এসে তোমার অঙ্গকে এক নিমিষে অঙ্গার করে দেবে। আতরালী ও আতরালী কাউয়া ফাউয়ার কথা একদম ভুইল্যা যাও। আসল কথা হইল শঙ্খচিলের ঠোঁট। শঙ্খচিলডার লগে দেখা হইলে কইবা লালনের মা আর মা নয় এক্কেবারে আগুন। রক্তের লাহান টকটইক্যা আগুন। কইবা তো, আমার লালনের কসম—

(রৌশন কাঁদছে। রৌশন কাঁদতে কাঁদতে প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল। এ হাসি উন্মাদিনীর হাসি।)

'কি চাহ শঙ্খচিল' : মমতাজউদ্দীন আহমদ

৫.১ লেখক পরিচিতি
৫.২ 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেরণার উৎস
৫.৩ নাটকের কাহিনীর রূপরেখা
৫.৪ বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ
৫.৫ নামকরণের তাৎপর্য
৫.৬ রোশনারা : একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজিক চরিত্র
৫.৭ অন্যান্য চরিত্র
৫.৮ এই নাটকের সংলাপ
৫.৯ ফিরে-আসা অপহৃতা নারী ও সামাজিক অনুশাসন : সাহিত্যে এই সমস্যার প্রতিবিম্বন
৫.১০ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
৫.১১ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী
৫.১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৫.১ লেখক পরিচিতি

মমতাজউদ্দীন আহমদ (জ. ১৯৩৫) সমকালীন বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার। ওদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমর তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন একবার : "মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে" বসে নাটক রচনা করেছেন তিনি। মুলত ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েই মমতাজউদ্দীন পরিচিত হয়েছিলেন একজন সংগ্রাম-মনস্ক নাট্যকার হিসেবে। তাঁর ঐ সময়ে লেখা তিনটি নাটক মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের তো বটেই, এমন কী পাকিস্তানি বাহিনির উৎপীড়নে জর্জরিত, সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এই নাটকগুলি হল 'স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'এবারের সংগ্রাম' এবং 'স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা'। স্বদেশপ্রেমের তীব্র আবেগই তাঁর এই নাটকগুলির প্রধান উপজীব্য। তির্যক্ ব্যঙ্গের একটি আভাসের মাধ্যমে মমতাজউদ্দীন তাঁর বলার কথাগুলোকে হাজির করেন পাঠক/দর্শকদের কাছে। এই ব্যাপারটি তাঁর অচির-পরবর্তী নাটক 'বর্ণচোরা' (১৯৭২)র মধ্যেও দেখি।

মমতাজউদ্দীনের পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যেও ঐ প্রবণতাগুলি অব্যাহত—তবে কখনও-কখনও রূপক-সঙ্কেতও তাঁর নাট্য-উপাদান হয়ে উঠেছে সার্থক ব্যঞ্জনা বহন করেই। 'স্পার্টাকাস-বিষয়ক জটিলতা' (১৯৭৩) এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে লেখা নাটক 'ফলাফল নিম্নচাপ' (১৯৭৪)। তবে তাঁর যে-তিনটি নাটক শিল্পগুণে এবং জনপ্রিয়তায় অগ্রগণ্য—সেগুলি হল : '৫২-র ভাষা আন্দোলনের অনুসূত্র ধরে একটি নারীর সকরুণ জীবনার্তি ব্যক্ত হয়েছে 'বিবাহ' নাটকে (১৯৭৮)। পরের নাটক—আমাদের আলোচ্য এই 'কী চাহ শঙ্খচিল' (১৯৮২)। এটিও একটি নারীরই একক বেদনার রূপচিত্র—যার পরিপ্রেক্ষিত স্বাধীনতার সংগ্রামকালের শেষ সপ্তাহ থেকে পরবর্তী মুক্ত-বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম বছর খানেক সময়,

যখন আচম্বিতে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নীতিবোধের অপহ্নব দেখা দিচ্ছে কোথাও-কোথাও। এই পটভূমিকাই আরও তীব্রতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'সাতঘাটের কানাকড়ি' (১৯৮৯) নাটকের মধ্যে। তার আগেই অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে মমতাজউদ্দীনের 'রাজা অনুস্বারের পালা' (১৯৮২)—যা ঐ সময়কালের দেশ ও সমাজের রূপক হিসেবেও গণ্য হবার যোগ্য। এসব ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি নাটক তিনি লিখেছেন, যার মধ্যে অনুবাদ নাটকও আছে।

মমতাজউদ্দীন সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে এই কথাটাই বলা যায় (বস্তুতপক্ষে, জিয়া হায়দার, বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ বাংলাদেশের নাট্য সমালোচকরা বলেওছেন সেটা) যে, সমকালীন দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রনিয়ামক গোষ্ঠী শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ওপরতলার মানুষদের ভ্রষ্টাচার-ভণ্ডামি-নীতিহীনতা-অনাচার-অবিচারের বাস্তব এবং ধীমান্ চিত্রায়ণ দেখা যায় তাঁর নাটকে। যে-লড়াই ১৯১৭ থেকে তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৫২ থেকে বহে-আসা সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে, তারই অব্যাহত প্রবহন আজও চলেছে মমতাজউদ্দীন আহমদের সৃষ্টির উপকূল ধরে।

৫.২ 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেরণার উৎস

'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের মধ্যে বাস্তব ইতিহাস কেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তার একটি করুণ-নির্মম দলিলের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতেই পারে এখানে নাট্যকার হিসেবে মমতাজউদ্দীনের অম্বিষ্ট মূল্যায়নের প্রয়োজনে। 'খানসেনা' বলে সাধারণ্যে উল্লেখিত পাকিস্তানি বাহিনি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নরহত্যার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপক নারীহরণ ও নির্যাতন করত (যেটা এই নাটকেরও ট্র্যাজিক পরিণামের উৎসস্বরূপ) তার একটি প্রামাণ্য বিবরণী (এরকম শত-শত ঘটনার সন্ধান মিলবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের ফাইলে এবং মহাফেজখানায়) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২-র দৈনিক বাংলা' থেকে :

"২রা অক্টোবর (১৯৭১) রাত ১টায় লেম্বুছড়াই থেকে মুক্তিযোদ্ধাসহ কম্বাইন্ড ফোর্স মেজর হায়দারের নেতৃত্বে করিমগঞ্জের কাতলামারী পাক ডিফেন্সের দিকে যাত্রা শুরু করে। ....সকালের সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে মেজর বীরবিক্রমে মরণ আঘাত হানলেন সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়ে। ....দুপুর বারটার দিকে সুদীর্ঘ ১০ ঘন্টা একটানা যুদ্ধ শেষে করিমগঞ্জের মাটি ছেড়ে ভেগে যেতে লাগল হানাদার পাক বাহিনী। ....মুক্ত হয়ে গেল করিমগঞ্জ।

মুক্তিযোদ্ধারা করিমগঞ্জের পাক ডিফেন্সে, বাংকারে ঢুকে শুধু পেটিকোট ও ব্লাউজ পরিহিত ১৮/১৯ জন বাঙালী তরুণী ও বালিকা দেখতে পায়। সবাই কাঁদছিল। ....তাদের সারা শরীরে চাবুক ও নির্যাতনের দাগ।.....মাসের পর মাস...বাংকারেই তাদের থাকতে হতো। এগুলো ছিল অফিসারদের ক্যাম্প।....ওদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা হয়েছে বিভিন্ন সময়। অধিকাংশই শিক্ষিতা, কেউ কেউ ছাত্রী। ....কমান্ডারের নির্দেশে গ্রাম থেকে কিছু পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে এনে তাদের পরতে দেওয়া হলো এবং শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত যারা লুটেছে তাদের ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য সহযোদ্ধাদের নিয়ে কোম্পানী কমান্ডার এগিয়ে চললেন সম্মুখপানে।" ('মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম' : মুসা সাদিক; ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ: ১৫৫-৫৬ থেকে উদ্ধৃত)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের এইসব বিবরণই নাট্যকারের হাতে শিল্পঋদ্ধভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রৌশনারাও ঐভাবেই পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা অপহৃত হবার পর ধর্ষিতা, লাঞ্ছিত হয়েছিল সেনাশিবিরে। মুক্তিযুদ্ধের সমকালের বাংলাদেশের ঐ রকম অসংখ্য অপহৃতা উৎপীড়িতা মেয়েদের প্রতীক-প্রতিমা রূপেই সৃষ্টি হয়েছে রৌশনারা। স্বাধীনতা উত্তরকালে তাদের জীবনের পরিণতি সর্বক্ষেত্রেই না-হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই ট্র্যাজিক

হয়েছে নানান্ মাত্রাবিন্যাসে। সেই ট্র্যাজেডির চিত্রায়ণও করেছেন মমতাজউদ্দীন এ নাটকে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে (সদ্য প্রয়াত।) পূর্ব-পাকিস্তান আর্মি কমান্ডের প্রধান লে: জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি যখন সুবিশাল এক সৈন্যবাহিনীসহ নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যেসব হতভাগিনী মেয়েদের উদ্ধার করা হয়, তাদেরই অন্যতমা বলে রৌশনারাকে কল্পনা করেছেন মমতাজউদ্দীন।

কিন্তু এই মেয়েরা 'মুক্তি' পেয়ে কেমন ছিলেন পরের দিন-মাস-বছরগুলোতে? তাঁদের এক ধরনের পরিণতির চিত্রায়ণ হয়েছে (হয়ত বা একটু বেশি নাটকীয়তার সঙ্গেই) এই রৌশনারার মধ্যে। আর এক ধরনের পরিণতির হদিশ পাওয়া যায় ড. নিলীমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' (ঢাকা, ২০০১) গ্রন্থে :

"আমি যখন পুনর্বাসন কেন্দ্রে ছিলাম কত স্বামী ভাই বাবা এসেছেন মুসলমান সমাজের, কিন্তু মেয়ে, বউকে কেউ ফিরিয়ে নেন নি। একজন আর্মি অফিসারও ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন; বউকে বললেন মাসে মাসে টাকা দিতে পারেন, কিন্তু ঘরে নিতে পারবেন না। মনে হয় তিনি এতদিনে জেনারেল হয়ে গেছেন, তাঁর বীরত্বের পুরস্কার পেয়েছেন, আর সুলতানা হয়তো টানবাজারে জীবনযুদ্ধের শেষ লড়াইতে ব্যস্ত।" (পৃ : ২৬)

ড. ইব্রাহিমের উল্লেখিত ঐ সুলতানা এবং মমতাজউদ্দীনের চিত্রিত এই রৌশনারার জীবন ভবিতব্যের পরিমাণে বস্তুতই কোনও পার্থক্য আছে কি?.....নিলীমা ইব্রাহিমের একটি নাটক আছে, 'যে অরণ্যে আলো নেই' (১৯৭৪)—যার নায়িকা রেহানা ঐ সুলতানার আদলেই গড়া। রেহানা, মীনা, শিউলি, রুমা, সেলিনা—পাকসেনাদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছিল সবাই, এখন আছে পুনর্বাসন কেন্দ্রে। এদের কাউকে স্বামী ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েও "দিনে তিনবার করে টিটকারী" দেয়; কারুর শ্বশুর নিজের প্রাণ বাঁচাতে পুত্রবধূকে ফেলে রেখে গিয়েছিল পাকসৈন্যদের লালসার সামনে কিন্তু এখন আর তাকে ফেরৎ নিতে চাননা; আর একজনকে ছোটভাই নিতে এলেও সে যায় না—সমাজ তাকে পতিতা বলবে, তার "বৈধ" পুত্রের সঙ্গে "ধর্ষণজাত" মেয়েকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে দেবে না এই ভয়ে; আবার এমনও একজন আছে, যে-কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইলেও সে গররাজি হয় এই ভয়ে যে, বিয়ের পর তার অবাঞ্ছিত "অপবিত্রতা"-র জন্য স্বামী শেষ পর্যন্ত ঘৃণাই করবে।

জিয়া হায়দারের 'সাদা গোলাপে আগুনও (১৯৮২) এবং 'পংকজ বিভাস' নাটক দুটিও এই অপহৃতা মেয়েদের ফিরে আসার পরবর্তী অসহায় যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। প্রথম নাটকটিতে, হাসপাতালের প্রসূতি-ওয়ার্ডে 'ওয়ার বেবি'-দের জন্মদানে প্রতীক্ষারতা বিপন্ন মায়েরা—শানু, কুমু, সালমা, বেলি, আইভি ভয়াল একাত্তরের দিনগুলোর স্মৃতি-রোমন্থনে জর্জর। প্রায় সকলেই বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করতে ভীত। বেলি আত্মহত্যা করতে চায়, সালমাও। শুধু শানু সংগ্রাম করে পিতৃপরিচয়হীন আসন্ন সন্তানকে বড় করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু নিকট-আত্মীয়রাও তাকে "নষ্ট মেয়ে" বলে প্রচার করায় মানসিক আঘাতে সেই সর্বাগ্রে মৃত্যুবরণ করে। সালমাও আত্মহত্যা করে—তবে তার মৃত্যুর পর তার বাবা তাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। কুমুর স্বামী অবশ্য তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বেলি তার প্রেমিক হাসানের মনে দ্বিধা দেখে তার সঙ্গে যেতে চায় না—সে হাসপাতাল ছাড়ে মৃত বান্ধবী শানুর মুক্তিযোদ্ধা ভাই আবিদের সঙ্গে, আইভির সন্তান জন্মের আগেই নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় নাটকটি প্রথমটিরই উত্তরপর্ব বলা চলে। আবিদ-বেলির মেয়ে রানী (আবিদ তাকে নিজের কন্যা বলেই পরিচিত করে—সেই হাসানের ছেলে মাহমুদকে চায়। কিন্তু হাসান রানীর 'অ-বৈধতা'-র কথা জানায় ছেলেকে। শেষ পর্যন্ত বেদনার মধ্যেই সাঙ্গ হয় নাটক।

একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যাপক বিপন্নতার এ-যেমন একটা দিক আছে, তেমনি তাঁদের দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছনার আর একটা দিকেরও সন্ধান মেলে নাটকে। মমতাজউদ্দীনের 'বর্ণচোরা' নাটকটির উল্লেখ আগেই করেছি; সেখানে এই অন্যতর দিকটির একটি মর্মান্তিক চিত্রায়ণ করেছেন তিনি। পাক বাহিনীর অনুগত জনৈক 'খান গোলাম সাদেক খান' যুদ্ধের সময় শুধু স্বদেশ এবং স্বজাতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি, তাঁর পুত্রবধূকেও সাগ্রহে তুলে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি সৈনিকদের হাতে, যাতে 'তাঁর' ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা পবিত্র পাকিস্তানি শোনিতের" উত্তরাধিকার অর্জন করে ধন্য করে গোটা পরিবারকেই। এ ধরনের রাজনৈতিক 'গুরুপ্রসাদী' এবং/অথবা 'নিয়োগপ্রথা'-র শিকার দেশদ্রোহী, ভ্রষ্টবিবেক অভিভাবকদের নির্বন্ধে অনেক দুর্ভাগিনীকেই হতে হয়েছে সেই ভয়াল দিনগুলিতে।

'কী চাহ শঙ্খচিল'-এর রৌশনারা এই অগণ্য দুর্ভাগিনী মেয়েদের সবার হয়ে প্রতিবাদে, বিদ্রূপে ফেটে পড়েছে। সে হল এই "মানহারা মানবী"-দের সকলের বিদ্রোহের, রুখে দাঁড়ানোর প্রতীক-প্রতিমা। অন্তত মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর এই ক্লান্ত, লাঞ্ছিত মানসকন্যাকে সেইভাবেই কল্পনা ও সৃষ্টি করেছেন বলতে পারি।

৫.৩ নাটকের কাহিনির রূপরেখা

'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ কয়েকটি দিনের সূত্র ধরে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের কিছু দিনের ঘটনা। একটি নারীর জীবনের অকল্পনীয় ট্রাজেডি চিত্রিত হয়েছে এর মধ্যে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে। এই নাটক মানসিক দ্বন্দ্বের নাটক। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এক পরিবার এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ রৌশনারা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি, নাটকটিতে ঘটনাক্রম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অতীতচারিতার মধ্যে দিয়ে। কখনো একক আলাপ, কখনো হাসপাতালের কর্মী আতর আলীর সঙ্গে কথায়-বার্তায় আবার কখনো বা ডাক্তার হান্নানের সঙ্গে আলাপে আমরা রৌশনারার পারিবারিক জীবন তথা নাট্যবস্তুকে আলোকিত হতে দেখি। রোশেনারার স্বামী তাদের একমাত্র সন্তান লালনকে হত্যার দায়ে কারাবন্দি, মানসিক ভাবে পর্যুদস্ত রৌশনারা। সন্তান-সম্ভাবনার আনন্দ সংবাদ দেওয়ার প্রাক্কালেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে তুলে নিয়ে যায়—"১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাস, তিন তারিখ। দিনটা শুক্কুরবার।" নাট্যকার সচেতন ভাবেই মুসলমান সংস্কার অনুযায়ী তাদের পবিত্র দিনে এই ভয়ংকর ঘটনার অবতারণা করেছেন। সৈন্য ব্যারাকে বারো তেরো দিন বীভৎস অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন রৌশন স্বাধীনতার দিন ফিরে আসে ঘরে—সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রশ্নে কেঁপে ওঠে সংসার, লালনের পিতৃত্বের অধিকারের প্রশ্নে জর্জরিত হয় রৌশনের পারিবারিক জীবন। তার স্বামী শ্বশুর সমেত সকলেই ধরে নেয় সৈন্য ব্যারাকের নিষিদ্ধ অত্যাচারের ফসল লালন। এরপর থেকেই এক বিচিত্র মানসিক নিপীড়নের শিকার হতে হয় রৌশেনারাকে। যার চরম প্রকাশ পিতার হাতে সন্তানের হত্যায়। মা এবং স্ত্রীর ভূমিকা দাঁড়িয়ে এই মর্মন্তুদ ঘটনার পিছনের সামাজিক ও মানসিক নানা প্রশ্নের আঘাতে রৌশনারা শেষ পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। নদীর চরে মৃতসন্তানের সাহচর্যের আশায় উন্মাদিনী রৌশনের পরিণতি দর্শককে মূক করে দেয়। উন্মাদিনী রৌশন আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে কিছু অমোঘ জিজ্ঞাসা— আইনসম্মত সন্তানের জন্মপরিচয় কালিমালিপ্ত হয়েছে, মা হয়ে সেই দুর্ভাগ্য থেকে সন্তানকে সে রক্ষা করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায় স্বামীর অন্যায় আতিশয্যে স্ত্রী হিসেবে সে বাঁধা দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত স্বামীর মুক্তির আশায় পরিকল্পিত পারিবারিক নিপীড়নের শিকার রৌশন। একদিন তারই লাঞ্ছনাকে হাতিয়ার করে সামাজিক করুণা কুড়িয়েছে তার পরিবার—আজ তাকেই নির্বাসিত করেছে মানসিক হাসপাতালে। এই নির্মম সামাজিক ট্র্যাজেডির জীবন্ত ভাষ্য 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটক।

৫.৪ বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের অশান্ত অভিঘাত এ-নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহবধূ রোশেনারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খানসেনাদের দ্বারা অপহৃতা হয়। এই দুর্ঘটনায় প্রাকমুহূর্তে সে জানতে পারে যে সে অন্তঃস্বত্তা কিন্তু স্বামীকে এই সুসংবাদ দেওয়ার আগেই তার জীবনে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ, বিধ্বস্তা বিপর্যস্ত রৌশনারা সৈন্যশিবির থেকে ফিরে এলে স্বামীগৃহে তার স্থান হয় বটে কিন্তু তার সন্তানকে সমাজ ও পরিবার যুদ্ধের ফসল হিসেবেই ধরে নেয়। তার স্বামীর অন্তঃসারশূন্য মেকী আবেগ রৌশনারাকে মূক বিমূঢ় করে তোলে। সন্তানের বৈধতা প্রতিষ্ঠায় অপারগ রোশেনারা স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের উপকরণে পরিণত হয়। রোশেনারার ধ্বস্ত জীবনকে মূলধন করে তার স্বামী সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সভা-সমিতিতে রৌশনারার যন্ত্রনাবিদ্ধ জীবনকে প্রচারের আলোয় তুলে ধরে তার স্বামী একদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের উদার নাগরিক রূপে বাহবা কুড়োয়, অন্যদিকে এই দুর্ঘটনা তার স্বপ্নপূরণের মূলধন হয়ে ওঠে। রৌশনারার সন্তান লালনের জন্মের পর তাদের দাম্পত্য জীবনের পাথরের দেওয়াল আরো নিরেট হয়েছে। রোশেনারা দেখেছে লালনের স্পর্শকে তার উদার স্বামী ঘৃণায় মুছে ফেলছে। মা হিসেবে অসহায় রৌশনারা সন্তানের এই অপমানে লজ্জায় ঘৃণায় কুঁকড়ে গেছে তবু প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেনি।

এই নাটকের ভয়ংকর নিষ্ঠুর চমক পাঁচ বছরের লালনের মৃত্যু—যে মৃত্যুর দায় রৌশনারার মাথায় চাপিয়ে তাকে মানসিক রোগগ্রস্থ বলে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে তার শ্বশুরবাড়ীর লোক। রৌশনারার সামনে তার সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে তার স্বামী তারপর তার মৃতদেহ নদীর চড়ায় বালি চাপা দিয়ে এসেছে। এইবার প্রতিবাদী হয়েছে রোশেনারার মাতৃসত্তা। সে চীৎকার করে দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চেয়েছে তার ভন্ড স্বামীর আসল চেহারা, কিন্তু কেউ-ই তাকে বিশ্বাস করেনি। সকলেই বিশ্বাস করেছে আলি নেওয়াজ (রৌশনারার স্বামী) নির্দোষ। রোশন নিজেই তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবাঞ্ছিত সন্তানকে হত্যা করেছে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে। রোশনকে স্থানান্তরিত করা হয় তারই পূর্ব-প্রণয়ী ড. হান্নানের হাসপাতালে,—সেখানেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। ড. হান্নানের আন্তরিকতাতেই সে তার মনের রুদ্ধ দরজা খুলে দেয়। কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক নিষ্ঠুরতার দায় বহন করতে করতে ক্লান্ত রোশন শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই মানসিক রোগীতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বরীর মতই রৌশনও শেষ পর্যন্ত উন্মাদিনীতে পরিণত হয়ে প্রমাণ করে গেল সে যে উন্মাদ ছিল না। তার সন্তানের পরিণতি তাকে অসংলগ্ন অস্থির করে দিয়েছিল। এই নাটক প্রমাণ করে স্বাধীনতা কত কঠিন মূল্য চায়—বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ের প্রতীক রৌশনারার জীবনের এই নির্মম পরিণতি আমাদের স্তব্ধ করে দেয়।

৫.৫ নামকরণের তাৎপর্য

মমতাজউদ্দীন আহমদ এই নাটকের নামের মধ্যে দুর্জ্ঞেয় কিছু সঙ্কেতের ব্যঞ্জনা এনেছেন। শঙ্খচিল—যে হল সিন্ধুপারের পাখি, সাগর-বন্দর-জনপদ পেরিয়ে দূরদূরান্তে পাড়ি দেয় অসীম আকাশের নিচে। সেদিক থেকে এই নাটকের যে বিষয়-উপজীব্য, তার সঙ্গে 'শঙ্খচিল' শব্দের ব্যঞ্জনাকে প্রাথমিকভাবে মেলানো দুরূহ। পাঠকরা/দর্শকরা অবশ্যই জিজ্ঞাসু হবেন এ-নাটক পড়বার/দেখবার সময় এই কথা ভেবে যে, এখানে শঙ্খচিলের চাওয়ার প্রশ্নটা ওঠে কিসে?....এই জিজ্ঞাসার উত্তর কিছুটা জটিল।

এই নাটকের নায়িকা রৌশন যেন অসহায়-নৈঃসঙ্গের সমুদ্রের উপকূলে একাকিনী এক নারী। তার বেদনা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে কখনো ডাক্তার হান্নানের, কখনো বা আতরালীর সঙ্গে একান্ত আলাপনে। ঝড়ে ডানা-ভাঙা এক শঙ্খচিলের মতোই করুণ অবস্থা তার। আর তাকেই এ প্রশ্ন করেছেন নাট্যকার—"কি চাহ শঙ্খচিল?"....এ প্রশ্ন নাটকের শেষে প্রতিটি পাঠক/দর্শকের মনেও কিন্তু জেগে ওঠে সমান ব্যাকুলতায়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, নাটকের এক অংশে রৌশন নিজেকেই ডানা-ঝাপ্টানো অসহায় এক পাখির সঙ্গে তুলনা করেছে আতরালীর কাছে।

একান্ত আপনজন বলে যারা গণ্য হয় তাদের মুখোস-খুলে-যাওয়া কদর্য ভাবমূর্তি দেখে এবং একমাত্র সন্তানের অপঘাতে মৃত্যুর নির্মম আঘাত যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে রৌশনারার যে অসহায় করুণ উপস্থিতি পাঠক/দর্শকের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, সেটাই এই নাটকের চূড়ান্ত ট্র্যাজিক পরিণাম। প্রথাসিদ্ধ নাট্যতত্ত্বের সংজ্ঞার সঙ্গে ছক মিলিয়ে এই ট্র্যাজিক অভিভবকে যে বাঞ্ছিত করা যায় না, সে কথা রৌশনারার চরিত্রের গভীরে অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করব। এখানে সেই ট্র্যাজিক-অস্তিত্বময়ী নারীর কাছে (যাকে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতার অন্তর্গত এক শব্দযুগল অনুসারে "মানহারা মানবী" বলেও উল্লেখ করতে পারি হয়ত বা!) নাট্যকার, পাঠক, দর্শকই শুধু নয়—সমস্ত সমাজই যেন কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন শুধোচ্ছে, কী চাও তুমি এর প্রতিকারের জন্য?....কি চাহ 'শঙ্খচিল'?.... এই 'প্রতীকী' প্রশ্নের মাধ্যমে নাট্যকার যেন গোটা সমাজটাকে ঐ মানরাহা মানবীর সামনে নতজানু হয়ে ক্ষমতা চাইয়েছেন।

৫.৬ রৌশনারা : একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজিক চরিত্র

'কি চাহ শঙ্খচিল'—নাটকটি বারোটি দৃশ্যে বিভাজিত। এই নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রৌশনারার দৃপ্ত উপস্থিতি। এ নাটকের মূল আকর্ষণ বা কেন্দ্রবিন্দু রোশেনারা তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত রকম নাটকীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যাপ্তি সুপ্তি, ধিক্কার-ব্যঙ্গ আবর্তিত হয়েছে। তাকে আমরা প্রথম আবিষ্কার করি মানসিক হাসপাতালের রোগী হিসেবে, ডাক্তার হান্নানের তত্ত্বাবধানে রৌশনকে সত্যি সত্যি মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু যখন একটু একটু করে চরিত্রটি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়, তার যন্ত্রণা ও অপমানের নিঃসীম অন্ধকার নিয়ে তখন দর্শক তার মানসিক স্থৈর্যে বিস্মিত হয়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সামান্য এক কর্মচারির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গেই রৌশনারার চাপা যন্ত্রনার মৃদু আভাস আমরা অনুভব করি—"আমার কিছু হয়নি আতরালী, আমার কিছু একটা হতে পারত,.........আমার যে পাগল সেজে আর এই বন্দীশালায় থাকতে মন চায় না। ডানা ঝাপটিয়ে আমার শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে এল আতরালী।"

এই নাটকের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে এক যন্ত্রনাদগ্ধ নারীহৃদয়—যে কখনো ব্যঙ্গে তীব্র অপমানে ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, আবার অসহায়তায় মূক, রোশেনারার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সাহস আমাদের সমাজের নেই, তাই সমাজ তাকে নির্বাসন দিয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবিধ্বস্তা রোশন যখন ফিরে এসেছে স্বামী তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে, সমাজ তাকে মাথায় করে অভ্যর্থনা সভার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসবের আড়ালে নিষ্ঠুর ঘৃণা বেআব্রু হয়ে ধরা পড়েছে রৌশনের কাছে। স্বামীর অন্তঃসারশূন্য, আন্তরিকতাবিহীন ব্যবহারিক উচ্ছ্বাস, শ্বশুরের সুবিধেবাদী আচরণ তাকে একটু একটু করে ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। ডাক্তার হান্নানের কাছে রোশন তীব্র ব্যঙ্গে ফেটে পড়তে চেয়েছে—"শ্বশুর তো হলো আমার বাপের তুল্য। আর স্বামী, স্বামীর পায়ের নীচে বেহেস্ত। শ্বশুরকে অস্বীকার করে বালুর বুকে বুক রেখে শুয়ে থাকব তেমন বেহুদা বউ আমি নই ডাক্তার।"

আসলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষপর্বটি রৌশনের জীবনে যে সর্বনাশের সূচনা করেছে তার স্বামী ও শ্বশুর সেটাকেই আবার মূলধন করে নিজের লোভ ও উচ্চশিক্ষা পূরণের পথ প্রস্তুত করেছে। নিজস্ব ঘেরাটোপের যে উষ্ণতায় রোশন

আশ্রয় পেতে চেয়েছে, আলি সাহেব তাকে সেখান থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেছে সমাজ-সংস্কারের হুমকী, বাজারী আবহাওয়ায়। রৌশন হয়ে উঠেছে নিপীড়িতা নারী 'মডেল' যাকে ভাঙ্গিয়ে আলি সাহেবের বাড়ি গাড়ির স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। রৌশনের স্মৃতিচারণায় তার স্বামী এবং পরিচিত জনেদের কৃত্রিম আচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"আমাকে সবাই খুব ভালবাসত। আব্বা আমি তো বিরাট কিছু একটা করে ফিরে এলাম। আমার গৌরবে ওর বন্ধুদের কত গৌরব।" রোশনের শিক্ষিত পরিশীলিত মন এই কৃত্রিমতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কিন্তু তার অসহায় বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় আক্রোশে ফেটে পড়েছে, নারী জীবনের লাঞ্ছনা সে সহ্য করলেও, মাতৃত্বের অবমাননা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি—"আব্বা, আপনার ছেলে, আমার স্বামী, আমার করুণা ভিক্ষা করে আপনার হাতে একটা প্রদীপ পাঠিয়েছে। সেই প্রদীপে আগুন দিতে হবে আমাকে। ....আমার সব আগুন যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আব্বা। আমার লালনের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার সব বৈভব, সব ঐশ্বর্য, সব নীরবতা যে হিম হয়ে গেছে। আমি আর পারছি না।"

রৌশনারার পরিবার তাকেই সন্তান হত্যায় দোষী সাব্যস্ত করতে চেয়েছে। তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর অন্তরালেও ক্রিয়াশীল সেই নিষ্ঠুর হিসেবী মন। আর হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার হান্নান ও এক এক সময় লালনের হত্যার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে "এখন আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি মা হয়ে নিজে নিজের গর্ভজাত সন্তানকে......। লালন তো যুদ্ধের ক্রোধ, তাকে ধারণ করা যায় কিন্তু আপন করা যায় না।" এই নিষ্ঠুর সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী রোশন নিজে। সন্তানের স্নেহ চুম্বনকে সক্রোধ ঘৃণায় মুছে ফেলতে দেখেছে সে। পিতা নেওয়াজআলি 'লালন' কে মেনে নিতে পারেনি, না সমাজে না সংসারে। আসলে নাট্যকার এখানেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি—'লালন' নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিশ্বমানবের ছায়া "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?" লালনের জাত নেই, জাত হয় না। দুর্ভাগা রোশন তাকে জাতধর্মে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। সংসারে বা সমাজে কোথাও লালনের অস্তিত্ব সংকট মোচন করতে পারেনি। রৌশনারার মাতৃসত্তার এই পরাজয় তাকে শেষপর্যন্ত ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। পিতা আলি নেওয়াজ লালনকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে, আর মা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে নদীর চরায় বালির বুকে, যেখানে মিশে রয়েছে আরো অসংখ্য লালনের অস্তিত্ব।

৫.৭ অন্যান্য চরিত্র

ডঃ হান্নান :

নাটকে ড: হান্নানকে আমরা দেখতে পেয়েছি মানসিক হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রূপে, তারই চেষ্টায় রোশনের চিকিৎসা চলছে। মানুষটি সহৃদয়, রোশনের যন্ত্রণার সমব্যথী—"মানুষ শখ করে, রাগ করে, কাঁদে, নদীতে সাঁতার কাটে, কিন্তু এলোমেলো হয় না সিস্টার।....... ওকে ভালবেসে ভালবাসার তথ্য ফিরিয়ে দিতে হবে। ভালো না বেসে ওকে শান্ত করা যাবে না সিস্টার।" রৌশনকে মানুষ হিসেবে ডাক্তার বুঝতে চেয়েছে, তার মনের কোমল তন্ত্রীকে ছুঁতে চেয়েছে।

আসলে ডাক্তার ছিলেন রৌশনেরই পূর্ব প্রেমিক, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করে। দেশে থাকলে হয়ত তাদের সম্পর্ক পরিণতি পেতে পারত, কিন্তু ডাক্তার যখন দেশে ফেরে তখন রোশন অন্যের ঘরণী। রৌশনকে এই অবস্থায় দেখে তার মধ্যেও এক অপরাধ বোধের সূক্ষ্ম পীড়ন ক্রিয়াশীল হয়। সে নিজে দেশের এই আপৎকালে দেশছাড়া হয়েছে সুবিধেবাদীর মত, এই অপরাধ বোধ তার ছিলই, রোশনের অবস্থা তাকে অস্থির করে তোলে। তার অবচেতনেও রোশনকে সুস্থ করে তোলার মধ্যে দেশসেবার তৃপ্তি মিশে গিয়েছিল। কিন্তু রোশনের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ডাক্তারের মোহমুক্তি ঘটেছে।

ডাক্তারই প্রথম উপলব্ধি করেছে রৌশনের যন্ত্রণার স্বরূপ, তার শ্বশুরবাড়ীর নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাস করেছে রৌশনের মানসিক ছন্দপতনকে। একাদশ দৃশ্যে ডাক্তার সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছে জনাব আলির প্রতি—"জনাব আলি আমি সমস্ত প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে এবং সূত্র বিন্যাস করে জেনেছি আপনার অসাধারন পুত্র আলি নেওয়াজ লালনকে খুন করেছে। .....আপনি তো জানেনই রৌশনারা পাগল নয়, ওকে পাগল বলে প্রমাণ করার জন্য আপনাকে তৎপর হতে হয়েছে। ....আপনার ছেলে তার নিজের ছেলেকে অস্বীকার করল কেন? লালন তো ছাউনির ছেলে নয়। .....আপনার আলি নেওয়াজের রাজনৈতিক মূলধন তো লালন।"[২] এই একটি মাত্র মানুষ সৎ নির্ভীকতার সত্য উচ্চারন করেছে। রৌশনারার পরিণতি ডাক্তার ঠেকাতে পারেনি, তার শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে ও পারেনি। কিন্তু রোশনের নির্বান্ধব শূন্য জীবনে তার ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠেছে।

প্রথম দৃশ্য।

একাদশ দৃশ্য।

আতরালী :

এ নাটকে আতরালী মানসিক হাসপাতালের সাফাই কর্মী। এক অশিক্ষিত বৃদ্ধ। আপাত দৃষ্টিতে তার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আতরালীর উপস্থিতি এবং তাকে উদ্দেশ্য করেই রোশেনারার যন্ত্রণাদগ্ধ নারীমন ও মাতৃহৃদয় লোকসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। আতরালী সেই মানুষ যার কাছে নিঃসংকোচে রোশন তার অন্তরাত্মার অস্থিরতাকে ব্যক্ত করেছে। আতরালীর মাধ্যমেই আমরা ব্যক্তি রোশেনারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

নাটকে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোন না কোন ভাবে প্রধান চরিত্র বিকাশে বা বিন্যাসে সাহায্য করে। আতরালী এখানে রোশেনারার অন্ধ মনের ডানা ঝাপটানোর সংবাদ আমাদের দিয়েছে। আমরা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষিত মননশীল সমাজ রোশেনারার যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারে নি, সেই সমাজেরই এক অশিক্ষিত অমার্জিত মানুষ এই যন্ত্রণার সঙ্গী হয়ে উঠেছে—"আপনে লোক ভালা। তয় আপনার মগজের মধ্যে বহুৎ জ্বালা যন্ত্রণা।"[১] আতরালী এই উন্মাদিনীর প্রতি সচেতন এবং সহানুভূতিশীল। সে যেন জানে রোশনের হৃদয়ের গভীর বার্তা। রৌশনারা ও বুঝি বা তার শিক্ষিত মার্জিত পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে এই সরল-সহজ মানুষটাকেই যন্ত্রণার অংশীদার করতে চেয়েছে। আতরালী যেন অনেকটা গ্রীক নাটকের 'কোরাস'-এর মতো, যার নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই, কিন্তু তার মাধ্যমেই দর্শক নাটকের মূল বিষয় এবং চরিত্র দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করতে পারে।

(১) পঞ্চম দৃশ্য।

৫.৮ এই নাটকের সংলাপ

নাটকের কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির প্রধান উপায় হল সংলাপ। নাটকের রসসৃষ্টি এবং চরিত্র পরিস্ফুটনের বাহন সংলাপ। সংলাপের মাধ্যমেই নাটকের পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। সংলাপ নাটকের চরিত্রসত্তার সামগ্রিক অভিব্যক্তি। চরিত্রকে বাস্তবধর্মী করতে এবং চারিত্রিক দ্বন্দ্ব প্রকাশে মূল অবলম্বন সংলাপ।

'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের মূল সম্পদ সংলাপ। ছোট ছোট সংলাপ নাটকের গতিবেগের পক্ষে উপযোগী হলেও দীর্ঘ সংলাপ ও যে কখনো কখনো সার্থক হয় তার অজস্র প্রমাণ আমাদের নাট্যসাহিত্যে রয়েছে, জুলিয়াস সিজার, ম্যাকবেথ—নাটকেও দীর্ঘ বক্তৃতাধর্মী সংলাপ আমরা লক্ষ্য করি। তবে সংলাপে আবেগের তীব্রতা নাট্যগতিকে স্তিমিত হতে দেয়নি। মূলতঃ স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়েই নাটকের ঘটনা আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে—তাই রোশেনারার

অসম্বৃত অস্থির চিত্ততার প্রকাশ হিসেবে দীর্ঘ সংলাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এনাটকের সংলাপে দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—শহুরে কথ্য ভাষার পাশাপাশি আতরালীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ে রৌশনারা আঞ্চলিক উপভোষাকেই আশ্রয় করেছে। পূর্ববঙ্গীয় লোকভাষায় তার স্বচ্ছন্দ গতি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে শিক্ষিতা রৌশনারা তার শিকড় ছিন্ন হয়ে যায়নি। আবার আতরালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনায় শহুরে ভাষা অন্তরায় হতে পারে এই ভাবনা তাকে আটপৌরে করে তুলেছে। অর্থাৎ মানসিক সচেতনতা তার যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে সংলাপের এই দ্বিস্তরিক প্রয়োগে নাট্যকার সে কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। আবার একথাও বলা যায় এ নাটকে নাট্যকার কোথাও নিজের কথা বলেননি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সকলেই নিজস্ব অভিব্যক্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এ নাটকের সাফল্যের অন্যতম কারণ এই সংলাপ সার্থকতা। কয়েকটি উদাহরণে এই আলোচনা প্রাঞ্জল হতে পারে—

১. প্রথম দৃশ্য □ রৌশনারার অস্থিরতা—

"আমার শত চিৎকারেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি বেশ সুস্থ স্বাভাবিক একজন মেয়ে।.......স্বামীর গলায় ধারালো চকচকে ছুরি।"

২. দ্বিতীয় দৃশ্য □ রোশেনারার অন্তরের যন্ত্রণা—

"আমার কিছু হয়নি আতরালী। আমার কিছু একটা হতে পারত, সেই একটা কিছু কবে যে হবে তাই ভেবে ভেবে আর ভাবতে ভাল লাগে না। .... ডানা ঝাপটিয়ে আমার শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে এল অতরালী।"

৩. তৃতীয় দৃশ্য □ পারিবারিক মেকী আবেগের প্রতি ব্যঙ্গ—

"শ্বশুর তো হল আমার বাপের তুল্য। আর স্বামী, স্বামী পায়ের নীচে বেহেস্ত। শ্বশুরকে অস্বীকার করে বালুর বুকে বুক রেখে শুয়ে থাকা তেমন বেহুদা বউ আমি নই ডাক্তার।"

৪. ষষ্ঠ দৃশ্য সন্তানের □ অপমানে যন্ত্রণাদগ্ধ মাতৃহৃদয়—

"আমার প্রিয় স্বামী জনাব আলী নেওয়াজ সকালে প্রচুর নাস্তা খেয়ে এবং লালনের কপালে চুমু খেয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলা থেকে নীচে নামত। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার স্বামী তার ঠোঁট দুটো হাতের তালু দিয়ে বার বার মুছে ফেলত। লালনের কপালের দাগ ঠোঁট থেকে অসহ্য ঘৃণায় তাড়িয়ে রেখে নতুন গাড়িতে উঠত।"

৫. অষ্টম দৃশ্য □ "কে কার অপরাধে শাস্তি বহন করবে ভেবে দ্যাখ ডাক্তার। ধর, ধর যদি আমি সর্বসমক্ষে বলি আমার ছেলে লালনকে আমার প্রিয় স্বামী আলী নেওয়াজ শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে, করুণা ভিক্ষাকারী আমার স্বামী মারা যাবে এবং মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে আমি তোমার ঘরে এসে উঠব ....ডাক্তার আমি তোমাদের ভালোবাসা আর স্বাধীনতার ইতিবৃত্তের একটি খুব বড় চরিত্র। ভয়ঙ্কর বড় এক ঘটনার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।"

৬. দ্বাদশ দৃশ্য □ "যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর, পৃথিবীর রঙকে মলিন কর আমি তো প্রতিবাদ করিনি—আমি তো সূর্যের আলোতে মুখ দেখাতে চাইনি—কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য গড়তে চাও কেন? আমার সন্তানের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?"

৫.৯ অপহৃতা নারী ও সামাজিক অনুশাসন : সাহিত্যে এই সমস্যার প্রতিবিম্বন

এ নাটক শুধু স্বাধীনতার নাটক নয়, এ নাটকের মূল উপজীব্য হল অপহৃতা একটি নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রশ্ন। যে কোন দেশের, যে কোন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, লাভ-লোকসান মূল্যহীন, সেখানে

সমগ্রের আবেগ এবং কল্যাণ মহতী রূপ নেয় নাট্যকার বলতে চেয়েছেন কতখানি চরম মূল্যে আমাদের স্বাধীনতার মূল্য নির্ধারন করতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রোশেনারার সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, তবু নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এমনই অসংখ্য রোশন এবং লালন স্বাধীনতার বলি। বিনা দোষে রৌশনকে শাস্তি পেতে হয়েছে। অবশ্য আমাদের দেশে অপহৃতা নারীর এই লাঞ্ছনার চিত্র পুরাণ মহাকাব্যের যুগ থেকে অব্যাহত আছে। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে অশোকবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে শিবিকার বদলে পায়ে হেঁটে ফেরার আদেশ দিয়েছিলেন যদিও সেকালে অভিজাত পুরস্ত্রীদের পায়ে হেঁটে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। অশোকবন থেকে ফেরার পর রামচন্দ্রের উক্তি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় নারীর অস্তিত্ব বিপন্নতার চরম প্রতীক বলে গন্য করা যায়—মূল রামায়ণের অনুসরনে সূত্রাকারে উক্তিগুলি উপস্থাপিত করা যায়—

১. প্রদীপের শিখা যেমন চক্ষু পীড়াদায়ক, তোমার উপস্থিতিও আমার কাছে তেমনি।

২. তোমার প্রতি প্রণয়বশতঃ আমি তোমাকে উদ্ধার করিনি, আমার কুলগৌরব রক্ষার্তে তোমায় উদ্ধার করেছি।

৩. লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ—যে কোন প্রধান পুরুষের সঙ্গে তুমি স্ত্রীর মত থাকতে পার। তোমাকে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

৪. তুমি কুকুরে চাটা ঘি-এর মত, সে যজ্ঞের প্রয়োজনে আসতে পারে না।

অপহৃতা নারী সম্পর্কে ভারতবর্ষীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুৎসিত মনোভঙ্গির আদিম উৎস রামায়ণের এই কান্ড।

বাংলা সাহিত্যে অজস্র নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানির গল্প'তে কমলাকে তার আত্মীয় পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছে কারণ ডাকাত তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কমলা তার নিজ সমাজে প্রত্যাখ্যাতা। উর্দু সাহিত্যিক রাজিন্দর সিং বেদীর 'লজবন্তী' গল্পেও দাঙ্গা ও দেশভাগের পটভূমিকায় এক অপহৃতা নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে। দাঙ্গায় অপহৃতা লাজো দেশভাগের পরে আবার ফিরে এসেছে—স্বামী সুন্দরলাল অপহৃতা নারীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার যজ্ঞের মূল হোতা। লাজোকে সে 'দেবী' বলে সম্বোধন করছে, সংসারে আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু লাজো তার পুরনো অবস্থান ফিরে পায়নি, সুন্দরলালের প্রাণের স্পর্শে তার জীবন স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি, সুন্দরলাল স্বর্ণসীতা তৈরী করে সমাজসেবার যজ্ঞ করেছে, কিন্তু প্রেম দেয়নি, সংসারে লাজোর অবস্থা বনবাসের সামিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জৈব' গল্পেও দাঙ্গার সময়ে অপহৃতা হবার অনুষঙ্গে গৃহবধূ সুদত্তা যে সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছিল, সে ব্যবহৃত হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক স্বামীর পরীক্ষাগারের গিনিপিগের মতো। তার বৈজ্ঞানিক স্বামী জিনতত্ত্বের এক গূঢ় দিক আবিষ্কারের নেশায় বারবোর স্ত্রীকে ব্যবহার করেছে। সুদত্তার ধর্ষণসঞ্জাত সন্তানকে তার পরীক্ষনের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। অপমানিত সুদত্তা তার মাতৃত্বের এই চরম অবমাননায় শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। স্বামীর ঔরসে তার যে দ্বিতীয় সন্তানটি আসন্ন, তাকে সে পৃথিবীর আলো দেখতে দিতে চায়না, পাছে দুই শিশুর পিতৃত্বের পার্থক্যজাত ফারাকের তুলনামূলক গবেষণা করতে শুরু করেন তার বিজ্ঞানী স্বামী। সেই গ্লানি সে সহ্য করতে পারবেনা—তাই সে চায় গর্ভ নষ্ট করতে।

'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকেও রৌশনারা তার নারীত্বের অপমান মুখ বুজে সহ্য করেছে, স্বামী স্বপ্ন পূরণের সিঁড়ি হয়ে উঠতেও বাধা দেয়নি। কিন্তু লালনের জন্মের বৈধতা এবং তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে উঠতে চেয়েছে। লালনের মৃত্যু তার মাতৃত্বের পরাজয় সে মেনে নিতে পারেনি—"......কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য গড়তে চাও কেন? আমার সন্তানের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?" কিংবা— "স্বাধীনতা? কার

স্বাধীনতা? কেমন স্বাধীনতা? মায়ের কোলে বাচ্চা নাই, মানুষের চোখে নিন্দা নাই, নদীর বুকে পানি নাই। এ কেমন স্বাধীনতা?" নাটকের শেষপর্বে তাই সত্যিই কার উন্মাদিনী রৌশনারা সমাজ-সংস্কারের অদৃশ্য শত্রুরূপী শঙ্খচিলের প্রতি প্রতিরোধে তীব্র—"আসল কথা হইল শঙ্খচিলের ঠোঁট। শঙ্খচিলডার লগে দেখা হইলে কইবা, লালনের মা আর মা নয় এক্কেবারে আগুন। রক্তের লাহাম টকটইক্যা আগুন। কইবা তো, আমার লালনের কসম—" মাতৃত্বের কঠিন প্রতিরোধ এনাটকের স্বাধীনতার রঙকে ফিকে করে দিয়েছে।

৫.১০ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. "রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকটি লেখা হলেও এর ট্র্যাজিক ভাবরূপটি সৃষ্ট হয়েছে সামাজিক অবক্ষয়ের অনুষঙ্গেই।"—এই বক্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করে দেখান।

২. "কি চাহ শঙ্খচিল" নাটকের শিরোনামটির তাৎপর্য বিচারের প্রেক্ষিতে রৌশনারা জীবনের ট্র্যাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৩. "রৌশনারা প্রকৃতপক্ষে কোনও একক চরিত্র নয়; পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থায় লাঞ্ছিতা নারীদের সবার প্রতীক স্বরূপ"—এ কথার তাৎপর্য কতটা বলুন।

৪. 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের সংলাপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করুন।

৫. 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকের মুখ্য সমস্যা কতখানি মনস্তাত্ত্বিক, আর কতখানি সামাজিক আলোচনা করে দেখান।

৬. 'কি চাহ শঙ্খচিল' নাটকে প্রত্যক্ষ পুরুষ চরিত্র দুটি : ডাক্তার হান্নান এবং আতরালী; আর পরোক্ষ পুরুষ চরিত্রও দুটি : রৌশনারার স্বামী এবং শ্বশুর। এই চারটি চরিত্রের তুলনামূলকভাবে বিচার করুন।

৫.১১ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. রৌশনারা পাকিস্তানি সৈন্যশিবির থেকে মুক্তি পাবার পর পরিবারে সে কীভাবে গৃহীত হয়েছিল, সংক্ষেপে বলুন।

২. রৌশনারার ছেলের নাম 'লালন' রাখার তাৎপর্য কী, আলোচনা করুন।

৩. রৌশনের স্বামী লালনকে হত্যা করল কী কারণে, বলুন।

৪. "আমার লালনের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার সব বৈভব, সব ঐশ্বর্য, সব নীরবতা যে হিম হয়ে গেছে।"—এই কথার তাৎপর্য কী, বলুন।

৫. "আপনার আলী নেওয়াজের রাজনৈতিক মূলধন তো লালন।"—এই কথার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের স্বরূপটি নির্ণয় করে দেখান।

৬. আতরালী রৌশনের প্রতি কীভাবে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানিয়েছিল, আলোচনা করুন।

৫.১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. রৌশন কবে পাক সৈন্যদের দ্বারা অপহৃতা হয়?
২. রৌশন বন্দী অবস্থায় পাক শিবিরে কতদিন ছিল?
৩. ডা: হান্নানের সঙ্গে রৌশনের বিয়ে হয় নি কেন?
৪. আতরালী হাসপাতালে কী কাজ করত?
৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভারতীয় সেনাবাহিনির সেনাপতি কে ছিলেন?
৬. পাক বাহিনির সেনাপতির নাম কী?
৭. 'শঙ্খচিল' কিসের প্রতীক?
৮. রৌশনের জীবনের সবচেয়ে বড় হতাশার উপলক্ষটি কী?
৯. "ডানা ঝাপ্‌টিয়ে আমার শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে এল"—এ কথা কে, কাকে, কখন বলেছে?
১০. "বেহুদা বউ" কথাটির তাৎপর্য কী?
১১. 'মানহারা মানবী' কথাটি কে, কোথায় ব্যবহার করেন?
১২. "ছাউনির ছেলে নয়" কথাটার মানে কী?

পর্যায় ২

একক ১ □ পূর্বসূত্র

১.১ মুখবন্ধ
১.২ টীকাসঙ্কেত

১.১ মুখবন্ধ

নিজের সময়কালের কোনো বৃহৎ, ব্যাপক সংগ্রামী-প্রতিবাদকে সৃষ্টির মধ্যে রূপ দিতে গিয়ে পুরোনো দিনের কিংবা মিথোলজির বৃত্তান্তকে বাইরের আবরণ হিসেবে রেখে, আসল বক্তব্যগুলো কিছুটা প্রচ্ছন্ন করে বলা লেখক-শিল্পীদের একটি সুপরিচিত টেকনিক। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়—নানাবিধ উপলক্ষ এই কৃৎকৌশল অবলম্বনের অন্তরালে থাকে। প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের যেমন একটা ধারা এই সব ক্ষেত্রে বহমান থাকে, ঠিক তেমনভাবেই ঐ অন্তঃশীল প্রতিরোধের প্রবাহটিও থাকে গতিশীল। দেশভাগ হয়ে নূতন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, প্রায় তার জন্মলগ্ন থেকেই এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা চালু করেছিলেন সেখানকার কেন্দ্রীয় শাসকরা, যাকে পূর্বখণ্ডের বাঙালিরা মেনে নিতে পারেন নি। এর বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলন প্রকাশ্যে তো তাঁরা করেই গেছেন প্রথমাবধি; গণসংগ্রামের পাশাপাশি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও লড়াই চালু থেকেছে সমান্তরালভাবে। ঐ সাংস্কৃতিক-প্রতিরোধের একটি ধারা প্রচ্ছন্ন-অতীত-প্রতিবেশের সূত্রে বর্তমানের-চিত্রায়ণের সেই সুপরিচিত টেকনিকটির খাত ধরে বহে গেছে ধীর, অথচ অনিবার্য গতিতে।

ফলে একদিকে যেমন, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' (নাটক), জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' (উপন্যাস), সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন' (ঐ) শওকত ওসমানের 'মৌন নয়' (গল্প), সিরাজুল ইসলামের 'পলিমাটি' (ঐ), আতোয়ার রহমানের 'অগ্নিবাক' (ঐ), এবং শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সিকান্দর আবু জাফর, সুফিয়া কামাল, আল-মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রাহমান-প্রমুখের অজস্র সংগ্রামী কবিতা লেখা হয়েছে সরাসরিভাবে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে, আর সেই দাবীকে ধ্বংস করার পশ্চিমি অপপ্রয়াসের প্রতিবাদে, ঠিক তেমনভাবেই প্রচ্ছন্ন-রূপকের মাধ্যমে ঐ একই অভীপ্সা ব্যক্ত হয়েছে আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান'[১] (১৯৬৩), সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নীল রং রক্ত'[২] (১৯৬৫), সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী'[৩] (১৯৬৭), 'পাপের সন্তান'[৪] (১৯৮১), 'পুরুষমেধ'[৫] (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'[৬] (১৯৬৯), শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'[৭] (১৯৬২), 'রাজা উপাখ্যান'[৮] (১৯৭১), সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন'[৯] (১৯৭২-৮০—১৯৮৩/১৯৯২), রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল'[১০] (১৯৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে।

এই বইগুলির মৌলিক প্রেরণা এবং আবেগ অভিন্ন : অত্যাচারী শাসক-শক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘাত। অন্যায়ের প্রতিবাদ, আত্ম-প্রতিষ্ঠার দাবী, মুখের ভাষা-এবং-ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সসম্মান স্বীকৃতি এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, স্বাধিকারের অভীপ্সা—এগুলিই ছিল সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকদের বিরোধের প্রেক্ষাপট। এই সমস্ত বইগুলিরই উপজীব্য হল : পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে যারা নব্য-উপনিবেশবাদী-সুলভ মনোভাব নিয়ে উত্তর-১৯৪৭ পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের কোটি-কোটি মানুষকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক

এবং সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ ও পীড়ন করতে শুরু করেছিল—তাদের অন্যায়-অপহ্নবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করা। কখনও সেই সংগ্রাম সরাসরিভাবে সমকালের পটভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে; কখনও তাকে রূপকাশ্রিত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুদূর অতীতে (যেমন, 'নীল ময়ূরের যৌবন'), কখনো বা কল্পনার জগতে (যেমন, 'ক্রীতদাসের হাসি')। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এদের সবকটি মিলেই ১৯৫২ থেকে ১৯১৭-এই দু-দশকের জনজাগরণ ও গণসংগ্রামের সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ ম্যানিফেস্টো তথা ইসতেহার রচনা করেছে, একথা বললে ভুল হবে না একটুও।

১.২ টীকাসঙ্কেত

১. ওয়াহাবি আন্দোলনের কাহিনি। গুলাম নবির নেতৃত্বে স্বাধীনতার লড়াই চিত্রিত হয়েছে।
২. তিতুমিরের 'বাঁশের কেল্লা'-র লড়াই থেকে নীল-আন্দোলন অবধি পটভূমিতে লেখা।
৩. ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব জেরেমিয়ার কাহিনি-উৎস নিয়ে জেরুজালেমের পটভূমিতে শাসক শক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থের সংগ্রাম নিয়ে লেখা। জেরুজালেমের পতন বর্ণিত করা হয়েছে।
৪. ঐ কাহিনিরই পরবর্তী পর্যায়। যে বাবিলীয়দের হাতে জেরুজালেমের ধ্বংস হয়েছিল, অর্থ শতাব্দীর মধ্যে তারাই বিধ্বস্ত হল পারসিকদের হাতে। ইহুদি সমাজপতিদের ধর্মোন্মত্ত মৌলবাদিতা বনাম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অস্তিত্বের লড়াই চিত্রিত। শেষ অবধি মানবিকতার জয়েরই-সঙ্কেত চিহ্নিত হয়েছে।
৫. বেদোত্তর (কিন্তু বুদ্ধপূর্ব) ভারতের প্রেক্ষিত। ব্রাহ্মণ্য-শক্তি-চালিত রাজার বিধানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মরীয়া লড়াই। মৌলবাদ বনাম মুক্তবুদ্ধি এবং রাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র এই কাহিনির দুই প্রতিস্পর্ধী পক্ষ।
৬. কৈবর্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে পাল সাম্রাজ্যের ভিৎ নড়ে ওঠার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
৭. আরব্যরজনীর কাহিনিধারার 'বিস্মৃত শেষ আখ্যান' বলে বর্ণিত। বাগদাদের রাজকীয় শাসন বনাম ক্রীতদাসের প্রতিবাদের ছবি চিত্রিত হয়েছে। 'রাজা' এবং 'ক্রীতদাস' এখানে রূপক হিসেবে গণ্য।
৮. কল্পনার বাদশাহ জাহকের পীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বাঙ্ময় হয়েছে।
৯. চর্যাপদের কবি, পরিবেশ, যুগ এবং মানুষ; রাজশক্তির সঙ্গে গণশক্তির লড়াই। বাংলা ভাষা এবং বাঙালির জাতিসত্তার আত্মঘোষণার সমকালীন আবেগকে হাজার বছর আগের পটভূমিকায় স্থাপিত করা হয়েছে।
১০. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শপ্রাপ্তির সূত্রে প্রাচীন যুগের প্রেক্ষিতে রাজা-প্রজার দ্বন্দ্বের ছবি কল্পিত হয়েছে।

একক ২ ☐ 'ক্রীতদাসের হাসি' : পূর্ণাঙ্গ পাঠ : শওকত ওসমান

২.১ ভূমিকা
২.২ কাহিনি : পূর্ণাঙ্গ পাঠ
২.৩ আরবীয় শব্দার্থপঞ্জি
২.৪ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত
২.৫ কাহিনি-সংশ্লেষ
২.৬ কাহিনির রূপক-বিশ্লেষণ
২.৭ 'ক্রীতদাসের হাসি'-তে বাস্তব চরিত্র
২.৮ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
২.৯ হারুন-অল-রশিদ
২.১০ তাতারী
২.১১ মেহেরজান-জুবায়দা-বুসায়না
২.১২ দুই কবি
২.১৩ অনুশীলনী
২.১৩.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
২.১৩.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী
২.১৩.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

২.১ ভূমিকা

'ক্রীতদাসের হাসি' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার এক দৈবী ব্যাপার।

মৌলানা জালাল, মাসুদ সহ, আমরা তিন জনে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছিলাম। নেহায়েৎ নিরুদ্দেশের পাড়ি। কিন্তু নানা দুর্বিপাকে এসে পৌঁছলাম এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে, আমারই এক সহপাঠিনীর বাড়িতে, নাম রউফননেসা। খুব ভাল ছাত্রী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের আর এক সেরা ছাত্র তাকে দাগা দিয়ে গিয়েছিল, তার খুঁটিনাটি হদিস আমার জানা আছে। ডিগ্রীর উচ্চতা দিয়ে কত মেয়ে যে প্রতারিত হয়, তার উদাহরণ রউফন। ছাত্রটা পরে এক ঠিকাদারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল আট আনা রাজত্ব সহ।

দশ বছর আর রউফনের কোন খোঁজ রাখি নি। হঠাৎ অকুস্থলে পৌঁছে জানা গেল, সে গ্রামে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, সে-ই প্রধান শিক্ষয়িত্রী। সংসারে এক মাত্র অবলম্বন পিতামহ শাহ ফরিদ উদ্দীন জৌনপুরী। নব্বুই বছর বয়স। এখন আর চোখে দেখেন না। কানে ঠিকমত শোনেন না। কানের কাছে মুখ নিয়ে অথবা খুব জোরে কথা বলতে হয়। প্রথম জীবনে তিনি লেখাপড়ার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। বর্মাযুদ্ধের সময় লুসাই অঞ্চলে লড়ায়ে

যান। পরে গৃহত্যাগ করে যান বিহার-যুক্তপ্রদেশ এলাকায়। ফিরে আসেন আর্বী-ফার্সির বিরাট মৌলানা-রূপে। বহু সাগ্‌রেদ আছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু গত তিরিশ বছর তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখেন না। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিশালা যে-কোন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিরাট সম্পদ।

একদিনের প্রবাস জীবন।

পরদিন সকালে বিদায়। অতিথি আপ্যায়নের ঘটা ছিল বেশী। তাই মৌলানা জালাল রসিকতা করে বলেছিলেন, "রউফন, তুমি কী আমাদের সেই 'সহস্র ও এক রজনী' বা 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা'র পেটোরোগী বানাতে চাও যে গৃহকর্তা রুটি আনতে গেলে তরকারী খেয়ে বসত আর তরকারী আনতে গেলে রুটি খেয়ে ফেলত।"

তারপর সকলে বেশ তুমুল হাসি হাসছিলাম।

দাদু, শাহ সাহেব, কানে শোনেন না। কিন্তু অত হট্টগোলে সচেতন। রউফনকে হাত ইশারায় ডেকেছিলেন।

ফরিদউদ্দীন জৌনপুরীর কানের কাছে রউফন মুখ নিয়ে বলেছিল, "দাদু, ওরা 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা'র গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে।"

দাদু হেসে-হেসে বলেছিলেন, "বন্ধুগণ, ওটা আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও এক রাত্রি) নয়। ও কেতাবের পুরা নাম "আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে। সহস্র দুই রাত্রি।"

"দাদু, আমি ইংরেজীর ছাত্র। আমি ত শুনেছি *'Thousand and one night'* সহস্র ও এক রাত্রি।" জবাব মাসুদের।

"ভুল শুনেছ।"

"ভুল?" মাসুদের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ চ্যালেঞ্জের ছোঁয়াচ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুল। তোমরা ত পড়ো বেঈমান ইংরেজের কেতাব। যাদের গোলাম ছিলে দেড়শ' বছর। আসল বই ত দ্যাখো নি।"

দাদুর কণ্ঠস্বর তপ্ত। তিনি নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। চোখে না দেখলেও, উঠান-ঘর সব তাঁর মুখস্থ। আলমারী খুলে ঠিক তৃতীয় সেল্‌ফের মাঝখান থেকে একটা জেল্‌দ-করা কেতাব বের করলেন।

তারপর একটু অবজ্ঞা-জড়িত সুরেই কেতাবখানা আমাদের টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন, "দোস্তেরা, একবার চোখে দেখে নাও।"

আমরা তিনজনে হুম্‌ড়ি খেড়ে পড়ি। মৌলানা জালাল আর্বী জানেন। কিন্তু আমরাও ত পড়তে পারি।

বিরাট পাণ্ডুলিপি। ছাপা কেতাব নয়। মলাট খোলার পর দেখা গেল কেতাবের নাম : আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে।

আমরা ত অবাক।

জিজ্ঞেস করল মাসুদ, "দাদু, এ পাণ্ডুলিপি আপনি কোথায় পেলেন?"

দশ মিনিট ধরে তিনি ইতিহাস বললেন। হালাকু খানের বগ্‌দাদ ধ্বংসের সময় এই পাণ্ডুলিপি আসে হিন্দুস্থানে। নানা হাত-ফেরীর পর পৌছায় শাহ্ সুজার কাছে। তিনি আরাকানে পলায়নের সময় পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদে এক ওমরাহের কাছে রেখে চলে যান। সেখান থেকে জৌনপুর। ফরিদ উদ্দীন সাহেব জৌনপুর থেকে এটা উদ্ধার করেন।

তিনি বললেন, "নাস্তালিখ অক্ষরে লেখা। অনেকে এটা ঠিকমত পড়তে পারে না পর্যন্ত।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এটাই তা-হোলে আসল আলেফ লায়লা?

"হ্যাঁ, ভাই।"

আমরা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগি। মাসুদ বললে, "দ্যাখেন ত শেষ গল্পটা কি? অর্থাৎ হাজা... গল্পটা।"

"শাহ্‌দাজা হাবিবের কাহিনী।"

"তা-হোলে ঠিক আছে। তারপর নায়িকার নাম কি?"

মৌলানা জালাল পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে দিলেন, "জাহাকুল আবদ... গোলামের হাসি।"

আমরা বিস্মিত। কিন্তু মৌলানা আরবী জানেন, সহজে মেনে নেবেন কেন? তিনি পাতা উল্টে ... বললেন, "হুজুর, আলেফ লায়লায় গল্প দুনিয়াজাদীর অনুরোধে শাহরেজাদী বলা শুরু করে... খছি না।"

"ওই কটা পাতা নেই। সংখ্যা ..."

মৌলানা তা মিলিয়ে নিয়ে খুবই আমাদের দিতে...

বিশ্বের বিস্ময় এই পাণ্ডুলিপি। আমি বললাম, "দাদু, আমরা কপি করিয়ে নিতে চাই আমাদের লাইব্রেরীর জন্য। তারপর আপনার কপি পাঠিয়ে..."

ঈষৎ কাঠখড় পোড়ানোর পর দ... হোয়ে গেলেরউফনের মুখে শুনেছিলাম, সাধারণতঃ তিনি এসব কাছ-ছাড়া করেন না। সেদিন আমাকে তাঁর স্নেহের নেমেছিল বোঝা যায়।

শুক্রিয়া, ধন্যবাদ মৌলানা জালাল এখানে আমার পথ দেখি... ...ছিলে।

এই আবিষ্কার আমাকে পাগল করেছিল।

আরো দু-দিন হয়ত থাকা যেত, কিন্তু চতুর্থ দিনে খুলছে। কিন্তু আর না। এই রত্নগুহা থেকে ... একটি রত্ন পৃথিবীকে না দেখানো পর্যন্ত আমার আর স্বস্তি না।

সেদিনই বিদায় নিলাম দুপুরের পর। রউফনের মিনতি... দাম দিতে পারলাম না, দুঃখ।

শা' সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল... ধরে-ধরে আনা হোলো দহ্‌লিজ পর্যন্ত।

সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে এল রউফন। জীবনের কাছে পরাজয়-মানা বীরেরই পৌত্রী। সে কিন্তু তার সজল ... আজ লুকাতে পারল না। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সেই সেরা ছাত্রটির কাছে প্রত্যাখ্যাত হোয়ে রউফন এমনি ... আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবনকে কিন্তু সে খোয়ার হোতে দেয় নি। বীরের পৌত্রী আপ্ত-মানবী।

গাড়িতে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত তুললাম। শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা—সব কিছুর পতাকা যেন আমার করতা...

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

মাথা নীচু করে রউফন সড়ক থেকে বাড়ি অভিমুখে এগোতে লাগল।

শহর ফিরেই মৌলানা জালালের সহায়তায় 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়নানে'র শেষ কাহিনীটা বাংলায় তর... ফেললাম।

বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মমতার জন্যেই ত পৃথিবীতে বাঁচা।

২.২ কাহিনি : পূর্ণাঙ্গ পাঠ

১

খলিফা হারুনর রশীদের প্রাসাদের এক অংশে সহধর্মিণী বেগম জুবায়দা ও বাঁদী মেহেরজান কথোপকথনরত।

বেগম। মেহের

মেহেরজান। বেগম সাহেবা।

বেগম। যা, এবার যা।

মেহের। আগে ওরা তন্দ্রায় ঝিমোক। মহলের প্রহরীরা এখনও জেগে আছে।

বেগম। আর তাতারী জেগে আছে তোর জন্যে।

মেহের। কিন্তু বেগম সাহেবা, ধরা পড়লে খলিফা আমাকে কতল করে ছাড়বেন।

বেগম। সে আমি দেখে নেব। আর এই নে। যদি বিপদে পড়িস্ আমার অঙ্গুরী রেখে দে। পাহারাদারদের দেখালে ছেড়ে দেবে।

মেহের। তবু ভয় লাগে, বেগম সাহেবা।

বেগম। আজ হঠাৎ ভয় লাগছে কেন?

মেহের। এমনি। খলিফা ত আমাকে দেখেন নি। দেখলে মেহেরবানী করতেন। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।

বেগম। যা। এই সুম্‌সাম রাত। এখন জওয়ানের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়তে কি যে সুখ—

মেহের। আপনি আমাকে ঈর্ষা করছেন, বেগম সাহেবা?

"মেহেরজান", দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেগম সাহেবা বল্‌লেন, "দুই সীনা একত্র দেখলে আমার কি যে খুশী লাগে!"

"বেগম সাহেবা", মেহেরজান জবাব দিলে, "এইজন্যে আমি কেয়ামত তক আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বাঁদী ত আছি-ই। বেহেশ্‌তেও যেন আল্লা আমাকে আপনার বাঁদী বানিয়ে রাখেন।"

"তুই যা। বড় বাজে কথা বলিস্। যা, আর দেরী করসি্ নে। একটু দাঁড়া—তোর চোখের সুর্মা কোণের দিকে একটু মুছে গেছে।"

বেগম সাহেবা নিজেই আয়নার সাম্‌নে মেহেরজানকে দাঁড় করানোর পর সুর্মার রেখা স্থান-শোভায় ভরিয়ে তুললেন।

—আহ্, তোকে যা মানিয়েছে। এই ঘাঘ্‌রা সাদ্‌রিয়া, ওড়না নেকাব। ফেরেস্তারা তোকে না তুলে নিয়ে যায়।

—বড় লজ্জা দেন, বেগম সাহেবা।

—যা, তাতারী না পাগল হোয়ে যায় আজ তোকে দেখে।

—বেয়াদবী মাফ করবেন, বেগম সাহেবা। সে ত পাগল আছেই। বুকে জড়িয়ে না ছাতু করে ফেলে।

—সে ত ভালই। তুই তার বদনে বদনে লেপ্‌টে যাবি, আর কাছছাড়া হোতে হবে না।

—কি যে বলেন, বেগম সাহেবা। ঘোড়ার সহিস, শুধু আপনার মেহেরবানীতে—

—ওকে দেখে ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে ভাল মানাবে। হাব্‌সী গোলাম। কিন্তু সুন্দর সুঠাম দেহ নওজোয়ান।

—মানুষ হিসেবে ও আরো সুন্দর।

—যা, যা। বড় কথা বাড়াস্‌। আঙুর নিয়েছিস্‌ ত?

—মেহরেজান ওড়নার আড়াল থেকে বেগম সাহেবাকে এক গোছা আঙুর দেখাল।

—তুই নিজেই আজ আঙুর। এর চেয়ে আর বড় মেওয়া তাতারীর কাছে কিছুই হোতে পারে না। (বুকে টোকা দিয়া) এখানেও ত বোঁটায় ভাল ফল ধরেছে।

বেগম সাহেবা হাস্‌তে লাগলেন। সরমে মেহেরজান মুখ নীচু করে আর কুঁচ্‌কনো গালের পাশ দিয়ে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে বেগম সাহেবাকে দেখে।

—এবার যা।

—আর থোড়া—একটা কথা, বেগম সাহেবা। আপনি কেন আমাকে এত পেয়ার করেন?

—তুই এলি। তাই আমি খুশী। তুই আছিস্‌, তাই এই প্রাসাদে আমার আনন্দ আছে। নচেৎ এই বিরাট মহলে কে কার? বেগম, বাঁদী ত শত শত। কিন্তু কাছের মানুষ মেলা দায়।

—খলিফা ত আপনাকেই...

—সে কথা রাখ।

—আমার কাজে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমিরুল মুমেনীন ত আজ আপনার মহলে আস্‌বেন না। কাছে থাকতে দিন।

—না। আর এ কি বলছিস্‌, মেহেরজান? যা, যা। আর একজনের বুক খা খা করছে। গোনাগার হোতে পারব না। ভোর হওয়ার আগে ঠিক ফিরে আসিস্‌।

—আমি ত ভয় পাই। দু-জনে কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না। যদি রাত্রে ঘুম আর না ভাঙে...

—না, এ ভুল কোনদিন করিস্‌ নে। যদিও খলিফা অমার কথা রাখেন—কিন্তু কখন কি হয়, কে জানে। মরজী যেখানে ইন্‌সাফ সেখানে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে নেই।

—আপনি ভয় পান, আর আমি ভয় পাব না, বেগম সাহেবা?

—না। তবু সাবধান থাকা ভাল।

—তবে খলিফা আমাকে কখনও দেখেন নি। সেই যা ভরসা। হঠাৎ পথে ধরা পড়লে বলব, বেগম সাহেবা বাগানে ফুল আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন।

—খলিফা দেখেন নি। সে ভাল-ই। কখন কি ঘটে এই মহলে, কেউ বল্‌তে পারে না।

—আমার তাই ত রোজ যেতে ইচ্ছে করে না, বেগম সাহেবা।

—না, যা। তাতারী জেগে আছে মহলের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

—আচ্ছা, বেগম সাহেবা।

—খোদা হাফেজ। ফি আমানীল্লাহ্‌।

নীচে তরুলতা শোভিত প্রাঙ্গণ চত্বর। তারপর বাগানের সীমানা শুরু। বাতাবী লেবুর সারি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ—অন্যান্য গাছের ঘন সন্নিবেশে রাত্রি অন্ধকার-জমাট। পথের হদিশ পাওয়াটা কষ্টকর। বেগম জুবায়দা অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বাঁদী মেহেরজান কি কালো অন্ধকার, না হাব্‌সী গোলামের কালো বুকে এতক্ষণে হারিয়ে গেল?

আখ্‌রোট-খুবানী ডাল ঝুলে আছে ওইখানে পূব দরওয়াজার দু'পাশের দেওয়ালের পাথর ঘিরে। তারই নীচে তো তাতারী প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ডালের ঝোপ ছেড়ে মেহেরজান কখন তার হাতে হাত দিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

হাবসী গোলাম আজ অপেক্ষা করবে ত? দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না স্পন্দিত বুকে, সারাদিনের কঠোর ক্লান্তির পর?

বেগম জুবায়দার মনে সেই প্রশ্ন, মেহেরজানের মনে সেই প্রশ্ন।

২

প্রাসাদ-কক্ষে হারুনর রশীদ পায়চারী-রত। মুখে আবেগ চাঞ্চল্যের ছাপ। বারান্দায় পদধ্বনির শব্দে উৎকর্ণ বগ্‌দাদ-অধিপতি হেঁকে উঠলেন, "কে?"

জবাব আসে "জাঁহাপনা, বান্দা-নেওয়াজ, আমি মশ্‌রুর।"

হারুন। এসো, এসো মশ্‌রুর। আজ আমি বড় একা। হ্যাঁ, একা।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, আর্মেনিয়া থেকে এক শ' মুজ্‌রানী—নর্তকী আনিয়েছি। ওদের ডাক দেব, হুকুম দিন।

হারুন। বড় একা, মশ্‌রুর। মুজ্‌রানী দিয়ে শূন্যতার সেই বোধ দূর হবে না।

মশ্‌রুর। হুজুর, আপনার যা' খাহেশ, শুধু বলুন। আস্‌সামায়ো তায়তান। তখন শ্রবণ অর্থ পালন।

হারুন। না, কিছু না। বড় একা লাগ্‌ছে, আজ জাফর বার্মেকী নেই, আব্বাসা নেই।

মশ্‌রুর। জনাবে আ'লা, সেদিনও আপনার ফরমাবরদার গোলাম কোন কিছু অমান্য করে নি।

হারুন। হ্যাঁ, মশ্‌রুর। তোমার অবলুস কালো দেওয়ের মত কদ্, তোমার পাহাড়ের মত বাজু—সব সময় আমার আর তলওয়ারের ইজ্জৎ রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু আমার বুকের পাষাণ-ভার নামাতে পারে না? তুমিই একমাত্র পুরাতন বন্ধু হয়ে গেছ। আর সবাই ওপারে।

মশ্‌রুর। আলম্পানা—আলাম্পানা—

হারুন। দহ্‌সৎ—ভয় পেয়ো না। আমি এখন আমিরুল মুমেনীন হারুনর রশীদ নই, আমি দরবারে নেই—হারেমে আছি। আমি তোমার বন্ধু, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, আপনি যেদিন রাত্রে উজীরে আজম জাফর বার্মেকীর কতল্ পরোয়ানা লিখ্‌লেন তখন বারবার ফিরে এসেছি তার দরওয়াজা থেকে। আপনার কাছে না-ফরমান সাজতে পারব না—আবার ছুটে গিয়েছি। আপনি সবুর করলেন না।

হারুন। মশ্‌রুর, আজো নিজের বিচার মানুষ নিজে করতে শেখে নি। সে খোদ্‌কশী (আত্মহত্যা) করতে পারে, যেমন সে রোজ গোস্তের জন্য দুম্বা কি গাইকসী করে, কিন্তু নিজের বিচার করে না। সেকথা আর উত্থাপন করো না কোনদিন।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, গোস্তাখি মাফ করবেন। মা'জী মা'জী—অতীত অতীত। তা আর কবর খুঁড়ে তুলবেন না।

হারুন। মশ্‌রুর, মানুষের লাশ কি কবরে পড়ে থাকে আর পচে?

মশ্‌রুর। আলেমারা সেই রায় দেন।

হারুন। না, না—মশ্‌রুর। দিওয়ানে এতক্ষণ বসেছিলাম। এখন পায়চারী করছি। কেন জানো? লাশ কবরে শুয়ে থাকে না। লাশ কথা বলে। তার ধাক্কা আরো শক্ত আরো কঠিন। জেন্দা মানুষের কণ্ঠ সেখানে ক্ষীণ ফিস্‌ফিসানি, ভাঁড়ার ঘরে নেংটি ইঁদুরের পায়ের আওয়াজ মাত্র। বসে থাক্‌তে পারলাম না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, মন থেকে সব মুছে ফেলুন।

হারুন। সব মুছে দিতে পারি। কিন্তু স্মৃতি, মশ্‌রুর? স্মৃতি লাশ জেন্দা করে তোলে।

মশ্‌রুর। স্মৃতি সমস্ত কওম-কে জেন্দা করে তুলতে পারে, জনাব। কিন্তু আলম্পনা, সকলের স্মৃতিশক্তি থাকে না। হাবা, বোবারা যেমন। তবে অতীতের কথা অনেকে বলে। সে ত এগোতে না পেরে, দুঃসহ বর্তমান থেকে পালানোর কুস্তি-প্যাঁচ মাত্র। ও এক রকমের ভেল্কি, জীবনী-শক্তির লক্ষণ নয়। বলিষ্ঠ মানুষেরই স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন হয় সামনে পা ফেলার জন্য।

হারুন। আহ্ মশ্‌রুর, তুমি ত শুধু জল্লাদ নও। তুমি আলেমুল আলেম। পণ্ডিতের পণ্ডিত। তাই ত আমার বন্ধু। কিন্তু স্মৃতি আমাকে ঘুমাতে দেয় না।

মশ্‌রুর। চলুন, কিছুদিন বগ্‌দাদের ঝামেলা ছেড়ে আর কোথাও যাই।

হারুন। কিন্তু আব্বাসা আমার সঙ্গ ছাড়বে? না, না। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত, কবরে দাফন হোলো তার। সোজা কথায় পুঁতে ফেললাম। কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের প্রতি মহব্বৎ—কিন্তু আমি কি?

খলিফা হারুনর রশীদ হা-হা-রবে প্রায় উন্মত্তের মত হেসে উঠলেন। পায়চারী করতে লাগলেন। হাব্‌সী মশ্‌রুর মাথা-নীচু, তহ্‌রীমা বাঁধার ভঙ্গীতে বুকে দুই হাত, পাথর-মূর্তির মত ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। হারুনর রশীদ পায়চারী হঠাৎ থামিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মশ্‌রুরের বুকে মৃদু তর্জনী আঘাত করলেন। আবার হা-হা হাসি। তারপরই পায়চারীরত অবস্থায় বলে উঠ্‌লেন, "কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের সঙ্গে কি রকম শাদী দিলাম? 'আকদ' হোলো অথচ রসুমৎ হবে না কোনদিন। শক্ত শর্ত। কঠিন কারার। মশ্‌রুর"—

মশ্‌রুর। আলম্পানা।

হারুন। আব্বাসা বাকী কাজ নিজে তামাম করলে। রসুমৎ-ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে নিলে যা বেরাদর নিলেন না। শর্ত ভঙ্গের কঠোর শাস্তিও দিলাম। আব্বাসী কওমের খুন বার্মেকী কওমের সঙ্গে মিশে নাপাক হবে—না, তা হোতে দিতাম না মশ্‌রুর—

মশ্‌রুর। আলম্পানা।

হারুন। আব্বাসা আমার সগ্‌গা সহোদর বোন। হা-হাঃ।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা—।

হারুনর রশীদ মশ্‌রুরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, হাব্‌সী জল্লাদ চক্ষু-তোলার সাহস পায় না। পায়চারী-সচল মুহূর্ত পৃথিবীর মতই ঘূর্ণমান। কিন্তু সমান তাল ও রেখায় নয়।

আমিরুল মুমেনীন আবার হঠাৎ থেমে মৃদু কণ্ঠে বল্লেন, "মশ্রুর, আমি স্মৃতি উপ্ড়ে ফেলতে চাই, সমস্ত স্মৃতি।"

মশ্রুর। চলুন, বাগানে যাই। নারেঙ্গী বনে ফুল ফুটেছে। কোথাও জাম্বুরায় পাক ধরেছে। বাগানে অঝোর গন্ধ। খোশবু মনের বোঝা হাল্কা করে আলম্পানা।

হারুন। তা-ই চলো। হারেমের এই কামরা আমার কাছে দোজখ। স্মৃতির 'হাবিয়া' নরক আমার খুন শুকিয়ে দিয়েছে। গুম-খুন আমার ঘুম। এখানে আর না।

মশ্রুর ঠিকই বলেছিল। ফল আর ফুলের খোশবুর সঙ্গে জুটেছিল ঠাণ্ডা হাওয়ার হাল্কা স্পর্শ। থোকা থোকা অন্ধকার কোথাও জমাট, কোথাও ঈষৎ ফিকে। তাই এখানকার বহু-মাত্রিক দুনিয়া বহু-মাত্রিক মনের নাগাল পায় বৈকি। পায়ের নীচে ঘাসের কোমলতা অন্যান্য অঙ্গের সান্নিধ্য খোঁজে। মিটিমিটি নক্ষত্র বর্তিকা-বাঁদীর কর্তব্য-সমাপনে নেমে আসে।

পায়চারী করতে করতে খলিফা বললেন, "মশ্রুর, তোমার কথামত ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি মনে শান্তি পাচ্ছি। আগুনের জ্বালা আর পোড়ায় না। আঁচ, আঁচ ত থাকবেই।"

মশ্রুর। শুক্রিয়া, জাঁহাপনা।

হারুন। মশ্রুর, তোমার মনে পড়ে, আমরা চারজনে কতদিন বগ্দাদের সড়কে, কতো বেগানার মহলে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি?

মশ্রুর। জাঁহাপনা, মওতের আগে তক্ বান্দা তা ভুলতে পারবে না।

হারুন। মনে পড়ে...মনিকার মান্জারের মহলে সেই রাত্রির কথা? অদ্ভুত সেই আওরত—শাদীর সময় যার শর্ত ছিল শওহর ব্যভিচারী হোলে, দু'শ' কোড়া দুই পাঁজরে খেতে হবে। দুই চক্ষু উপড়ে ফেলে দিতে হবে। ...মনে পড়ে?

মশ্রুর। কেয়ামৎ তক্ মনে থাকবে, বান্দা নয়াজ, ভৃত্য-পালনকারী।

হারুন। মনে পড়ে, সিন্দবাদ নাবিকের কথা? তার হপ্তম সফরের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী।

মশ্রুর। বান্দার স্মৃতিশক্তির পরিচয় ত আপনার জানা আছে, জিল্লুল্লাহ্।

হারুন। সব মনে আছে। জাফর আর আব্বাসা কবরে শুয়েও ভুলে যায় নি। কিন্তু আমি ভুলে যেতে চাই।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, সে-সব কথা আর তুলবেন না। চমৎকার রাত্রি। আপনি যদি মঞ্জুর করেন, কবি ইস্হাককে ডেকে আনি। তার গজল শোনা যাক।

হারুন। না, মশ্রুর। নির্জনতাই আমার পছন্দ। এখানে রাত্রির হাওয়া পাঁজরের দাহ নিভিয়ে দিতে পারে। কবির জায়গা আর কোথাও। ওরা বুকের কল্লোল আরো বাড়িয়ে তোলে।

মশ্রুর। বান্দা-নওয়াজ, ভৃত্য-পালক, তবে চলুন—শহরের সড়কে হাঁটি। বগ্দাদ শহর ত ঘুম জানে না। কোথাও না কোথাও কিছু পাওয়া যাবে, মনের বাতাস ফেরাতে।

হারুন। না, মশ্রুর। এই লেবাসে অসম্ভব। আর দু'জনে ত বহুদিন বেরোই নি। উম্মায়েদ খুনীদের গোয়েন্দা, গুণ্ডা—কোথায় কিভাবে ওৎ পেতে আছে কে জানে।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, উম্মায়েদেরা কর্দোবা শহরে পালিয়েছে। ওরা আর এদিকে চোখ ফেরাবে না।

হারুন। মশ্রুর, খেলাফৎ ত পাও নি। বুঝবে না রাজত্বের লোভ কতো। ওই লোভের আগুনের কাছে হাবিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব—সব পুড়ে যায় সেই আগুনে। উমাইয়ারা আমার বংশপ্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাসকে গাল দেয় সাফ্‌ফাহ—রক্ত-পিপাসু বলে—আর ওরা? জাব দরিয়ার তীরে যদি আবুল আব্বাস হেরে যেত? জয় বা পরাজয়ের গ্লানি মেটাতে পরাজিতদের গাল দেওয়া একটা রেওয়াজ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। উমাইয়াদের পাশা যদি ঠিক পড়ত, তখন? নীতি এখানে বড় কথা নয়। বল—লোক-বল, অস্ত্র-বল, অর্থ-বল সব নীতির মাপকাঠি। তাই দু'জনের বগ্দাদ শহরে এই অবস্থায় পায়চারী করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, উমাইয়াদের ঘাড় অত তাকৎ রাখে না।

হারুন। না রাখুক। হুঁশিয়ারী ভাল, হুঁশিয়ারী ভাল, মশ্রুর।

মশ্রুর। জিল্লুল্লাহ্, আপনার মহল এই 'কাওসুল আক্দারের' বাগানে কতদিনের পুরাতন গাছ রয়েছে।

হারুন। বহুদিনের। আব্বাজান মরহুম মেহ্দী বলতেন—দুই শ' বছর আগে এখানে—কিন্তু ওকি, মশ্রুর?

মশ্রুর। কি, জাঁহাপনা?

হারুন। (উৎকর্ণ) ওই—

মশ্রুর। কি, আমিরুল মুমেনীন?

হারুন। তুমি শুনতে পাচ্ছো না?

মশ্রুর। না আলম্পানা।

হারুন। হাসি, হাসি—কে যেন হাস্‌ছে।

মশ্রুর। হাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

হারুন। আমার মহলের গায়ে কে হাস্‌ছে এত রাত্রে—এই হাসি—একটু চুপ করো।

খলিফা হারুনর রশীদ ঠোঁটে তর্জনী রেখে ইঙ্গিত করলেন, একদম নিঃস্তব্ধ দাঁড়াও।

সত্যি, চতুর্দিকের সুমসাম বিয়াবান যেন হাসির মওজে দোলা খাচ্ছে। খুব জোর হাসি নয়। অস্পষ্ট। তবু তার রণন উৎস-মুখের খবর পাঠায়। উৎকর্ণ কিছুক্ষণ শোনার পর, হারুনর রশীদ স্তব্ধতা ভেঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "মশ্রুর। শুনেছো এমন হাসি? কে হাসছে আমার মহলের দেওয়ালের ওদিকে? এ হাসি ঠোঁট থেকে উৎসারিত হয় না। এর উৎস সুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ। ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎসঙ্গ-দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপল-বিনুনী পাশে ঠেলে ঠেলে—বিজন পথভ্রষ্ট তৃষার্ত পথিককে সঙ্গীতে আমন্ত্রণ দিতে—এই হাসি তেমনই বক্ষঝর্ণা-উৎসারিত। কিন্তু কে এই সুখীজন—আমার হিংসা হয়, মশ্রুর। আমি বগ্দাদ-অধীশ্বর সুখ-ভিক্ষুক। সে ত আমার তুলনায় বগ্দাদের-ভিক্ষুক, তবু সুখের অধীশ্বর! কে, সে?

মশ্রুর জবাব দিলে, "আলম্পানা, ওদিকে ত হাব্সী গোলামেরা থাকে।"

হারুন। হাব্সী গোলাম?

মশ্‌রুর। হ্যাঁ, বাদ্‌শা-নামদার।

হারুন। গোলামেরা এমন হাসি হাসতে পারে?

মশ্‌রুর। পারে, আমিরুল মুমেনান। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আস্বাদ পায়। ওরা হাসে।

হারুন। তুমি ঠিক ধরেছ। না, এ গোলামের হাসি নয়।

মশ্‌রুর। ওদিকে মানুষ বলতে আর কিছু নেই, জাঁহাপনা।

হারুন। মনে হয় কোন জ্বীন-পরীর হাসি। কিন্তু কান দিয়ে শোন ত। মিহি-মোটা দু-রকম হাসি যেন একত্রে মিশে বাতাসের লাগাম ধরে আসছে।

মশ্‌রুর। তা-ই মনে হয়।

হারুন। কিন্তু কারা হাস্‌ছে? কোন মানব-মানবী? কোন মানব-মানবী একত্রে?

মশ্‌রুর। গোলামের হাসি, জাঁহাপনা।

হারুন। ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।

মশ্‌রুর। হাসি থেমে গেল, জিল্লুল্লাহ্‌।

হারুন। হ্যাঁ। তা-ই মশ্‌রুর। কিন্তু ওর রেশ আমার কানে এখনও বাজছে।

মশ্‌রুর। সত্যি, অদ্ভুত হাসি।

হারুন। মশ্‌রুর, চেয়ে দেখো ওই দিকে। ওই খুবানির গাছের ডাল যেখানে দেওয়ালের লাগালাগি মিশেছে কে যেন সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল।

মশ্‌রুর। না, জাঁহাপনা। এখানে কে আসবে? কার এত সাহস?

হারুন। একটু এগোও। দ্যাখো, ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ডাল যেমন কাঁপে, খুবানির শাখা তেমনই কাঁপছে।

মশ্‌রুর। আমিরুল মুমেনীন, কোন নিশাচর পাখি বসেছিল, হয়তো এখনই উড়ে গেল। তার ডানার ঝাপটের শব্দে এমন মনে হয়।

হারুন। হয়ত তা-ই। এখন কত রাত্রি?

মশ্‌রুর। আলম্পানা, ঐ ত দজ্‌লা নদীর উপরে আদম-সুরত হেঁটে হেঁটে দূরে নাম্‌ছে। আর বেশি প্রহর বাকি নেই শুকতারা ওঠার।

হারুন। চলো, এখন মহলে ফিরে যাই। এই রাত্রির কথা যেন কেউ টের না পায়, মশ্‌রুর। আহ্‌, ঐ হাসি আমি যদি হাস্‌তে পারতাম। কাল আবার আমাদের তালাসী নিতে হবে—এমনই রাত্রে।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান—শ্রবণ অর্থ পালন।

হারুন। মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা।

হারুন। আজ আমি ঘুমাব, অনেক—অনেক ঘুম। কাল দরবার হবে না, ওম্‌রাদের বলে দিও। আমি শুধু হাসি শুন্‌ছি। আমি এমনই হাসি হাস্‌তে চাই। চলো......

৩

হারুনর রশীদের কাওসুল্-আব্‌দার বা সবুজ প্রাসাদ রাত্রির নৈঃশব্দ্য-মোড়কে কৃষ্ণবর্ণ। মহলের কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে, কিন্তু উদ্যান আগেকার মতই সুপ্তিমগ্ন, অন্ধকার। খোজা প্রহরীরা কোথাও কোথাও নিজের জায়গায় মোতায়েন আছে। তাদের দেখা যায় না। জুতার আওয়াজ নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ওঠে নি এখনও। বাতাসের গতায়তি হয়ত শব্দ তোলে, কিন্তু তার ছোঁয়াচ নির্জনতা ভেদ করতে পারে না। সুপ্তির বর্ম এখানে বড় কঠিন। "মশ্‌রুর, ধীরে", আ'বার কাফ্‌তান গোলাপডালের কাঁটায় বিঁধে গিয়েছিল, তা ছাড়াতে ছাড়াতে খলিফা হারুনর রশীদ বললেন।

"জাঁহাপনা, আজ কেউ আর হাস্‌ছে না" মশ্‌রুর জবাব দিলে।

দু'জনে হাঁটছিলেন উদ্যানের সাধারণ রক্তিম পাথরের পথ ছেড়ে ঘাসের উপর, গাছের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে নির্জনতার প্রান্তরে অজ্ঞাতবাস বিক্ষত হৃদয়ের প্রলেপ। হয়ত সেই জন্যে অথবা অন্য কারণে আমিরুল মুমেনীন হাঁটছিলেন। আজ তাঁর দেহাবয়বে চাঞ্চল্য প্রায় অনুপস্থিত। হাঁটছেন, দু'একটা কথা বল্‌ছেন। আবার কান খাড়া করছেন। ছায়ার মত সঙ্গী মশ্‌রুর অন্ধকারে যেন নিঃশ্বাসের বাতাস।

—মশ্‌রুর।

—জাঁহাপনা।

—কিছু শুনতে পাচ্ছো?

—হ্যাঁ, জিল্লুল্লাহ্। সেই হাসি।

—দাঁড়াও, চুপ করে শোনো।

—আজ আরো স্পষ্ট, আরো তীব্র।

—মানব-মানবীর মিলিত হাসি।

—গোলামেরা এত রাত জেগে থাকে?

—থাকে, জাঁহাপনা। বিশ্রাম অর্থ ত শুধু ঘুম নয়।

—এগোও, দেখা যাক্ কোন্ দিক থেকে এই হাসির শব্দ আসে।

তাঁরা দু'জনে এগোতে লাগলেন। কাওসুল আব্‌দারের বিস্তৃত দেওয়ালের ওপার থেকে বিচ্ছুরিত হাসির অনুরণন ছুটে আসে। আর কিছু বোঝা যায় না। দু'জনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শোনেন, খোলা আকাশের নীচে। স্ফূর্ত এই হাসির পরিমাপ শুধু শব্দে করা চলে না। কর্ণপটে আশাবরী রাগ তারাগ্রামে পৌঁছে যে সুরের ঝিকিমিকি রচনা করে এই হাসি প্রায় তারই তুলনা। কিন্তু মানুষ এই হাসি হাস্‌তে পারে—বিশেষ করে গোলামেরা? আমিরুল মুমেনীন প্রশ্ন তুললেন ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে।

জবাব দিলে মশ্‌রুর, "জাঁহাপনা, চলুন। প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে এর তল্লাশ শেষ করি।

হারুন। না, মশ্‌রুর, এত হট্টগোলে হয়ত সব পণ্ড হয়ে যাবে। বুলবুলের ডাক বনের আড়ালে বসে শুনতে হয়।

মশ্রুর। আমি কিন্তু বুলবুল দেখার পক্ষপাতী, আলম্পানা।

হারুন। আমি কি কম পক্ষপাতী? কিন্তু এত তাড়াহুড়ায় হয়ত কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। বুলবুল উড়ে পালাবে।

মশ্রুর। তার চেয়ে আমাকে দুই রাত্রি সময় দিন, আমি সব হদিস বের করব।

হারুন। বেশ। দু'দিন বহু কাজ আছে। শুনেছি রোমের সুলতান সেই হতভাগ্য নিসিফোরাসের বহু সমর্থক গুপ্তঘাতক সেজেছে। আমিরদের আমিরী চালে নানা গলদ ঢুকেছে। তাই নানা কাজ, আমি দু'দিন ব্যস্তই থাকব। তুমি বের কর হাসির হদিস।

মশ্রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান।

হারুন। কিন্তু মনে রেখো, মশ্রুর। দু'দিন সময়। তার বেশি নয়।

মশ্রুর। বান্দার গর্দান জিম্মা রইল, জাঁহাপনা।

হারুন। বেশ। এবারকার যুদ্ধে রোমের বহু গোলাম বন্দী হয়েছে। বাজারে গোলামের দাম খুব সস্তা। ওরা তবু হাসে? আর এই হাসি অসম্ভব মনে হয়।

মশ্রুর। দু'দিন আমিরুল মুমেনীন। সবই জানা যাবে।

হারুন। বেশ।

হারুনর রশীদ আবার উৎকর্ণ। শুন্‌লেন সেই মানব-মানবীরা হাস্‌ছে। রুমুঝুমু নিনাদ তরুলতার ক্রোড়ে, বাতাসের পাখনায়, পাখ-পাখালিদের স্থির পালকের আবেশে, যখন—বসুন্ধরা হাস্যমগ্ন।

৪

তৃতীয় রাত্রি।

স্থান, কাওসুল আক্‌দারের উদ্যান। এই রঙ্গমঞ্চে দুইজন পরিচিত অভিনেতাই উপস্থিত, আরো দুই রাত্রি যাদের সঙ্গে দেখা।

— জাঁহাপনা।

— মশ্রুর, তোমার হদিস বাতাও।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, জায়গা বিশেষে কানের চেয়ে চোখের কিমৎ বেশি। আমি আজ হদিশ মুখে বল্‌ব না, আপনাকে শোনাব না। আপনার মেহেরবান দুই আঁখিপটে সব ছবি পড়বে, আপনি দেখবেন। এখন আমাকে অনুসরণ করুন।

হারুন। কোন দিকে মশ্রুর?

মশ্রুর। সেই দেওয়ালের কাছেই। কিন্তু একটু দূরে। একটা বাদাম গাছের ডালের কাছে।

হারুন। তা-ই চলো।

মশ্‌রুর। বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন, জাঁহাপনা। আর একটা আরজ। আপনাকে তক্‌লীফ করে সামান্য উঁচুতে গাছের ডালে চড়তে হবে।

হারুন। তক্‌লীফ কি? তুমি জানো না, ছেলেবেলায় আমি পিতার চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন এইসব গাছে চড়েছি। আমার কোন কষ্ট নেই।

মশ্‌রুর। তা আমি শুনেছি নামদার।

দুই জনে অন্ধকারে লেবাস্ পর্যন্ত গোপন করে এগোতে লাগলেন। গাছের পাকা পাতা ঝরে। আমিরুল মুমেনীন কান খাড়া করেন।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "মশ্‌রুর, আজ এত রাত্রি, সেই হাসির রণন ত পাচ্ছি না।"

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, বান্দাকে এই বিষয়ে আর কোন সওয়াল করবেন না। আপনার সতর্ক, নেঘাবান চোখের কাছে সব হাজির হবে।

হারুন। মশ্‌রুর, তুমি ধাঁধাঁয় ফেললে। হঠাৎ প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলে?

মশ্‌রুর। না, ওরা আজ এদিকে আসবে না। আমি মানা করে দিয়েছি।

হারুন। তা বুঝেছি। মশ্‌রুর, কোন কাঁচা কাজ করে না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, এই সেই বাদামের দারাখ্‌ৎ (বৃক্ষ), এই গাছের ডালে আমাদের চড়তে হবে।

হারুন। আচ্ছা, জুতা খোলার প্রয়োজন হবে না। আমার আ'বা শুধু খুলে এক পাশে রেখে দিই।

মশ্‌রুর। আলম্পানা, আমি খুলে নিচ্ছি।

প্রায় পনর হাত উর্ধ্বে খাড়ী ডালে মশ্‌রুর ও আমিরুল মুমেনীন উঠে বস্‌লেন।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, একবার রাত্রির বগদাদ—আপনার গড়া বগ্‌দাদকে এই উঁচু থেকে দেখে নিন। চমৎকার। কত আলো চারিদিকে। এই রাত্রি তবু মানুষের স্পন্দন, হৃৎস্পন্দনের মতই ধুক্‌ধুক্ করছে। দজলা নদীর বুকে গুফার উপর আলোর ঝিকিমিকি দেখুন। গুফাদারেরা গজল গাইছে, দাঁড় টানছে। আমিরুল মুমেনীনের গড়া বগ্‌দাদ, এক-কথায় অপূর্ব।

হারুন। মশ্‌রুর, মহলের মিনার থেকে কত রাত বগ্‌দাদকে দেখেছি। কিন্তু আজকের দেখা কোনদিন ভুলতে পারব না। গাছপালার মধ্যে বসে যেন আদিম দুনিয়া থেকে দেখছি মানুষের গড়া জিনিসকে। ইন্‌সান-ও স্রষ্টা। আর ইন্‌সানের তৈরি চিজ বিধাতার চিজের চেয়ে কিছু নগণ্য নয়। আমার বগ্‌দাদের এই ইমারৎ, সব কিছু হয়ত আজরাইলের থাবায় লয় পেয়ে যাবে, কি বগ্‌দাদ অমর উপকথায় পরিণত হবে। আরাইল সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

মশ্‌রুর। আলহামদোলিল্লাহ্, জাঁহাপনা।

হারুন। বগ্‌দাদ দুনিয়ার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রোশনাই হোয়ে থাকবে মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। আলহামদোলিল্লাহ্। সকল প্রশংসা আল্লার।

হারুন। কিন্তু মশ্‌রুর, সেই হাসির ত কোন আলামৎ-চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, আমার হাত থেকে এই কাঁচখানা গ্রহণ করুন, কিমিয়ার কাছ থেকে আনা।

হারুন। কেন?

মশ্রুর। এটা চোখে দিলে গাঢ় অন্ধকারেও আবছা কিছু দেখতে পাবেন। আর ওই দিকে তাকান। ওই যে খুবানীর ডাল ঝুলে রয়েছে—সেদিন যে-জায়গাটা আপনার নেঘাবান চোখে পড়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকুন, আলম্পানা।

হারুন। বেশ। কিন্তু কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না।

মশ্রুর। দেখতে পাবেন, নুরুল্লাহ্। আর খুব আস্তে কথা বলবেন। আশেপাশে দেখুন। আমার কাছেও একটা কাঁচ আছে। চোখে লাগাই।

হারুন। কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সব অন্ধকার।

মশ্রুর। আমিরুল মুমেনীন, ঐ ঝুলন্ত ডালের সোজাসুজি দেওয়ালের ওপাশে অর্থাৎ বাগানের দিকে দেখুন।

হারুন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য ঝাপসা। একজন আওরৎ, হ্যাঁ, আওরৎ-ই আসছে। ওড়না, সদরীয়া, নেকাব—সবই আছে। আমার মহলের আওরৎ কোন্ বেগম, কোন্ বাঁদী, মশ্রুর?

মশ্রুর। বান্দাকে নাচার করবেন না, জাঁহাপনা। শুধু আপনার মেহেরবান চোখে দেখুন।

হারুন। কিন্তু আমার চোখ মেহেরবান নয়। আমার মহলের বেগম না—বাঁদী? একি মশ্রুর, ডাল ধরে ঝুলেও যে দেওয়ালের উপর চড়ল, তারপর ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—হাত ইশারায় কি যেন বললে। নীচে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে? ও কি মহলের বেগম, না বাঁদী?

মশ্রুর। জাঁহাপনা, অমি কোন জবাব দেব না। একটু সবুর করুন। বান্দাকে আর গোস্তাখির গোনায় গোনাগার করবেন না।

হারুন। সবুর। মশ্রুর, গোস্বায় আমার খুন টগ্‌বগ্ ফুটছে।

মশ্রুর। আলম্পানা, সবুৎ (প্রমাণ) বা একটা কাজের সব না দেখে আপনি গোস্বা হোতে পারে না।

হারুন। তা সহী (ঠিক)

মশ্রুর। আলম্পানা, এবার ডাইনে বিশ তিরিশ হাত দুরে একটু কোণাকোণি আপনার নেঘাবান চোখ সরান। ওটা গোলমদের বস্তী। ঐ এক ঝরোকায় আলো জ্বলছে মিটিমিটি। ওদিকে তাকান। চোখে কাঁচ লাগাতে ভুলবেন না।

হারুন। ওখানে কেন?

মশ্রুর। দেখুন, আলি-শান।

হারুন। মশ্রুর, তুমি শুধু তেলেসমাতী ধাঁধাঁ সৃষ্টি করছ।

মশ্রুর। এবার দেখুন।

হারুন। ও ত গোলামী বসতের ঘর। কিছু মাটি উঁচু করে ফেলে দিওয়ানের মত বানিয়েছে। উপরে বিছানা পাতা। রঙীনই মনে হয়। গোলামের ঘরে—এই তাকিয়া? আর ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, আপনি শুধু দেখে যান।

হারুন। আমি ত দেখছি-ই।

পাশাপাশি উপবিষ্ট মশ্রুর ও হারুনর রশীদ। কত রাত্রি কে জানে? গাছের কয়েকটা ডাল এক জায়গা থেকে বেরিয়েছে এমন খাঁড়ি। বেশ হেলান দিয়ে এখানে বসা যায়। কিন্তু কৌতূহলী মানুষ ত আরামের

স্বাদ-প্রার্থী নয়। আমিরুল মুমেনীন ও মশ্‌রুর শিরদাঁড়া-সটান মনোনিবেশে দৃশ্য দেখতে লাগলেন। শোনার ক্ষেত্র নেই, বলাবাহুল্য।

গোলাম-বসতের সাধারণ মাটির ঘর যেমন হয়, এই ঘরের মশালা তার চেয়ে অন্য কিছু নয়। কিন্তু তবু পরিপাটি আছে। মাটির দিওয়ান জানালার পাশে মরুভূমি লু' হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত ঘরেই জানালা উঁচুতে। যেন সোজাসুজি বাতাস মুখে না লাগে। গাছের পাতার তৈরি দুই পাল্লা। কখনও বন্ধ, কখনও খোলা থাকে। নীচের রাস্তা থেকে কিছু দেখা যায় না। অনেক উপর থেকে ঘরের মেঝে চোখে পড়ে।

হঠাৎ মেটে দিওয়ানের উপর এক হাব্‌সী নওজোয়ান এসে শুয়ে পড়ল, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। তার পিছনেই এলো আরমেনী এক তরুণী। সে বসে পড়ল একপাশে। হাতে একগোছা আঙুর।

গুচ্ছসমেত সে হাব্‌সী নওজোয়ানের ঠোঁটের উপর ধরে ও নাড়াতে থাকে। হাব্‌সী আঙুরের লোভে ঠোঁট বাড়ায়। তরুণী তখন দ্রাক্ষাগুচ্ছ উপরে তুলে নেয় আর মিটিমিটি হাসে। হাব্‌সী জোয়ান এবার বালিস থেকে আরো উর্ধ্বে মুখ তোলে, কিন্তু আঙুরগুচ্ছ তেমনই আরো উপরে সরে যায়।

কথা শোনা যায় না, তবু কেউ কাছে থাকলে শুনতে পেত বৈকি।

তরুণী। তুমি বড় লোভী, তাতারী? তোমার সবুর সয় না।

যুবক। মেহেরজান, সবুর করা যায় না। ভাল মেওয়া দেখলে জিভে পানি এমনি আসে।

তরুণী। এসো, আর একবার চেষ্টা করো, তোমার ঠোঁটের কাছে আঙুর ঝুলিয়ে ধরি।

যুবক। তোমার ঠোঁটে আরো বেশি মেওয়া আছে।

তরুণী। বেশ, তাই খাও। কিন্তু আঙুর পাবে না।

যুবক। আঙুরে আমার প্রয়োজন নেই। ও আর আমাদের নসীবে জুটে না। বেগম জুবায়দার মেহেরবানী, আঙুর-ও জুটছে।

তরুণী। শুধু আঙুর? আর কিছু না?

যুবক। সেই মেওয়া—

উভয়ের হাস্যধ্বনি আর কামরার ভেতরে আবদ্ধ থাকে না। এই প্রাণদ হাসি শুধু এই মুহূর্তে পাওয়া যায়—হৃদয় যেখানে হৃদয়ের বার্তা উপলব্ধি করে, সান্নিধ্যের ব্যগ্রতায় নিজের অস্তিত্ব আর আলাদা রাখতে নারাজ। বাতাস হয়ত লোভেই ছুটে আসে তার তরঙ্গে নতুন সুর জুড়ে দিতে। বাতাসকে এখানে আমন্ত্রণ দিতে হয় না।

যুবক। মেহেরজান, আগে এই মেওয়া দাও। তারপর তোমার মেওয়া দিও।

তরুণী। আবার চেষ্টা করো।

যুবক। না। আমি এই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

তরুণী। আহা, রাগ করো না। আজ আমিও সবুর করতে পারব না ভয় হয়। খলিফার কানে গেলে—

যুবক। ভেবে লাভ নেই, মেহেরজান। বেগম সাহেবা যখন আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আর ডরাই না।

তরুণী। এসো, আঙুর খাও। আমি ত তোমার জন্যে আনি। বেগম সাহেবা আমাকে রোজ অনেক কিছু খাওয়ান।

যুবক। মেহেরজান, তুমি ভারী সুন্দর, তোমার কথার মতই সুন্দর। বিধাতা তোমাকে ঝুটো করেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

তরুণী। ঝুটো?

যুবক। বিধাতা ত সব জানেন। তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ। এই আঠারো বছরে তুমি কি দাঁড়াবে তা ত তিনি জানতেন। সেই কল্পনার মূর্তিতে তিনি কি তোমার ঠোঁট আস্ত রেখেছেন, মেহেরজান?

তরুণী। তিনি কি করেছেন জানি না, তুমি ত—

আবার সেই উতরোল হাসি ওঠে এই জীর্ণগৃহের মধ্যে। ফিরদৌস (বেহেশ্‌তের নাম) ত দূরে নয়। বুকের কপাট খুল্‌লে যে হাওয়া বেরোয়, তারই স্নিগ্ধতা আর শীতলতা দিয়েই বেহেশ্‌ত তৈরি। আজকের হাসি সহজে থামা জানে না। লয়ান্তরের মত তারি মধ্যে তরুণী মুখের কথা ছড়িয়ে যায়।

তরুণী। বিধাতার উপর খালি চুম্বনের অপবাদ কেন? রসিক কী সেখানেই শুধু থেমে থাকতে পারে?

যুবক। আহ্ মেহেরজান—

যুবক আর দিওয়ানে শুয়ে থাকে না। ধড়্‌মড়্ উঠে পড়েই সে তরুণীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। তারপর বিধাতার উপর যে অপবাদ দিয়েছিল সে তারই অভিনয় শুরু করে। চারি-চক্ষুর মিলন, বহু শতাব্দীর প্রবাদ। ঠোঁটের কথা কেন কেউ কোনদিন উল্লেখ করে নি?

যুবক। (ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে) তোমার বুকের মেওয়া কি কম মধুময়, মেহেরজান?

তরুণী। তুমি যে কতদিনের দুর্ভিক্ষে উপবাসী। খালি খাওয়া ছাড়া আর কোন কথাই নেই মুখে।

যুবক। উপবাসী, অনাহারী। নিশ্চয়ই তোমার মত ইফ্‌তারীর জন্য আমি সারা জন্ম উপবাসী থাকতে রাজী। কিন্তু আর কথা বলব না।

তরুণী। তুমি আমার সদ্‌রীয়া কাঁচুলী খুলছ কেন? তোমার দুষ্টু হাত আমি ভেঙে দেব। খাওয়া ছেড়ে এবার ছাওয়া ধরেছ।

যুবক। মেহেরজান, তুমি সত্যি, সত্যি মেহেরজান। প্রাণে করুণা ঢেলে দিতে পারো।

তরুণী। আমার খোলা সীনায় তোমার ঠোঁট তাঁতারী। আগে আমার ঠোঁটে ছিল তোমার ঠোঁট। তোমার অধঃপতন ঘটছে, ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছো। কোথায় গিয়ে যে থামবে— যাও—।

কৃত্রিম ক্রোধ ও হাসির যুগল-ডানায় সওয়ার মেহেরজান। বাহুপাশ ছাড়িয়ে, দিওয়ানের পাশে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীর নগ্ন। পরনে শুধু ঘাগ্‌রা।

তাতারীও সামনে এসে দাঁড়িয়ে তরুণীর চোখের দিকে তাকায়। নিস্তব্ধ মুহূর্ত। তারপর মেহেরজানের ঘাড়ে হাত দিয়ে সেও হাসতে থাকে। দুই জনে হাসে। যেন স্মৃতির রোমন্থন-লীলায় দু'জন ভেসে যাচ্ছে। এই সুখ-সমুদ্রের প্রবাহ অনন্তকালের রেখায় হয়ত মিশে গেছে। কবে? তারা কেউ জানে না।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে যেন উভয়ের সম্বিত ফিরে আসে। হাব্‌সী যুবক মেহেরজানকে বুকে জড়িয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে এসে আল্‌তোভাবে দিওয়ানে রাখলে। তারপর বাতি নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে দুই জনে অনেকক্ষণ হাস্‌তে থাকে। কেন? সে তারা-ই ভাল জানে, আর জানে বিধাতা।

প্রেমিক-প্রেমিকার কুহর শুনেছো কোন দিন? না শুনে থাকো, লেখক তোমাকে আর কিছু বোঝাতে পারবে না।

৫

মশ্রুর। জাঁহাপনা।

হারুন। কি মশ্রুর?

মশ্রুর। কি দেখ্‌ছেন?

হারু। দেখছি না, শুনছি।

মশ্রুর। কি, আলম্পানা?

হারুন। হাসি শুনছি। হাসি থেমে গেছে, তবু শুনছি। কিন্তু আমার মহল থেকে নৈশ অভিসার! কে—কে এরা, কে?

মশ্রুর। জাঁহাপনা।

হারুন। মশ্রুর, আমি জানতে চাই, মহলের কোন বেগম না বাঁদী?

মশ্রুর। মহলের কেউ নিশ্চয়। আর ত কিছু জানার প্রয়োজন নেই, আলম্পানা।

হারুন। আছে। আমার ইজ্জৎ কি কিছু নয়?

মশ্রুর। তৌবাস্তাগ্‌ফেরুল্লা।

হারুন। তবে কে ওরা?

মশ্রুর। আর জানার চেষ্টা করবেন না, জিল্লুল্লাহ্‌।

হারুন। না, আমাকে জান্‌তেই হবে, আর তা জানাবে তুমি।

মশ্রুর। বাদ্‌শা নামদার, বান্দাকে গোনাগার করবেন না।

হারুন। বলো তুমি কি জানো?

মশ্রুর। জাঁহাপনা, মাফ করুন বান্দাকে।

হারুন। না, মশ্রুর। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শুধু তুমি আছ। তোমার প্রতি বেদীল্‌ হওয়ার অপরাধে আমাকে অপরাধী করো না।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, আমি মাফ চাইছি দু'হাত জোড় করে। আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে কি বুঝতে পারছেন না আলম্পানা, কেন—কেন—আমার মুখ বন্ধ হয়ে আসছে?

হারুন। কিন্তু মশ্রুর, তুমি কি নিজের গর্দানের কোন দামও দাও না?

মশ্রুর। জাঁহাপনা, অনেক গর্দান নিয়েছি এই হাতে, আর কত দামী দামী গর্দান—মহামান্য জাফর বার্মেকী, যিনি দুনিয়াকে কামিজের গলায় কফ্‌তান লাগানো শিখিয়ে গেছেন—সেই গর্দান। আমার এই হল্‌কুমের (গ্রীবাদেশ) দাম তো তুচ্ছ তার কাছে। আপনার মেহেরবানী হয়, দানা-পানি নিঃশ্বাসের জন্য এই হল্‌কুম রাখবেন—না হয় কলম-তরাস—কর্তন করবেন।

হারুন। এত অভিমান করো না। তুমি জানো, তার দাম আমার কাছে কিছু নয়। সোজা বলো, আসল রহস্য কী? বড় ভুল করেছি—কবি ইস্‌হাককে সঙ্গে না নিয়ে। ঐ প্রেমের দৃশ্য দেখে হয়ত উম্‌দা গজল লিখে বস্‌ত, না হয় তোমার বেয়াদবির সাক্ষী থাকত।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, এই সুন্‌সাম রাত্রি। এই রইল তলওয়ার। আপনি নিজের হাতে আমাকে কতল করুন, কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না। কিন্তু মশ্রুর বেয়াদবির কলঙ্ক বোঝা মাথায় সইতে পারবে না। নচেৎ হুকুম দিন, আপনার বহু নেমক-পানি যে হলকুমের পথে গেছে, তা আপনার সামনে এই তলওয়ার খিঁচে দু'ফাঁক করে আপনাকে উপহার দিয়ে যাই।

হারুন। মাথা তোলো, মশ্রুর। আমার ইজ্জৎ তুমি দেখছ না। কোন ব্যভিচারিণী বেগম থাকলে তোমার কি উচিৎ নয়, হুঁশিয়ার হওয়ার জন্য খবর দেওয়া? তুমি বন্ধুর কাজ করছ না।

মশ্রুর। জাঁহাপনা, আমি এইটুকু বলতে পারি, মজকুর আওরৎ মহলের কোন বেগম নয়।

হারুন। বেশ। তাহলে তুমি আসল ভেদ খোলাসা করছ না কেন? তোমার বাধা কোথায়? আর মনে রেখো মহলের ভেতর ব্যভিচারিণী বাঁদী পর্যন্ত আমি রাখতে পারি না।

মশ্রুর। ও ব্যভিচারিণী নয়, জাঁহাপনা। তাও আপনাকে জানিয়ে দিলুম।

হারুন। তুমি ধাঁধাঁ আরও বাড়িয়ে তুলছ, মশ্রুর।

মশ্রুর। আমাকে গোনাগার করবেন না। তার চেয়ে তলওয়ার নিজের হাতে গ্রহণ করুন। মশ্রুর প্রাণের জন্য এতটুকু লালায়িত নয়। অবাধ্য বান্দা হিসেবে তার বাঁচার কোন অধিকার নেই, বাঁচতে চায় না সে।

হারুন। আমি জানতে চাই।

মশ্রুর। আমি জানাতে পারি না, আমি অক্ষম, আলম্পানা।

হারুন। কেন পারো না?

মশ্রুর। আরো মানুষ এর সঙ্গে জড়িত।

হারুন। বেশ। আচ্ছা নাদান তুমি, এতক্ষণ তা বলো নি কেন?

মশ্রুর। জাঁহাপনা, বান্দার আক্কেল কম, তা আপনি জানেন।

হারুন। শোনো মশ্রুর, আমি পাক্ কোরান-ছোঁয়া কসম করে বলছি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করব না। আর তার গোস্তাখি যদি অমার্জনীয় হয়—হজরত মোহম্মদ (দঃ) এর নামে কসম, তবু আমি তার বা তাদের কোন ক্ষতি করব না।

মশ্রুর। আলম্পানা, তালোহে শুনুন। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। মজকুর আওরৎ আরমেনী বাঁদী, নাম মেহেরজান। বেগম জুবায়দা ওকে খুবই পেয়ার করেন। তাই হাব্‌সী গোলামের সঙ্গে গোপনে ওর শাদী দিয়েছেন।

হারুন। হাহ্ হা, মশ্রুর। এই কথাটুকু বলতে তোমার এত সঙ্কোচ। তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে। তুমি সাফ পানি ঘোলা করতে ওস্তাদ। বেগম জুবায়দা এমন কিছু কসুর করেন নি, যার জন্য তুমি এত ঘোরপাক খেলে।

মশ্রুর। তবু জাঁহাপনা, আমি যে তাঁর কাছে করার করেছিলাম—

হারুন। সে আমি দেখব। মশ্রুর, সত্যি হাসি পাচ্ছে। একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ যদি কিছু করে বস্‌তাম, আমার আফসোসের সীমা থাকত না। কিন্তু মশ্রুর, আমি এমন বাঁদী জীবনে দেখিনি।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, মেহেরজান সত্যি খুবসুরৎ। মুসলে এক সিপাহ্ সালারের 'মাল-এ গনীমৎ' (যুদ্ধের বখ্‌রায় প্রাপ্ত দ্রব্য) ছিল। বেগম সাহেবা ওকে মহলে আনান। বড় বিশ্বাসী আওরৎ। তাই বেগম সাহেবা ওকে ভালবাসেন।

হারুন। মশ্‌রুর, কিন্তু কাল আবার রাত্রে দেখা হবে। আমার অন্য এরাদা আছে। বেগম সাহেবা যেন এইসব রাত্রির খোঁজ না পান।

মশ্‌রুর। বহুৎ আচ্ছা, জনাব। বান্দার গর্দান জিম্মা।

হারুন। হ্যাঁ, শোনো মশ্‌রুর। তুমি কবি ইস্‌হাককে খবর দিও, সে যেন রুবাব সঙ্গে নিয়ে কাল রাত্রে হাজির হয়।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান, ইয়া আমিরুল মুমেনীন।

৬

রুবাবের কান্না এই মাত্র থেমে গেল। তারপর চাপা হাসির আওয়াজ শোনা যায়। চাপা কিন্তু প্রাণদ। অন্যান্য দিনের মত এই রাত্রিও স্তব্ধ শীতলতার ভাণ্ডার, বাতাসের কারাগার। বাগিচায় হারুনর রশীদ, আবু ইস্‌হাক, মশ্‌রুর কথোপকথন রত।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তোমার সঙ্গ এই জন্যে ছাড়তে পারি নেই। বহুদিন পর তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে। আবার আবৃত্তি করো।

ইস্‌হাক। আলম্পানা, আবু ইস্‌হাকও কোন দিন আমিরুল মুমেনীনকে ত্যাগ করে যেতে পারবে না। তবে শুনুন ঃ

> ইরানী মেয়ের সীনা ভাল,
> মিশরী মেয়ের উরু।
> আরবী মেয়ের নাভীর নীচে
> স্বর্গ ঠারে ভুরু।

হারুন। হাহ্ হা, শোনো, মশ্‌রুর। কিন্তু মিশরী মেয়েরা তোমাকে কতল করে ছাড়বে কবি।

ইস্‌হাক। আলম্পানা, আবু ইস্‌হাক এমন বহুবার কতল হয়ে গেছে, সুতরাং ডর নিস্ত।

হারুন। ইরানী মেয়েরা তোমাকে খুন করবে, কবি।

ইস্‌হাক। ওদের দুই সীনার উপত্যকার মাঝখানে আমার কবর হয়ে গেছে, জাঁহাপনা। লাশকে কি কেউ খুন করে?

হারুন। শোনো, মশ্‌রুর। বিষণ্ণ রাত্রে কবি ইস্‌হাকের সঙ্গ পেলে তার কোন চিন্তা থাকে না। কিন্তু কবি কখন কোন্ পানশালায় হারিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল।

ইস্‌হাক। আপনার বান্দা মশ্‌রুর তা জানে। শুধু মশ্‌রুর কেন, দুনিয়ার সবাই জানে, মশ্‌রুরের তলওয়ারের ঝিলিক আর ইস্‌হাকের কথার ঝিলিকের কাছে বিদ্যুৎ তুচ্ছ।

হারুন। কিন্তু কবি, তুমি আরমেনী মেয়ে সম্পর্কে কোন রুবায়ী লিখবে না?

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, আজ প্রথম দেখলাম আরমেনী মেয়ে; তাও দূর থেকে গাছে সওয়ার হয়ে। তাই ওরা খারিজ আছে।

হারুন। কিন্তু কি দেখ্‌লে?

ইস্‌হাক। দেখলাম মশ্‌রুরের তলওয়ারের ঝিলিক হার মেনে গেল।

হারুন। আর কি দেখ্‌লে?

ইস্‌হাক। দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না—দেহের প্রতীক ছন্দ, না ছন্দের প্রতীক দেহ।

হারুন। আর কি শুনলে?

ইস্‌হাক। শুনলাম, আদমকে তৈরির পর বিধাতা হয়ত যে হাসি হেসেছিল তারই অনুরণন।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তুমি সত্যি সুরের কবি। মশ্‌রুর কাল খাজাঞ্চীখানা থেকে কবিকে চার হাজার আশরফী দেওয়ার বন্দোবস্ত করবে। আমার ফরমান।

মশ্‌রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান।

হারুন। কবি, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ইস্‌হাক। বলুন, আলম্পানা।

হারুন। ঝুটো চিজ কি খাওয়া যায়?

ইস্‌হাক। চিজ?

হারুন। হ্যাঁ।

ইস্‌হাক। খাওয়া যায়, আবার যায় না।

হারুন। সে কেমন?

ইস্‌হাক। অনেক জিনিস ঝুটো হয়, তা খাওয়া চলে না। হেকিমী ইলেমের বিরোধী। আবার অনেক চিজ যা কখনই ঝুটো হয় না, উচ্ছিষ্ট হয় না। সেখানে হেকিমী ইলেম 'থ', অসহায়।

হারুন। এমন চিজ আছে?

ইস্‌হাক। কিন্তু হঠাৎ এমন অদ্ভুত সওয়াল, জাঁহাপনা?

হারুন। এমনি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, কোন্ চিজ কোনদিন ঝুটা হয় না?

ইস্‌হাক। জীবন এবং যৌবন, জাঁহাপনা। নদী কি কেউ কোনদিন উচ্ছিষ্ট করতে পারে?

হারুন। না, পারে না।

ইস্‌হাক। জীবন যৌবন বহতা নদীর মত। কত তৃষ্ণার্ত আকণ্ঠ পান করে যাবে, তবু ঝুটা হবে না। কিন্তু জীবন যৌবন, ছাড়া আর সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। যা বহতা নয়, তা-ই উচ্ছিষ্ট।

হারুন। কবি আবু ইস্‌হাক, তুমি শুধু বাদক নও, সত্যিকার কবি—বিরাট কবি। মশ্‌রুর, ইস্‌হাককে আরো পাঁচ হাজার আশরাফি সওগাত দিলাম। কাল বন্দোবস্ত করো, মশ্‌রুর।

মশ্রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান।

ইস্‌হাক। আমিরুল মুমেনীন, আপনি বান্দা-নওয়াজ তা জানি, কিন্তু গরীবের উপর এত মেহেরবান হবেন না।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তোমার মর্যাদা হারুনর রশীদের খাজাঞ্চীখানা দিতে পারে না। তা জানি, তবু—

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, শুক্‌রিয়া—হাজার—লাখ শুক্‌রিয়া।

হারুন। মশ্রুর!

মশ্রুর। আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। আজকের নৈশ অভিযান এখানে শেষ হোক। আমার ঘুম পাচ্ছে। কাল তুমি শহর কোতোয়ালকে বলে রাখবে, আমার দশ-পনর জন কোতোয়াল দরকার হবে।

মশ্রুর। যো হুকুম, আলম্পানা।

হারুন। হাঁ, কাল আবার আমাদের এখানে দেখা হচ্ছে মজ্‌লিশ ভাঙার আগে, আবু ইস্‌হাক, তোমার রুবাবে আবার আনন্দের মওজ তোলে।

[রুবাব বেজে চলে]

কাওসুল আক্দারের বাগ-বাগিচায় সুরের হিল্লোল।

বগ্‌দাদের সড়কে অগাধ রাত্রি।

গোলাম-বস্তি নিব্‌ঝুম।

৩

পরদিন রাত্রি।

গোলাম-বস্তী নিব্‌ঝুম।

তারা দুজনে ঘুমিয়ে ছিল, মৃত্যু-রূপা ঘুম—একে অপরের অঙ্গের পাকে পাকে একাকার।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ হোলো। প্রথমে ধীর, মৃদু শব্দ। তারপর জোরে, দ্রুত।

—তাতারী, শুনছ?

—কে.......কি........

মেহেরজান। শুন্‌ছো?

তাতারী। কি মেহেরজান?

মেহেরজান। দুয়ারে কে ঘা দিচ্ছে।

তাতারী। আমার ঘোড়াটা হয়ত দড়ি ছিঁড়ে আমার খোঁজে এসেছে।

মেহেরজান। না, না—এ তোমার পেয়ারা ঘোড়া নয়। মানুষ।

তাতারী। শুয়ে থাকো, কোন সাড়া দিও না।

মেহেরজান। আরো জোরে ঘা দিচ্ছে, দরজা ভেঙে পড়বে। আমি হলফ করে বলতে পারি ঘোড়া নয়। তুমি সাড়া দাও।

তাতারী। কে?

নেপথ্যে। দরজা খোল।

তাতারী। কেন?

নেপথ্যে। দরকার আছে।

তাতারী। কে?

নেপথ্যে। এই গোলাম, দরজা খোল্। নচেৎ লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলব।

তাতারী। কে আপনি, জনাব?

নেপথ্যে। আমি মশ্রুর।

তাতারী। জাঁহাপনা, এখনই খুলছি। (ফিস্ফিস্ কণ্ঠে) মেহেরজান, সর্বনাশ! তুমি তাড়াতাড়ি বোরখা পরে নাও।

মেহেরজান। (ফিসফিস্ শব্দ) তাতারী, আল্লা যেন সহায়, নেঘাবান হন। কোথাও লুকানোর জায়গা নেই?

তাতারী। এই ছোট খুপরী, লুকাবে কোথায়?

মেহেরজান। তবে আল্লা যা নসীবে রেখেছেন, আমি বোরখা পরে নিই, তুমি দরজা খুলে দাও।

নেপথ্যে। এই জলদি কর্, দরজা খোল্।

তাতারী। দিচ্ছি, জনাব। বোরখা পরেছ?

মেহেরজান। পরেছি।

তাতারী। আসুন, জনাব। (নতজানু) আহ্লান ওয়া সাহ্লান ইয়া মওলানা। এ কি! স্বয়ং আমিরুল মুমেনীন। লা-হাওলা ওলা কুয়াতা, আলম্পানা, বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন। এই শির ঝুঁকালাম। গোস্তাখির জন্য আমায় কঠোর সাজা দিন, জাঁহাপনা।

হারুন। তুই ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়েছিস্, আরো আলো—আরো রোশ্নাই চাই।

তাতারী। জাঁহাপনা, গরীবের আর তো কিছু নেই। তবে পাশের প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনি।

হারুন। মশ্রুর, কোতোয়ালদের একটা আলো আনতে বলে, শিগগীর।

মশ্রুর। যো হুকুম, জাঁহাপনা।

তাতারী। আলম্পানা, গোস্তাখি মাফ করবেন বান্দার সওয়ালে। এই সুম্সাম রাত্রে আপনার পয়জার এই গোলামদের বস্তীতে জিল্লুল্লাহ্‌র আবির্ভাব? কিছু বুঝতে পারছি নে।

হারুন। আবু ইস্হাক।

ইস্হাক। জাঁহাপনা।

হারুন। আমার বদলে, তুমি জবাব দাও।

ইস্হাক। এই গোলাম, জাঁহাপনা তোর হাসি শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তোর জন্যে ইনাম নিয়ে এসেছেন।

তাতারী। ইনাম?

ইস্হাক। হ্যাঁ, ইনাম।

তাতারী। কিন্তু জাঁহাপনা, বান্দার কোন গুণ নেই, আর বান্দা এমন কোন কাজ করেনি, যার জন্যে সে ইনাম প্রত্যাশী হতে পারে।

ইস্হাক। গোলাম, তোর হাসি বড় মধুর। তাই আমিরুল মুমেনীন সেই হাসির রেশ ধরে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

তাতারী। জনাব, বান্দাকে আর গোনাগার করবেন না। গোলাম তার আবার হাসি।

হারুন। না, সত্যি। ইস্হাক আমার কথাই বলছে। আমি সেই জন্যেই এসেছি।

তাতারী। আমিরুল মুমেনীন, আল্লা আপনার শান শওকত আরো বৃদ্ধি করুন, আপনার দব্‌দবা দিতে দিতে ছড়িয়ে পড়ুক। আপনি দুনিয়ার আমীর হন। গরীবের এই ঝুপড়িতে কি করে যে আপনাদের জায়গা দিই।

মশ্রুর। চুপ কর, গোলাম।

হারুন। এই যে কোতোয়ালেরা আলো এনেছে। এখন চারিদিক বেশ চোখে পড়ে। এই গোলাম, ওটা কী?

তাতারী। কি জাঁহাপনা?

হারুন। এই যে দেওয়ালের সাথে কালো বোরখা লেগে রয়েছে।

তাতারী। জাঁহাপনা—

হারুন। কি?

তাতারী। জাঁহাপনা—

মশ্রুর। জবাব দে, নফর।

তাতারী। জাঁহাপনা, বান্দাকে কতল্ করুন। বান্দা এই জবাব দিতে অক্ষম।

হারুন। জবাব দে, নচেৎ—

তাতারী। জাঁহাপনা।

হারুন। মশ্রুর এই বান্দার জিভ ছিঁড়ে নাও, এখনও জবাব দিচ্ছে না।

মশ্রুর। আবু ইস্হাক, দ্যাখো দ্যাখো, গোলামটা ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছে, তবু জবাব দিচ্ছে না।

ইস্হাক। আমি দেখি, মশ্রুর। এই, আমিরুল মুমেনীনের সওয়ালের জবাব দে।

হারুন। মশ্রুর যা ভেবেছিলাম তা নয়। না-ফরমান গোলাম। একে কতল করো। এক্ষণি।

মেহেরজান। (বোরখা খুলতে খুলতে) না, না আমিরুল মুমেনীন। দেওয়ালের গায়ে শুধু বোরখা নেই। আমি আছি তার ভেতরে। ওকে মাফ করুন।

হারুন। আবু ইস্হাক, মশরুর—দ্যাখো। বোরখার অন্ধকার ছিঁড়ে এই মাহতাব (চাঁদ) কোথা থেকে উদয় হোলো? থামো মশ্রুর। জবাব পাওয়া গেছে। এই, তুই কে?

মেহেরজান। (নতজানু) জাঁহাপনা, মজ্‌কুর জানানা আপনার বাঁদী।

হারুন। বাঁদী?

মেহেরজান। হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

হারুন। কোন দেশী বাঁদী এমন?

মেহেরজান। আরমেনী বাঁদী, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। এই গোলাম, উঠে দাঁড়া। একটা জবাব দিবি। তবু এত ভয়। এ তোর কে?

তাতারী। আমার বিবি আলম্পানা।

হারুন। তোর বিবি?

তাতারী। হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

হারুন। তুই শাদী করেছিস্, অথচ খবর দিস্ নি? গোলামের আস্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে। আলেপ্পো শহরে কতকগুলো গোলামের তাই মাথা থেঁৎলে দিতে হোলো।

তাতারী। জাঁহাপনা, গোস্তাখি মাফ করবেন। আপনার পায়ের খাক্ এই গোলাম। তার আবার শাদী। তার আবার দাওয়াৎ।

হারুন। তোর কি জানা নেই, আপন মাওলার (প্রভু) হুকুম ছাড়া কোন গোলাম শাদী করতে পারে না বা নিজের বেটির শাদী দিতে পারে না?

তাতারী। জানি, জাঁহাপনা।

হারুন। তবে—

তাতারী। তার সাজা নিতে আমি প্রস্তুত আছি। অবাধ্য, নাফরমান বান্দার যা' শাস্তি হয়, তাই আমার প্রাপ্য।

হারুন। হ্যাঁ, তোর গর্দান যাওয়া-ই উচিৎ। এই বাঁদী, তুই কোথা থাকিস।

মেহেরজান। আপনার মহলের বাঁদী, জাঁহাপনা।

হারুন। আমার মহলের বাঁদী শাদী করেছে গোলাম, অথচ আমাকে কেউ জানায় নি। তাজ্জব ব্যাপার। তোকে কোনদিন দেখি নি?

মেহেরজান। না, আলম্পানা।

হারুন। অমন নতজানু কর-জোড়ে তোর থাকার দরকার নেই। উঠে দাঁড়া।

মেহেরজান। জাঁহাপনা। বান্দীকে আর গোনাগার করবেন না।

হারুন। আমি যা বলি, তা শোন্। এখানে মশরুর খাড়া আছে, তা ভুলে যাস্ নি। উঠে দাঁড়া।

মশরুর। জাঁহাপনা—

হারুন। গোলাম, তোর আস্পর্ধা আস্মান ছাড়িয়ে গেছে। কুকুরের মত তোদের জিভ ছিঁড়ে নিলে তবে গায়ের ঝাল মেটে।

তাতারী। জাঁহাপনা, বান্দা গোনাগার। আপনার যা মরজী, তাই করুন। বান্দার কোন দুঃখ নেই।

হারুন। আবু ইস্হাক, এ গোলাম ত চমৎকার কথা বলে। ঠিক তোমার মত।

ইস্হাক। হ্যাঁ, আলম্পানা। যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাস্তেও পারে।

হারুন। কেন, আবু ইস্হাক?

ইস্হাক। আলম্পানা, সাধারণত কথা নয়, ভাল কথার মূল কি? ভাল কথা হচ্ছে রূহের (আত্মার) প্রতিধ্বনি—সেখানেই জমে থাকে, তারপর ঝর্ণার মত বেরোয়। অনাবিল হাসি হচ্ছে ভাল

কথারই শারীরিক রূপ। তাই জিল্লুল্লাহ্, যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাসতেও পারে। হাসি আর কথার মূল উৎস এক জায়গায়।

হারুন। ও আবু ইস্হাক, তুমি ফল্সাফা-দর্শন শুরু করে দিলে। এত বোঝার মত ধৈর্য এখন আমার নেই। এই বাঁদী—তোর কিছু বলার আছে?

তাতারী। না, জাঁহাপনা। গোনাগার, নাফরমান—আমাদের কতল করুন।

হারুন। মশ্রুর, তৈরি হও। আমার ফরমান মোতাবেগ এদের শাস্তি দেবে। এক চুল না এদিক-ওদিক হয়।

মশ্রুর। যো হুকুম, আলম্পানা।

হারুন। হাজেরান (সমবেত) মজ্লিস—মশ্রুর, কবি আবু ইস্হাক এবং কোতোয়ালগণ, এই দুই বান্দা এবং বান্দী কানুনের খেলাপ যে কাজ করেছে, তার জন্য এদের শাস্তি কী? তলওয়ারে গর্দান গ্রহণ করা যায়, অঙ্গচ্ছেদ করা চলে, একদিনের পাঁজর নামিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু তলওয়ারের আরো শক্তি আছে। তলওয়ার লোহার জিঞ্জির ছিন্ন করতে পারে। আমি এই মজ্লিসে ঘোষণা করছি—আজ থেকে এই দুই বান্দা-বান্দীর গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন হোক। এর দুই জনে মুক্ত আজাদ, আমার রাজত্বের দুই জন স্বাধীন নাগরিক।

(সকলে। মারহাবা। মারহাবা।)

তাতারী। হে আমিরুল মুমেনীন, আপনার মেহেরবানি সীমাহীন, আপনার হৃদয় বিশাল, আমরা উভয়ে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। হে জিল্লুল্লাহ্, আপনার দুই বাহুতে আরো শক্তি সঞ্চিত হোক যেন সিকান্দার শা'র মত আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর হন। আমিরুল মুমেনীন জিন্দাবাদ।

(সকলে। মারহাবা। মারহাবা।)

হারুন। আমি আরো ঘোষণা করছি, এই মুহূর্ত থেকে হাবসী তাতারী—কয়েক মুহূর্ত আগে যে গোলাম ছিল, বগ্দাদ শহরে পশ্চিমে আমার যে বাগিচা আছে সেই বাগিচা এবং তার যাবতীয় গোলাম বান্দী, মালমাত্তা, আসবাব সব কিছুর সে মালিক। তার সমস্ত লেবাস ও দিনগুজ্রানের খরচ আজ থেকে খাজাঞ্চীখানা বহন করবে।

(সকলে। মারহাবা। মারহাবা।)

তাতারী। জাঁহাপনা, আপনার করুণার ঋণ আমরা কোনদিন শোধ দিতে পারব না।

হারুন। যাও, কোতোয়াল—এখন-ই হাবসী তাতারীকে আমার বাগিচায় নিয়ে যাও। লেবাস সেখানে প্রচুর আছে। এই বেশে আর যেন কোনদিন ওকে আমি না দেখি।

সকলে। সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

হারুন। একটু সবুর করো, কোতোয়াল। তোমাদের হাসির জন্য আমি এই ইনাম দিলাম দাঁড়াও দুইজনে। আর একবার সেই হাসি হাসো।

তাতারী। জাঁহাপনা, বান্দাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। তার বোঝায় বান্দার ঘাড় ক্লান্ত। আজ হাসি আসতে পারে না, জাঁহাপনা।

হারুন। বেশ। কিন্তু মনে রেখো, হাসি তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই হাসিই আমি শুনতে চাই। হাঁ, আমি শুনতে চাই। আমার বুক যখন ভারাক্রান্ত থাকবে, তখনই তোমার হাসি আমি কামনা করব। যাও, এখন নাহি-বা হাস্‌লে। কোতোয়াল, একে নিয়ে যা। বাঁদী, তুমি মহলে ফিরে যাও।

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, গোলাম ত চলে গেল। এখন আবু ইস্‌হাকের কথা শুনুন। এই আরমেনী বাঁদী, তৌবা— এই আরমেনী আওরতের জন্য কি ইনাম দিবেন? কান শোনার জন্য পাগল।

হারুন। সে আরো বড়ই ইনাম। চলো, মেহেরজান। আমাদের সঙ্গে চলো। তুমি বেগম জুবায়দার কাছে ফিরে যাও। তবে তুমি আর বাঁদী নও।

মেহেরজান। জাঁহাপনা, আপনি অশেষ মেহেরবান। আপনার মরজীই আমার মরজী।

হারুন। মেহেরজান, তুমিও এত মিষ্টি কথা বলতে পারো। আজব দুনিয়া। রাত্রি প্রায় শেষ। চলো মশ্‌রুর। আবু ইস্‌হাক, তোমার গজল-শোনা রাত্রি আবার আসবে। নিরাশ হয়ো না, কবি।

ইস্‌হাক। আলম্পানা, আবু ইস্‌হাক আশা মানে না—নিরাশা জানে না। আবু ইস্‌হাক বিশ্বের মুসাফির। সে যা দেখে, তারই গান করে। চলুন, জাঁহাপনা।....

৮

অন্দর মহল। আবু ইস্‌হাক ও হারুনর রশীদ।

—আবু ইস্‌হাক।

—জাঁহাপনা।

হারুন। হাব্‌সী গোলামের খবর জানো?

ইস্‌হাক। না, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। আমিও তিনদিন খোঁজ নিতে পারি নি, তাই বাগিচার মোহাফেজকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

ইস্‌হাক। মোহাফেজ ডাকার দরকার নেই, আলম্পানা। গোলাম যা পেরেছে, তার তুলনা নেই। এই বদান্যতা শুধু জিল্লুল্লাহ খলিফা হারুনর রশীদ-বিন-মেহ্‌দীর পক্ষেই সম্ভব।

হারুন। তবু খোঁজ নিতে হয়। কারণ ওর হাসি শোনার প্রয়োজন আমার আছে। ঐ ত মশ্‌রুর মোহাফেজকে নিয়ে হাজির। আহ্‌ আর কুর্নিশে প্রয়োজন নেই। এসো মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, মোহাফেজ হাজির।

হারুন। মোহাফেজ, হাব্‌সী তাতারীর কোন তক্‌লীফ হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, আপনার নেমক খেয়ে বহুদিন এই বাগিচার মোহাফেজ-পদে নিযুক্ত আছি। বহু কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এমন কাহিনী এখনও শুনি নি, জাহাপনা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যে ভিক্ষুক ছিল, তৃতীয় প্রহরে সে আমীর। এ শুধু বগ্‌দাদেই সম্ভব।

হারুর। গোলাম লেবাস পরেছে ত?

মোহাফেজ। আমিরুল মুমেনীন, কালো চেহ্‌রা, লেবাস পরার পর ওকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

হারুন। বহুৎ আচ্ছা। ওর কোন কষ্ট হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ। আলম্পানা, যেটুকু তক্‌লীফ, সে শুধু অনভ্যাসের কষ্ট। বিছানা, গালিচা, গোলাম, বাঁদী, মুজ্‌রানী— এর মধ্যে হঠাৎ একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করা কী বিচিত্র?

হারুন। কোন অস্বোয়াস্তি দেখলে নাকি?

মোহাফেজ। হ্যাঁ, জনাব। এই গোলাম কাউকে হুকুম দেয় না।

হারুন। রপ্ত হোক, তখন দেবে।

মোহাফেজ। নীচে গালিচার উপর শুয়ে থাকে।

হারুন। ও সব ঠিক হয়ে যাবে। আহেস্তা-আহেস্তা।

মোহাফেজ। আমিরুল মুমেনীন, মুজ্‌রানীরা ত বিরক্ত হয়ে গেছে।

হারুন। কেন?

মোহাফেজ। ওরা বলে, এখানে বেকার হয়ে যাচ্ছে। আজ তিনদিন খানাপিনা নাচ-গান কিছুই হচ্ছে না।

হারুন। হচ্ছে না?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপনা, হবে কি করে? আমি একদিন পাঁচজন মুজ্‌রানীকে জনাব তাতারীর কাছে পাঠালাম। সবাই নওজওয়ান। সকলকে ফেরৎ পাঠালে। বললে, যাও।

হারুন। আচ্ছা—।

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, তা ছাড়া— আপনি এত কিছু দিয়েছেন— অন্য মানুষ হলে আনন্দে পাগল হয়ে যেত। এর সে-সব কিছু নেই। সব সময় গম্ভীর।

হারুন। সব সময়?

মোহাফেজ। হ্যাঁ, জাঁহাপনা। বাবুর্চি খানা ঠিক রাখে। একবার খেতে যায় মাত্র।

হারুন। একবার?

মোহাফেজ। হ্যাঁ, আলম্পানা। রাতে কিছু খায় না। অলিন্দে বসে আকাশের তারা দেখে আর চুপচাপ বসে থাকে।

হারুন। কোন গোলাম বেয়াদবি করছে না ত ওর সঙ্গে?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপনা। আপনার হুকুম—কোন্ শয়তানের বাচ্চা বরখেলাপ করবে?

হারুন। এই গোলাম হাসে না?

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, জোরে হাসি ত দূরের কথা। গোস্তাখি মাফ করবেন, আমরা কেউ ওর দাঁতই দেখলাম না।

হারুন। হাসে না?

মোহাফেজ। না, জিল্লুলাহ্।

হারুন। হাসে না?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপনা।

হারুন। একবারও না?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপনা। আমি 'গীবৎ' (পরনিন্দা) করছি না। আপনি এই দোষে আমার গর্দান নিতে পারেন।

হারুন। আশ্চর্য। যাও, মোহাফেজ। তুমি খুব তরীবতের সঙ্গে ওকে রাখবে। যদি কোন ত্রুটি কানে আসে, আমি সমস্ত গোলামদের সঙ্গে তোমাকেও কতল করব।

মোহাফেজ। আস্‌সামায়ো তায়তান। আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। মশ্‌রুর, মোহাফেজ যা বলে গেল, তোমার বিশ্বাস হয়?

মশ্‌রুর। বিশ্বাস হয় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়, কারণ মোহাফেজ সাহেব ইমানদার কর্মচারী।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তোমার বিশ্বাস হয়?

ইস্‌হাক। হয়, জাঁহাপনা।

হারুন। কেন?

ইস্‌হাক। হেকিমী দাওয়াই তৈরি করতে অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। হাসি একটি জিনিস। কিন্তু হাসি তৈরি হয় নানা জিনিস দিয়ে। খাওয়া লাগে, পরা লাগে, আরাম লাগে, শিক্ষা লাগে, আরো বহু কিছু।

হারুন। নানা চিজ?

ইস্‌হাক। হ্যাঁ, খলিফা নামদার। তার একটা উপাদানের যদি অভাব ঘটে, আর হাসি তৈরি হবে না। ধরুন, সব আছে—নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরি হবে না।

হারুন। হবে না?

ইস্‌হাক। না, জাঁহাপনা। আমার মনে হয়, অনেক উপাদান হয়ত আছে, কিন্তু কোন একটা উপাদানের অভাব ঘটেছে।

হারুন। তোমার কি ধারণা?

ইস্‌হাক। বেয়াদবি মাফ করবেন ত, জাঁহাপনা?

হারুন। বেয়াদবি? এই কামরায় আমি আমিরুল মুমেনীন নই, তোমাদের বন্ধু। বেয়াদবির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ইস্‌হাক। মেহেরজান কোথায়, আলম্পানা?

হারুন। সে আর কারো 'জানে' মেহের (করুণা) ঢাল্‌তে গেছে।

ইস্‌হাক। তা ত উচিত নয়। মেহেরজান বিবাহিত স্ত্রী। আর কারো জন্যে সে হারাম।

হারুন। তোমার মতে হারাম। কিন্তু কারো-কারো মতে হারাম নয়।

ইস্‌হাক। হারাম নয়?

হারুন। না।

ইস্‌হাক। এমন ফতোয়া কেউ দিতে পারে?

হারুন। আলেম পারে। এই দ্যাখো, আলেম আবদুল কুদ্দুসের ফতোয়া। তিনি লিখছেন, মেহেরজান কেনা বাঁদী। মালিকের হুকুম ছাড়া তার কোন শাদী হতে পারে না। যদি হয়, তা না-জায়েজ (শাস্ত্রসিদ্ধ নয়)। মজকুর বাঁদী মেহেরজান ও গোলাম হাব্‌সী তাতারীয় শাদী না-জায়েজ। সই দেখেছ?

ইস্‌হাক। দেখালাম, জাঁহাপনা। কিন্তু জনাব আবদুল কুদ্দুস এই ফতোয়া দিলেন?

হারুন। দেবেন না কেন?

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, শাস্ত্রকে চোখ ঠারা যায়, কিন্তু বিবেককে চোখ ঠারা অত সহজ নয়।

হারুন। তুমি কি বলতে চাও?

ইস্‌হাক। আবদুল কুদ্দুস আল্লার কালাম বিক্রী করেছেন।

হারুন। দুনিয়া ত কেনা-বেচার জায়গা। আর তিনি তোমার মত আহম্মক নন।

ইস্‌হাক। কেন জাঁহাপনা?

হারুন। এই বগ্‌দাদ শহরে তিন তিনখানা আলীশান মাকান, ইমারৎ বাগ-বাগিচা—আর বছর পাঁচ হাজার 'দীরহাম' যায় খাজাঞ্চীখানা থেকে। তিনি এসব খোয়াতে যাবেন নাকি তোমার মত আক্কেল দেখাতে গিয়ে? আমি কি দিই, তা-ও তিনি যেমন জানেন, আমি কি চাই তাও তিনি তেমন বোঝেন। দোকানদার-খরিদ্দারে এরকম সম্পর্ক না থাকলে কি দুনিয়া চলে?

ইস্‌হাক। কিন্তু, জাঁহাপনা—

হারুন। আহ্‌, ইস্‌হাক, তুমি বড় বন্ধ্যা হুজ্জতে এগোও খোওয়াব-চারী কবি, কিছুই বোঝ না। তুমি জানো, দীরহামের মোজেজা (অলৌকিক) শক্তি আছে। দীরহাম অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

ইস্‌হাক। না, আলম্পানা।

হারুন। দীরহামের তাকৎ অসম্ভব, অশেষ। তোমাকে বুঝিয়ে বলা যাক্‌। তুমি কালো আঙুর পছন্দ করো, না সবুজ আঙুর?

ইস্‌হাক। সবুজ আঙুর।

হারুন। বেশ। সবুজ আঙুর না পেলে—

ইস্‌হাক। কালো আঙুর খাই।

হারুন। ধরো, বাজারে সবুজ আঙুর আছে, কিন্তু দাম খুব চড়া। অত পয়সা তোমার নেই। তখন?

ইস্‌হাক। তখন কালো আঙুর কিনি।

হারুন। কিন্তু মনে রেখো, তোমার কাছে নয়, শুধু এমনিতেও কালো আঙুর সবুজ আঙুর এক নয়। দু'য়ের আস্বাদ আলাদা। কিন্তু তোমার দীরহামের পরিমাপে দুই-ই এক। দীরহামের কত কুওৎ, কত শক্তি বুঝতে পারছো?

ইস্‌হাক। পাচ্ছি, জাঁহাপনা।

হারুন। খোয়াবি নিয়ে থাকো, তুমি সহজে এ সব বুঝবে না। যাক সে ব্যাপার। কথায় কথায় আমরা অনেক তফাৎ চলে এসেছি। গোলামের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে কেন?

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, ও হয়ত আর হাস্‌বেই না।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, তোমার জন্যেই আমার পাগ্‌লা-গারদ বানাতে হবে। গোলাম আবার হাস্‌বে না? দেখে নিও, দীরহাম কি করতে পারে। মশ্‌রুর তুমি সাক্ষী।

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, যদি উপাদানের অভাব হয়?

হারুন। তোমার ওসব খুট দর্শন, ইস্‌হাক। পরশু আমরা তিনজনে গোলামের হাসি শুনতে যাব, কাল খবর পাঠাব। তোমার দাওয়াৎ রইল, আবু ইস্‌হাক। মনে থাকে যেন, পরশু আমরা তিনজনে হাব্‌সী তাতারীর মেহমান।

ইস্‌হাক। বহুৎ খুব, জাঁহাপনা।

হারুন। মশ্‌রুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইসহাক আক্কেলের তেজ হারিয়ে ফেলছে।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, আমার তলওয়ারে তেজ কিন্তু বাড়ছে।

হারুন। চলো, এখন ওঠা যাক্।

মশ্‌রুর। যো-হুকুম, আলম্পানা।

৯

কাল রাত্রি। বাগিচার কক্ষ। মোহাফেজ ও তাতারী।

— মোহাফেজ

— জনাব।

— তুমি জানো চারদিন আগে আমি কি ছিলাম?

— জনাব, তা জানি বৈকি।

— কিন্তু তুমি কি ছিলে, তা জানো না। জানো?

— আপনি কি বলতে চান, জনাব?

— তোমার মত অনেকেই জানে না যে তারা কী। আমি গোলাম ছিলাম, খুব নীচুদরের গোলাম। কিন্তু তুমিও গোলাম, আমিরুল মুমেনীনের গোলাম। অবশ্যি উঁচুদরের গোলাম।

— তা সত্যি, জনাব।

— আজ চাকা ঘুরে গেছে। তুমি আমার চেয়ে অনেক নীচুদরের গোলাম। আমারও গোলাম।

— আলবৎ।

— কিন্তু আমি ভুলে যাই নি, আমি গোলাম ছিলাম।

— জনাব, তাতারী। আপনি বড় হক্ কথা বলেন।

— শোনো, মোহাফেজ। এসো হাতে হাত মেলাও। মনে রেখো, তুমিও যা, আমিও তাই।

— শুক্‌রিয়া, জনাব।

— কিন্তু বড় গোলামেরা ছোট গোলামদের মনে রাখে না। ছোট গোলাম বড় গোলাম হলে তারও সেই অবস্থা ঘটে। গোলামখানার এ এক মহা দস্তুর।

— আপনার কথা শুনতে বড় মিষ্টি লাগে।

— এখন শোনো, মোহাফেজ। বাইরে আমাদের যে সম্বন্ধ আছে তা থাক। কিন্তু ভেতরে আমরা পরস্পরের মোহাফেজ—রক্ষক।

— শুক্রিয়া, জনাব।

— জেনো রেখো, আমি গোলাম গোলাম-ই আছি।

— না, না, জনাব।

— সত্যি। সত্যি বলছি। তুমি কি মনে করো, এই বাঁদী গোলাম মুজ্‌রানী ইমারৎ গালিচার মধ্যে খুব স্বোয়াস্তিতে আছি?

— কোন তক্‌লীফ হচ্ছে, বলুন। নচেৎ আমিরুল মুমেনীন আমার গর্দান নিয়ে নেবেন।

— না, তোমার দোষ নয়। আমরা অর্থাৎ গোলামেরা নিজের যোগ্যতা আর মেহনৎ দিয়ে কোন জিনিস অর্জন না করলে, স্বোয়াস্তি পাই না। যোগ্যতা, মেহনতের বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু যদি আমাদের উপর ঝরে পড়ে, তাতে সুখ কোথায়? মগজ আর তাগদের জোরে কোন জিনিস না পেলে আমরা মজা পাই না। এই বাগবাগিচা আমার মেহনতের ফল নয়।

— সত্যি, হুজুর?

— হ্যাঁ, সত্যি। মনে রেখো, যোগ্যতা থেকে কোন চিজ না পেলে তা ঢিলে লেবাসের মত বেখাপ্পা-ই দেখায়। আর যোগ্যতা-মেহনৎ ব্যতিরেকে যারা পুরস্কারপ্রার্থী—তারাই হচ্ছে দুনিয়ার আসল গোলাম।

— জাঁহাপনা, আপনি উজীর মরহুম জাফর বারমেকীর মত আক্কেলমন্দ্‌ কথা বলেন।

— চুপ। জাফরের নাম তোমার মুখে শুনলে খালিফা জিভ ছিঁড়ে ফেলবে।

— হুজুর আপনি, তাই বলছি।

— আমাকে জনাব-হুজুর সম্বোধনে ডাক দিও না। আমরা বন্ধু।

— আপনি যখন অভয় দিলেন—

— শোনো, তোমাকে আমার একটা খবর দিতে হবে।

— খবর?

— হ্যাঁ খবর। তুমি কি বগ্‌দাদের সড়কে, কাফিখানায় ফরসুৎ-মত ঘোরাঘুরি কর না?

— তা করি বৈকি।

— তুমি তাহলে খবর যোগাড় করতে পারবে।

— কি খবর বলুন?

— কিন্তু, এ-খবর খোদ আমিরুল মুমেনীনের কাওসুল আক্‌দার প্রাসাদের খবর।

— জনাব, পাথরে, দেওয়ালে খবর আটকা থাকে না। যারা মহলে থাকে, তারাও মানুষ। চোখে দেখলে বা কানে শুনলে, মুখে না বলে পারে না। চোখের, কানের, মুখের একটা যোগ-সাজস আছে।

— আছে?

— আছে বৈকি। বেগম খৈজুয়ান যে নিজের বড় ছেলে হাদীকে দাসী দিয়ে গলা টিপিয়ে মেরেছিল, তা কি করে জানাজানি হলো? খলিফা হাদী মারা গেলেন, তাই না হারুনর রশীদ খলিফা হলেন।

— তাই নাকি?

— আপনি জানেন না? বগ্‌দাদের সবাই জানে, আর আপনি জানেন না? যাকে জিজ্ঞেস করেন, সে-ই ঐ জবাব দেবে, কিছু জানে না। বড় মজার ব্যাপার।

— শোনো মোহাফেজ, যদিও মহলের খবর। কিন্তু খবর একটা তুচ্ছ ব্যক্তির।

— কে সে?

— বলছি। তুচ্ছ ব্যক্তি সে। বেগম জুবায়দার খাস-বাঁদী মেহেরজান। তারই খবর চাই।

— শাহী সড়কের এক কাফিখানায় আমি কাল সন্ধ্যায় বসেছিলাম। সেখানে খবর শুনলাম।

— কি খবর?

— আমার ত তেমন শোনার গা ছিল না। একজন আর একজনকে বলছে, মহলে নাকি এক রূপের তুফান এসেছে—এক আরমেনী বাঁদী। খালিফা নাকি তাকে শাদীও করতে পারে।

— আর কি শুনলে?

— হুজুর, আমার কান তো বেশি ওদিকে যায় না, বয়স পঞ্চাশের উপর। জওয়ান হলে এসব রসালো কথার দিকে মন যায়। কানও যায়।

— আজ তুমি বেড়াতে বেরিয়ে দ্যাখো যদি কোন খবর আনতে পারো।

— আচ্ছা, জনাব।

— আবার জনাব কেন? এসো, হাতে হাত মেলাও।

১০

বগ্‌দাদের সড়কে রাত্রি।

শহরের উপকণ্ঠে নির্জনতার রাজগী অনেক আগে শুরু হয়েছে। কিন্তু সরাইখানার আলো তখনও নেভে নি। আনন্দ-তালাসী পথিকজনের আনাগোনা কচিৎ কানে আসে।

আবছা অন্ধকারে দুই ব্যক্তি হাঁটছিল। হঠাৎ একজন হেসে উঠল। অপর ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারে না। সেও সঙ্গীর পথ অনুসরণ করে।

—আবু নওয়াস।

—কি আবুল আতাহিয়া।

আতাহিয়া। তুমি হাসছো?

নওয়াস। হ্যাঁ, হাসছি।

আতাহিয়া। অবিশ্যি তোমার কবিতা পড়ে মনে হয়, তুমি সত্যি মনে মনে হাসতে পারো। আমাকে দিয়ে তা হয় না।

নওয়াস। তা আমি জানি, তুমি দুনিয়ায় শুধু কেয়ামৎ দ্যাখো।

আতাহিয়া। আর তুমি?

নওয়াস। বেহেশ্‌ত। এই দুনিয়াই আমার বেহেশ্‌ত।

আতাহিয়া। শরাব আর সাকী থাকতে, তোমাকে আর আল্লা হেদায়েৎ করবেন না।

নওয়াস। তোমাকে শয়তান পথ দেখায়।

আতাহিয়া। কেন?

নওয়াস। শয়তানের পথ মৃত্যুর পথ। জীবনের সড়ক আলাদা। তুমি শুধু মৃত্যুর কথাই বলো।

আতাহিয়া। তুমি ত মরুভূমির মধ্যে জীবনকে খুঁজছো।

নওয়াস। মোটেই না। আমার সেই কবিতা পড়ো নি, আতাহিয়া?

আতাহিয়া। কোন কবিতা নওয়াস?

নওয়াস। বলছি, শোন।

বেদুইনদের মাঝখানে বৃথা কর আনন্দ-সন্ধান।
কিবা ভোগ করে তারা, যারা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর লোক?
থাক্ ওরা ওইখানে, বসে খুব উষ্ট্রদুগ্ধ খাক;
যারা কভু শেখেনি কো সূক্ষ্ম প্রাণ-উপভোগ।।

আতাহিয়া। একে বুঝি বলে মরুভূমিতে জীবন-সন্ধান?

নওয়াস। তুমি আজকাল আর্বী ভুলে যাচ্ছ, আতাহিয়া। না, আমার কবিতা বুঝতে তোমার কষ্ট হয়?

আতাহিয়া। তার চেয়ে বলো না কেন আমি আমার ওয়ালেদের (বাপ) নাম ভুলে যাচ্ছি।

নওয়াস। তবে ভুল তুমি করো। বুদ্ধি আর বোধি—আক্কেল আর উপভোগ, দুই-ই জীবনে দরকার। কারণ, ইন্দ্রিয়ের পথ আবার বোধিরও পথ। যে মুহূর্তে তুমি একটা বন্ধ করবে, অন্যটা-ও থেমে যাবে। তখন তুমি আর গোটা ইন্‌সান (পূর্ণ মানব) নও।

শাকী, পানপাত্র ভরে দাও মদিরাধারায়
অন্ধকারে কেন? এসো আলোর সভায়।।
বিনা পানে নিরানন্দ শুষ্ক অভিশপ্ত ক্ষণ।
মাতালের মত টলি—সেই ত অমূল্য জীবন।।

আর আতাহিয়া, সেই জায়গায় তুমি কি লিখছো?

'জাম' ঘিরে বসিয়াছে যত সব মওজী ইন্‌সান,
দুনিয়ার হাত থেকে করে তারা মৃত্যু-মদ্য পান।।

ছোঃ—এটা কি কবির কথা?

আতাহিয়া। শোন, নওয়াস। কবিতা তোমার চেয়ে খারাপ না লিখলেও কথায় পারব না।

নওয়াস। ও কথা ছাড়ো। তুমি মেহ্‌দীর বাঁদী উৎবা-র প্রেমে পড়েছিলে?

আতাহিয়া। পড়েছিলাম।

নওয়াস। কেন?

আতাহিয়া। তা জানি নে।

নওয়াস। তখন তুমি জীবনকে খুঁজেছিলে। প্রেমের পথ, ভোগের পথ, উপভোগের পথ, জীবনের পথ, সব এক জায়গায় বহু সর্প-মিথুনের জড়াজড়ির মত। ওকে আলাদা করতে যেয়ো না, বন্ধু।

আতাহিয়া। আজ অনেক খামর (শরাব) টেনেছো মনে হচ্ছে।

নওয়াস। তা ত বটেই। শোনো, তোমাকে আমাকে তফাৎ কি জানো?

আতাহিয়া। কি তফাৎ?

নওয়াস। আমি আঙুর ফ ল খাই, আর তুমি? তুমি দ্রাক্ষালতা চিবোও। আর মনে মনে বলো, আঙুর যখন এমন মিষ্টি, দেখা যাক্ ওর আসল মাদ্দা বা উৎসটা কেমন? একটু চিবোই।

আতাহিয়া। নওয়াস, তুমি আজ বিলকুল শরাবী।

নওয়াস। আতাহিয়া, একটা গল্প শোনো।

আতাহিয়া। বলো।

নওয়াস। তখন আমি কুফা শহরে। এক বাঁদীর আশ্‌নায়ের জালে ধরা পড়ে গেলাম।

আতাহিয়া। তোমার মত পাকা মৎস্য?

নওয়াস। কথায় বাধা দিও না। প্রেমে আর খাদে তফাৎ নেই, পড়ে গেলাম। সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই। যাক্ অনেক ঘোরাফেরা কান্নাকাটি আরজী মিনতি অগয়রহের পর আমার মহ্‌বুবা (দয়িতা) ওলিদা-কে পেলাম। শোনো, ওর সদ্‌রিয়া (জামা বিশেষ) খুলে আমি ত বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম। এমন সুগঠিত তীক্ষ্ণ-বোঁটা স্তন আমি, খোদার কসম আর জীবনে দেখিনি। ছেলেরা কেতাব পড়ে তিন্‌কা দিয়ে। অক্ষরের কাতার ঠিক রাখার জন্যে। এ ঠিক সেই তিন্‌কার মত। ভাবলাম, এটা হাতে থাকলে আমি আর জীবনে কাতারভ্রষ্ট হব না অর্থাৎ গোনাহ্‌র পথে অসৎ পথে পড়ব না। আল্লার মেহেরবানী, এমন তিন্‌কা জুটিয়ে দিয়েছেন, জীবনের কেতাব পড়তে আমার আর ভুল হবে না। আরো শোনো। সেই অবস্থায় আমি কোথায় তিন্‌কা হাতে গ্রহণ করব, তা না, আমার মাথা ঝুঁকে গেল। আমি সীনার ঠিক নীচে নরম ত্বকের উপর ঠোঁট রাখলাম। লোকে পা চুমে, কদম-বুসী করে, আমি করে বসলাম স্তন-বুসী, সীনা-বুসী,—যা বলো।

আতাহিয়া। হাহ্ হা, আবু নওয়াস। মারহাবা। ইয়া আবু নওয়াস। আহ্‌লান সাহ্লান, ইয়া নওয়াস। মাইয়োকেলা হাজিহিল কালাম ইল্লা আবু নওয়াস—আবু নওয়াস ছাড়া কে আর এমন কথা বলতে পারবে? হাহ্ হা হাহ্ হা...

নওয়াস। আহ্, আমার পিঠে এতো থাপ্‌ড়াচ্ছো কেন, আতাহিয়া? তোমার হাসি থামাও, নচেৎ এখনই তোমার আঁৎড়ী বেরিয়ে পড়বে। আর এতো হেসো না, এখনই আমিরুল মুমেনীন তা কিনে নেবেন।

আতাহিয়া। আহ্ আবু নওয়াস। আর একটু হেসে নিতে দাও। পেটে কুলুপ লেগে গেল। .....আমিরুল মুমেনীন আজকাল হাসির সওদাগরি করেন না কি?

নওয়াস। তুমি জানো না?

আতাহিয়া। না।

নওয়াস। হাসির অনেক দাম। লাখ দীরহামেরও বেশি।

আতাহিয়া। সত্যি?

নওয়াস। কাল তিনি তোমাকে আমার মারফৎ দাওয়াৎ দিয়েছেন। গোলামের হাসি শুনতে যাবো। আবু ইস্‌হাক থাকবে। খানাপিনা গান বাজ্‌না সব আছে।

আতাহিয়া। আলহাম্‌দোলিল্লাহ্।

নওয়াস চলো, অনেক রাত হয়ে গেছে। সরাইখানা বন্ধ। সড়কে লোকজন কম। তার উপর অন্ধকার।

আতাহিয়া। তোমার ভয় কী? তোমার ত তিন্‌কা আছে।

দুই কবি হেসে উঠল জনশূন্য সড়কের উপর। প্রতিধ্বনি দূরে সহজে অস্তিত্ব হারায় না। নিদ্রিত মহানগরী বগ্‌দাদ। তার দুই কবি শুধু জেগে ছিল। জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কবিতা কি কখনও বিশ্রাম নিতে পারে?

১১

বেগম জুবায়দা, আপনার পাঁজর কি রিক্ত? নৈশ হাহাশ্বাসের মুখে দজ্‌লার উপরের দিকে চেয়ে, প্রতীক্ষার দুর্ভেদ্য অরণ্যে পদধ্বনি শুনে লাভ নেই। বক্ষে বক্ষ, সীনা-ব-সীনার সাধনা সন্ন্যাসিনী জানে না। তাই তারা কৃচ্ছ্রতা আর আত্মনিগ্রহের জোয়ালে প্রতারিত যৌবনের আরশীতে বিবেকের প্রতিফলন দেখতে চায়। বিকৃত ইচ্ছা তাদের কাছেই আনন্দের মরীচিকা। গতিহীনতার দুর্গন্ধ, স্বর্গীয় সৌরভ মনে হয় নাসিকার নিঃসাড় সড়কে। মেহেরজান আপনার কাছে ফিরে আসবে না হৃদয়ে উত্তাপ দিতে। না-ই আসুক। আপনার তৃষ্ণার্ত দুই চোখ আত্মার সোপান গ'ড়ে তুলুক কল্পনায়। কল্পনা ত মিথ্যা হয়ে যায় না। মহাকাল তাকে বরণ করে। নির্জনতা-বিহারী মেহেরজান, নাই বা এলো কোলাহলের জোয়ারের মত। বিশাল আকাশ। তাই ত নক্ষত্রেরা নিঃসঙ্গ। আপনার প্রাণের অসীমতায় শুধু দুটি শুকতারা জেগে থাক্।

আদাব, বেগম সাহেবা।

১২

তাতারীর বাগিচা।

কার্পেট-শোভিত কক্ষ। বিশেষভাবে আজ আলোকসজ্জার পরিপাটী দেখা যায়। তার কোণে চারটি সামাদান জ্বলছে। উপরে ঝাড়বাতি। তাকিয়া, গের্দা চারিদিকে সাজানো। কক্ষের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন একটি বারান্দা। এখানে তাতারী কক্ষের ভেতরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরিধানে পাজামা পিরহান।

বাগান থেকে ফুলের খোশবু এই কামরা পর্যন্ত ধাওয়া করে। তবু মাঝে মাঝে দ্রাক্ষারস-সৌরভের কাছে পেছিয়ে যেতে হয়। তিন চার জন শাকী জাম্ ও পেয়ালা হাতে প্রতীক্ষমান।

হারুন। তাতারী!

তাতারী। আলম্পানা।

হারুন। ওখানে কেন? আজ আমরা তোমার মেহ্মান। এই দ্যাখো, কত শরীফ মানুষ এসেছে তোমার বাগিচায়। আবু নওয়াস, আবুল আতাহিয়া, আবু ইস্হাক। এদের যেমন দরবারে তেমনি নিজের মকানে পাওয়া নসীবের কথা। তুমি ভুলে যাও না কেন তুমি আর গোলাম নও। এসো, এসো।

তাতারী। জাঁহাপনা.....

হারুন। খানাপিনা যথেষ্ট হয়েচে। আবু নওয়াস আর মাটিতে পা ফেল্‌বে না। কি বলো, আতাহিয়া?

আতাহিয়া। জাঁহাপনা, আবু নওয়াস সব সময় মাথায় হাঁটে। ও আর কখনই বা পা ব্যবহার করে?

হারুন। কিন্তু আজ কদম টলটলমান।

আতাহিয়া। জাঁহাপনা, ওর খোঁয়ারী এসে গেছে। এই নওয়াস।

নওয়াস। জী।

আতাহিয়া। ঘুমোচ্চ কেন? হাসি শুনবে না?

নওয়াস। আতাহিয়া, তুমি আমার লেজ ছাড়া আর কিছু নও। কিন্তু দুম্বার লেজ বেজায় ভারী।

আতহিয়া। আমিরুল মুমেনীন, আপনি সাক্ষী থাকুন। নিজের মুখে স্বীকার করেছে, আবু নওয়াস একটা দুম্বা।

নওয়াস। আতাহিয়া, হুজুরের সাম্‌নে বেয়াদবি করো না। তুমি তা হলে মেনে নিচ্ছো, তুমি একটা লেজ।

আতাহিয়া। তুমি দুম্বা হলে, আমার লেজ হতে আপত্তি নেই।

নওয়াস। দু....ম্....বা....লেজ। দুম্ বা লেজ।

আতাহিয়া। আবু নওয়াস, তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

হারুন। থামো দুই জনে। তোমাদের কবিদের সঙ্গ মাঝে মাঝে আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করে তোলে। খালি কথা আর কথা। তাতারী, এরা এসেছে তোমার হাসি শুনতে। একবার সেই হাসি—বিশ্বজয়ী হাসি—শুনিয়ে দাও ত। এই নওয়াস....

নওয়াস। জাঁহাপনা।

হারুন। চোখ খোলো।

নওয়াস। আস্‌সামায়ো তায়তান।

হারুন। হ্যাঁ, তাতারী, তোমার হাসি শুনিয়ে দাও। কী.....? এখানে লজ্জা পাচ্ছো। ঐ বারান্দায় গিয়েই হাসি শুনিয়ে দাও।

তাতারী। জাঁহাপনা।

হারুন। কী বলো।

তাতারী। হাস্‌তে পারছি না, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন। তুমি কি আবু নওয়াসের মত পানিতে ডুবে আছো?

তাতারী। না, জাঁহাপনা। আপনি দেখেছেন, ও পানি আমি স্পর্শ করি না।

হারুন। তবে হাস্‌বে না যে।

তাতারী। আলম্পানা, হাসি আসছে না।

হারুন। আবু ইস্‌হাক, একে হাসির দাওয়াই দাও।

ইস্‌হাক। জাঁহাপনা, ও এখনি হাস্‌বে। এই হাসো ত হে।

তাতারী। হাসতে পারছি না, জনাব আবু নওয়াস।

হারুন। আমি খোদ আমিরুল মুমেনীন হুকুম দিচ্ছি, তুমি হাসো। তোমার হাসি আমরা শুনতে চাই। হাসি শোনার জন্যে এদের ডেকে এনেছি। বেইজ্জৎ হব?

সময়ের ভারের কাছে হিমালয় পরাজয় স্বীকার করে। এখানে মহাকাল স্বয়ং অনড়। সকলের নিঃশ্বাস ভারী। কামরায় সকলে নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি একজনের দুই ঠোঁটের উপর নিবদ্ধ। কাল হয়তো এখানেই থেমে থাক্‌ত, যদি না হারুনর রশীদ হঠাৎ গর্জে উঠতেন।

হারুন। হাসো।......কি এখনও হাসছো না?

তাতারী। জাঁহাপনা।

হারুন। আমাকে বহু মানুষ জাঁহাপনা বলে, তোমার কাছ থেকে ও ডাক শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই হাসি।

তাতারী। জাঁহাপনা।

হারুন। বুঝেছি। তুমি হাসবে না। তুমি আমাকে বন্ধুদের সামনে বেইজ্জৎ করতে চাও। মশ্‌রুর....

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, এই নাফরমান বান্দার গর্দান এখনই দু-টুকরো করি।

আতাহিয়া। জাঁহাপনা.....

হারুন। কি আবুল আতাহিয়া, তুমি আবার কি বলতে চাও।

আতাহিয়া। জিল্লুল্লাহ্ এখনই ওর সাজা দেবেন না।

হারুন। কেন?

তাতারী। আলম্পানা, কারণ—এত খানাপিনা আর গান বাজনা আর হাসির পর, একদা-গোলামের হাসি না শুনলেও চলবে।

হারুন। আতাহিয়া, তুমি চুপ্ করো। মশ্‌রুর—

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা—

হারুন। তলওয়ার খোলো। দেরি করছ কেন?

নওয়াস। আলম্পানা, আলম্পানা......আমি কবি আপনি জানেন। নাফরমানের গর্দান নেওয়া উচিত। কিন্তু এর অপরাধ কতটুকু বিচার করে দেখা হোক্। ও হাস্‌ছে না। কিন্তু হাসির জন্য ওয়াক্ত লাগে, যেমন নামাজের জন্য প্রয়োজন হয়।

হারুন। আবু নওয়াস, তোমার কবিত্বের খোর্মা এখন গাছে ঝুলিয়ে রাখো। ওয়াক্ত লাগে? সময় লাগে?

আতাহিয়া। হাঁ, জাঁহাপনা। সব সময় হাসি আসে না।

নওয়াস। আমি ত আপনাকে, নুরুল্লাহ্ আগেই বলেছি, উপাদান লাগে।

হারুন। আবু নওয়াস, তুমি হুঁসে আছো তা হলে।

নওয়াস। আলম্পানা, হুঁসে থাকার জন্যই আমি বেহুঁস হই। আল্খামারো লী কামারান্। সুরা আমার কাছে আকাশের চাঁদ।

হারুন। কি বল্‌তে চাও তুমি, আবু নওয়াস? সাফ্-সাফ্ বলো।

নওয়াস। আস্‌সামায়ো তায়তান। হুজুর, দুনিয়ায় কত দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুন-খারাবি, ঝগড়া-কোন্দল, লোভ মোহ মাৎসর্য। এ সব কি দেখা যায় চোখে? বেহুঁস থাকাই ভাল। আমার ওই হুঁস আছে বলেই আমি বেহুঁস থাকতে চাই। আর যাদের সে হুঁস নেই অর্থাৎ যারা বেহুঁস তারা হুঁসে থাকে। অর্থাৎ— মোদ্দা কথা, যারা বেহুঁস তারা হুঁসে থাকে, আর যারা হুঁসে তাকে তারা বেহুঁস। দুনিয়ার তাবৎ লড়াইবাজ দাঙ্গাবাজ ফেরেব্বাজ আওরৎবাজ ঘোড়াবাজ মরদ্‌বাজ নিজেদের ভয়ানক হুঁসিয়ার মনে করে।

হারুন। নওয়াস, তুমি যে কী বলছ, আমার ও বোঝার সাধ্য নেই। মরদ্‌বাজ আবার কি? আরগুলো থোড়াবহুৎ বুঝি।

নওয়াস। আলম্পানা, সেই লুৎ-আলয়হেস্ সালামের জমানায়—

(সকলে। হা-হ্ হা-হ্ হা। হা হ্ হা হ্ হা হ্)

হারুন। আবুল আতাহিয়া, তোমাদের মত কবি এবং বাদক সঙ্গে থাকলে আর খেলাফৎ চলবে না। মশ্‌রুর, তোমার তলওয়ার নামাও। কিন্তু মনে রেখো, তাতারী, তোমাকে যা দিয়েছি, তা আর কেউ পেলে আবার আমার গোলাম হতে চাইত। এত বাগ্‌বাগিচা বান্দী গোলাম ধনদৌলত। খবরদার আর নেমক-হারামির অপবাদ নিজের মাথায় ঢালবে না। আজ তোমাকে মাফ করলাম। কয়েকদিন পর আবার আসছি, তোমার হাসি আমরা শুনব। মনে রেখো......।

১৩

কালো রাত্রি। মজকুর জায়গা। পরিচিত বাগিচা। ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা গেল। অনেকক্ষণ। হয়ত কয়েক শতাব্দী। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সময়ের পাখনা ছিঁড়ে যায়। শতাব্দী মুহূর্তের মধ্যে গুহায়িত হয়।

ঘুঙুরের আওয়াজ থেমে গেল। তারপর রুম্‌ঝুম রিনিঠিনি রব ওঠে। সে শুধু পা ফেলার অনুষঙ্গ হিসাবে। যে পায়ে ঘুঙুর এতক্ষণ মুখর ছিল, সেই যুগল চরণ এখন হাঁটার কাজে নিয়োজিত।

রুম্‌ঝুম্ ......রুম্‌ঝুম .....রিনিঠিনি...... হঠাৎ সেই শব্দও নির্বাপিত।

তাতারী হঠাৎ চকিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলে, "তুমি কে....তুমি কে? কে তোমাকে এখানে পাঠালে?"

—জনাব তাতারী, বান্দীকে মাফ করবেন, আমার নাম বুসায়না। আমাকে আমিরুল মুমেনীন পাঠিয়েছেন।

তাতারী। তুমি কে?

বুসায়না। আমার নাম বগ্‌দাদে জানে না, এমন ইন্‌সান ত কম আছে। আমি রোক্কাসা (নর্তকী) বুসায়না।

তাতারী। কি চাও?

বুসায়না। খলিফার হুকুম, আমি যেন আপনার খেদমৎ করতে পারি।

তাতারী। বুসায়না, খেদমতের জন্য এখানে বান্দা-বান্দী আছে।

বুসায়না। কিন্তু তারা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না। আপনার মুখের হাসি কে যেন কেড়ে নিয়েছে। আমি এসেছি আপনার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে।

তাতারী। বুসায়না, তাই কী তোমার এই লেবাস?

বুসায়না। কি দেখলেন, জনাব?

তাতারী। লেবাস দেহ-আবরণের জন্য। তোমার লেবাস দেহ উলঙ্গার্থে। এর সাহায্যে তুমি আমাকে আনন্দ দেবে?

বুসায়না। জনাব, রোক্কাসা আপনাকে জাগিয়ে তুলবে।

তাতারী। তার চেয়ে তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যাও, বুসায়না, তোমার মেহেরবানী কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার চোখে ঘুম নে ই। ঘুমের ঘোরে থাকি। কিন্তু শিরা-উপশিরা বিশ্রাম নিতে পারে না। কণ্টক-মুকুট মাথায় হজরত ঈসা, যীশুখ্রীষ্ট অমর। আমার কণ্টক-শয্যা আমাকে কি দেবে?

বুসায়না। খলিফা সেইজন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার কালো ঠোঁট বর্ষার কালো মেঘের মত। ওতে চুম্বনের বিদ্যুৎই শুধু শোভা পায়।

তাতারী। না। সরে যাও, বুসায়না। তুমি আমাকে বেইজ্জৎ করতে এগিয়ো না।

বুসায়না। বান্দীর গোনা মাফ করবেন, জনাব।

তাতারী। তুমি আমার পাশ থেকে সরে ঐ দিওয়ানে বসো।

বুসায়না। কেন?

তাতারী। তুমি আমাকে আনন্দ দিতে পারবে না।

বুসায়না। সমস্ত বগ্‌দাদ শহর বুসায়নার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর আপনার মুখে এই কথা?

তাতারী। আনন্দের উপকরণ তোমার কাছে নেই।

বুসায়না। কেন নেই?

তাতারী। মানবীর যৌবনই কি যথেষ্ট? তাহলে জননী-রূপে সে কিরূপে মর্যাদা পায়? ও কি। তোমার সদ্‌রিয়া খুলে ফেলছ কেন? জানো, জননীর খোলা স্তন বহুদিন আমি পান করেছি। বুঝলাম, তোমার তূণে আদিম কয়েকটা শর আছে মাত্র।

বুসায়না। জনাব, এগিয়ে আসুন। নতজানু এক নারী আপনাকে আহ্বান দিচ্ছে। আমার এই যৌবনকে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না।

তাতারী। বুসায়না, তুমি ত মোড়-জানু। অঙ্গসন্ধিক্ষণে আনন্দ আহরণ আমার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়—জন্তুদের কাছেও না। আমি মানুষ। আমার মন প্রয়োজন হয়।

বুসায়না। সে মন এখন প্রয়োজন নয় কেন?

তাতারী। বুসায়না, সময়ও মানুষের সৃষ্টি। মানুষ আছে বলেই সময় আছে। সময়েরও প্রয়োজন হয়।

বুসায়না। সে সময় এখন নয়?

তাতারী। না, তোমার খোলা বুক ওড়নায় ঢাকো। নারীর বিবসনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হওয়ার অধিকার আছে। তাও শুধু প্রেমে। একটি মানুষ যার সান্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অর্থবান হয়—তেমন মানুষের জন্যে। জমিন-দরদী দেহ্‌কান (চাষী) যেমন নহরের পানি নিজের জমির জন্য বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে, প্রেমিকা নারী তেমনই সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ একটি হৃদয়ের জন্যই সঞ্চিত রাখে। তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও ত সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সস্তা নয়— যে নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতির শিশুকে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে—যে নারী শাশ্বত মানবতার জননী—বসুন্ধরার অন্তত অঙ্গীকার, সে অত সস্তা হয় না, বুসায়না। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছো। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তারাও পৃথিবীর ঠিকানা জানে না।

বুসায়না। আমাকে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না।

তাতারী। না বুসায়না। প্রতিদিন কিছু দীরহাম ছুঁড়ে ফেলে, যারা তোমাকে বেইজ্জৎ করে আমি তাদের মত তোমাদের অসম্মান করতে শিখিনি। আমি গোলাম। দীরহাম দিয়ে সব কিছু কেনার পাগলামি থেকে অন্তত আল্লা আমাকে রেহাই দিয়েছেন।

বুসায়না। না, জনাব, আপনি গোলাম নন। অতীতের কথা ভুলে যান। আপনি আমাকে ইজ্জত-আব্রুই দিয়েছেন। কিন্তু তার বদৌলত...

তাতারী। কাঁদছো কেন, বুসায়না। কারো চোখের পানি—আর সে পানি যদি শিশু কি আওরতের হয়, আমি সহ্য করতে পারি না। কাঁদছো কেন?

বুসায়না। জনাব....

তাতারী। কি বলো।

বুসায়না। জনাব, বুসায়নার পায়ের তলায় বগ্‌দাদের অমির-ওমরাদের ফরজন্দ্‌রা কত চোখের পানি ফেলে যায়। দরবারের ষড়যন্ত্র, ঈর্ষা, দবদবা, লোভে-থকা, বিবি-ক্লান্ত কত আমির রঈস বুসায়নার পয়জারে হাঁফ ছাড়তে আসে—সেই রোক্কাসা আজ কাঁদছি না, হাসছি।

তাতারী। কিন্তু হাসি তোমাকে প্রতারণা করছে।

বুসায়না। কাঁদছি। হ্যাঁ, কাঁদছি। কারণ এই বয়সে ধন-দৌলতের আল বুরুজ পাহাড়ে উঠে, কেউ মৃত্যু চোখে দেখতে চায় না।

তাতারী। মৃত্যু?

বুসায়না। হাঁ, মৃত্যু। কাল ফজরে, আপনার বাগিচায় আমি কতল হয়ে যাব। মশ্‌রুরের তলওয়ারের তেজ একটি নারীর হল্‌কুম (গ্রীবা) ছেদে অপারগ তা উম্মাদও বিশ্বাস করবে না।

তাতারী। কিন্তু মশ্‌রুর তোমাকে কতল করবে কেন?

বুসায়না। খলিফার হুকুম। আমিরুল মুমেনীন বলেছেন, আমি যদি আপনার খেদমত করতে না পারি, ফজরে আমার গর্দান যাবে।

তাতারী। তুমি এই বাজি ধরলে কেন?

বুসায়না। আত্মবিশ্বাস ছিল। সমস্ত বগ্দাদ আজ লোভের দরিয়া। এখানে কে শুষ্ক থাকতে পারে? শান্শওকত, দব্দবা তারই শিকার সমস্ত মানুষ তারা কোনদিন মানুষ ছিল ভুলে গেছে। আমি ত বগ্দাদের বাসিন্দা। আমি আর নতুন কি হবো? তাই আত্মবিশ্বাস ছিল। আর থাকবে না বা কেন? কত আমীর ওমরা দেখ্লাম। কাঁচা দীরহাম আর কাঁচা গোশ্তের খরিদ্দার। কতজনকে ফতে করলাম। তার জন্য ইলেম লাগে না, সাধনা লাগে না।—একটু হাসি, একটু লেবাস এদিক-ওদিক। ধনদৌলত বিনা মেহ্নতে আসে। এখানেও বিনা মেহনৎ। শুধু জয় আর জয়। বাজি ধরেছিলাম। হেরে গেছি। কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) দেব বৈকি। আর কাঁদব না।

তাতারী। কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দেব না।

বুসায়না। কেন?

তাতারী। তুমি মহীয়সী নারী। হয়ত বাঁচার খাতিরে বগ্দাদের ঐ দরিয়ায় ডুব দিয়েছিলে। কিন্তু সামান্য ভাসমান কাঠের টুকরো দেখে তুমি মাটির মানুষ, ডাঙায় ওঠার চেষ্টা পাচ্ছো। তোমাকে মরতে দেওয়া পাপ।

বুসায়না। কিন্তু কে আমাকে বাঁচাবে? আপনাকে আর বেইজ্জৎ করতে পারব না।

তাতারী। সেইজন্যেই ত সোজা উপায় পেয়ে গেছি।

বুসায়না। সোজা?

তাতারী। হ্যাঁ, বুসায়না, তুমিও আমার মত আত্মার ব্যাধিগ্রস্ত। ঐ দেওয়ালে তলওয়ার লট্কানো—আমাকে কতল করো। এ জায়গা আমার কাছে অসহ্য, শ্বাসরোধী।

বুসায়না। তাহলে পালিয়ে যান্ না কেন? আপনি ত গোলাম নন।

তাতারী। বাহ্ হা, বুসায়না। এই ধনদৌলত দেখে সেই রাতে ভুলে ছিলাম। পরে সব বুঝে ভাবলাম, পালাই! বাদ মগ্রেব শহরের ফটক থেকে বেরুতে যাব, দেখ্লাম সান্ত্রী। বললে, এই শহরের বাইরে যেতে পারবেন না, খলিফার হুকুম। আমি কেমন স্বাধীন, বুঝেছো বুসায়না? এই বান্দী বান্দা মুজরানী ইমারতের মধ্যে আমি স্বাধীন। একটা মোরগকে কতগুলো মুরগীর সঙ্গে খুল্লার মধ্যে রেখে দেওয়ার মত। তোমার মেহেরবানী আমি কেয়ামত তক্, রোজ হাশরের দিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না। আমাকে কতল করো। এই নাও তলওয়ার।

বুসায়না। না বেরাদর, আপনাকে মরতে দিতে পারব না। বগ্দাদের সাহারার মধ্যে এই একটি ওয়েসীস আমি পেয়েছি, তা নাস্তানাবুদ করতে পারব না।

তাতারী। তবে?

বুসায়না। সব মাথায় পেতে নেব। কত কালিমা ত সারা জীবন বইলাম। খুনে তা সাফ হতে পারে। আসুক মশ্রুর, তার জন্য অপেক্ষা করব।

তাতারী।	না, বুসায়না। জীবন অনেক মূল্যবান। তাই আত্মহত্যা করি নি। আত্মহত্যা ভীরু বুজ্‌দীলের কাজ। মানুষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে পিছু হটে না। জন্তুরা যেমন লেজ গুটিয়ে পালায়, তেমন পালায় না। কিন্তু বুসায়না, তোমার আত্মার সন্ধান আমি পেয়েছি। তুমি এখান থেকে যেয়ো না। আমি কাল ফজরে জবাব দেব, হয়তা মুখ হাসিশূন্য। কিন্তু জবাব দেব আমি। মশ্‌রুর......। একি, বুসায়না কোথায় গেল?......মোহাফেজ........মোহাফেজ.......
তাতারী।	বুসায়না কোথা গেল?
মোহফেজ।	এই ত এখানে ছিল।
তাতারী।	দ্যাখো, কোথায় গেল। ওর পায়ে ঘুঙুর আছে। যেখানে যাবে, বাজবে।
মোহাফেজ।	ঘুঙুর? ঐ ত পড়ে আছে গালিচার উপর।
তাতারী।	কখন খুললে, আশ্চর্য! যাও, ওর খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো।
মোহাফেজ।	যো হুকুম, হুজুর।

১৪

সরাইখানায় তারা গজল শুনছিল।

কত দূর থেকে আসে লু-হাওয়ার তীর
সে কি তোমার নিঃশ্বাস শাকী,
আমার কদমে জিঞ্জির।।
কত আমীর তোমার উমেদার
এ দীল সংগেসার, বেকারার
সুমসাম রাতে আহাজারী সার,
পাথরে কুটা ফুটা শির।।
আমার কদমে জিঞ্জির।।

রুবাবের আওয়াজ শুধু এই স্বরে বিষণ্ণতার আমেজ ছুঁইয়ে যায়। বগ্‌দাদের সরাইখানা অন্ধকার। গায়ক হয়ত আদেশ দিয়েছিল আলো নিভিয়ে দিতে।

গজল অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। যেন আজ আর শেষ হবে না। শ্রোতারা বুঁদ। বিরহীর আর্তনাদ সকলের বুকে জারিয়ে গেছে। এখানে সবাই প্রেমিক। ঝাপ্‌সা অন্ধকারে শুধু বহু মানুষের আন্দাজ পাওয়া যায়।

হঠাৎ একজন হো হো শব্দে চতুর্দিক সচকিত করে হেসে উঠল।

আসরে ফাটল দেখা যায়, তাই বহু শ্রোতাই বিরক্ত!

সত্যি গায়কের গজল থেমে গেল পরিবেশ মোতাবেক। তার কণ্ঠ থেকে আর রাগ বেরোয় না—যা রাগিণীর পুরুষ রূপ। গোস্বাধৃত তার গলার আওয়াজ।

—আবুল আতাহিয়া, বেয়াদবের মত হাস্‌ছো কেন?

—আবু নওয়াস, মাথায় জমজমের ঠাণ্ডা পানি ঢালো।

নওয়াস। এমন গজলটা ধরেছিলাম। সব জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলে।

আতাহিয়া। তার মালিক তো স্রেফ আল্লা। আমি তো বান্দা।

নওয়াস। তোমার এমন আক্কেল বলেই তো তেমনি কবিতা লেখো।

আতাহিয়া। তোমার আক্কেল আছে, স্মৃতিশক্তি আছে?

নওয়াস। আল্লা মাথার খুলিটা এখনও শূন্য করে নেন নি।

আতাহিয়া। নিয়েছে। টের পাও নি।

নওয়াস। দ্যাখো, এখনই লড়াই বেধে যাবে।

আতাহিয়া। তা তো বাধবেই। নাদানকে নাদান বল্‌লেই, তার গলা থেকে গান বেরোয় না।

নওয়াস। আমি নাদান?

আতাহিয়া। প্রায়। পুরো নয়। সেদিন যে বললে, তুমি জীবনের কবি, জীবনের গান গাও, আর আমি মৃত্যুর কবি, নিরাশাবাদী অগয়রহ। আরো কি কি বললে। আজ তুমি কি গজল গাইছ?

নওয়াস। উঃ, আবুল আতাহিয়া। তোমার মাথার খুলিটা হাকিম কে দিয়ে একবার দেখিয়ে নাও। ওটা খালি হয়ে গেছে, টের পাও নি।

আতাহিয়া। এই বুঝি জীবনের গান?

নওয়াস। বিরহে দুঃখ আছে। দুঃখ কি জীবনে আসে না? এতে জীবন-বহির্ভূত কি দেখলে?

আতাহিয়া। মৃত্যু কি জীবনে আসে না?

নাওয়াস। আসে। সে একবারমাত্র......তুমি যা করো?

নওয়াস। নওয়াস, দুঃখের গান গাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। আজ তুমি যে বিরহের গান গাইলে এমন মজা আর কোনদিন পাই নি। তোমার কবিতা ফিকে লাগে এর কাছে।

নওয়াস। আবুল আতাহিয়া, ভুল করো না। দুঃখ আর মৃত্যু এক জিনিস নয়। দুঃখের গান গাই দুঃখকে দূর করার জন্যে, দুঃখের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারব, তার জন্যে। যারা এই জীবন জীইয়ে তুলতে পারে না, তারা কবিতা লেখে শকুনদের জন্যে। পারশীরা শকুনের কাছে যেমন মড়া ফেলে দেয়, ওই কবিরা তেমন কবিতা ছুঁড়ে দেয় পাঠকদের জন্যে। আজান দিয়ে মুসল্লি ডাকে, তুমি কবিতা দিয়ে মানুষ ডাকার বন্দোবস্ত করো। তুমি—

আতাহিয়া। থামো, থামো। এলাম দু-দণ্ড মওজ করতে, তুমি কি যে কচ্‌কচ্‌ শুরু করে দিলে। তৌবাস্তাগ্‌ফেরুল্লা।

নওয়াস। শয়তান তোমার কাছাকাছি থাকে কি না, তাই তোমার বার বার আস্তাগ্‌ফেরুল্লা পড়তে হয়।

আতাহিয়া। হাহ্‌ হা, আমি তো শয়তানের কাছেই বসে আছি, ঠিক বলেছো।

নওয়াস। শয়তানই বিশ্বসৃষ্টির আগে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগ সাধন করেছিল। সেই যুক্তিই মানুষের সভ্যতার উন্নতির অন্যতম বড় উপাদান। মনে রেখো, আবুল আতাহিয়া। মাঝে মাঝে শয়তানেই হয়তো আসল মনুষ্যত্বের সূচনা ঘটে।

আতাহিয়া। শয়তানের যুক্তি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

নওয়াস। আতাহিয়া, যুক্তির পেছনে কি থাকে জানো?

আতাহিয়া। না।

নওয়াস। তা তোমার জানার কথা নয়। যুক্তির পেছনে থাকে মুক্তির স্বপ্ন। এই মুক্তির স্বপ্নই মানুষকে মানুষ বানায়। আমি তাই দুনিয়ার তামাসা ভাল করে দেখি।

আতাহিয়া। তুমি পাকা ইব্‌লিশ। আমি আকাশের দিকে তাকাই।

নওয়াস। শকুনেরা অনেক উপরে ওঠে। কিন্তু চোখটা ঠিক ভাগাড়ের দিকেই থাকে।

আতাহিয়া। নওয়াস, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায়। কারণ, চোর আর ছেনাল কারচুপিতে খুব বড়।

নওয়াস। আতাহিয়া, আজ কষে গালাগাল দাও। আমি আজ মওজে আছি। আমার আর এক মজ্‌লিশ বাকী আছে।

আতাহিয়া। তোমার সঙ্গে আজ রাত কাটাচ্ছি না।

নওয়াস। নীরস তুমি। মওজ দেখ্‌লে তোমার দীল বাতাসে কাঁপে। কিন্তু বন্ধু, জীবনকে খুঁজে পেতে হাটে হাটে ঘুরতে হয়।

আতাহিয়া। কিন্তু তুমি যে শুধু রূপের হাটে ঘুরে বেড়াও।

নওয়াস। রূপের হাটই আসল হাট। মানুষ যদি তা না আবিষ্কার করত, এই দুনিয়ায় বাঁচার আর কোন মজা থাকত না। ফুল তো বনে ফোটে। কিন্তু তাকে আমরা সাজিয়ে ফোটাতে চাই। তাই বাগান করি। রূপের নেশা থেকেই কাজের উৎপত্তি অথবা কাজ থেকে রূপের নেশার উৎপত্তি....আর কাজই সমস্ত সংসারকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার মত নিষ্কর্মারা আকাশের দিকে তাকায়। কাজে আর রূপে মিতালি পাতিয়েই তো ইন্‌সান এগোচ্ছে। যখন আর ওই দুই খোঁট একত্রে মেলাতে পারে না, তখনই মানুষ হয় ইব্‌লিশ। মুনাফেকীর (ভণ্ডামি) জন্ম সেইখানে।

আতাহিয়া। কিন্তু নওয়াস, জাহেলী (অজ্ঞতা) থেকেও তো মুনাফেকীর জন্ম হতে পারে।

নওয়াস। তা হয়। কিন্তু জাহেলী তো একটা তাসীর (ফল)। তুমি কেমন মা-বাপ-ইয়ার-দোস্ত-মুল্লুকে মানুষ, তার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে।

আতাহিয়া। কিন্তু এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নওয়াস। কেন?

আতাহিয়া। এলাম দু-দণ্ড মওজ করব। তুমি গান করবে, আমি গান শুনব। সে জায়গায় এসব কি শুরু করলে?

নওয়াস। রুহ্‌-সাফা (আত্মা-পরিষ্কার) পানি ত তোমার জঠরে যায় না, তাই আমার জায়গাটা তোমার ঠিকানা মত নয়।

আতাহিয়া। না, ইয়ার। আবার গজল গাও।

নওয়াস। কিন্তু গজল আর জমবে না।

আতাহিয়া। কেন?

নওয়াস।	কল্পনার বোররাকে (স্বর্গীয় বাহন) চড়ে, তুমি দুনিয়ার তাবৎ সুলতানার (রানী) সঙ্গে 'জেনা' ব্যভিচার করতে পারো, আর এ খাহেশও স্বাভাবিক। কিন্তু মাটির উপর পড়লে, বিবিরও মত নিতে হয়।
আতাহিয়া	লা-হাওলা, লা-হাওলা। বাঁচাও প্রভু শয়তান থেকে।
নওয়াস।	সত্যি।
আতাহিয়া।	কিন্তু আমি বলছি, তোমার কল্পনা যদি ভেঙে থাকে, জোড়া দাও।
নওয়াস।	তা আর সম্ভব নয়।
আতাহিয়া	দ্যাখো আবুল আতাহিয়া, তুমি আর যাই করো আমার সঙ্গে বাজি ধরো না। খোদ আমিরুল মুমেনীন আমার সঙ্গে বাজি ধরে প্রায় হারতে বসছেন।
আতাহিয়া।	তোমার সঙ্গে বাজি?
নওয়াস।	তারই ফয়সালা আছে কাল? পরে সব শুনবে। আজ থাক্, চলো ওঠা যাক্।
আতাহিয়া।	আবু নওয়াস, বগ্‌দাদ তোমাকে চেনে না, তাই তোমার এত বদ্‌নাম।
নওয়াস।	বন্ধু মহাপুরুষদের অনেক দেরিতে চেনা যায়। চল্লিশ বৎসর লেগে গিয়েছিল হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ)-কে জানতে। তাই বলে আমি একটা বিশেষ কিছু.....তা মনে করো না। এক দেশে বাদ্‌শার নাম ছিল হবু। মন্ত্রীর নাম গবু। মহাপুরুষেরা নবুয়ৎ (নবীত্ব) পায়, আমি এবার গবুয়ৎ পেয়ে যাব।
আতাহিয়া।	হা-হা-হা, আবু নওয়াস। তোমাকে ঠিক মত বুঝি না, তবু বুকে বুক মিলাতে ইচ্ছা করে।
নওয়াস।	খবরদার। এর নাম বুৎ-পরস্তি—প্রতিমা-পূজা। ও মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ধ্বংসের পথে। বুঝবে, তবে বুকে বুক মিলাবে। সব জিনিস তুমি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করবে, নচেৎ তুমিও বুৎ পরস্ত (প্রতিমা পূজক)—সে তুমি মুসলমানই হও আর ইহুদীই হও। না, আর কথা না। ওহে সরাইওয়ালা তোমার শরাবের দাম কাল নিও।
সরাইওয়ালা।	আচ্ছা জনাব। আসসালামো আলায়কুম।
উভয়ে।	আলায়কুম আস্‌সালাম।

১৫

বেগম জুবায়দা দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখান থেকে একদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল মেহেরজান। বাগানে তেমনই অন্ধকার। সাদা পাথরের রাস্তা হয়ত কিছুটা আভাস দিয়ে যায়। হয়ত মেহেরজান এই পথেই আবার ফিরে আসবে। মালে-গনীমতের মধ্যে এমন উপহার পাওয়া যায়? কথাটা একবার বেগমের মনে জাগল। তিনি পায়চারী করতে লাগলেন।

কালো বোরখা পরিহিতা এক নারী হঠাৎ পেছনে থেকে তাঁকে ডাক দিলে ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে।

— বেগম সাহেবা।

— কে তুতী?

— জী, বেগম সাহেবা।

তুতী মহলের ক্রীতদাসী। বোরখা খুলে ফেলেছে সে ততক্ষণে।

— কোন খবর পেলি?

— না বেগম সাহেবা। এই বিরাট মহল। যেখানে শত শত গোলাম আর বান্দী, সেখানে খবর পাওয়া মুসকিল।

— আমি ত আর কিছু চাই নেই। কেমন আছে, এইটুকু খবর পেলেই খুশি।

— বেগম সাহেবা, আপনি ওকে বড় ভালবাসতেন।

— তা ত বাসতাম। পরের দুঃখ মুছে নিতে পারলে রুহে (আত্মায়) কত যে শান্তি, তা যদি মানুষ জানত।

— বেগম সাহেবা, আপনি ফেরেশ্‌তা। বেহেশতের হুর দুনিয়ায় এসেছেন।

— যা, কি যে সব বলিস। পানির জন্য মানুষের কত কষ্ট। আমি একটা নহর কাটাব ঠিক করেছি।

— বেগম সাহেবা, সবাই আল্লার কাছে হাত তুলে আপনার জন্যে দোয়া মাঙবে।

— তুই মেহেরজানের খবর আনতে পারলি না।

— বেগম সাহেবা, এই মহলের ব্যাপার ত আপনি জানেন। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সকলে যে-যার স্বার্থ নিয়ে আছে। মেহেরজান.....এখানে নাও থাকতে পারে।

— হুঁ।

— তুই যা। খবরদার, এ-খবর কেউ না জানে।

— খোদার কসম, বেগম সাহেবা। আপনি মায়ের সমান। আমার কাছ থেকে কোন খবর আল্লার ফেরেশ্‌তা পর্যন্ত বের করতে পারবে না।

তুতী চলে গেল।

বেগম সাহেবা দাঁড়িয়ে রইলেন খাম্বার মতই অনড়। উৎকর্ণ। বাতাসের ঈষৎ শব্দ তাঁকে উচ্চকিত করে তোলে।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মেহেরজান। তাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তার একমাত্র দুশ্‌মন দুরন্ত যৌবন। সেই যা ভয়। নচেৎ এমন নিভাঁজ অন্ধকারেই ত সে ফিরে আসবে।

বেগম জুবায়দা বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

১৬

(মোহাফেজ এবং হারুনর রশীদ।)

— মোহাফেজ?

—আমিরুল মুমেনীন, আপনার বান্দা।

হারুন। গোলাম তাতারীর খবর কী? গোলাম এবার হাস্‌ছে?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপনা।

হারুন। এত দূর হিমাকৎ—আস্পর্ধা!

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, গোলাম চুপচাপই থাকে। আহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সে খবর দিতে আমি আসি নি।

হারুন। তবে তুমি কি খবর নিয়ে এসেছো?

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে!

হারুন। বুসায়না, আত্মহত্যা করেছে!

মোহাফেজ। বাগিচার এক গাছের ডালে ঝুলছিল, আজ বিকেলে দেখা গেল। আমরা কেউ খোঁজই পাই নি।

হারুন। বুসায়না আত্মহত্যা করেছে, না, গোলাম তাকে খুন করেছে?

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, সব খবর আমার জানা নেই। কাল রাত্রে তাতারী আমাকে ডেকে বললে বুসায়না কোথা গেল খোঁজ কর।

হারুন। বুসায়না, রাত্রে গোলামের কাছে ছিল না?

মোহাফেজ। না, জাঁহাপনা।

হারুন। মশ্রুর, মশ্রুর!

মশ্রুর। জাঁহাপনা।

হারুন। এখনই কোতোয়ালকে ডাকো। শুনেছো, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে।

মশ্রুর। এখনই শুনলাম।

হারুন। যাও, কোতোয়ালকে খুনের তদারক করতে বলো। আমি এখনই বাগিচায় যাব।

মশ্রুর। আস্‌সামায়ো তায়তান।

হারুন। মোহাফেজ, এতদূর আস্পর্ধা গোলামের। গোলামকে আবার গোলাম বানাব। তার দেহ টুকরো টুকরো করব না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিলে তিলে পশুপক্ষী পোকার আহার্য বানাব। হাবসী গোলামের এত সীনার জোর? মোহাফেজ...

মোহাফেজ। জিল্লুল্লাহ্।

হারুন। গোলাম এই খবর জানে?

মোহাফেজ। আলম্পানা, গোলামের কাছে এই খবর যাওয়া মাত্র সে ত পাগলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, তারপর দৌড়ে গেল সেই গাছের নীচে। অন্যান্য গোলামের সাহায্যে গাছ থেকে লাশ নামিয়ে সে ত ছাতিপেটা শুরু করল, আর হাউ হাউ কান্না। জামিনের উপর কি পটকান খাওয়া। বহেনের জন্যেও তো কেউ এমন করে না।

হারুন। তাজ্জব ব্যাপার। মশ্রুর ফজরে গিয়ে শুনে এসছিল, বুসায়না নিজের মাকানে ফিরে গেছে। মাকানেও ছিল না।

মোহাফেজ। জাঁহাপনা, গোলাম বুসায়নার গোসলের ব্যবস্থা করছে।

হারুন। কিন্তু সকালে মশ্রুরকে গোলাম বলেছিল, বুসায়নাকে সে জায়গা দেয় নি ঘরে।

মোহাফেজ। আলম্পানা, আল্লা এর মাজেরা জানে।

হারুন।	বাগিচায় আর কেউ আছে?
মোহাফেজ।	জাঁহাপনা, বগ্‌দাদে বুসায়নার রূপের খ্যাতি কে না শুনেছে। ধনদৌলতের রোশ্‌নাই-ও তার কম নয়। সমস্ত বগ্‌দাদ আজ বাগিচায় ভেঙে পড়ছে। লাশের পাশে পাগলের মত কাঁদছে আপনার গোলাম তাতারী।
হারুন।	মশ্‌রুর, কোতোয়াল পাঠিয়ে বাগানের ভিড় হটাও। আমি খোদ্ যাব।
মশ্‌রুর।	জাঁহাপনা, এই মোহাফেজকে বিদায় দিন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।
হারুন।	যাও, মোহাফেজ।
মোহাফেজ।	আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মুমেনীন।
মশ্‌রুর।	জাঁহাপনা, গোলাম খুন করে ওকে গাছে ঝুলিয়ে দেয় নি ত?
হারুন।	নিমকহারামকে দিয়ে কি না সম্ভব। গোলাম একটা পাথরের পিণ্ড ছাড়া আর কি। বুসায়না যে ওর কাছে ছিল না, তাও সত্য। মোহাফেজের জবানী তার প্রমাণ। হয়ত বুসায়না বাজি ধরে হেরে গিয়েছিল। তাই তোমার তলওয়ারের ভয়ে গাছে ঝুলেছে।
মশ্‌রুর।	ওর মাজেরা (রহস্য) আলেমুল গায়েবই জানেন।
হারুন।	চলো, সরেজমিন তদারক করা যাক। কিন্তু তার আগে মশ্‌রুর, সেই বান্দীর বাচ্চা, বান্দরের বাচ্চাকে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বলো। একদম 'হাবিয়া' কয়েদখানায়। পোকামাকড় বিচ্ছুর সঙ্গেই জিন্দেগানী চলার উপযুক্ত ও একটা কমিনা-কমজাত। নওয়াসের কাছে আমাকে বেইজ্জৎ করে ছাড়ছে। এত বেসুমার মালমাত্তার মালিক করে দিলাম। তবু গোলামের বাচ্চা হাসল না। তবে হাসি আমি আদায় করব। যাও, মশ্‌রুর। আমার প্রতিটি লফ্‌জ (শব্দ) যেন ঠিক ঠিক পালন হয়।
মশ্‌রুর।	আস্‌সামায়ো তায়তান।

১৭

আবু নওয়াস হাঁটছিল।

পাশে দজ্‌লা বয়ে চলেছে। মেঘে গোধূলির ঝিলিমিলি। এখানে শহর থেমে গেছে। বেবহা ময়দানের প্রারম্ভ। মরুভূমিই অংশবিশেষ। তবে এখানে আবাদ আছে। আর আছে কুর্মা গাছের সারি।

নদীর উপর গুফাদারেরা গুফা বেয়ে চলেছে। কোন কোন গুফাবোঝাই তরমুজ, তামাক, কফি। সন্ধ্যার আগে ঝাপ্‌সা স্তিমিত এই জীবনলীলার দিকে নওয়াসের কোন লক্ষ্য নেই। বালুতীর। খালি পায়ে হাঁটার জন্য মনোরম। নওয়াস তাই হাঁটছে। তীরে দজ্‌লার ঢেউ এসে লাগে, কখনও কখনও নওয়াসের পায়ে আছড়ে পড়ে। কবি একটু চমকায় মাত্র। তারপর হাঁটতে থাকে। কোন কিছুর দিকে তার আকর্ষণ নেই। উটের কাফেলা চলেছে দূরে দূরে। গোধূলির অন্ধকারে খেজুরবীথির পাশে পাশে এই দৃশ্য অবসরভোগীর আশীর্বাদ। কিন্তু নওয়াসের চোখ আজ কোন বস্তুর উপর এককভাবে বিদ্ধ হয় না। দৃষ্টি স্পর্শ করে, গ্রহণ করে না কিছুই।

নওয়াস যেন আজ অনন্তের মুসাফির। তাড়াহুড়া নেই, ক্ষিপ্রতা নেই। আরো-আরো কিছু আছে চোখে দেখার। তাই হঠাৎ একাগ্রতার প্রয়োজন বোধ লাগে না।

নওয়াস হাঁটছিল। দজ্‌লা ঈষৎ শান্ত, ঈষৎ নীরব। তবু মানুষের মেহনতের নানা পট তো সাজানো। নওয়াস তা দেখতে প্রস্তুত নয়।

মরুভূমির বুকে কি সে কোন পানশালার খোঁজ পেয়েছে? না, এই বালুর চাঁচর রাজ্যে পানি স্বপ্ন মাত্র। পানশালা ত বেহেশ্‌ত।

আর শহরের শ্রেষ্ঠ পানশালা ত সে ছেড়ে এসেছিল গোধূলির পূর্বে।

আকাশে নক্ষত্র ফুটতে থাকে এক এক করে। নওয়াস সেদিকে একবার তাকিয়ে দিগন্তেই কি যেন খুঁজতে লাগল। পান্‌শালার পর নারী নওয়াসের অভিষ্ট। কিন্তু মানবীর কোন প্রয়োজন নেই তার। চাঁদ-সড়কের রোক্কাসা-দের উঁচু বুক আজ তাকে বাধা দিতে পারে নি।

হঠাৎ থামল নওয়াস। দজ্‌লার কুলুকুলু-স্বর তার কানে আসে। তার কোন শব্দ সে কান দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

দিগন্তের দিকে নওয়াসের দুই চোখ—অন্ধকারে যেন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। প্রশ্নকারী, উত্তরদাতা উভয়ই সে নিজে।

নওয়াসের দুই ঠোঁটে হঠাৎ মৃদু হাসির আঁচড় দেখা গেল। তারপর বেশ জোরেই হেসে উঠল। সে।

আন্দোলিত মন তখন ঠোঁটের কিনারায় প্রতিধ্বনি তোলে ঃ নওয়াস, নওয়াস। আরো হাসো, হাসো। দুনিয়ায় তোমাকে সকলে শরাবী মদ্যপ বলেই জানবে। আর জানবে কবি-রূপে। বলবে, ব্যভিচারী নওয়াস। তোমার কলঙ্কই বেঁচে থাকবে, তোমার অস্তিত্ব থাকবে না। কেউ জানবে না, তুমি কেন কলঙ্কের কালি-বোঝা নিজের মুখে মাথায় তুলে নিয়েছিলে? হাসো, হাসো, নওয়াস।

নওয়াস সত্যি নিজের মনে হাসতে লাগল। তারপর চুপ করে গেল। গম্ভীর তার মুখাবয়ব।

খেজুরের বীথি এখানে ঝাপসা, আকাশের গায়ে এসে মিশেছে।

আবার নওয়াস সোচ্চার বলতে লাগল ঃ আমিও মানুষের মনের অন্ধকারে এমনই আকাশ রচনা করে যাব। মৃত্তিকা-জাত, তবু আস্‌মানের সঙ্গী। আমার কলঙ্ক কেউ বুঝবে না। জীবনের দিকে দিকে হে অমৃতের পুত্র, অগ্রসর হও। মৃত্তিকা থেকে আকাশে পাড়ি দিও—কিন্তু তোমার দুই পা সব সময় যেন মাটির উপর থাকে। এইভাবে আকাশও তোমার কাছে ধরা দিয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা তা করো না, আকাশের খোঁজে এগোও, এদিকে পৃথিবীতে হারিয়ে যাও। তোমাদের মানুষ বলেই আর কেউ চেনে না। তুমি পৃথিবী-বিস্মৃত, তাই মনুষ্যত্ব-বিস্মৃত। নওয়াস তাই কলঙ্কের কালি মেখে নিলে। শিব-হাল নওয়াস। আবে-হায়াৎ বিলিয়ে দিয়ে জহর নিজে পান করলে। শূন্য আকাশ তোমাদের কাছে এত প্রিয় যে, বৈচিত্র্য-গর্ভা পৃথিবীর দিকে তাকালে না। তাই কবি নওয়াস তার কবি-ব্রত ধারণ করল। হোক পাঁকে, সহজ আনন্দ—এই সহজ অনন্দের দিকে আগে মানুষকে টানো—জীবনকে ভালবাসতে শিখুক মানুষ। তাই ত শরাব শাকী আমার কাব্য প্রাত্যহিকতার প্রতীক। কাকে বোঝাব এই কথা?—একটি মানুষ যদি পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচবার অভিলাষী হয়, নওয়াসের কলঙ্ক সার্থক। সূর্যের মত আমার জন্য থাক কলঙ্ক— জ্বলা আর জ্বালা—তোমাদের জন্যে থাক শুধু প্রাণদাত্রী আলো আর আলো। চতুর্দিকে কালিমাময় জাল বিছিয়ে অঙ্গার কি হীরককে জ্যোতিহীন, না নির্মূল্য করতে পারে? কিন্তু নওয়াস, তবু—তবু, তোমার হৃদয় আবেগ- উদ্বেলিত কেন? শান্ত হও, মন। রাত্রি নামে গোধূলি শিখরে—

নওয়াস হঠাৎ অল্প জায়গায় মধ্যে পাগলের মত পায়চারী করতে লাগলো। অন্ধকার চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। নওয়াস তারই কয়েদখানার হঠাৎ চীৎকার দিয়ে ওঠে ঃ না, না।

সে জানে এই কণ্ঠস্বর কারো কাছে পৌঁছবে না। তবু থেমে গেল সে, বুকে অস্থিরতা সত্ত্বেও। আবার শহরের দিকে মুখ ফেরায় আবু নওয়াস। রহস্যময়ী দীপান্বিতা বগ্‌দাদ, আবার হেসে উঠছে। সেখানেই ত সে ছুটে যাবে। জীবনধারা থেকে আঁজলা পান না করলে ত তার তৃষ্ণা মিটবে না। মানুষের জীবনই মদিরাবিশেষ, তাই ত সে মদিরায় জীবনকে খুঁজছে।

বগ্‌দাদ-অভিমুখী নওয়াস। দজ্‌লা হয়ত জোয়ারে উত্তাল। তার পদধ্বনি বার বার শমে তেহ্‌াই মারছে। গজল গাইছে গুফাদারেরা দল বেঁধে। সুরের খেই পাক্‌ড়ে গুনগুন করতে লাগল আবু নওয়াস।

জীবনের সবক নিতে বগ্‌দাদেই ত তাকে ফিরে যেতে হবে। বিরাট মরুভূমি আর শূন্যতার উপাসনা তার ব্রত নয়।

আবু নওয়াস জোর পা ফেলতে লাগল।

শহরের দরওয়াজার কাছাকাছি দজ্‌লার বুকে বিপণী-সারির আলো পড়েছে।

নওয়াস ভাবলে, "দজ্‌লা ত নদী নয়—আমার বুক। সম্মুখে কোথাও অন্ধকার কাছে বলে কী এই নদীর স্রোতদল শহরের আলোস্নাত এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায়? অন্ধকারের রহস্য কী তাদের টানে না?....আমি নিজে এক দজ্‌লা।"

হাল্কা বুকে হাসল আবু নওয়াস। অতঃপর নিকটস্থ এক পানশালায় ঢুকে পড়ল, যেখানে আবুল আতাহিয়া তার প্রতীক্ষার্থী হয়ে বসে ছিল।

—এসো, এসো, কোথায় ছিলে তুমি?

—হারিয়ে গিয়েছিলাম, আতাহিয়া।

আতাহিয়া। তুমি দেখছি আর এক মেহেরজান।

নওয়াস। না, আবুল আতাহিয়া। সত্যি হারিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। এই খুঁজে পাওয়ার আনন্দটুকু আজ পান করব। আমার শরাবের প্রয়োজন হবে না।

আতাহিয়া। বেশ, তবে চলো, ওঠা যাক। বগ্‌দাদের নৈশ স্রোতে অবগাহনের পর আজ ঘরে ফিরব। এসব জায়গা আমার ভাল লাগে না। তোমার জন্যেই শুধু আসা।

নওয়াস। বেশ, তাই চলো।

১৮

লৌহগরাদের ওপারে আকাশ।

শুধু কি আকাশ। পৃথিবী নিজের অন্তহীন বিস্তার অস্বীকারের জন্য গণ্ডীর মধ্যে বিচিত্রার আতসবাজি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এগোয়। থামতে চাইলেও থামতে পারে না। তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষের মধ্যেই তাই পৃথিবী ভেঙে ভেঙে টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্বাবনে কুচফল হারিয়ে পুনরায় খোঁজার মত। খুঁজে পাওয়ার পর আবার

ছড়ানো। ঝর্ণা-উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থানে-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে। তাই গরাদের ওপারে শুধু আকাশই অস্তিত্বের ইশারা জাগায় না, ধেয়ে আসে চূর্ণিত পৃথিবী, টুকরো-টুকরো রঙীন কাঁচের মত অন্তহীন বর্ণ সজ্জায়-পলানুপল, দণ্ড-প্রহর, অহর্নিশ।

গরাদের ওপারে তাই ত মানুষ মাথা কোটে। নিষ্প্রাণ পাথরেও চেতনার প্রলেপ আরো করে। মেজে মেজে হৃদয়কে করে তোলে অমলিন নিদাগ আর্‌শি। সেখানে অন্ততঃ পৃথিবীর ছায়া পড়ুক।

গরাদের এপার এবং ওপারের দূরত্ব-পার্থক্য মুছে দিতে তাই নবেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। ধারাবিচ্ছিন্ন উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে। তরঙ্গকল্লোল একক শব্দে কখনও মুক্তি পায় না।

ওইখানে হাব্‌সী-মুখের দিকে তাকাও। কোড়াহত ও মুখ কি অনড় স্থৈর্যে অবিচল? না। কৃষ্ণ হাবসীমুখ সফেদ আরমেনী মুখের আদলে কী ডুবে যাচ্ছে না? আরশির সমতল রূপান্তর ধরে রাখছে না শুধু।'

তুমি হয়ত দেখতে পাও না। কারণ, তুমি সেই নবেন্দ্রিয়ের অধিকারী নও। তার চেয়ে গরাদের প্রাচীরেই কান পাতো। পাষাণেও চেতনা প্রবাহ আছে।

অভিশপ্ত বগ্‌দাদ এখনও নিদ্রা-সমাহিত। তার ঘুম যেন কেয়ামতের পরও ভাঙবে না।.....

১৯

বগ্‌দাদের এই সরাইখানার প্রবেশপথ খুবই সঙ্কীর্ণ। মালিক একটা ছোট গালিচার উপর উপবিষ্ট। পিছনে মোটা গের্দা। সামনে রূপার নল-সংযুক্ত হুক্কা। আনমনা ধূমপান করছিল সে।

কিন্তু এই প্রবেশপথ পার হয়ে গেলেই সবায়ের আসল চেহারা দেখা যায়। স্তিমিত আলোয় বিরাট হলের মধ্যে নৈশ-বিলাসীরা বসে আছে। কেউ নিঃসঙ্গ। কেউ দল বাঁধা। এখানে কফি শরাবের মজলিশ গুলজার। কল-গুঞ্জনের বিভিন্ন গ্রাম সমস্ত কক্ষে নিনাদিত। মৃদু ফিস্‌ফিশানি থেকে হাহ্‌হা—হৈহো রব, সবই এই জায়গায় সাজে। কোণায় কোণায় নর্তকীদের নাঁচ, মাঝে মাঝে ঘুঙুর ও তাম্বুরীনের আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ ঢেউ তুলে যায়; তা আছড়ে পড়ে নানা বীচিভঙ্গে। কেউ শুধু তাকিয়ে দেখে আবার জামে ঠোঁট নামায়, কেউ তালি-সংযোগে চীৎকার দিয়ে ওঠে, "মারহাবা, মারহাবা।" যেন কেয়ামৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে ত্রস্ত পালিয়ে গেল। পৃথিবী আবার আনন্দে নির্বিবাদ।

অন্যান্য দিনের মত আজও সরাইখানা এতক্ষণ গুলজার ছিল। তারপর আওয়াজের তোড় কমে গেছে। কিন্তু কথার তোড় থামছে না। অবিশ্যি লয় মৃদু, খাদ-অভিমুখী।

সরাইখানার মাঝখানে একটি পাথুরে মাটির ছোট উঁচু চবুতরা। তার উপর এতক্ষণ কয়েকজন বসে বসে কফি পান করছিল। এক জন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঃ সাবাস, আবু নওয়াস, সাবাস।

তারপর সমস্ত সরাইখানায় এই একই নাম ঘুরে ঘুরে আসে। আবু নওয়াস। আবু—আবু নওয়াস। আবু নওয়াসের কি হবে?

নতুন কয়েকজন আগন্তুক এসে পড়ল সরাইয়ের গুহায়। হয়ত এই স্তিমিত ভাবের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। সরাইখানায় কি কেউ আসে গৃহোচিত নীরবতা উপভোগে? সকলের তরঙ্গে গা ঢেলে সবাই স্নানার্থী এইখানে। ম্রিয়মাণতা এখানে নিষিদ্ধ, পাপ।

আগন্তুক একজন সরাইয়ের মাঝামাঝি এসে চীৎকার দিয়ে উঠল ঃ গোটা বগ্‌দাদ কি আজ মৃত, না কোন কেয়ামতের খবর পাওয়া গেছে— যার জন্যে সরাইখানা আজ ঠাণ্ডা গোরস্থান?

চারিদিক থেকে চোখ এই চ্যালেঞ্জদাতার উপর পড়ল।

প্রথমে অনেকে প্রশ্নটা বুঝতে পারে না। উত্তর-প্রার্থীর উদ্দেশ্য কি? কি জবাব চায় সে?

আবার শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠস্বর, "বগ্‌দাদ কি মৃত না কেয়ামতের প্রতীক্ষার্থী?"

এইবার কয়েকজন কফির পেয়ালা ঠোঁট থেকে নামিয়ে নওজোয়ানের দিকে তাকায়। বিরক্ত হয় অনেকে। সরাইয়ের হাওয়া যেন এই তরুণ আগন্তুক বিষিয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম কোণা থেকে আর এক যুবক দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, "আপনি অন্তত বসে পড়ে প্রমাণ দিন যে, আপনি মরেন নি।"

— কিন্তু বগ্‌দাদ মরে গেছে।

— না।

— তবে এই সুম্‌সাম ভাব কেন?

— বগ্‌দাদ তার যৌবনের উৎসব পালন করছে। বগ্‌দাদের নওরোজ আজ।

— নওরোজ কি এইভাবে পালিত হয়? গোরস্থানের স্তব্ধতায়?

— বগ্‌দাদ মরে গিয়েছিল। আজ বগ্‌দাদ বেঁচে উঠেছে। তাই আমরা হুল্লোড়ে মেতে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে রাজি নই। আপনার ভাল না লাগে অন্য সরাই দেখুন। বগ্‌দাদে তার অভাব নেই।

— আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

— বগ্‌দাদ দুনিয়ার শয়তানদের কাছে একটা ধাঁধাঁ। আর তুমি এত সহজে বুঝে ফেলবে, নওজোয়ান?

— মেহেরবানী করুন, আপনাদের এই প্রহেলিকা আর সহ্য করতে পারছি নে।

— আজ বগ্‌দাদ বেঁচে উঠেছে।

— কবে তার মৃত্যু হয়েছিল?

— তার খোঁজ পান নি, টের পান নি?

— ব্যাপার কি, ভাই?

—আজ বগ্‌দাদ বেঁচে উঠেছে। আপনি তো জানেন, বুসায়না খুনের ইন্‌সাফ হচ্ছিল আজ আমিরুল মুমেনীনের দরবারে। আমির-ওমরাহ্‌-কাজী সবাই বললে, হাব্‌সী তাতারী এই খুন করেছে। খুন কা বদ্‌লা খুন। গর্দান নেওয়া হোক হাব্‌সীর।

তখন সরাইয়ের আর এক কোণায় অন্য দুই নওজোয়ান চীৎকার দিয়ে উঠল, 'থামুন-থামুন।" তাদের প্রসারিত করতালু আর আঙুলের দিকে সকলের দৃষ্টি আবার ধাবিত হয়।

"থামুন, থামুন", রবে দুইজনে এগিয়ে এলো, দুই নওজোয়ান। তারপর তারা বললে, "আজ আমরা দু-জনে দরবারে ছিলাম। সব কথাই মনে আছে। আমাদের একজনকে খলিফা আর একজনকে নওয়াস মনে করলেই আপনার গোটা দরবার চোখের সামনে দেখতে পাবেন।"

"বেশক্—নিশ্চয়—নিশ্চয়", সমর্থনের রব উঠল চারিদিক থেকে। "এতক্ষণ তো শুনছিলাম, এবার চোখেও দেখতে পাব।" জনান্তিকে একজন প্রস্তাব করলে, 'চত্বরটা ছেড়ে দিন। ওখানে খলিফা বসুন। আর নওয়াস নীচে দাঁড়াক। সকলের দেখতে সুবিধা হবে।"

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

প্রস্তাব মত মঞ্চ সজ্জিত হতে আর বেশি বিলম্ব ঘটে না। তারপরই সরাই দরবারে পরিণত হয়। আগন্তুক দুই জন তখন অভিনেতা।

নওয়াস। জাঁহাপনা—

আমিরুল। কি নওয়াস?

নওয়াস। জাঁহাপনা, বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন, বুসায়না হত্যার বিচার আমি এতক্ষণ নিজের চোখে দেখলাম। কিন্তু এতে খুনের কোন প্রমাণ হয় না।

আমিরুল। প্রমাণ হয় না?

নওয়াস। না। এক জনের জান্ 'হালাক' (ধ্বংস) করার আগে সমস্ত নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া উচিত। কারণ, আমরা কেউ জানের মালিক নই। প্রাণ ধ্বংস সহজ, সৃষ্টি অনেক কঠিন কাজ।

আমিরুল। তুমি কি বলতে চাও?

নওয়াস। এই বিচার ভুল, আলম্পানা।

আমিরুল। কেন ভুল?

নওয়াস। প্রমাণ নেই। কেউ চোখে দেখে নি।

আমিরুল। সব সময় চোখে দেখার প্রয়োজন হয় না। সাক্ষীসাবুদ এবং ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

নওয়াস। বিচারের ক্ষেত্রে আন্দাজের কোন জায়গা নেই।

আমিরুল। বুসায়না কি খামাখা মারা গেল?

নওয়াস। খামাখা না, আলম্পানা। কিন্তু হাব্সী জওয়ান তাকে খুন করে নি। আর এ ত খোদ্কসী—আত্মহত্যার ব্যাপার।

আমিরুল। কিন্তু গোলাম নিজের সাফায়ে একটা কথা পর্যন্ত বললে না, মুখ খুললে না। তা কি অভিযোগ স্বীকার নয়?

নওয়াস। না, জাঁহাপনা, আর স্বীকার করলেও ক্ষেত্র অনুযায়ী অনেক সময় খুন স্বীকারকারীর উপর বর্তায় না। বেটার হত্যাপরাধ অনেক সময় কি পিতা নিজের কাঁধে তুলে নেয় না?

আমিরুল। কিন্তু এই গোলাম সব কিছু করতে পারে।

নওয়াস। না, জিল্লুল্লাহ্। এ কালো গোলাম কালো পাথর। স্তব্ধ। কালো পাথর কোনদিন নকল হয় না। সাদা আর ঝল্মলে পাথরই সহজে নকল করা যায়।

আমিরুল। আবু নওয়াস, তুমি কি বলতে চাও, আমার বিচার ভুল?

নওয়াস। হ্যাঁ, আলম্পানা।

আমিরুল। ভুল? আবু নওয়াস, তোমার জিভ সামলাও।

নওয়াস। জাঁহাপনা, ভুলকে ভুল বলা কবিদের ধর্ম। আমরা শুধু সুন্দরের পূজারীই নই।

আমিরুল। আমি ভুল বিচার করি?

নওয়াস। জিল্লুল্লাহ্ ইন্‌সান ভুল করে বসে বৈকি। আমরা জানি আমিরুল মুমেনীন ফেরেশতা নন।

আমিরুল। নওয়াস, চুপ্‌চুপ। তোমার বেয়াদবী আমি ক্ষমা করব না।

নওয়াস। জাঁহাপনা, আল্‌হাক্কো মোররুন—সত্য তিক্ত পদার্থ, তা আপনি জানেন।

আমিরুল। আবু নওয়াস, তুমি হদ্ ছাড়িয়ে যাচ্ছো। আমার কাজী-আমির-ওমরা—এত লোক, যারা প্রতিদিন বিচার করে তারা ত বিচারে কোন ভুল দেখল না।

নওয়াস। জাঁহাপনা, তারা যখন আপনার চোখ দিয়েই দেখে, তখন নিজেদের চোখ ব্যবহার করে না। আর যখন নিজেদের চোখও দেখার কাজে লাগায়, তখন আপনার চোখের ঝিলিক তারা আগেই দেখে নেয়।

আমিরুল। উপস্থিত এত শরীফ মানুষদের তুমি বেইজ্জৎ করছ, আবু নওয়াস।

নওয়াস। না জাঁহাপনা। নওয়াস মদ্যপ। মাতালেরা দুনিয়ার কারো উপর শত্রুতা সাধন করে না—এক নিজের উপর ছাড়া। কাউকে বেইজ্জৎ করা আমার খস্‌লতের বাইরে।

আমিরুল। অর্থাৎ আমার ইন্‌সাফ ভুল।

নওয়াস। হ্যাঁ আলম্পানা।

আমিরুল। থামো, নওয়াস। তোমার বুকের পাটা আল্লার জমিন ছাপিয়ে যাচ্ছে। বেয়াদব ইন্‌সানকে আমি মাফ করি না তোমাকেও মাফ করবে না। শুধু এক শর্তে তুমি ক্ষমতা পেতে পারো—এই উপস্থিত শরীফ ব্যক্তিদের কাছে যদি মাফ চাও। নচেৎ—

নওয়াস। নওয়াস আপনার দরবারে কোন গুনা করে নি, জাঁহাপনা।

আমিরুল। তুমি মাফ চাও।

নওয়াস। বে-কসুর নিরপরাধ কিভাবে ক্ষমা চাইবে?

আমিরুল। মাফ চাও।

নওয়াস। আপনি আমাকে এই কাজ থেকে মাফ করুন।

আমিরুল। নওয়াস; তুমি বেয়াদব নও শুধু। না-ফরমান। গোলামের সঙ্গে তোমারও গর্দান ধুলায় লুটিয়ে পড়ুক—। মশরুর—

নওয়াস। জাঁহাপনা, আপনার যা মরজী। কিন্তু জাঁহাপনা মনে রাখবেন, আপনার সাধের বগ্‌দাদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আজ আমি আমার গর্দান বাড়িয়ে দিলাম—কারণ এই বগ্‌দাদকে আমি ভালবাসি, আমার জন্মভূমি বগ্‌দাদ। ভবিষ্যতের একটি মানুষ অন্তত বলবে, বগ্‌দাদ অবিচারের কাছে মাথা নোয়ায় নি। জাঁহাপনা—

আমিরুল। মশ্‌রুর, একে আজ কয়েদখানায় রাখো, কাল দরবারে আবার নতুন বিচার হবে এই না-ফরমান, অবাধ্য কবির।

নওয়াস। জাঁহাপনা, একটা কথা বলবার দাবি জানাচ্ছি। বগ্‌দাদকে আপনি যেমন ভালোবাসেন, তেমনি আমিও ভালবাসি। কিন্তু আপনার বগ্‌দাদের কোন ঐশ্বর্যই টিকবে না। টিকে থাকবে শুধু বগ্‌দাদের

বিবেক এবং বিবেক-সাধনা। ও কেউ ধ্বংস করতে পারে না। ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে থাকলেও ওর কণ্ঠধ্বনি অনাগত মানুষ শুনবে—তারা বগ্‌দাদকে বাঁচিয়ে তুলবে। তাই আজ অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালুম। যে বীজ আপনি রোপণ করেছেন, তাই একদিন বগ্‌দাদকে গ্রাস করবে। তাই আবু নওয়াস আজ কবন্ধ সাজল। নিজের হাতে নিজের গর্দানকে গেন্দুয়ার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে যেন বগ্‌দাদের বিবেক আবার চীৎকার দিয়ে উঠতে পারে, "আমি কবি, চিরন্তনের কণ্ঠস্বর! মশ্‌রুরের তলওয়ার, আমিরুল মুমেনীনের ভ্রুকুটিদণ্ড কবির হলকুমের (গ্রীবা) নিকটে পৌঁছাতে পারে না যে। বগ্‌দাদের প্রেম আমাকে বানিয়েছে কবি, বগ্‌দাদের প্রেম আমাকে করে তোলে শহীদ। কবিরা নিত্যকার শহীদ—কারণ, জীবনকে সব সময় তারা পিছনে ফেলে চলে। জীবন থেকে জীবনান্তর। কবিরা তাই মাত্র একটিবার পুনরুজ্জীবনের স্বর্গলোভী শহীদ নয়। তারা বাঁচে, আবার শহীদ হয়; শহীদ হয়, আবার বেঁচে ওঠে। জীবন-মৃত্যুর সাময়িক ফারাকে তাই তারা বিহ্বল হয় না, শঙ্কাত্রাসে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে না। কর্মিমাত্রেই রক্তবীজ, বিবেকের নিষ্কাম সাধক। চলো মশ্‌রুর। নিয়ে চলো। তোমার তলওয়ারের ধার এতদিন কোন মানুষ স্পর্শ করে নি। এবার অন্তত সে কলঙ্ক থেকে রেহাই পাবে। আদাব আমিরুল মুমেনীন।"

"আরো বললাম, মশ্‌রুরের সঙ্গে যেতে যেতে"—হঠাৎ সরাইখানার আর এক কোণায় দেখা গেল, এতক্ষণ ভিড়ে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি প্রথম বক্তার বাক্য সমাপ্তি মাত্র কথা বলতে বলতে অগ্রসর হচ্ছে। ভিড় ঠেলে এগোয় সে। মুখে কথা, "বললাম, বগদাদের নর-নারীর কান্নায় আমি কাঁদি, তাদের আনন্দে আমি হাসি—তারাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তারাই আমার কবিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের জীবনযাত্রার ধারাই আমার রসের উৎস। মশ্‌রুর, আমার কোন দুঃখ নেই। বগ্‌দাদের বাসিন্দা আমার ভীরু বুকে সাহস যোগায়। তাদের কথা আমার ঘুমন্ত কথাকে জাগিয়ে তোলে। তাই মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। কারণ, বগ্‌দাদের বাক্যস্রোত রোধের ব্যবস্থায় এগোবে কোন্ আহম্মক? বগ্‌দাদের বন্ধুগণ—।"

বক্তা ততক্ষণে অভিনেতা-নওয়াসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলে আনন্দে চীৎকার দিয়ে ওঠে, "আবু নওয়াস, আবু নওয়াস।"

"বগদাদের বন্ধুগণ, তোমাদের ভালবাসায়, তোমাদের কবি আবার তোমাদের মাঝখানে ফিরে এসেছে। আমিরুল মুমেনীন পরে নিভৃতে মশরুরকে আমার সামনে বললেন, "একজন নিরীহ কবিকে খুন করে—বগ্‌দাদবাসীদের আমি কি জবাব দেব? তাই বন্ধুগণ, তোমাদের নিকট, তোমাদের নিঃশ্বাসের উত্তাপে চাঙ্গা আবু নওয়াস এইখানে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর পর ফেরেস্তা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বগদাদে না বেহেশ্‌তে যেতে চাও? আমি জবাব দেব, বগ্‌দাদে।"

"আহ্‌লান্ সাহ্‌লান ইয়া আবু নওয়াস, স্বাগতম, হে আবু নওয়াস।" চারিদিক থেকে রব ওঠে।

"কিন্তু বন্ধুগণ, সরাইখানা নীরব কেন? জল্লাদের হাতে যদি আমার গর্দান যেতো, তোমরা কি সরাইখানা জমিয়ে তুলতে না? একটি মানুষের মৃত্যু এভাবে দেখা উচিত নয়। আমি ত জীবনের কবি। তোমাদের স্তব্ধ দেখলেই আমার আত্মা বিষণ্ণ হয়ে পড়ত। আকাশের কোন নক্ষত্র খসে গেলে কি অন্যান্য তারা নিজের কর্তব্য ভুলে যায়? বরং সেই শূন্য জায়গা পূরণে এগিয়ে আসে নব উজ্জ্বলতায়।—এসো, সরাইখানা আমরা আজ ভরপেয়ালা করে তুলি। নতুন গজল শোনাব আমি। আনন্দ কর, বগ্‌দাদবাসী। মওজ-তরঙ্গ তোলো অঙ্গসমুদ্রে, চিত্তঅরণ্যে, রুবাব পাত্র-পঞ্চমে—"

সুরে, সুরায়, নৃত্যচঞ্চলতায়, স্বর-মুক্তির স্বচ্ছন্দতায় সরাইখানায় আবার বন্যা ডাকল।

উচ্চ চত্বরে উপবিষ্ট নওয়াস।

আনন্দস্রোত নানা দিক থেকে ওইখানে আছড়ে পড়ছে।

নওয়াসের সম্মুখে পানপাত্র।

কিন্তু তার দুই চোখ বিবাগী। এই প্রাণপ্রবাহে কি যেন বার বার খুঁজতে লাগল।

২০

আমিরুল মুমেনীনের মহল।

নিশীথ রাত্রি।

—কে?

—মশরুর, জাঁহাপনা।

—গোলামকে এনেছো?

—হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

—ওকে পৌছে দিয়ে, তুমি বাইরে যাও। ওর সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।

—আস্‌সামায়ো তায়তান।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ তাতারীর প্রবেশ। সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে জর্জর। দেহ প্রায় ত্বকহীন। কপালে, গণ্ডদেশে দগ্‌গগে ঘা।) তাতারী, জানি, তুমি আমার কথার জবাব দেবে না। কিন্তু আজ খলিফারূপে আমি তোমাকে ডাকি নি।

তাতারী। (কণ্ঠে ঘড়ঘড় শব্দ। শ্বাসকষ্ট।)

হারুন। আজ তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরূপে তোমাকে এইখানে ডেকে এনেছি। তুমি দেখছো, বাইরের বাতাসের কত দাম। আমি তোমার সমস্ত মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত। আমাকে ভুল বুঝো না।

তাতারী। (খলিফার দিকে চাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু চোখ স্ফীত। ফলে তাকানো কষ্টকর।)

হারুন। তুমি একটিবার হাসো। তা হলে তুমি যা চাও তাই পাবে। আমার সুদক্ষ হেকিম রয়েছে, তারা শরীর সাত দিনে আবার পূর্বের মত চাঙ্গা করে তুলবে। তোমার একটা হাসি শুধু প্রয়োজন। জবাব দাও।

তাতারী। (নিরুত্তর।)

হারুন। আবু নওয়াসের কাছে আমি অপদস্থ। তুমি নাকি আর কোনদিন হাসবেই না। কিন্তু কেন? কেন তুমি জীবনের পেয়ালা এমনভাবে পায়ে ঠেলে দিচ্ছ? তুমি নওজোয়ান। জীবনের সমস্ত সড়ক তোমার জন্য দু-পাশে ফল-ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর তুমি নিজের দুই চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছ। কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখো নি। কেন? এই নিশীথ রাত্রি, কেউ শুনবে না। তুমি শুধু

জবাব দাও, আমি পাক্ কোরান ছুঁয়ে কসম করছি—তোমার নালিশের ভিত আমি উপড়ে ফেলতে চেষ্টা পাব। তস্‌বী হাতে কস্‌বীর মত আমাকে ভণ্ড মনে করো না। আমার কসমের দাম আছে।.....তবুও তুমি নিরুত্তর। কি চাও তুমি? একটা গোলামের যা কাম্য, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি অনেক কিছু তোমাকে দিয়েছিলুম, তুমি নিলে না। এত জুলুম সহ্য করছ, অথচ তোমার কথা যেখানে কাজে পরিণত হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে......সেই সুযোগ তুমি নিচ্ছ না। আমি নিজে ভেবে পাইনে। তোমরা কি আর কোন ধাতুতে গড়া? একটা জবাব দাও.....(পায়চারীরত) একটা জবাব.....একটা হাসি.....আচ্ছা, হাসি জাহান্নামে যাক্, একটা জবাব দাও। আমি তোমার সব অপরাধ মাফ করে দেব। যা চাও তাই পাবে। সময় দিলুম.....বুঝেছি, তুমি.....নির্বাক থাকবে, হাসবে না......বেশ। যাও। তোমাকে তিন দিনের মেয়াদ দিলুম। শুধু একটি হাসি হেসে তুমি জীবনের সবকিছু অধিকার ফিরে পেতে পারো। নচেৎ আরো শাস্তি—হ্যাঁ, শাস্তি—যা কোনদিন তুমি কল্পনাও করো নি। তোমাকে ভেবে দেখার সময় দিলুম।.... (হাততালি প্রদান) মশ্‌রুর—

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা।

হারুন। মশ্‌রুর, গোলামকে নিয়ে যাও।

মশ্‌রুর। আসসামায়ো তায়তান।

হারুন। মশ্‌রুর,—না থাক, আর একদিন বলব।

(সকলের প্রস্থান)

২১

নহরে জুবায়দার তীর। বিকাল বেলা। খর্জুরবীথির পাশে একটা টিলার উপর আতাহিয়া ও আবু নওয়াস উপবিষ্ট।

আতাহিয়া। নহরে বাতাসের দোলা লাগছে, দ্যাখো দ্যাখো, নওয়াস।

নওয়াস। নারীর স্নেহ পানি রূপে এখানে বিগলিত হয়ে ঝরে পড়ছে, আতাহিয়া। আহ্, মানবের প্রেম-মমতা যদি এমনই রূপ পেতো :

আতাহিয়া। কিন্তু তুমি দিনদিন এমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছ, আমার আর ভাল লাগছে না, আবু নওয়াস। তুমি আর উচ্ছলিত ঝর্ণা নও।

নওয়াস। আতাহিয়া, সাহারা মরুর অনেক নীচে পৃথিবীর বুক যে পানি সঞ্চিত রেখেছে—তা কি শান্ত অনুচ্ছল?

আতাহিয়া। তা নয়।

নওয়াস। মাঝে মাঝে উপরে সব শুকিয়ে ফেলতে হয়, ভিতরে সরস তাজা থাকার জন্যে।

আতাহিয়া। কিন্তু আমি তোমার স্তব্ধতা সইতে পারি নে। উপরিভাগ শুকিয়ে ফেলতে যে অনেক কষ্ট, নওয়াস।

নওয়াস। তা তো হবেই। সকলের কথা তোমার মুখ দিয়ে বলার ভার যে নিয়েছ বন্ধু। তোমার একার বোঝা ত হালকা, কিন্তু শত-সহস্রের বোঝা যখন তোমার কণ্ঠে চাপে—তখন? কে চায় শুকিয়ে সাহারা হতে? কিন্তু প্রাণধারা সঞ্জীবনের জন্য এই বিশুষ্কতাই মাঝে মাঝে বেছে নিতে হয়।

আতাহিয়া। চলো, কোন সরাইখানায় যাই।

নওয়াস। আমি এখন সরাইখানার দর্শক, শরীকদার নই।

আতাহিয়া। তবু চলো।

নওয়াস। দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শতদল ফোটে। চলো।

আতাহিয়া। কিছু চুপ করে যেয়ো না। তোমার কথাই ত আমি শুনতে চাই।

নওয়াস। তা হলে এই বুকে কান পাতো, মুখের দিকে তাকিয়ো না।

আতাহিয়া। যথাদেশ। তাই শুনব বন্ধু। চলো, তার আগে কোন পানশালার ওমে আড়াল হয়ে নিই।

নওয়াস। চলো।

২২

সময় গোধুলি বেলা। স্থান কারাগারের চত্বর। হারুনর রশীদ, মশরুরের প্রবেশ। চত্বরের পাশে দণ্ডায়মান তাতারী ও কোড়াদার। তাতারীর হাতে পায়ে জিঞ্জীর। কোড়াদারের হাতে চাবুক। চত্বরের দুই ভাগ। একদিক উঁচু। অন্যদিক কয়েদীর অবস্থানভূমি। সেদিকটা নীচু।

হারুন। তাতারী তিন দিনের জায়গায় তিন বৎসর কেটে গেল তোমার জীবনের মেয়াদ বহু দিন দিন বাড়িয়ে দিয়েছি। আজ কিন্তু আমি বোঝাপড়া করতে চাই। বাজি ধরে, বন্ধুদের কাছে আমি হেরেছি। কিন্তু আর না.....। তোমাকে আমি শেষ সুযোগ দিতে চাই। জবাব দাও.....

(তাতারীর দিকে তাকাল। সে নিশ্চল পাথরের মত দণ্ডায়মান। সমস্ত শরীরের চামড়া নেই বললেই চলে। অবয়ব কিন্তু পুর্বের মতই আছে। নির্যাতনে তা ক্ষয়ে যায় নি। তাতারী অবশ্য পৃথিবীকে আর সম্পূর্ণ দেখে না। দুই স্ফীত ভুরু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। চাবুকের আঘাতের ফল।)

"জবাব দাও। আবু নওয়াস বলেছিল, তুমি কালো পাথর। সত্যই তুমি কালো পাথর। তোমার শরীর কি ফুলাদের মত ইস্পাতে গড়া? চাবুকের ঘায়ে তুমি নাকি আর্তনাদ পর্যন্ত করো না। সত্যি কোড়াদার?"

কোড়াদার। জাঁহাপনা, বহুদিন আপনার নেমক খেয়েছি। কিন্তু এমন হিমাকৎওয়ালা কয়েদী আমি কোনদিন দেখিনি। পিটে পিটে ওকে দুরস্ত করলেও, ও শব্দ করে না, আওয়াজ তোলে না।

হারুন। কি করে?

কোড়াদার। দেখবেন, আলম্পানা?

হারুন। হাঁা, সেই জন্যেই ত এসেছি।

কোড়াদার। তবে দেখুন—

(কোড়া চালায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাতারী শুধু দক্ষ অভিনেতার মত মুখমণ্ডল বিকৃত করে, আর হাঁপায়।)

হারুন। খামুস, কোড়াদার। আর কি করে?

কোড়াদার। জাঁহাপনা বেহুঁশ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও গোঙায় না, আর্তনাদ করে না। জনাব, এ কয়েদী ইন্‌সান নয়। জীন, দেও বা পাথর।

হারুন। যা কোড়াদার, তুই বাইরে যা। কোড়া মশ্‌রুরের হাতে দে। যে হাতে মশ্‌রুর তলওয়ার চালায়, সেই হাতে আজ কোড়া চালাবে।

কোড়াদার। জো হুজুর, জাঁহাপনা। (মশরুরের হাতে কোড়া-প্রদান এবং প্রস্থান)

মশ্‌রুর। আলম্পানা, কয়েদীর সমস্ত শরীর থেকে প্রায় খুন ঝরছে, ওর উপর আর কোড়া চালানো বৃথা। বেহুঁশ হয়ে যাবে। আর কথা বলা চলবে না— যে জন্যে আপনার এখানে আগমন।

হারুন। বেশ, কোড়া ফেলে দাও। তবে রাখো, দরকার হোতে পারে।—তাতারী, মনে রেখো আজ তোমার কেয়ামৎ। আজরাইলও (যমদূত) আজ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। জবাব দাও—জবাব দাও। বেতমীজ গোলাম তবু স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল! মশ্‌রুর, এই বেতমীজের জিভ টেনে টেনে ছেঁড়ার আয়োজন করতে হয়।

মশ্‌রুর। তা হলে কি কথা বলা সহজ হবে, জাঁহাপনা।

হারুন। হুঁ, মশ্‌রুর, সেও এক সমস্যা। ইনসানের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু এ ত পাথর—(পায়চারীরত) গোলাম তোমাকে শেষ সুযোগ দিলাম। নচেৎ—তারপর মশ্‌রুর তার কাজ শুরু করবে। জবাব দাও....(তাতারী নির্বিকার। শারীরিক যন্ত্রণায় শুধু মুখ কুঁচকে নিঃশ্বাস নেয় আর ফেলে) না মশ্‌রুর— বৃথা কালক্ষেপ। (হাততালি দিল। দুই জন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা।

হারুন। ওই কামরায় একজন জানানা অপেক্ষা করছে, তাকে নিয়ে আয়।

প্রহরীদ্বয়। আস্‌সামায়ো তায়তান। (প্রস্থান)

হারুন। (আঙুলি নির্দেশ) এক আজব সমস্যা।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, সমস্যা জীইয়ে রেখে লাভ কি? আপনি শুধু হুকুম দিন।

হারুন। মশ্‌রুর, তার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আমি ভাবছি—

মশ্‌রুর। আলম্পানা, কি ভাবছেন?

হারুন। ভাবছি, এত দৈহিক যন্ত্রণা এরা সহ্য করে কি ভাবে?

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, আবু নওয়াস বলে—মানুষ আনন্দাতীত আরো কিছু পায়, যার কাছে এই যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা মনে হয় না।

হারুন। আনন্দাতীত—ও একটা পাগলের প্রলাপ। আবু নওয়াসই তা বলতে পারে।

মশ্‌রুর। আমি কিন্তু এই কয়েদীকে দেখে তা প্রায় বিশ্বাস করতে বসেছি।

হারুন। তুমিও বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছ।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, অথবা এরা বোধ নয় মানুষ নয় অথবা মানুষ যা দিয়ে তৈরি এদের উপাদান তার চেয়ে আলাদা।

হারুন। তোমার পাগল হতে বেশি দেরি নেই। এই দ্যাখো....

এতক্ষণ তাতারী দাঁড়িয়েছিল। শরীরে বোধ হয় অব্যক্ত যন্ত্রণা, তাই ধীরে ধীরে বসে পড়ল। জায়গাটা বালুময়। হতব্যক্তির রক্ত পরিষ্কারের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা। তাতারী বসে পড়ল। তারপর দুই গোড়ালি চেপে ধরে মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিল। সবই নিঃশব্দে ঘটে।)

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা—

হারুন। আস্তে আস্তে, মশরুর। (দুইজনে ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে কথা বলে) আস্তে। একটু বিশ্রাম নিক।

মশ্‌রুর। ওর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

হারুন। আছে। একটু তেজ সঞ্চয় করে নিক।

মশ্‌রুর। জাঁহাপনা, তেজের উৎস আনন্দ। ওর তেজ হয়ত সেই এক জায়গা থেকেই আসে।

হারুন। মশরুর। তুমি বড় বাজে বকো। শুধু দেখো, দেখো। ওর তেজের সব পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আজ। এই গোলাম।

(কথায় ছেদ পড়ে। মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমী লেবাস। যৌবন সর্বাঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থীর মত লুটিয়ে পড়েছে। চোখমুখে হাসির ঝিলিক ছাপিয়ে ওঠে। আপ্ত-রমণীর মত চলাফেরা।)

মেহেরজান। জাঁহাপনা, কোথায় আপনার তামাসা? আমি—

হারুন। (হঠাৎ পেছন ফিরে) ধীরে। আস্তে।— (এবার সকলে খুব নীচ গলায় সংলাপ-রত)

মেহেরজান। বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু আপনার তামাসা কোথায়? আমি ত কোতোয়ালের মাকানে বসে বসে হয়রান। শেষে আপনার ডাক যে পড়ল, তার জন্য শুকরিয়া, ধন্যবাদ—

হারুন। তামাসা নিশ্চয় দেখবে।

মেহেরজান। কিন্তু কোথায়?

হারুন। আছে, বেগম সাহেবা।

মেহেরজান। কিন্তু কই?

হারুন। (উপবিষ্ট তাতারীর দিকে নির্দেশ) ওই—

মেহেরজান। ও কে?

হারুন। একটা না-ফরমান, অবাধ্য কয়েদী, আমার কথার কোন ইজ্জৎ রাখে না।

মেহেরজান। ওর গর্দান দু-টুকরো করেন। ওর অপরাধ কি?

হারুন। তার সুমার নেই।

মেহেরজান। তবু—

হারুন। আমার অবাধ্য গোলাম।

মেহেরজান। চাবুক লাগান।

হারুন। তাই লাগিয়ে লাগিয়ে ত শরীরের ওই দশা।

মেহেরজান। বেশ করেছেন। কিন্তু গোলামটা কে?

হারুন। বলছি, সব বলব তোমাকে।

মেহেরজান। কে এই গোলাম, মশ্‌রুর?

হারুন। মশ্‌রুর ওর নাম জানে না।

মেহেরজান। তা মশ্‌রুর নিজের মুখেই বললে পারে। গোলামটা কে?

হারুন। তুমি এগিয়ে গিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা কর না।

মেহেরজান। বেশ।

(অগ্রসর হয়ে চত্বরের কিনারায় আসে, তারপর বেশ জোরেই ডাক দেয়। এরপর স্বাভাবিক কণ্ঠে সব সংলাপ)

কে—তুমি কে?

(হাঁটুর মধ্যে মুখ-গোঁজা তাতারী প্রথমে 'কে?' শব্দে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মাথা তোলে। তারপর ধীরে ধীরে মেহেরজানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে খাড়া হয়)

তুমি কে?

(তাতারী কোন জবাব দেয় না। শুধু স্ফীত চোখে তেড়ে-তেড়ে তাকায়)

তুমি কে?

(তাতারী উদ্‌ভ্রান্তের মত জিঞ্জীর-বাঁধা দুই হাত তোলার চেষ্টা করে)

কে তুমি?

(কোন জবাব আসে না। পেছনে ফেরে মেহেরজান)

কে এই গোলাম, আমীরুল মুমেনীন?

হারুন। তুমিই জিজ্ঞেস কর, জবাব নাও।

মেহেরজান। (মুখ ফিরিয়ে) তুমি কে? জবাব দাও। জবাব দিচ্ছ না কেন? (আবার খলিফার দিকে) কে এই গোলাম, জাঁহাপনা? ও জবাব দিচ্ছে না।

হারুন। জবাব আদায় কর।

মেহেরজান। তুমি কে? (তাতারী নিরুত্তর)

হারুন। একে চেন না?

মেহেরজান। না।

হারুন। মশরুর, হা হা হা মশ্‌রুর।
(হাসতে লাগল।)

মেহেরজান। হাসি বন্ধ করুন আমিরুল মুমেনীন। কে এই গোলাম?

হারুন। তুমি একে চেন না?

মেহেরজান। দুনিয়ার তামাম মানুষ কি আমার জানা যে একে চিনব?

হারুন। হা হা হা!.....জিজ্ঞেস কর ও তোমাকে চেনে কি না।

মেহেরজান। জাঁহাপনা, কয়েদখানার এই অন্ধকারে এই বুঝি আপনার তামাসা? আমি বাইরে চললাম।

হারুন। তা যাও। কিন্তু তার জন্যে সারা জীবন আফশোষ করতে হবে।

মেহেরজান। কেন?

হারুন। তুমি ওকে চেন।

মেহেরজান। চিনি?

হারুন। হ্যাঁ। ওই কোঁকড়া-কঠিন চুলের দিকে তাকাও। গায়ের চামড়া তো আর কালো নেই। চুল ঠিক আছে।

মেহেরজান। তুমি কে কয়েদী? জবাব দাও।

হারুন। হাহ্‌ হা। চার বছর ধরে আমরা জবাব পাই নি, আর তুমি এই কয়েক লহমায় উত্তর পাবে!

মেহেরজান। কিন্তু এ কে? আমি চিনতে পারছি নে, জাঁহাপনা।

হারুন। হাহ্‌ হা। চিনতে পারলে না? গোলাম তাতারীকে আজ চিনতে পারলে না, মেহেরজান?

মেহেরজান। তাতারী.....তাতারী.....কিন্তু তাতারীর এই দশা কেন?

হারুন। না-ফরমান। অবাধ্য। তাই—

মেহেরজান। না-ফরমান। কি ওর অপরাধ?

হারুন। মুখের কথা বন্ধ করেছে। ওকে কি না দিয়েছিলুম বাগবাগিচা তরখানা বাঁদী গোলাম ইমারৎ—সব ইনকার (ঘৃণা) করলে। বন্ধ করলে মুখের কথা। তাই চার বছর ধরে, তিলে তিলে শায়েস্তা হচ্ছে—

মেহেরজান। ইনকার করলে?

হারুন। হ্যাঁ।

মেহেরজান। ইনকার করলে (একটু অগ্রসর হয়, পরে পেছনে ফিরিয়া).....জাঁহাপনা, যে না-ফরমান তাকে কতল করেন নি কেন?

হারুন। হিমাকতের শাস্তি দেব বলে।

মেহেরজান। সে শাস্তি ত অনেক পেয়েছে। আজ এখনই ওকে কতল করুন। হুকুম দিন, মশ্‌রুরকে।

হারুন। তা তোমার পরামর্শে হবে না, মেহেরজান। আজো ও কথা বলুক, ওর সব অপরাধ আমি মাফ করে দেব।

মেহেরজান। তাতারী, কথা বল, জবাব দাও। খোদ্ আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন। কথা বল। তোমার সমস্ত শরীর জখমে খুনে জারেজার। এই জর্জর দেহের যন্ত্রণা আর কেন সহ্য করবে? কথা বল। (তাতারী নিরুত্তর)

হারুন। হাঃ হা। জবাব আদায় কর, মেহেরজান।

মেহেরজান। তাতারী, খোদার ওয়াস্তে—একবার কথা বল। বল....(হারুনর রশীদ হাসিতে লাগিল। হাসি থামলে) জাঁহাপনা, ওকে কতল করুন। ওর এই কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। হুকুম দিন মশ্‌রুরকে।

হারুন। না, মেহেরজান। কতল্ আমি ওকে করব না। জীবনকে যে পাশার ঘুটি বানাতে পারে এত সহজে, তাকে হত্যা করব না। তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে—

মেহেরজান। না, জাঁহাপনা, এত নিষ্ঠুর হবেন না। দয়া করুন।—(নতজানু)

আমি আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছি, ওকে কতল করুন।

হারুন। না, না—তা হবে না।

মেহেরজান। হবে না?

হারুন। না।

মেহেরজান। (উদ্‌ভ্রান্ত) হবে না.....(তাতারীর দিকে অগ্রসর) কথা বল, তাতারী। তুমি এমন নির্বোধ কেন? স্বপ্নভাঙার পর স্বপ্নে-দেখা ধন-দৌলত হারানো শোকে কেউ কোনদিন কাঁদে নাকি—এক নির্বোধ ছাড়া। নিজেকে কেন এইভাবে চুরমার করে ফেলছ? কথা বল। আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন.......কথা বল......আমি তোমার দিকে চেয়ে রইলাম, কান পেতে রইলাম...... (তাতারী নিরুত্তর। খলিফা হেসে উঠল। হাসি থামার পর, মেহেরজান ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, একদম তাতারীর কাছে, বালুভুমির উপর)

কথা বল......তুমি যা বলতে, তুমি কি এত যন্ত্রণা বুকে আজও তাই মনে রেখেছ? তুমি বলতে, "মেহেরজান, গোলামের মহব্বৎ আর এক আলাদা চিজ। তা আমির-ওমরার মহব্বৎ নয়। তারা দৌলতের কদর বোঝে। আর দৌলতের বড় গুণ হল বিনিময় আর হাতফেরী হওয়া। হস্তান্তর ছাড়া তার গুণ প্রকাশ পায় না। আমির-ওমরার মহব্বৎ এই হাতফেরীর মহব্বৎ। গোলামের প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির—আকাশের একটি প্রান্তে একাকী মৌন—অবিচল—(রোরুদ্যমান) তুমি তেমনই অবিচল আছ। কিন্তু আমি....আমি ত বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হয়ে গেলাম। আর বান্দী থাকলাম না। কোড়াঘাতের এত ব্যথা সয়েছ, এস মুছিয়ে দিই, মুছিয়ে নিই—(মেহেরজান হস্তপ্রসার মাত্র)

হারুন। সান্ত্রী। সান্ত্রী—(দুই প্রহরীর প্রবেশ)

সান্ত্রী, যা এই বিবিসাহেবাকে বাইরে নিয়ে যা।

মেহেরজান। (আর্তস্বর) না, না।

হারুন। সরম করিস নে, প্রহরী। দুইজনে দুই হাত ধর। (তথাকরণ, টানিতে টানিতে অগ্রসর)

মেহেরজান। (পশ্চাতে মুখ) তোমার যন্ত্রণা মুছে নিতে পারলাম না, তোমার নির্মল দেহ স্পর্শের যোগ্যতা আমার নেই..... নাই বা স্পর্শ করলাম এই কলঙ্কিত হাতে (চীৎকার) তাতারী— তাতারী— (কারাগার হতে অপসৃয়মান মুখ, শেষবার মেহেরজান দেখল তাতারীকে, তারপরই)

তাতারী। শোন, হারুন রশীদ—

হারুন। বেতমীজ, জাঁহাপনা বল!

মশ্‌রুর। বেয়াদব! বল আমিরুল মুমেনীন।

তাতারী। শোন হারুনর রশীদ—

হারুন। কোড়াদার, মশ্‌রুর—মশ্‌রুর কোড়া চালাও। বেয়াদব, বেয়াদব—

(কোড়া চালাইতে থাকে সেই অবস্থায়)

তাতারী। শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব— কিন্তু—কিন্তু—ক্রীতদাসের হাসি—না—না—না—না—

(পতন ও মৃত্যু, বেগে আবু নওয়াসের প্রবেশ)

নওয়াস। আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।

(এইখানে পাণ্ডুলিপি ছিন্ন)

অসমাপ্ত

২.৩ আরবীয় শব্দার্থপঞ্জি

অ

অগয়রহ	ইত্যাদি

আ

আক্কেলমন্দ্	বুদ্ধিমান
আজরাইল	যমদূত
আবে-হায়াৎ	যে-জল-পানে অমরত্ব মেলে
আলম্পানা	জগৎপালক
অক্দ	মন্ত্রপূত বিবাহ
আদম শুরত	কালপুরুষ
আস্সামায়ো তায়তান	শ্রবণ অর্থ পালন
আল্হামদোলিল্লাহ	আল্লার জন্য প্রশংসা
আমিরুল মুমেনীন	মুসলমানদের শাসক প্রধান
আলিশান	খুব ঝলমলে

ই

ইনসান	মানুষ
ইনাম	পুরস্কার

উ

উম্দা	ভাল
উমেদার	প্রত্যাশী

ক

কওম, কৌম	গোষ্ঠী
কাফ্তান	আস্তিন
কুওৎ	শক্তি
কোড়া	চাবুক

খ

খোয়ার	শূন্য
খোয়ারি	তন্দ্রা
খোদ্কসী	আত্মহত্যা
খোশ্বু	সুগন্ধ
খুল্লা	দরমা
খামুস	চুপ
খস্লৎ	স্বভাব

গ

গীবৎ	পরনিন্দা
গের্দা	উঁচু বালিশ
গোস্ত্	মাংস
গেন্দুয়া	খেলার বল

চ

চিজ	জিনিষ

জ

জেনা	ব্যভিচার
জেল্দ	মলাট
জেন্দা	জীবিত
জিল্লুল্লাহ্	আল্লার ছায়া
জিম্মা	সংরক্ষণের দায়িত্ব
জাহেল	অজ্ঞান

ত

তেলেস্মাৎ	যাদু
তৌবাস্তাগ্ফেরুল্লা	শয়তান থেকে মুক্তি দাও, আল্লা
তিনকা	খড়কে
তরীবত	স্ফূর্তি, প্রাচুর্য

দ

দোস্ত	বন্ধু
দহ্সৎ	ভয়
দাফন	কবর দেওয়া
দারাখ্ৎ	বৃক্ষ
দব্দবা	প্রতিপত্তি
দীরহাম	মুদ্রা
দস্তুর	নিয়ম

ন

নুরুল্লাহ	দেবজ্যোতি
নেকাব	ঘোমটা

নেমক	লবণ	র	
নসীব	ভাগ্য	রসুমৎ	বাসরশয্যা
নফর	ভৃত্য	রুবাব	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
নিস্ত	নেই	রোক্কাসা	নর্তকী
ফ		ল	
ফরমাবরদার	অনুগত	লাহাওলা	শয়তান থেকে বাঁচার মন্ত্র
ফল্‌সাফা	ফিলজফী, দর্শন	লেবাস	পোশাক
নাফরমান	অবাধ্য	লুৎ	পয়গম্বরের নাম
ফরজন্দ	ছেলে	শ	
ফেরেশ্‌তা	দেবদূত	শান-শওকত	চাকচিক্য, আড়ম্বর
ম		স	
মেহেরবানী	দয়া	সগ্‌গা	সহোদর
মুজরানী	নর্তকী	সীনা	বুক
মহব্বৎ	প্রেম	সাফ্‌ফাহ	রক্তপিপাসু
মালে-এ গনীমৎ	ধর্মযুদ্ধে প্রাপ্ত মাল	সবুৎ	প্রমাণ
মজ্‌কুর	উল্লেখিত	সদ্‌রীয়া	জামা
মাওলা	প্রভু	সুন্‌সাম	নিঝুম
মারহাবা	সাবাস	সীনা-ব-সীনা	বুকে বুকে
মোহাফেজ	রক্ষক	সঙ্গেসার	পাথর দ্বারা চূর্ণ
মোজেজা	অলৌকিক শক্তি	হ	
মেহ্‌মান	অতিথি	হিমাকৎ	আস্পর্ধা
মহবুবা	প্রিয়তম	হাবিয়া	নরক বিশেষ
মুসল্লী	নমাজী	হুর	অপ্সরী
মাকান	ঘর		

২.৪ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

২.৪.০ □ লেখক সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শওকত ওসমান বাংলাদেশের সর্বাগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি অত্যন্তই খ্যাতিমান। শওকত ওসমানের জন্ম ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার হুগলি জেলায়। পড়াশুনো কলকাতায়, সেন্ট জেভিয়ার'স কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন বাংলা সাহিত্য বিভাগে। ওসমানের বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে সুপরিচিত হল: উপন্যাস □ 'হুপ্তম পঞ্চম' (১৯৫৭), 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬৩), 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০), 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩), প্রবন্ধগ্রন্থ □ 'সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই' (১৯৮৩), 'মুসলিম মানসের রূপান্তর' (১৯৮৬) ইত্যাদি। ওসমানকে ১৯৬৬ সালে আদমজি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান তিনি। এছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারি স্মারক স্বর্ণপদকেও তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। উদারপন্থী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং লেখক হিসেবে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষভাবে পরিচিত।

২.৪.১ □ এই উপন্যাসকে যেহেতু সাজানো হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত 'আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা' (সাধারণভাবে যা 'সহস্র এক আরব্যরজনী' ওরফে 'আরব্যরজনী' বলেই পরিচিত) কাহিনিমালার 'হারিয়ে যাওয়া' সর্বশেষ গল্প হিসেবে, তাই মূল আলোচ্য গ্রন্থের বিশ্লেষণে যাবার আগে 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' তথা 'আরব্যরজনী' সম্পর্কে এবং তার সঙ্গে বাঙালির সাহিত্যচর্চা কতটা সংশ্লিষ্ট, সে বিষয়েও প্রথমে কিছু কথা বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.৪.২ □ আরব্যরজনী-কাহিনিমালার মূল আরবীয় নাম হল 'অল্‌কিতাবু অল্‌ফি লয়লথিন্ ওয়্ লয়লথিন।' এর অর্থ: হাজার-একটি রাত্রির গল্পগ্রন্থ। মোটামুটি ভাবে একথা বলা হয় যে, খ্রি ১২শ শতাব্দী থেকে এর কাহিনিগুলি সংকলিত হতে থাকে। আরব, পারস্য, মিশর, ভারতবর্ষ, চিন এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার নানাদেশে প্রচলিত বহু কাহিনিই বিবর্তিত হয়ে এই কাহিনিমালায় সমাহৃত হয়েছে। সুলতান শহ্‌রিয়রকে তাঁর বেগম শহ্‌রজাদি এই কাহিনিগুলি এক হাজার এক রাত ধরে শোনান বলে প্রচলিত আছে। কোনও এক বেগমের চরিত্রবিচ্যুতিতে ক্রুদ্ধ হয়ে শহ্‌রিয়র নাকি নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন বলে প্রতি সন্ধ্যায় একটি করে তরুণীকে বিয়ে করে পরদিন ভোরে তাঁকে হত্যা করতেন। উজিরকন্যা শহ্‌রজাদির সঙ্গে যে রাত্রে বিয়ে হয়, সেই রাত থেকেই নাকি নতুন বেগম এই গল্পের ঝুলি খুলে বসেন-যা চলে একটানা হাজার এক রাত! এরপরে স্বাভাবিক ভাবেই বাদশাহের ক্রোধ নিরসিত হয়ে যায় এবং শহ্‌রজাদিকে নিয়েই তিনি বাকি জীবনটা সুখে নির্বাহ করেন—এমনই বলা হয়েছে 'আরব্যরজনী'র আদি কাহিনিতে।

২.৪.৩ □ গল্পগুলির একটা বড় অংশ বগ্‌দাদকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বহু কিংবদন্তির নায়ক খলিফা হারুন-অল-রশিদ সংক্রান্ত। এ ছাড়া রূপকথা, সামাজিক গল্প, দৈত্য-জিন-পরিহুরি-ইত্যাদি নিয়েও বেশ কিছু অলৌকিক কাহিনি, প্রেমের গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ-ইত্যাদি এতে আছে। ভারতবর্ষ এবং বাংলার উল্লেখও কোনও গল্পে পাওয়া যায়। 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ', 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর', 'সিন্ধবাদ নাবিক' প্রভৃতি গল্প তো সারা বিশ্বেই পরিচিত। ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রোসাং-চট্টগ্রামের কবি আলাওল 'সৈফ-উল-মুলুক্ বদি-উজ্-জামান' নামে যে কাব্যকাহিনিটি লেখেন, সেটিরও আদিরূপ আরব্যরজনী-কাহিনিগুচ্ছে পাওয়া যায়।

২.৪.৪ □ ১৭০০-১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফরাসি লেখক আঁতোয়ান গ্যালী বারো খন্ডে এই কাহিনিগুলি অনুবাদ করেন তাঁর মাতৃভাষায়। আরবীয়-সংস্কৃতির বহিরের জগতে এই কাহিনিগুচ্ছের সেই ছিল প্রথম প্রকাশ। আরবি

ভাষায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি বেরোয় ১৮৩৯-৪২ সালে কলকাতায়। কলকাতা থেকেই তার আগে রামতনু গাঙ্গুলি গ্যালাঁর বইটির ছত্রিশটি গল্পের ইংরেজি ভাবানুবাদ প্রকাশ করেন 'দ্য বিউটিজ অব অ্যারাবিয়ান নাইটস: ওয়ান হানড্রেড অ্যান্ড ওয়ান স্টোরিজ নাম দিয়ে ১৮১৬ সালে। উল্লেখযোগ্য যে, রামতনু শহ্‌রজাদিকে 'ভারতের রাজকন্যা' বলে পরিচিত করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর 'একাল আর সেকাল' (১৮৭০) বইতে তাঁর বাল্যস্মৃতি হিসেবে "আরবি নাইটের পালা" গান শোনার কথা লিখেছেন।

'আরব্য রজনী'-র সবচেয়ে পরিচিত ইংরেজি সংস্করণও সর্বপ্রথম ভারত থেকেই বেরোয়। রিচার্ড বার্টনের ১৬ খন্ডের ঐ অনুবাদগ্রন্থ ১৮৮৫-৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বারাণসী থেকে। বাংলা ভাষাতেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রাহা এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিক 'আরব্যরজনী'-র নির্বাচিত কাহিনি-সংকলন প্রকাশ করেছেন বিশ শতকে।

২.৪.৫ ❒ 'আরব্যরজনী'-চর্চায় বাঙালির একটি অভিনব অবদান হল আলোচ্য এই বিচিত্র, আধুনিক উপন্যাসটি: 'ক্রীতদাসের হাসি'। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩-তে, ঢাকায়। তারপর থেকে এ-অবধি, এই কাহিনির অন্তত বিশটি সংস্করণ বেরিয়েছে—এমনই জনপ্রিয় হয়েছে এই বই বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে। এমন কি, দুই বাংলাতেই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই 'নব্য-আরব্যরজনী'র গল্প পাঠক্রম এবং গবেষণারও উপজীব্য হয়েছে।

'ক্রীতদাসের হাসি'র উপক্রমণিকা হিসেবে যা লেখা হয়েছে সেটা একটা গল্পের মতনই। 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা'-র (হারিয়ে-যাওয়া) সর্বশেষ কাহিনি রূপে এটিকে কল্পনা করেছেন শওকত ওসমান। এ-কাহিনির নাম হল, 'জাহাকুল আব্‌দ': ক্রীতদাসের হাসি। বিস্মৃতপ্রায় নাস্তালিখ্ হরফে লেখা এক পাণ্ডুলিপি থেকে (যেন) সেটিকে উদ্ধার করে অনুবাদ করা হয়েছে জনৈক মৌলানা জালাল নামে পুরানো আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাজ্ঞ এক পণ্ডিতের সহায়তা নিয়ে। এই গল্পের সৃষ্টি কেন, তার আসল পরিপ্রেক্ষিতে যে কী, সে সব কথায় পরে আসব। তার আগে, শওকত ওসমান মূল গল্পের পূর্বকথা হিসেবে যে-কাহিনি লিখেছেন সেটি একটু বলা দরকার:

"হালাকু খানের বগ্‌দাদ ধ্বংসের সময় এই পাণ্ডুলিপি আসে হিন্দুস্থানে। নানা হাত-ফেরীর পর পৌঁছায় শাহ্ সুজার কাছে। তিনি আরাকানে পলায়নের সময় পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদে এক ওমরাহের কাছে রেখে চলে যান। সেখান থেকে জৌনপুর।"

ইতিহাসে-কল্পনায় মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে এই যে-মুখবন্ধ রচেছেন শওকত ওসমান, তাকে একান্তই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য তিনি ঐ কল্প-ইতিহাসকে, নিজের জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু সহপাঠিনী রউফননেসার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে (নাকি) তিনি ঐ 'বিস্মৃত' পাণ্ডলিপির সন্ধান পান। রউফনের বৃদ্ধ পিতামহ, আরবি সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত নব্বই-অতিক্রান্ত শাহ্ ফরিদউদ্দীন জৌনপুরী (নাকি) ঐ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন গ্রামের বাড়িতে। শওকত সবান্ধবে সেখানে বেড়াতে গিয়ে (নাকি) ঐ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন গ্রামের বাড়িতে। শওকত সবান্ধবে সেখানে বেড়াতে গিয়ে (নাকি) তাঁর কাছে পরের বিবরণটি শোনেন এবং পরে, মৌলানা জালালের সাহায্য নিয়ে (নাকি) ঐ 'হারানো' কাহিনির 'অনুবাদ' করেন। মূল 'অরব্যরজনী'র শেষ হয়েছে যেখানে, শাহজাদা হবিবের গল্প সাঙ্গ করে—এই 'হারানো' পুথিতে তার পরের গল্পটি আছে—ঐ 'জাহাকুল আব্‌দ'। এজন্যই 'আরব্যরজনী' গ্রন্থের আসল নাম (নাকি) 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে' (১০০২ রাত্রির কাহিনি)।

২.৪.৬ ❒ একালে রচিত ঐ হাজার-পেরোনো 'দ্বিতীয় রাত্রি'-র গল্পটি শওকত প্রকৃতপক্ষে যে-কারণে লেখেন, তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার স্বাধিকার

প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন সে-দেশের বুদ্ধিজীবীরা এবং ছাত্রসমাজ। অসংখ্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ এই সূত্রে লেখা হয় পরবর্তী তিন দশক ধরে। এই 'ক্রীতদাসের হাসি'-ও সেই সংগ্রামী সাহিত্যধারারই অবিচ্ছেদ্য একটি সৃষ্টি। এর ভূমিকার অর্থাৎ, প্রারম্ভ-কাহিনির শেষ পংক্তিতে শওকত তাঁর আসল অভিপ্রেরণা যে কী, সেটি ব্যক্ত করেছেন:

"বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকার জন্যই তো পৃথিবীতে বাঁচা।"

এ বই যখন লেখা হয়, তখন পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে ওপার বাংলার মানুষের অধিকাংশেরই মানসিক ভেদরেখাটা খুব সুস্পষ্ট। ততদিনে (১৯৬৩), '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পরেও এক দশকের বেশি কেটে গেছে। অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক শোষণ উত্তরোত্তর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। সেই সবটুকু প্রেক্ষাপটই এখানে 'আরব্যরজনী'র কল্পিত পটভূমিতে মিশে গেছে।

২.৫ কাহিনি-সংশ্লেষ

বগদাদের বাদশা হারুণ-অল-রশিদ, তাঁর হাবসি গোলাম তাতারী আর তার আরমেনি স্ত্রী, বাঁদি মেহেরজানের উচ্ছল দাম্পত্যসুখের মুহূর্তে উৎসারিত হাসির শব্দ শুনতে পান আড়াল থেকে। গোলামকে তিনি আমির করে দেন, তার কাজের শর্ত থাকে, ঐ রকম প্রাণখোলা হাসি হেসে শোনাতে হবে বাদশাহকে। অন্যদিকে রূপসী মেহেরজানকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে তিনি নিজের বেগম বানান। তাতারী কিন্তু আর একদিনও হাসে না—রূপসী নর্তকী বুসায়নার দেখানো প্রলোভন, সৈনিকদের উৎপীড়ন সব কিছুই সে উপেক্ষা করে স্পর্ধিতভাবে। তিন বছর ধরে তার ঐ স্পর্ধিত প্রতিরোধের সামনে হারুণ-বাদশা নিরুপায় এবং উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকেন। সেনাপতি মশরুর এবং এক কবি—আবু ইসহাক—তাঁকে প্ররোচিত করেছিল মেহেরজানকে ভোগদখল করতে—যে মেহেরই ছিল তাতারীর প্রাণখোলা হাসির একমাত্র উৎস। স্বাভাবিকভাবেই, তাকে খুইয়ে তাতারীর মুখের সমস্ত হাসিও হারিয়ে গেছে।

বাদশাহের প্রধানা বেগম, জুবায়দা—মেহের ছিল যাঁর অতি প্রিয় বাঁদি, মেহের-তাতারীর বিয়েটাও যিনি ঘটিয়েছিলেন সঙ্গোপনে—তিনি এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা মেনে নিতে গিয়ে অসহায় বলে বুঝতে পারেন নিজেকে। এই তিন বছরে মেহেরও বাদশাহ-মহলের সুখের জোয়ারে ভেসে ভুলে গেছে নিজের অতীত।

অন্যদিকে, বাদশাহের সহচর আরেক কবি, আবু নওয়াস তাঁকে স্পষ্ট মুখের ওপর শুনিয়ে দেন এভাবে মানুষের বিবেককে বন্দী করা যায় না। তাতারীর মুখে কথা এবং হাসি ফোটানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, মানসিক-পীড়ন করার জন্য বাদশাহ 'বেগম' মেহেরজানকে তার সামনে নিয়ে আসেন। মেহেরের পূর্ব-স্মৃতি ফিরে আসে—তাতারীর মুখেও শব্দ ধ্বনিত হয় চার বছর পরে, সে বুঝিয়ে দেয় দিরহাম-দৌলত দিয়ে গোলাম খরিদ করা যায়, কিন্তু, 'হাসি—না, না, না"- আর সেই বিবেক-জাগরূক কবি আবু নওয়াস বলে: "আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।"

২.৬ কাহিনির রূপক-বিশ্লেষণ

পুরো কাহিনিটাই রূপক-কল্পনা। হারুন-অল্-রশিদ—বাদশাহ আলম্পনা—তিনি এই নব্য-'আরব্যরজনী'র গল্পে আসলে পাকিস্তানি শাসকতন্ত্রের প্রতিভূস্বরূপ। বেগম জুবায়দা হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন বৃহত্তর-সংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিকল্পা। সেনাপতি মশ্রুর, অনুগত-কবি ইসহাক, আলেম আব্দুল কুদ্দুস এঁরা সবাই পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী, মাথা-বিকানো লোভী বুদ্ধিজীবী এবং ক্ষমতাসীনের প্রসাদভিক্ষু ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতীকী চরিত্র। আবু নওয়াস এবং আবুল আতাহিয়া—স্পষ্টবক্তা এই দুই কবি হলেন ১৯৫২-র পরবর্তীকালে অধিকাংশ বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ প্রতীক-চরিত্র। আর ক্রীতদাস তাতারী হল পূব-বাংলার আমজনতা এবং তার প্রাণপ্রতিমা মেহেরজান—সে তো বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং আত্মসম্মানেরই অভিজ্ঞান।—এই নব্য-'আরব্যরজনী'র গল্পের অন্তর্বিলীন রূপটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই আর কোনও অসুবিধা হয় না।

বাঙালিকে গোলাম বানিয়ে তার আত্মিক সত্তাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল পাক শাসকগোষ্ঠী। নামে সমানাধিকার দিয়ে (এখানে যা তাতারীকে গোলামি থেকে 'মুক্তি' দেবার প্রহসন) তারা চেয়েছিল তার অনুভব এবং অভিব্যক্তি, ('হাসি' যার রূপক এখানে) এবং তার ঐতিহ্য এবং আত্মচেতনাকে (এখানে, মেহেরজান) কেড়ে নিতে। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী (কবি ইসহাক) সৈন্যবাহিনী (মশ্রুর), ধর্মগুরু (আবদুল কুদ্দুস) তাতে মদৎ দিয়েছিল। মশ্রুরের মুখের বুলিই হল, "আস্‌সামায়ো তায়তান"—আদেশ শোনা মানেই তা মানা। সে সাবধান করে বাদশাহ্‌কে : "স্মৃতি সমস্ত কওমকে (জাতিকে) জিন্দা করে তুলতে পারে জনাব" অতএব ভুলিয়ে দিতে হবে সমস্ত স্মৃতি—যা কওমের আপন-ঐতিহ্য। ইসহাক মেহেরজানের রূপে-উন্মত্ত বাদশাহ্‌কে সলাহ্ দেয়, জীবন এবং যৌবন কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না যেহেতু তাই মেহেরজানকে আপনি ভোগদখল করুন। আলেম কুদ্দুসও ধর্মীয় ফতোয়া দিয়ে বিধান দিলেন সেই একই মর্মে। অতএব বাদশাহ গোলামকে আমির বানালেন : বাঙালি জনতাকে নামকা-বাস্তে সমপর্যায়ভুক্ত বলে ঘোষণা করল পাক শাসনতন্ত্র। আর, আরমেনি বাঁদিকে আরও বড় ইনাম—বেগমগিরি!...বাঙালির সংস্কৃতিকেও বাদশাহি কায়দায় গ্রাস করা হল আচম্বিতে।

অন্যদিকে, বুদ্ধিজীবী বাঙালির প্রতীক-প্রতিম কবি নওয়াস বলেন, "আমিও মনের অন্ধকারে এমনই আকাশ রচনা করে যাব।" তিনি বাদশাহের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "এই বিচার ভুল, জাঁহাপনা"; বলেছেন, 'টিকে থাকবে শুধু বিবেক এবং বিবেকসাধনা। ও কেউ ধ্বংস করতে পারে না।...তাই আজ অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালুম আমি কবি, চিরন্তনের কণ্ঠস্বর।..বগ্‌দাদের (পড়ুন, বাংলার) প্রেম আমাকে বানিয়েছে কবি, বগ্‌দাদের (পড়ুন, বাংলার) প্রেম আমাকে করে তোলে শহীদ।"

কাহিনির শেষ মেহের বলেছে, "গোলামের প্রেম ধ্রুবতারার মতো স্থির..কিন্তু আমি তো বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হয়ে গেলাম.." এ আর্তনাদ অপহৃত বঙ্গ-সংস্কৃতির, তার বুকের আবেগ, মুখের ভাষার। 'আরব্যরজনী'র মধ্যযুগীয় মধ্যপ্রাচ্যের পটপ্রেক্ষার অন্তর্কাঠামোয় নূতন এক মাত্রাবিন্যাস করে মধ্য-বিংশ শতাব্দীর পূর্বপাকিস্তানকে পরোক্ষে বিম্বিত করেছেন শওকত ওসমান, নতুন এক 'অ্যারাবিয়ান নাইট্‌স'-এর রচয়িতা একালের বাঙালি ঔপন্যাসিক।

মেহেরের এই আর্তনাদেই সচকিত হয়ে স্তব্ধ, মৌন প্রতিরোধী গোলাম তাতারী প্রতিবাদে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, বাদশাকে তাচ্ছিল্য করে তাঁর নাম ধরে ডেকে বলে, 'হাসি' কেনা যায় না; মানুষের আত্মাকে কেনা যায় না—

কেন না (কবি নওয়াসের শেষ কথায়) আত্মার ধ্বনিই যেহেতু হাসি।...এই এক আশ্চর্য রূপকথা শওকত ওসমান আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই রূপকথা পুব বাংলার মানুষের আত্মবীক্ষণ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে টলটলে। তাঁদের প্রতিরোধের দৃঢ়তায় আতপ্ত। শুধু, সেটা জড়ানো রয়েছে 'আরব্যরজনী'র পোশাকে, বাদশাহি লেবাসে।

২.৭ 'ক্রীতদাসের হাসি'-তে বাস্তব চরিত্র

'আরব্য রজনী'-র আবহটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপে দেখানোর জন্য শওকত ওসমান শুধু বগদাদ, হারুন-অল-রশিদ এবং মধ্যযুগীয় পটপ্রেক্ষিতের চিত্রায়ণই করেন নি, এই '১০০২-তম' কাহিনিতে এমন দুটি চরিত্রকে এনেছেন যাঁরা বাস্তবে তো ছিলেনই, আবার সহস্রাধিক এক কাহিনিরও কোনও-কোনওটির সঙ্গে তাঁরা সম্পৃক্ত। এঁরা হলেন দুই কবি : আবু নওয়াস এবং আবুল আতাহিয়া। মধ্যযুগের আরবীয় কাব্যসাহিত্যে এঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুজন ব্যক্তিত্ব। এমন কি, এই আধুনিক আরব্যরজনীতেও তাঁদের ব্যক্তি-পরিচয়ের যা আভাস পাওয়া যায়, তা তাঁদের বাস্তবজীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গেও সাযুজ্যে এবং সামঞ্জস্যে পূর্ণ।

বাস্তবেও এই দুই কবি ছিলেন সমসাময়িক : আবুল আতাহিয়ার (খ্রি. ৭৪৮-৮২৮) এবং আবু নওয়াস (খ্রি. ৭৬২-৮১৫) দুজনেই হারুন-অল-রশিদের প্রীতিধন্য ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবেও তাঁদের উল্লেখ মেলে। কুফা নগরীতে গিয়ে বসবাসের সময়ে এক রূপসী বাঁদির প্রণয়াসক্ত হবার ব্যাপারটা বাস্তবে আবুল আতাহিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছিল , এখানে সেটা অবশ্য আবু নওয়াসের আত্মস্মৃতিচারণে বর্ণিত হয়েছে। আবার বাদশাহ হারুনের কথা অমান্য করায় বন্দিত্ব এবং কশাঘাতের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আতাহিয়ার : এখানে কল্পিত চরিত্র তাতারীকেই সেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আবু নওয়াসের উল্লেখ 'আরব্য রজনী'র বেশ কিছু গল্পেই মেলে। তাঁর রসবোধ, পরিহাস-দক্ষতা, উপস্থিতবুদ্ধি এবং মাতাল হয়ে কবিতা আওড়ানোর সূত্রে খলিফা হারুনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঐ সব কাহিনির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে। এই ভাবমূর্তিটি 'ক্রীতদাসের হাসি'-র মধ্যেও বজায় রেখেছেন শওকত ওসমান। 'আরব্যরজনী'র বেশ কয়েকটি কাহিনি তাঁর রচনা বলে বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই নব্য-আরব্যরজনীর গল্পটির চূড়ান্ত ভাবব্যঞ্জনাও তাঁরই উক্তির মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়েছে : "হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।"

২.৮ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শওকত ওসমানের এই বিচিত্র রূপকোপন্যাসের বিশ্লেষণে আগ্রহী পাঠক মাত্রেই গ্রন্থ সমাপ্ত করার পর অনিবার্যভাবেই উপলব্ধি করবেন একটি অকাট্য সত্য : এ-কাহিনির আবেদন দ্বিমাত্রিক। একটি মাত্রায় রয়েছে রূপকের অন্তরালে আত্মগোপন করা সমকালীন রাষ্ট্রীয় রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যঞ্জনা; আর অন্য মাত্রাটি গড়ে উঠেছে প্রধান কয়েকটি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের অভিঘাতে ঋদ্ধ হয়ে।

প্রধান চরিত্র এখানে তিনটি-বাদশাহ্ হারুন-অল-রশিদ, তাতারী এবং মেহেরজান। এর পরেই গুরুত্বপূর্ণ হলেন বেগম জুবায়দা, দুই কবি আবুল আতাহিয়া এবং আবু নওয়াস, আর নর্তকী বুয়াসনা। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই

নানা পর্যায়ে মানসিক টানাপোড়েনের চমৎকারভাবে বিন্যাস করে শওকত ওসমান সামগ্রিকভাবে এক আশ্চর্য জটিল মনস্তাত্ত্বিক বুননে এ-কাহিনির বিন্যাস করেছেন।

২.৯ হারুন-অল-রশিদ

এই মানুষটির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভাবরূপের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় : 'রাজসিংহ', উপন্যাসের ঔরংজীব এবং 'রক্তকরবী' নাটকের যক্ষরাজ। এই দুজনের মতোই বগ্দাদের বাদশাহও সর্বশক্তিমান এবং নির্মম, স্বার্থপরায়ণ শাসক আর মানসিকভাবে একান্তই নিঃসঙ্গ, অসহায় এবং তৃষ্ণার্ত। 'রাজসিংহ'-এ নির্মলার কাছে ঔরংজীব যেমন "দু-দণ্ড শান্তি" আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, "রক্তকরবী"-তে নন্দিনীর সান্নিধ্যে যেমন স্নিগ্ধ হতে চেয়েছিলেন যক্ষপুরী-অধীশ মকররাজ-ঠিক তেমনই এখানেও নিজের প্রেমহীন, রুক্ষ, শুষ্ক আরব-মরুভূমির মতো হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে যৌবনোদ্ভাসের প্রতীক-স্বরূপ খোলা গলার হা-হা হাসির উৎস খুঁজে পাবার ব্যর্থ বাসনায়, হাবসি গোলামের রূপসী আরমেনি প্রেমিকা মেহেরজানকে তিনি ধরে নিয়ে গেছেন আপন হারেমের সুখশয্যায়।

নন্দিনীর প্রাণোচ্ছলতার উৎস যে রঞ্জনের ভালোবাসা, নির্মলার স্নেহস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রেরণা যে মানিকলালের সঙ্গে তার আত্মিক নিবিড়তা-এই গূঢ় সত্যদুটি বোঝেন নি যথাক্রমে যক্ষরাজ এবং ঔরংজীব। ঠিক তেমনই, তাতারী-মেহেরজানের প্রেমের যুগল অভিব্যক্তিই যে তাদের উচ্ছ্বসিত হাসির উৎস, এটা বোঝেন নি বাদশা হারুন। তাতারী এবং মেহেরকে ঐহিক-সুখের সম্ভারে ভরিয়ে দিয়েও তিনি ব্যর্থ ঐ আনন্দের কলস্বন তাদের গলায় শুনতে। বেগম হবার 'সৌভাগ্যে' মেহের আপাতভাবে বিভ্রান্ত হলেও, সেই 'সুখে' যে হাসির ঝরনা ঝরে না, কাহিনির শেষে সেও সেটা হারুনকে বুঝিয়েছে। আর তাতারীর কাছে তো তিনি পরাস্ত প্রথম থেকেই। ধনদৌলত, প্রাসাদ, সাজসজ্জা, ভৃত্য, সহকারী, প্রগল্ভা সুন্দরী নারী-সব কিছু দিয়েই তিনি তাকে ভোলাতে চেয়েছেন। সে ভোলেনি এবং হাসে নি। এই পরাভবের জ্বালায় তিনি তাতারীর ওপর নির্মম অত্যাচার করিয়েছেন; রাগে অন্ধ হয়ে মেহেরকে প্রহরীদের হাতে তুলে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করিয়েছেন—কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে।

হারুন একই সঙ্গে অসহায় ও বিপন্ন নিজের অন্তরে, আবার ক্রূরতা, অহমিকা, নৃশংসতাও তাঁর চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বংশগৌরব যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য তিনি নিজের সহোদরা ভগ্নীকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন-পাছে সে তার প্রেমিক উজির বার্মেকীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। বিরাট তাঁর হারেম; অথচ মানুষটিকে শুধুমাত্র নারীলোভী এমনও বলা যাবে না। মেহেরকে তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন তাতারীর কাছ থেকে নিজের নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েমের জিদে; অথচ ব্যর্থতার আক্রোশে তাকেই প্রহরীদের হাতে তুলে দিতেও তাঁর বিন্দুমাত্র বাধেনি। বেগম জুবায়দার মতো মহীয়সীকে সহধর্মিণী হিসেবে পেয়েও তিনি তাঁর প্রতি উদাসীন থেকেছেন। অথচ প্রতিমুহূর্তেই স্তাবক, অনুচর, সিপাই, সান্ত্রী, দাস, দাসী, নর্তকীদের দ্বারা পরিবৃত হয়েও তিনি চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ এবং করুণ।...এই দ্বিধায় বিভক্ত তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে এসব কারণেই হারুন অল রশিদ একটি চূড়ান্ত ট্র্যাজিক চরিত্র। এতটাই তিনি অন্তরে-অন্তরে দুর্বল যে, স্পষ্টভাষী কবি আবু নওয়াসের তীব্র তিরস্কার এবং চেতাবনির সামনেও তিনি প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ-তাঁর অসহায় অবস্থাটা এমনই ভঙ্গুর যে, সেই তীক্ষ্ণ তিরস্কার তাঁকে মাথা নিচু করে শুনতেই হয়।

কিংবদন্তিতে বাদশাহ হারুন অল রশিদ প্রজাহিতৈষী, সুবিবেচক এবং মহদাশয় বলে কথিত হলেও, শওকত ওসমান এখানে তাঁকে সেই প্রথাসিদ্ধরূপে চিত্রিত করেন নি। তবে বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটি আর্তিকে যেভাবে লেখক ফুটিয়ে রেখেছেন আগাগোড়া, তাতে হারুন চরিত্রটি একান্তভাবে মানবিকই হয়ে উঠেছে-তিনি এ কাহিনির নায়ক হতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু খলনায়কও হয়ে ওঠেন নি। অবিমৃষ্য-অহমে জর্জরিত, নিজের কাছেই পরাভূত এক ট্রাজিক শাসক হিসেবেই এই উপন্যাসে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন।

২.১০ তাতারী

সে-ই হল এ-উপন্যাসের নায়ক। আবিসিনিয়া থেকে বন্দী হিসেবে ধরে এনে ক্রীতদাস বানিয়ে রাজসেবা করালেও বগ্দাদের রাজপুরুষেরা তার স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বপূর্ণ আত্মবিশ্বাসকে একটু ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। সে তার প্রতীতিতে অটল, প্রেমে অবিচল এবং প্রতিবাদে ইস্পাত-কঠিন। প্রাণের আনন্দকে সে উচ্ছ্বসিত করতে জানে, কিন্তু কোন বাদশাহি ফরমানের সামনে শির অবনত করে নকল হাসি হাসতে স্বীকার করেনি তাতারী।

রাজার প্রসাদলব্ধ ঐহিক ধনবৈভব তার কাছ উপেক্ষণীয়। ঘটনাচক্রে, ক্রীতদাস থেকে ধনী এক মনিবে রূপান্তরিত হলেও (বরং বলি, রূপান্তরিত করা হলেও) সে তার অধুনা ভৃত্য-সেবক-কর্মচারীদের প্রাপ্য মানবিক সম্মান দিয়ে হৃদ্যতার সম্পর্কই গড়তে চেয়েছে। মেহেরের প্রতি তার প্রেম এমনই সুদৃঢ় যে, বগ্দাদের সর্বজনের পরমতম আকাঙ্ক্ষার ধন, পরমারূপসী নর্তকী বুসায়নার লজ্জাহীন প্রগল্ভ ছলাকলার লোভানিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে অনায়াসেই। নিজের প্রেমিকার কাছে তাতারী যত আবেগ-তাড়িতই হয়ে থাকুক না-কেন, দ্বিতীয় কোনো নারীর যৌবন তাকে পদস্খলিত করাতে পারে না, দীর্ঘসময় প্রেমিকার সান্নিধ্যবঞ্চিত হয়ে থাকলেও। বরঞ্চ, প্রগল্‌ভা, নির্লজ্জা, বহুচারিণী নর্তকী বুসায়নাকেও তাতারী প্রকৃত প্রেমের পবিত্রতার স্বরূপ যে কী, সেটাই বোঝাতে চেষ্টা করে এবং তার প্রয়াসে সে সফলও হয়। তার অন্তর বিকশিত হয় : পবিত্র হয়।

রাজবৈভবের প্রসাদপুষ্টা, বহুতোষিণী, নির্লজ্জা বুসায়নার অন্তরের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া আসল সত্তাটিকে জাগিয়ে দিয়েছে তাতারীই। তাতারীর পবিত্রতা-ভরা চিত্তের সংস্পর্শে এসেই সে নিজের গরিমার-খোলসে-মোড়ানো অবমাননার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাতারী যিশাস ক্রাইস্ট নয় ঠিকই; কিন্তু বাইবেল-কাহিনিমালার সে মেরি মাদলিনের মতোই এই বুসায়নাকেও সে ঘৃণ্য গণিকাজীবন থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পেরেছে, তাকে তার "আত্মার সন্ধান" দিয়েছে মহামানব না-হওয়া সত্ত্বেও। বুসায়নার আত্মহত্যায় অবশ্য তাতারীর কোনো দায়িত্ব নেই-কারণ ঐ গ্লানিময় এবং ত্রস্ত জীবন থেকে সে তো নিজেই এইভাবে রেহাই খুঁজে নিয়েছে।

কাহিনির শেষে, তাতারীকে আমরা দেখেছি দমন-পীড়ন-সন্ত্রাসের সামনে-দাঁড়ানো এক অনবনত বীর প্রতিস্পর্ধী হিসেবেই। অথচ, তার আগে বুসায়নার মৃত্যুতে সে যেভাবে ভেঙে পড়েছিল (মোহাফেজের ভাষায়) যে "বহেনের জন্যেও তো কেউ এমন করে না।" কোমলে-কঠিনে বিমিশ্র এমন এক বিচিত্র-ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাতারী উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে এসে কিন্তু একটি আতীব্র-প্রতিবাদী, প্রতিরোধী এবং সংগ্রামী মানুষের চিরকালীন প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

মৌনমুখ তাতারী তিন বছর ধরে বাদশাহি ইনাম এবং বাদশাহি শাস্তি-দুইকেই অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করেছে। খোদ আমিরুল মুমেনীন বাদশাহ হারুন অল রশিদের সমস্ত হুকুমকে নিস্তব্ধ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অমান্য করেছে।

তিন বছর ধরে সে তার লুট-হয়ে-যাওয়া প্রেমের স্মৃতিকে সত্তায় অবিচল রেখেছে ধ্রুবতারার মতো। যে-প্রেম তার গলায় ঝর্ণালহরের মতো হাসিকে উচ্ছ্বসিত করত, তার অভাবে বাদশাহের হাজার-অনুনয় এবং উৎপীড়নেও ঐ হাসিকে সে রাজার মনোরঞ্জনের জন্য উচ্ছ্বলিত করেনি।

আসলে, সমকালের সংগ্রামী বাঙালির সত্তাপ্রতীক হিসেবে তাতারীকে এইভাবেই রূপকাশ্রিত করতে চেয়েছিলেন শওকত ওসমান। তার প্রেম, তার আবেগ, উচ্ছ্বাস, পবিত্রতোয়া, অন্তর, অমেয় সহ্যশক্তি, অসীম দুঃখবরণের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম এক সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব-এই সমস্ত কিছু মিলেই তার চরিত্রের পূর্ণায়ত রূপটিকে ব্যক্ত করেছে 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের মধ্যে। প্রখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসে প্রাচীন রোমের ক্রীতদাস-বিদ্রোহের মহানায়ক স্পার্টাকাসকে যেমনভাবে প্রমূর্ত প্রতিরোধের প্রতীক-পুরুষ হয়ে উঠতে দেখি, এখানেও তাতারীর চরিত্রনির্মাণেও প্রায় অনুরূপভাবেই সফল হয়েছেন শওকত ওসমান। পার্থক্য শুধু এটাই যে, এখানে গণবিপ্লবের অধিনায়ক নয়—তার প্রতিরোধ একক, যদিও, কাহিনির রূপকের অন্তরালে গণসংগ্রামেরই প্রতীকী নায়ক সে!

২.১১ মেহেরজান-জুবায়দা-বুসায়না

এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি নারীই এক স্বৈরাচারী শাসকের-পাতা-বেড়াজালে অসহায়ভাবে বন্দিনী। শওকত ওসমান এই তিনজনকেও তাঁর রূপক-কাহিনির প্রতীকী চরিত্ররূপেই গড়ে তুলেছেন। মেহেরজান হল, ভাষা-আন্দোলনকে উপলক্ষ করে উৎসারিত বাঙালির জাতীয়তাবোধ-এবং-স্বাভিমানের আংশিক প্রতিভূ; স্বৈর-শাসক হারুন এবং তার সিপাহ্-সলার মশরুর (পড়ুন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের অনুগত সৈন্যবাহিনী) তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে 'বেগম' পদে বৃত করেছে (অর্থাৎ, এক কথায় ইনাম দিয়ে তার বিবেককে খরিদ করতে চেয়েছে), তাতে সে কিছুকাল বিভ্রান্তও হয়েছে; কিন্তু, পরিণামে সে ফিরে পেয়েছে তার স্বকীয় পরিচয়কেই, তাই সেও বিদ্রোহিনী হয়েছে এবং ফলশ্রুতি হিসেবে প্রহরীরা তাকে টেনে নিয়ে গেছে রাজার হুকুমে। তখন আর সে 'বেগম' বলে গণ্য হয় না; রাজার কথাতেই সে তখন এক সাধারণী নারী মাত্র ("বিবি")!

বাদশাহি শাসনে নিরুপায় হয়ে মেহেরজান তাতারীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর হারুনের হারেমে ঢুকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। দীর্ঘ তিনটি বছর ঐভাবে বৈভবের বন্দীশালায় আটক থেকে এবং তাতারীর কোনও সমাচারই না-পেয়ে হয়ত বা সে ধরেছিল যে তার দয়িত সেই হাবসি দাস চিরতরে হারিয়ে গেছে। ঠিক এইজন্যেই বন্দী-অবস্থায় প্রহারে-প্রহারে বীভৎস-হওয়া তাতারীর সামনে এসেও সে তাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। যখন চিনল, সেই মুহূর্তেই তার স্মৃতিতে ফিরে এল পুরানো সব দিনের কথা এবং অনমনীয় প্রতিবাদী প্রেমিকের পাশে নিজের নিরুপায় আত্মসমর্পণের দৌর্বল্য মেহেরকে করে তুলল আত্মগ্লানিতে জর্জর। এই নিদারুণ বিবেকের যন্ত্রণা এবং সব পেয়েও, বস্তুত 'সব' কিছুই হারানোর হাহাকার তাকে গ্লানি এবং অনুতাপে ক্লিষ্ট করল—যা তার কথায় ব্যক্ত হয়েছে : "গোলামের প্রেম ধ্রুবতারার মতো স্থির...কিন্তু আমি তো বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হয়ে গেলাম...আর বান্দী থাকলাম না...."

এই অনুতাপের তপ্ত অশ্রুতে নিষ্ণাত হয়ে কাহিনির অন্তিম মুহূর্তে বাদশাহের ব্যভিচারের খাঁচায় বন্দিনী বিলাস সহচরী মেহেরজান দেহমনের সমস্ত গ্লানিকে ধুয়ে ফেলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে—যার শাস্তি হিসেবে তৎমুহূর্তেই সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতরস্বভাব প্রহরীদের কবলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তের এই উত্তরণ মেহেরজানকে মোহনীয়া থেকে মহনীয়ায় পরিণতি দিয়েছে।

বেগম জুবায়দা সম্ভবত এই কাহিনির সবচেয়ে দুঃখী, উপেক্ষিত এবং অপমানিত চরিত্র। উপন্যাসে তিনি যে রাজনৈতিক-রূপকের প্রতিভূ—সেটি আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মনস্তত্ত্বের নিরিখে তাঁকে বিচার করলে তাঁর ঐ বেদনার্ত, লাঞ্ছিত অস্তিত্বটিকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি।

মেহেরজান ছিল তাঁর পরম স্নেহের পাত্রী। তিনি স্বয়ং উদ্‌যোগ করে তাকে স্বামীর কাছে পাঠাতেন। নিজের স্বামীর বহুচারিতার পাশাপাশি হাবসি গোলামের প্রেমের নিষ্ঠাকে তুলনা করেই, তিনি সেই একনিষ্ঠতার পুরস্কার স্বরূপ তার রূপসী প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে দেন সঙ্গোপনে (কারণ, মেহেরের মতো সুন্দরী তাঁর স্বামীর নজরে পড়লে যে, তার আর রক্ষা থাকবে না এটা তিনি ভালই বুঝতেন।)—এবং তাদের নিরাপত্তারও প্রয়াসী ছিলেন তিনি। স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত এই নারী মেহেরকেই একান্ত আপনজন বলে আঁকড়ে ধরেন—তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো, সখির মতো মেশেন।

কিন্তু, ঘটনা-পরম্পরায় সেই মেহেরই যখন বাধ্য হল তাঁর সপত্নী হতে, এই নারীর জীবনে আর কিছুই অবলম্বন রইল না তারপর থেকে। সাম্রাজ্ঞী হয়েও তিনি তখন দীনা ভিখারিণির থেকেও বেশি নিঃস্ব। এই রিক্ত, করুণ চরিত্রটিকে কাহিনিতে তারপর থেকে আর প্রয়োজন হয়নি। তাই অতিস্বল্প আয়তনের একাদশ পরিচ্ছেদের শেষ পংক্তিতে এসে শওকত ওসমান তাঁকে এভাবেই সান্ত্বনা, সমব্যথিত্ব জানিয়েছেন : "কল্পনা ত মিথ্যা হয়ে যায় না। মহাকাল তাকে বরণ করে। নির্জনতা-বিহারী মেহেরজান নাই বা এলো কোলাহলের জোয়ারের মতো। বিশাল আকাশ। তাই ত নক্ষত্রেরা নিঃসঙ্গ। আপনার প্রাণের অসীমতায় শুধু দুটি শুকতারা (পড়ুন, দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার দীপ্তোজ্জ্বল মুখ) জেগে থাকে।...আদাব, বেগম সাহেবা।" লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও যেন সেই অভিবাদনে অংশ নেয়।

বুসায়না এই কাহিনির তৃতীয়া নারী এবং মনোবিচারের মানদণ্ডে সেও এক পরম করুণ চরিত্র। বাদশাহি প্রসাদে সে ধনী, বিলাসিনী এবং শ্লথচরিত্রা একজন রোক্কাসা (নর্তকী)। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উচ্ছৃংখল অভিজাতরা তো শুধু নিজেদের বিশালায়তন হারেম নিয়েই তৃপ্ত থাকত না—থাকতে পারত না! তাই প্রয়োজন হতো বুসায়নাদেরও। এই বিলাসিনী গণিকাকে অন্যতর প্রয়োজনেও হারুণ ব্যবহার করেছেন এই কাহিনিতে। তাতারী কী ধাতুতে গড়া যে, সেটা বোঝার ক্ষমতা ছিল না সর্বশক্তিমান্ বলে নিজেকে ভাবা বাদশাহ হারুনেরও! তাই রূপসী গণিকার লোভানি দেখিয়ে তিনি তাতারীর মন থেকে মেহেরকে মুছতে চেয়েছেন, যাতে এই নির্লজ্জা নর্তকীর রূপযৌবনের সান্নিধ্যে থেকে সে আবার হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বুসায়নার ব্যর্থতায় একই সঙ্গে আরও দুটি বিষয় উন্মোচিত হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে; এক তাতারীর চরিত্রের শ্রদ্ধার্হ একনিষ্ঠতা এবং পবিত্রতার বোধ; আর, দুই বুসায়নার চিত্তের উন্মীলন। তাতারীর প্রসঙ্গ একটু আগেই বলেছি—শুধু নারীর প্রেম সম্পর্কে তার উপলব্ধির সত্য অভিজ্ঞানটি যে ঠিক কী ছিল, সেটি এই সূত্রে অনুধাবনযোগ্য : "প্রেমিকা নারী...সমস্ত লজ্জা সংকোচ একটি হৃদয়ের জন্যই সঞ্চিত রাখে।" বুসায়না এতকাল রূপযৌবনের বেসাতিই করেছে শুধু—নারীর মাতৃমূর্তি, প্রেমিকামূর্তি ছিল তার ভাবনার সীমানার বাইরে জিনিষ।

তাতারীর কাছে সেই অন্যতর, মহত্তর নারীত্বের ভাবরূপগুলির পরিচয় পেয়ে তার যেন নবজন্ম ঘটল! প্রেমের পবিত্রতা, নারীর সহজাত লজ্জা এবং সম্ভ্রমের অভিভব—এই সব সম্পর্কে তার চেতনা লাভের অনুষঙ্গ হিসেবেই, এত দিনের সঞ্চিত-নির্লজ্জতার ভার তার কাছে অসহ হয়ে উঠল : আত্মগ্লানিতে জর্জর হয়ে বুসায়না বেছে নিল আত্মহননের মাধ্যমে তার এতদিনের ঘৃণ্য, কলঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি।

২.১২ দুই কবি

আবুল আতাহিয়া এবং আবু নওয়াস, এই কল্পকাহিনিতে এ-দুটি বাস্তব চরিত্র এখানে যেন স্বয়ং লেখকেরই বক্তব্যকে বাঙ্ময় করেছেন—বিশেষত আবু নওয়াস। বাদশাহকে মুখের ওপর সত্য কথা বলে দেওয়ার জন্য এ-দুই কবি কাহিনির ভারসাম্য রক্ষা করেছেন যে, এটা মানতে হবে। রাজশাসনের 'ধামাধরা' কবি ইসহাকের সঙ্গে এখানেই তাঁদের পার্থক্য। যে সব নির্মম সত্য বাদশাহের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আবু নওয়াস দরবারে দাঁড়িয়ে সরাইখানার 'দরবারী' অভিনয়ের দৃশ্যে তারই প্রতিধ্বনি শুনি আমরা অনামা তরুণের কণ্ঠে : দরবারে সেই সত্যভাষণের জন্য আমিরুল মুমেনীন বাদশাহ হারুণ অল রশিদ কবিকে কোনও শাস্তি দিতে পারেন নি, তিক্ত সেই তিরস্কার তাঁকে গিলতে হয়েছে। সরাইখানায় 'আসল' আবু নওয়াস উপস্থিত হলে, তাঁকে যেভাবে সকলে সংবর্ধিত করে এর পরে, তার থেকে এটা সুস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, এই ক্ষেত্রে বগ্‌দাদের সাধারণ মানুষ, তাতারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধেই।

আর সেই বিরুদ্ধতা গাঢ়বদ্ধ হয়েছে আবু নওয়াসের জন্যই। উপন্যাসের যবনিকাপতনের অচির-পূর্বে তাঁর মুখেই ধ্বনিত হয়েছে, সেই কাহিনির অভীপ্সিত জীবনদর্শন : "হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি!"—কোনও জালিম সামন্তপ্রভুর নির্দেশে সেই পরমসত্যের হেরাফেরি ঘটে না। এই স্বল্পব্যাপ্ত চরিত্র হলেও তাঁর গুরুত্ব এ কাহিনিতে অপরিসীম। আবুল আতাহিয়ার সঙ্গে তাঁর আলাপগুলি এ উপন্যাসের প্রমেয় ভাবরূপকেই নির্দিষ্ট করেছে নিঃসন্দেহে।

২.১৩ অনুশীলনী

২.১৩.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রাজনৈতিক-রূপমালাকে বিশ্লেষণ করে দেখান।

২. 'ক্রীতদাসের হাসি'-র মুখবন্ধটি কতখানি প্রয়োজনীয় এই উপন্যাসের পক্ষে আলোচনা করুন।

৩. শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের মুখবন্ধ এবং মূল কাহিনি—দুয়েরই সমাপ্তি ঘটিয়েছেন দুটি গভীর তাৎপর্যময় উক্তির মাধ্যমে; উক্তিদুটি উদ্ধৃত করে তাদের তাৎপর্য কী, বিশদভাবে বলুন।

৪. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের সঙ্গে 'রাজসিংহ' এবং 'রক্তকরবী'—এই বিখ্যাত দুটি বই কতখানি পর্যন্ত তুলনাযোগ্য, বলুন।

৫. হারুণ-অল-রশিদ এবং স্বৈরাচারী শাসক এবং নিঃসঙ্গ এক হতাশ মানুষ—এই দুটি পৃথক সত্তার দ্বন্দ্বে দীর্ণ;—একথা কতটা সত্য?

৬. তাতারী "প্রতীতিতে অটল, প্রেমে অবিচল এবং প্রতিবাদে ইস্পাত-কঠিন"—এই কথার পরিপ্রেক্ষায় তার ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করুন।

৭. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের তিনটি নারীই কোনও-না-কোনও ভাবে বন্দিনী হবার যন্ত্রণায় উৎপীড়িত এবং অসহায়— উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ করে এই কথার তাৎপর্য নির্ণয় করুন।

৮. 'ক্রীতদাসের হাসি' একটি মাত্রায় রাজনৈতিক উপন্যাস, অন্য মাত্রায় এটি মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণযোগ্য একটি কাহিনি— একথা কতদূর মানা যায়, বলুন।

২.১৩.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'আরব্যরজনী' কাহিনিমালার আদি-গল্পটি কী?

২. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের অন্তর্গত ঐতিহাসিক-চরিত্রগুলির পরিচয় দিন।

৩. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের আবু নওয়াস এবং আবুল আতাহিয়া—এই দুই কবির উপস্থিতি কতখানি অনিবার্য, আলোচনা করুন।

৪. নারীর প্রেম সম্পর্কে তাতারীর উপলব্ধিগুলি কী, বলুন।

৫. বুসায়নার আত্মহননের কারণ কী?

৬. সরাইখানায় অভিনীত 'দরবারী দৃশ্য'-টির তাৎপর্য কী, বিচার করুন।

৭. কাহিনির মধ্যপর্ব থেকে বেগম জুবায়দার হারিয়ে যাওয়া কতটা স্বাভাবিক সঙ্গত হয়েছে?

৮. মোহাফেজ এবং তাতারীর সংলাপ কাহিনির কোন্ প্রয়োজন সাধিত করেছে?

৯. ইসহাক এবং আব্দুল কুদ্দুসের মন্ত্রণা 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণামকে কীভাবে তরান্বিত করেছে?

১০. 'ক্রীতদাসের হাসি' নামটুকুর ব্যঞ্জনা কী?

২.১৩.৩ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'আস্‌সামায়ো তায়তান' মানে কী?

২. "স্মৃতি সমস্ত কওমকে জিন্দা করে তুলতে পারে"—এ কার উক্তি?

৩. শাহ ফরিদউদ্দীন জৌনপুরী কে?

৪. 'আলেক লয়লা ওয়া লয়লানে' মানে কী?

৫. হালাকু খান কে?

৬. দজ্‌লা কী এবং কোথায়?

৭. রামতনু গাঙ্গুলির বইটির নাম কী? কবে প্রকাশিত?

৮. 'আরব্যরজনী গল্পমালার' তিনটি বিখ্যাত কাহিনির নাম বলুন?

৯. মেরি মাদলিন এবং স্পার্টাকাসের তুলনা কার-কার সঙ্গে করা চলে?

১০. 'জাহাকুল আব্‌দ' মানে কী?

১১. 'কাওসুল আকদার' কোথায়?

১২. আব্বাসা এবং জাফর কাদের নাম?

১৩. "আমিও মনের অন্ধকারে এমনই আকাশ রচনা করে যাব"—কার কথা?

১৪. "মানুষের আত্মার প্রতিধ্বনি" কী?

১৫. "বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হয়ে" যাবার যন্ত্রণা কে ভোগ করেছে?

১৬. "চিরন্তনের কণ্ঠস্বর" শোনায় কে?

১৭. দীরহাম-দৌলত দিয়ে কী কেনা যায় না?

১৮. কুফা শহরে কে, কার প্রেমে পড়েছিল?

১৯. আমিরুল মুমেনীন কে?

২০. কোন্ "ভুল ঠিকানায়" কে গিয়েছিল?

একক ৩ □ 'নীল ময়ূরের যৌবন' : পূর্ণাঙ্গ পাঠ : সেলিনা হোসেন

৩.১ কাহিনি : পূর্ণাঙ্গ পাঠ : অপনা মাংসে হরিণা বৈরী

৩.২ লেখিকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

৩.৩ রাজনৈতিক ভাবনা ও 'নীল ময়ূরের যৌবন'

৩.৪ চর্যাপদের প্রতিবিম্বন ও সমকাল

৩.৫ বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা : স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ

৩.৬ কাহিনি-নির্যাস

৩.৭ কাহিনির মুখ্য কুশীলবরা

৩.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র

৩.৯ গ্রন্থনাম আর পরিচ্ছেদনাম : তাৎপর্য-অন্বেষণ

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১০.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

৩.১০.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

৩.১০.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৩.১ কাহিনি : পূর্ণাঙ্গ পাঠ : অপনা মাংসে হরিণা বৈরী

১

রাশি রাশি চুলের গোছা সামলাতে সামলাতে সময়টা শেষ বিকেল হয়ে যায়। হাঁটু মুড়ে বসে থাকার জন্যে পা জোড়া কেমন ঝিম মেরে আছে। বড় খোঁপায় ময়ূরের পালক গুঁজে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শবরীর বুক তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ছলছলায় জউনা নদীর ঢেউ। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে একবার বাম পা আর একবার ডান পা ঝাঁকিয়ে নেয় বেশ করে। তবুও ঝিম ভাবটা সহজে কাটতে চায়না। পুব দিকের বেড়ার গা থেকে গুঞ্জার মালা নিয়ে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। হাতে কেয়ূর, কটিদেশে মেখলা পায়ে মল শবরীর বিশেষ শখ। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে সারাদিন চন্দন লেপে রাখার দরুন মুখটা এখন আশ্চর্য পেলব। নিজেই অবাক হয় শবরী। দুপুরের পর থেকে নিজেকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ও। চন্দনের মৃদু সুরভি শরীর থেকে উঠে আসে। শবরীর মনে হয় সৌন্দর্য চর্চা প্রার্থনার মতো। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে না থাকলে মনোযোগ ছুটে যায়। ছুটে গেলে ঈশ্বরকে যেমন একমনে ডাকা যায় না, তেমন সৌন্দর্যচর্চাতেও খুঁত থাকে। তখন অস্বস্তি হয় শবরীর। নিজেকে আর কিছুতেই সৌন্দর্যের স্রষ্টার

ভূমিকায় রাখতে পারে না। কাহ্নুপাদও শবরীর এই পান সইতে পারে না। তাই সৌন্দর্যচর্চায় শবরীর বিরামহীন প্রচেষ্টায় ও যখন শিল্পী হয়, তখন কাহ্নুপাদ ওর সামনে নতজানু হয়। গদগদ স্বরে প্রার্থনার ভাষায় ভালোবাসার কথা বলে। বলে, তোমার শরীরটা ভীষণ পবিত্র মন্দির শবরী। অহরহ সেখান থেকে আরতির ঘন্টা শুনতে পাই। এ যেন এক চমৎকার প্রার্থনার ভাষা। এর বাইরে আমি আর কোন কিছু বুঝতে চাই না। বুঝি না ঈশ্বর বুঝি না বেদ।

শবরী তখন বাঁধ ভেঙে খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে টের পায় ওর বুকের ভেতর সুখের হরিণ কাঁপে। ভাবে, কানুর মুখের ভাষা কেমন সুন্দর জীবন সাজায়। ওর মতো এমন আর কেউ পারে না।

টিলার ওপরের এই চাঁচরবেড়ার ঘর থেকে দূরের অরণ্য নীলাভ দেখায়। রোদ কমেছে। শবরী চঞ্চল হয়ে ওঠে। পোষা ময়ূরের সঙ্গও এখন তেমন আরামদায়ক নয়। দূরদুরান্তে ছড়িয়ে দেয় দৃষ্টি। একটু পরে কানু আসবে। সারাদিন তার দেখা মেলে না। দিন ফুরোলে কানাই আসে। দিনমানে শবরী কাহ্নুপাদকে পাবে না, এটাই ছিল ওদের বিয়ের প্রথম শর্ত। বিয়ের দিন এ নিয়ে সবাই কাহ্নুপাদকে ঠাট্টা করেছিলো। শবরীর প্রথম দিকে খারাপ লাগলেও এখন মেনে নিয়েছে। বরং প্রতীক্ষার এ তীব্রতায় রাত্রি মোহনীয় হয়ে ওঠে। তাই শবরীর রাত্রির নিজস্ব রঙ আছে। তা কালো নয়। বর্ণাঢ্য। বিষণ্ণ শোকের মতো বিশাল অন্ধকার শবরীর রাত্রিকে ব্যর্থ করে দেয় না। মোমের মতো নরম। চাঁদের বিচ্ছুরিত আলো চাঁচরবেড়ার বাড়িটাকে উৎসবমুখর করে তোলে। টিলা জুড়ে অপূর্ব কার্পাস ফুল ফুটে আছে। সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ কার্পাস ছুঁয়ে শবরী টিলার গা বেয়ে নামতে থাকে। শবরীর মনোযোগ না পেয়ে ময়ূরটা আরো আগে নিচে নেমে গেছে। কার্পাসের সাদা ফুলের পাশে ওটা এখন পেখম ছড়িয়ে নামছে। শবরী থমকে থাকে। ময়ূরটা এভাবে ওকে আনন্দ দেয়। ওটা ঠিক টের পায় যে কখন ওর মন খারাপ থাকে। তখন পেখম মেলে। এখন এটা কেবলই ঘুরে ঘুরে নাচবে। একবারও শবরীর দিকে তাকাবে না। বাড়ির পেছনে কঙ্গুচিনা ফলের গাছে ফল পেকেছে। তা দিয়ে হাঁড়িয়া তৈরি করেছে শবরী। এখনো আসছেনা কেন কানু? গোধূলিলগ্ন থেকে শুরু হয় ওর প্রতীক্ষা। চারদিকে নীলাভ অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। বুনো ফুলের তীব্র গন্ধ দিকবিহীন ছুটছে। ঝিম ধরে শবরীর মাথায়। চারদিকের পরিবেশ উৎসবের জন্যে প্রস্তুত। অথচ কানু নেই। এই টিলা, অরণ্য, কার্পাসবাগান, কঙ্গুচিনা গাছের সারি কানু ছাড়া অর্থহীন। কিছুই ভালো লাগেনা শবরীর। কখনো এতো দেরি হয় না কানুর। নরম সবুজ দূর্বায় পা ডুবে যায় ওর। ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ আসে। আর তখুনি শবরীর ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। দ্রুত পায়ে কাহ্নুপাদ আসছে। নিমেষে কাহ্নিলা ওর হাত ধরে কার্পাসের ঘন বিনুনির আড়ালে চলে যায়। শবরীর শরীরের চন্দনের গন্ধ ওকে পাগল করে। ময়ূর-পালক-গোঁজা শবরীর চুলের অরণ্যে মুখ গুঁজে দেয়।

আজ এতো দেরি করেছো কেন কানু?

দেরি কই? দেখো পাহাড়ের মাথা থেকে সন্ধ্যার আলো এখনো মুছে যায় নি।

মিছে সান্ত্বনা দিচ্ছো। রাত নেমেছে কখন। আমার মনে হয়েছে আমি বুঝি অনন্ত রাত ধরে প্রতীক্ষা করছি।

প্রতীক্ষার সময়টা খুব খারাপ সখি। আর সেজন্যেই মিলন এতো মধুর। তাছাড়া তুমি আমাকে বেশি ভালোবাস কিনা—

মোটেই না।

শবরী মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে।

শবরীর গলা থেকে গুঞ্জার মালা খুলে নিজের হাতে জড়িয়ে নেয় কাহ্নুপাদ। তারপর ওর কোলের ওপর মাথা রেখে টানটান শুয়ে পড়ে। পায়ের কাছে কার্পাসের ডাল নুয়ে থাকে। ময়ূরটা নেচে নেচে ঘরে ফিরে গেছে। ও বোঝে দিনমানে শবরী ওকে যতো আদরই করুক, এখন ও শবরীর কেউ না। শবরী কার্পাসের ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় গোঁজে।

ঘরে চলো কানু?

ঘর? ঘর আবার কি? এইতো ঘর। আমি বুঝি না এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফেলে মানুষ কেন ঘরে যায়। ঘরে আমি আনন্দ পাইনা সখি। মনে হয় চারপাশের বেড়াগুলো যেন বাতাসের পথ আটকে দেবার জন্যে, ফুলের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্যে, অন্ধকারের মোহন আকর্ষণ উপেক্ষা করার জন্যে তৈরি।

সবাইতো তোমার মতো কবি না।

একটা বিশেষ সময়ে সকলেরই কবি হওয়া উচিত সখি। নইলে আনন্দের মুহূর্ত তেমন জমে না। জানো আমি দেশের রাজা হলে কি করতাম?

কি?

বলতাম, যে যে-কাজই করুক সকলেরই বিশেষ সময়ে কবি হতে হবে। বাধ্যতামূলক। এটাই হোত আমার রাজ্যের আইনের প্রথম শর্ত। নইলে বেঁচে থাকাটা কেমন পানসে হয়ে যায় শবরী।

সেজন্যেই তুমি রাজা হওনি। তাই সবাই বেঁচে গেছে।

শবরী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। অনেক দূরে ভুতুম ডাকে একটা। কাহ্নুপাদ আনমনা হয়ে যায়। বুকের ভেতর কেমন যেন হারাই-হারাই ভাব। কখনো তা স্বস্তি। কখনো অস্বস্তি।

হাঁড়িয়া করেছি কানু।

শবরীর কণ্ঠ খাদে নেমে আসে। যেন অনেক দূর থেকে ভীষণ প্রলোভনের হাতছানি দিচ্ছে।

আজ হাঁড়িয়ার উৎসব? আঃ...

কাহ্নুপাদ লাফিয়ে উঠে বসে।

এখুনি নিয়ে এসো।

আজকের রাতও যেন হাঁড়িয়া খেয়ে নেশাগ্রস্ত। শবরী দ্রুত টিলার গা বেয়ে উপরে উঠে যায়। কাহ্নুপাদ তাকিয়ে থাকে। এমন রাতে চাঁচরবেড়ার বাড়িটা কেমন সুমসাম। শবরী ঝাঁপ ঠেলে ঘরে ঢোকে। ময়ূরটা শব্দ করে। কাহ্নুপাদের মগজে নেশার আমেজ। শবরীর দেহে আছে এক অপরূপ মদিরা। মৃদঙ্গের মতো বাজে। কাহ্নুপাদের মনে হয় ঐ ধ্বনি টুংটাং শব্দে ছুটে আসছে টিলার গা বেয়ে। প্রতিদিন দেখে, তবু দেখার শেষ হয় না। শবরী যেন নিঃশেষ হবার জন্যে নয়। শতাব্দীকালের মন্দিরে ও এক বিরাট কাঁসর ঘণ্টা। অনবরত আহ্বান করে। সে আহ্বানে যে কি সুখ কাহ্নুপাদ তা কাকে বোঝাবে। কঙ্গুচিনার হাঁড়িয়া ওর নেশাকে আরো জমিয়ে তোলে। বুকের মধ্যে মৃদঙ্গের ধ্বনি ভৈরবীরাগের লয়ে কাহ্নুপাদকে এক বিস্মৃতির তলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সারা দিনের ক্লান্তি আর ক্লান্তি মনে

হয় না। ঝিমিয়ে আসে দেহ। ক্লান্তি শবরীর চন্দনের সুবাস হয়ে কাহ্নপাদের মগজে কেলিকলহে মাতে। তখন শবরী আসে। পায়ের মল মৃদু শব্দ তোলে। প্রকৃতি আশ্চর্য নীরব উদাস। ভুতুমের ডাক নেই।

কাহ্নপাদ চুমুক চুমুক হাঁড়িয়ার সঙ্গে শবরীর পুরো শরীরে নেশার উৎসব ঘনিয়ে তোলে। জীবনের মতো আনন্দ আর কোথাও নেই।

আর খেয়ো না কানু—

বাজে কথা বলতে নেই সখি। তোমার কণ্ঠে বাজে কথা কেন? তুমি এতো অপূর্ব কেন শবরী? কেন তোমার সব কিছুতে এমন নিপুণ শিল্পীর হাত? তুমি আমার চাইতেও বড় কবি। এমন হাঁড়িয়া আমি কখনোই বানাতে পারবো না। তুমি আর আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমার সৌন্দর্যের দরজায় তৃষ্ণার্ত পথিক।

বলতে বলতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে কণ্ঠ। কাহ্নপাদ স্পষ্ট দেখতে পায় নিজের অস্তিত্বে আর কোন স্থিতি নেই শবরীর। ও এখন চমৎকার এক মায়ার হরিণ। সামনে বিরাট জঙ্গল। তীরধনুক হাতে নিয়ে ছুটছে কাহ্নপাদ। কিন্তু কিছুতেই সে হরিণকে বাগে আনতে পারছে না। ছুটে বেড়াচ্ছে এ পথ থেকে ও পথে। পথ আর ফুরোয় না। কিন্তু পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন, ঐ হরিণীকে ধরা চাই-ই চাই। হাঁড়িয়ার হাঁড়িতে শেষ চুমুক দেয় কাহ্নপাদ। শবরী অনেক আগেই ঢলে পড়েছে। গভীর নেশা। ময়ূরপালক খসে পড়েছে খোঁপা থেকে। শিথিল বসন এলোমেলো। কাহ্নপাদ ওকে বুকের কাছে টেনে নেয়। রঞ্জিত রাত্রির পটভূমির ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। নিঃশ্বেস ঘন হয়ে আসে কাহ্নপাদের। শবরীর কানে ফিসফসিয়ে ওঠে ওর কণ্ঠ।

জানো সখি নেশা হওয়ার পর তোমাকে আর বৌ বলে মনে হয় না। মনে হয় অন্য নারী। যে নারীর ওপর কোন অধিকার নেই অথচ যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠে। যাকে পাওয়ার জন্যে মন পাগল হয়ে যায়।

ও আমি তাহলে কেউ না?

শবরী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কাহ্নপাদ তা আবার নিজের দিকে ঘোরায়।

মিছে অভিমান সখি। তুমিই সব। তোমাকে কেন্দ্র করেই তো সব ইচ্ছে জাগে। তোমাকে অন্য নারী ভাবলে নেশা আরো জমে ওঠে। মনে হয় আমি বুঝি আর আমার মাঝে নেই। কি যে পিপাসা শবরী। কেমন করে তোমাকে বোঝাই।

দুর ছাই আমি এতো কিছু বুঝি না। সব খানে কেবল তোমার কবিতা কানাই।

কাহ্নপাদ সে কথায় কান দেয় না।

তোমার এসব কথায় আমায় ভয় লাগে। মনে হয় তুমি অনেক দূরের। আমার কেউ না। তোমার সঙ্গে আমার এই বৌ বৌ খেলা বড় অল্পসময়ের জন্যে। কেন এমন হয় কানু?

কাহ্নপাদ উত্তর দেয় না। শোনেইনি। নেশার ঘোর বন্‌বন্ করে পাক খায়। কাহ্নপাদ কিছু অনুভব করে না। ভুলে যায় শবরীর কথাও। আপন মনেই কথা বলে। এ যেন কেবল নিজেকে বলা। যা আমার নয় তা পাওয়ার জন্যে মন এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কেন শবরী? তোমাকে পর ভেবে কেন এতো সুখ পাই।

কানু, কানাই?

শবরী কাহ্নুপাদের চুলের ভেতর হাত রাখে। সাড়া নেই কাহ্নুপাদের। ঘুম ঘুম জাগরণের মাঝে শবরী টের পায় কার্পাস ফুলের তীব্র গন্ধের আমেজ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। উত্তর দিকের ডোমপাড়া থেকে কোলাহল আর ভেসে আসে না। শবরীর বুকের ভেতর সুখের হরিণ কাঁপে।

রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে কাহ্নুপাদ। তাও রাজা বুদ্ধমিত্রের অশেষ দয়ায় সেটা জুটেছে। নইলে ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড প্রতাপে তার পাশে যাবার সাধ্য কারো নেই। একদিন বুদ্ধমিত্র ঘোড়ার শকটে যাবার পথে গাড়ির চাকা কাদায় দেবে যায়। কাহ্নুপাদ ভীষণ পরিশ্রমে চালকের সঙ্গে সে চাকা তোলায় সাহায্য করেছিলো। রাজা খুশি হয়ে তাকে কিছু চাইতে বললে, কাহ্নুপাদ রাজদরবারে কাজ চেয়েছিলো। এ তার বহুদিনের ইচ্ছে। পরবর্তীকালে কাহ্নুপাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে এবং তার কবিত্বশক্তির গুণে বুদ্ধমিত্র রাজদরবারে তার স্থান স্থায়ী করে দিয়েছে। যদিও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং পরিষদের অন্যান্য কেউই ব্যাপারটা সুনজরে দেখে না, তাই অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি লোককে এতদূরে নিয়ে আসার কোন শক্তি তারা পায় না। অহরহ সকলে তার পেছনে লেগে থাকে। কিন্তু রাজার জন্যে খুব বেশি সুবিধে করতে পারে না। তাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটুও বিরাম নেই কাজের। রাজা দরবারে না থাকলেও পাখা টানতে হয়। অন্য লোকেরা তো থাকে। পাখা টানতে টানতে কাহ্নুপাদের হাত যখন অবশ হয়ে আসে, মনের মধ্যে কবিতার পংক্তি গুনগুনিয়ে ওঠে। কখনো সে পংক্তি ভালোবাসার। কখনো প্রতিবাদের। কিন্তু প্রতিবাদ সরাসরি করতে পারে না বলেই তার গায়ে আবরণ দিতে হয়। ওদের জীবনের চারদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ। সে শ্বাসরোধী প্রতাপ ওদেরকে কোনদিকেই স্বচ্ছন্দে এগুতে দেয় না। সারাক্ষণ মনের মধ্যে কাঁটার মতো কি যেন খচ্‌খচ্‌ করে। তখন স্বস্তি ফুরিয়ে যায়। কার্পাস ধুনোর মতো আনন্দ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়। কাহ্নুপাদ বিষণ্ন হয়ে থাকে। পথ খুঁজে পায় না।

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।

পাখা টানতে টানতে কাহ্নুপাদ কেবলি নিজেকে প্রকাশের পথ খোঁজে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ জ্বালা গনগনে হাপরের মুখ খুলে রাখে। কাহ্নুপাদ অনবরত পোড়ে। কোথায় গিয়ে কি করবে বুঝতে পারে না।

কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সে মো উআস।।

কাহ্নুপাদ আজও হাঁড়িয়ার নেশার ভেতর যখন স্বপ্ন দেখে তখন ঠিক এ ধরনের যন্ত্রণাই তীব্র হয়ে ওঠে। বিড়বিড় করে। সেই অস্পষ্ট ধ্বনিতে শবরীর ঘুম ভাঙে। তখনো পুরো ভোর হয়নি। স্নিগ্ধ বাতাসের গায়ে অনিন্দ্য আলোআঁধারী। শবরী কাহ্নুপাদের গায়ে ঠেলা দেয়।

কানু কি বলছো?

চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার শবরী। পথ বন্ধ। এগুতে পারছি না।

তোমার কথা বুঝতে পারি না।

আমিও পারি না। সবসময় মাথা ভার হয়ে থাকে।

কাহ্নুপাদ চোখে বোঁজে। শবরী শিথিল বসন গোছায়। রাত্রির বাসর নিস্তেজ। কাহ্নুপাদের পাল্লায় তাকে মাঝে মাঝে এমনি খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয়। কিছুতেই ঘরে যেতে দেয় না কাহ্নুপাদ।

কানু ওঠো। আলো ফুটেছে।

তাতে কি? আমি উঠবো না।

তোমাকে কাজে যেতে হবে?

কাজ?

কাহ্নুপাদ চোখ খোলে। রাজা কিছু না বললেও মন্ত্রী দেবল ভদ্র একটুও এদিক ওদিক সইতে পারে না। ঠিকমত দরবারে পৌঁছাতে হয়। কাহ্নুপাদ উঠে বসে। দু'হাতে মাথার চুল ধরে ঝাঁকুনি দেয়। সারা শরীরে এখানো ঝিমঝিম ভাব।

চলো সই নদী থেকে নেয়ে আসি।

কাহ্নুপাদ শবরীর আঁচল টেনে ধরে।

আঃ ছাড়ো।

না।

কাহ্নুপাদের হাঁড়িয়া-দৃষ্টিতে বুনো-রোদ ঝিলিক দেয়। এবং তা সঙ্গে সঙ্গে শবরীর চন্দন-শরীরে লুটিয়ে পড়ে। টিলার ওপরে ময়ূরটা জাগরণের জানান দেয়। শবরী ছটফটিয়ে ওঠে। ঝুমঝুমিয়ে মল বাজে।

কাগনী ধানের ভাত রেঁধেছে শবরী। ঘরের মেঝেয় হরিণের চামড়া। বিছিয়ে খেতে বসেছে কাহ্নুপাদ। সামনে ভাতের থালা। ধোঁয়া উঠছে। জলের ভাঁড়। তরকারির বাটি। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে শবরী। বেশিরভাগ সময় ও এই ভঙ্গিতেই বসে। হাতে কেয়ূর নেই। কটিদেশও খালি। দিগলদাগল চুলের রাশি বেয়ে জল ঝরে। নদীতে ডুব দেবার পর ভাল করে চুল ঝাড়া হয়নি। কাহ্নুপাদ খেয়ে চলে গেলে তখন নিজেকে নিয়ে বসবে শবরী। নিরাবরণ শবরীর দীপিত সৌন্দর্যে কাহ্নুপাদ টাল খায়। হরিণের মাংস মুখে দিতে গিয়ে সেটা শবরীর মুখে গুঁজে দেয়।

আঃ কি হচ্ছে?

তুমি আগে খাও, তারপর তোমার প্রসাদ আমি নেব।

না, কখনো না।

হ্যাঁ।

পাপ হবে?

তুমি তো জানো শবরী এটাই আমার প্রার্থনা। এভাবেই আমি দেবতাকে তুষ্ট করি।

কাহ্নুপাদের চোখে অনুরাগের শাসন। শবরী মাংসের টুকরো দাঁতে কামড়ে ধরে। চোখে ঝরে বিগত মিলন রাত্রির সুধাময় জ্যোৎস্না। মনে মনে বলে, কানুটা এমন পাগল বলেই ওর জন্যে মরে যেতেও কষ্ট হয় না।

হরিণের মাংসের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খায় কাহ্নুপাদ। খেতে ভালোবাসে ও। শবরী যতটা সম্ভব নতুন নতুন খাবার বানাতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নানারকম জিনিস সংগ্রহ করে। যত্ন

করে কাহ্নুপাদের জন্যে রাঁধে। কত কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সঙ্গতি কৈ? একটা বা দুটো—এর বেশি ব্যঞ্জন একবেলায় রাঁধা হয় না। তবু সংসারে লোক কম বলে এই জোটে।

এই মাংসটা আর একটু খাও?

না তোমার জন্যে থাক।

হরিণের মাংস তুমি বেশি ভালোবাসো কানু?

ভালোবাসলেই একলা খেতে হবে?

আমার বেশি ভালো লাগে না।

কাহ্নুপাদ হো হো করে হাসে।

শুধু ছল করে আমাকে খাওয়াতে চাও। খাইয়েই তোমার সুখ না? শবরী কথা না বলে মাংসের টুকরো কাহ্নুপাদের পাতে দিয়ে দেয়।

হরিণের মাংস আজ শেষ হয়ে গেলো। আর নেই।

তবে?

তোমার ভাবতে হবে না। কাল আমি নদীর ধারে গিয়ে কাঁকড়া ধরে আনবো।

রোদে কষ্ট হবে?

শবরী খিলখিলিয়ে হাসে।

পাখা টানতে তোমার কষ্ট হয় না?

হলে কি? আমি সইতে পারি।

আমিও পারি।

তার মানে তুমি হারতে চাও, না? ঠিক আছে। তপ্ত খাবার পেলে আমার লাভ। পেটে গাদিয়ে ঘুম দেয়া যায়।

তাই দিও।

কাহ্নুপাদ তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। চেটেপুটে খাওয়া শেষ করে। ঢক্ ঢক্ করে জল খায়। শবরী বাসনকোসন গোছায়। বেড়ার গায়ে হরিণের চামড়া ঝুলিয়ে রাখে।

আজ এতো খেয়েছি যে হাঁটতে কষ্ট হবে।

শবরী অনুরাগের হাসি হাসে। কর্পূর-দেয়া পানের খিলি এগিয়ে দেয়। কাহ্নুপাদ ওকে বিদায়-সোহাগ জানায়।

কখন ফিরবে?

ঠিক সন্ধ্যায়।

সারাদিন তোমাকে পাই না।

শবরীর মুখটা ম্লান হয়ে যায়।

মুখটা উজ্জ্বল করো সখি। আমি যাই।

শবরী জোর করে হাসে। বুকটা কেমন করে। টিলার গা বেয়ে দ্রুত নেমে যায় কাহ্নুপাদ। শবরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। পোষা ময়ূর পাশে এসে দাঁড়ায়। শবরীর দিকে গলা বাড়িয়ে দেয়। ও আদর করে পাখে হাত বুলায়।

২

কাহ্নুপাদ হেঁটে যাবার সময় টের পায় সমগ্র পল্লীতে একটা রবরবা ভাব। চারদিকে চাঞ্চল্য। সবাই কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই চাষ-আবাদ করে। কেউ কার্পাস বোনে। কেউ শিকার করে। পুবদিকের বাড়িগুলোর সামনে বাচ্চাদের কলরব বেশি। ছেঁড়া একটা জাল বেড় দিয়ে ওরা মুরগী ধরার চেষ্টা করে। এই ওদের খেলা। খেলতে খেলতে ওরা শিকারের তালিম নেয়। তারপর একদিন নিপুণ হাতে অভ্যস্ত হয়ে বনে রওনা করে। বাচ্চাদের এইসব খেলা কাহ্নুপাদের ভালো লাগে। ছুটকিকে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাহ্নুপাদ অবাক হয়।

কি রে তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে?

শিকার আমার ভালো লাগে না কাকা। ওরা জীবগুলোকে বড় কষ্ট দেয়।

কাহ্নুপাদ থমকে ওর মুখের দিকে তাকায়। ছেলেটার টানটানা বড় চোখে বিষাদ। ও যেন সবার চাইতে একটু আলাদা। ভাবুক। কখনো উদাসীন। মনে হয় ওর আলাদা কোন চেতনা আছে। যা ওকে অন্যপথে চালনা করে। এজন্যে কাহ্নুপাদ ছুটকিকে খুব ভালোবাসে।

কাকা তুমি কোথায় যাচ্ছো?

রাজদরবারে।

আমি একদিন তোমার সঙ্গে যাবো।

যাস।

কাহ্নুপাদের পিছু পিছু ছুটকিও হাঁটে। দুধ দোহানোর জন্যে পিঠা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ধনশ্রী। গোয়াল থেকে গরু বের করছে ভৈরবী। ওদের ছয়টা গরু। দুধ বেচে ধনশ্রী। খুব একটা রোজগার নেই। তবু কিছুতেই অন্য কাজ করতে চায় না। রাতদিন দাবার নেশা। খেলায় জমে গেলে ওঠায় কার সাধ্যি। কাহ্নুপাদকে দেখে পিঠা হাতে এগিয়ে আসে।

কোথায় যাচ্ছো কানুদা, কাজে?

হ্যাঁ।

তুমি বেশ আছ। একদম বাঁধা কাজ। আর কোন ভাবনা নেই। আমার ও রকম একটা জুটলে বেঁচে যেতাম। আর জুটবেই বা কি করে? আমি কি আর তোমার মতো লিখতে পারি।

কাহ্নুপাদ হেসে মাথা নাড়ে। ভৈরবী গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাছুরগুলো ডাকছে।

সবই কপাল কানুদা। কপালে না থাকলে কিছু হয় না।

যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কাহ্নুপাদ আর দাঁড়ায় না। তাড়াতাড়ি হাঁটে।

চাঙ্গারী বোনার বাঁশের পাতাগুলো ঘরের সামনে জড়ো করে রাখছে দেশাখ। বৌদি সুলেখা বড় দ্রুত হাতে চাঙ্গারী বোনে। বিশাখ ওগুলো নিয়ে শহরে বিক্রি করে আসে। নইলে তীর ধনুক ছাড়া আর কিছু বুঝতে চায় না। শিকারে ওর তুখোড় হাত। বনে বনে, পাগলের মতো ঘোরে। শিকার শুধু ওর জীবিকা নয়। জীবিকার অতিরিক্ত অন্য কিছু। কাহ্নুপাদকে দেখে বাঁশের চিকন গোছা ফেলে ছুটে আসে।

মনে আছে তো কানুদা আগামী হপ্তায় আমরা হরিণ শিকারে যাবো?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।

আচ্ছা।

তোমার যা ভুলো মন। রোজ রোজ মনে না করালে চলে না।

তোরা আমাকে কি ভাবিস বলতো?

তুমি আমাদের সবার চাইতে আলাদা। তুমি কবি। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব-করি কানুদা।

কাহ্নুপাদ হো হো করে হাসে। দেশাখের সরল উক্তির জবাবে অনাবিল হাসি। ছুটকি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেশাখও হাসে।

যাই কানুদা, আমার আবার শহরে ছুটতে হবে।

কাহ্নুপাদ দ্রুত হাঁটে। পথে নামলে এর ওর সঙ্গে কথা না বলে উপায় নেই। শুধু কবি বলেই নয়, রাজদরবারে কাজ করে বলে ওরা ওকে একটু আলাদা চোখে দেখে।

কাকা তুমি কেমন করে লেখো?

জানি না রে।

আমারও লিখতে ইচ্ছে করে।

ঠিক আছে লিখবি। বড় হয়ে নে।

পথে পড়ে রামক্রির মদের দোকান আর কামোদের মুদির দোকান। দু'টোই বন্ধ। ওরা এখনো কাজে নামেনি। রামক্রির বৌ দেবকী একাই একশো। মদের দোকানে রামক্রির না থাকলেও চলে। দেবকী একাই মদ চোলাই থেকে আরম্ভ করে খদ্দের আপ্যায়ন এবং কড়ের হিসেব রাখা—সবই অবলীলায় করে। দেবকীকে খুব পছন্দ কাহ্নুপাদের। সবসময় মুখে হাসিটি লাগাই থাকে। কখনো কেউ ওকে রাগতে দেখেনি। দেবকী দারুণ সতেজ, স্নিগ্ধ।

গত রাতের হাঁড়িয়া কাহ্নুপাদের মাথার মধ্যে এখনো ক্রিয়া করে। নেশার এই পরবর্তী সময়টা কাহ্নুপাদকে কেমন দুর্বল করে রাখে। কোনো কিছু ভালো লাগেনা তখন। অথচ দেবকীর কথা ভাবতে খারাপ লাগছে না। দেবকী মগজের মধ্যখানে বসে খুনসুটি করছে। এমন কেন হয়? দেবকীর সঙ্গে তেমন কিছু সম্পর্ক নেই, অথচ ওর কথা ভাবতে ভালো লাগছে; চেহারা মনের মধ্যে লালন করে সুখ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাহ্নুপাদ সমস্ত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ও বোঝে না কেন এমন হয়। প্রচণ্ড শূন্যতা মন জুড়ে হা হা করে। ডুকরে মরে অন্তর।

কাকা তুমি কি ভাবছো?

কাহ্নুপাদ চমকে ফিরে তাকায়।

কৈ কিছু না রে?

হেসে ছুটকির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এই ছেলেটা ওর খুব ভক্ত। একবার জুটে গেলে আর সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ও রাজদরবারে যেতে চায়। কিন্তু যেতে পারবে না। ছুটকিকে ঢুকতে দেবে না ওরা। জন্মগতভাবেই ওখানে ঢোকার অধিকার অর্জন করেনি ও। ওকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নগরের বাইরে ওর মতো শত শত লোককে কেমন নির্বিবাদে আলাদা করে দিয়েছে ওরা। ওদের জন্যে কোনো দায়ভার ওদের নেই। ছোটলোকের জন্য অতো সময়ই বা কৈ? নিজেদের দারিদ্র আর অভাবের কথা স্মরণ করলে কাহ্নুপাদের ভেতরে এক প্রবল তাড়না হয়। রাজসভায় কতো ঐশ্বর্য। এতো বিলাস। কতো অনাচার। কোনোকিছুই লেখাজোখা নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ওকে কেন্দ্র করে সে ছুঁক-ছুঁক ভাব প্রকাশ করে তা মোটেই স্বস্তি দেয়না কাহ্নুপাদকে। গ্লানি আচ্ছন্ন করে রাখে। মানুষ বলেই স্বীকার করতে চায় না। ধর্মে-কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে বিধি-নিষেধের আইনকানুনের হোতা সেজে আছে ঐ ব্রাহ্মণরা। এদের প্রতাপকে অস্বীকার করে কার সাধ্য! অন্তরে যতো ক্ষোভ, যতো জ্বালাই থাক না কেন, কাহ্নুপাদকেও স্বীকার করে নিতে হয়েছে এ ব্যবস্থা। নইলে তো প্রাণে বাঁচাই দায়।

ভাবতে ভাবতে কাহ্নুপাদ যখন নদীর ঘাটে এসে পৌঁছে বেলা তখন বেশ চড়চড়িয়ে উঠেছে। ঘাটের উপর পা ছড়িয়ে ডোম্বি একা একা বসে গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সবাই ওকে ডোম্বি বলে ডাকলেও কাহ্নুপাদ ওর নাম দিয়েছে মল্লারী। অদ্ভুত প্রাণবন্ত মেয়ে। নৌকা যেমন অবলীলায় দ্রুত বায়, তেমনি গাইতে পারে, নাচতে পারে। এমন সরেস মেয়ে এ অঞ্চলে আর একটিও নেই। শবরী মন্দিরার মতো বাজে। সে ধ্বনি মৃদু। ঝংকৃত। প্রাণের গভীরে আস্তে আস্তে সঞ্চারিত হয়। মল্লারীর কোথাও মৃদুমন্দতা নেই। মল্লারী নদীর উত্তাল স্রোতের মতো উর্মিমুখর। নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কাহ্নুপাদকে আসতে দেখে মল্লারী উঠে দাঁড়ায়। কাহ্নুপাদ ছুটকির মাথায় হাত বুলোয়।

ছুটকি তুই ঘরে যা।

না।

কি করবি?

তুমি যাও। আমি এদিক-ওদিক ঘুরবো।

কাহ্নুপাদ লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। নৌকা দুলে ওঠে। মল্লারীর ফুরফুরে চুল বাতাসে ওড়ে। নদীর বাতাসে মিঠেল আমেজ। মন দুর্বল করে দেয়। কাহ্নুপাদ মল্লারীর দিকে তাকিয়ে হাসে। শবরী ওর বিয়ে করা বৌ। কিন্তু মল্লারীর জন্যে ওর প্রাণের অনুরাগ। ওর ভেতরে নিজের শক্তি অনুভব করে কাহ্নুপাদ। মল্লারী যেন ভীষণ গর্জনে গড়িয়ে-পড়া পাহাড়ী নদী। তাই মাঝে মাঝে ভয় করে। মল্লারী ওকে যত ভালোইবাসুক কাহ্নুপাদের ভয় কাটে না। যেন একটা অদৃশ্য শক্তি মল্লারীর চারদিক ব্যূহ রচনা করে রেখেছে। ছলছল্ কল্‌কল্ চলনে-বলনে তা ঠিক্‌রে পড়ে।

মল্লারী কাছি গুটিয়ে বৈঠা হাতে নেয়। কাহ্নুপাদ পাটাতনের ওপর বসে।

আমি বুঝি প্রথম খ্যাপ?

তুমি নাহলে আমার খ্যাপে সাঁইত করবে কে?

আমার কাছ থেকে তো কড়ি নাও না?

নেবো কেন? তুমি আমার নৌকায় উঠলেই হয়। তোমাকে নিয়ে নৌকা বাইতে পারলে আমার কড়ির চেয়ে বেশি পাওয়া হয়।

হো হো করে হাসে কাহ্নুপাদ।

বেশ কথা বলতে শিখেছো।

তোমার সঙ্গে থাকলে না শিখে উপায় আছে। তোমার মতো কথা বলতে না পারলে আমাকে তোমার ভালো লাগবে কেন?

তোমাকে ভালো লাগার অনেক গুণ আছে।

সত্যি?

হ্যাঁ গো সত্যি।

কি গুণ বল দেখি?

সে মেলা।

আমিতো দেখিনা?

কেউ কেউ নিজেরটা দেখে না। সেটা অন্যের দেখার জন্যে। অন্যে দেখে সুখ পায়।

আচ্ছা।

মল্লারী ঠোঁট ওল্টায়। নৌকা মাঝ নদীতে। তীরে আছড়ে-পড়া নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা কাহ্নুপাদের ভালো লাগে। ও চারদিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়। আনন্দে চোখে জল আসে। বিধাতা ওদের জন্যে প্রাণভরে ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু রাজসভায় গেলে টের পায় কিছুই ওদের জন্যে নয়। সব ওদের—যারা উঁচু বর্ণের। ওরা ভোগ করবে—খাবে—ছিটোবে। যেটুকু কাঁটাকুটো তা ওদের জন্যে। ঐটুকু চেটে ওদের খুশি থাকতে হবে। কোনো কিছুই চাইতে পারবে না।

কি ভাবছো কানাই?

কিছু না।

মাঝে মাঝে তুমি যেন কি ভাবো?

কিছু ভাবি না।

ফাঁকি দিও না কানাই। তোমার মুখ দেখলে সব টের পাই।

কাহ্নুপাদ কথা না বলে হাসে।

আমার জন্যে একটা গান লিখবে বলেছিলে? আমি গাইবো।

হাঁ লিখবো। শেষ হয়নি। তোমার কণ্ঠে নিজের লেখা গান শুনতে কি যে সুখ মল্লারী। জগৎসংসার ভুলে যাই।

কাহ্নুপাদের দৃষ্টিতে মোহমুগ্ধতা ঘনিয়ে ওঠে। মল্লারী উচ্ছ্বাসে দিশেহারা হয়ে যায়। এইটুকুইতো ও চায়। এর বেশ কিছু না। ঐ ব্রাহ্মণরা রাতের অন্ধকারে ওর শরীর হাতড়ে বেড়ায়। দিনের আলোয় জোটে অবজ্ঞা আর অবহেলা। পল্লীর লোকগুলোও তেমন। বাঁকা চোখে তাকায়। কেবল কাহ্নুপাদ ওকে সম্মান দেয়। ভালোবাসে। প্রথম যেদিন কাহ্নুপাদ ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলো, সেদিন বলেছিলো : সবাই তোমাকে ডোম্বি ডাকে— আমার ভালে লাগে না। আমি মল্লারী ডাকবো কেমন? ও খুশি হয়ে মাথা নেড়েছিলো। এমন সুন্দর করে কেউ ওকে কোনো দিন বলেনি।

মল্লারীর সুগঠিত বলিষ্ঠ দু'হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। কি অবলীলায় নৌকা বায় ও। যেন জিনিসটা ওর আজন্মের দখলে। ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে। একটুও এদিক ওদিক হয়না। চমৎকার এক মোহিনী ভঙ্গিতে দাঁড় বাইছে ও। স্বচ্ছন্দে পারার এই আশ্চর্য গুণ কাহ্নুপাদকে বিহ্বল করে। মনে মনে ও এই শক্তির কাছে নতজানু হয়।

সারাদিন নৌকা বাইতে তোমার খারাপ লাগে না মল্লারী?

ও প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকায়।

মোটেই না। খেয়া পারাপার ছাড়া আর কিছু ভাবনাই করতে পারি না আমি। তাছাড়া সারা দিন তো বাইতে হয় না। যখন খ্যাপ জোটে তখন।

বেশ কাজ।

এই দেখোনা, খেয়া পারাপার না করলে তোমাকেই বা রোজ রোজ পেতাম কোথায়?

নিজের গরজেই আমি তোমার কাছে আসতাম মল্লারী।

ঘাটে এসে নৌকা লাগে। মল্লারী আর কোনো কথা না বলে নৌকা বাঁধায় ব্যস্ত হয়ে যায়। তীরে এসে জল আছড়ে পড়ে।

কেউ যেন ভীষণ আক্রোশে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে। কাদামাটিতে একাকার ঘোলা জল উপায়হীন।

কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে নেমে যায়।

ডোম্বি জিজ্ঞেস করে, ফিরবে কখন?

সবার মুখে কেবল ফেরার কথা। যদি বলি ফিরবো না? ফিরতে আমার ভালো লাগে না।

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে কাহ্নুপাদ সোজা হাঁটতে থাকে। ডোম্বি দড়ি-কড়া গুছিয়ে নেয়। কাছি খোলে আবার। কয়েকজন লোক পার হবার জন্যে ঘাটে এসে ভিড় জমিয়েছে।

৩

একটা ছোলঙ্গ সুতোয় বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে দেশাখ। অরুণ ওটা বারবার দুলিয়ে দেয়। সেটাকে তীরবিদ্ধ করে হাতের তাক ঠিক করে ও। একটুও এদিক ওদিক হয় না। যত জোরেই দুলুক না কেনো দেশাখ ঠিক সেটাকে বিদ্ধ করে ফেলে। প্রতিদিন এ কাজটা করা চাই ওর। সারা শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে। অরুণ মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

তোমার মতো হাতের নিশানা আর কারো নেই দাদা। ইস তুমি কি সুন্দর পারো।

তোকেও শেখাবো।

আমিও তোমার মতো শিকারী হবো। জানো দাদা ছুটকি না শিকার দুইচোখে দেখতে পারে না।

হ্যাঁ।

দেশাখি ওর কথায় খুব মনোযোগ দেয় না। একমনে লক্ষ্য ঠিক করে। অরুণ ছোলঙ্গটা এবার গড়িয়ে দে। অরুণ ফলটা দড়ি থেকে ছিঁড়ে মাটিতে গড়িয়ে দেয়। দাদার ক্ষমতায় ও সবসময় মুগ্ধ। দেশাখ অবলীলায় গড়িয়ে যাওয়া ফলটা তীরে গাঁথে। সাধনায় ওস্তাদ ও। আর প্রতিদিনের এই একাগ্রতাটুকু আছে বলেই হাতটা নষ্ট হয়নি। দেশাখ ফলসহ তীরটা উঠিয়ে নিতেই সুলেখার ডাক শোনে।

ও দেশাখ এবার যাও ভাই। বেলা হয়ে যাচ্ছে। রোদ উঠলে আবার নিজেই বিরক্ত হবে।

সুলেখা দেশাখের স্বভাব জানে। শিকারের বাইরে কোনো কাজ খুব একটা করতে চায়না। তার ওপর মনমতো না হলে সবাইকে গালাগাল করে আস্ত রাখেনা। ওর রুক্ষ চেহারায় কোথাও কোনো মায়াদয়া নেই বলেই মনে হয়। সুলেখার ডাকে আঙিনায় ফিরে বাঁশের তৈরি চাঙ্গারীগুলো দড়ি দিয়ে বেশ কায়দা করে বেঁধে ফেলে দেশাখ। এগুলো নিয়ে এখুনি শহরের দিকে রওনা হতে হবে। বেচে কিছু কড়ি পেলে এবং তা দিয়ে চাল কিনতে পারলে তবে খাওয়া। নইলে সবাই উপোস দেবে। গতদিনের শিকারে একটা সজারু আর কয়েকটা ঘুঘু পেয়েছিলো। তা বেচে মাকে আর বৌদিকে একজোড়া কাপড় এনে দিয়েছে। তাই এখন ঘরে খাবার নেই। কাগনী ধানের চাল এসেছে বাজারে। একদিনও কেনা হয়নি। বাড়িতে আটজন লোক। পঙ্গু বাবা। বৃদ্ধা মা। তরুণী দুই বোন। ছোট ভাই। বড় ভাইয়ের বৌ সুলেখা। বড় ভাই পরের নৌকায় বাণিজ্যে গেছে। নিজের বাণিজ্য নয়। কড়ি রোজগারের জন্য অন্যের নৌকায় খাটতে যাওয়া। কবে ফিরবে কেউ জানে না। কোনো খবরও নেই। সংসারের সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কেবল বৌদি চাঙ্গারী বোনে বলে কিছুটা রক্ষা। তাছাড়া কেউ একটা কড়ি আনতে পারে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে দেশাখের। সব ছেড়েছুড়ে একদিকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। কেবল অভাব আর অভাব। কখনো স্বপ্ন দেখে দেশাখ। রাজা যদি একদিন কিছু জমি দান করে দেয়? পরক্ষণে নিজেকে শাসায়। যতসব লুচ্চামী দেশাখ। লজ্জা করেনা। মুরোদ নেই এক কড়ির, আবার স্বপ্ন দেখা। এজন্যে মাঝে মাঝে সুলেখা বলে, তুমি একদম শুকনো কাঠের মতো কট্টর। বাবা। এত কঠিন থাকতে কেমন করে পারো?

বেশি ছেঁদো কথা আমার ভালো লাগে না। দেশাখের সোজা জবাব। বোঝাটা যখন কাঁধের ওপর উঠিয়ে নেয় তখন কচি বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি ঝক্‌ঝকে চাঙ্গারীগুলো সূর্যের সোনালী আলোয় চিক্‌চিক্ করে। তখন মনে হয় এই কাজ করতে খুব খারাপ লাগেনা ওর। শুধু অভাব আর দারিদ্র্য বড় বেশি যন্ত্রণাদায়ক। কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এজন্যে নিজের দশাসই শরীর নিয়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করে। রওনা করার আগে সুলেখা সামনে এসে দাঁড়ায়। তোমার দাদার একটু খবর নিও। শহরের দিকে রওনা করলে সুলেখা রোজ এই এক কথাই বলে যাদের নৌকোয় ভুসুকু বাণিজ্যে গেছে, তাদের লোকজনও জানে না নৌকা কবে ফিরবে। বাণিজ্য মানেই অনির্দিষ্ট কালের যাত্রা। ভাগ্য ভালো হলে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে আসা যায়। নইলে একদিকে যেমন রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির ভয় তেমনি অন্যদিকে আছে জলদস্যুর উৎপাত। সামনে পড়লে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়। এসব ভাবতে ভাবতে দেশাখ জামা গায়ে চড়ায়। আজ সুলেখাকে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে হবে। সুলেখাও জানে দেশাখের পক্ষে খবর আনা সম্ভব না। জেনেও সবসময় বলে। দেশাখও একই উত্তর দেয়। সুলেখার সঙ্গে ওর একটা মনগড়া

সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। চাতুরালিতে দু'জনেই ওস্তাদ। কেউ কারো কাছে হারতে রাজি নয়। দেশাখ মনে মনে হাসে। দাদাকে ছাড়া বৌদির দিন যেন আর কাটে না। তার শারীরিক মানসিক পারিপার্শ্বিক ভুসুকুর জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সুলেখা ওর হাতে এক টুকরো হরিণের মাংস গুঁজে দেয়। কবেকার মাংস দেশাখও জানে না। একসঙ্গে বেশি মাংস পেলে লবণ হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। দরকার মতো বের করে গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভুনা করে সুলেখা।

এটা খেয়ে যাও ভাই। আর কিছু নেই।

সুলেখার 'আর কিছু নেই' কথায় দেশাখের সংকোচ হয়।

ভাবছো কি? নাও?

না থাক। বাবাকে দাও গিয়ে।

না, না তুমি খাও। তুমি এতদূর হেঁটে যাবে, পথে কষ্ট হবে।

বাবাকে আমি অন্যকিছু দেবো।

কি দেবে তা তো জানি।

দেশাখ হাত বাড়িয়ে মাংসের টুকরোটা নেয়। বৃদ্ধ পঙ্গু বাপের কাশির শব্দ আসছে। মা বুকের মধ্যে তেল মালিশ করে আর গাল দেয়।

মরেও না বুড়ো। মরলে তবু হাড় জুড়োয়। এ জ্বালা আর সইতে পারি না।

বাবার উত্তর ওরা কেউ শুনতে পায় না। প্রবল কাশির তোড়ে ভেসে যায় তার সুখ-দুঃখ। যৌবনে বাবা ভীষণ রাগী ছিলো। মাকে মারতো ধরে। পান থেকে চুন খসলে সইতে পারতো না। আজ মা সুযোগ পেয়েছে। কথার শাণিত চাবুকে প্রতিশোধের মাশুল ওঠাচ্ছে।

ওরে না নিলে আমার উঠিয়ে নাও ভগবান।

দেশাখ ও সুলেখা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। আসলে দু'জনের প্রয়োজনই দু'জনের কাছে ফুরিয়েছে। বাবা অথর্ব বলে মুখ খোলে না। মা-র শরীরে কিছু শক্তি আছে বলেই গালাগাল করে। বাবাকে সহ্য করতে পারে না। ভাবনার মাঝে দেশাখের চকিতে মনে হয় অথচ সুলেখা ভুসুকুর বাড়ি ফেরার দিকে চেয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে। কেন? ভুসুকু জোয়ান, উপার্জন করতে পারে। সুলেখার সবরকম প্রয়োজনে লাগে, এজন্যেই কি? দেশাখ উত্তর খুঁজে পায় না। হঠাৎ করে সুলেখাকে প্রশ্ন করে, দাদাকে তুমি খুব ভালোবাস—না বৌদি?

দেশাখের প্রশ্নে সুলেখার মুখ লাল হয়ে ওঠে। উত্তর দেয় না। যার জন্যে ওকে তাড়া দেয়।

তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি যাও। রোদটা যেন তেলেভাজা হয়ে গন্‌গন্‌ করছে।

যাচ্ছি। কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তুমি মা-র মতো দাদাকে গালাগাল করবে। জোর করেও ভালোবাসতে পারবে না।

সুলেখা হেসে ফেলে।

বাব্বা! অত ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে না।

দেশাখ আর দাঁড়ায় না। দ্রুত চলতে থাকে। সুলেখা সেদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে। মন খারাপ হয়ে যায়। দেশাখ কেমন অনায়াসে কথাগুলো বলে গেলো। বছর দেড়েক ধরে ভুসুকু ওর কাছে নেই। কিছুই ভালো লাগে না। দেশাখ রোজগার করেই দায় সারে। অথচ এই অভাবের সংসারকে দু'হাতে বেড় দিয়ে রাখতে হচ্ছে ওকে। সকলের দাবি ওর কাছে।

অরুণ এসে আঁচল ধরে টানাটানি করে।

খিদে পেয়েছে বৌদি?

সুলেখা অরুণের দশ বছরের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চেহারায় ভুসুকুর অনেকটা আদল আছে।

খিদে পেয়েছে বৌদি?

খিদে পেয়েছে তো আমি কি করবো?

বারে তুমি না করলে কে করবে?

সুলেখা হেসে ফেলে।

আয়।

ওর হাত টেনে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

তুমি না থাকলে আমাকে কেউ খেতে দিতো না বৌদি।

সুলেখার মনে হয় এই একটা দায়িত্বের জন্যে ও এই সংসার থেকে নড়তে পারে না। ভুসুকু যাবার পর কতবার বাবা এসেছে নিতে। নিজেই যেতে পারেনি সুলেখা। যাবার কথা উঠলে দেশাখসহ আর সবাই এমন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে তাকায় যে তখন মত বদলাতে হয় সুলেখার। কেউ ওকে জোর করেনা, যেতে দেবো না বলে শাসায় না, তবু কোথায় যেন কি একটা বন্ধন আছে। অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা সেটা।

গতরাতের হাঁড়িয়ার তলানীটুকু শ্বশুরকে দেয় সুলেখা। বৃদ্ধ বড় আগ্রহে টেনে নিয়ে কয়েক চুমুকে শেষ করে ফেলে। সুলেখা আর সবার মুখে কি দেবে সে চিন্তা করতে থাকে। অরুণ একমুঠি পান্তা এক সানকী পানির মধ্য থেকে সপ্ সপ্ করে খাচ্ছে। আর সবাই উপোস। লোকী আর গুণী বারান্দার কোণে চুপচাপ বসে আছে। ওরা বড় লক্ষ্মী। কখনো কিছু চায় না। বরং এদিক সেদিক ঘুরে এটা ওঠা জোগাড় করার চেষ্টা করে। সুলেখা ওদের ডেকে বলে, তোরা নদীর ধার থেকে একবার ঘুরে আয়।

এর অর্থ দু'জনেই বোঝে। জেলেরা যেখানে বড় জাল ফেলে মাছ ধরে সেখানে ওরা প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। কখনো ট্যাকে গুঁজে মাছ নিয়ে আসে। কাঁকড়া পেলেতো কথাই নেই। জাল থেকে ছাড়া পেলে কাঁকড়াগুলো ছুটতে থাকে। দু'বোনে মহা উল্লাসে শাড়ির আঁচলে বেঁধে দৌড়ে ঘরে ফেরে। যেদিন আনতে পারে সেদিন ওদের আনন্দ আর ধরে না। সুলেখা যত্ন করে রাঁধে। আর দু'বোনে কুয়োতলার ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে গায়ে পানি ঢালে। আজও সুলেখার ইশারা পেয়ে দু'জনে ছুটে বেরিয়ে যায়। ও সংসারের নিত্যকর্মে মন দেয়।

এই এক অবস্থা ধনশ্রীর চাঁচের বেড়ার ঘরেও। ভৈরবী গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। দু'বছর আর তিন বছরের ছেলে দু'টো একটানা কাঁদছে। গরু দুয়ে তিন সের দুধ পেয়েছে ধনশ্রী। বিক্রি করে চাল আনবে। কখন

ফিরবে কে জানে। যা খেয়ালী মানুষ। দাবার আড্ডায় মজে গেলে সারাদিন হয়তো আর ফিরবেই না। একদিকে অভাব আর অন্যদিকে স্বামীর খামখেয়ালী। এই দু'য়ের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ করতে হয় ওকে। একেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছেও। আক্ষেপ নেই, প্রতিবাদ নেই। ভীষণ শান্ত স্বভাব ভৈরবীর। কথা বলে সুন্দর করে। সেজন্যে সকলেই পছন্দ করে। ছেলে দু'টো একটানা কেঁদে চলেছে। ভৈরবী আনমনে তাকিয়ে থাকে। অতিথি এসেছে দু'জন। শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়। ধনশ্রীর দূর সম্পর্কের ভাই। একমুঠো চাল নেই ঘরে যে ওদের সেদ্ধ করে দেবে। ভয় হয় ভৈরবীর। ধনশ্রী কখন ফিরবে? কতবেলা পর্যন্ত অভুক্ত রাখবে অতিথিদের? ও মনে মনে প্রার্থনা করে। বিধাতার কাছে ক্ষমা চায়। নিজের নিরুপায় অক্ষমতার জন্যে রাগ হয়। হঠাৎ মনে হয় কামোদের কথা। ওর হাতে পায়ে ধরলে সেরখানেক চাল বাকিতে পাওয়া যেতে পারে। ছোট ছেলেটাকে কাঁখে নিয়ে বড়টার হাত ধরে বেরিয়ে যায় ভৈরবী। অতিথিরা ঘরে নেই, এক্ষুণি হয়তো আবার ফিরে আসবে।

বেশ ভিড় কামোদের দোকানে। ভৈরবী এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে কড়ি নেই। কামোদের কাছে বাকির জন্যে এসেছে। সুতরাং খদ্দের সব বিদেয় না হলে ওর পক্ষে কোনো কথা বলাই সম্ভব না। কোলের ছেলেটা ঘ্যানঘেনিয়ে কেঁদেই চলেছে। কামোদের সঙ্গে দু'বার চোখাচোখি হয়েছে। তারপর আবার কাজে ব্যস্ত হয়েছে ও। কামোদের অবস্থা মোটামুটি ভালো। এক সময় ও ভৈরবীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। বাবা দেয়নি। পাত্র হিসেবে কামোদকে তার পছন্দ ছিলো না। অবশ্য ওর নিজের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছেও ছিলো না। এই মুহূর্তে সে কথা মনে পড়লে ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকে ও। ভৈরবী চাইলে কামোদ ফিরিয়ে দেয় না। তাই দোকানে অনেক বাকি। ধনশ্রীর সাধ্য হয় না শোধ করার। ঐ দাবার আড্ডায় মন না থাকলে হয়তো পারতো। কিন্তু ঐ নেশা ছাড়া ধনশ্রী বাঁচবে না। সুতরাং মানসম্মান অনেকখানি খাটো করতে হয় ভৈরবীকে। ঘরে অতিথি বলেই লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে আসতে হয়েছে ওকে। অতিথিকে উপোস রাখলে সবচেয়ে বড় পাপ হবে। ও চোখ বুঁজে মনে প্রাণে ভগবানকে ডাকে। হরিপালকে বেশ কড়া ভাষাতেই ফিরিয়ে দিলো কামোদ। কিছুতেই বাকি দেবে না। বড্ড লোকসান হচ্ছে। ভৈরবীর মনে হয় ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পা ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে। একবার ভাবে ফিরে যাবে পরক্ষণে অতিথির চেহারা ভেসে ওঠে। যার ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তার আর শরম কি! খদ্দেররা বিদেয় হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না ভৈরবী। কামোদ এক সের চাল মাপতে মাপতে বলে, জানি কি বলবে? কিন্তু খদ্দের বিদেয় না করে তো কথা বলতে পারি না। জানি কামোদদা। কি করবো বলো, ঘরে অতিথি।

হাঁড়িতে ভাত নেই নিত্য অতিথি। এ জ্বালা তোমার জুড়োবে কবে বলতো?

ছিঃ ছিঃ কামোদদা ওকথা বলতে নেই।।

কামোদ আর কথা বলে না। চালটা পোঁটলা বেঁধে দেয়। ভৈরবী ভাবে কামোদ কি এখনো ওর ওপর রাগ করে আছে? কে জানে। কোনোদিনই তো কিছু বলে না। চাইতে এলে কিছু-না-কিছু দেয়।

চালের পোঁটলা ভৈরবীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে হেসে বলে, অনেক বাকি তোমাদের।

ও এলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

না ধনাদাকে আর পাঠাতে হবে না। তোমার কাছে আমার বাকিই থাক।

ভৈরবীর হাত কাঁপে। কিছু বলে না। পোঁটলাটা আঁচলের নিচে নিয়ে দ্রুত হাঁটে। কামোদ আনমনা হয়।নিত্যদিনের অভাব তবু মুখের হাসিটি কখনো মিলিয়ে যায় না ভৈরবীর। কামোদের বুক হু হু করে ওঠে। এমন একটা মেয়েকে বউ করার সাধ ছিলো ওর। স্বপ্ন দেখতো কত!

এক কড়ির তেল দাও কামোদদা?

তেল?

হ্যাঁ। কি ভাবছো?

তেল দিয়ে কি রাঁধবে?

সে কি আর আমি জানি? জানে বউ।

তাইতো।

কামোদ হেসে ফেলে। খদ্দের চলে যায়।

ঘরে ফিরে ভৈরবী চালগুলো সেদ্ধ বসায়। এতক্ষণ কেমন একটা দুঃখ দুঃখ ভাবছিলো মনের মধ্যে। সারাটা পথ গলার কাছে কি যেন আটকে ছিলো। কিন্তু টগবগে ভাতের দিকে তাকিয়ে সব কথা ভুলে যায় ও। উঠোন থেকে লাউ আর বেগুন তুলে এনে রাঁধে। মন খুশিতে ভরে ওঠে। অতিথিকে গরম ভাত আর গরম তরকারী দিতে পারবে, এই মুহূর্তে ভৈরবী এর বেশি কিছু আর ভাবতে পারে না। ভৈরবীর চাওয়া ভীষণ কম। বড় অল্পে তৃপ্ত হয়ে যায় ও। ছেলে দু'টোকে গরম ভাত দিয়ে বসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে জল আসে ওর চোখে। মনে হয় জীবনে আর কোনো কিছু চাইবার নেই। ওর। ভীষণ কিছু চাইতে ভয় করে ভৈরবীর। ভয় হারাবার। পেয়ে না রাখতে পারার ভয়ও আছে ওর মনে। কেনো যে এমন হয়, ও বোঝে না। আর অনেক কিছু বোঝে না বলেই ওর জীবনের জটিলতা কম। দুঃখবোধ কম এবং অনায়াসে বেদনা তাড়িয়ে দিতে পারে।

৪

হরিণ শিকারের আয়োজনে মেতে উঠেছে সবাই। আজ ওরা তিন মাইল দূরের বনে হরিণ শিকারে যাবে। দেশাখের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। ও দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কাহ্নুপাদও আছে। ধনশ্রী, কামোদ, রামক্রী, দেবেন, সাধন সবাই আছে। দল বেঁধে হরিণ মারতে যাওয়া এক বিশেষ উৎসবের মতো। এতে আনন্দ যেমন আছে, রোজগারও তেমন। বেশ লাগে। তিনটে শিকার হলে তো সারা পাড়া উৎসবে মেতে উঠবে। বেলা ওঠার আগেই দলেবলে রওনা করে ওরা।

ওদেরকে এক সঙ্গে ঘাটে দেখে মুচকি হাসে ডোম্বি। আজ কাহ্নুপাদের সঙ্গেও ওর খাতির নেই। বেশ কতগুলো কড়ি আদায় হবে। এতক্ষণ একটা খ্যাপও দেয়নি। বসে বসে ঝিমুনি ধরে যাচ্ছিলো। নদীর বাতাসে মাঝে মাঝে মন কেমন হয়ে যায়। এখন গায়ে গতরে ব্যথা করে। বুকটা হু হু শব্দে মুচড়ে ওঠে। ওদের দেখে ডোম্বি হেসে ওঠে, আজ ভোরে কার মুখ দেখে যে উঠেছি কে জানে? রোজগারের এমন সুবিধে? রোজ রোজ কেন যে হয়না?

হরিণের মাংসে তোকেও ভাগ দেবো ডোম্বি, বিনে কড়িতে পার করে দে! দেশাখের বিনীত অনুরোধে দপ্ করে ওঠে ও।

ইস আমার নাগর। বললেই দিলাম আর কি!

দেশাখ অপমানিত বোধ করে। কিন্তু জোর করে কিছু বলতেও পারে না। যাত্রার মুখে কোন বাদ-বিবাদে যেতে চায়না ও।

হরিণ পাও কি না তার ঠিক নেই আগেই লোভ দেখাচ্ছো?

অলুক্ষণে কথা বলবিনা।

দেশাখ চটে ওঠে।

পার করে দিবি কি না বল?

কড়ি দিলেই দেবো।

এমনিতে দিবি না?

না।

ঠিক আছে তোকে উৎসবেও ডাকবো না।

খুব ডাকবে। নইলে নাচবে কে?

হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ডোম্বি। কাহ্নুপাদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখতে ভালো লাগে। চোখে পলক পড়ে না। কোথাও খাটো হবে না। নিজের ওপর ভীষণ বিশ্বাসে বৈঠা হাতে কেমন একটা পুরুষালী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কাহ্নুপাদকেও যেন চেনে না। কারো কাছে ওর কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কামোদ নিচু স্বরে একটা অশ্লীল গালি দেয়। জোরে দেবার সাহস নেই। তাহলে হয়তো বৈঠার ঘায়ে মাথা দু'ফাঁক হয়ে যাবে। অবশেষে রামক্রী মাথাপিছু এক কড়িতে পার করে দেবার জন্যে রাজি করায় ওকে। দেশাখ রাগে গোঁ গোঁ করে। কথা বলতে পারে না। দু'ভাগে ওদেরকে পার করে দেয় ডোম্বি। সবার আগে নৌকার ওপর লাফিয়ে ওঠে দেশাখ। দূরের অরণ্য চোখের সামনে ঝাপ্‌সা থেকে উজ্জ্বল হয়। স্নায়ু উদ্দাম হয়ে ওঠে। নিশপিশ করে হাত।

ডোম্বির হাতের বৈঠার নিবিড় চাপে ছল্‌ছল্ শব্দ ওঠে নদীর বুকে। কাহ্নুপাদ কান পেতে শোনে। ঐ শব্দ যেন ওর নিজের বুকের তল থেকে উঠে আসছে। জাগতিক সুখ দুঃখ ভালোবাসার এক চমৎকার আলোড়ন। মাঝ নদীতে এসে ডোম্বি খিলখিলিয়ে হাসে।

এখন নৌকা ডুবে গেলে বেশ হয়?

ইস ডুবলেই হলো। যেন বিনে কড়িতে নৌকায় উঠেছি।

দেশাখের মুখ খিস্তিতে সবাই হেসে ওঠে। ডোম্বি অপ্রতিভ না হয়ে জোর করে হাসে। সে হাসির রেশ নদীর খোলা শরীরে বাতাসে তরঙ্গ তোলে।

নদীর বুকে জেলেদের নৌকাগুলো ঘাপ মেরে বসে থাকার ভঙ্গিতে মৃদু নড়েচড়ে। ইতস্তত ঘোরা নয়। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে এগুচ্ছে। ছেলেদের চোখেমুখে চক্‌চকে উল্লাস। হাসির রেশ শেষ করে জোরে জোরে শ্বাস টানে ডোম্বি।

নদীর বাতাসে মাছুয়া গন্ধ। মনে হয় ঝাঁক বেঁধে সব এদিকেই আসছে।

তুই কেমন করে জানলি?

সারাদিন নদীর বুকে থাকলে এসব টের পাওয়া যায়।

ইস, রাজসভার পণ্ডিতের মতো কথা!

দেশাখের মুখভেংচিতে সকলে হেসে ওঠে। কড়ি দেবার জ্বালাটা ও ভুলতে পারেনি। সুযোগ পেলেই ডোম্বিকে আক্রমণ করে।

যাই বলো না কেন, নির্ঘাৎ বড় কিছু পাবে ওরা। জেলেদের চোখমুখের দিকে দেখোনা একবার!

কথা শেষ না হতেই দেশাখ চেঁচিয়ে ওঠে, দেখো দেখো কানুদা কত বড় একটা মাছ উঠেছে।

ডোম্বির হাতের বৈঠা জোর শব্দে ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে।

এত বড় মাছ দু'চার বছরে দেখিনি?

মাছ দেখতে গিয়ে তুই আবার আমাদের ডুবিয়ে দিস না?

অত সহজে ডুবলে নৌকা বাই কেন?

তাজা ছটফটানো মাছটাকে টেনে নৌকায় ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন জনে চেপে ধরে। অনবরত লেজ আছড়ায় ওটা। কামোদ জিহ্বায় শব্দ করে বলে, মনে হচ্ছে আমার খিদে পেয়েছে কানুদা।

ধনশ্রী পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, কাগনী ধানের ভাত আর ঐ মাছের দোপেঁয়াজা। উঃ, যা মজা হবেনা!

তোমার জিভ দিয়ে জল ঝরছে না তো ধনাদা? কাহ্নুপাদ হেসে বলে।

ধনাদার ঝরছে কিনা জানি না, কিন্তু আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না।

রামক্রী বড় করে ঢোক গেলে।

জল কিন্তু আমার জিভেও আসছে—

ডোম্বি কথা শেষ করার আগে দেশাখ লুফে নেয়।

শুধু তোর জিভে আসেনি, ঐ জল বৈঠা বেয়ে নদীতে নেমেছে, ঐ তো দেখতে পাচ্ছি।

তুমি সব সময় আমার পিছে লাগো কেন বলতো?

সত্যি কথা কইলে বুঝি পিছে লাগা হয়?

দেখো, ভালো হবে না কিন্তু।

ডোম্বি রেগে ওঠে।

কাহ্নুপাদ তাড়াতাড়ি বলে, দেশাখ রে, যতই শিকারে যাইনা কেন, ঐ মাছ দেখলে প্রাণটা কেমন করে ওঠে। বলে বোঝানো যায়না।

ঠিক বলেছো।

সকলে কলরব করে ওঠে। কাহ্নুপাদের সমর্থন পেয়ে ডোম্বি নরম হয়ে যায়। সকলের বুকের কথাই যেন ঐ একটা। ঠিকমতো কেউ বোঝাতে পারছিলো না। তাই কেউ আর আলাদা প্রকাশ খোঁজার চেষ্টা করে না। সকলে যেন অদৃশ্য এক মাছ-ভাতের উৎসবে বসে যায়। এর বাইরে জীবনের চাওয়া আর খুব একটা নেই। এ দৃশ্য স্থির ছবি হয়ে আটকে থাকে সকলের হৃদয়ে। একসময় ওরা অনুভব করে এই মাছ রাজদরবারে চলে যাবে। এই মাছ ওদের জন্যে নয়। মাছের আলোচনা শেষ হতে-না-হতেই নৌকা এসে ঘাটে লাগে।

অতবড় মাছ যখন দেখেছি নিশ্চয় আমাদের যাত্রা আজ শুভ।

দেশাখ লাফিয়ে নেমে যায়। ওকে আবার শিকারের উদ্দামতায় পেয়ে বসে। ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে পায়ের গতি। ডোম্বি কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধতে বাঁধতে বলে, শিকারের নামে দেশাখের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

যেমন নাচের নামে তোমার রক্ত।

কাহ্নুপাদ আস্তে করে বলে। সকলে নেমে গেছে।

গীত লেখা ছেড়ে দিয়ে হরিণ শিকারে যে?

কেবল গীত লিখলে কি পেট ভরে?

কাহ্নুপাদ হাঁটতে থাকে। রামক্রী কড়ি গুণে দেয় ওকে। ওরা চলে গেলে পাটাতনের ওপর বিছিয়ে ওগুলো ও আবার গোনে। তারপর কোমরে গুঁজে রাখে। কৌটো খুলে পান খায়। গুনগুনিয়ে গান ধরে। কাহ্নুপাদ ওকে একটা গান শিখিয়েছে। এক শো পদুমা চৌউঠি শাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচত ডোম্বি বাপুড়ী। আর কিছু মনে নেই ওর। ঘুরে ফিরে ঐ দু'টো লাইনই ভীষণ আবেগে গাইতে থাকে। যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় ঐ দুটো লাইনে নিমজ্জিত। গাইতে গাইতে ডোম্বির চোখে জল আসে। বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। মেঠো পথে একদল লোক ক্রমাগত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গাছগাছালির আড়াল হচ্ছে। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে। তারপর আর না। কেউ কোথাও নেই। পারাপারের লোক এসেছে। ডোম্বি আবার নৌকোর কাছি খোলে।

বনে ঢোকার আগে ওরা চুমুক চুমুক হাঁড়িয়া খেয়ে নেয়। ব্যবস্থাটা রামক্রীর। ওর মদের দোকান আছে। হরিণ উৎসবের নামে ও ভীষণ উত্তেজিত হয়। তাই বিনা কড়িতে ও সকলকে হাঁড়িয়া দেয়। ওর মতে হাঁড়িয়া না খেয়ে শিকারে নামলে শিকার তেমন জমে না। রক্ত গরম হওয়া চাই। পান্‌সে ঠাণ্ডা রক্ত শিকারের জন্যে উপযুক্ত নয়। কাহ্নুপাদ আর দেশাখ বেশি খায়। রামক্রী দেশাখকে ইচ্ছে করেই বেশি দেয়। শিকারে ও প্রধান ভরসা। হৈ-হৈ করে ওরা যখন বনে বেড় দেয় তখন কাহ্নুপাদের বুক ধড়ফড় করে। কেবলই মনে হয় ডোম্বি এখন মাঝনদীতে।

তোমাকে একটু আনমনা দেখাচ্ছে কানুদা?

ও কিছু না।

নেশা বেশি হয়নি তো?

পাগল।

কি যে বলিস দেশাখ। নেশা কানুদাকে কখনো ধরে না, যদি না কানুদা নেশাকে ধরে।

তাইতো। আমরা চলি কানুদা। তোমরা ঠিকমতো এগুবে কিন্তু। দেশাখ, কামোদ, রামক্রী ও আরো কয়েকজন তীরধনুক নিয়ে গাছের আড়ালে চলে যায়। বাকি সবাই চারদিক থেকে টিন বাজিয়ে ভীষণ শব্দে হরিণ তাড়া করে। ভয়ে হরিণগুলো এদিক ওদিক ছুটতে থাকলে ওরা মারবে। সকলে আনন্দ উল্লাসে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ছুটছে। বনের কিছু অংশ ঘিরে ধরেছে। এখনো একটা হরিণও বের হয়নি। প্রাণভয়ে লুকিয়েছে যেন কোথায়। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। বেরুতে হবেই। হাঁটতে হাঁটতে কাহ্নুপাদ একসময় একলা হয়ে যায়। রাজদরবারে বসে বসে পাখা টানতে হয়। ছুটোছুটিতে ওর তেমন অভ্যেস নেই। অল্পেই হাঁফিয়ে ওঠে। এদিক ওদিক কাউকে না দেখে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে ও। বুক ভরে শ্বাস নেয়। পাশের ঝোপে খস্খস্ শব্দে তাকাতেই লক্ষ্য করে চমৎকার এক মায়াহরিণের বাচ্চা বড় বড় চোখের টলটলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাহ্নুপাদের বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে। লোভ চক্চকিয়ে লাফায়। হরিণের মাংস ওর ভীষণ প্রিয়। সেজন্যেই এদের সঙ্গে আসা। বাচ্চাটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি সরায় না। কাহ্নুপাদের মনে হয় ও বুঝি মাকে হারিয়ে ফেলেছে। তখুনি ওকে তাড়াবার কোনো ইচ্ছে হলো না কাহ্নুপাদের। থিতিয়ে এলো লোভের কচকচানি। শিউরে উঠলো নিজে নিজেই। এ জায়গায় ও না হয়ে দেশাখ হলে কি হতো? পরমুহূর্তে প্রচণ্ড টিনের শব্দে বাচ্চাটি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়। কালো চোখের ভীরু দৃষ্টি ছলছলিয়ে ওঠে। শবরীর কথা মনে হয় কাহ্নুপাদের। শবরী এমন! বিহ্বল মুহূর্তে ছলছল করে ওর সমস্ত শরীর। হাসি পায় ওর। হরিণের মাংস যত প্রিয়ই হোক না কেন ও নিজে কোনো দিন শিকারী হতে পারবে না। বাচ্চাটা যেন ওর কাছে আশ্রয় চাইছে। কাহ্নুপাদ অসহায় বোধ করে। দেশাখের হাত থেকে ও কিছুতেই বাচ্চাটিকে রক্ষা করতে পারবে না। বিড়বিড়িয়ে ওঠে, আপন মাংসই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু। কে একে রক্ষা করবে? সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে তিনটে বড় হরিণ মেরেছে ওরা। দু'টো দেশাখ। একটা রামক্রী। দেশাখ একই সঙ্গে আরো চারটে খরগোশ মেরেছে। কামোদ মেরেছে একটি সজারু। বাকিরা কেউ কেউ পাখি মেরেছে। সকলের মনেই খুশির ভাব। হরিণের বাচ্চাটাকে দেখে ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্ত হলেও কাহ্নুপাদ ভীষণ খুশি। তিনটে হরিণ তো কম কথা নয়। হল্লা করতে করতে ফিরে আসে ওরা। দু'টো হরিণ কেটে টুকরো টুকরো ভাগ করে নেয়। অন্যটা রেখে দেয়। সন্ধ্যায় ওটাকে আস্ত পুড়িয়ে ওদের উৎসব হবে। পুরো পাড়া খুশিতে মেতে ওঠে। বিরাট আগুনের কুণ্ড করে হরিণ পোড়াবার আয়োজন করে। ছোটদের চীৎকার আর উল্লাসে সরগরম হয়ে ওঠে পাড়া।

সব আয়োজন ঠিকঠাক করে হাতে এক খরগোশ দোলাতে দোলাতে পুব পাড়ার দিকে ছোটে দেশাখ। বেশ কয়েকদিন বিশাখার সঙ্গে দেখা নেই। মনটা ছটছটিয়ে ওঠে। তাছাড়া উৎসবের খবরটাও দিতে হবে ওকে। ঐ পাড়াটা সবচেয়ে সুন্দর আর ছিমছাম। ছোট ছোট টিলার পাশে চাঁচরবেড়ার বাড়িগুলো একদম ছবির মতো। পুব পাড়া আর বিশাখা দু'য়ের কাছে এলেই দেশাখের শিকারী মন নরম হয়ে যায়। অসম্ভব গরীব বিশাখার বাবা। একগাদা ভাইবোনের মধ্যে ও সবার বড়। ঠিকমতো খাওয়া জোটে না। রোগা শরীরের মাঝে জ্বলজ্বল করে চোখ জোড়া। ঐ চোখের দীপ্র ঔজ্জল্যে দেশাখের প্রতিদিনের অবগাহন। নেশার মতো মনে হয়। ভুলে যায় অভাবের কথা, শিকারের কথা। বিশাখার অবুঝ চেতনায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগে দেশাখের। আর কেউ ওকে এমন করে ধরে রাখতে পারে না। বৌদি একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলো, ঐ রোগা, পুঁচকে মেয়েটার কি আছে বলতো?

কি আছে তাতো জানিনে?

ওমা কেমন কথা।

অতো জানতে গেলে প্রেম হয় না বৌদি।

তাই নাকি?

তোমরা যেন কি? মাঝে মাঝে বেশি হিসেব আমার একটুও ভালো লাগে না বৌদি।

হিসেবই তো তোমার পেশা।

পেশা কিন্তু নেশা না। তাই কখনো কখনো ওটাকে মাঝ নদীতে ফেলে দেই।

তাই বলো।

বৌদির বাঁধভাঙা হাসিতে দেশাখ লজ্জা পেয়েছিলো। ভাবতে ভাবতে দেশাখ বিশাখাদের বাড়ি ছাড়িয়ে চলে যায়। মনের মধ্যে সুখ-সুখ ভাব।

কোথায় যাচ্ছেন দেশাখদা?

এই যে নিশু, তোদের বাড়িতে যাচ্ছি।

বারে, বাড়ি ছেড়ে তো চলে এসেছেন।

তাই তো। তোর দিদি কৈ রে নিশু?

নিশু পোকা-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হাসে। হাত দিয়ে দূরের টিলা দেখায়।

দিদি ঐখানে গেছে?

কেন?

শামুক খুঁজতে।

এই অবেলায় শামুক খুঁজতে?

বাঃ দিদি শামুক না আনলে যে রাতে আমাদের উপোস দিতে হবে। তিনদিন থেকে বাবার জ্বর।

অ।

দেশাখের মুখ ভার হয়ে যায়।

তুমি ঐদিকে যাবে দেশাখদা? তাহলে দিদিকে বোলো আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না।

ঠিক আছে, যা।

ছাড়া-পাওয়া ছাগলটার মতো নিশু লাফাতে লাফাতে চলে যায়। বেচারা। বিশাখা ওকে এখানে আটকে রেখে গেছে। দেশাখ খরগোশটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নেয়। ভালোই হলো। ঐ টিলায় গেলে বিশাখাকে একলা পাওয়া যাবে। পরক্ষণে মনে হয় বিশাখা অতদূর একলা একলা না গেলেই পারতো। কত কিছুর ভয়। বেশি ভয় রাজার লোকদের। পছন্দ হলে যে কাউকে নিয়ে চলে যায়। তখন ওদের বাছবিছারের বালাই থাকে না।

জাতধর্ম মাথায় ওঠে। দেশাখ একটু দ্রুত হাঁটে। মনে হয় খরগোশটার ওজন অনেক বেড়ে গেছে। এই মুহূর্তে ওটা বিশাখার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এক রাতের জন্যে ওদের বাড়িতে উৎসব জমবে।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধান চাষ করেছে রাজার লোকেরা। এগুলো রাজা বুদ্ধমিত্র কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্রী দেবল ভদ্রের নিষ্কর জমি। ঐখানে আগে বিশাখার বাবার জমি ছিল। জমি ছিল ধনশ্রী ও আরো অনেকের। একদিন দেখা গেলো ওটা আর ওদের নেই। রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে দান করেছেন। কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কেউ কোনো আপত্তিও করতে পারবে না। কেন না রাজা দেশের ভূমির একমাত্র মালিক। দেশাখের দাঁতে দাঁত লেগে হঠাৎ করে কড়কড়িয়ে ওঠে। ওরা সব ছোটলোক। ওদের কোনো কিছুতে কোনো অধিকার নেই। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওঠা কচি ধানের চারা বাতাসে দুলছে। দেশাখ দূর থেকে দেখতে পায় বিশাখাকে। ও নিচু হয়ে শামুক খুঁজছে। এ সমস্ত ধানের ক্ষেত পাহারা দেয় রাজার লোকেরা। ধান ক্ষেতের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শামুক পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। তাই দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা আসে শামুক খুঁজছে। তখন ধানের চারা নষ্ট হয়। পাহারাদারের হাতে ধরা পড়লে মার খায়। সেজন্যে বিশাখা কখনো দলে-বলে আসে না। একা একা আসে। ভাইবোনদেরও সঙ্গে আনে না। ওরা বড্ড হৈ চৈ করে। অনেক সময় আসল কাজই ভণ্ডুল হয়ে যায়।

কোঁচড়ভর্তি শামুক নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেশাখকে দেখতে পায় বিশাখা। কাদামাখা পা জোড়া ক্ষেতের মধ্য থেকে টেনে তুলে ঘাসে মোছে। তারপর তরতরিয়ে নেমে আসে।

তুমি?

কেন আসতে নেই বুঝি?

যাঃ তাই বলেছি নাকি।

তা নয়তো কি। তুমি চাওনা যে আমি আসি।

এই নাও তোমার সঙ্গে আড়ি।

বিশাখা নিজের আড়ির আঙুলটা দেশাখের আঙুলে ছুঁইয়ে দেয়।

উফ্, আবার রাগ হয়েছে। দেখি মুখখানা—

যাও।

বিশাখা এক ঝট্‌কায় দেশাখের হাত সরিয়ে দেয়।

তুমি একটা অসভ্য।

আর কি?

সজারু।

দেখো সজারু বোলো না। আমি মোটেই সজারুর মতো ভীতু নই।

সজারুর মতো তোমার মনের মধ্যে কাঁটা।

ও! তাই বলো।

দেশাখ হো হো করে হাসে।

ঐ কাঁটা-মনটার জন্যেই তো পাগল হয়েছো।

ছাই হয়েছি।

বিশাখা ভেংচি কাটে। দেশাখ ওর হাত ধরে টিলার কোল-ঘেঁষে বসে পড়ে।

দেখো, তোমার জন্যে কি এনেছি।

খরগোশ? তুমি মেরেছো?

তবে আর কে? মেরেছি আবার বাড়ি বয়ে নিয়ে এসেছি।

যা মজা হবে। মাকে বলবো অনেক মশ্‌লা দিয়ে রাঁধতে। উঃ যা খুশি লাগছে।

দেশাখের বুকটা কেমন করে। বিশাখা বড় অল্পে খুশি হয়। ওর ঐ খুশিটুকু যদি প্রতিদিনের করে দেয়া যেতো।

এই, কি ভাবছো?

বিশাখা দেশাখের পিঠে হাত রাখে।

তুমি এতদূর একলা একলা কেন এসেছো বিশাখা?

রাতে উপোস—

থাকগে।

দেশাখ ওকে বুকের কাছে টেনে আনে। শুকনো চুল সরিয়ে দেয় মুখের ওপর থেকে। জানে, বিশাখা কি বলবে। পেটে আগুন নিয়ে একলার চিন্তা করা যায় না। সেটা দেশাখ বোঝে। তবু মন মানতে চায় না। বিশাখার ম্লান বিষণ্ণতায় ও ভীষণ অনুতপ্ত হয়। কথাটা না বললেই পারতো। বিশাখাও জানে ওর এই আসাটা দেশাখেরও পছন্দ নয়। কিন্তু উপায় কি। বিশাখার গলা ধরে আসে।

আমি আসতে চাইনি। মা জোর করে পাঠিয়েছে। ছোট ভাইবোনগুলো কাঁদছিলো।

দেখি কতগুলো শামুক পেয়েছো?

দেশাখ খুশি হবার চেষ্টা করে। মনে হয় ওর বোন দু'টিও শামুক খুঁজতে আসে।

অনেক। আমাদের দু'দিন হবে। আজকে আমার ভাগ্য খুব ভালো। শামুক আবার খরগোশ।

দেশাখ আবার ভাবে, এমন দিন কেন রোজ রোজ হয় না।

বিশাখা, আজ সন্ধ্যায় হরিণ-উৎসব।

সত্যি?

বিশাখা আবেগে দেশাখকে জড়িয়ে ধরে।

আজ একটা দিনের মতো দিন।

চলো এখন যাই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাকে বলেই চলে আসবে। আমি নিচে দাঁড়িয়ে থাকবো।

সবুজ টিলাগুলো ভীষণ নির্জন। আকাশে চাঁদ। টিলার ওপরে ছোট ছোট বাড়িগুলো প্রস্ফুটিত কার্পাস। দেশাখের শিকারে-অব্যর্থ হাতের মুঠোয় বিশাখার শামুক-খোঁজা কাদা-লাগা হাত। দূর পাহাড়ের দিক থেকে ঝলক ঝলক বাতাস আসে। বিশাখার ভালোবাসার স্পর্শ। দেশাখ যখন আদর করে তখন পাগল হয়ে যায়। সবুজ টিলার পাদদেশে

একজোড়া মানব-মানবীর আকাঙ্ক্ষা নদীর মতো বয়ে যায়। দু'জনে কথায় হাসিতে মগ্ন হয়ে পথ চলে। দেশাখের তখন একটুও মনে থাকে না যে বাড়ি মানেই বাবার কাশি, মা-র বিরক্তি, বৌদির বিষণ্ণতা। কিশোরী বোনদের দ্রুত বেড়ে ওঠা। বাড়ি মানেই অভাব। ওসব ভুলে যায়। যে চিন্তাগুলো বুকে ধিকিধিক জ্বলে বিশাখা তা অনায়াসে ভুলিয়ে দেয়। বিশাখার সান্নিধ্য মানেই যাদুর কাঠির পরশ।

বিশাখাকে উৎসব-প্রাঙ্গণে রেখে দেশাখ দ্রুত বাড়ি আসে। বাক্সের তলা থেকে বহুদিনের পুরোনো নীল জামাটা বের করে পরে। চুপচুপে তেলে চুলগুলো চকচকে করে তোলে। জুলফি বেয়ে সে তেল গড়ায়। বাবার ঘর থেকে কাশির শব্দ আসে। মা-র সাড়াশব্দ নেই। ভাই-বোনগুলো চলে গেছে উৎসব-প্রাঙ্গণে। বেরোতে গিয়ে দেশাখের বুকটা খচ্ করে ওঠে। চাঁচরবেড়ার ঐ পাশে সুলেখা কেমন চাপচাপ বসে আছে। পিঠের ওপর রাশি রাশি চুলের গোছা। যেমন কালো, তেমন ঘন। দেশাখের মনে হয় বৌদির চুলের গোছা সত্যি অপূর্ব। অনেকদিন হলো সুলেখা আর ভুসুকুর কথা জিজ্ঞেস করে না। যত দিন যায় ও ম্রিয়মান হতে থাকে। ভুসুকু যাদের সঙ্গে বাণিজ্যে গেছে তারা কেউ ফেরেনি। কোনো খবরও নেই। হঠাৎ দেশাখের মনে হয় অর্থহীন অপেক্ষা। ভুসুকু আর ফিরবে না। হয়তো জলদস্যুরা নৌকা ভেঙেচুরে ওদেরকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, নয়তো ঝড়ে নদীতে ডুবেছে। সুলেখা মিছেই দিন গুণছে।

বৌদি?

বলো।

সুলেখা মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দেয়। গলাটা ভারি। চোখের কোণা ভেজা।

আমার চেহারাটা কি এতো খারাপ যে তাকাবে না বলে ঠিক করেছো?

দেশাখ হাসাবার চেষ্টা করে।

কি বলবে বলো?

চলো।

কোথায়?

কেন, হরিণ-উৎসবে?

তুমি যাও।

আমিতো যাবোই। তোমাকেও নিয়ে যাবো।

সুলেখা ঘুরে দাঁড়ায়।

কেন বিরক্ত করছো।

বিরক্ত?

দেশাখের রাগ হয়।

নয়তো কি? সব জেনেশুনেও আবার যেতে বলছো?

দাদা নেই বলে কি তোমার সব উৎসব বাদ?

সুলেখা কথা বলে না। উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে পটহ মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। দেশাখ চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঐ শব্দ যেন সুলেখার বিষণ্ণ জীবনের দ্বারপ্রান্তের আগমনী বার্তা। কিন্তু তাতে সুলেখার কোনো ভাবান্তর হয় না। যেমন ছিলো তেমন বসে থাকে। অথচ একদিন ঐ শব্দে ভুসুকুর হাত ধরে ছুটে বেরিয়ে যেতো। সারারাত নাচতো। একটুও ক্লান্ত হতো না। আজ ইচ্ছে করে ঐ শব্দ উপেক্ষা করছে। দাঁতে দাঁত চেপে রক্তের নাচন থামাতে চাইছে। সুলেখার জন্যে ভীষণ কষ্ট হয় দেশাখের। কাছে গিয়ে সামনাসামনি উবু হয়ে বসে।

বৌদি?

সে ডাকে কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় সুলেখা। দেশাখের কণ্ঠ যেন পটহ মাদলের ঝংকার। দেশাখের চোখে চোখ পড়তে চমকে যায়। ঐ দৃষ্টি বলে ও আজ ভিন্ন দেশাখ। সুলেখা কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে। কে যেন তাকে তীরে উঠে আসবার জন্যে ডাকছে। ও কি গভীর থেকে গভীর জলে ডুবে যাবে? নাকি জলের স্পর্শ ঝেড়ে ফেলে হাঁসের মতো উঠে আসবে? দেশাখ ওর হাত ধরে টেনে ওঠায়।

চলো বৌদি? সারারাত উৎসব হবে আর তুমি একলা মন খারাপ করে বসে থাকবে কেন?

তোমরা হাঁড়িয়া খাবে, জোড়ায়, জোড়ায় নাচবে। আমি কি করবো বলতো?

তুমিও সঙ্গী জোগাড় করে নাচবে?

দেশাখ?

ভাবো, সারাদিন শিকার করি বলে আমার মনটন সব নষ্ট হয়ে গেছে? ওঠ। কাপড় পরে নাও।

বাবা-মা।

অতো সংকোচের দরকার নেই বৌদি? এ সংসারে আমার ওপর কে কথা বলবে? সেসব আমি দেখবো। তুমি ঐ বিয়ের সময়কার মেঘডুম্বুর শাড়িটা পরে নাও।

সুলেখা আর কোনো কথা না বলে ঘরে চলে যায়। মনে কৃতজ্ঞতা। দেশাখ যেন ওকেও ভুসুকুর বাণিজ্যের নৌকায় উঠিয়ে দিয়েছে। ও বন্দরের অভিমুখে চলেছে। পটহ মাদলের শব্দ উত্তাল হয়ে উঠেছে। বাজনাদাররা যেন আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছে না। দেশাখ উঠোনে পায়চারী করে। কুয়োতলার ছোলঙ্গ গাছটায় একটা কাক বসে ডাকছে। চারিদিকে ছমছমে আঁধার। সুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত হাঁটে দেশাখ।

হরিণের পোড়া মাংসে ভুরভুর করছে সমগ্র পল্লী! আগুনের লাল শিখা গনগনে। পটহ মাদলের ঝংকারে উদ্দাম নাচছে ডোম্বি। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। দেশাখ সুলেখার হাতে চাপ দেয়।

দেখেছো, ডোম্বিটা যেন কি?

ও নইলে আসর জমে না।

সুলেখা মুচকি হাসে। দেশাখ অনুভব করে সুলেখা লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে। ওর চোখের দীপ্তিতে বাসনার ফুলকি হাওয়াই বাজির মতো জ্বলছে আর নিভছে। সুলেখা ভিড়ে মিশে যায়। দেশাখ একা দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না সময়টা রাত। চারদিক যেন খাঁ খাঁ চৈত্রের দুপুর। আকাশের পাল্লার একমনী বাটখারাটা এখন দুপুরের দিকে ঝুঁকে আছে। লোকজনের তপ্ত শ্বাস ঝাঁঝিকাঁসির বাজনা হয়ে বন্ বন্ ছুটছে। রাত আর একটু

গাঢ় হলে মানুষগুলো একদম পাগলা হাতি হবে। কেউ কারো পরোয়া করবে না। দেশাখ চৈত মাসের অসহ্য উত্তাপ গায়ে নিয়ে বিশাখাকে খুঁজছে। ডোম্বির নাচ আরো উদ্দাম হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পটহ মাদলও। বহুদিন পর যেন খরখরি গায়ে বেশরম বেহায়াপনা। যন্ত্রগুলোও মানুষ হয়েছে। ঐখানেই বিশাখাকে পায় ও। একমনে ডোম্বির নাচ দেখছিলো। হাত ধরে অর্জুন গাছের আড়ালে নিয়ে আসে।

এত দেরি করেছো কেন? তোমাকে খুঁজে—

দেশাখ ওকে কথা বলতে দেয় না। ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে ধরে। ঘন আঁধার এখানে জমজমাট। তবু অল্প সময়ের মধ্যে দেশাখ তপ্ত হাওয়ার গনগনে দুপুর পার করে। অর্জুনের মড়মড়ে খয়েরী পাতা দলছুট বুড়ো হয়ে নিঃসাড় ঝরে।

খাবার সময় হয়েছে। পটহ মাদল থেমে থেমে শব্দ করছে। তালের বাইরে এলোপাথাড়ি বাড়ি পড়ছে। ডোম্বি পা ছড়িয়ে বসে আছে। বাচ্চারা মাংস নিয়ে চলে গেছে। দেশাখের মনে হয় দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল। আরো পরে রাত হবে। সুলেখাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ও। মাংস চিবোয় আর ছোট ছোট হাড় এ ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে। সঙ্গে হাঁড়িয়া। নেশার তখন প্রচণ্ড গতি। ঠেকিয়ে রাখে কার সাধ্যি! দেশাখের মনে হয় চমৎকার সেজেছে শবরী। অপূর্ব দেখাচ্ছে। বিশাখা নিজেকে সাজাতে পারে না। বোঝে না কোন বস্তুতে ওকে মোহিনী মনে হবে। শবরী জানে। কাহ্নুপাদের কবিতার মতো শবরী নিজেকে সাজায়। দেশাখ বড় একটা মাংসের টুকরো নিয়ে বসে।

কাহ্নুপাদের পাশে শবরী। শবরীর সাদা দাঁত ঝিলিক দেয়। অকারণে হাসে। কায়দা করে দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরো ধরে রাখে। এ দৃশ্যে ডোম্বি চোখ ঘুরিয়ে নেয়। বিজাতীয় ক্রোধ দমন করতে গুনগুনিয়ে গান ধরে। দুম করে পা ফেলে ঘুঙুর বাজায়। বাজনাদারদের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। মনে আগুনে-জ্বালা। কাহ্নুপাদ ওকে যতই ভালোবাসার কথা শোনাক—গোপনে মল্লারী ডাকুক, উৎসবে শবরীই সব। ডোম্বি ঢক্‌ঢক্ করে হাঁড়িয়া গেলে।

এত খেলে নাচবি কেমন করে?

নাচবো না।

রাত কতো বাকি—

তাতে কি? এখনতো সবাই জোড়ায় জোড়ায় নাচবে।

ডোম্বির ঝাঁঝালো কণ্ঠ শিথিল হয়ে যায়। কার ওপরই বা রাগ করবে। রাগ করলে শরীর কিড়মিড় করে। নাচতে ইচ্ছে করে না। তাতে লাভের বদলে লোকসান।

সুলেখা অন্ধকার হাতড়ে সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। বিপত্নীক সুদাম ওর সঙ্গী হয়েছে। গতবছর বউ মরেছে সুদামের। সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে। রাজার জমিতে ধান লাগায়। কারো সাতে পাঁচে নেই। মুখে হাসি লেগেই থাকে। এজন্যেই সুদামকে পছন্দ হয়েছে সুলেখার। সুদামের সঙ্গে নাচ জমবে ভালো।

পোড়া মাংসের গন্ধ তখন বাতাসে তীব্র নয়, মৃদু। হাঁড়িয়ার নেশা সকলের মগজে। পটহ মাদল আবার শরীর দুলিয়ে ওঠে। ঝঙ্কৃত শব্দে জোড়া চঞ্চল পা উদ্দাম হয়। ডোম্বি কোনোদিকে খেয়াল করে না। এক মনে হাঁড়িয়া

টেনে চলে। ওর নেশা আজ সমুদ্র হয়েছে। যত ঢালো কোনো আপত্তি নেই। ডোম্বির ঘুঙুর আর বাজে না। পিপুল গাছের নর্তকী অন্ধকারে কাহ্নুপাদ শবরীর খোঁপা খুলে দেয়। শবরী হাঁড়িয়ার মত্ত নেশা হয়ে কাহ্নুপাদের সব ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করে রাখে। জোড়া জোড়া নর-নারী। কেউ কারো দিকে চায় না। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। দেশাখের মনে হয় চারপাশের এত নর-নারীর ও কাউকে চেনে না। প্রত্যেকটি শরীর যেন এক একটি আস্ত খরখরে দুপুর হয়ে উঠছে। রাতের কথা ভুলে যায় দেশাখ। সুলেখাকে খুঁজে পায় না! আজ সুলেখা দেশাখের চোখের আড়ালে থাকতে চায়। তাই থাকুক। বুকের কাছে বিশাখা। ছটফটে খরগোশ হয়ে বিরাট ঘাসের বনে ঢুকে পড়েছে। দেশাখের শিকারী হাত সে বন বেড় দিয়ে রেখেছে। কখন যেন পটহ মাদল থেমে যায়। বাতাসে মাংসের গন্ধ আর নেই। আগুন নিভে ছাই। সব উৎসব শেষ। খোলা আকাশের নিচে ওরা এলোপাথাড়ি ঘুমোয়। শেষ রাতের হিমেল বাতাস সে ঘুম আরো গাঢ় করে দেয়।

৫

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্রের শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। দেবল ভদ্র ছাড়া কোনো রাজ-কাজ চলে না। বৌদ্ধ রাজা বেদবিরোধী হলেও আর্য-সংস্কারের বিরোধী নন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে আপোষ করেছেন বুদ্ধমিত্র। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর রাজসভায় মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অনেক ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এখানে নিত্যদিন আসর বসায়। স্বভাবতই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মের হোতা হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণরা। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের গভীর এ শিকড় প্রোথিত হয়ে যায়। আর এ আধিপত্যের শিকার হয় নিম্নবর্ণের মানুষ।

বুদ্ধমিত্র দেবল ভদ্রকে নিষ্কর জমি দান করেছেন। মাইলের পর মাইল সে জমির বিস্তার। বিশাখাদের বাড়ির পাশের টিলার গা-ঘেঁষে এ জমির সীমানা শুরু। আধিপত্য, অর্থ দুই-ই দেবল ভদ্রের হাতের মুঠোয়। চন্দ্র-সূর্য-চাঁদ তারা যতদিন স্থির থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেবল ভদ্র বংশপরম্পরায় এ জমি ভোগ করবে। যে রাজাই আসুক রাজকোষে তাদের কোনো রাজস্ব দিতে হবে না। অবশ্য রাজা বুদ্ধমিত্র এ জন্যে দানপুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হয়েছে। তাই তার লাভ। নরকের দ্বার বুদ্ধমিত্রের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো। দেবল ভদ্রকে যথেষ্ট সমীহ করে বুদ্ধমিত্র। আচারে এবং অনাচারে দু'ভাবেই দেবল ভদ্র এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

বুদ্ধমিত্র এবং দেবল ভদ্র দু'জনেই ইন্দ্রিয় কর্তৃক শাসিত হতে বড় বেশি ভালোবাসে। জীবনকে তারা বোঝে ভোগে। সে ভোগ যে ভাবে যে পথে যে উপায়ে হোক না কেন আপত্তি নেই। এ ছাড়া জীবনের আর সব ফাঁকি। ঐ ফাঁকিতে পড়লে জীবনকে কেউ আর ভোগ করতে পারে না। বুদ্ধমিত্র আর দেবল ভদ্রের জীবনদর্শন আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। তাই কোনো বিরোধ নেই। স্থায়ী নর্তকী মাধবী আছে রাজদরবারের জন্যে। কিন্তু তাতেও হয়না। রাতের অন্ধকারে চর আসে ওদের সুখের উপকরণ খুঁজতে। এ ছাড়া বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে তো লেগেই আছে। পানীয়ের সঙ্গে ভেঙে যায় অনেক মেয়ের শরীরের কলস। বিরামহীন এ আকাঙ্ক্ষা। জীবনের এ উৎসবকে বহুবিধ বর্ণ আর সঙ্গীতে সাজাতে দক্ষতার সীমা নেই দেবল ভদ্রের। কি যে সঞ্জীবনী শক্তি ক্রিয়া করে তার নিপুণ আকাঙ্ক্ষায়। আয়েসের বিশ্রব্ধ আলাপে বসে অন্ধকারের আকাশ হাতড়ে চাঁদ খোঁজে দেবল ভদ্র। এসব অনাচারের

বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে আপত্তি করে পণ্ডিত সুধাকর ভট্ট। জ্ঞান অনুশীলন এবং শাস্ত্র আলোচনা ছাড়া জীবনের আর কোনো অর্থ যার জানা নেই। কিন্তু সুধাকর ভট্টকে পরোয়া করার মতো লোক দেবল ভদ্র নয়। তবে মাঝে মাঝে সমীহ করে। সুধাকর ভট্টের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। অস্বীকার করার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সমীহ না করে উপায় নেই। বুদ্ধমিত্র তাকে ভালোবাসে। সে জন্যে দেবল ভদ্রের জোর সবসময় খাটে না।

রাজসভার এ ধরনের পরিবেশ কখনো ভীষণ শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে কাহ্নুপাদের জন্যে। বলির পাঁঠার মতো ছটফট করে কেবল। ব্রাহ্মণরা সবসময় কোণঠাসা করে রাখে ওকে। মুখটি খুলবার জো নেই, অথচ ও নিজে একজন কবি সেকথাও ভুলতে পারে না। ভেতরে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয় তখন ঐ রাজসভা তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে কাহ্নুপাদের। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের রাশভারী সংস্কৃত ভাষার পাশপাশি ওর লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওরা ওকে নিয়ে যতই হাসাহাসি আর বিদ্রুপ করুক না কেন ঐ ভাষাই কাহ্নুপাদের বুকের ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। নেই নাড়ির টান। মাসে একটা দু'টো গীতের আসর বসে। দেবল ভদ্রকে অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত একটাও গীত পড়ার অনুমতি পায়নি ও। উপরন্তু ব্যঙ্গ করেছে মন্ত্রী। ছুঁচোর কেত্তন বলে ওকে ভাগিয়ে দিয়েছে। লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। নম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষীতবৈ। এটা ম্লেচ্ছভাষা। ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করলে অপরাধ হয়। যদি কেউ ব্যাবহার করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রাজদরবারে আর পুজো-অর্চনায় ছাড়া যে ভাষার কোনো ব্যবহার নেই তার এত মূল্য কিসের? ওরা শত শত লোক যে ভাষায় কথা বলে তার কি কোনো মূল্য নেই? ভাবতে গিয়ে কাহ্নুপাদের মাথায় ঝিম ধরে। পরক্ষণে সমস্ত শরীরের রক্ত ভীষণ গরম স্রোত হয়ে কল্‌কল্‌ বয়। দেবল ভদ্রের টুঁটিটা লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে শাসায়। ওকে আরো ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য না ধরলে সকলের মুখের ভাষাকে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

রাজসভায় আজ নৃত্যগীতের আসর। সন্ধ্যায় ফুল-লতা-পাতা-আলপনায় উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলবে গোধূলির পর। দেবল ভদ্রের উৎসাহের শেষ নেই। স্থায়ী নর্তকী মাধবী ছাড়াও আরো পাঁচজন তরুণী এসেছে। তাই আজ সারাদিনের ছুটি। গতকাল কাহ্নুপাদ দেবল ভদ্রের অলেক্ষ্যে বুদ্ধমিত্রের কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলো যে আজকের উৎসবে ওর লেখা গীত ও রাজসভায় পড়বে। বুদ্ধমিত্র রাজি হয়েছিলো। আনন্দে দিশেহারা কাহ্নুপাদ ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসেছিলো। ভাবতে পারেনি যে বুদ্ধমিত্র এত সহজে রাজি হবে।

নৌকায় ডোম্বির সামনে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

কাল আমার গীত রাজসভায় পড়বো মল্লারী।

সত্যি?

মল্লারীর বৈঠা নদীর বুকে জোর শব্দ ওঠায়।

এতদিনে আমার ভাষার মর্যাদা হবে মল্লারী। আমি দেখাবো ওদের ঐ তালের মতো শব্দগুলো কেবল ভাষা নয়। আমাদের ভাষা ঝর-ঝরে, প্রাণ আছে। কি বলো মল্লারী?

সত্যি এমন হয় না। যখন তোমার গীত গাই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তখন আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে।

মাঝে মাঝে তাই ভাবি মল্লারী দরকার নেই ঐ রাজসভার। তোমার কণ্ঠই আমার সব। কিন্তু পারিনা। যখন ওরা অবজ্ঞা করে তখন ওদের ঘাড়ে পা রেখে আমার ভাষার শক্তি দেখাতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে নিজের

ভাষাটা ওদের সামনে মুকুটের মতো মাথায় পরি। এ ভাষায় যে নদীর স্রোত আছে তা ওদের জানা দরকার... এটা আমাকে করতেই হবে মল্লারী।

একটানা কথা বলে কাহ্নুপাদের বুক হালকা হয়ে যায়। ও নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে দেয়।

তোমার হাতে যাদু আছে কানু। মুখের ভাষা তুমি বুকের ভাষা করে দাও। কেমন করে পারো?

কি জানি। জানি না তো।

কাহ্নুপাদ আনমনে দুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হাজার ভাবনা।

রাজা তোমার কথায় রাজি হলো কেন কানু। মদের ঘোরে বলেনি তো?

না গো না। রাজা খুব ভালো।

আনন্দের আতিশয্যে কাহ্নুপাদ বিচারবুদ্ধিহীন সরল শিশু হয়ে যায়। কোনো কিছু তলিয়ে দেখার ইচ্ছে নেই।

কি জানি। আমার ভয় করে।

ও কিছু না।

কাহ্নুপাদ হেসে উড়িয়ে দেয়। এক কোষ জল তুলে ডোম্বির দিকে ছুঁড়ে মারে।

ভয় কেন বলতো?

আমরা যে ছোট জাত। আমাদের তো সবটাতেই অপরাধ।

কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না। এর উত্তর ওর নিজেরও জানা নেই। এ নিয়ে ভাবলে ওর মাথা গরম হয়। কিন্তু উপায় খুঁজে পায় না। নিজের লোকজনের কাছেও জোর-সোরে বলতে পারে না। সব চারদিক থেকে হা হা করে ছুটে আসে। ছোট মুখে বড় কথা নাকি মানায়না। নৌকা কুলে ভেড়ে। কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে নেমে যায়। দ্রুত ঘরে ছোটে। সন্ধ্যার অনেক বাকি এখনো। শবরীর প্রসাধন প্রায় শেষ। ও ময়ূরের মতো পেখম ধরেছে কেবল।

আহ্। এই মুহূর্তে তোমাকে এমন সাজেই চাইছিলাম সই।

শবরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় কাহ্নুপাদকে আশা করেনি। তাছাড়া কেমন যেন নতুন দেখছে ওকে।

দেখছো কি সই?

কাহ্নুপাদ ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

তুমি যেন তুমি নও?

শবরীর কণ্ঠে বিস্ময়।

আমি এখন তোমার অন্য কানু।

হুঁ, তাতো দেখছি। অন্য সময় হলে এতক্ষণে রেহাই দিতে না আমাকে।

আজ তোমাকে ছোঁব না সই। এই মুহূর্তে তুমি আমার মুখের ভাষা। আমার লিখতে না-পারা মুখের ভাষা। তুমি ভীষণ পবিত্র। তোমাকে ছুঁয়ে কিছুতেই নষ্ট করা যায় না।

কি বলছো কানু?

কাল রাজসভায় আমার গীত পড়বো।

সত্যি?

হ্যাঁ সই। আজ তুমি যেমন শিল্প হয়েছো, ঠিক তেমন করে আমার গীত রচবো সই। তুমি যেমন আছ, তেমন করেই বোস। আমি দেখি।

আমি একটুও নড়বো না কানু।

সারারাত আমরা এমন করে কাটিয়ে দেবো।

পারবে? তোমাকে আমি চিনি। শবরী হাসে।

আমাকে ভুল বুঝোনা সই। পারতেই হবে। জীবনমরণ বাজি। ঐ রাজসভায় গীত গাইতেই হবে। যত যন্ত্রণা, যত কষ্টই হোক। আমি তোমার সঙ্গে আছি।

শবরী মাথা নুইয়ে রাখে। সাধনার রাত পার হয়ে যায়। কাহ্নুপাদ একফোঁটা ঘুমুতে পারে না। কখনো বুকের মধ্যে উত্তাল আকাঙ্ক্ষা। কখনো কখনো।

সকালে ময়ূরটা কতবার ছটফটিয়ে গেছে, সেদিকে একটুও খেয়াল নেই শবরীর। ওর চাঁচরবেড়ার বাড়িতে আজ উৎসব। কানুকে সারাদিন বাড়িতে পাবে। কাহ্নুপাদ একমনে লিখছে। শবরীর খুশির সীমা নেই। তুচ্ছ হয়ে গেছে সোহাগী ময়ূর। ছুটোছুটি করে রান্না করেছে। কানুর প্রিয় কচ্ছপের মাংস রেঁধেছে। প্রচুর মশলা, দই, রাই সরিষায় সে ব্যঞ্জনের গন্ধ টিলার গায়ে ম-ম করছে। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু, তালরস গাঁজিয়ে মদ তৈরি করেছে। শবরীর মনে হয় প্রিয়জনকে কেন্দ্র করে এ উৎসবকে আপন মনে ভরিয়ে রাখা যায়। লোক সমাগম এ উৎসবের মাধুর্য ও সৌন্দর্য নষ্ট করে। একাকী খুশির এই ভীষণ আবেগ শবরীকে মাতাল করে রাখে। কাহ্নুপাদের মনের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র যোগ নেই। রান্নাবান্না শেষ করে বেড়ার গায়ে, মেঝেতে আল্পনা আঁকে শবরী। তারপর দীঘল চুল ছেড়ে দিয়ে নাইতে যায়। পায়ে মল নেই। তবু মনে হয় ওর প্রতি পদক্ষেপে ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে।

আর একদিকে কাহ্নুপাদ তখন ক্রমাগত নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছে। কোনো পঙক্তিই পছন্দ হচ্ছে না। পুরোটাতো পরের ব্যাপার। কখনো মনে হয় নিজের জ্বালার কথা উচ্চস্বরে বলে। পরক্ষণে চুপসে যায়। তাহলে ওরা ওকে মেরে ফেলবে। পড়তে দেবেনা। কুক্কুরীপাদ এ জন্যেই বলে, রুখের তেন্তলি কুম্ভরী খাঅ। সরবে বলতে পারে না বলে কুক্কুরীপাদ এমন আবরণ দিয়ে বলে। চমৎকার কথা বলে কুক্কুরী। ওদের জীবনের তেঁতুল ঐ দেবল ভদ্রের মতো হোঁতকামুখো কুমীরে খায় বলেই তো ওদের এত যন্ত্রণা। সমাজে ঠাঁই নেই, মুখের ভাষার দাম নেই, ঘরে নিত্য অভাব। নইলে এত ধান, এত কার্পাস কিসের অভাব ওদের? সব ঐ রাজার গোলায় যায়। ছোট লোকদের জন্যে কেবল নেড়া কুটা। আর কি? ওদের জন্যে ঐটুকুই যথেষ্ট, এতেই ওদের বর্তে যাওয়া উচিত। ও একবার লিখে ফেলে ডোম্বির কথা।

নগর বাহিরি ডোম্বি তোহরি কুড়িয়া

ছোই ছোই যাইসি বাম্ভণ নাড়িয়া

পরক্ষণে কেটে দেয়। দরবারে সে এই কথা বললে ওরা ওখানেই ওকে টুটি ছিঁড়ে মেরে ফেলবে। যত অনাচার, সব ওদের জন্যে শুদ্ধ। ছোটলোকেরা তা বলতে পারবে না। কুক্কুরীপাদের মতো ভাষার আবরণ খোঁজে কাহ্নুপাদ: তিনি ভুঅন মই বাহিঅ হেঁলে। হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ! না হচ্ছে না। একথা লিখে কি হবে? তিন ভুবন আমার দ্বারা অবহেলায় বাহিত হল। মহাসুখলীলায় আমি লিপ্ত রয়েছি। যন্ত্রণাটা তত তীব্রভাবে প্রকাশিত নয়। আরো তীব্র করা চাই। আবার কাটাকাটি শুরু হয়। শবরীর ভেজা চুল থেকে জল ঝরছে। পরিপাটি আঁচড়িয়েছে চুল। তোরঙ্গ থেকে ধোয়া-শাড়ি বের করেছে। পায়ে আলতা। সময় বয়ে যায় তবু কাহ্নুপাদের লেখা শেষ হয় না। শবরী ময়ূরটাকে খেতে দেয়। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কাহ্নুপাদ একটু সুস্থ হয়। আগের একটা লেখা ভীষণ পছন্দ হয়। ওটাকেই ঠিকঠাক করে নেয় ও।

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা। তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।

কাহ্নু কাঁহ গই করিব নিবাস। জো মন গোতর সো উআস।।

হ্যাঁ। এটাই হবে। ভীষণ অন্ধকারে পথ রুদ্ধ। তা দেখে কানু বিমনা হলো। কাহ্নু কোথায় গিয়ে নিবাস করবে। যারা মনোগোচর তারাই উদাস। এর সঙ্গে আরো ছয় পংক্তি দিব্যি এসে যায়। ও চটপট লিখে ফেলে। কয়েকবার পড়ে। তারপর খুশি হয়ে যায়।

খাবার নিয়ে বসে থাকে শবরী। বাতাসে পটকাতে পটকাতে ওর ব্যঞ্জনের গন্ধ হাওয়া। মনটা ক্রমাগত দমে যেতে থাকে। এত আয়োজন, এত যত্ন যার জন্যে সে একবারও ফিরে তাকালো না। মনখারাপকরা নিরুৎসাহ শবরীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ পর্যন্ত তিনবার ডেকেছে কানুকে। হুঁ-হাঁ করা ছাড়া কোনো কথা বলেনি কানু। যেন কোনো খিদে নেই। খাবার কথা একদম ভুলে গেছে। বাইরে বৈশাখী বাতাস চাঁচর বেড়ার সঙ্গে ইয়ার্কি করে। কাপাসের শুকনো খিরখি পাতা ঘরে এসে পড়ে। ছোট জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে শবরী। দূরে নদীর ধারে মানুষ নেই। নদীটা নিস্তেজ পড়ে আছে। খাঁ-খাঁ দুপুর এখন মৌজের লটাবন। শবরীর কিছু ভালো লাগে না। সাদা কার্পাস ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খায়। কাল সারারাত একরকম জাগা। এখন ঘুম পাচ্ছে। বিরক্ত লাগছে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে শুয়ে থাকতে। দুপুর দেখতে ভালো লাগে না। দুপুরে তাত। শরীরের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এ আয়োজন যার জন্যে সে আজ শবরীর কথা ভুলে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ওঠে কাহ্নুপাদ। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যদিও ঐ গীতটা লেখার পর বেশ একটা বিশ্বাস হয়েছে নিজের ওপর। অন্তত একটা ভাল জিনিস দাঁড় করাতে পেরেছে। কিন্তু দ্বিধামুক্ত হতে পারে না। পণ্ডিতের দল বাঘের মতো বসে থাকে। সুযোগ পেলেই হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেবল। এমনিতেই ওরা কেউ ওর ওপর খুশি নয়। জোর করে অহরহ নিজের দাবি জানাতে হয়। কাহ্নুপাদের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে থাকে। শবরীর দিকে চাইবার ফুরসত নেই। শবরীর পায়ের আলতা, ঘরের আলপনা কোন কিছুই তেমন করে নজরে আসে না। মৌজ করা দুপুরটা আজ শীতল।

খেতে বসেও ঠিকমত খেতে পারে না কাহ্নুপাদ। যত্ন করে রাঁধা প্রিয় খাবারগুলো সব বিস্বাদ মনে হয়। বুকের ভেতর কি একটা আটকে আছে। ভয়, শঙ্কা ইত্যাদি নানা বোধ ওকে পিছু টেনে রাখে। মনে হয় ভীষণ একটা আগুনে পরীক্ষা ওর পায়ের কাছে। এদিকে থালার ওপর কানুর ভাতের নাড়াচাড়ায় শবরীর চোখ ফেটে

কান্না আসে। রাগও হয় নিজের উপর। যাকে সে ভেবেছিল শ্রেষ্ঠ উপচার কানু তাকে অবহেলা করে যাচ্ছে। ঝিম ধরা অনুভূতি ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলে, কিছুই খাচ্ছো না কেন তুমি?

ধুত, ভালো লাগছে না। আজ তুমি একটুও মনোযোগ দিয়ে রাঁধোনি। থালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে যায় কাহ্নুপাদ। হাঁড়িকুড়ি বাসনকোসনের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে শবরী। সারাদিন দু'জন দু'টো ভিন্ন জগতে কাটিয়ে এখন কি করে একে অপরের মনের কথা বুঝবে? কারো চিন্তার সঙ্গে কাজের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। দু'জনে নিজেদের মধ্যে কোনো সেতু তৈরি করেনি। ফলে দু'জনে দুই ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে অপরিচিত মানবমানবী হয়ে। কাহ্নুপাদ হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে শবরীকে দেখে অবাক।

ওকি তুমি অমন করে বসে আছো কেন? কি হয়েছে তোমার সই? শবরীর চোখে পানি টলমল করে। কাঁদছো?

বিস্মিত হয় কাহ্নুপাদ। সারাদিনের ঘটনা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কৈ না কিছুই তো হয়নি। কথাকাটাকাটি না, মনোমালিন্য ঝগড়াঝাঁটি না। তবুও কাঁদছে কেন শবরী? হঠাৎ মনে হয় সকাল থেকে শবরীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো না। ও একবারও ওর কথা ভাবে নি। ওকে বুঝবার চেষ্টা করেনি। হয় তো ওকে কেন্দ্র করে ভীষণ কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটাও পূরণ করেনি। সামান্যতম বিচ্ছিন্নতার সুযোগে জীবনযাপনের কত মূল্যবান মুহূর্ত ওলোট পালোট হয়ে যায়। সম্পর্কটাই এমন। অহরহ একে অপরকে বুঝতে হয়। এই মুহূর্তে কাহ্নুপাদ কবিতা লেখার মতো নিজেকে আবিষ্কার করে। এতদিন সম্পর্কের এদিকটাও কখনো ভেবে দেখিনি। আজ শবরীর চোখের জল নিমেষে ওর বয়স বাড়িয়ে দেয়। মনে হয় মাঝে মাঝে একে অপরের কাছ থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়াও একটা চমৎকার খেলা। একঘেয়েমীর সুতোটা গলায় ফাঁস হয় না। শবরীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাহ্নুপাদ। গালের ওপর গড়িয়ে পড়া পানির রেখা মুছিয়ে দেয়। শীতল ঠোঁটে চুমু খায়।

কি হয়েছে তোমার সই? আমার অপরাধ নিয়ো না।

আমার কিছু হয়নি।

এতটা বেলা পর্যন্ত তোমার থেকে অনেক দূরে ছিলাম সই। তাই এখন বুঝতে পারছি না কি দোষ করেছি?

বোঝার মতো মন নেই তোমার।

মন?

হো হো করে হাসে কাহ্নুপাদ।

মন নেই বলেই তো গীত রচনা করি। নইলে কি করতাম সই? ঠিকই বলেছো, মন নেই আমার।

কথাটা ভীষণভাবে আলোড়িত করে ওকে। মন না থাকাই ভালো। মন থাকার যন্ত্রণা অনেক। এ যে কি যন্ত্রণা তা কাউকে বোঝানো যায় না। যন্ত্রণার দায়ভার নিয়ে কাহ্নুপাদের রাতদিন হরিণ-পোড়া আগুন। শবরীর দিকে তাকায় ও। ওর সাদা মুখে জলের দাগ। খোঁপায় ময়ূর-পালক নেই। গলায় গুঞ্জার মালা নেই। হাতে কেয়ূর নেই। পায়ে মলও। নিরাভরণ শবরীর দিকে আজ ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায় কাহ্নুপাদ। সাদা মুখটা ঘিয়ের প্রদীপের

নিভু নিভু আলোর মতো উজ্জ্বল হচ্ছে। কাহ্নুপাদের বুক দুলে ওঠে। উৎসবের বিবর্ণ আলো যখন রহস্যময় হয়ে এক নিষিদ্ধ স্বর্গে হাতছানি দেয় ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে শবরীকে। শবরী এখন উৎসবের শেষ আলোর মতো লোভনীয়। বৈশাখী বাতাস চাঁচরবেড়ার গায়ে দুপ্‌দাপ আছড়ে পড়ে। একগুঁয়ে ষাঁড় যেন। রাখালের হাতছাড়া হয়ে গেছে। কারো কথা শুনতে চায় না। তখন কাহ্নুপাদের চোখের সামনে ঘরগেরস্থালির দুপুর তার চালচিত্র হারায়। বদলে যায় হাঁড়িকুড়ির ঘেরাটোপ। এই মুহূর্তে শবরী তাই কাহ্নুপাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা। চোখের জল মুছে যায়। সাদা ঠোঁট রক্তাভ। শবরীর বুকের ভেতর সুখের হরিণ কাঁপে।

আঁধার জোরালো হবার আগেই রাজসভা জমে ওঠে। ঝলমল করছে চারদিক। কাহ্নুপাদের বুক কাঁপে। বারবার কামিজের ভেতরে হাত রাখে। হ্যাঁ কাগজটা ঠিক আছে। হারায়নি। সারাদিন ঐ দশটা পংক্তির জন্যে জীবনযাপন ভুলতে বসেছিলো। এখন ঐ একখণ্ড কাগজই ওর মতো শত শত লোকের মানসম্মান, বেঁচে থাকা। কাহ্নুপাদ একপাশে চুপচাপ বসে থাকে। আস্তে আস্তে বুকটা বিশাল হতে থাকে। কিসের ভয়? কাকে ভয়? দেবল ভদ্র কেমন বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধমিত্র সিংহাসনে অটল, গম্ভীর। ওরা কেউ ওর আপনজন নয়। এই রাজসভায় কাহ্নুপাদ একা লড়াই করতে এসেছে। দাবি জানাতে এসেছে। পরক্ষণে রাজমহিষী এসে ঢোকেন। কি অপূর্ব। কাহ্নুপাদের চোখে পলক পড়ে না। রূপের ছটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে মণিমাণিক্যের চাকচিক্য। পরণে মেঘ-ডুম্বুর শাড়ি। দরবারের চেহারা বদলে যায়। সকলে উঠে রাণী চন্দ্রলেখাকে কুর্নিশ করে। চাপা-হাসি রাণীর ঠোঁটের কোণে। চন্দ্রলেখার জন্যে কোনো যুৎসই উপমা খুঁজে পায় না কাহ্নুপাদ। হঠাৎ করেই সব ভালোলাগা চুপসে যায়। উৎসবে শুধু প্রথম পর্বের জন্য চন্দ্রলেখা। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কোনো অধিকার নেই। যখন নর্তকীর নূপুরনিক্কণে চঞ্চল হয়ে উঠবে বুদ্ধমিত্রের সমগ্র শরীর, তখন চন্দ্রলেখার জন্যে দরবারের দরোজা বন্ধ। তার স্থান অন্দরমহলে। সে অবস্থা সবসময় প্রতিবাদহীন। চন্দ্রলেখা নিজেও তা জানেন। এবং জেনেও তা সহ্য করেন। এটাই আইন। কোনো কাগুজে আইন নয়। অলিখিত। উত্তরাধিকার সূত্রেই এ আইন এক রাজা থেকে আর এক রাজায় গিয়ে বর্তায়। সব রাজমহিষী অলংকারের মতো, এ শর্ত মাথায় নিয়ে অন্তঃপুরে ঢোকে। নির্বিবাদে তা চলে যায় পুত্রবধূর মাঝে। চন্দ্রলেখা মৃদু হাসছেন। দেবল ভদ্রের সঙ্গে দু'একটা কথা বলছেন। তাঁর মাথার ওপর দুলছে ময়ূর-পালকের ওপর হীরে মতির টুকরো বসানো কারুকার্যময় পাখা। কাহ্নুপাদের ইচ্ছে করে চন্দ্রলেখার বুকের ঢাকনা খুলে ভেতরটা দেখতে। নর্তকীর নুপূর-নক্কণ কোন অভিঘাতে সেখানে তরঙ্গ তোলে? এক মুহূর্তে শবরীকে না বুঝলে কেমন সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। অথচ এরা কেমন করে জীবন-যাপন একতারে বেঁধে রাখে? একটুও কি নড়ে না?

উৎসবের প্রথম অংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্যে। জমে উঠবে শাস্ত্রালোচনা। তত্ত্বকথা। স্বরচিত গীত। উৎসব শুরু হয়। কাহ্নুপাদ উৎসুক হয়ে শোনে। সংস্কৃত ভাষার প্রবল স্রোত বয়ে যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঠোঁটে ঠোঁটে। সেই রাশভারী শব্দগুলো যেন কাহ্নুপাদের ঘাড়ের ওপর প্রহরীর হাতের লাঠির প্রচণ্ড আঘাত। ঘাড় নাড়বার উপায় নেই। কান পেতে শুনতে হয়। রস উদ্ধার করার সামর্থ্য ওর নেই। আগ্রহও নেই বুঝবার। বরং বিজাতীয় ক্রোধ হয়। জীবনের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কাহ্নুপাদের অসহ্য। বিরক্ত লাগে ওর। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রাত যত বাড়ে পণ্ডিতরা তত মেতে ওঠে। প্রচণ্ড তর্ক শুরু হয়। কেউ কারো কথা শুনতে

রাজি নয়। চঞ্চল হয়ে ওঠে দেবল ভদ্র। স্বয়ং বুদ্ধমিত্রও। চন্দ্রলেখা চলে গেছে দরবার ছেড়ে। কাহ্নুপাদ বসে বসে হাই তোলে। বুদ্ধমিত্র দেবল ভদ্রকে কি যেন ইশারা করে উঠে চলে যায়। দেবল ভদ্রের মেজাজ অসহিষ্ণু হয়ে গেছে। উৎসবের পরবর্তী অংশের জন্যেই সে এখন উন্মুখ। রাগটা এসে পড়ে কাহ্নুপাদের ওপর। রুক্ষ মেজাজে খেঁকিয়ে উঠে, এত রাত পর্যন্ত বসে আছিস কেন?

গীত পড়বো।

গীত?

দেবল ভদ্রের চোখ কপালে ওঠে। ভীষণ বিস্ময়।

কার লেখা গীত?

আমার।

তোর? তুই কি গীত লিখিস? তুই সংস্কৃতের কি জানিস?

সংস্কৃত জানবো কেন? আমার ভাষায় লিখেছি।

কাহ্নুপাদ চওড়া বুক টান করে দাঁড়ায়। কালো মিশমিশে পাথুরে গড়নের শরীরটা দ্বিধাহীন এবং ঋজু।

ও ছুঁচোর কেত্তন?

দেবল ভদ্রের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

বেরো এখান থেকে। বেরো বলছি?

রাজা আমাকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন।

রাজা কে? এই দেবল ভদ্র সব। এখানে রাজার অনুমতিতেও কোনো কাজ হয় না। ভাগ। যতসব ছোটলোকের কারবার। লাই দিলে মাথায় ওঠে।

দেবল ভদ্র কাহ্নুপাদের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দ্বাররক্ষী দরজা বন্ধ করে। কাহ্নুপাদের মনে হয় আজ রাতের আঁধার ভীষণ গাঢ়। সামনে কিছুই দেখা যায় না। ও হতভম্বের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

চলে যেতে হবে এটাও যেন বুঝতে পারছে না। একটু পরে আবার দরজা খুলে যায়। পণ্ডিতরা একে একে বেরিয়ে আসছে। তখনো তারা ভীষণ উত্তেজিত। তর্কের শেষ নেই। চলতে চলতে কথা বলে। কাহ্নুপাদ একজন কবি। কেউই তাকে দেখতে পায় না। ও বোঝে উৎসবের প্রথম পর্ব শেষ। তখুনি তবলার বোলের সঙ্গে ঝংকৃত হয় নূপুর-ধ্বনি। নিভু-নিভু ঘিয়ের প্রদীপে আবার নতুন সলতে পড়েছে। আলো উজ্জ্বল হচ্ছে। এখন বুদ্ধমিত্র দরবারে আসবে। কাহ্নুপাদ ধীর পায়ে মণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কোথাও কোনো জ্বালা নেই। নিজেকে কেমন নির্ভর মনে হয়। আশ্চর্য! কেন যে এমন লাগছে। কাহ্নুপাদ বুকভরে খোলা মাঠের টাটকা বাতাস গ্রহণ করে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঘাটে আসে বারুয়া মাঝি নৌকার পাটাতনে চিৎপাত শুয়ে আছে। কাহ্নুপাদকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে কাছি খুলে দেয়। কাহ্নুপাদ সটান শুয়ে পড়ে। এতক্ষণে বুকটা কেমন ভার মনে হয়। কামিজের ভেতরে সারাদিনের পরিশ্রম। হাত দিতেই সমস্ত শরীর চন্‌চনিয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ জ্বালা ছনের শূলার মতো মুখ উঁচিয়ে থাকে।

নৌকা থেকে নামার সময় টের পায় বুনো রাগ ভেতরটা তাতিয়ে রেখেছে। সোজা রামক্রী আর দেবকীর দোকানের দিকে রওনা করে। কাহ্নুপাদ আবার শবরীর কথা ভুলে যায়। না, দোকান বন্ধ হয়নি। দরজার ওপর

সাংকেতিক চিহ্নটা এখনো টাঙানো রয়েছে। কাহ্নুপাদ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে। দেবকী ঘড়ার মধ্যে মদ ঢালছিলো। কাহ্নুপাদকে দেখে কাছে এসে দাঁড়ায়।

কি ব্যাপার? এমন হুড়মুড়িয়ে ঢুকছো যে? মনে হচ্ছে খাওয়ার আগেই বেহুঁশ হয়ে এসেছো?

কাহ্নুপাদ দেবকীর কাঁধে হাত রাখে। পাশের ঘরে রামক্রীর গলা শোনা যাচ্ছে। হয়তো ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। হয়তো ছুটকীর হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। ও দেবকীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায়।

বেহুঁশ না হয়ে কি উপায় আছে? তোমার মুখের দিকে চাইলেই নেশা অর্ধেক হয়। আর হাতের মাল যে খায়—

বোস, বোস। কেবল আদিখ্যেতা। অতো সয়না, বাপ্!

কাহ্নুপাদ হো হো করে হাসে।

সবই সয়। কেবল মুখে স্বীকার করতে চাও না। যাকগে। দেখো, ঘড়া আর নল দেবে। তোমার ঐ বেলের খোলে আজ আর চলবে না।

আচ্ছা গো আচ্ছা। বুঝতে পারছি গলা পর্যন্ত শুকনো করে এসেছো। কাহ্নুপাদ কথা না বলে মিটমিটিয়ে হাসে। দেবকীও হাসে। তারপর ঘরের কোণ থেকে নতুন ঘড়া আনে, নতুন নলও।

সব যে নতুন দেখছি?

তোমাকে কি পুরনো দেওয়া চলে। নাও গিলতে শুরু করো।

কাহ্নুপাদ ওর হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে।

বোসোনা একটু কাছে?

ধুত। তুমি একটা ইয়ে—

দেবকী ঝট্ করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। ওপাশের ঘর থেকে রামক্রী সাড়া দেয়।

কে এসেছে দেবী? কানুদার গলা যেন?

হ্যাঁ গো তাই। বেলের খোলে হচ্ছে না তার। ঘড়া নিয়ে বসেছে।

ও বাবা। তা দাও ভালো করে দাও। যেন আর উঠতে না পারে।

থাকার জায়গা দিলে উঠবোনা কিন্তু রামক্রী?

ওদিকে বৌদির কি হবে?

চুলোয় যাক।

বলতে পারলে।

দেবকী তর্জনী তুলে শাসন করে!

ও কিন্তু কানুদার মনের কথা নয় দেবী।

মনের কথা না হলেও বলতে পারবে না।

ঠিক আছে আর বলবো না।

কানুদাকে ভালো করে দিও দেবী। ওকে তো আর মাতাল করতে পারবে না তুমি।

হা হা করে হাসে কাহ্নুপাদ।

ঠিক বলেছো দাদা। গলা পর্যন্ত ভরলেও পা টলে না কিন্তু।

সে কি আর আমি জানি না। খাও খাও বেশি করে খাও।

কাহ্নুপাদ রামক্রীর সঙ্গে আর কোনো কথা বলে না। চোখের ইশারায় দেবকীকে ডাকে। দেবকী মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

এক জাতীয় গাছের সরু বাকল শুকিয়ে গুঁড়ো করে তা দিয়ে মদ চোলাই করে রামক্রী আর দেবকী। নারকেল, ভাত, তাল ও কাজঙ্গ গাঁজিয়েও মদ তৈরি করে এরা। এক একটার এক একরকম স্বাদ। এক একরকম দাম। খদ্দের পছন্দমতো মদ খায়। সারি সারি চৌষট্টি ঘড়া সাজিয়ে রাখে ওরা। বড় বড় ঘড়া। চৌষট্টির বেশিও রাখে না, কমও না। ওদের বিশ্বাস চৌষট্টির কম বেশি হলে ব্যবসা ভালো চলে না। মদ বিতরণের দু'টো পন্থা আছে ওদের। এক হলো ছোট ছোট ঘড়া আর নল। দুই সমান আকারের বেলের খোল। এর বাইরে অন্য কিছুতে ওরা খদ্দেরকে মদ দেয় না। প্রকাশ্যে মদ বিক্রি করে। এর বিরুদ্ধে দেশের কোনো আইন নেই। রাতের বেলা সব ঘড়াগুলো ভরে রাখে দেবকী। দিনের বেলা কোনো দিন একদম সময় পায় না। কোনোদিন আবার ফাঁকাই যায় দোকান। দোকানের পেছনে ওদের ঘর। সেখানে ছাঁকছুঁক রান্নার অবসরে খদ্দেরের পদশব্দের জন্যে উন্মুখ থাকে দেবকী। খদ্দের লক্ষ্মী। ফিরে গেলে অকল্যাণ হয়। ঘড়াগুলো আবার ভর্তি করে ঠিকঠাক মতো সাজিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কাহ্নুপাদের সামনে এসে দাঁড়ায় দেবকী।

কি গো আর পারবে?

পারবো তো অনেক কিছু। কিন্তু চাইলে তো দেবেনা তুমি।

হেঁয়ালী রাখো।

আর এক ঘড়া দাও।

কাহ্নুপাদের মাথায় দরবারের উৎসব শুরু হয়। অজস্র নূপুর-নিক্কণ শুনতে পাচ্ছে ও। প্রদীপের মৃদু আলোয় সারা ঘরে আলো-আঁধারী। দেবকীকে চন্দ্রলেখার মতো মনে হয়। ও যদি কাছে এসে দাঁড়াতো তবে হয়তো উত্তেজিত স্নায়ু একটু শান্ত হতো। মদ খেয়ে জ্বালা জুড়োয়নি। আরো বেড়েছে। যে পথে জ্বালা জুড়োবে তার জন্যে আরো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে ওর। এ জ্বালার দহন ভালো। তিলে তিলে কাহ্নুপাদকে লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দেবে। বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। কাহ্নুপাদের মনে হয় ঐ জ্বালাটাই ওর জীবনে শান্তির প্রলেপ। এর বাইরে আর কোথাও শীতল স্পর্শ নেই। আর এক ঘড়া মদ খেয়ে উঠে দাঁড়ায় ও। না, পা টলছে না। মাথায় একটা চাপ কেবল। ধুত নেশা হয় না কেন? জমজমাট নেশা। মদটা ওরা বোধহয় ঠিকমতো বানাতে পারেনি। তবু যাহোক রামক্রী আর দেবকী আছে বলেই রক্ষা। নইলে সব খরার মাঠঘাটের মতো বুক উদোম করে রাখতো। দেবকী নিজেই চিকন বাকলের চোলাই করে মদ। তৃষ্ণা যেন কণ্ঠে এসে আটকে থাকে।

ওকি! ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছো যে?

তোমার মদে নেশা হয় না কেন দেবকী?

সে শুধু তোমার হয় না। আর সবার হয়।

আমার জন্যে একটু আলাদা বানাও না? পারবে?

না বাপু ক্ষমা কর। আলাদা মদ আমি বানাতে জানি না।

জানো কেবল ইয়ে—

কাহ্নুপাদ মুখ খিস্তি করে। তারপর পকেট হাতড়ে কড়ি খোঁজে।

না একটাও কড়ি নেই। তারপর ঈষৎ হেসে বলে, বাকির খাতায় লিখে রাখো। সুদে আসলে একসঙ্গে দেবো।

তোমার বেলায় সব সই।

তাই নাকি?

কাহ্নুপাদের চোখের পাতা নেচে ওঠে। দেবকী অকারণে খিলখিলিয়ে হাসে। সে হাসিতে মোহিনী শরীর নর্তকী হয়। পাশের ঘর থেকে রামক্রী আসে।

কি হলো কানুদা?

তোমার কানুদাকে বাকির খাতায় রাখছি।

ভয় নেই তোমার, সব আমি একসঙ্গে শোধ দেবো রামক্রী।

ভুলো না আবার।

ভুলতে চাইলে কি তোমরা ভুলতে দেবে।

কাহ্নুপাদ দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায়। সেদিকে একটুক্ষণ চেয়ে দরজার ওপর থেকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সরিয়ে নেয় দেবকী। কাহ্নুপাদ শেষ খদ্দের। আর কেউ আসবে না। কাহ্নুপাদ ঘাড় ফেরাতেই দেবকী দরজা বন্ধ করে দেয়।

ফুরফুরে বাতাস গায়ে এসে গড়াগড়ি খায়। যেন এতক্ষণ কাহ্নুপাদের অপেক্ষায় ছিল, দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসেছে। এ আরামটুকু উপভোগ করে হাঁটতে মন্দ লাগে না ওর। রাত কত হবে কে জানে? শবরী কি করছে কে জানে? অপেক্ষায় অপেক্ষায় এতক্ষণে হয়তো অভিমানী হয়েছে। হোক। কিছুই ভালো লাগে না ওর। দেশাখের বাড়ির পেছনের ছোট টিলাটার বাঁক ঘুরতেই চাপা হাসি কানে আসে কাহ্নুপাদের। ও কান খাড়া করে। মাথার ভার কমেছে। এদিকে কোনো বাড়ি নেই। চলার গতি আপনা থেকেই থেমে আসে। কে হতে পারে ওখানে? কাহ্নুপাদ দু'পায় এগোয়। গাছগাছালীর ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোর একটুখানি অংশ পড়ছে ওদের ওপর। ঘাসের ওপর কাত হয়ে শুয়ে কথা বলছে। চিনতে পারে কাহ্নুপাদ। এত বড় ঘন কালো চুল এ তল্লাটে আর কারো নেই। সুলেখা আর সুদাম। ও পিছিয়ে আসে। মনে পড়ে অনেকদিন আগে ভুসুকু বাণিজ্যে গিয়ে আর ফেরেনি। কোনো খোঁজও নেই। কেউ জানে না বেঁচে আছে কিনা। কোনোদিন ফিরবে কিনা। সুলেখা তাই জুড়ি বেছে নিয়েছে। সুদাম বড় নিরীহ লোক। চমৎকার ধান রোপণ করতে পারে। মৌসুমে ওর কদর বেড়ে যায়। কাহ্নুপাদ আবার হাঁটতে থাকে। কখনো গুনগুনিয়ে গান গায়। কখনো শিস বাজায়। চারদিকে নীরব নিঝুম। নদীর দিক থেকে একটা শব্দ আসছে। চাঁচরবেড়ার বাড়িগুলোতে আলো নেই। ভুতুড়ে অন্ধকারে ওরা বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো। অথচ সবটা মিলিয়ে একটা চমৎকার ধারাবাহিকতা আছে। ঐ ধারাবাহিকতাই জীবনে উত্থান পতন, চলাচল, বয়ে যাওয়া। আজ কিছুতেই নিজের বাড়ির পথ চিনতে পারেনা কাহ্নুপাদ। বেমালুম ভুলে যায়।

আপন মনে চলতে চলতে একসময় চমক ভাঙে ওর। মল্লারীর বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। আর তিনটে বাড়ি পেরোলেই হলো। এরপর আর কোনো বাড়ি নেই। পিপুল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় ও। নিজেকে প্রশ্ন করে, আজ আমি ঘরে ফিরছিনা কেন? উত্তর আসে, সব সময় ঘর ভালো লাগে না। তাহলে কি করবে? রাজসভা থেকে ফিরে যে জ্বালাটার লক্ষ্যে প্রতীক্ষা করেছি তার জন্যে ঘর নয়। সে সূচীমুখ জ্বালার দায়ভার এই লোকালয়েরও। আজ আমার উচিত সবাইকে ডেকে ডেকে এ কথা বলা। এই পিপুল গাছ তুই সাক্ষী। বল তুই আমার পক্ষে? মল্লারী তুই সাক্ষী। এ নদীটাও। ধনাদার গরুটাও। দেশাখ তোর তীরধনুকও। কাহ্নুপাদ শব্দ করে হাসে। যেন শবরী বলছে, খুব হয়েছে কানু, এবার থামো। আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। পিপুল গাছের ওপর একটা শামকুক্‌ড়া ডাকে।

কাহ্নুপাদ জানে মল্লারী একলা থাকে। রামলালের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বছর দুই আগে। রামলাল দক্ষিণপাড়ায় ঘর বেঁধেছে নতুন করে। মল্লারী বাঁধেনি। একা একাতেই নাকি সুখ। সারাক্ষণ ভালোবাসাবিহীন পুরুষ মানুষের মন জোগানো ওর ধাতে সয়না। নৌকা বেয়ে রোজগার করে। নাচে, গান গায়। রাতের অন্ধকারে লোক আসে ওর ঘরে। কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে যায় এক রাত্তির সুখ। গোটা পল্লীতে ওর মতো প্রাণবন্ত মেয়ে আর একটিও নেই। উপরন্তু মল্লারী সুন্দর। সুগঠিত। এমন চমৎকার দেহের বাঁধুনি আর কারো দেখা যায় না। ও কারো পরোয়া করে না। কাউকে ভয় পায় না। একটা নিষেধ-ভাঙা সাহস আছে ওর মধ্যে। অথচ যখন ভালোবাসে, প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালোবাসে। বেঁচে থাকার জন্যে নিজেই মনের মধ্যে সাহস জমিয়ে রেখেছে। চাঁচরবেড়ার বাড়ি তুলেছে। কার্পাস লাগিয়েছে। ময়ূর পোষে। হরিণের মাংস খায়। রামলাল ওকে আঘাত দিয়েছে। অপমানও করেছে। কিন্তু সেটাকেই জীবনের শেষ বলে মেনে নেয়নি ও। রামলালকে ছাড়াও জীবনকে ভাবতে পারে কাহ্নুপাদের সঙ্গ মাঝে মাঝে কথা হয় রামলাল প্রসঙ্গে। কাহ্নুপাদ যখন বলে, রামলাল তোমার সব কেড়েকুড়ে নিয়ে গেছে। তখন ও প্রবল প্রতিবাদে মাথা ঝাঁকায়।

মিথ্যে কথা। চোরে আর কতটুকু নিতে পারে বলো, যদি আমি নিজ থেকে সব দান না করি।

কাহ্নুপাদ অবাক হয়ে তাকায়। ভারি শক্ত মেয়ে। পরাজয়কে কখনো স্বীকার করবে না। কাহ্নুপাদ হেসে বলেছিলো, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

মোটেই তা নয়। আমি মচকাইওনা। যে মনটা তুমি দেখতে পাও না সেটা যে কিসের আমিও জানিনা। কোনো কিছুতেই গলেনা। আগুনেও না।

বড় সাহসের কথা।

মল্লারী তরঙ্গ তুলে হেসেছিলো।

ওর আত্মবিশ্বাস কাহ্নুপাদকে অভিভূত করেছিলো। আর ওর এসব গুণাগুণের জন্যেই ও আকৃষ্ট হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো এ প্রাণশক্তির অপচয় হতে দেয়া যায় না।

মল্লারীর কথা যখন ভাবে তখন তার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায় কাহ্নুপাদ। দেবকীর মদ যে নেশা জমাতে পারে না, মল্লারীর চিন্তা তা পারে। একদম অন্য ভুবনে নিয়ে যায়। পিপুল গাছের ডালে বাতাসের শরশর। আর দু'টো ঘর পেরুবে কিনা তা ভাবতে থাকে কাহ্নুপাদ। আর তখনই নিঃশব্দে এগিয়ে আসে ও। শব্দ করে হাসে।

এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো যে?

মল্লারী?

না, অন্ধকারের পেতনী নই। মল্লারীই। ঘরের বাইরে বসেছিলাম। দেখলাম গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছো। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য কেউ। কিন্তু খুব ঠাহর করে দেখার পর বুঝলাম তুমিই।

ঘরের বাইরে বসে রয়েছো কেন? ভয় নাই?

আবার খিলখিল হাসি উঠে দিগ্‌বিদিগ্‌ ছুটে যায়। চাঁচরবেড়ার বাড়ি তা আটকাতে পারে না।

আমার কি আছে যে ভয় পাবো?

অন্ধকারে তো সবাই ভূতের ভয় পায়।

উত্তরের বদলে হাসি। হাসি আর থামতে চায় না।

তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না ঘরে যাবে?

এই বেশ। কার্পাস গাছগুলো হাওয়ায় কেমন দুলছে দেখো।

ও তুমি দেখো। আমি কি গীত লিখি?

মল্লারী?

কাহ্নুপাদের কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ।

কি হয়েছে কানু?

মল্লারী দেবল ভদ্র আজ আমাকে ভীষণ অপমান করেছে।

কেন? গীত পড়োনি?

মল্লারীর দু'চোখের পাতায় ঝিলিক।

আমি ছোটলোক। মুখের ভাষায় গীত লিখি। সব ছুঁচোর কেত্তন। দেবল ভদ্র আমাকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছে?

তুমি কি করলে?

কিছু করিনি।

কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না?

তাহলে কি আমাকে আস্ত রাখতো?

না রাখলে মরতে। আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্যে মরেছো। কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে?

মল্লারী?

পারো কেবল অবাক হতে। আমি যা বলি মনের কথা বলি। একটুও ফাঁকি নেই। মরলে কি হয় কানু? যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাস তার জন্যে মরতে পারো না?

কাহ্নুপাদের বুকের গভীর থেকে শব্দটা উঠে আসে প্রতিজ্ঞার মতো, পারি। আমি পারি মল্লারী।

জানি তুমি পারো। তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমাকে পারতে হবে।

এই তোমার মাথা ছুঁয়ে শক্তি নিলাম।

তোমাকে যে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ আমি নেবো।

মল্লারী অন্ধকারে কাহ্নুপাদের পায়ে হাত রাখে। পিপুল কাছের হাজার পাতা নড়ে ওঠে। বাতাস মল্লারীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যায়। মল্লারীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় কাহ্নুপাদ।

মাঝে মাঝে তোমাকে আমার ভয় লাগে মল্লারী।

কেন?

তোমার শক্তি আছে। সাহস আছে। ভয় নেই। তাই মনে হয় কখনো তুমি বুঝি ভীষণ—

বলোনা? থামলে কেন?

না থাক।

খিলখিল করে হেসে ওঠে ও।

অর্ধেক কথা পেটে, অর্ধেক কথা মুখে। এ না হলে কি কেউ আর গীত লিখতে পারে?

বেশ বলেছো।

দু'জনেই হাসে। কার্পাস ফুলগুলো মুখ উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে দূরের বন থেকে বাঘের গর্জন ভেসে আসে। দু'জনের সঘন নিশ্বাসের মতো মহুয়ার গন্ধ তীব্র হয়ে ওঠে।

মল্লারী।

কি?

ঘুমুবে না?

তুমি না এলে ঘুমোতাম। এখন ঘুমোবোনা।

চলো তাহলে নৌকা করে নদীতে বেড়াই গিয়ে।

এখন?

রাত আর বেশি নেই। সময়টা ভালো। এই সময়টা আমার খুব প্রিয়।

কাহ্নুপাদ মল্লারীর হাত নিজের মুঠিতে নেয়। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঘাটে আসে। নদীর বুকে ঝিরঝিরি বাতাস। লাফিয়ে নৌকায় ওঠে ওরা। কাছি খুলে দেয় মল্লারী। বিশাল নদীটা হালকা অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আজ নৌকা বাইতে একদম নতুন লাগে ওর। প্রথম দিনের বৈঠা হাতে নেওয়ার মতো নিষিদ্ধ আনন্দ। আজ শুধু বেড়ানো। পারাপার করা নয়। কড়ি চাওয়া নয়। পাটাতনে চিৎপাত শুয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। মল্লারীর সুডৌল হাতের সঙ্গে কথা বলে বৈঠা। সে উচ্ছ্বাস—নদীর জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ। দু'পাশের নদীর তীর, আবাদ জমি, বনবনানী সবকিছুর মধ্যে কাহ্নুপাদ নতুন আলোকপাত করে। পৃথিবীটা যেন একটা নদী। নদীর ঢেউয়ের মতো দিনরাত এখানে সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, জীবন মৃত্যু উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। তাই পৃথিবীরূপী এই নদী

গহন, গম্ভীর এবং ভয়ঙ্কর। নিজেই ঠাঁই টিকিয়ে রাখার জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। এই নদী পার হওয়া কঠিন। একটা কবিতার পংক্তি কাহ্নুপাদের মগজে আসি আসি করেও আসে না। বারবার ছুটে যায়। তখন ও মল্লারীকে দেখে। মনে হয় নদীর মেয়ে মল্লারী। নদীতে ওর জন্ম। ওর মা নৌকা করে বাপের বাড়ি যাবার সময় মাঝ নদীর বুকে ও হয়ে যায়। কে জানে মরণও হয়তো এখানে আছে। মল্লারী তাই চায়ও। অনেকদিন বলেছে, আমি মরলে দেহটা নদীর বুকে ভাসিয়ে দিও। বর্তমানে নদীর মতো জীবন ওর। তবে সে নদীতে চড়া পড়েনি। সুখ দুঃখের স্রোতের প্রবাহে মল্লারী সে নদীকে উত্তালমুখর করে রেখেছে। গভীর খাদে বয় তার জীবনের প্রবল স্রোত। চড়া পড়ার সম্ভাবনা কম। নিজেকে জিইয়ে রাখার শক্তিও ওর আছে।

কাহ্নুপাদ মল্লারীর কাছে গিয়ে বসে। মল্লারী হাসে।

নৌকা ডুবে গেলে আমার দোষ নেই?

যাক ডুবে। বেশ হয়। দু'জনে একদম—

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মল্লারী। মাঝে মাঝে ওর এই হাসিটা কেমন তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। অন্ধকার নদীর গম্ভীর রূপটা ঐ হাসির সঙ্গে বড্ড বেমানান। নৌকা অনেক দূরে এসে গেছে। প্রতিদিনের পরিচিত লোকালয় এখন পেছনে। কাহ্নুপাদ আরামে চোখ বোঁজে।

একটা গান গাও মল্লারী।

গান? কোনটা?

যে গানটা প্রথম শিখেছিলে?

মল্লারী সঙ্গে সঙ্গে গায় ঃ

এবং কার দিঢ় বাখোড় মোড়িঅ। বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িঅ।।

কাহ্নু বিলসই আসব মাতা। সহজ নলিনীবন পইসি-নিবিতা।।

কাহ্নুপাদ একমনে গান শোনে। নিজের লেখা পংক্তিগুলো মল্লারীর কণ্ঠে আশ্চর্য বদলে যায়। এ যেন আর এক স্রষ্টা। নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কয়েকটা পংক্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গায় ও। যেন ছাড়তে ইচ্ছে করে না। যেভাবে হোক প্রাণের কাছে কেবল ধরে রাখা। কাহ্নুপাদের মনে হয় মাত্র কয়েকটা পংক্তি, অথচ কি তার ক্ষমতা। সমস্ত পরিবেশ বদলে দিয়েছে। দু'কুলের আছড়ে পড়া নদীর জল সে সবের রেশে যেন মাথা কুটে মরছে। বড় একটা মাছ নৌকার কাছাকাছি ঘাই মেরে গেলো। অনেকদূরে কালো পিঠ উঁচিয়ে ভাসছে শুশুক। মল্লারী গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে গেছে। চোখে জল। কাহ্নুপাদের মনটা উদাস হয়ে যায়। বুক হা হা করে। চারিদিকে সবাই আছে অথচ কেউ নেই। সঙ্গীর অভাব ওকে এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় বন্দী করে রাখে। কাহ্নুপাদ নিজের হাতে তৈরী বেড়িতে আটকা পড়েছে। পালিয়ে আসার জন্যে ছটফট করে। হঠাৎ করে ওর মনে হয় এখানে আর ভালো লাগছে না। অন্য কোথাও যাবার বাধা এখন। এই নদী ওকে আর সঙ্গ দিতে পারে না। এই নৌকা, দাঁড়, এর চালক কেউ আর ওর জন্য যথেষ্ট নয়। কাহ্নুপাদের মন অন্য কিছু পাওয়ার জন্যে খাঁ খাঁ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নৌকা কেমন দুলে ওঠে। গান থেমে যায় মল্লারীর। নিজেকে সামলে নেয়। চোখের জল মোছে।

এজন্যে আমি নৌকায় গাইতে চাইনা।

কাহ্নুপাদ কথা বলেনা। দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও জানে দূরটাই ওর কাছে আপন। যত কাছে যাব ততই সে জায়গা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।

অনেক দূরে এসে পড়েছি কানু?

চলো ফিরে যাই।

ফিরতে আমার মন চায়না।

এখন আমার অন্য কিছু ভালো লাগছে না মল্লারী।

কেন।

জানিনা। আমার মাঝে মাঝে এমন হয়।

ও।

মল্লারী নৌকা ঘোরায়। এতক্ষণে সমস্ত আনন্দ কর্পূরের মতো উবে যায়। দলছুট কচুরীপানা এখানে ওখানে ভাসছে। কাহ্নুপাদ মল্লারীর হাত ধরে।

বৈঠা আমাকে দাও আমি বাইবো।

তাহলেই হয়েছে। ঘরে আর ফিরতে হবে না।

দিয়েই দেখো না।

না থাক তুমি বোসো। বাইতে আমার কষ্ট নেই।

ঐ দেখো জোয়ার এসেছে। এখনতো আর তেমন বাইতে হবে না। শুধু বৈঠা নিয়ে বসে থাকা!

এত সহজে সব কিছু হলে তো সবাই সব কাজ পারতো। তাহলে এক একজনে এক একটা করে কেন?

বড় শক্ত কথা। ঠিক আছে হার মানলাম।

মল্লারীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাহ্নুপাদ আর বেশি কথা বলতে সাহস পায় না। আসলে সুরটা ও নিজেই কেটে দিয়েছে। সেটাকে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না। যতক্ষণ না যন্ত্রণা আপনা আপনি বাজে। তবে ভরসা এই যে, মল্লারী বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকে না। অল্প সময়ে আবার নিজের মধ্যে টুং করে ঘা দেয়। তারপর আবার চমৎকার বেড়ে ওঠে। কাহ্নুপাদ নৌকার অপরদিকে গিয়ে বসে। আঁধার ছুটে যাচ্ছে। যেন নদীতে নাইতে এসেছিলো। বড্ড দেরি করে ফেলেছে। তাই এখন দ্রুত ছুটছে। বনমোরগের ডাক ভেসে আসছে। দূরের টিলা পুরো দেখা যায় না। পাতলা ফিনফিনে আঁধারে গা ঢেকে শুয়ে আছে। কর্দমাক্ত দু'তীরে ছলাৎ ছলাৎ করে পানি আছড়ে পড়ছে। কাঁপিয়ে যাচ্ছে তীরভূমি। কাহ্নুপাদ হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। কখনো মল্লারীর দিকে চায়। চোখাচোখি হয়। আবার দৃষ্টি ঘুরে যায়। যেন অনেক আগে দু'জনের গভীর জানাশোনা ছিলো। এখন কেটে আর কাউকে চিনতে পারছে না। প্রাণপণে চেনার চেষ্টা করছে। চিনতে গিয়ে বুকের বোঁটা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে টুপটাপ।

৬

খেয়াঘাট, অরণ্য, হাট প্রভৃতি স্থান থেকে কর আদায় করে রাজার লোকেরা। এ সবকিছুর ওপর রাজার একচেটিয়া অধিকার এবং এটা রাজকোষের একটা নিয়মিত আয়ের উৎস। প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানের কর বাবদ একটা মোটা অংশ রাজকোষে জমা হয়। সুতরাং যে করেই হোক কর আদায় করতেই হয়। মাঝে মাঝে রাজার লোকেরা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বড় নির্মম আচরণ করে। দুই তিন বছর কর বাকি ফেললে অথবা অন্য কোনো সামান্য অপরাধেও দশ রকমের শাস্তির একটি ভোগ করতে হয়। আর এই দশ রকমের শাস্তি আইন করে শুধুমাত্র ওদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। কখন যে কার ভাগ্যে পড়বে কেউ তা জানে না। অনেক সময় বুঝতেও পারে না কি অপরাধে কি শাস্তি হলো। দেখা গেলো একদিন রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে গেলো। প্রাপ্য হয়েছে নয় নম্বর শাস্তি। অর্থাৎ তিনদিন উপোস দিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হলো। কারণ জানার উপায় নেই। অনেকদিন পরে হয়তো কোনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলে বললো, কিরে কেমন ঠুকে দিয়েছিলাম সেবার। বেটা আমার পাশ দিয়ে দিয়ে হাঁটিস? তোর ছায়া আমার গায়ে পড়লে পাপ হয় না? তখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করণীয় তাকে না। মনে মনে আশ্বস্ত হয়। তবু নয় নম্বর শাস্তি; এক, দুই, তিন হলে রক্ষা ছিল না। একবার উৎপন্ন ধানের ষষ্ঠ ভাগ রাজার গোলায় দিতে চায়নি বলে সুদামকে দু'নম্বর শাস্তি অর্থাৎ চর্ম-পাদুকার প্রহার করা হয়েছিলো। তিন দিন কোনো হুঁশ ছিলো না ওর। গাছ-গাছড়ার ওষুধে দীর্ঘকাল পর সুস্থ হয়েছিলো সুদাম। সেই থেকে বেচারার স্বাস্থ্য যে ভেঙে গেলো আর ঠিক হলো না। গাঁয়ের লোককে প্রায়ই আশঙ্কায় থাকতে হয়। কোন অপরাধে কখন শাস্তি হবে কেউ টের করতে পারবে না।

যারা সারাক্ষণ বিভিন্ন কর আদায়ের জন্যে আনাগোনা করে দেশাখ বেশ রসিয়ে এক একজনের এক একটা নামকরণ করেছে। খেয়াঘাটের কর যে আদায় করে তাকে ডাকে তারক। হাট-বাজারের রাজকর্মচারীর নাম হট্টপতি। অরণ্যের কর যে আদায় করে তাকে বলে অরণী। আস্তে আস্তে গাঁয়ের লোক তাদের আসল নাম ভুলে যায়। দেশাখের দেওয়া নামগুলো চালু হয়ে গেছে। লোক মুখে তার বাধাহীন প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। যাদের ওপর এ সকল নাম আরোপিত হয়েছে তারাও প্রথমদিকে রাগারাগি করলেও এখন সে নাম মেনে নিয়েছে। শুধু মেনে নেওয়া নয়, এ নামে অভ্যস্তও হয়ে গেছে।

খেয়াঘাটের কর আদায়কারী বলাই শর্মাকে ডোম্বি ডাকে তরপতি। ক'দিন থেকে তরপতি ওর পিছে লেগেছে করের জন্যে। ডোম্বি জানে ওর চটুল হাসির মোহিনী ভঙ্গির জন্যে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে বলাই শর্মার এ সুযোগটা নিতে ছাড়েনা ও। আজ নয়, কাল, কাল নয় পরশু এমনি করে ঘোরাতে আমোদ লাগে। ডোম্বির চোখের নাচুনীতে বিগলিত গদগদ বলাই শর্মাকে কেমন নির্বোধ মনে হয় ডোম্বির। রাজার লোক বলে কিছুটা গর্ববোধ আছে। দাপটও দেখায় যত্রতত্র। দাবা খেলতে ভালোবাসে। রাস্তার ধারে ডোম্বির নাচ দেখতে পেলে উৎফুল্ল হয়। দিনের বেলা লোকজনের সামনে দশহাত দূরে দাঁড়িয়েই দেখে। রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি ওর দরজায় দাঁড়িয়ে টুকটুক শব্দ করে। কেননা দেবল ভদ্র ব্রাহ্মণদের জন্যে দুটো আইন তৈরি করেছে। এক, ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে কোনো ধরনের মেলামেশা করতে পারবে। সে যদি তার বিবাহিত স্ত্রী নাও হয় তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এমন কি তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গ দোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হবে না। দুই, অন্যের বিবাহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করা কম দোষের হবে। তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।

এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলো পণ্ডিত সুধাকর। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। তার আপত্তি ছিলো এ জন্যে যে এভাবে ব্যভিচারকে আইনের আশ্রয়ে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। ব্যভিচারকে নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এতে লোকজন উচ্ছৃঙ্খল হবে। এর দ্বারা সমাজের কোনো মঙ্গল নেই। বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলো দেবল ভদ্র।

সমাজ? সমাজ তো আমরাই। যাদের হাতে আইন তৈরি করবার ক্ষমতা আছে তারাই তো সমাজ। আমরা ভোগ করবো, ওড়াবো, তছনছ করবো। যা খুশি তা করবো। আর সব কীটানুকীট।

সমর্থন জুগিয়েছিলো সাঙ্গপাঙ্গরা :

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মন্ত্রী। আমাদের যাতে মঙ্গল হয় সে কাজই উনি করেছেন। আমাদের কল্যাণ দেখা তাঁর কর্তব্য।

রেগে গিয়েছিলো সুধাকর। টকটকে গৌরবর্ণের চেহারায় ভাটার মতো দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিলো। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সকলেই সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু দেবল ভদ্রের বুকের পাটা অন্য ধাতুতে তৈরি। কোনো কিছু তাকে বড় একটা স্পর্শ করে না।

তুমি ঐ অগণিত লোককে মানুষ বলে মনে করো না মন্ত্রী দেবল ভদ্র? দেবল ভদ্র কণ্ঠস্বর চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলো, করি। নিশ্চয়ই করি। তবে ব্যবহার্য দ্রব্যের মতো। যখন ব্যবহারে লাগবে কাছে রাখবো। যখন লাগবে না দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

বাঁকা হাসিতে চকমকিয়ে উঠেছিলো দেবল ভদ্রের ধূর্ত চেহারা। স্বভাবে তিনি ইন্দ্রিয়শাসিত। এর বাইরে শুকনো হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। অকারণ বিনয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাসে মদত জুগিয়েছিলো পারিষদদল। দেবল ভদ্রের প্রতিটি শব্দে তারা মাথা নাড়ার জন্যেই আছে। আর কোনো কাজ নেই।

রাজা বুদ্ধমিত্রের কাছে আবেদন করেছিলো পণ্ডিত সুধাকর। অশীতিপর বৃদ্ধের দৃপ্ত চেহারা তাকে অভিভূত করেছিলো ঠিকই, কিন্তু বুকে তেমন জোর ছিলো না। কপালে চিন্তার ছায়া ফুটে উঠেছিলো কিন্তু প্রতিবাদ করেনি দেবল ভদ্রের তৈরি আইনের বিরুদ্ধে। সুধাকর জানে আপত্তি করার মতো সাহস বুদ্ধমিত্রর নেই। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্রকে পরিচালিত করে। রাজকাজের সব ব্যাপারে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। এককথায় সমুদয় শাসনযন্ত্র দেবল ভদ্রের হাতের মুঠোয়। কারো কোনো কথা সেখানে চলে না। বুদ্ধমিত্র মাথা হেলিয়ে বলেছিলো, আইন তৈরির সব ক্ষমতা দেবল ভদ্রের আপনি তো জানেন পণ্ডিত সুধাকর।

তাতো জানি। তবু ভেবেছিলাম আপনারও কিছু করার ক্ষমতা আছে। আপনি দেশের রাজা।

রাজা শব্দটা ভীষণ বিদ্রূপ বুদ্ধমিত্রের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলো পণ্ডিত সুধাকর। সঙ্গে সঙ্গে অপায়হীন একটি অক্ষম লোকের সামনে থেকে রাগে গরগরিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো। কিন্তু করতে না পারার গ্লানি তাকে মরমে মারছিলো। মনে হয়েছিলো এক অদ্ভুত একতরফা আইন তৈরির সব লজ্জা ও অপমান তার একার। কিন্তু কিছু করতে পারলো না। অন্তত রদ করতে পারলে কিছুটা সান্ত্বনা পেতো। তবু একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। নিজের বিবেককে প্রতারিত করেনি।

সুধাকরের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হলো অনেকের ক্ষেত্রেই। যাদের এতদিন ইচ্ছে ছিলো কিন্তু সাহস ছিলো না। তারা সুযোগের সদ্ব্যবহারে তৎপর হলো। বলাই শর্মা তেমন একজন। একদিন রাতের অন্ধকারে ডোম্বির ঘরে এসে ঢুকলো। ও অবাক হয়নি। আকারে ইঙ্গিতে বলাই শর্মা ক'দিন ধরে এই ইচ্ছেই প্রকাশ করেছিলো। ডোম্বি তেমন আমল দেয়নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। আজকে বলাই শর্মাকে দেখে চটুল হাসিতে আমন্ত্রণ জানায়।

বাবা কি ভাগ্য আমার তরপতি আজ আমার ঘরে। আজকাল কি রাতের বেলায়ও কর আদায় শুরু করলে?

অপ্রতিভের হাসি হাসে বলাই শর্মা। তির্যক্‌ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ডোম্বির দিকে তাকালে ছল্‌কে-ওঠা রক্ত হিম হয়ে যায়। টেনে টেনে বলে, তোমার কাছে আবার কর কি? এই এলাম বেড়াতে বেড়াতে। ভাবলাম দেখি তুমি কি করছো? তাছাড়া আমাদের সবার উচিতও সবার খোঁজখবর করা।

বলাই শর্মার নির্বোধ হাসিতে ডোম্বির রাগ হয়।

তাই নাকি? দিনের বেলাতো আমাদের ছায়া মাড়াতে ভয় পাও। তা তরপতি রাতারাতি আমাদের ছায়াগুলো এমন পবিত্র হয়ে গেলো কি করে?

জানোনা মন্ত্রী আইন করে দিয়েছে যে তোমাদের সংসর্গ এখন আর দোষের না।

বলাই শর্মার কণ্ঠে ভীষণ উৎসাহ।

ও মা কি বলো। কৈ শুনিনি তো? তা আইন করে সব বেশ শুদ্ধ করে নিচ্ছো তোমরা। তোমরা ভালোই আছো। যা খুশি করার জন্যে তোমাদের হাতে আইন তৈরির ক্ষমতা আছে।

আহা তুমি চটছো কেন? এতে তো তোমাদেরও পুণ্যি হচ্ছে। তোমরা বামুনের ছোঁয়া পাচ্ছো। তোমাদের খুশি হওয়া উচিত।

ঠিকই বলেছো।

ডোম্বি বিদ্রূপের হাসিতে ছল্‌কে ওঠে। বলাই শর্মার বুকটা আচমকা কেঁপে যায়। ডোম্বির হাসি যেন থামতে চায় না।

এত পুণ্যি রাখবো কোথায় বলো তো তরপতি?

বলাই শর্মা কথা বলতে পারে না। অকস্মাৎ থেমে-যাওয়া ডোম্বির হাসির সঙ্গে সঙ্গে বলাই শর্মা ভয় পেয়ে যায়। কি বলবে বুঝতে পারে না। বেশি কথা বললে আজকের রাতটা মাটি হয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় চুপ করে থাকে। ডোম্বির ঘরে মেটে প্রদীপ জ্বলে। রান্না শেষ হয়েছে। চুলোয় কয়লার আগুন। সে গন্‌গনে আগুনে গভীর অন্ধকারের কালো শরীর গোলাপী।

ডোম্বির দীর্ঘল দেহের মোহন ভঙ্গি বলাই শর্মার চোখের তারায় আটকে থাকে। দৃষ্টি ফেরানো কঠিন। বলাই শর্মা কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বলে, এবার তোমার সব কর মাফ করে দেবো ডোম্বি।

তাতো দেবেই। বিনে কড়িতে তো আর রাতের শয্যা বানাইনি। ডোম্বির সুরেলা কণ্ঠ রুক্ষ ও কর্কশ।

ঠোঁটের যা ধার তোমার, তাতে বলাই শর্মা কেন দেবল ভদ্রও খুন হয়ে যাবে।

আবার সেই আচমকা হাসি। শানানো ছুরির মতো ঝিলিক দেয় : যা করি বাপু সোজাসুজি। বাঁকা পথের কাজ কারবার আমার কাছে নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল।

একসময় চুলোর গন্‌গনে কয়লা একদম ছাই হয়ে যায়। এলোপাথাড়ি বাতাসে মাথায় মাথায় শন্‌ শন্‌ শব্দ। বলাই শর্মা বিদায় নেয়। নদীর কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে ডোম্বির। নদী যেমন জন্মের পর বুকে নিয়েছে,

যেমন লালন করেছে, তেমন আবার পরিশুদ্ধও করে। একটা ডুব দিয়ে উঠলে মনে হয় কোথাও কোনো গ্লানি নেই, ময়লা নেই, কাদামাটি নেই, দারুণ ঝরঝরে আর পবিত্র লাগছে। একা বিছানায় শুয়ে ডোম্বি বিড়বিড় করে, নদী তুই আমার সব, আমার মা, আমার বাবা, আমার বন্ধু; কেবল তুই আমার কানু হাতে পারলি না নদী! এক মুহূর্তে ও তখন ডোম্বি থেকে মল্লারী হয়ে যায়। কানুর লেখা গান ওর কণ্ঠে উঠে আসে। আর ও প্রেমিকা হয়ে জাপটে ধরে। গুণগুণ করে। ভাবে, এখন যদি কানু আসতো তবে বেশ হতো। এই একটা লোক ওকে পাগলের মতো টানে। পেছনের সমস্ত নাড়ির বাঁধন উপরে ফেলে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

দেবল ভদ্রের প্রবর্তিত আইন যখন ঢেঁড়া পিটিয়ে সর্বত্র ঘোষণা করা হলো তখন গাঁয়ের লোক কথা বলতে পারেনি। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছিলো অনেক। কেবল ডোম্বি গায়ে বিছুটির জ্বালা নিয়ে নৌকায় বসে চিৎকার করেছিলো, বেশ হলো। খদ্দের বাড়লো আমার। রোজগারও বাড়বে। দেশের রাজা আমাদের ভারি দয়ালু। গরীবের দিকে দৃষ্টি আছে। পারাপারের লোকেরা হাঁ করে ওকে দেখছিলো। চিৎকার করেছিলো দেশাখও।

বেশ করেছে। কাজের মতো কাজ করেছে। কতকাল আর লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখা যায়। প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ভালো। এবার চামুক-চুমুক খাওয়া যাবে।

জটলা করছিলো অনেকেই। দেশাখের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর সকলের মন ছুঁয়ে যায়। সবার মধ্যেই কম বেশি অসন্তোষের গুঞ্জন।

এতদিন আচারে-আচরণে আমরা ছোটলোক ছিলাম। এবার আইন করে ঘোষণা করা হোল আমরা নেড়ি কুকুরের চাইতেও অধম।

সকলের চোখেমুখে বেদনার ছায়া। কেউ প্রতিকারের ভাষা জানে না। মাথা পেতে নিতেও গ্লানি। দুঃসহ যন্ত্রণার নীল কাঁটা বুকের মাঝে বিঁধে থাকে।

ইচ্ছে করছে ঐ লুচ্চাটার মাথা ফাটিয়ে—

ওরে দেশাখ চুপ কর। দেবল ভদ্রের বিরুদ্ধে কথা বললে কারো ঘাড়ে মাথা থাকবে! কচুকাটা করবে। ঘরদোর পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। বুড়ো নিমাইয়ের আতঙ্কিত কণ্ঠে দেশাখ চুপ করে যায়। ওরা সবাই জানে দেবল ভদ্র এক মুহূর্তে একটা বিরাট অনর্থ ঘটাতে পারে। সে কারো পরোয়া করে না।

বেশি বাড় ভালো না রে। ছোটলোকের মতোই থাক।

না কাকা সবসময় এমন একটা কথা বলবেন না?

ভিড়ের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে বলে দীপক।

তবে তোরা কি করবি?

সেটা আমাদের ভাবতে হবে।

বুকের পাটা বেড়েছে দেখছি!

বুড়ো নিমাই দুপ্‌দাপ্ জটলা থেকে সরে পড়ে। যুবকরা সবসময় মাথা গরম করে। ওরা আগে পিছে বুঝতে চায় না। বাতের ব্যথায় কাতর বুড়ো নিমাই এর বেশি কিছু ভাবতে পারে না।

অসন্তোষের হুল-ফোটানো জ্বালাটা বুকে নিয়ে একে একে সবাই নিজ নিজ কাজে যায়। এ অপমান কারো পক্ষেই ভোলা সম্ভব না। হজম করা ভীষণ কঠিন। প্রতিবাদের উপায় চাই। একথাক'টি প্রার্থনার সঙ্গীতের মতো সবার মুখে। ভীড় কমে গেলে দেশাখ কাহ্নুপাদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

কানুদা তুমি তো লেখো, চিন্তাভাবনা করো; আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

কি?

আমার কেন ছোটলোক? কি আমাদের অপরাধ? আমাদের কি নেই? কথা বলছো না কেন?

আমি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারিনা দেশাখ। দেবল ভদ্রের শরীর টুকরো টুকরো করে দেখতে ইচ্ছে করে যে তার রক্তের রঙ কি? আমার রক্তের রঙ যদি লাল হয় তবে সেই একই রঙ নিয়ে ওদের বেঁচে থাকা উচিত না, হয় মরুক নয় রক্তের রঙ পাল্টাক। সব জায়গায় উচ্চ-নিচের ভেদটা তফাৎ করে দিক।

ঠিক বলেছো। চলো একদিন সবাই মিলে রাজার কাছে গিয়ে এই আবেদন জানাই।

তাতে লাভ? রাজা তো ওদের লোক। আমাদের কেউ না। আমাদের জন্যে তার কোনো দরদ নেই।

কানুদা, এসো তাহলে আমরা ছোটলোকরা আলাদা হয়ে যাই। আমাদের ভেতর থেকে একজনকে রাজা বানাই, একজনকে মন্ত্রী বানাই তারাই আমাদের কথা ভাববে। আমাদের উপকার করবে। কাহ্নপাদ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

তুই একটা সাংঘাতিক কথা বলেছিস দেশাখ। তাহলে আমরা রাজাকে কর দেবো না কি বলিস?

হ্যাঁ ঠিক।

আমাদের এই এলাকার সব জমির মালিক হবো আমরা।

হ্যাঁ ঠিক।

আমাদের মুখের ভাষাই হবে আমাদের রাজদরবারের সম্মানিত ভাষা।

উফ্, কানুদা। আমরা নিজেদের একটা রাজ্য গড়বো।

কিন্তু, কিন্তু দেশাখ ওরা তা মানবে না।

না মানলে লড়াই করবো।

কেমন করে? আমাদের তো কিছু নেই।

তীরধনুক আছে।

সে আর ক'টা? কিন্তু ওদের লোকজন আছে। অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওদের সঙ্গে আমরা পারবো না।

সেজন্যে নিজেদের তৈরি করতে হবে কানুদা।

তাই।

দু'জনে আবার নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়। দেশাখ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে শিকারের নামে তীরধনুকের একটা দল গড়ে তুলবে ও। আস্তে আস্তে সে দল এক বিরাট বাহিনী হয়ে যাবে। কাহ্নপাদ ভাবে স্বপ্ন যত সুখকর হোক ব্যাপারটা খুব সহজ না। ওরা ছাড়া রাজকোষে অর্থ জোগাবে কে? ধানের গোলা ভরবে কে? দেশের সব জমির মালিক রাজা। এত সহজে সবকিছু ওদের ছেড়ে দেবে না। তার জন্যে প্রচুর রক্তপাত চাই। অনেক রক্ত। কাহ্নপাদের মাথা ঝিম ধরে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে সাদা মেঘ ভাসে।

তখন পটহ মাদল বাজিয়ে কুক্কুরীপাদ নেচে নেচে পথ চলে। গলায় হাড়ের মালা। উলঙ্গ কুক্কুরীপাদ। কোনোদিকে খেয়াল নেই। যোগীর ধ্যানে মগ্ন। ও দূরের পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। ওখানে থাকে। সংসার পছন্দ করে না। উদ্দাম, মুক্ত ও প্রেমময় জীবন ওর কাম্য। ওকে ভালোবেসে ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সন্ধ্যা। দু'জনে পাহাড়ে থাকে। ফলমূল খায়। কখনো গাঁয়ে এসে ভিখ চায়। কাহ্নপাদকে দেখে এগিয়ে আসে।

এখানে বসে আছে যে কানুদা?

এমনি।

কাহ্নুপাদ হাসে।

রাজার আইনে মাথা ঘুরে গেছে তো? বুঝি, সব বুঝি কানুদা। আবার পটহ মাদল বেজে ওঠে। কুক্কুরীপাদ গায় :

দুলি দুহি পিঠা ধরন ন জাই।
রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ।।
আঙ্গন খরপণ সুন তো বিয়াতী...

কুক্কুরী গাইতে গাইতে অনেকদূর চলে যায়। অস্পষ্ট হয়ে আসে গানের কথা, সুর। কেবল বাজনার শানাই আসে মৃদু। ও যোগী হয়ে যত হাড়ের মালাই পরুক আসলে দেশের অবস্থা বোঝে। নইলে এমন সুন্দর পংক্তি কেউ বানাতে পারে না। কাছিম দুইয়ে পাত্রে রাখা যায় না। গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়। কুক্কুরীপাদের গানের প্রথম পংক্তি কাহ্নুপাদকে ভাবায়। কি সুন্দর করে বলা। আসলে ও যোগীর জীবনযাপন করলেও মানুষের কথা ভাবে। মানুষকে ভালোবাসে। ভালোবাসার এই সুগভীর বোধ থেকেই হৃদয়ের ভাষার এমন বাঙময় প্রকাশ।

দেশাখ উঠে দাঁড়ায়।

আমি চলি কানুদা।

কোথায়?

দেখি কোথায় যাই।

ঠিক আছে যা।

ওর মন যে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ও আর কোথায় যাবে। ঘুরে ফিরে আবার নিজের মুখোমুখি হবে। আরো দু'পাঁচটা ছেলেকে মনের কথা বলবে। একত্রিত করতে চাইবে। করুক। কাজটা ওকেই সাজে। ওর সে গুণও আছে। কাহ্নুপাদ হাঁটতে হাঁটতে খেয়াঘাটের কাছে আসে। সেখানে আর এক জটলা। সকলের কণ্ঠই আজ কিছু কিছু সোচ্চার হতে চায়। কিন্তু গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে পারে না। কোথায় যেন ভয়। নিমাই বুড়োর তর্জনী দেখতে পায়, ছোটলোকরা ছোটলোকের মতো থাক। তাই বেশি ভাবতে চায় না কেউ। আবার নিজেদের শামুকের মতো গুটিয়ে নেয়। আর তখুনি অরণ্যের কর আদায়কারী রাজার লোক দেখে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাহ্নুপাদ কথা বলে।

কি ব্যাপার অরণীবাবু?

ব্যাপার আর কি? এই এলাম ঘুরতে ঘুরতে। সারাদিনই তো ঘুরতে হয় এখানে নয় ওখানে। কাজটাই তো ঘোরার।

বেশি কথা বলা অরণীবাবুর স্বভাব। কথায় একবার পেয়ে বসলে আর থামতে চায় না। নিজেও বোঝে নিজের এ অভ্যেসের কথা। তখন দাঁতে জিভ কেটে বলে, আমি বড্ড বাচাল। একবার শুরু করলে আর থাকতে পারি না।

পান খেয়ে রাঙিয়ে-রাখা দাঁতগুলো বের করে হা হা করে হাসে। কারো কারো দিকে চোখ পড়তে ফুঁসে ওঠে।

কি হে বাপু আর কতদিন ঘোরাবে? ঘুরতে ঘুরতে তো পা'দুটো হারাতে বসেছি। কলুর বলদের ঘোরা এর কাছে কিছুই না। আর কিন্তু ঘুরতে পারবো না বাপু। এবার না দিলে দরবারে নালিশ দেবো। তখন মজাটা টের পাবে।

যারা অরণ্যে শিকার করে ওরা দু'তিনজন জোড় হাতে বলে ওঠে, দেবো, অরণীবাবু দেবো। আপনাকে আর ঘুরতে হবে না। বাড়ি বয়ে দিয়ে আসবো। বড় খারাপ সময় যাচ্ছে। শিকার করে দিন চলে না।

অতশত আমি বুঝি না বাবু। আমার কাজ আমি করবো। নইলে আবার আমাকে শাস্তি পেতে হবে।

ওদের দিকটাও তো ভাববেন অরণীবাবু?

কাহ্নুপাদ ওদের হয়ে সাফাই গায়।

অত দেখতে গেলে আমার চলে না।

অরণীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর। সকলেই চুপ। হঠাৎ নীরবতা সকলকে জাপটে ধরে। পরিবেশটা সহজ করার চেষ্টা করে কাহ্নুপাদ; আপনার শরীরটা খারাপ নাকি অরণীবাবু? চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছে।

তা দেখাবে না কেন বল? এ দেশটায় কি বাস করার উপায় আছে? যতসব জঞ্জাল আমার মাথার উপর এসে পড়েছে। গতকাল আমি আমার প্রিয়তম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছি।

কেন? কেন?

আর কেন? আমার শালার ভাগ্নের কন্যার নামে কলঙ্ক রটেছে। পরে শুনেছি যে কলঙ্ক মিথ্যে। কিন্তু মিথ্যে হলেও, কলঙ্ক তো। সে পাপে আমার স্ত্রীও কলুষিত হয়েছে। এখন সে কুলটা স্ত্রীকে নিয়ে কি করে ঘর করি বল? তাই ওকে ত্যাগ করেছি। গতকাল বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় প্রিয়তম স্ত্রী ছিলো আমার। অরণী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। কেঁদে ফেলে। তার আসল নাম একটা ছিলো। এখন আর চালু নেই। সকলেই ভুলে গেছে। কোঁচার খুঁটো দিয়ে বারবার চোখ মোছে। নাক ঝাড়ে। নাকের ডগা লাল হয়ে ওঠে। সকলেই হতভম্ব। কেউ কথা বলতে পারে না। কাহ্নুপাদ একবার মনে মনে আউড়ে নেয়, শালার ভাগ্নের কন্যা তার দোষে...। নাঃ, আর ভাবা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হয় অরণী। নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে সচেতন হয়ে যায়।

আবার বলে, তোমার হয়তো জানো না, আমার মা তেমন সৎকুলের মেয়ে ছিলেন না। আমার বাবা তাঁর বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলেন। আমার গিন্নী কিন্তু সৎ ক্ষত্রিয় বংশের মেয়ে ছিলো। সেই দিক থেকে আমি আমার বাবার ওপর টেক্কা দিয়েছিলাম। আহা, তার ওপর আমার এমন প্রেয়সী! অরণী আবার চোখের জল মোছে। শোক যেন কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। অথচ সংস্কার আষ্টেপৃষ্টে। সেটাও মানতে হয়। অরণীর এত গভীর শোক দেখে হঠাৎ হাসি পায় কাহ্নুপাদের। পেছন থেকে নিমাই বুড়ো দরদী গলায় সহানুভূতি দেখায়।

আহা বড় সৎ বামুন আমাদের অরণীবাবু। এমন নিষ্ঠাবান লোকের জন্যেই তো সমাজটা টিকে আছে। নইলে সব ছারখার হয়ে যেতো।

বটেই তো। কতবড় পুণ্যের কাজ করেছেন উনি।

পেছন থেকে কে যেন সমর্থন জানায়। কাহ্নুপাদ খেয়াল করে অনেকেরই মুখেচোখে একটা ভক্তিভাব। যেন এমন মহান পুণ্য আর কিছুতেই হয়না। একইসঙ্গে সকলেই যেন একটা শোকের অংশীদার হয়ে একদম বাক্যহারা হয়েছে। এদের নিয়ে কেমন করে আলাদা রাজ্য হবে? ওরা কি এদের বিরুদ্ধে লড়বে? হতাশ বোধ করে কাহ্নুপাদ। বুকটা মোচড়ায়। কিছুই ভালো লাগে না। দেশাখকে খোঁজে। না, ও এ জটলায় নেই। কেউ কথা বলছে না কেন? ভাবটা যেন কথা বলে পুণ্যের পবিত্রতা এবং স্তব্ধতা ক্ষুণ্ণ করার সাহস কারো নেই। একসময় অরণী নিজেই উঠে দাঁড়ায়।

যাই। ছেলেমেয়েগুলো ঘরে রয়েছে। ওদের তো আর দিয়ে দেইনি। বড্ড জ্বালাতন করে। ঘরে ফিরে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসে অরণী। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, দেশাখ কৈ? দেখছি না তো। ওর চুল পর্যন্ত দেখা যায় না আজকাল। আমাকে কেবলই ঘোরায়। দশদিন চোরাকুঠুরী থেকে ঘুরে এলেই মজাটা টের পাবে।

কেউ কোনো কথা বলে না। অরণী লম্বা পা ফেলে ঘাটে এসে দাঁড়ায়। একদল লোক নিয়ে ডোম্বির নৌকা কেবল ঘাটে এসে ঠেকেছে। অরণী এককোণে সরে দাঁড়ায়। সকলের নামা হয়ে গেলে লাফ দিয়ে নৌকায় ওঠে। ডোম্বির উল্টো দিকে নৌকার মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়। যদি কোনোক্রমে বৈঠার জল এসে গায়ে লাগে অথবা ডোম্বির ছায়া পড়ে তাহলে তো বাড়ি গিয়ে আবার স্নান করতে হবে। এমনিতেই এ পাড়া এলে স্নান না করে উপায় থাকে না। সেজন্যেই তার সবসময় এক কথা, ছোটলোকগুলোর জ্বালায় রাস্তায় হাঁটা দায়। ডোম্বি আবার নৌকার কাছি খুলে দেয়। অরণীবাবু উঠলে তার কাউকে নৌকায় ওঠানো যাবে না। সবসময় একলা পারাপার চায়। মনে মনে বিরক্ত হলেও ডোম্বির উপায় নেই। নইলে দরবারে ঠুকে দিলে খামোখা শাস্তি। ডোম্বি কাছিটা একপাশে গুছিয়ে রাখে।

দেখিস সাবধানে রাখ। জল ছিটাসনে যেন।

ডোম্বি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বামুনদের এসব কিছুতে ও মজা পায়। আসল চরিত্র তো ওর চেয়ে ভালো কেউ আর জানে না।

আ মোলো, হাসির কি ঘটা।

ভয় নেই। আমার কাছি আপনাকে ছুঁয়ে দেবে না। ও লোক চেনে। আচারবিচার বোঝে।

হয়েছে। ঢঙ রাখ।

ডোম্বি হাসতে থাকে। রেগে যায় অরণী।

তুই থামবি কিনা বল?

ঐটুকুর জন্যেই তো বেঁচে আছি। তাও বন্ধ করে দেবেন?

যতসব ছিনালীপনা। দেখলে গা জ্বলে।

অরণী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গাল দেয়। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

যা হাসির ছিরি নৌকাটা না ডুবলেই বাঁচি।

অরণীর মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। ডোম্বির বৈঠায় ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ হয়। আড়চোখে অরণী বারবার সেদিকে চায়। মেয়েলোকটা ইচ্ছে করে জল না ছিটোলেই হয়। এদেরকে বিশ্বাস নেই। ডোম্বি আজ আর কোনো বদমায়শী করে না। নইলে অনেক সময় এমন কায়দা করে জল ছিটায় যেন ওর কোনো দোষ নেই। নোকা বাওয়াটাই এমন। ঘাটে এসে ভিড়তেই অরণী লাফ দিয়ে নেমে যায়। দূর থেকে দু'টো কড়ি ছুঁড়ে দেয় ডোম্বির দিকে। ডোম্বি কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখে।

ঘাটের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে-থাকা ছুটকির ব্যাপারটা ভালো লাগে না। অমন করে কড়ি দিতে ও আগে দেখেনি। তাই ডোম্বিকে জিজ্ঞেস করে, অমন করে কড়ি দু'টো ছুঁড়ে দিলো কেন মাসী?

আমরা যে ছোটলোক তাই। যদি হাতে হাত লেগে যায়।

আমরা কেমন করে ছোটলোক হলাম মাসী।

কি জানি, জানি না।

আমাকে কেউ অমন করে কড়ি দিলে আমি ঘুঁষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দেবো।

পারবি ছুটকি?

খুব পারবো।

তাই যেন পারিস ছুটকি। তাই যেন পারিস।

ডোম্বি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ছুটকির বড় বড় চোখের পাতায় সর্বনাশা ঝড় আবিষ্কার করতে চায়। খেয়া পারাপারের জন্য দু'জন বুড়োবুড়ি এসেছে। ডোম্বিকে আবার কাছি খুলতে হয়। ছুটকিও উঠে বসে নৌকায়। এপারে এসে কাকুতি মিনতি শুরু করে বুড়োবুড়ি।

পারের কড়ি দিতে পারবো না বাপু। একটাও কড়ি নেই।

তা হবে না।

ডোম্বি বুড়িব হাতের পুঁটলি কেড়ে নিয়ে খুলে ফেলে। গোটাকয়েক তিলের নাড়ু। পাঁচ সাতটা মোয়া। পান সুপারি। এমনি হাবিজাবি কতকিছু। কিন্তু কড়ি নেই। ডোম্বি পুঁটলিটা রেখে দিয়ে বুড়ির কোমর হাতড়ায়। না নেই। ও অবলীলায় বুড়োর কোমরও খোঁজে। কিন্তু আশা নেই।

পায়ে পড়ি ছেড়ে দে মা। একটা কড়ি নেই। জামাইর বাড়ি যাচ্ছি বেড়াতে।

তা যে চুলোয় খুশি সে চুলোয় যাও। কড়ি দিয়ে যেতে হবে। বুড়ো-বুড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না। আগে কখনো এ পথে আসেনি। ভেবেছিলো হাতে-পায়ে ধরলে পাটনী পার করে দেবে। কিন্তু এ যে বড় কঠিন তা কেমন করে জানবে। দু'জনে হতভম্বের মতো এদিক ওদিক চায়।

ঠিক আছে কড়ি না দিতে পারতো ও নাড়ুগুলো রেখে দাও।

বুড়ি তাড়াতাড়ি পুঁটলি থেকে নাড়ুগলো বের করে ডোম্বির হাতে দিয়ে নেমে যায়। ওদিকে তাকিয়ে ছুটকি বলে, আচ্ছা মাসী তুমি ওদের ছেড়ে দিলেই তো পারতে?

না রে, বিনে কড়িতে পার করলে লক্ষ্মী থাকে না।

কেন কানু কাকা তো প্রায়ই কড়ি না দিয়ে নেমে যায়?

তোর কানু কাকা আর ওরা বুঝি সমান হলো?

তাতো না। তবে পারাপার আর কড়িতো সবার জন্যে সমান। কানু কাকা না দিলে তোমার লক্ষ্মী থাকে?

তোর কানু কাকার থেকে আমিই কড়ি নিই না। হলো তো?

কেন নাও না?

অত কথা বলিস না ছুটকি।

আচ্ছা মাসী এই নদীটা কোথায় গিয়ে বাঁক নিয়েছে?

জানি না।

আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করে। জানো মাসী মনে হয় মাছ হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাই অনেকদূরে। দেখি কোথায় কোথায় নদী বাঁক নেয়। আচ্ছা মাসী?

বল?

নদীর পানি ঘোলা কেন?

জানি না।

তুমি কিচ্ছু জানো না। জানো কেবল নৌকা বাইতে।

ছুটকি রেগে যায়। ওর কত কি যে জানতে ইচ্ছে করে। যেখানে আকাশটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। বসে বসে গাছ-গাছালির বেড়ে ওঠা দেখতে ইচ্ছে করে। এখন আর একটি জিনিস জানার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে। রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, আমরা কেমন করে ছোটলোক হলাম। মাসী?

তুই বাড়ি যা ছুটকি, তোর মা খুঁজবে?

ও। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না এইতো? ঠিক আছে।

ছুটকি জোরে জোরে নদীর পানিতে পা নাচায়। বৈঠা ধরে নাড়িয়ে দেয়। তারপর দুপদাপ উঠে চলে যায়। ডোম্বি অবাক হয়। ভীষণ চালাক ছেলে তো। ও হাঁটতে হাঁটতে দূরের পাহাড়ের দিকে যায়। পারাপারের লোক নিয়ে জলের বুকে পরম অবহেলায় নৌকা বায় ডোম্বি। যেন কোথাও কোনো দায়ভার নেই। দাঁড়ে হালে কাছিতে সর্বত্র এক সাবলীল নিরুদ্বেগ পরমসুখে খেলা করে। কেবল বিনে কড়িতে পারাপারে যত কড়াকড়ি। হাজার মিনতিতে মন গলেনা। কিন্তু ছুটকি ঠিকই বলেছে। কানুকে ছেড়ে দেয় কেন? শুধু ছাড়া নয়, দিতে চাইলেও নেয় না? এর উত্তর জানা নেই ওর। আপন মনে হাসে ডোম্বি। শুধু একটি মানুষ ওকে নদীর মতো উদার করে দেয়।

৭

ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বরে সময় আর কাটতে চায়না বিশাখার। কাল সন্ধ্যায় দেশাখ ওকে এখানে আসতে বলেছিলো। সেই কখন এসেছে ও। সব কাজ ফেলে রেখে মাকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে। ভাইবোনরাও কেউ টের পায়নি। অথচ দেশাখের পাত্তা নেই। যা রাগ হচ্ছে। ভাবছে চলে যাবে এখুনি। আবার মনটা নরম হয়ে যায়। দেখা না করে যাওয়া ওর নিজের পক্ষেই সম্ভব না। দেশাখ ছাড়া আর কোনো আনন্দই নেই ওর জীবনে। চারদিকে শুধু অভাব। এক বেলা খেলে আর এক বেলা জোটেনা। সারা বছরে একটা কাপড় কেনা হয়না। মনটা সবসময় বিষণ্ন হয়ে থাকে। শুধু দেশাখের সান্নিধ্য ওকে মাতিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে বিশাখার মনে হয় বিষণ্ন হতে হতে ও যখন কুঁকড়ে যায় তখন দেশাখ আবার ওকে উজ্জীবিত করে। দেশাখই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে ও হয়তো মরে যেতো। ইদানীং বাবার অসুখ ওকে আরো হতাশ করে দেয়।

আস্তে আস্তে কেমন ভয় করতে থাকে বিশাখার। কতকাল আগের বৌদ্ধ মন্দির কে জানে। এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। লোকজন ইচ্ছেমতো ইট কাঠ খুলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। রাজা কোনো গরজ করে না। এ ধরণের তিনটে মন্দির আছে। সব ভাঙা। পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে বিরাট বকুলগাছ গজিয়েছে। চত্বর ফেটে গিয়ে ঘাস ছেয়ে গেছে। বুনোফুলের গন্ধ ভুরভুর করছে। পেটের কাছে চমৎকার একটা সাদা ফুলগাছ আছে। বেশ বড়ো গাছটা। ফুলের নাম জানে না ও। ওর ভীষণ প্রিয়। দেশাখ ছোট ছোট গুচ্ছ ফুলের এক থোকা পেড়ে ওর খোঁপায় গুঁজে দেয়। ফুলের মৃদু গন্ধ বিশাখাকে দুঃখের কথা ভুলিয়ে দেয়। সব কিছুর আকর্ষণ আস্তে আস্তে কেমন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আজ বোধ হয় আর দেশাখ আসবেনা। ফিরেই যেতে হবে। হঠাৎ করে বিশাখার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে।

চত্বরের পেছনের ভাঙা দেয়াল টপকে দেশাখ ঢোকে। কাঁধের ওপর দুই জোড়া ঘুঘু। ফাঁদ পেতে ধরেছে। আসার পথে একটা সজারুর পেছনে অনেকক্ষণ তাড়া করেছিলো। কিন্তু মারতে পারেনি। সেজন্যে আসতে দেরি হয়ে গেলো। বিশাখার পায়চারী লক্ষ্য করে মিটমিটিয়ে হাসে। আচমকা ঘুঘুর পাখা ঝাপ্‌টানির শব্দে ভীষণ ভয় পায় বিশাখা। পেছন ফিরে দেশাখকে দেখেই জড়িয়ে ধরে। ঘুঘুর পায়ের আঁচড় লাগে ওর কপালে। ঘাড় থেকে ঘুঘুর জোড়া নামাতে নামাতে দেশাখ বলে, দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় বুঝি? একটুও তর সয়না?

বুনো জংলী।

দেশাখ হো হো করে হাসে। বিশাখা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে।

ইস্‌, দেখি দেখি, কপালে রক্ত বেরিয়েছে।

না, দেখতে হবে না।

বিশাখা দেয়ালের কাছে সরে যায়।

রাগ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু।

থাক আর তোষামোদ করতে হবে না।

ঠিক আছে এই আমি গম্ভীর হলাম। একটিও কথা বলবো না।

দেশাখ পিঠের ওপর থেকে তীরধনুকের বোঝা নামায়। অন্য সময় হলে এ কাজ বিশাখা করতো। আজ ও চত্বরের আর এক ধারে বসে হাত কামড়াচ্ছে। আড়চোখে দেশাখকে দেখছে। দেশাখ গভীর মনোযোগে ঘুঘু দেখে। যেন আগে কোনোদিন এ পাখিটি দেখেনি। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। যেন এখানে কোনো বিশাখা নেই। ভালোবাসা নেই। চুমু খাওয়া নেই। আরো রাগ হয় বিশাখার। এখানে আর কিছুতেই থাকবে না। চলে যাবে। ভাঙা দেয়ালটা টপ্‌কে পেরুতে যাবে তখন দেশাখ এসে হাত ধরে।

ছাড়ো। আমি চলে যাব।

কিছুতেই না।

তুমি একটা—

কি বলো? থামলে কেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

বলবে, বলবে। একশোবার বলবে। ঐ সাদা ফুল সাক্ষী।

দেশাখের বুকের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে বিশাখা ওর বুকের ধুক্‌পুকানি শোনে। মুহূর্তে ওলোটপালোট হয়ে যায় সব অনুভূতি। দেশাখ ওর কড়ে আঙুল নিজের আঙুলে ঠেকিয়ে বলে, ভাব?

ভাব।

দু'জনে শব্দ করে হেসে ওঠে।

এই বুকের খাঁচায় তুমি আমার ঘুঘু।

না কক্‌খোনো না। অমি ঘুঘু হতে পারবো না।

তাহলে কি?

তোমার তীরধনুক।

ও বাব্বা একদম গোড়ায় হাত। ঠিক বলেছো তুমি। একদিকে আমার খাওয়াপরা, অন্যদিকে প্রেম। দু'টো ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। এমন সুন্দর কথা তুমি কেমন করে বললে বিশাখা? এখন তোমাকে কি উপহার দেই বলো তো?

হুঁ। চালাকী? সব বুঝি।

কথা ঐ একটাই। তোমাকে উপহার দিলে তা আমার ভাগেও আসে। দু'জনে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। দেশাখের মনে হয় ইদানীং বিশাখা বেশ একটু ভারি হয়েছে। মুখে অতিরিক্ত লাবণ্য এসেছে। চোখে গভীর কালো স্নিগ্ধতা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টি ছায়াছন্ন হয়ে আসে। ফিরে যেতে মন চায় না। বিশাখা ঐ সাদা কেতু ফুলের মতো সুগন্ধীময় এবং পবিত্র। ও যেন সব মলিনতার ঊর্ধ্বে। দেশাখ একটা হাত নিজের মুঠিতে তুলে নেয়। পাতলা লম্বা আঙুলগুলো চকচকে পাখির পালকের মতো পিচ্ছিল। আঙুলগুলো মুখে পুরে কামড়ে দেয় ও। বিশাখা চোখে চোখ রেখে হাসে। দেশাখের মনে হয়, সাজে না কেন বিশাখা? সাজলে হয়তো ওকে একদম অন্যরকম দেখাতো। কানে কুণ্ডল, গলায় গুঞ্জার মালা, হাতে কেয়ূর ও শঙ্খবলয়, কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল।

আঃ! একদম নতুন মেয়ে হয়ে যেতো বিশাখা। দেশাখ চিনতে ভুল করতো। সংকোচে কথা বলতো না। তখন নিজেই হেসে এগিয়ে আসতো। গলা জড়িয়ে ধরে বলতো, আমি তোমার বিশাখা। আমায় চিনতে পারছো না?

ওমা, তুমি নিজে নিজে হাসছো কেন?

ভূতে পেয়েছে।

যাঃ! সত্যিকথা বলো? কার কথা ভাবছো?

বলবো না।

থাকগে বোলো না। আমিও শুনবো না।

বাব্বা! আচ্ছা শক্ত মেয়ে তো! আমি ভেবেছিলাম গাল ফুলাবে, কাঁদবে। আমি বসে বসে মান ভাঙাবো। দিলে তো সব মাটি করে।

বেশ জব্দ?

দেশাখ টানটান হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। কেতুগাছের ছায়া ওর সারা শরীরে। দু'জনেই এই ফুলগাছটা ভালোবাসে। গন্ধটা ওদের পাগল করে দেয়। বিশাখা দেশাখের চুলের গভীরে হাত ডোবায়।

এ গাছটার ফুল সাদা কেন দেশাখ?

খারাপ কি?

লাল হলে ভালো হতো।

আমি অতো ভাবিনা। যা আছে তাই আমার ভালো লাগে। যারা গীত লেখে তারা ওসব নিয়ে মাথা ঘামায়। ধরো এই কেতুফুলগাছটা যদি গাছ না হয়ে বাঘ হতো তাহলে কি আমরা এখানে আসতাম?

বিশাখা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেবলই বলতে থাকে, তুমি যাই বলো ফুলগুলো লাল হলে আমার বেশি ভালো লাগতো?

ঠিক আছে বাপু, ঠিক আছে। পরজন্মে আমি তোমার জন্যে লাল ফুল হয়ে এই গাছে ফুটবো।

তাহলে আমি কাকে ভালোবাসবো?

তাইতো? তুমি আর কারো হও এটা আমি চাইনা। দরকার নেই ফুল হবার। জনম জনম তুমি আমার।

দেশাখ বিশাখার ভালোবাসার পবিত্র ফুল হয়ে ওর সমস্ত শরীর ঢেকে দেয়। সে আবরণে বিশাখা এক অহঙ্কারী মরালী। সরোবরে অনবরত ডানা ঝাপটায়। সে প্রকাশ অনাবিল আনন্দের বিহ্বলতা। কড়া রোদ কেতু ফুলের সমস্ত ডালপালা ভেদ করে ওদের উত্তপ্ত করে দেয়। সময়ের কোনো হিসেব দু'জনের কেউই রাখে না। ওরা যখন একান্তে নিজেদের পায় তখন এমন করেই ধরে রাখে সময়। ভুলে যায় অরণ্য, শিকার, ধান ক্ষেতে শামুক কুড়োনো। ভুলে যায় অভাব আর দারিদ্র্যের দাঁতখিঁচুনি। তখন ওদের আকাঙ্ক্ষা বন্‌বন্‌ ছোটে। ছুটতে ছুটতে বন পেরোয়, নদী পেরোয়, পাহাড় বেরোয়। তখন বিশাখার কণ্ঠ বিজনে ঘুঘুর ডাকের মতো মাদকতা ভরা। দেশাখ সে কণ্ঠস্বরের মায়াবী আকর্ষণে পথ ভোলে। তারপর জোড়া ঘুঘুর অস্থির পাখা ঝাপ্টানিতে দু'জনে ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বরে ফিরে আসে।

দেখছো পাখিগুলো কেমন রেগে গেছে?

বন্দী বলে আমাদের সুখ সইছে না।

পাখি মারতে তোমার খারাপ লাগে না দেশাখ?

একটুও না।

কেন?

বিশাখা ওর হাত দু'টো সরিয়ে সরে বসে।

কেমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছো দেশাখ?

নিষ্ঠুর কেন? ওকে না মারলে তো আমাকে মরতে হবে। ওকে মারি বলেই তো আমি বেঁচে আছি।

বিশাখার মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায়। দেশাখের কথাগুলো ওর পছন্দ হয় না। ভালো লাগে না। এতটা ক্রুর ভাবে না বললেও পারতো। ওর চেহারায় অন্যকিছু আঁচ করে দেশাখ আবার বলে, পাখি আমি ভালোবাসি বিশাখা। জানো অনেকদিন গেছে যখন চমৎকার কোনো পাখি আমি মারতে পারিনি। কথা বলছো না কেন বিশাখা? দেশাখ ওকে কাছে টেনে নেয়। যেন ও এখুনি ওকে না জানিয়ে অন্য কোথাও উধাও হবে। খুঁজে পেতে দেশাখের কষ্টের শেষ থাকবে না। আর সে আশংকায় ওর অনুভূতি শিউরে উঠে। আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় ওকে। কেতুফুলের মাথা থেকে রোদ অনেক সরে গেছে। পুরো চত্বরে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা।

তোমার বাবা কেমন আছে বিশাখা?

বাবার অসুখ ভালো হচ্ছে না। বাবা বোধ হয় বাঁচবে না।

মিছে ভাবছো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিছে নয়, সত্যি। মা রোজ কাঁদে। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে থাকতে ভয় করে।

ভয় কেন? তোমার জন্যে আমি তো আছি।

তুমি কত দিক সামলাবে? আচ্ছা দেশাখ আমরা এত গরীব কেন?

আমরা গরীব বলেই তো রাজার গোলায় ধান। রাজ দরবারে উৎসব।

আমরা কি কোনোদিন ধনী হতে পারবো না? হাত পা ছড়িয়ে খেয়ে পরে আমোদ করতে পারবোনা?

হয়তো কোনোদিন পারবো। তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। তোমাকে আমি তীরধনুক চালাতে শেখাবো বিশাখা।

সত্যি? তাহলে বেশ হবে। আমিও তোমার সঙ্গে শিকারে যাবো। বিশাখা উৎসাহে সোজা হয়ে বসে।

ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বর আজ অন্যরকম হয়ে যায়। ভালোবাসা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শক্তি গৌরবে। দেশাখ বিশাখার হাতে হাত রেখে স্বপ্ন দেখে : বিরাট এক ধনুক-বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে ও।

শান্ত সন্ধ্যা। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজছে। সুলেখা বারান্দায় বসে চুল আঁচড়ায়। দেশাখ কুয়োতলায়। মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালছে। জল ঢালার ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ খারাপ লাগে সুলেখার। একজোড়া ঘুঘু খাঁচায় পুরে রেখেছে ও। একটার চামড়া খুলে সুলেখাকে দিয়েছে রাতের রান্নার জন্যে। রাতে রাঁধতে ইচ্ছে করে না ওর। ঝামেলা

থাকলে সবসময় ও বিকেলে রান্নাবান্না সেরে রাখে। যেহেতু দেশাখ বলেছে সেজন্যে ঘুঘুটা এখনই রাঁধতে হবে। টানটান করে চুল বেঁধে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যায়। দেশাখ কুয়োতলা থেকে চিৎকার করে, মুখ-পোড়ানো ঝাল দিয়ে রেঁধো কিন্তু বৌদি। তোমার ঐ সাদা তরকারী হলে কিন্তু খাবো না।

সুলেখা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসে।

শুধু মুখ পোড়াবে? বুক পোড়াবে না?

পোড়াইনি আবার? সে কম্ম কবে শেষ করেছি।

তাই নাকি? খবরটা দিও ভাই।

রান্নাঘরের পেছনের আমগাছে বসে ভীষণ কর্কশ শব্দে কাক ডাকে একটা। দেশাখ ভিজে শরীরে ঘরে যায়। শ্বশুর সুলেখাকে ডাকে। ও বৌমা কাকটা তাড়াও না?

আমার বড্ড ভয় করছে বাবা।

ভয় করছে? কিসের ভয়?

কাকটা যেন কেমন করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কি যে বল—

সত্যি বাবা। আমার ভীষণ ভয় করছে।

বুড়ো আর কথা বলতে পারে না। প্রবলবেগে কাশে। দেশাখ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

কিসে তোমার ভয় করছে বৌদি?

ঐ কাকটা কেমন বিশ্রী দেখো না দেশাখ। যেন হাঁ করে আমাকে দেখছে।

দেখবে না? তোমাকে ভালো লেগেছে যে?

দেশাখ হো হো করে হেসে ওঠে। কাকটা উড়ে চলে যায়। সুলেখা কথা না বলে রান্না ঘরে ঢোকে।

ও কি বৌদি চলে যাচ্ছো যে?

তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

মা কোথায় বৌদি?

ছুটকিদের বাড়ি বেড়াতে গেছে।

মা সারাদিন ঘুরতে পারে। কোথাও না গিয়ে দিন কাটেনা তার।

তা সারাদিন ঘরে বসে করবে কি?

হ্যাঁ, তোমার মতো বৌ যার, তার ঘরে না থাকলেও চলে। বাবা বোধ হয় ঘুমোলেন আবার।

ঘুমুবে না? কাশির জ্বালায় এমনিতেই তার ঘুম আসে না। তুমি সবার পেছনে লেগেছো কেন বলো তো?

মোটেই লাগিনি। খোঁজখবর নিচ্ছি মাত্র।

একদম উপযুক্ত ছেলে। শোনো, চাঙারিগুলো বানিয়ে রেখেছি। কালকে বিক্রি করতে নিয়ে যেও।

আচ্ছা। এখন একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাচ্ছো?

ধনাদার দাবার আড্ডায়।

দেশাখ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখার কেমন নিঃসঙ্গ লাগে। সারা বাড়িতে কেউ নেই। কেবল ঘরে রুগ্ন শ্বশুর। বাইরে সন্ধ্যে। মনের ভেতর যন্ত্রণা। শুধু সুদাম একগুচ্ছ কার্পাস। ওর সঙ্গে থাকলে আনন্দের মুহূর্ত অন্ধকারে আকাশকুসুম হয়। আজ রাতে ওর সঙ্গে মিলন হবে। অভিসারে বেরুতে একটুও ভয় লাগে না। শুধু কাক দেখে ভয়। মনের মধ্যে যাবতীয় সংস্কার হাঁটাচলা করে। তাই সুদাম কেবল ক্ষণিকের আনন্দ, কিন্তু স্বস্তি নয়। যদি সুদাম ওর জীবনে চিরকালের হতো? কাছে থাকতো। পিঁড়ি পেতে খেতে বসতো। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতো। যখন তখন আদর করতো। কানে কানে কথা হতো। কুয়োতলায় একসঙ্গে যেতো। এখন কিছুই ভালো লাগে না সুলেখার। ভুসুকু ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি আর কতকাল থাকে? সুলেখা একচক্কর উঠোনে হাঁটে। অবশেষে দেশাখের ঘুঘু নিয়ে রাঁধতে বসে। লোকী আর গুণী এসে ঢোকে নিঃশব্দে। ওরা দু'জনে শামুক কুড়োতে গিয়েছিলো দেবল ভদ্রের ধানী জমিতে। ঐ জমি পাহারা দেয় নিখিল। জোয়ান ছেলে। ময়লা কুচকুচে গায়ের রঙ। যখন তখন ফক্‌ফকে দাঁত বের করে হাসে। ধান ক্ষেত্রে আশেপাশে ছেলেমেয়েদের দেখলে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। লোকী আর গুণী দু'জনে আজ ভারি খুশি। মনের সুখে শামুক কুড়িয়েছে। ওদের তো কিছু বলেই নি উপরন্তু নিজেও ওদের আঁচল ভরে দিয়েছে। দু'জনেই শামুকগুলো ঢেলে দেয় রান্নাঘরের মেঝেতে।

ইস! অনেক পেয়েছিস তো?

সুলেখার চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে। বহুদিন ওরা একসঙ্গে এত শামুক আনেনি।

আজ ভীষণ মজা হয়েছে বৌদি?

ওরা দু'জনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসি আর থামতে চায় না।

ওমা কি হলো? ভূতে পেলো নাকি? হাসি থামা বলছি? সুলেখা ধমকে ওঠে।

জানো বৌদি নিখিল আজ আমাদের তাড়া করেনি। উঃ, যা ভালো ভালো কথা বলেছিলো। নিখিল যে এত ভালো এতদিন বুঝতেই পারিনি।

কি কথা বলছিলো রে?

সুলেখা ভুরু কুঁচকে তাকায়।

কি জানি কেমন কেমন যেন কথা। আর কেউ কোনোদিন এমন কথা বলেনি বৌদি। শুনতে ভীষণ মজা লাগছিলো।

তাই নাকি? বড্ড ডেঁপো হয়েছিস তো তোরা?

আমরা কিছু বলিনি। সব নিখিল বলছিলো।

দাঁড়া দেশাখ এলে বলবো?

কি বলবে? দোহাই বৌদি দাদাকে কিছু বলো না। আমরা নিখিলের সঙ্গে মোটেই কথা বলতে চাইনি। ও নিজে যেচে কথা বলেছে। আমাদের কোনো দোষ নেই বৌদি?

লোকী গুণীর মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে যায়।

ঠিক তো?

সুলেখা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

দু'জনে একসঙ্গে সুলেখার গায়ে হাত দেয়।

ঠিক আছে। যা হাতমুখ ধো গিয়ে।

দু'জনে পালিয়ে বাঁচে। সুলেখা হেসে ফেলে। যত গম্ভীর হয়েই কথা বলুক আসলে ওর হাসি পাচ্ছিলো। ওদের বয়সটা হিসেব করলো মনে মনে। একজনের চৌদ্দ আর একজনের তেরো। দেখায় অরো কম। রোগা শরীরে বাড়বাড়ন্ত তেজ নেই। তবে চেহারা ফুলের মতো। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আদর করতে ভালো লাগে। ওদের চিন্তা ছেড়ে সুলেখা শামুক গোছাতে ব্যস্ত হয়ে যায়। ক'দিন ভালোই চলবে। কাল সকালে নদীর ধারে গিয়ে দু'একটি মাছ বা কাঁকড়া পেলে মন্দ হবে না। কাগনী ধানের ভাতে সাংঘাতিক মজা লাগে। কিন্তু নিত্য জোটে কৈ?

এদিকে কুয়োতলায় দু'বোনে ফিস ফিস করে।

নিখিলদা খুব মজার লোক না রে?

খুব। গুণী চটপট জবাব দেয়। যা হাসাচ্ছিলো আমাদেরকে। হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গেছে। মাগো! ভাবলে কেমন যেন লাগে। এই গুণী, নিখিলদা কিন্তু তোকে বেশি কাতুকুতু দিচ্ছিলো।

গুণী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে।

যাঃ আমাকে না তোকে? তুই যে বড়।

মোটেই না।

ঠিক আছে। সমান সমান।

নিখিলদা আজ আমাদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করলো কেন রে?

কে জানে।

আমাদেরকে বোধহয় ভালো লেগেছে?

হবে হয়তো।

লোকী, আমরা আবার নিখিলদার কাছে যাবো?

হ্যাঁ। বড় ভালো লোক। শোন গুণী, এরপর গেলে বৌদির কাছে বলবোনা কিন্তু। বৌদি আবার দাদাকে বলে দেবে।

ঠিক। এবার থেকে আমরা লুকিয়ে যাবো।

তুই কিন্তু বড্ড হাসিস গুণী। এত হাসি ভালো না।

আমি তোর মতো গম্ভীর থাকতে পারি না।

কখনো থাকতে হয়।

নিখিলদা তোকে বেশি আদর করছিলো লোকী?

যাঃ কি যে বলিস।

দু'জনে কুয়োর ঠাণ্ডা পানিতে ঝপ্‌ঝপ্‌ হাতমুখ ধোয়। দু'জনের মধ্যে একটা নতুন বোধ। সুখ-সুখ ইচ্ছে। এর আগে কেউ কোনোদিন কাউকে ছেড়ে কোথাও যায়নি। সব সময় একসঙ্গে ঘোরে। আজ লোকী ভাবলো, গুণীকে ফাঁকি দিয়ে একদিন একলা-একলা নিখিলদার কাছে যাবো। গুণী ভাবলো, লোকীটার একদিন খুব অসুখ করুক, একা একা নিখিলদার কাছে যাবো।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে ভৈরবী। ঘরে একমুঠো চাল নেই। বিকেলে দুধ বেচতে গেছে ধনশ্রী। এখনো ফেরেনি। এদিকে বাড়িতে অতিথি এসেছে। কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারছে না ভৈরবী। নিজের শরীরটা ভালো নেই। পেটের ভেতর বাচ্চাটা অনবরত নড়ে। বেশি নড়লে ভৈরবী কেমন অসুস্থ বোধ করে। তখন কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বড় ছেলে পলাকে পাঠিয়েছে ধনশ্রীর খোঁজে। ও এখনো ফেরেনি। ঘরে সজারুর মাংস আছে। ধনশ্রী খুব শখ করে ভৈরবীর জন্যে এনেছে। ও খায়নি। পেটে বাচ্চা নিয়ে সজারুর মাংস খেলে বাচ্চা সজারুর মতো ভীতু হয়। বড় হলে সাহসী হয় না। শিকার করতে পারে না। যুদ্ধে যেতে চায় না। ভৈরবী মনে মনে ভাবলো, এমন ছেলে জন্ম দেয়ার চাইতে না দেয়াই ভালো। ছোট ছেলে লালা ঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমোচ্ছে বুকের হাড় ক'খানা স্পষ্ট দেখা যায়। শুধু নিঃশ্বাসে তা উঠছে আর নামছে। ভৈরবীর ইচ্ছে করে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে। তক্ষুণি পলা আসে।

মা-বাবা না, দাবার আসরে বসেছে।

দাবার আসরে? দুধ কি হলো?

দুধ অমনি পড়ে আছে। বাবাকে কত ডাকলাম। উল্টে আমাকে বকে দিলো।

বললি না তোর সনকা কাকু এসেছে?

বললাম তো। বাবা কিছু বললো না। কেবলই দাবার চাল গুণছে।

যা তুই খেলগে।

এই এক অভ্যেস ধনশ্রীর। দাবার আসরে বসলে বিশ্বসংসার ভুলে যায়। বিভূতির বাড়ির সামনের বিরাট আম গাছের মাচার ওপর রোজ দাবা খেলা বসে। বুড়োরারই বেশি খেলে। কারো কোনো কাজ নেই। কেউ কিছু করতে পারে না। শুধু দাবার চালে গুণে গুণে ক'টা দিন পার করতে চায়। অথচ ওরা যখন খেলে বিশ্ব-সংসার ভুলে যায়। তখন মনে হয় না কেবলমাত্র ক'টি দিন পার করে দেবার জন্যেই ওরা একটা অবলম্বন খুঁজে নিয়েছে। একবার চক্রবী আর সাধন পাক্কা ছয় দিন এক নাগাড়ে বসেছিলো। কেউ কাউকে মাত করতে পারে না। ফলে

ওঠেও না। শেষে পাড়ার লোকে এসে খেলা ভেঙে দিয়ে দু'জনকে উঠিয়ে দেয়। ধনশ্রী অবশ্য বেশি খেলে না। কিন্তু বসলে আর কোনোদিকে ফিরে চায় না ভৈরবী প্রথম প্রথম রাগ করতো। এখন আর রাগে না। রেগে কোনো লাভ হয় না। ধনশ্রী প্রতিদিন যেমন তেমনই। সংসারে খুব আসক্তি নেই, আবার অনাসক্তিও নেই। যেনতেন চললেই ধনশ্রী খুশি।

পলা যা দুধের ভাঁড়টা নিয়ে আয়।

এনে কি হবে?

দেখি আমি কি করতে পারি।

পলা কথা না বলে আবার বেরিয়ে যায়। ভীষণ চঞ্চল ছেলে, কখনো হাঁটেনা, দৌড়াতে থাকে। ভৈরবী জানালার কাছে এসে বসে। পলা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর ছোট্ট শরীর আর একটা টিলার আড়ালে চলে যায়। দূরের বাড়িগুলো ছবির মতো। বিকেল প্রায় শেষ। একটু পর সন্ধ্যে হবে। মাত করতে না পারলে মিটমিটে আলোয় খেলেই যাবে ধনশ্রী। বৌ ছেলে অতিথি কারো কথা মনে করেই উঠবেনা। বুকটা কেমন করে ভৈরবীর। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় নিজেও জানেনা। কখনো মনে হয় ঐ দূরের বনে কখনো ডোঙ্গির নায়ে চড়ে নতুন কোনো জায়গায়। পেটের ভেতর আবার নড়াচড়া। ভৈরবী চমকে ওঠে। যেন ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছে। নিজেকে সামলে নেয়। মুখে একদলা থুথু উঠে আসে। এবার যেন একটু বেশি খারাপ লাগছে। আগে এমন হয়নি। ভৈরবী জোরে জোরে শ্বাস নেয়। বাতাসে মহুয়ার গন্ধ টের পায়। মনে হয় এখন ধনশ্রী ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে দু'জনে এই কুমারী-সন্ধ্যার অনাবৃত শরীরটা দেখতে দেখতে ডগমগে হয়ে যেতো। ধনশ্রী এসব জিনিস ভালোবাসে না। ভৈরবী কেমন করে বোঝাবে যে সন্ধ্যাটা কি অপূর্ব সুন্দর হয়ে যৌবনবতী হচ্ছে।

মা, নাও। বাবা টেরই পায়নি যে আমি এটা নিয়ে এলাম।

খেলতে বসলে কি তোর বাবার হুঁশ থাকে?

আচ্ছা মা, বাবা কেমন করে সব কথা ভুলে যায়? তুমি তো কিছু ভোলো না?

ভৈরবী কিছু না বলে হাসে।

বড় হলে আমিও বাবার মতো হবো। ভুলে যাওয়া বড্ড মজা।

কে বলেছে?

কেউ বলেনি। আমি জানি।

পাগল।

ভৈরবী ছেলের মাথায় হাত বুলোয়।

তুই ঘরে থাক পলা। পলাকে দেখবি! আমি এখুনি আসবো।

আমার ভয় করবে মা।

কিচ্ছু ভয় নেই সোনা। আমি যাবো আর আসবো। ভৈরবী দুধের ভাঁড় নিয়ে বেরিয়ে যায়। ভারী শরীরটা নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না। পা শিথিল হয়ে যায়। চলতে চায় না। কোনোমতে কামোদের দোকানে আসে। সন্ধ্যায় ভিড় নেই। একদম খালি। কামোদ নিজের মনে মনে হিসেব কষে।

কামোদদা।

বুঝেছি। অতিথি এসেছে তো?

না বলতেই সব বোঝো। এমন বোঝো বলেই তো বেঁচে আছি। কামোদ চোখ বড় করে।

এই দুধটা রেখে কিছু চাল দাও।

দুধ কে খাবে?

তুমি।

আমি? আমি কেন দুধ খাবো। আমার কি অসুখ করেছে?

এত কথা ভালো লাগে না কামোদদা। ঘরে ছেলেরা একলা। তাড়াতাড়ি দাও।

যদি না দেই?

ইস্! কি শুরু করলে? আমি জানি তুমি রোজ দুধ খাও।

আজ থেকে আর খাবো না।

তোমার পায়ে পড়ি কামোদদা। একটু পরে অতিথিরা ঘরে ফিরবে। রান্না না হলে কি ভীষণ লজ্জা!

এমন করে সংসার করতে তোমার রাগ হয় না ভৈরবী?

কামোদের গম্ভীর কণ্ঠ ভৈরবীর কানে খট্ করে বাজে। কথা না বলে চুপ করে থাকে। কামোদও আর কথা বাড়ায় না। ছোট্ট একটা হাঁড়ি এগিয়ে দেয়।

এর মধ্যে ঢেলে দাও।

ভৈরবী মাথা নীচু করে রাখে। কক্ কক্ শব্দে একটা পাখি উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। কামোদ চাল মেপে দিলে ও আর একটা কথাও বলে না। পোঁটলাটা বুকের কাঁধে ধরে ফিরে যায়। দিনের বেলা হলে নদীর ধার থেকে হেলেঞ্চা নিয়ে আসতো। এখন সে উপায় নেই। সজারুর মাংসের সঙ্গে শাক ভেজে দিতে পারতো অতিথিকে। এই দিতে না পারার জন্যে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। ধনশ্রী শাকপাতাই বেশি পছন্দ করে। মাংস খুব একটা খেতে চায় না। আয়োজন কিছুই নেই। তবু ভৈরবীর কত কি যে রাঁধতে সাধ হয়। রাঁধার মতো সুখ আর কিছুতে নেই। ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে পৌঁছয় ও।

ভৈরবী চলে যাবার পর কামোদের হিসেবে ভুল হয়। কিছুতেই আর মন বসেনা। ছোটবেলায় ভৈরবীর সঙ্গে খুব ভাব ছিলো ওর। দু'জনে অনেক ঘুরেছে টিলা থেকে টিলায়। বনে জঙ্গলে রান্নাবাড়ি খেলেছে। ফল কুড়িয়েছে। সেসব কথা এখন মনে রাখেনি ভৈরবী। নয় বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়ে যায়। ভৈরবীর বিয়ের দিনে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলো ও। খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কাউকে কিছু বলতে পারেনি। ভৈরবী বড় ভালো। ওর বৌ হলে বেশ হতো! দু'জনে হাসিখুশিতে সংসার করতো। তপতী ওকে বড্ড জ্বালাতন করে। সংসারের অভাব তপতীর সহ্য হয় না। অকারণে কামোদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যা তা বলে চিৎকার করে গালাগালি করে। মুখে কোনো কথা আটকায় না। তপতী কেন ভৈরবী হয় না? ভৈরবীর মতো শান্ত সুবোধ ধৈর্যশীলা। স্বামীর ভালোবাসায়

যার অগাধ বিশ্বাস। সব আচরণে অকুণ্ঠ সমর্থন। কামোদের মাথা ঝিমঝিম করে। দোকানের কেনাবেচা ভালো লাগে না। ও ঝাঁপ আটকিয়ে ভেতরে চলে যায়।

অতিথিকে খাইয়ে, ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে, রাত জেগে বসে থাকে ভৈরবী। ধনশ্রীর ফেরার নাম নেই। রাত কত হলো কে জানে? চারদিকে সাড়া নেই। কিছুক্ষণ আগেও হঠাৎ হঠাৎ মানুষের গলা পাওয়া গেছে। এখন সেটাও বন্ধ। চাঁচরবেড়ার গায়ের ওপর চাঁদের আলোর লুটোপুটি। আকাশে মেঘ নেই একটুও। দোরগোড়ায় বসে থাকে ও। ঘুম আসে না। শরীর যতই খারাপ লাগুক ধনশ্রী না এলে কিছুতে ঘুম আসবে না। এটা একটা অভ্যেস হয়ে গেছে। ধনশ্রীর সঙ্গে ওর বয়সের ব্যবধান ষোল বছরের মতো। কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। ধনশ্রী অসম্ভব ভালো। ভৈরবীও নিজে থেকেই সুখ সৃষ্টি করে নিয়েছে। তবু মাঝে মাঝে কেমন নিঃসঙ্গ লাগে। কামোদের কথা মনে হয়। ছোটবেলায় ওকে ছাড়া কামোদের চলতো না। ওর সঙ্গে কত উজ্জ্বল মুহূর্ত কাটিয়েছে। সেইসব স্মৃতিকে ভৈরবী এখন ভয় পায়। কখনোই গাদানো কাপড়ের মতো ভাদ্রের রোদে মেলে ধরে না। সংগোপনে জমিয়ে রেখেছে। ধনশ্রী ওকে ভীষণ ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। ওকে ছাড়া চলতে পারে না এক মুহূর্তও। কোনোদিন অবহেলা করেনি। অকারণে রাগারাগি করেনি। সেজন্যেই ধনশ্রীর গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে না ভৈরবী। মনটা এদিক-ওদিক করলেও আবার লক্ষ্মী ছেলের মতো ফিরে আসে আপন জায়গায়। ধনশ্রীর একটাই দোষ। দাবা খেলতে বসলে সব কথা ভুলে যায়। তার জন্যে কোনো রাগ নেই ভৈরবীর। শ্মশান থেকে শেয়ালের ডাক আসছে। কোনো করুণ কান্নার বিলাপধ্বনি একটানা আসতেই থাকে। বুকটা কেমন করে ভৈরবীর। কামোদের কথা মনে হয়। সংসারে কামোদের কোনো সুখ নেই। তপতী যন্ত্রণা দেয়। দূর ছাই। কামোদের জন্যে কি দায় পড়েছে? যত্ত সব বাজে ভাবনা। ওর ছেলে আছে স্বামী আছে সংসার আছে। চাঁচরবেড়ার বাড়ি আছে। বাড়ির সামনে লাউয়ের ঝোপ আছে। কচি লাউয়ের ডগায় সাদা ফুল বিশাল প্রশান্তি। আর কিছু চায় না ভৈরবী আর তখনই ধনশ্রীর উঁচু কণ্ঠের গান শুনতে পায় ও। রাতে একলা পথ চলতে হলে এমনি করে গান গাইতে গাইতে আসে ধনশ্রী। নইলে নাকি গা ছম্‌ছম্‌ করে। গান ওকে সঙ্গ দেয়। নিজেকে একলা মনে হয় না।

দোরগোড়ায় ভৈরবীকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যায় ধনশ্রী। ধপ্ করে ওর পাশে বসে পড়ে।

এখনো জেগে আছো বৌ? খাওনি তো?

ভৈরবী মাথা নাড়ে। ধনশ্রী মাথটা ওর ঘাড়ে ঘষে নেয়।

খেলতে বসলে সব ভুলে যাই বৌ। রাগ করেছো?

না।

সত্যি?

ধনশ্রী ভৈরবীকে বুকে জড়িয়ে চুমু খায়।

লক্ষ্মী বৌ। সোনা বৌ। আজ শরীরটা কেমন?

ভালো। জানো, মনে হয় সময় আর বেশি নেই।

এবার একটা মেয়ে হলে ভালোই হয়।

ধনশ্রী গদগদ স্বরে কথা বলে। আবেগে গলা জড়িয়ে আসে : খাবো না? চলো। ঘুম পেয়েছে।

দু'জনে উঠে ঘরে আসে। হরিণের চামড়ার আসনটা ধনশ্রী বিছিয়ে নেয়। কলসী থেকে জল ঢালে। ভৈরবী ঠাণ্ডা ভাত বাড়ে মাটির বাসনে। সজারুর মাংস তুলে দেয় ধনশ্রীর পাতে। হাঁড়িয়া এনে সামনে রাখে। ধনশ্রীর খাওয়া হলে সেই বাসনে নিজের ভাত মাখিয়ে নেয়। ঢক্‌ঢক্‌ করে হাঁড়িয়া খেয়ে ভৈরবীকে বুকে জড়িয়ে ঘুমোয় ধনশ্রী। কিন্তু ঘুম আসে না ভৈরবীর। ধনশ্রীর বুকের উত্তাপও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অন্ধকারে চোখ মেলে কান পেতে থাকে। যদি কোনো সুকণ্ঠী পাখির ডাক শোনা যায়। সেই শৈশবের স্মৃতির মতো। হঠাৎ মনে হয় তপতী কেন ভালো মেয়ে হয় না। না, জীবনকে জটিল করে তোলার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। বিশেষ করে ধনশ্রীর মতো সহজ সরল লোকের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে। ভৈরবী ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। না, ওর কোনো দ্বিতীয় ভুবন নেই। ভৈরবী এক এবং অভিন্ন থাকতে চায়।

শিল্পিত প্রসাধন নিয়ে রাতের এক প্রহর পার করে দেয় শবরী। কাহ্নুপাদ আসে না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় শিথিল গুঞ্জামালা, ময়ূর পালক। একসময় সব কিছু টান দিয়ে কুটিকুটি করে ফেলে ও। লক্ষ্মীবিলাস শাড়ি মেঝেতে গড়ায়। কত যত্ন করে পরেছিলো। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চন্দনের ফোঁটায় নিজেকে সাজিয়েছিলো। পায়ের পাতা থেকে শুরু করে মেজাজটা রাগতে রাগতে ক্রমাগত ওপরের দিকে ওঠে। ইচ্ছে করেই পায়ে আজ নূপুর পরেনি শবরী। মনে করেছিলো কাহ্নুপাদের কাছে আজকের অভিসার হবে শব্দহীন। শব্দের একটা চমক আছে। মনের মধ্যে ময়ূরনৃত্যের আমেজ আনে। শব্দের আবেদন চতুর নাগরালির মতো। শব্দহীন হলে কেমন লাগে সেটাই আজ অনুভব করতে চেয়েছিলো ও। সারাদিনের আয়োজন যেন ব্যঙ্গ করছে শবরীকে। রাত্রি দু'প্রহরও শেষ হয়। তবু আসেনা কাহ্নুপাদ। শবরীর বিবাহিত জীবনে এমন আর কোনোদিন হয়নি। সারাদিন যেখানেই থাকুকনা কেন সন্ধ্যার সময় ঠিকঠিক ঘরে আসে। কেবল রাজসভায় গীত পড়ার দিন ফেরেনি। বলেছিলো, সারারাত মাঠে শুয়েছিলো। মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো দেখে ঘরে ফেরেনি। সেটাই বিশ্বাস করেছিলো শবরী। কিন্তু আজ কি হলো? আজ কেন ঘরে ফিরলোনা কানু? চাঁচরবেড়ার আগল বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। ধাতুর খাটে একা। লক্ষ্মীবিলাস শাড়ি শবরীর যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়। বাইরে প্রবল হাওয়া এদিক ওদিক ছোটে। চাঁচরবেড়ার সঙ্গে তার শর্তহীন ইয়ার্কি।

শেষ রাতের কিছু আগে ফিরে আসে কাহ্নুপাদ।

শবরী আজ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে নেই। টিলার গায়ে হাঁড়িয়ার গন্ধ নেই। কিছুতেই আগল খোলে না শবরী। এমনটি হবে জানা ছিলো কাহ্নুপাদের। এখন সাধ্যসাধনা করে শবরীর মান ভাঙতে হবে। দেবকীর ঘরে আজ অনেক মদ খেয়েছে কাহ্নুপাদ। নেশায় বুঁদ হয়েছিলো, ভাগ্য আজ ওর অনুকূলে কাজ করেছে। রামক্রী ছিলো না বলে দেবকী যত্ন করেছে অনেক। রামক্রী পাঁচ ক্রোশ দূরে মামার বাড়িতে গিয়েছে। দরজার ওপর সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলো দেবকী। ঘরে কাহ্নুপাদ একা খদ্দের। কাহ্নুপাদের আকাঙ্ক্ষাকে আজ ও বাধা দেয়নি। কিন্তু সীমা টানা আছে দেবকীর। সে লাইনের এক পা এখানে আসতে দেয়না কাউকে। দোকানের সামনে গিয়ে ঘরে ফেরার সময় নিজেই ডেকেছিলো কাহ্নুপাদকে। হেসেছিলো অকারণ উচ্ছ্বাসে। ইঙ্গিতও ছিলো সে হাসিতে।

যাচ্ছো কোথায়?

যাবো আর কোন চুলোয়। ঘরে যাচ্ছি। তা ভরসন্ধ্যায় ডাকছো কেন?

বসবে নাকি?

অনুমতি দিলে ঘরে ফিরবে কোন শালা?

এসো।

দেবকীর হাসিতে বুকটা তোলপাড় করে উঠেছিলো। শবরীর কথা মনে ছিলো না ঠিক সে মুহূর্তে। তার পর দেবকী সাংকেতিক চিহ্নটা খুলে নিয়েছিলো দরজা থেকে।

ওকি? সন্ধ্যাতেই দোকান বন্ধ করে দিলে?

দেই যাতে কেউ বিরক্ত না করে।

তার মানে আজ আমি একলা?

কোনোদিন নাকি তোমার নেশা জমাতে পারি না, আজ নেশা জমিয়ে দেবো।

ভীষণ নেশা জমিয়েছিলো দেবকী। সব ভুলিয়ে দিয়েছিলো। শবরীর কথা কেমন করে ভুললো ও? গুঞ্জার মালা, ময়ূর পালক তো উপলক্ষ মাত্র। ভালোবাসাই। সব ভালোবাসাই তো সব সৌন্দর্যের দরজা খুলে দেয়। এ সত্য কাহ্নুপাদের চাইতে কে আর বেশি জানে। তবু কেন এমন হলো? শবরী বিমুখ হয়েছে এখন আর কোনো নেশা নেই কাহ্নুপাদের। অনুশোচনা হয়। মনে হয় দেবকী যাদু জানে। নিমেষে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। দেবকীর সঙ্গ উপলব্ধি করে কাহ্নুপাদের শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে। ও টিলা বেয়ে নামতে থাকে। শবরীর দরজা আজ বন্ধই থাক। চারপাশে তাকায় ও। রাত বেশি নেই। কাহ্নুপাদ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেয়। আর কোনো স্নায়ুর চাপ নেই। বেশ ঝরঝরে লাগছে। গান গাইতে ইচ্ছে করে কাহ্নুপাদের। কিন্তু কিছু মনে আসে না। কোথায় যাবে ও। একটাই জায়গা আছে তা হলো মল্লারীর ঘর। গোটা পল্লীই একটা সমুদ্র। তারমধ্যে মল্লারীর ঘর সবুজ দ্বীপ। অনবরত হাতছানি দেয় মৌতাত নারী হয়ে। মল্লারীর সামনে দাঁড়ালে মনের মধ্যে কোনো গ্লানি হয় না, কোনো অপরাধবোধও কাজ করে না। চাঁদের আলোয় পিপুল গাছের দীর্ঘ ছায়া মাটির বুকে চমৎকার আলপনা। কাহ্নুপাদ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

তক্ষুনি ডোম্বির ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। রাত আর বেশি বাকি নেই। দাঁড়াবে না ফিরে যাবে ভাবার ফাঁকে ডোম্বি বের হয় ঘর থেকে। ঘাড়ে গামছা। হাতে ঘড়া। কাহ্নুপাদ এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। চমকে ওঠে ডোম্বি। অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। চট্‌ করে নিজেকে সামলে নেয়।

তুমি? কি যে ভাগ্য আমার!

কোথায় যাচ্ছো?

একটা ডুব দিয়ে আসি। সারারাত যা গরম গেলো। একটুও ঘুমুতে পারিনি।

মিথ্যা বলতে গিয়ে বুক কেঁপে ওঠে। কাহ্নুপাদের সামনে সত্যিকথা বলার সাহস নেই ডোম্বির। সঙ্গে সঙ্গে ও কাহ্নুপাদের পায়ের কাছে বসে পড়ে পায়ে ওর হাত রাখে।

তুমি রাগ কোরো না কানু। বামুনগুলোকে সবদিন ঢুকতে দেইনা। যেদিন কড়ি থাকে না উপোস করতে হয় সেদিন কেবল দেই। তুমি রাগ করেছো কানু?

কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না। শুধু ভালোবাসার কথায় ডোম্বির কি পেট ভরে? পেটের জন্যে ডোম্বিকে কড়ি জোগাড় করতে হয়। সারারাত না ঘুমিয়ে কড়ি জোগাড় করে ও। কাহ্নুপাদের মনটা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে।

আমার মনের মধ্যে একটা প্রতিশোধের আগুন কানু।

কাহ্নুপাদ চমকে ওঠে : মানে?

ওরা তোমাকে গীত পড়তে দেয়নি। আমাদেরকে বড্ড অপমান করে।

কি করবে?

সে, আমার মনে আছে।

মল্লারী। তোমার গলা কাঁপছে কেন?

ডোম্বি শব্দ করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

এত হাসি ভালো না।

বাব্বা। দাদাঠাকুরের মতো উপদেশ দিচ্ছো। তুমি আমার ঘরে বসো। আমি চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি।

না বসবোনা। বসতে ভালো লাগে না।

কি করবে?

আমার যদি অনেক কড়ি থাকতো মল্লারী—

তাহলে বুঝি পথে পথে ছিটিয়ে বেড়াতে?

না পথে নয়। ভালোবাসা বাঁচাতাম।

মাগো গীতের কথা হয়ে গেলো।

ডোম্বি আবার হাসতে আরম্ভ করে। কাহ্নুপাদ জোরে নিঃশ্বাস টানে। চাঁচরবেড়ার বাড়িগুলো অন্ধকার থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। আড়িমুড়ি ভাঙছে। ভোর হচ্ছে। কাহ্নুপাদের মনে হয় সমস্ত পরিবেশ থেকে একটা দাপুরদুপুর শব্দ ছিটকে বেরুচ্ছে।

চলো, আমিও নদীর দিকে যাই মল্লারী।

তাই চলো।

দু'জনে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।

আমাদের সাধ্যমতো সাধ মেটেনা কেন কানু?

আদায় করতে পারি না বলে।

ঠিক বলেছো। কেবল পিছু হটি বলেই তো ঠকে যাই।

আচ্ছা মল্লারী, তোমার ঘর বাঁধতে সাধ হয় না?

না। কেন?

একবার তো দেখলাম সাধটা কেমন? এইতো ভালো আছি। হাতে পায়ে বেড়ি নেই। তাছাড়া—

ডোম্বি কথা শেষ না করে আবার হাসে।

তাছাড়া কি?

ঘর বাঁধলে কি তোমাকে পেতাম?

আমাকে না পেলেই বা কি?

তোমাকে পাওয়া ভাগ্য।

ডোম্বি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসি যেন থামতে চায় না। উফ্! হাসি যেন ভাসিয়ে নেবে!

ডোম্বি হাসতে হাসতে নদীর জলে নামে। তখন কাক-ভোর। কেউ কোথাও নেই। শান্ত নদী থিরথির। দূরের বনের মাথায় আলোর পটপটি। অন্ধকার ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে। ডোম্বি সাঁতরে অনেক দূরে যায়। আবার ফিরে আসে। ডুব দিয়ে কোথায় গিয়ে যে ওঠে, হদিস করা মুশকিল। কাহ্নুপাদের মনে হয় মল্লারীর সঙ্গে জলের একটা সখীভাব আছে। ও যেখানেই যাচ্ছে জলের বুকে সে সখ্য ছল্‌কে উঠছে। অন্য কেউ হলে জল বুঝি এত অত্যাচার সইতো না। ইচ্ছেমতো জল আছড়ে-পিছড়ে তছনছিয়ে ডাঙায় ওঠে ডোম্বি। কাহ্নুপাদের কাছ থেকে ইশারায় বিদায় নিয়ে ভিজে শরীরে ছপছপিয়ে চলে যায়। যতদূর দেখা যায় চেয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। বুকের লটাবনে তখন দারুণ ঝড়।

একা একা ঘাটে বসে থাকে ও। দু'একজন করে লোক আসা-যাওয়া করছে। কাক-ভোরের নদী যেন সুগন্ধময়। কাহ্নুপাদের মনে হয় সত্যি বুঝি নদীর গা থেকে গন্ধ আসছে। প্রাণভরে শ্বাস নিলে ফুসফুসে ভিজে শরীরের ছপ্‌ছপ্ শব্দ হয়। নদীটাকে যদি বুকের মধ্যে পুরে রাখা যেতো তাহলে বেশ হতো। তখন শবরীর কথা মনে হয়। এতক্ষণে শবরীর ঘুম ভেঙেছে। ময়ূরের গলা জড়িয়ে ধরেছে। না, হয়তো ধাতুর খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কাল রাতে শবরী ওকে ঘরে নেয়নি। ও রাগ করেছে। রাগে শরীরকে কষ্ট দিয়েছে শবরী। কাহ্নুপাদ এক মায়াবীর আশ্রয়ে দুঃখ ভুলতে চেয়েছিলো। বানোয়াট দুঃখ। আসলে নিজেকে টুকরো টুকরো করে দেখা। সে টুকরো থেকে বেরোয় পবিত্র সাদা ফুল। কাহ্নুপাদ যাকে অস্তিত্বের অংশ মনে করে। না, সব সময় সেটাও খুব প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। জীবনের আরো অনেক জটিল ও গভীর ব্যাপার-স্যাপার আছে। তা কখনো হরিণ-পোড়া আগুন হয়ে প্রবল বাতাসে শন্‌শন্ করে। তখন নিজেকে ঠিক রাখতে শক্তি খরচ হয়। এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছে করছে নদী পেরিয়ে দূরে কোথাও যেতে। কিন্তু ঘাটে পারাপারের কেউ নেই। বারুয়া মাঝিও না। কাজেই আরো কিছুক্ষণ বসতে হবে। তখুনি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ছুটকি আসে। ছুটকির চেহারায় দেবকীর ছাঁট আছে। দেবকীর মতো ওর আদলেও ভীষণ টান। দেখলে কাছে বসিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে।

কাকু তুমি বুঝি সারারাত ঘুমোওনি?

কেন রে?

নইলে এত ভোরে এখানে কেন?

আসতে নেই বুঝি?

আমি চাইনা আমার আগে কেউ আসুক।

কেন?

কাহ্নুপাদ ভীষণ অবাক হয়।

আমার ইচ্ছে, আমি সবার আগে এই ঘাসের ওপর পা রাখব। আর কেউ মাড়িয়ে গেলে খুব খারাপ লাগে।

সেজন্যে বুঝি এত ভোরে বেরিয়েছিস?

ঠিক বলেছো।

মা বকে না?

মা টেরই পায় না! অনেক রাত পর্যন্ত মদ বেচে মা সকালে উঠতে পারে না। সেজন্যেই তো আমার এত মজা। জানো কাকু, আমার মদ বেচতে একটুও ভালোলাগে না।

কি করতে ইচ্ছে করে?

কেবল ঘুরে বেড়াতে। বড় হলে আমি ঘরে থাকবো না। পথে পথে ঘুরে বেড়াবো। আচ্ছা কাকু, এই রাস্তাটা কত দূরে গেছে?

কত দূর? অনেক দূর।

দূর ছাই! অনেক দূর তো আমিও জানি। কত দূর বলো না?

চোখ বুঁজে চিন্তা করে নে। যত দূর তোর মন চায় তত দূর।

তুমি কিছু জানো না। কতজনকে জিজ্ঞেস করি কেউ বলতে পারে না। কেউ কিছু জানে না।

বড় হলে তুই কি হবি ছুটকি?

কিচ্ছু হবো না। হাড়ের মালা পরে গান গাইবো আর সারা দেশে ঘুরে বেড়াবো। ভালো হবে না?

খুব ভালো হবে। তুই অনেক বড় হবি।

যাই ঘুরে আসি। মা আবার উঠে আমাকে খুঁজবে।

ছুটকি বড় শিমুল গাছটার আড়ালে চলে যায়।

হয়তো এখুনি ছুটবে ঐ দূরের টিলার দিকে। কাহ্নুপাদ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভেতর এক বিশাল পৃথিবী গড়ে তুলেছে ছুটকি। সে পৃথিবীর কোনো সীমানা নেই। একটু পরে ছুটকি সত্যি সত্যি ছুটতে থাকে। ছোট্ট শরীরটা অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়। টিলার আড়ালে ওকে আর দেখা যায় না। কাহ্নুপাদ আর বসে থাকতে পারে না। বারুয়া মাঝি ঘাটে এসেছে। নদী পার হয়ে চলে আসে কাহ্নুপাদ। গ্রামের দিকে হাঁটতে থাকে। গাছের ছায়া মন্দ লাগে না। হঠাৎ করে গত রাতের কথা মনে হয়। শবরীর ওপর বুনো রাগটা একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। একগাদা পাখির বিচিত্র শব্দ, মাটির সোঁদালো গন্ধ, ঝোপঝাপের ওঁৎ-পাতা ভঙ্গি দেখতে দেখতে কাহ্নুপাদ মায়াহরিণের ছোট্ট বাচ্চা আবিষ্কার করে। কাহ্নুপাদকে একটুও ভয় পায়না। ঝোপের কাছে একটা দু'টো লাফ দেয়। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাহ্নুপাদও দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন দু'জনের মধ্যে মজার খেলা জমে উঠেছে। সেই অবাক-করা চোখের ওপর চোখ পেতে রাখে কাহ্নুপাদ। মনের মধ্যে দারুণ হুটোপুটি। যদি ধরতে পারতো। নিয়ে গিয়ে পুষতো। না, তা হতো না। রাজার আইনে ওরা কেউ হরিণ পুষতে পারে না। টের পেলে কেড়ে নিয়ে যায়। আর তখুনি বাচ্চাটা মায়ের ডাক শুনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে যায়। কাহ্নুপাদ বিশাল কড়ুই গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। হলুদ পাপড়ি ঝরে পড়ে টুপটাপ। একটু দূরে অনেক ময়ূরপালক ছড়িয়ে থাকে। একটা নিয়ে গালে বুলোয় ও। শবরী প্রায়ই ময়ূরপালক খুঁজতে বনে আসে। গুঞ্জার ফুল নিয়ে যায়। দ্বিতার বীচি সংগ্রহ করে মালা গাঁথে। শবরী কি এখন আসবে? বনের ছায়ার নষ্ট বাতাসে ঘুম আসে কাহ্নুপাদের।

বারুয়া মাঝির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে কাহ্নুপাদকে খুঁজতে বেরোয় শবরী। শরীরের কোথাও শিল্পিত পরিচর্যা নেই। খোঁপায় শুকনো ফুলের মালা। পায়ে বাসি আলতা। চন্দনের গন্ধ নেই কোথাও। রাতজাগা চোখে ক্লান্তি। কেমন বিবর্ণ দেখায় শবরীকে। গত রাতে কানুকে দরোজা না খোলার জন্যে এখন প্রচণ্ড অনুতাপে। রাগ পড়ে যাবার পর কেবলই ভোরের প্রতীক্ষা করেছে। কখনো কানুর উপর এত দীর্ঘ রাগ ও করেনি। তাই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে কানুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, মান ভাঙো কানু। আমি আর রাগ করবো না। নৌকায় বসে পানিতে পা ডুবিয়ে রাখে ও। চোখে মুখে জ্বালা। আঁচল ভরে জলের ছিটা দেয়। কিছুই ভালো লাগে না। কানুর ওপরও অভিমান হয়। কানুও তো অপেক্ষা করতে পারতো? তা না করে সর্ সর্ করে নেমে চলে এলো। এখন কোথায় কে জানে?

বনে বনে ঘোরে শবরী। সুন্দর ময়ূরপালক পেলে আঁচলে জমিয়ে রাখে। একগুচ্ছ গুঞ্জার ফুলও নিয়েছে। এখন ইচ্ছে করছে সবকিছু ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলতে। অহেতুক বোঝা যেন। কানুকে না পেলে এ সবেই বা কি হবে? খোঁপা খুলে গেলে শুকনো ফুল ঝরে যায়। এলোমেলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকে। অর্জুনের বীচি নরম পায়ে শক্ত ঠেকে। কখনো ব্যথা পায়। অন্যমনস্ক হয়ে যায় শবরী। বন আজ আর ভালো লাগে না। ঝোপঝাড় কেটে বনটা উদোম মাঠ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। অন্যমনস্কতায় খেয়াল করেনি যে, দেশাখ ওর থেকে খানিকটা দূরে তীরধনুক তাক্ করে বসে আছে। লক্ষ্য ওর দিকে। মুখ মিটিমিটি হাসি। হঠাৎ করে চমকে চেঁচিয়ে ওঠে শবরী।

কি করছো?

শিকার করছি।

কি?

বনে কেমন সুন্দর মায়াহরিণ এসেছে। আগে কখনো দেখিনি এমন জন্তু।

শিকার করতে পারবে?

খু-উ-ব।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শবরী।

ওঠো, ওঠো, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। শিকার তো ধরে নিয়ে খাঁচায় পুরছো। আর কত?

একটায় কিছু হয় না বৌদি? দেবে অনুমতি?

ইয়ার্কি হচ্ছে?

দেশাখ শবরীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

তোমাকে যখন দেখেছি বৌদি আজ নিশ্চয় ভালো একটা কিছু মারতে পারবো।

উল্টোটাও তো হতে পারে? আজ তুমি কিছু না-ও পেতে পারো? দেশাখ শবরীর মুখ চেপে ধরে।

অলুক্ষণে কথা বোলো না। ঐসব কথা সইতে পারি না। যদি কিছু না পাই তাহোলে গুষ্টিশুদ্ধু উপোস।

নাও বাপু, কথা ফিরিয়ে নিলাম। উপোসে কাজ নেই। আজ যেন শিকারের বোঝায় বাড়ি ফিরতে কষ্ট হয়।

হ্যাঁ, এই তো। এমন করেই বলবে।

এই সাতসকালে কেন এসেছি জিজ্ঞেস করলে না তো?

তুমি যা খুশি তা করতে আসো আমার কি? চলো। তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো।

না, আমার শখ নেই।

চলো না, ঠকবে না।

দেশাখ শবরীর হাত ধরে নিয়ে যায়। কাঁটাঝোপে শবরীর হাত কাটে!

নাহ্ তোমার সঙ্গে পারবোনা। এবার ছাড়ো। যথেষ্ট হয়েছে।

দেশাখ কথা বলে না। গম্ভীর মুখে হাঁটে। ওর হাতে তীরধনুক। পিঠে পাখিধরার ফাঁদ। শবরীকে একটা ঝোপের দিকে ঠেলে দেয়।

ঐ ঝোপের আড়ালে গিয়ে দেখো বৌদি? বুঝবে দেওরটা কেমন কাজের হয়েছে। আমি চললাম।

এতক্ষণে শবরী সব বুঝতে পারে। নিশ্চয় কানু আছে ওখানে। এ কথাটা একবারও মনে হয়নি। ভেবেছিলো দেশাখ হয়তো কোনো ফাঁদে-পড়া পাখি দেখাবে। ঝোপের আড়ালে দু'পা গিয়ে থমকে দাঁড়ায় শবরী। কড়ুই গাছের বিরাট ছায়ায় চিৎপাত শুয়ে ঘুমোচ্ছে কাহ্নুপাদ। হাতের মুঠোয় ময়ূরপালক। সব গ্লানি ঘুচে গেলো শবরীর। ঐ ময়ূরপালক ক'টাই শবরীর জন্যে ভালোবাসা। ঘুমন্ত কাহ্নুপাদকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। নতুন মানুষ। শবরীর নতুন ভালোবাসায় স্নিগ্ধ। কাহ্নুপাদের রচিত গীত কি ঐ ঘুমন্ত প্রশান্তির চেয়ে সুন্দর? কি নির্বিবাদ। দ্বিধাহীন। শবরী হাঁটুমুড়ে কাহ্নুপাদের পাশে বসে। ঘুম ভাঙায়না। থাক ঘুমোক ও। ঘুম ভাঙার পর শবরীকে দেখলে হাত বাড়িয়ে যে দৃষ্টিতে ছুঁয়ে দেখবে সেটা ভাবতে শবরীর বুকটা কেঁপে ওঠে। আর এজন্যেই কাহ্নুপাদ ওর কাছে প্রতিদিনের হয়েও নতুন।

তখুনি ও চুলের গোছা গুছিয়ে ময়ূরপালক গুঁজে দেয়। ঘাসের লম্বা ডাঁটার গুঞ্জার মালা গাঁথে। বাতাসে বারবার এলোমেলো হয় চুল। কড়ুইয়ের হলুদ ফুলের পাপড়ি উড়ে উড়ে আসে। শবরী একদৃষ্টে কাহ্নুপাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। যেন ওর সঙ্গে শবরীর আজই প্রথম জানাজানি।

৮

কার্তিক মাসের হিমঝরা শুরু হয়েছে। ভোরের কুয়াশা নদীর শরীর লেপ্টে রাখে। ঘাটে আসতে বেলা হয়ে যায় ডোম্বির। নইলে নাকে-কানে হিমের পিন্‌পিনে প্রবেশ একদম বাজে। সইতে পারে না ও। বারুয়া মাঝি তো সূর্য ওঠার পরও কানমাথা চাদরে মুড়ে রাখে। ডোম্বি মনে মনে নদীকে গাল দেয়। তবুও মাসটা ডোম্বির ভীষণ পছন্দ। পছন্দ এ মাসের সুখরাত্রিব্রত উৎসব। গাঁয়ের সকলের প্রিয় উৎসব। ভোরে বাড়ি-বাড়ি অতিথি অর্চনা হয়। কপালে চন্দনের ফোঁটা, একটি সুগন্ধী ফুল আর হাতের তালুতে দই। এ দিয়ে সবাইকে বরণ করা হয়। এর আগের দিন সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে সকলের নিমন্ত্রণ থাকে। খাওয়ার আগে পায় কর্পুর-মেশানো সুগন্ধী জল। খাওয়ার শেষে মশলাযুক্ত পানের খিলি। কামিনী ধানের ভাতের সঙ্গে দই আর রাই সরিষার তৈরি ভীষণ ঝাল দেয়া ছাগলের মাংস। খাবার জন্যে সারা বছর সকলের যেন প্রতীক্ষা থাকে। যত ইচ্ছে পেট পুরে খাওয়া যায়। সন্ধ্যে হতেই দলে দলে বেরিয়ে যায় নারী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ে। এক দল খেয়ে এলে আর এক দল যায়। এই

একটা দিন ডোম্বি বিনে কড়িতে সবাইকে পার করে। অন্য সব উৎসবের চাইতে এটা যে ওর কেন এত প্রিয় তাও জানে না। এমন কি চোত মাসের কাম-উৎসবও এত ভালো লাগে না। নাচ-গান-বাদ্যে গাঁ মুখরিত হয়। এ উৎসবের বড় আকর্ষণ চন্দনের ফোঁটা, সুগন্ধী ফুল আর হাতের তালুর দই। গত বছর কানুকে একটি চমৎকার চুমকুড়ি দিয়েছিলো। তাছাড়া কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতে কি যে আরাম। মনে হয় সবকিছু এক অন্যরকম নদী হয়ে বইছে। সে নদীর জলে আশ্চর্য গন্ধ। দিকবিদিক মাতিয়ে রাখে। ডোম্বি সে নদীতে একলা নৌকা বায়। কানু কূলে কূলে গুণ টানে। কেউ আর কোথাও নেই। কেবল ছপ্‌ছপ্ নৌকা বাওয়া আর গুণ টানা। হিম ঝরাতে ঝরাতে একদিন হুট করে দিনটা এসে যায়।

ভোর রাতে শবরীর ঘুম ভেঙে গেলে কানুকে জড়িয়ে ধরে। আগের দিন রাতে চন্দন ঘষে রেখেছে। দু'টো খুব সুন্দর হলুদ আর লাল মেশানো গুন্দা ফুল খুঁজে এনে কলাপাতায় করে শিশিরে রেখে দিয়েছে। দই বানিয়েছে।

কাহ্নুপাদ বুকের নিচে বালিশটা টানতে টানতে বলে, আজ সোহাগটা একটু বেশি মনে হচ্ছে?

কেন কখনো কি কম দেখেছো?

হুঁ, অনেক দেখেছি। কখনো কমতে কমতে এতই কমে যায় যে—শবরী মুখ চেপে ধরে—

দেখো, মিছে কথা বোলো না।

মিছে বুঝি?

তা নয়তো কি?

ঠিক আছে, মিছে না হলে আজকে আরো কিছু হোক।

হুঁ। এজন্যেই ভনিতা।

কাহ্নুপাদ মিটমিটিয়ে হাসে। বুকের নিচ থেকে বালিশটা সরিয়ে দেয়। শবরীর ঘন কালো একরাশ চুল বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে। ধাতুর খাটে দু'জন মানুষ শান্ত হয়ে যাবার আগে ভাবে, কানুটা সাংঘাতিক। ছটোপুটিতে ওস্তাদ। শবরী ভীষণ ভালো। সব ব্যাপারগুলো ও নিখুঁত বোঝে। রাজা ওকে রাজদরবারটা সাজিয়ে তোলার কাজ দিলে পারতো। ভোরের আঁধার ছুটতে-না-ছুটতে পটহ মাদল বেজে ওঠে। দ্রিম দ্রিম। যেন ঘোষণায় মুখরিত, আজ সুখরাত্রি ব্রত। পুরোবাসী উঠো। জাগো। দু'দিন কোনো কাজ নেই। কেবল নাচ, গান, হল্লা। রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল ছুটে আসে। উদ্দাম নাচে ডোম্বি। ও আজ ঘাটে যাবে না। নৌকা বাইবে না। জায়গায় জায়গায় নাচবে। ধাতুর খাটে শুয়ে থেকে কাহ্নুপাদ ভাবে, ডোম্বি দিনভর নাচে বলেই সুখরাত্রি ব্রত আকাঙ্খিত। শবরী ভাবে, কানু সারা দিন ঘরে থাকে বলেই সুখরাত্রি ব্রত সুন্দর। আজ কানুর সারা গায়ে চন্দন লেপে দেবো। নাচের মাঝে মাঝে ডোম্বির মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কাল ভোর ছাড়া কানুর কপালে চন্দন দেয়া যাবে না। বাজনার শব্দে সকলে পথে নেমে আসে। ডোম্বির নাচের ফাঁকে ছোট ছেলেমেয়েরা গান গায়। গাইতে গাইতে পথে চলে। দেশাখের চঞ্চল চোখ বিশাখাকে খোঁজে। আজ বিশাখাকে নিয়ে দূরের পাহাড়ে যাবে। আজ কোনো কিছুতে মানা নেই। তীরধনুকে বিশাখার হাত বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে দেশাখ নিজেও ভাবেনি। বিশাখার আজ ঘুঘু মারার পরীক্ষা। কিন্তু ওকে কোথাও খুঁজে পায় না। ওকি এখনো ঘর থেকে নামেনি? গত বছর দু'জনে সন্ধ্যায় বাজি ধরেছিলো। কে আগে নামতে পারে। বিশাখার সঙ্গে দেশাখ কোনোদিন পারেনি। তখন ও রেগে যেতো,

তুমি কি রাতে ঘুমোওনা?

ঘুমোই। কিন্তু ঠিক সময়ে আমার ঘুম ভাঙে। আমি মন্ত্র পড়ে ঘুমোই।

কচু।

দেশাখ ভেংচি কাটে। বিশাখা খিলখিল শব্দে হাসে।

রাগলে তোমাকে ভালো দেখায়।

দেশাখ বিশাখার চুল টেনে ধরে।

উঃ! ছাড়ো।

আগে বলো সামনের বার আমার আগে আসবে না?

ঠিক আছে। আসবো না।

কিন্তু বিশাখা কোনোবার সেকথা মনে রাখেনি। প্রত্যেকবার আগে এসে হাজির হতো। কিন্তু আজ কি হলো? এখন অবশ্য ও আগের মতো চঞ্চল নেই। অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। শরীর ভারী হয়েছে। মুখ চোখে বুনো কচ্‌কচি। দেখলে আবেগ উথ্‌লে ওঠে। দেশাখ তখন দলছুট হয়ে বিশাখার বাড়ির দিকে যায়। কার্তিকের এই হিমেল ভোরের সুখব্রত রাত্রির উৎসবে ওর মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। জীবনের অনেক গোঁজামিল এখন ওঁকে ভাবায়। কিন্তু প্রতিকার দেখেনা বলে অহরহ মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। বিশাখাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয় না। মাঝপথে ওর সঙ্গে দেখা হয়। বিশাখা ছুটতে ছুটতে আসে।

আজ তুমি জিতে গেছো।

বিশাখা তড়বড়িয়ে কথা বলে। দেশাখকে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে যাবার ফলে কিছুটা বিহ্বল। দেশাখ এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ঘুম থেকে উঠে আসার দরুন আশ্চর্য সতেজ। কোনো বিষণ্ণতা যেন ওর পবিত্রতা নষ্ট করেনি।

তোমার আজ দেরি কেন বিশাখা?

কাল রাতে বাবার অসুখ ভীষণ বেড়ে গিয়েছিলো। আমি, মা কেউই ঘুমোইনি। ভোর রাতে একটু শুয়েছিলাম। তাই ঘুম ভাঙেনি।

বাবা এখন কেমন?

ভালো। মা বললেন আমাকে উৎসবে যেতে। উঃ, তোমাকে এখানে না পেলে আমার যে কি খারাপ লাগতো!

দেখলে তো! তোমার মনের কথা আমি সব টের পাই। চলো। ওমা, উল্টো দিকে যাচ্ছো যে?

না ওদের সঙ্গে আমরা থাকবো না। তুমি আর আমি সারাদিন একসঙ্গে কাটাবো।

সত্যি খুব মজা হবে।

দু'জনে হাত ধরে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে থাকে।

দেশাখ, তোমাকে না পেলে আমার দিনগুলো অন্যরকম হতো?

কেমন?

আমি তা জানি না। বোধ হয় খারাপ। জানো মাঝে মাঝে মনে হয় আমার জন্যে কোথাও কোনো আনন্দ নেই।

থাক। এসব কথা ভাবতে নেই।

শুধু তোমার কাছে এলে সবকিছু অন্যরকম হয়ে যায়।

দেখো বিশাখা আমরা অনেকদূর চলে এসেছি?

সত্যি তো পটহ মাদলের শব্দ আর নেই।

তোমার ভালো লাগছে না?

হ্যাঁ।

চলো দৌড়াই?

না, আস্তে আস্তে যাবো। দৌড়ালে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

তবে থাক।

আজ আমরা কি করবো দেশাখ?

খেলবো।

কি খেলা।

মিছেমিছি খেলা?

দেশাখের মনে হয় বিশাখার শরীরে নতুন ঘাসের গন্ধ ভোঁ ভোঁ দৌড়াচ্ছে। একটু পর ওরা একটা বড় টিলার আড়ালে চলে যাবে, আর সেখানে গেলেই সবকিছু থেকে আড়াল হয়ে যাবে ওরা। তখন বিশাখার শরীরের ভোঁ ভোঁ করা গন্ধটাকে দেশাখ ধরে ফেলতে পারবে।

পটহ মাদলের ঝংকারে ডোম্বির উদ্দাম নৃত্য সমগ্র পল্লী মাতিয়ে তোলে। কেউ আর ঘরে নেই, সবাই পথে নেমে এসেছে। যার যা ইচ্ছে মতো হাসছে, গাইছে, নাচছে। ফুর্তির শেষ নেই। কারো ঘরেই আজ রান্না হবে না। ফলমূল, বাসি খাবার; সামান্য কিছু খেয়ে দুপুর কাটিয়ে দেবে। তারপর বিকেল পড়লেই ছুটবে রাজবাড়ির দিকে। কাহ্নপাদ অবাক হয়ে দেখছে ডোম্বির প্রাণশক্তি। একটুও ক্লান্তি নেই। যেখানে সেখানে নেচেই চলেছে। শবরী কোথায় যেন বেরিয়েছে। কাহ্নপাদ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে চলে আসে। পাখির পালকের কলমটা বেড়া থেকে নামিয়ে লিখতে বসে। মনে হয় লেখার জন্যে মনের ভেতর অনুকূল পরিবেশ। ডোম্বির উদ্দাম নাচের ছন্দের মতো পংক্তি আসছে।

ভবনির্মাণে পড়হ-মাদলা। মন বপন বেণি করণ্ডকশালা।

জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ। কানে ডোম্বি-বিবাহে চলিআ।।

এ পংক্তিটা লিখে হেসে ফেলে কাহ্নপাদ। মনের বিচিত্র আনাগোনায় কখনো মুগ্ধ হয়, কখনো শঙ্কিত। কলম ছেড়ে ঘরে পায়চারী করে। বাজনা খুব মৃদু শব্দে আসছে শবরী যে কোথায় গেলো? জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুক্কুরীপাদ এখানে ওখানে কি করছে? ইদানীং লুইপা আর বিরুআ বেশ ভালো গীত লিখছে। ওদের কয়েকটা গীত কাহ্নুপাদ দেখেছে। ভেতরের আবেগটা মুহূর্তে আবার চনচনিয়ে ওঠে। ও আবার হরিণের চামড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

ডোম্বি বিবহিআ আহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আনতু ধাম।।
অহনিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জৈইনিজালে রঅনি পোহাঅ।।

পংক্তিগুলো গুণগুণিয়ে গায় কাহ্নুপাদ। সুরটা ঠিক করে। ভেবে পায় না কি করে লিখে ফেললো যে, ডোম্বিকে বিয়ে করে পুনর্জন্ম হলো। হ্যাঁ, আর এক জন্মে ও ওকে চাইবে। ওকে ছাড়া জীবন সফল হবে না। যার এতো দুর্বার আকর্ষণ তাকে উপেক্ষা করা সহজ না। শেষের পংক্তি দু'টোর জন্য ওকে আর ভাবতে হয় না।

ডোম্বিএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খনহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো।

ডোম্বির সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত হয়, ক্ষণমাত্রও সে সেই ডোম্বিকে ছাড়ে না। পুরো গীতটা লেখার পর শরীরটা কেমন অবশ লাগে। উঠতে ইচ্ছে করে না। হরিণের চামড়ার ওপর টানটান হয়ে থাকে। মনে হয় বুকের নিচ দিয়ে ভীষণ শীতল এক জলের রেখা গড়িয়ে যাচ্ছে।

কার্তিকের দুপুর কবুতরের বুক হয়ে উম ছড়ায়। গায়ের কুটোকুটো ঝেড়ে উঠে বসে বিশাখা। অর্জুন গাছের কালো গোটাগুলো সবখানে ছড়িয়ে আছে। দেশাখ অনেকগুলো জড়ো করেছিলো। এখন একটু দু'টো করে এদিক ওদিক ছুঁড়ে মারে। কনুইতে ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে ও। বিশাখা নখ দিয়ে মাটি খোঁটে। আনত দৃষ্টিতে ঘাসের বেগুনী ফুলের স্নিগ্ধতা। সংসার মানেই কেবল বাবার অসুখ নয়। এ বোধ থেকে ছাড়া পাবার দরুন ওর দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, বুকের ওঠানামা আমূল পাল্টে যায়। অকারণে দেশাখের চুল ধরে টানে।

আমি আর এখান থেকে বাড়ি ফিরবো না।

ইস্! এ যেন আমার রাজ্য? যেমন খুশি তেমন চাইলেই হলো আর কি!

দেশাখ কপট ভেংচিতে বিশাখার পায়ের আঙুল ধরে নাড়া দেয়।

এটা যদি আমাদের বাড়ি হতো?

আবার মিছে ভাবনা।

ভাবতে দোষ কি।

কষ্ট বাড়ে। মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দেয়া হয়।

আমরা কেন নিজেদের ইচ্ছেমতো থাকতে পারি না? রাজার আইন কেবল আমাদের পিছু পিছু ছোটে।

তখুনি দেশাখের বুকটা মড়মড় শব্দে উল্টে পাল্টে যায়। ওর একটা স্বপ্ন আছে। সেজন্যে ও তৈরি হচ্ছে। প্রতীক, মিহির, খিত্তি, বিগিন, অরুণকে ধনুক ছোঁড়া শেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে আরো বাড়বে। বাড়তে বাড়তে

হাজার হবে। তখন ও ডাক দেবে। ভয়ানক একটা ডাক। সে হাঁকে মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে ছুটবে ওর পিছু পিছু। সকলে জানবে লক্ষ্যটা কোথায়। লক্ষ্যটা কি। বিশাখা থাকবে ওর পাশে। বিশাখা চমৎকার শিখেছে।

এ্যাই? কি ভাবছো?

বিশাখা ওকে নাড়া দেয়। ও ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। ফূর্তির ঝম্‌ঝমে চলায় আশেপাশে দৃষ্টি নেই।

বিশাখা?

দেশাখ গম্ভীর হয়ে ডাকে।

কি বলো?

ধরো, এই বনটা আমাদের রাজ্য। গাছপালা, পশুপাখি সব প্রজা। তুমি আমার রাণী।

বিশাখা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

হাসছো যে?

বারে আমি তো রাণীই। এটা আবার বলতে হবে নাকি?

ওহ্‌! খুব বিশ্বাস। যদি না করি?

তোমার মুণ্ডু কাটা যাবে।

সত্যি পারবে?

দেশাখ ওকে কাছে টানে।

আমার ওপর তোমার এমন জোর যেন সবসময় থাকে বিশাখা। কিন্তু রাজা রাণী এসব আমার একটুও ভালো লাগে না। তুমি রাজা অন্য কাউকে বানিয়ে দিও। তুমি আমি যেমন আছি তেমন থাকবো। বনে বনে ঘুরবো আর পাখি ধরবো। যেমন খুশি তেমন। কেউ শাসন করতে আসবে না।

দেশাখ কথা বলে না। ঘাসের ডগা চিবুতে থাকে।

কি পছন্দ হলো না?

বনে বনে ঘুরলেই চলবে না। প্রজাদের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝলে রাণী?

দেশাখ ঘাসের ডগা ছুঁড়ে ফেলে। সূর্যের খরখরে তেজ অর্জুন গাছের মাথায়। বনটা নিথর। এতদূরে পটহ মাদলের শব্দ নেই। স্বপ্ন দেখতে দেখতে দেশাখ এক বিশাল প্রান্তরে এসে যায়। বিশাখা আর কোথাও নেই। সেই প্রান্তরের বুকের ওপর একশো একটা ঘোড়া দৌড়ে যায়। নড়ে উঠে আবার শান্ত হয় বিশাখা। মনে মনে প্রার্থনা করে অর্জুন গাছের ছায়াটা রাতের আঁধার হোক। ডালপালা চাঁচরবেড়ার ঘর। কিন্তু বেশি ভাবতে পারে না। দেশাখ ওকে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নেয়। সময়ের গতি ওরা রুখতে পারে না। দুপুর গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেল হয়। ওদের মনের ইচ্ছে, দুপুরটা একটু থামলে পারতো।

দুপুরের পর থেকেই ডোম্বি নৌকা নিয়ে বসে। আজ আর কোনো পারাপার নয়। সবার যাত্রা একদিকে। ছোটরা বেশি খুশি। লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকায় ওঠে।

মাসী আজ আর আমাদে মানা করতে পারবে না?

ডোম্বি হাসে। অনেকদিন কাউকে নৌকায় ওঠায় না। কেউ এলে ভাগিয়ে দেয়। নইলে ওরা বড্ড জ্বালাতন করে। ডোম্বি লক্ষ্য করে সকলের চোখেমুখে চক্‌চকে খুশি। সামান্য খেয়ে, না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে যাদের দিন কাটে তাদের জন্য এ উৎসব বিরাট আয়োজন। পারপার করতে করতে শেষ বিকেল হয়ে যায়। তাবু কানু আসে না। ডোম্বি কেমন অবসন্ন বোধ করে। তবে কি কানু যাবে না? পরক্ষণে খুশি হয়। হাত পা ছড়িয়ে নৌকার ওপর বসে পড়ে। কানু নিশ্চয় যাবে না। না যাওয়াই ভালো। যাদের হাতে এত অপমান একদিনের ঐ আর কি সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারে? তখুনি বিশাখাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ঘাটে আসে দেশাখ। না ও নিজেও যাবে না। বুকটায় চড়চড় আওয়াজ হয়। রাই সরিষা আর দইয়ে রাঁধা ছাগমাংসের আকর্ষণ গতবার পর্যন্ত ছিলো। এবার আর নেই। মনে করলেই শরীরে বমি ভাব হয়। ডোম্বিকে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে খুশি হয়। অন্তত কথা বলার লোক পাওয়া গেলো। জানে ঘরে ফিরে কাউকে পাবে না। সবাই এতক্ষণে চলে গেছে। বিশাখাও যাবার জন্যে ছটফট করছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশাখের যুক্তি মেনেছে। ও লাফিয়ে নৌকায় উঠে বসে। মৃদু ঢেউয়ে নৌকা এপাশ ওপাশ করে। ডোম্বি নিজেকে গুছিয়ে নেয়।

কাছি খুলবো?

না।

যাবে না।

না।

খাবে কি?

নদীর জল।

ডোম্বি খিল খিলিয়ে হাসে।

বাব্বা। কথাতো না, যেন একদম খট্‌খট্‌ শব্দ।

শুনলে প্রাণ জুড়ায়?

একদম না।

তাহলে আর কি? তাছাড়া তোমাকে খুশি করা কার সাধ্যি! এক কানুদা কেবল পারে।

অন্ধকারে ডোম্বির মুখে আলো ছলকে যায়।

কে বললো তোমাকে?

বলবে আবার কে? চোখে দেখলে সব বুঝি? বলো সত্যি কিনা?

অত কথা জানি না।

জানো সবই, বলবে না।

আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? দেখলাম না যে?

আমার কথা কি তোমার মনে হয়?

বারে হবে না কেন?

কি জানি বাপু, তোমার কি আর অন্যদিকে চোখ দেবার সময় আছে?

ডোম্বি উত্তর দেয় না। দেশাখের কথাগুলো মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে উপভোগ করে। দেশাখের কথাগুলো যদি সবদিক দিয়ে সত্য হতো যদি সামাজিক জীবনে শবরী না হয়ে মল্লারী হতো কাহ্নুপাদের সঙ্গী। না বেশি কিছু ভাবতে ভালো লাগে না। কষ্ট বাড়ে। একটা বাজে কষ্ট।

তুমি যাবে না কেন দেশাখ?

তুমি তো যাওনি?

তাই তো বলি অন্ধকারে কথা বলে কে? ঠিকই ভেবেছি যে তোমরা।

কানুদা তুমি? তুমি যাওনি?

কাহ্নুপাদ লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। দেশাখ সরবে বলে, তাহলে আমরা অনেকে যাইনি?

অনেক নয় দেশাখ। গুটিকয়েক।

সামনের সুখব্রত রাত্রিতে কেউ যাবে না কানুদা?

না গেলে রাজার লোক ধরে নিয়ে যাবে। নইলে যে দুঃস্থ খাওয়ানোর পুণ্য পাবে না রাজা।

কাহ্নুপাদ তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে ওঠে। কেউ আর কথা বলতে পারে না। দেশাখ জানে এটাই চরম কথা। না গেলে রাজার লোক বেঁধে নিয়ে যাবে। পুণ্য অর্জনের এমন মহান সুযোগ কিছুতেই ছাড়বে না। পাড়াটা আজ একদম সুনসান। কুকুরের ডাকও কোথাও নেই। ফিকে চাঁদের আলো চারদিকে। টুকরো টুকরো মেঘের ইতস্তত ভ্রমণ। বাতাস নেই। কেমন দমধরা গুমোট ভাব। কাহ্নুপাদ চিৎপাত শুয়ে পড়ে দেশাখের গা ঘেঁষে।

ঘরে ভালো লাগছিলো না তাই বেরিয়ে এলাম, ভাবিনি তোমাদের পাবো।

আমরা কেউ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করিনি তবু আমরা এক জায়গায় এসে গেলাম কি করে কানুদা?

লক্ষ্য যখন এক হয় তখন কেউ কাউকে ডাকে না দেশাখ। সবাই আপনা আপনি এসে জড়ো হয়।

হবে হয়তো।

দেশাখ সাহসী কণ্ঠে বলে। নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে দেয়। গুণগুণ করে গান গায় মল্লারী। তিনজনের কেউ আর কখনো কথা বলে না। অথচ ভাবনায় তিনজনের বুকটা মুহূর্তে মুহূর্তে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায়। কখনো ডোম্বির বুকটা কাহ্নুপাদের হয়, কখনো দেশাখের বুকটা ডোম্বির, কখনো কাহ্নুপাদের বুকটা দেশাখের। তিনজনের সচল আনাগোনায় তারা অনুধাবনের একই লক্ষ্যে ক্রমাগত ছুটতে থাকে। হঠাৎ করেই ডোম্বি কোমর থেকে একটা ছুরি টেনে বের করে। দেশাখ চমকে তাকায়।

ওটা কি?

চেনো না?

ডোম্বি খিলখিলিয়ে হাসে। কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে উঠে বসে। ডোম্বির হাতটা মুচড়ে ধরে। এটা দিয়ে কি হবে?

আমার বুকে একটা প্রতিশোধের আগুন জ্বলে।

কি বলছো ডোম্বি?

এতকথা জানতে চাও কেন দেশাখ?

ডোম্বি আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। নদীর বুকে ছপ্ ছপ্ শব্দ। একটা নৌকা চলে যাচ্ছে। কাহ্নুপাদ অন্ধকারেও যেন মল্লারীর দৃষ্টি দেখতে পায়। তীব্র সে দৃষ্টি আগুনের চাইতেও বেশি আগুনের চাইতেও সর্বনাশী। কাহ্নুপাদ সেখানে দেশাখের হাতে তীরধনুক, ডোম্বির হাতে ছুরি আর ওর হাতে কলম। পরিবেশটা কেমন সুন্দরভাবে ঘনীভূত হচ্ছে। তারপর ফাটবে। ফেটে চৌচির হবে। আস্তে আস্তে ডোম্বির হাসি থেমে যায়। অপরপারে লোক এসেছে ওকে ডাকছে। দেশাখ আর কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে পাড়ে নামে। ডোম্বি কাছি খুলে দ্রুত নৌকা বায়।

৯

দু'টো যমজ ছেলে বুকের কাছে নিয়ে নিস্তেজ শুয়ে থাকে ভৈরবী। শারীরিক এবং মানসিক কোনো দিক দিয়েই ওর কোনো শক্তি নেই। যমজ ছেলে দেখার পর থেকেই ভীষণ কান্নায় বুকটা ফাটা মাঠের মতো টুকরো টুকরো। শুত্তির মা বাচ্চা দু'টো দেখছে। ধনশ্রী দরজার কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তাকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। বুকের ভেতর কেবল একটা না, না ধ্বনি। কিছুতে হতে পারে না। কিছুতেই না। ছেলে হবার পর ভৈরবী ওর পা চেপে ধরেছিলো।

তুমি বিশ্বাস করো আমি অসতী নই। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বুঝিনা। আমার আর কেউ নেই।

ধনশ্রী ওর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলো। হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে কতবার গালে ঘষেছিলো : বৌ, বৌ আমি তা জানি। আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু—। ঐ কিন্তু কাঁটা হয়ে আছে দু'জনের মনে। কেউই কিছু বুঝতে পারছে না। অথচ দু'জনে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে কোনো অঘটন ঘটতে পারে না। ভোররাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রশান্ত আমেজেও ধনশ্রী ঘেমে নেয়ে উঠছিলো। সংসারের এই সুখটাকে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারবে না। ধনশ্রী গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পায়। ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা চলে যাচ্ছে। ছৈয়ের ভেতর ভৈরবী। না চোখে আর পানি নেই। সব কান্না শেষ। মাথায় আর ঘোমটা নেই। সব লজ্জা শেষ। তখুনি উত্তেজিত অবস্থায় চেঁচিয়ে ওঠে ধনশ্রী, না এ আমি হতে দেবো না বৌ। কিছুতেই হতে দেবো না। ও ভৈরবীর পাশে এসে বসে। ভৈরবী কথা বলতে পারে না। কেবল ঠোঁট নড়ে। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানিনা গো। ভৈরবীর ইচ্ছে করে এই কথাটা পাড়াময় চিৎকার করে বলতে। কিন্তু কে শুনবে? ছেলেদুটো সরবে চেঁচায়। ধনশ্রী ঘরের দরজা জানালা হাট করে খুলে রাখে।

যমজ ছেলের খবর জানাজানি হলেই রাজার লোক ছুটে আসবে। অসতীত্বের দায়ে ভৈরবীর বিচার হবে। ভৈরবীকে ত্যাগ করতে হবে ধনশ্রীর। এটাই রাজার আইন। এক নারীর গর্ভে এক সঙ্গে দু'সন্তানের জন্ম মানেই দু'জন লোকের সঙ্গে যৌনসঙ্গম। সকলেই এটা বিশ্বাস করে। আর সঙ্গত কারণেই সমাজ থেকে ব্যভিচার দূর করার জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাজার দায়িত্ব সমাজকে কলুষহীন ও পবিত্র রাখা। এর আগে আরো দু'বার এ ধরনের ঘটনা হয়েছিলো। সুভায় তো বৌ-র শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিলো। আর চন্দ্রদাস নিজেই আইন হয়েছিলো। বৌকে ইচ্ছে করে ত্যাগ করেছিলো। এতবড় ব্যভিচার নিজেই সহ্য করতে পারেনি। 'আমি অসতী নই' বলে বুক চাপড়ে কেঁদেছিলো চন্দ্রদাসের বৌ। কিন্তু চন্দ্রদাস শোনেনি। শোনার মতো মানসিকতা তার ছিলো না। কিন্তু ধনশ্রী কি করবে? ধনশ্রী যে মনে প্রাণে বৌকে বিশ্বাস করে। না, ও কিছুতে বৌকে ত্যাগ করবে না। কিছুতেই না।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ও কাহ্নুপাদের কাছে ছুটে আসে।

এখন কি হবে কানু?

সব শুনে দরজার ওপর বসে পড়ে কাহ্নুপাদ। কোনো কথা বলতে পারে না।

না, কানুদা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে আমার বৌ অসতী।

তবে কেমন করে হলো?

জানিনা, জানিনা।

ধনশ্রীর অসহিষ্ণু কণ্ঠ। জেদের সঙ্গে চিৎকার করে। বুকের ভেতর খচ্‌খচে কাঁটাটাকে প্রাণপণে চেপে রাখে ওটা মাঝে মাঝেই গভীরে ঢুকে যেতে চায়।

আমার বৌ যদি ব্যভিচার করেই থাকে তবু আমি ওকে ছাড়তে পারবো না কানু।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসেও কাহ্নুপাদের মাথাটা গরম হয়ে ওঠে কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ধনশ্রী যতই আবেগের কথা বলুক এর পেছনে যুক্তি কি?

আমার বৌ-কে আমি যদি ঘরে রাখি তার জন্য রাজার কি কানু? আমি মানিনে রাজার আইন।

কাহ্নুপাদ চমকে ওঠে। তাইতো। ব্যভিচার ওদের জন্য শুদ্ধ। কিন্তু আমরা না করলেও তার বিচার হবে।

তুমি কথা বলছো না কেন কানু?

মাথা ঠাণ্ডা করো ধনাদা। ভেবেচিন্তে এগুতে হবে।

তুমি ভাবো। আমি ঘরে যাই। ঘরে অনেক কাজ।

কিন্তু না, শেষ রক্ষা করতে পারেনি ধনশ্রী। দু'জন সন্তানের জন্য দু'জন বাবা, এ যুক্তিটা এত বেশি প্রবল যে, এর বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলতে পারে নি। পনেরো দিন সময় দেয়া হয়েছিলো ধনশ্রীকে। কিন্তু ধনশ্রী তা মানেনি। আইন ছিল পনের দিন শেষ হলে পরদিন ভোরেই ভৈরবীকে গরুর গাড়িতে উঠিয়ে বাপের বাড়ির পথে রওনা করিয়ে দিতে হবে। ধনশ্রী ইচ্ছে করলে সঙ্গেও যেতে পারে। কিন্তু রাজার সে আইন মানেনি ধনশ্রী। তাই পরদিন দুপুরে রাজার লোক এসে জোর করে ধনশ্রীকে ধরে নিয়ে গেছে। প্রথমে একজন এসেছিলো। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলো। তারপর এসেছিলো আরো চারজন। পাঁচজনের সঙ্গে পারেনি ধনশ্রী। যেতে হয়েছিলো। আর সেজন্যেই চেঁচাতে চেঁচাতে গেছে ধনশ্রী, আমার অসতী বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর করি তাতে রাজার কি? আমাদের ভালো রাজার দেখতে হবে না। চাইনা এমন রাজা।

বড় শক্ত কথা বলেছিলো ধনশ্রী। কিন্তু বেশি বলতে পারেনি। পিটুনীর চোখে মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ বেরুচ্ছিলো কেবল। এই ঔদ্ধত্যে শঙ্কিত মন্ত্রী দেবল ভদ্র জনা পঞ্চাশেক রক্ষী পাঠিয়েছিলো গাঁয়ে। সর্বত্র রাজার রক্ষী ঘুরে বেড়ায়। সারা গাঁ জুড়ে রাজার আইন থম্‌থম্ করে। এর আগে এ রকম বড় ধরনের কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। লোকগুলো কেবল মাথা নিচু করে আইনত পালন করেছে। অবাধ্য হয়নি। আজ ধনশ্রী পুরো ছকটা উল্টে দিলো। কঠিন মূল্য দিতে হবে তাকে। অপরাধ অনেক : অসতী বৌ ঘরে রেখে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেবার প্রবণতা। রাজার আইন অমান্য করা। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলা। দেবল ভদ্র এতবড় ধৃষ্টতা কিছুতেই সহ্য করবে না। রাজদরবারে ছিলো কাহ্নুপাদ। দেখেছে দেবল ভদ্রের টক্‌টকে মুখে আগুনের আভা আর কঠোর দৃষ্টি। পুরো গ্রাম তছনছ করে

দিতেও তার বাধবে না। কাহ্নুপাদ আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে দুপুরটা পার করেছে। ধনশ্রীকে চুনের ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কি হবে কাহ্নুপাদ নিজেও তা জানে না। তার চোখের সামনে সব কিছু বিপরীত ঘরে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কোথায় যেন আপন নিয়মে একটা ফোকর তৈরি হচ্ছে। সেটা ঠেকাবার সাধ্য কারো নেই। দেশে বৌদ্ধ রাজা। কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সংস্কারের প্রয়োজনে কেউ এগিয়ে আসে না, সর্বত্র ব্রাহ্মণের দোর্দণ্ড প্রতাপ। সে প্রতাপে প্রাণ-ওষ্ঠাগত কাহ্নুপাদের মতো এক শ্রেণীর লোকের। বৌদ্ধ ধর্মের মায়ামমতার কথা গল্পের মতো শুনেছে ওরা। সেটা পেলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতো। আরো একটু স্নিগ্ধ, আরো একটু শ্যামল।

বিকেলে তড়িঘড়ি ঘরে ফেরার পথে কাহ্নুপাদের চোখে পড়ে করুণ দৃশ্যটা। বুক হু হু করে ওঠে। গরুর গাড়ির পেছনে ভৈরবীর ভাই। মুখ নিচু করে হাঁটছে। খবর পেয়ে দু'তিন দিন আগে এসেছে। মুখ শুকনো। উস্‌কোখুস্‌কো চুল। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। বোনকে গালাগাল করলেও ধনশ্রীর ব্যবহারে ও ভীষণভাবে আলোড়িত। দেশাখ গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। হয়তো অনেকদূর যাবে। কাহ্নুপাদ জানে ও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। কাহ্নুপাদ নিজেও পারেনি। ভৈরবী সকলের পায়ে ধরেছে। কেঁদে বলেছে, সে অসতী নয়। ও যে কোনো পরীক্ষা দিতে রাজি। শুধু যেন ধনশ্রী ওকে ত্যাগ না করে। কিন্তু এখন রাজার চাইতে মন্ত্রীর শাসন প্রবল। তার মুখের ওপর কথা বলবে কে? ভৈরবীর অনুনয়-বিনয় কাউকে স্পর্শ করেছে। কাউকে করেনি। কেউ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে। সেজন্যেই গরুর গাড়ির ছইয়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে চলে যাচ্ছে ভৈরবী। পেছনে ধুলো উড়ছে। ওকে আর চেনা যায় না। সন্তান জন্ম দেবার পর শরীরের যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো এমন একটা চরম পরিণতিতে তার শেষ কাঠামোটা ভেঙে গেছে। বড় ছেলে দু'টোর সঙ্গে সঙ্গে ছোট দু'টোও সমানে কাঁদছে। কারো প্রতি ওর কোনো আকর্ষণ নেই। ভৈরবী যেন জাগতিক পৃথিবীর সমস্ত সুখদুঃখ থেকে হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কয়েকদিন রাজার লোক বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে। কেউ যদি সামান্য কথাও এদিক ওদিক করে বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবে। গাঁয়ে থম্‌থমে পরিবেশ ভূতুড়ে হয়ে যায়। সন্ধ্যের পর কেউ আর বাইরে থাকে না। দরকার ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলে না। ভৈরবী চলে যাবার পরদিন কামোদ বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে। শ্বাসরুদ্ধকর এই পরিস্থিতি ওর জন্যে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিলো। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। ভৈরবীর বাসায় এখন আর সন্ধ্যেবেলা বাতি জ্বলে না। শূন্য ঘর হাহা করে। হাটুরেরা ওপথ দিয়ে ফেরার সময় চোখ তুলে চায় না। ধনশ্রী এখনো বন্দী। কবে ছাড়া পাবে কেউ জানে না। কাহ্নুপাদ নিজে রাজদরবারে থেকেও কোনো হদিশ করতে পারে নি। ডোম্বি একদিন কাহ্নুপাদকে একলা পার করতে করতে বলেছিলো, তুমি কেমন ঝিমিয়ে গেলে কানু?

ধনাদার জন্যে মনটা পোড়ে।

ডোম্বি খিলখিলিয়ে হাসে।

মনটা পুড়িয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? পারলে দেবল ভদ্রের বাড়িটা পুড়িয়ে দাও।

আহ্‌, আস্তে মল্লারী।

নদী আর নৌকা ছাড়া কেউ এখানে নেই। এদের অবিশ্বাস করি না। আর থাকলেই বা কি?

ডোম্বি জোরে জোরে নৌকা বায়। কান্থপাদ হাঁটুতে মাথা রেখে বসে থাকে। গুণ টানে দু'জন লোক। ওদের পেশিবহুল শরীরে আশ্চর্য জোয়ানকী। সবাই যদি অমন হতো? ওরা কোথায় যায়? ওদের ধরে রাখা যায় না? ওরা গাঁয়ের জোয়ান ছেলেগুলোকে শরীর গড়ার কৌশল শিখিয়ে দিতো।

সুলেখা যখন দেশাখের কাছে কথাটা পাড়লো তখন নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিলো দেশাখের। তখন রাত। ফিকে জ্যোৎস্নায় সুলেখার মুখ তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সব কাজ সেরে দেশাখকে বাইরে ডাকে সুলেখা। রান্না ঘরের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে। মুখে পান। রাশি চুল উঁচু করে খোঁপাবাঁধা। ঘরের ভেতর থেকে লোকী আর গুণীর হাসাহাসির শব্দ আসে। আমড়া গাছের মাথায় বসে একটা কাক থেমে থেমে ডাকে। সব কিছু কেমন বিরক্তিকর মনে হয় দেশাখের। এমন কি সুলেখার এই ডেকে আনার ভঙ্গিটাও।

কেন ডেকেছো বলছো না যে?

তোমার দাদার তো কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না দেশাখ?

হ্যাঁ, অনেক তো খোঁজখবর করলাম।

আর হয়তো ফিরবেই না?

তাইতো মনে হয়।

দু'জনে কিছুক্ষণ সময় কাটায়। কাকের ডাক আর নেই। দেশাখ হাই তোলে। সারা বিকেল ছেলেদের তীর ছোঁড়া শিখিয়েছে। এখন ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।

আমার ঘুম পাচ্ছে বৌদি।

বলছিলাম কি, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সুলেখার গলা কেঁপে যায়।

সিদ্ধান্ত?

হ্যাঁ। সুদাম আমাকে বিয়ে করতে চায়।

বৌদি?

আমি রাজি হয়েছি দেশাখ।

কি বলছো?

তোমার ঘাড়ে বসে আর কতকাল খাবো। তোমার দাদাও ফিরবে না। ভেবেচিন্তে দেখলাম নিজের পথ করে নেয়া ভালো।

আমরা কি তোমাকে অনাদর করেছি?

ছিঃ দেশাখ! অমন কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি। এবং তোমার এই কষ্টের উপার্জনেও আমি খুশি ছিলাম। কিন্তু কতকাল টানবে? তোমার নিজেরও তো বিয়ে করতে হবে। এখন তুমিই ব্যাপারটাকে মিটিয়ে দিতে পারো।

আমি ভেবে দেখি বৌদি? আমাকে সময় দাও।

দেশাখ আর দাঁড়ায় না। একরকম দৌড়ে নিজের ঘরে চলে আসে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়। ছেলেমানুষের মতো শব্দ করে কাঁদে দেশাখ। পাশের ঘরে শুয়ে সে কান্না শোনে সুলেখা। বুকটা কেমন করে। কিন্তু কিছুতেই পিছোবে না। এখনই উপযুক্ত সময় পথ দেখার।

শেষ পর্যন্ত সুলেখার কথাই রাখতে হয় দেশাখের। গাঁয়ের একদম শেষ সীমান্তে নিরিবিলি সংসার পাতে সুলেখা। সুদাম পাকা চাষী। চাষবাস খুব ভালো বোঝে। সংসারে অভাব কিছুটা কম। দু'জন মানুষের দিন ভালোভাবেই কেটে যায়। সুলেখার মনে হয় বহুদিন অন্ধকার ঘরে বন্দী থাকার পর ও ছাড়া পেয়েছে। এখন রোদ দেখছে। বাতাস পাচ্ছে। সুদাম ভারি ভালোমানুষ। নিরীহ, গোবেচারা। সুলেখার সংস্পর্শে জীবনের নতুন বাঁকবদলে সুখী। মাঝে মাঝে দেশাখের বুক খাঁ খাঁ করে। সুলেখার জন্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে। শাশুড়ী মুখ বেঁকিয়ে বলে, গেছে ভালো হয়েছে। আপদ গেছে। ছলটা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংসারের হালটা ধরে রেখেছিলো সুলেখা। এখন সেটা এলোমেলো, বিধ্বস্ত। লোকী, গুণী, বৌদিকে ভুলতে পারে না। লুকিয়ে দেখা করতে যায়। অরুণের লুকোছাপা নেই। সোজাসুজি এখানো 'আমার বৌদি' বলে দাবী নিয়ে উপস্থিত হয় সুলেখার কাছে। সুলেখার মাঝে মাঝে খট্‌কা লাগে। সংসারটা ছেড়ে এসেও এখনো ওটা যেন ওরই রয়ে গেছে।

সুলেখার ঘটনা অনায়াসে সকলে ভুলে যায়। কিন্তু ধনশ্রী সকলের বুকের মধ্যে একটা কালো কাঁটা হয়ে গেঁথে আছে। কেউ ভুলতে পারে না। লোকটা আর ফিরে আসেনি। কি হয়েছে কেউ কিছু জানে না। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। ভয়, পাছে কোনে অশুভ সংবাদ শুনতে হয়। কেবল বুকের নিচে খচ্‌খচে শব্দ টের পায়। যখন তখন রাজার লোক আসে। সামান্য কারণে একে ওকে ধরে নিয়ে যায়। দু'একদিন আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। নয়তো মারধর করে। কাউকে কোনো কারণ জানাবার দরকার নেই। অপরাধ কি সেটাও জানে না। দেশাখের তীরধনুকের দলে জোয়ান ছেলে বাড়ে। নিমাই, বাদল, গৌরাঙ্গ, শিবু। ওরা শিকারের নামে দূরের বনে চলে যায়। সারাদিন পর ফিরে এলে তখন আর একটুও ক্লান্তি লাগে না দেশাখের। শরীরে যেন একটা আল্‌গা যন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। সেটা থেকে অনবরত শক্তি চুঁয়ায়। চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেয় অবসাদ আর ক্লান্তি। সন্ধ্যায় নিজের হাতে তিতির আর হরিয়ালের পাখ ছাড়াতে ছাড়াতে ভুসুকু-র কথা মনে করে। দাদাটা সেই যে গেলো আর কোনো খবর নেই। যদি বেঁচে থাকে? যদি ফিরে আসে? মুহূর্তে হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ভয় করে দেশাখের। একজন মানুষের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যাবার ভয়। ধনশ্রী এ বোধটা সকলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়। আসলে সুলেখা যাওয়াতে পুরো সংসারের গোছানো ভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে। মা খেয়ালখুশিমতো রান্নাবান্না করে। লোকী গুণী নিজেদের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ায়। সোহাগের কেউ নেই, শাসনেরও কেউ নেই। দেশাখ পাখি দু'টো তৈরি করে মাকে ডাকে। মা ঘর থেকেই কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, বাতের ব্যথায় উঠতে পারছি না বাবা।

রাতের খাওয়া হবে না?

দুপুরের যে চাট্টি আছে তা ভাগ করে খেয়ে নে। রাতে তো ঘুমিয়ে থাকবি। আর রাঁধতে পারবো না। পেটে খিদে থাকলে আমার ঘুম আসে না।

দেশাখের মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। মা-র কাছ থেকে কোনো জবাব আসে না। অগত্যা দেশাখ কুয়োতলায় গিয়ে পাখি দু'টো ধুয়ে আনে। উনুন জ্বালিয়ে ঝল্‌সে নেয়। এর বেশি কিছু করার সাধ্যি ওর নেই। তারপর বারান্দায় বসে মনের সুখে কামড়ে কামড়ে খায়। সারাদিনের পরিশ্রমে পেটে ভীষণ খিদে। সুলেখা থাকলে কিছু তৈরি খাবার পাওয়া যেতো। না সেকথা ভেবে মন খারাপ করে না ও।

একটু পরে নিঃশব্দে লোকী গুণী ঢোকে। দেশাখকে বারান্দায় দেখে দু'জনের বুকের মধ্যে ভীষণ তোলপাড়। ধরা পড়ে যাবার ভয় কিন্তু দেশাখ খাবার আনন্দে ওদের খেয়াল করে না। দু'জনের কোঁচড় ভরা শামুক। চুপচাপ ঘরের কোণে ঢেলে রেখে দু'জনে কুয়োতলায় আসে। ঝপাঝপ্ পানি ওঠায়। লোকী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

নিখিলদার মতো মানুষ হয় না, না রে গুণী?

ঠিক বলেছিস।

আজ তোকে অনেকক্ষণ রেখেছিলো। পাহারা দিতে আমার যা ভয় করছিলো। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিলো এই বুঝি কেউ এসে পড়ে।

ভয় না ছাই।

কেন?

ভাবছিলি গুণীটা এলেই আমি নিখিলদার কাছে যেতে পারি। তোর দেরি সইছিলো না।

যাঃ মিছে কথা।

বুঝি রে বুঝি।

দু'জনেই শব্দ করে হাসে। তারপর ঘরে এসে দুপুরের চাট্টি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু দু'জনে দু'পাশে শুয়ে থাকলেও ঘুম আসে না কারোরই। নিখিলদার সঙ্গে কেমন একটা মজার কাণ্ড ঘটে যায়। এতদিন এতসব কথা কিছুই জানতো না! পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন জানি করে।

ঘুম আসছে না গুণী।

আমারও আসছে না।

আবার চুপচাপ। দু'জনের নিঃশ্বাস ওঠানামা করে। একে অপরের পিঠের সঙ্গে লেগে আছে। একসময় লোকী ফিস্‌ফিস্ করে ডাকে। গুণী?

বল।

আমার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক বলেছিস, আমারও।

আবার চুপচাপ। নিজেদের ওপর বিরক্ত হয় নিজেরাই। চোখ ব্যথা করে। জোর করে আর কতক্ষণ চোখ বুঁজে থাকা যায়।

লোকী?

বল।

আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমারও।

চল বাইরে গিয়ে বসি।

চল।

দু'জনে উঠে বাইরে আসে। উঠোনে আমড়াগাছের ছায়ায় আলপনা। বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকে ওরা।

এসব কথা কাকে জিজ্ঞেস করা যায় রে?

চুপ্চুপ্। কাউকে না।

চল ঘরে যাই।

চল।

দু'জনে আবার ঘরে এসে শোয়। চুপচাপ। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও ঘুম আসতে চায় না ওদের।

দেখতে দেখতে হুট করে চোত মাস এসে পড়ে। এ মাসে কাম-মহোৎসব হবে। শুকনো খট্খটে ক্ষেতে জল ঢেলে কাদা বানিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গান আর জোর নৃত্য হয়। সকলের বিশ্বাস এতে পরিতুষ্ট হয়ে কামদেব অধিক শস্য দেবে। চৈতালী ফসলে ভরে উঠবে আঙিনা। আর শস্যের প্রাচুর্য মানেই ধন। এ উৎসবের জন্যে যুবকযুবতীদের বাছাই করে গাঁয়ের বুড়োরা। দশজোড়া যুবক যুবতী নাচবে। সারারাত উলঙ্গ হয়ে। ভোররাতের ফিকে আঁধারে মিলিত হবে তারা। সে মিলনের বীর্যপাত শস্যের প্রাচুর্য বয়ে আনবে। উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়। জমি ঠিক হয়। এক একবার এক এক জমিতে উৎসব হয়। চিঁড়া আর নারকেল দিয়ে তৈরি নানা রকমের খাবার এ রাতের প্রধান দিক। সব বাড়িতে এক আয়োজন। যুবকযুবতীদের সেই খাদ্য পোটলা করে বেঁধে দেয়া হবে। ওরা উৎসবের আগে যাবে। জমিতে ছিটোবে। কামদেবের কাছে প্রার্থনা করবে। যখন পটহ মাদলে শব্দ উঠবে, শুরু হবে ডোম্বির গান, তখন থেকে উৎসবের শুরু। সন্ধ্যার আলো-আঁধারী মিলিয়ে গেলে ওরা গান গাইতে গাইতে জমিতে যাবে। তেমন একটা জমির কাছে, যে ফসল দেবে। জীবন বাঁচাবে। প্রাচুর্যে, ধনে, সুখে, শান্তিতে সে জীবন মহিমান্বিত হবে। প্রথমবারের মতো লোকী, গুণী এ উৎসবে যোগ দেবে। দু'জনের খুশির শেষ নেই। লোকী নাচবে নিমাইর সঙ্গে, গুণী শেখরের সঙ্গে। প্রতিবছর নতুন নতুন জোড় ঠিক হয়।

বিকেলবেলা গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, চোখে কাজল টেনে লোকী এবং গুণী অস্থির হয়ে ওঠে। মা চিঁড়ে নারকেলের পায়েস রেঁধেছে। কলাপাতায় পোঁটলা করে বেঁধে নিয়েছে ওরা। বাড়িতে খাবার নিয়ম নেই ওদের। মা মনে মনে প্রার্থনা করে যেন কোনো ছেলের চোখে পড়ে যায় ওরা। তাহলে বিয়ের জন্যে আর ঝৈ-ঝামেলা হবে না। বুড়ো বাপ অসুস্থ। কে আর এ দায়িত্ব পালন করবে।

নাচতে গিয়ে পা যেন আর উঠতে চায় না লোকীর। কেবলই নিখিলের কথা মনে পড়ে। নিমাই না হয়ে নিখিল হলে আনন্দ হতো বেশি।

এই লোকী, সন্ধ্যারাতেই ঝিমুচ্ছিস কেন?

নিমাই ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

ইস তুই যেন কি?

আমাকে তোর পছন্দ হয়নি?

হয়েছে।

না হয়নি। তোর শরীরে তেমন সাড়া নেই।

ছাই বুঝিস।

লোকী ওর বুকের সঙ্গে মিশে যায়। গলার কাছে নাকটা ঘষে নিমাই শরীরে ঝাঁকুনী দিয়ে উদ্দাম নেচে ওঠে। রক্তে মাতাল বন্যা। সবার এক অবস্থা। নাচটা যেন জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে গেছে। কাম দেবতা তুষ্ট হলে ফসল ফলবে। সে ফসলে পেট ভরবে। নইলে উপোস। সে জন্যেই এ নাচের সঙ্গে আরো কিছু থাকে। ফসলের প্রাচুর্যের আবেগ। সেজন্যে এ নাচে ঢিলেমী সয়না। উদ্দাম হয়ে ওঠা প্রথম শর্ত। এ আসরে ওরা নতুন। কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা জড়তা ওরা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবু এটা একটা সামাজিক স্বীকৃতি। এতে সকলের সমর্থন আছে। এই একটা রাত ওরা নিজের করে পেয়েছে। এভাবে আর কোনোদিন পাবে না। পটহ মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ ক্রমাগত বাড়ছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে ডোম্বির গলা। সেইসঙ্গে বাড়ছে শরীরের উত্তেজনা, নৃত্যের উদ্দামতা। আস্তে আস্তে নিখিলের কথা ভুলে যায় লোকী। সেই ঝিমুনি ভাব আর নেই। গুণী প্রথম থেকে শেখরের সঙ্গে জমে গেছে। মন খারাপের বালাই নেই ওর। আজ রাত এবং এই নাচের অনুষ্ঠানই ওর কাছে আনন্দের। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ পুরো দেখতে পায় না। কেবল কতগুলো অবয়ব। তীক্ষ্ণ। ধারালো। অন্ধকার ভেদ করে তার নগ্ন দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। ডোম্বি গান গাইতে গাইতে ভাবে, আজকের অনুষ্ঠানে ছোঁড়াগুলো যেমন মরদ, ছুঁড়িগুলোও তেমন। কেউ কারো চাইতে কম না। নিজের ষোল বছর বয়সটা কল্পনা করে বুক ফেটে শ্বাস বেরোয়। ক্রমাগত ডোম্বির জোর নিস্তেজ হতে থাকে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আর একটু পরে ওরা চলে যাবে। তখন আর বাজনার দরকার হবে না। গানের দরকার হবে না। ছেলেমেয়েদের শরীরটা আপন নিয়মে বাজবে, গাইবে।

পিচ্ছিল মাটি কাদায় থ্যাকথ্যাক করছে। বারবার পা পিছলে যায় লোকীর। নিমাই শক্ত হাতে ধরে রাখে। আশেপাশের অনেকেই সরে পড়েছে। দূরে দূরে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে। শেখরের হাত ধরে গুণী চলে যাচ্ছে। আর পেছনে সুমন্ত আর পারুল। লোকীর বুকটা কেমন যেন করে। পায়ের নিচে থক্থকে কাদা। এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি। এখন শরীরটা কেমন কুঁকড়ে আসে। ভালো লাগে না। কিন্তু আজকের নাচের উদ্দেশ্য ভেবে নিজেকে শাসন করে। প্রাণপণে ভালো লাগাতে চায়। নিমাই আবার ওকে ঝাঁকুনি দেয়।

আমাকে তোর পছন্দ হয়নি লোকী?

বারবার একটা কথা বলো কেন, বলো তো?

তুই যে দেবার কথা বলিস না? মাটি তৈরি না হলে কি ফসল ফলে?

নিমাইর কণ্ঠ করুণ শোনায়।

আমি কি মাটি?

এসব কি কথা? সবতো জানিস।

কিছু মনে করিস না নিমাই এত নাচের পর সব কেমন এলোমেলো লাগছে।

নিমাই ওকে বুকে টেনে আদর করে।

তুই উর্বর ধরণী। আমি চাষা। চাষ করি। লোকী এজন্যই তো এত আয়োজন। এলোমেলো লাগলে সারা বছর মাটি হয়ে যাবে।

না রে আমি ঠিক আছি। তুই মিছে ভাবনা করিসনা। চল যাই। তুই একটা পাকা চাষী হবি নিমাই।

হবোই তো। চাষীর ছেলে চাষী হবো না তো কি দেশের রাজা হবো?

হলে বেশ হতো।

বুঝতে পারছি তোর মনটা যেন অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছে। তাই এমন আনমনা। তোর এখানে আসা ঠিক হয়নি। দেবতার রাগ হবে।

দূর! কি যে বলিস আবোলতাবোল!

লোকী ভয় পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় এসব কথা। শব্দ করে হেসে ওঠে। নিমাইয়ের গায়ে ঢলে পড়ে। নিমাই যদি এসব কথা আর কাউকে বলে তাহলে কি যে লজ্জা। কারো কাছে মুখ দেখানো যাবে না। সকলে ছিঃ ছিঃ করবে। লোকী সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। নিমাই ওকে নিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। কাছাকাছি সবাই আছে। কেউ কাউকে খোঁজে না। নেশার জমাট অবস্থা যেন। চারদিকে অন্ধকার। দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসে। উদোম মাঠে হা হা বাতাস বয়। মৃদু অথচ শীতল। সকলের মনের মধ্যে ফসলের স্বপ্ন। সকলের শারীরিক চেতনায় নতুন ধানের অনুভব। নিমাই পাকা চাষীর মতো চাষের কাজে মন দেয়। নরম হাতে মাটি কোপায়। আগাছা সাফ করে। তারপরে ভীষণ যত্নে গাছ বোনে। নিমাই ফসলের প্রার্থনায় ওর সমস্ত শরীর মন উৎসর্গ করে দেয়। লোকী মাটি হয়ে বুকে টানে।

কাম-উৎসবের পর গোটা পাড়ায় চাষের সাড়া পড়ে। সুদামের এক মুহূর্তের সময় নেই দুপুরেও ঘরে ফেরে না। খাবার বেঁধে নিয়ে যায়। ফেরে সেই সন্ধ্যায়। সুলেখা একলা ঘরে বসে চাঙারী বোনে। একটুও খারাপ লাগে না। জীবনের কোথাও যেন আর কোনো ফোকর নেই। সব শূন্যতা ভরে গেছে। শরীরের অন্তঃস্থলে আর একটি প্রাণের শব্দ বাজে। সুলেখা আনমনা হয়ে সে শব্দ শোনে। কে যেন দু'পায়ে টলতে টলতে ওর দিকে ছুটে আসছে। ভুসুকুর সঙ্গে পাঁচ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছে। কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এখন সুলেখার ছোট্ট ঘরে দ্বিগুণ আনন্দে ফিরে আসে। সেদিন সুদামকে খবরটা দিয়েছিলো সেদিন সুদাম কেমন বিব্রত, ভয়ার্ত মুখে ওর দিকে চেয়েছিলো। কথা বলতে পারে নি।

কি হলো? তুমি খুশি হওনি?

খুশি? হ্যাঁ, খুশি হয়েছিতো।

সুদাম আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনোরকমে কথাকটি বলেছিলো। তারপর কেমন এলোমেলো স্বরে বলেছিলো, বাচ্চা হতে গিয়ে তোমার যদি কিছু হয় তাহলে আমি বাঁচবো না সুলেখা।

কি হবে?

সুলেখা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো।

যদি কোনো অঘটন ঘটে?

যাঃ, কিছু হবে না। ভয় করলেই ভয়। তুমি কিছু ভেবো না।

সুলেখা জানতো না সুদামের আগের বৌ বাচ্চা হতে গিয়েই মারা গিয়েছিলো। খবরটা সুদামকে খুশি করেনি। সন্তানে ওর তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই। ও চায় একজন ভালো বৌ আর নিরিবিলি সংসার। কাজ শেষের পর খোশগল্প। তারপর প্রশান্তির ঘুম। একদঙ্গল ছেলে-মেয়ের ঝৈ-ঝক্কি ওর পছন্দ নয়। তবু সুলেখার ঝল্‌মলে মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলেনি ও। একা একা বুকের মধ্যে অকারণ বেদনা বহন করে। সারাক্ষণ হারাই হারাই ভাব। চাষের কাজে মন বসে না ঠিকমতো। এদিকে সুলেখা সপ্তাহে দু'দিন পিপুল গাছের গোড়ায় জল ঢেলে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পুজো করে। পুত্র সন্তান চায়। উপার্জনক্ষম পুত্র। বাপ-মার বুড়ো বয়সের দায়দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে নেবে। সুলেখা পেটের সন্তানকে কেন্দ্র করে সেই অনাগত দিনের স্বপ্ন দেখে।

রাজদরবারের পাখা টানার কাজটা আর ভালো লাগেনা কাহ্নুপাদের। যে কাজটার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে হতো আজ সেটার ওপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা। জীবিকার প্রশ্নে আপোষে আর মন ওঠে না। অন্ন যেন গলা কামড়ে ধরে নামে। সে জ্বালা বিষের মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। মনে হয় অন্ন নয় অপমান আর অবজ্ঞার দলাগুলো থোকে থোকে নামছে। সারাদিন কেমন বিষণ্ণ হয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। ও চাকরীটা ছেড়ে দিলে একটা অনিশ্চিত জীবনের মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিদিন খাবার জুটবে না। দিনের পর দিন উপোসেও কাটতে পারে। তবু সমগ্র অস্তিত্ব তাতেই সায় দেয়। দারিদ্র্যে আপত্তি নেই। অভাব সইতে পারবে। কোনো কিছুতেই এখন আর ভয় নেই। পিছু হটতে এখন ওর প্রচণ্ড ঘৃণা।

একদিন খাবার সময় শবরী কেমন অসহায়ের মতো তাকিয়ে ব্যাকুল হয়েছিলো, খাচ্ছো না কেন? রান্না ভালো হয়নি?

কাহ্নুপাদ ম্লান হাসে। শবরীর সিঁথিটা চওড়া মনে হয়।

রান্না খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ইদানীং খেতে আমার একটুও ভালো লাগেনা।

কেন? শরীর খারাপ? কই আমাকে বলোনি তো?

কাহ্নুপাদ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। একটুক্ষণ থেমে বলে, ভাবছি চাকরীটা ছেড়ে দেবো শবরী।

কেন?

ওদের ঐ অপমান আর অবজ্ঞা সইতে পারছিনা আমি।

তাহলে খাবো কি আমরা?

অন্য কোনো কাজ জুটিয়ে নেবো। একটু অভাব হবে, পারবে না সইতে? তুমি কি বলো শবরী?

শবরী কথা বলে না। মুখ নিচু করে রাখে। তরকারীর বাটিটা নাড়াচাড়া করে। সেই আনত মুখের দিকে তাকিয়ে কাহ্নুপাদ বোঝে যে শবরীর সায় নেই। ঐ চাকরীটুকুর জন্যে তবু ভাত জোটে। না থাকলে উপোস। নিরম্বু উপোস

মানতে শবরী রাজি নয়। ও চায় একটু সুখ, কিছুটা নিরুদ্বেগ দিনযাপন। শবরী মল্লারী নয়। মল্লারী হলে ঐ অপমানের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তখুনি চেঁচিয়ে উঠতো, ওখান থেকে তুমি চলে এসো কানু। দুটো মানুষের পেট একরকম করে চলে যাবে। ও নিয়ে ভাবতে হবে না। তবু ঐ অপমানের দলা গলা দিয়ে নামাতে পারবো না। অথচ শবরী কথা বলতে পারছে না। ওর ধাতই আলাদা। কাহ্নপাদ ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে। শবরী জল আনার ছলে সামনে থেকে উঠে যায়। কাহ্নপাদ হাসে। তার এই মানসিক আশ্রয়টুকুর জন্যেই মল্লারীর কাছে ছুটে যেতে হয়। ও মাঝনদীতে নৌকা ঠেকানোর মতো অবলীলায় শক্ত হাত বাড়িয়ে দেয়। একটুও ভয় পায় না। শবরীর আনত মুখের সৌন্দর্য ওকে যতই বিচলিত এবং মোহিত করুক না কেন, সেদিকে চেয়ে কাহ্নপাদ নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে না। তেমন বুঝলে শবরীকে রেখে ও একাই এগিয়ে যাবে। প্রয়োজন নেই শবরীর। শরীরের ভেতরেও কোথায় যেন একটা ইস্পাতের ফলা গেঁথে আছে। সেটা থেকে প্রয়োজন মতো আগুনে-রশ্মি ঝল্‌কায়। সে রশ্মি কাহ্নপাদের ধ্যান-ধারণায় নতুন প্রলেপ দেয়। বদলে যায় কাহ্নপাদ। অপমানের আগুনে পুড়ে ও কালো হয়ে গেছে। সেদিন সারাদিন শবরী কথা বলেনি। মুখ গুঁজে শুয়েছিলো। কাহ্নপাদ ওর ওপর রাগতে পারে না। বরং ওকে বুঝতে চায়। যে ব্যঞ্জনায় শিল্পী হয়ে ওঠে সেই একই ব্যঞ্জনায় ও শাণিত হতে পারে না কেন? যার লক্ষ্যভেদী আঘাতে এঁফোড়-ওঁফোড় হয়ে যায় নির্ধারিত বস্তু।

কাহ্নপাদ মাটিতে বসে শবরীর গভীর চুলে হাত ডুবিয়ে ডাকে ওকে, ওঠো সই, মিছে ভয় পেয়ো না।

শবরীর চোখের কালো তীরে জলের রেখা। আসলে কানু ছাড়া ও আর কিছুই বোঝে না। কখনো কানুর সঙ্গে ওর কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। যত মন খারাপই করুক সেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না শবরীর। আজো ফিক্ করে হেসে কাহ্নপাদের ঘাড়ে মুখ গোঁজে। নাকের ডগা লাল হয়ে গেছে।

কানু তুমি যা করতে চেয়েছো তাই করো। দু'জন মানুষের আর ভাবনা কি! কোনোমতে চলেই যাবে। এমনিতে তো আমরা রাজার সুখে নেই। আর একটু অভাব হবে এই যা। তুমি সইতে পারলে আমিও পারবো। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি কানু।

কাহ্নপাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে ও। নাকটা চেপে ধরে।

দেখছো কি? আমি সত্যি বলছি। প্রথমে মন খারাপ হয়েছিলো। এখন আর আমার একটুও মন খারাপ করছে না। আমি ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক। ধনাদাকে ওরা কি কষ্টটাই না দিলো? ভৈরবীর জন্যে বুকটা আমার কেমন করছে।

কাহ্নপাদ শবরীর চুলে মুখটা ডুবিয়ে রাখে। মনে হয় ওখান থেকে ভিন্ন ঘ্রাণ আসছে। শবরীর যে সৌন্দর্য কাহ্নপাদকে প্রতিনিয়ত সঙ্গ দেয় তা নিয়ে শবরী দূরে সরে যায় নি। বরং কাছে এসেছে। আরো গভীরে। শবরীর নির্বিবাদ সমর্পণ ওকে আনন্দ দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এটাই অনুভব করে যে শবরীর সমর্পণটা তেমন জরুরি নয়। ও সমর্পণ না করলেও কাহ্নপাদ যা চাইছিলো তা হতো। ওকে কেউই পিছু টানতে পারতো না। নিজের এ পরিবর্তন কাহ্নপাদকে সাহসী করে তোলে।

নৌকার ওপর কথাটা শুনেই বৈঠা থেমে যায় ডোম্বির হাতে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কাহ্নপাদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে রাত জাগার ক্লান্তি। কেমন বিশুষ্ক চেহারা। মনে হয় ভেতরে প্রচণ্ড ওলোটপালটের ক্ষমাহীন আক্রোশ।

কি বলছো তুমি কানু?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

ভালোই হয়েছে কানু। তোমাকে আমি নৌকা বাওয়া শেখাবো। সারাদিন পারাপার করে যা পাবো তা ভাগ করে নেবো। তাতে তোমার চলে যাবে, কি বলো?

কাহ্নুপাদ হেসে মাথা নাড়ে।

সে দেখা যাবে। পেটের কথা অতো চিন্তা করি না।

এখন থেকে তুমি সারাদিন গীত লিখবে। এই ঘাটে বসেই লিখো।

পারাপার করতে ভালো না লাগলেও আপত্তি নেই। সন্ধ্যায় তোমার কড়ির ভাগ আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।

কাহ্নুপাদ হো হো করে হাসে। অপ্রস্তুত হয়ে যায় ডোম্বি।

হাসছো যে?

আমার জন্যে তোমার ভাবনা দেখে হাসছি।

তোমার সব তাতে ঠাট্টা।

রেগো না মল্লারী। একটা কিছু জুটিয়ে নেয়া এমন আর কঠিন কি? কাজ না পেলে বনের ফলমূলতো আছে। ভাত নাইবা খেলাম। তবু এ অপমান আর সয় না।

কাহ্নুপাদের দৃষ্টি ঝক্‌মক্ করে। মল্লারী কথা বলে না। সেটা যে ওরও মনের কথা। শুধু কয়টা কথা বলে তার কি প্রকাশ হয়? কেবল হাতের বৈঠা ছপ্‌ছপ্ বয়।

দেবল ভদ্রের সামনে কথা বলতেই বাঘের মতো গর্জে ওঠে মন্ত্রী। সে জানে কাহ্নুপাদ আরো একশোজনের মতো নয়। একটু আলাদা। কাহ্নুপাদ ভাবতে জানে। ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা প্রকাশ করতে জানে। কেবল মাথা পেতে সবকিছু মেনে নেয়না। সেজন্যে কাহ্নুপাদের ওপর একটা রোষ আছে দেবল ভদ্রের। আছে মনের ভেতর কিছুটা ভয়ও। পাছে অপমান করে এই ভয়। তাছাড়া কাহ্নুপাদ গীত রচনা করে সেটা আরো অসহনীয়। ছোটলোকের বাড় সীমাহীন মনে হয়। সেটা কিছুতেই সম্ভব না। বেশি সহ্য করলেই ছোটলোকগুলো মাথায় চড়ে বসবে। কাহ্নুপাদ তার সামনে আর কাজ করবে না বলতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে দেবল ভদ্র। এতবড় কথা তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলার সাহস কারো নেই। ছোটলোকগুলো থাকবে কেবল হুকুম শোনার জন্যে। অন্য কোনো ধরনের কথা বলার অধিকার ওদের নেই। তাই কাহ্নুপাদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা অসহ্য। দেবল ভদ্র পারলে ওর টুঁটি চেপে ধরে।

এতো বড় কথা বলার সাহস তোর হলো?

সাহসের কি আছে? আমি আর কাজ করবো না শুধু এটাই তো বলেছি?

কেন কাজ করবি না শুনি?

আমার ভালো লাগে না।

কি? কি বললি?

দেবল ভদ্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায়। কাহ্নুপাদ আবারও বলে, আমার ভালো লাগে না।

তাহলে করবি কি? গীত লিখবি?

দেবল ভদ্রের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে দপ্ করে জ্বলে ওঠে কাহ্নুপাদ।

হ্যাঁ তাই করবো। ওটাই আমার কাজ।

হ্যাঁ তাই করবো!

দেবল ভদ্র চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

কাজে যা। আর যেন এ ধরনের কথা না শুনি।

দেবল ভদ্র ওকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গট্‌গট্ করে অন্যত্র চলে যায়। আজ দরবারে কিসের যেন উৎসব। সবাই ব্যস্ত। কাহ্নুপাদ নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। বুকভরে শ্বাস নেয়। আজ থেকে ও মুক্ত। কোথাও কোনো দায়ভার নেই। নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা। তবুও বুকটা থর্‌থর্ করে ওঠে। দেবল ভদ্রের পরবর্তী আচরণ ওকে শংকিত করে রাখে। আজ সারারাত রাজদরবারে উৎসব হবে। কাল ছুটি। তারপর? কাহ্নুপাদ সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে জোরে হাঁটতে থাকে। ভাবলে অকারণে বুক আতংকিত হবে। তার চেয়ে ঐ চুকিয়ে বুকিয়ে দেবার চেষ্টাই ধরে রাখা ভালো। এতে শক্তিতে স্রোত বাড়ে।

পথে দেশাখের সঙ্গে দেখা। কাঁধে দু'টো বনমোরগ ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরছিলো ও।

কি ব্যাপার কানুদা অমন জোরে জোরে হাঁটছো যে?

কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।

মানে?

মানে আর কি? ওদের ঐ অপমান আর সইছে না।

উঃ। কানুদা ঠিক করেছো! এবার আমরা একটু অন্যরকম হবো কানুদা। ওদের বোঝাতে হবে আমাদের ভেতরও মানুষ আছে। কেবল ছোটলোক নেই।

আমারই ভুল হয়েছিলো দেশাখ। ভেবেছিলাম রাজদরবারে নিজের লেখা গীত পড়লেই আমার ভাষার সম্মান হবে। এখন দেখছি আসলে তা নয়। কেবল রাজদরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতের কদর করুক ওটা কারো মুখের ভাষা নয়। ওটাকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখে বেঁচে থাকবে দেশাখ।

ঠিক বলেছো কানুদা। রাজদরবার কোন ছার। নিজেরাই নিজের ভাষার সম্মান করবো। ওদের কোনো কিছুতে আমাদের দরকার নেই।

দু'জনে আবার চুপচাপ হাঁটে। দু'জনের ভেতরই উত্তেজনা।

তুমি এখন কি করবে ভাবছো কানুদা?

এখনো ভাবিনি।

চলো তোমাকে তিরধনুক চালানো শেখাই। তারপর দু'জনে শিকার করবো। যা পাই দু'জনে ভাগ করে নেবো কানুদা। তোমার হবে না তাতে?

খুব হবে।

তুমি যেন কিছু ভাবছো?

দুর পাগল।

খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কাহ্নুপাদ ঠা ঠা হাসে।

যাদের সম্বল নেই তাদের আবার সম্বলের চিন্তা কি?

আমি তো তাই বলি।

কাহ্নুপাদ দেশাখের ঘাড়ে হাত রাখে। আশেপাশে খুব একটা লোকজন নেই। চারদিকে বুক-চেতানো উদোম মাঠ হা হা করছে। বিক্ষিপ্ত গাছ। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। যেন অনেকদূর থেকে কেউ ছুঁড়ে মেরেছে। তাই এখানে ওখানে পড়ে আছে। কুড়োবার কেউ নেই। অযত্ন এবং অবহেলাই সই। সরু মেঠো পথে কাহ্নুপাদের পদক্ষেপ আজ অন্যরকম। দেশাখের চঞ্চলতাও বাড়ে। দু'জনের মনের ভেতর সুখের পাখি নড়াচড়া করে। দু'জনেই হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, নদীটা খুব কাছে। আরো দূরে হলে ভালো হতো। হাঁটতে একটুও ক্লান্তি নেই।

পরদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে আড়িমুড়ি ভাঙে কাহ্নুপাদ। খুব ভালো লাগছে। জানালা গলিয়ে রোদ এসেছে। কখনো এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়না ও। আজকের প্রসন্ন সকাল কাহ্নুপাদের জীবনের বাঁক বদলের সূচনা। ও বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান গায়। তারপর সারাদিন একরকম ওঠেই না। বিছানায় গড়িয়ে, গীত লিখে দিন কাটাতে চায়। শবরীও খুনসুটি করে।

কখনো পাখির পালকের কলমটা নিজের মাথায় গুঁজে রাখে। কখনো চুলের গোছা সামলাতে সামলাতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে কাহ্নুপাদের সামনে। কাহ্নুপাদ ঘরে থাকলেই ওর আবেগটা বদলে যায়। তখন যা নয় তা করতে ইচ্ছে করে। এবং কাহ্নুপাদের কাছে তা অবলীলায় প্রশ্রয় পায়। একটা পুরো গীত লেখার আবেগে কাহ্নুপাদ এখন উদার। কোনোকিছুতেই বাধা সেই যেন। আজ নিজেকে সত্যিকারের ছোটলোক বলে মনে হয় ওর। নির্ভেজাল ছোটলোক। যে ছোটলোকের সংজ্ঞা ওরা দিতে পারবে না। একথা মনে হতেই হো হো করে হাসে ও।

হাসছো যে?

আজ আমি একটা আস্ত ছোটলোক। কাজ নেই, কাম নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, রাজা নেই, মন্ত্রী নেই। কি বলো সই?

ঠিক।

শবরীও হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে চুলোর ওপর তরকারী পোড়ার গন্ধ পায়।

ঐ যাঃ সব গেলো! আজ আর খেতে হবে না।

কাহ্নুপাদ ওর হাত চেপে ধরে।

যাক।

কেন?

উঃ বাবা! ছাড়ো। আমাকে আর পাগল বানিয়ো না।

শবরী তড়িঘড়ি ছুটে যায়। তরকারী সামলায়। কাহ্নুপাদ আবার কলম নিয়ে উপুড় হয়। মনে মনে বলে, কাহ্নিলা তুই একটা আস্ত হারামী। তোর মনের ঠিক-ঠিকানা নেই। কাহ্নিলা তোর জীবনটাই বরবাদ। তুই কিছু বুঝিস না, কিন্তু জানিসনা তবু গীত লিখতে চাস। কাহ্নিলা রে! এত সাহস ভালো না। কয়েকটি পংক্তি লিখে আবার কেটে ফেলে। আবার লেখে,

ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা।

সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।।

আত্মপর বিভেদ ভুলে ঘুমায়, সহজেই নিদ্রিত হয় কাহ্নুপাদের নগ্ন মন। নিজের আকাঙ্ক্ষাকে গীতের রূপকে নির্বিবাদে প্রবেশ করিয়ে রাখে জ্বালা জুড়োবার এটাই সহজ পন্থা। নিজেকে এমন প্রকাশ করা যায় বলেই কলম কাহ্নুপাদ ভালোবাসে। কলমটা দাঁতে কামড়ে রাখে ও। তারপর আবার দু'পংক্তি লেখে,

চেঅন ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।

সঅল সুফল করি বহে সুতেলা।।

তার চেতনা বেদনা নিঃশেষ, জাগতিক সমস্ত ব্যাপার বিনষ্ট করে কাহ্নুপাদ সহজানন্দে প্রবিষ্ট। এই অবস্থায় ত্রিভুবন তার কাছে শূন্য, স্বপ্নের মতো অলীক; কোনো কিছুর ঘুরপাকে তাকে আর পড়তে হবে না। কাহ্নিলা তুই পথ পেয়েছিস। হো হো কাহ্নিলা তোর সামনে কোনো নদী নেই। কাহ্নিলা রে তুই একদৌড়ে দূর পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে পারিস। তোর আর ভাবনা কি। তুই এখন আপন মনে গান গা। তখন ও লেখার সরঞ্জাম একপাশে ঠেলে রেখে চিৎকার করে শবরীকে ডাকে।

সই? সই?

উঃ! কি হলো?

দুপুরের খাওয়ার পর আমরা বনে যাবো।

কেন?

তোমার ময়ূরপালক কুড়োবো।

সত্যি আজ তুমি যাবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ?

উঃ কি আনন্দ! কতদিন দু'জনে একসঙ্গে বনে যাইনি।

শবরী দ্রুত কাজ সারার চেষ্টা করে। হরিণের চামড়া পেতে খাবার জায়গা করে। জলের ভাঁড় নামায়। ভাতের সানকি আনে। আজ আয়োজন কম। মৌরালী মাছ আর নলতে শাক।

বাঃ, রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে।

ছাই রেঁধেছি। আয়োজনতো তেমন নেই।

আয়োজনে কি হবে? ঘটা করে খেতে ইচ্ছে করে না। অল্প আয়োজনে তৃপ্তিটাই বড় কথা।

তাই বলো? আজ তোমার মনে খুশির ঢল।

এই ঢলটাকেই সব সময় ধরে রাখতে চাই। মন ভরা থাকলে বাইরের আয়োজন না হলেও চলে।

শবরী কথা বলে না। রান্নাঘরে যায়। পায়ের মল ঝুমঝুমিয়ে ওঠে। বাসনে ভাত নিয়ে আসে। বাটি ভরে ভরে তরকারী। কাহ্নুপাদ আবেশ করে খায়। খাবার পরে পানের রসে ঠোঁট রাঙায়। বাইরে এসে বেলা দেখে। এখনো অনেক বেলা বাকি। দু'জনে পাহাড়ের গা বেয়ে তড়বড়িয়ে নেমে আসে। শবরীর পোষা ময়ূরটা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে। মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে বনে এসে নিজেকে আজ মুক্তমানুষ মনে হয় কাহ্নুপাদের। এতদিন নিজেকে যেন এক খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলো। পাখা মেলে ওড়ার জো ছিলো না। চারদিকে ছিলো লোহার শিকের মতো শাসন আর চোখরাঙানি। অবহেলা আর অনুকম্পা। এখন ও ছাড়া পেয়ে নিজের ভুবনে এসেছে। ইচ্ছে মতো উড়বে, ঘর বানাবে, পাতার আড়াল তৈরি করবে। কারো পরোয়া করবে না। শবরীর হাতটা নিজের মুঠিতে নিয়ে ঝরাপাতার মর্মর তুলে গাছের ছায়ায় হাঁটে কাহ্নুপাদ। ময়ূরপালক কুড়োনোটা ছল। নিজেকে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটাই প্রধান।

পরদিন চারিদিকে কেমন ঝড়ো হাওয়া বয়। বৃষ্টি নেই। গুমোট ভাব থমথমে। ঘাটে নৌকা নেই। পথে লোক নেই। আকাশে মেঘ। বিদ্যুতের চাবুক চিরে যায়। জানালায় বসে বাইরে তাকিয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। হঠাৎ করে দমকা বাতাসে কেঁপে ওঠে ঘরের জিনিষপত্র। জানালা বন্ধ করার জন্য চেঁচামেচি করে শবরী। কিন্তু কাহ্নুপাদ সে চেঁচামেচি কানেই তোলে না। এভাবে বসে থাকতে ওর কি যে ভালো লাগছে তা শবরীকে কেমন করে বোঝাবে? দই দিয়ে চিঁড়া মাখিয়েছে শবরী। কানুকে খেতে ডাকে। কিন্তু খাওয়ার জন্যেও ওর কোনো গরজ নেই। তাই রাগ করে শবরী ময়ূরের গলা জড়িয়ে কথা বলে। ময়ূরকে শুনিয়ে শুনিয়ে কানুর সঙ্গে আর কথা বলবে না বলে পণ করে। কাহ্নুপাদের মনে হয় একটা মানুষ যেন বাতাস ঠেলে এগিয়ে আসছে। চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু পুরো বুঝতে পারছে না। উপরন্তু ধুলোর ঝড়ে মানুষটাকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কাহ্নুপাদের ভেতরটা ছটফটিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে মানুষটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তোমাকে আমার চেনা চেনা লাগছে কেন? ভেতরের আবেগটা চাপতে না পেরে ঠাস্ করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় কাহ্নুপাদ। খোলা দরজা দিয়ে জোর বাতাস ঢোকে। উড়িয়ে নিতে চায় শবরীকে। কোনোরকমে দু'হাতে দুয়ার সামলায়। দেখে, কাহ্নুপাদ সাঁই সাঁই করে নেমে যাচ্ছে। দ্রুত লোকটার সামনে গিয়ে অবাক হয়ে যায় কাহ্নুপাদ।

ভুসুকু তুমি?

হ্যাঁ আমি ফিরে এসেছি। ভুসুকু ওকে জড়িয়ে ধরে। স্বজন ফিরে পাওয়ার আবেগ ওর দু'বাহুর চাপে। কাহ্নুপাদ সে উত্তাপ অনুভব করে। ভুসুকুকে দেখে আনন্দ এবং বেদনার মিশ্র অনুভূতিতে কাহ্নুপাদ অভিভূত হয়।

আমরা ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আর ফিরবে না।

সে রকম অবস্থাই হয়েছিলো। তবু দূরে থাকতে পারলাম কৈ?

ফিরতেই হলো। নাড়ির টান যে?

রোগা হয়ে গেছো?

কানুপা আমি আবার গীত লিখবো। মনে হয় কতকাল যেন আমি সব কিছু থেকে দূরে সরে আছি। কানুপা ফিরে আসতে পেরে আমার কি যে খুশি লাগছে তা আমি বোঝাতে পারবোনা।

তাতো ঠিকই ভুসুকু। নিজের জমির গন্ধ না পেলে বুক উচাটন হয়ে যায়। আমি তো অন্য জায়গায় গিয়ে একদম থাকতে পারবো না। তোমার গীত শোনার অপেক্ষায় রইলাম। কোথায় ছিলে এতকাল?

সে মেলা কথা। জলদস্যুর কবলে পড়েছিলো আমাদের নৌকা। সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। অনেকে প্রাণে মরেছে। আমি কয়েক বছর ওদের হাতে বন্দী ছিলাম। কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। একদিন বসে বসে শোনাবো সেসব গল্প।

সেই ভালো। আজ ঘরে যাও। দম ফেলে বাঁচো।

যা ঝোড়ো বাতাস। তবু কোথাও থেমে থাকতে মন চাইলো না। ছুটে বেরিয়ে এলাম। নিজের মাটির টানে উড়তে উড়তে এসেছি কানুপা।

কেমন করে যে এলাম ভেবে এখন অবাক লাগছে। মনটা কোনো বাধাই মানতে চাইলো না।

ভালোই করেছো। তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এ যে কত ভাগ্য।

আমার ঘরের খবর কি কানুপা?

ভালো। সবাই ভালো আছে।

বউটা হয়তো ভেবে ভেবে সারা হয়েছে। ঘরে যাই কানুপা।

যাও।

লজ্জিত হাসি হাসে ভুসুকু। ভুসুকু আর দাঁড়ায় না। পথের বাঁক বদলে নিজের বাড়ির দিকে যায়। একটু দূর থেকে বলে, চেনা পথ-ঘাটের গন্ধে আমি পাগল হয়ে গেছি কানুপা। কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না। মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হয়তো হুড়মুড়িয়ে নামবে। তবু ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না কাহ্নুপাদের। মনে হয় বৃষ্টি নামলে ভালো। মজা করে ভিজতে পারবে। আসলে তা নয়, বিক্ষিপ্ত মনটাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কাহ্নুপাদ বৃষ্টি চাইছে। ভুসুকুর গীত ওর মনের মধ্যে বৃষ্টি হয়ে নামছে। সেই কয়টা পংক্তি মনে পড়ছে—যে-কয়টা পংক্তি ভুসুকু ওকে শোনানোর পর ওকে একদম অন্যরকম লাগতো। মনে হতো ভুসুকুর সঙ্গে ওর অনেক ব্যবধান। ও এমন লিখতে পারবে না। সে পংক্তি এখন কি নির্মম পরিহাসের মতো ব্যঙ্গের স্বরে ধ্বনিত। ভুসুকু আরও একবার জলদস্যুর হাতে পড়েছিলো। সেবার এত কষ্ট পায়নি ও। অল্প দিনেই ছাড়া পেয়ে চলে এসেছিলো। তখনো বিয়ে করেনি ও। ফিরে আসার পর এই গীত লিখেছিলো। যেন সময়টা সবদিক দিয়ে ওকে বঞ্চিত করলো।

বাজ নাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গলে ক্লেশ লুড়িউ।।
আমি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিনী চণ্ডালে লেলী।।

ভুসুকুর এই গীতটা কাহ্নুপাদ কোনোদিন ভুলতেও পারিনি। বজ্র নৌকা পদ্মা খালে বাওয়া হলো। নির্দয় দস্যু সব লুঠ করে নিলো। ভুসুকু আজ বাঙালী হলো। নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিয়ে গেলো। আহা, তখন কেন এমন

লিখেছিলো ভুসুকু। কাহ্নুপাদের বুকটা মোচড়ায়। ধুলোর ঝড় নেই। বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি পড়ে। কাহ্নুপাদ সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফেরে।

সই, ভুসুকু ফিরেছে।

ভুসুকু?

ওকে দেখেই তো অমন ছুটে গেলাম।

কিছু বলেছো?

না। আমি ওকে কেমন করে বলবো সই? ও যে বউর জন্যে উতলা হয়ে ছুটে গেলো। আমার সঙ্গে বেশি কথা বলেনি।

শবরী কথা বলতে পারে না। শড়ির আঁচল দিয়ে কাহ্নুপাদের মাথা মুছিয়ে দিয়ে শুকনো কাপড় এগিয়ে দেয়। কাহ্নুপাদ কাপড় না নিয়ে ভিজে শরীরে ওকে কাছে টানে।

আমি দূরে গেলে তুমিও সুলেখার মতো চলে যাবে সই?

শবরী ওর মুখটা চেপে ধরে। কাহ্নুপাদ হাতটা সরিয়ে দেয়।

আসলে এটাই সত্যি। অনেকদিনতো অপেক্ষা করলো সুলেখা। যদি ভুসুকু কোনোদিন ফিরে না আসতো তাহলে কেমন হতো? সময় থাকতে নিজের পথ বেছে নিয়েছে। এটাই নিয়ম।

আমরা সবাই নিয়মের দাস কি বলো সই? কাহ্নুপাদ মুচকি হাসে।

শবরী চটে ওঠে।

থামবে তুমি?

থামতে বলছো কেন? যদি এমন হয় তাহলে তুমি তোমার পথ দেখে নিও।

কানু তুমি একটা হাতি। এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। ছাড়ো আমাকে। শুকনো কাপড় পরো।

যদি না ছাড়ি?

ইস, আর ঢঙ দেখাতে হবে না। নিজে তো ভিজেছো, আবার আমাকেও ভেজানো হচ্ছে!

জল ভালো লাগছেনা?

একটুও না।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে দেখাচ্ছি মজা।

কাহ্নুপাদ শবরীর হাত ধরে জোর করে ঘরের বাহিরে টেনে আনে। শবরীর নিষেধ এবং চিৎকার শোনে না। ওকে টানতে টানতে পাহাড়ের গা বেয়ে সমতলভূমিতে নামে। তারপর কার্পাসক্ষেতে ঢোকে দু'জনে। আর তখনই

শবরীরও ভালো লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে। অনেকদিন পর বৃষ্টি নেমেছে। তুমুল বৃষ্টির স্রোতে ভেসে যায় আশপাশ। চারদিক ধোঁয়ার মতো দেখায়। সে অলৌকিকে প্রবেশ করার বড় সাধ কাহ্নুপাদের।

পরদিন রাজার লোক এসে কাহ্নুপাদকে খবর দিয়ে যায়। দেবল ভদ্রের হুকুম, রাজ দরবারে যেতে হবে। কাহ্নুপাদ চুপচাপ শোনে। কিছু বলেনা। লোকটি চলে গেলে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ায়। বুকের জ্বালা বেশি তীব্র হয়ে উঠলে কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না। গুম হয়ে যায়। এ ওর বরাবরের অভ্যেস। ডোম্বি নৌকা নিয়ে মাঝনদীতে। কাহ্নুপাদ তীরের কাদায় দাঁড়িয়ে নলখাগড়া ছেঁড়ে। দেবল ভদ্রের হুকুম এসেছে। ও জানতো আসবে। তবু ও যাবে না। কালকে হয়তো জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর শাস্তি। কি শাস্তি দেবে কে জানে। না, তবুও কিছুতেই যাবে না।

অনেকক্ষণ পর নৌকা-বোঝাই লোক নিয়ে ফিরে আসে ডোম্বি। গুণে গুণে কড়ি আদায় করে। কাহ্নুপাদের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত নেই। আবার লোকবোঝাই করে চলে যায়। আজ ঘাটে পারাপারের হিড়িক আসে। কাহ্নুপাদ হাঁটতে হাঁটতে দেবকীর দোকানে ঢোকে। দেবকী দোকানে নেই। রামক্রী চুপচাপ বসে আছে। কি খবর রামক্রীদা, গালে হাত দিয়ে বসে আছো যে?

মন ভালো নেই।

কেন?

বউর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

ও, তাই বল। ও আর এমন কি। চুকেবুকে যাবে। তা তোমার ঘড়ায় আছে নাকি কিছু?

সব খালি। ঐ নিয়েই তো ঝগড়া।

নাঃ, দিনটাই মাটি। বৌদি কোথায়?

জানি না। রেগেমেগে কোথা, বেরিয়ে গেল যেন। আমাকে কিছু বলেনি।

তুমিও রেগে আছো দেখছি। ছুটকি কোথায়?

ওকি ঘরে থাকে নাকি? কোথায় কোথায় ঘুরছে কে জানে?

তোমার ছেলেটা খুব ভালো হয়েছে।

ঐ-ভালো দিয়ে করে খেতে পারবেনা।

না, তুমি অমন করে বোলো না। বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে ছুটকি। যাই গিয়ে। তোমার মেজাজ ভালো না।

নাঃ থাক। মালপানি নেই যখন থেকে আর লাভ কি?

মনখারাপ নাকি?

তোমার মতো বউর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি আমার।

এতক্ষণে রামক্রী হো হো করে হাসে।

তুমি আছ বেশ। সুখের চাকরি।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

তাই নাকি? করবে কি?

দেখি কি করা যায়।

ছাড়লে কেন?

ভালো লাগে না।

ওমা, এমন কথাতো শুনিনি! তোমার সব কাজকর্মই এমন। কাহ্নুপাদ হেসে বেরিয়ে যায়। আবার নদীর ঘাটে আসে। ঘাটে ডোম্বি একলা। লোক নেই। কাহ্নুপাদ লাফিয়ে নৌকোয় ওঠে।

তোমার ভীড় তাহলে কমলো?

চলে গিয়েছিলে যে বড়?

করবো কি একলা একলা?

তোমার মনটা বুঝি ভালো নেই কানু?

কেন?

রাজার লোক এসেছিলো ডাকতে?

হ্যাঁ।

ওরা হয়তো সহজে ছাড়বেনা।

না ছাড়ুক। বেশি আর কি করবে? কয়দিন শাস্তি দেবে না হয়।

ভাবনা হচ্ছে?

মোটেই না। ভাবনা আবার কি। যা করেছি তা তো জেনে শুনেই করেছি।

ডোম্বির চোখে ঝিলিক। ঝক্‌ঝকে ছুরির চমক। কাহ্নুপাদের মনে হয় ডোম্বি ওর কাছ থেকে বুঝি অনেকদূরে সরে গেছে। ওর চেহারায় আগের আদল নেই। বদলে গেছে। কেমন ধারালো হয়েছে। ডোম্বি কোমর থেকে চক্‌চকে ছুরিটা বের করে।

ওটা কি হবে মল্লারী?

কি আর, দরকারের সময় কাজে লাগবে।

দরকারটা কি শুনি?

নতুন গীত কি লিখেছো কানু?

এটা বুঝি আমার কথার উত্তর হলো?

ঐ দেখো, লোক আসছে? নৌকো খুলতে হবে?

খোলো। আমিও যাবো।

কোথায়?

কোথাও না। নৌকোয় বসে থাকবো। তোমার সঙ্গে এপার-ওপার করবো।

সেই ভালো।

ডোম্বি উচ্ছ্বসিত আবেগে হেসে ওঠে। কানুকে এমন করে পাওয়ার সাধ ওর কতকালের। কখনো পাওয়া হয়নি। ডোম্বির সঙ্গে নৌকো বাইতে ভালো লাগে কাহ্নুপাদের। কতকাল ধরে এসব কাজ থেকে ও অনেক দূরে

ছিলো। এখন সব কিছু নতুন নতুন লাগে। এতকাল ও নিজের জায়গা ছেড়ে একটা বিদেশি জায়গায় বাস করেছিল। এখন নিজের দিকে ফিরে চাইবার সময় হয়েছে।

ঘাটে লোক নেমে গেলে ডোম্বি হঠাৎ করেই বলে, আজকাল একটা বামুন আমাকে বড্ড জ্বালায় কানু।

কে?

আগে দেখিনি। বলে দেবল ভদ্রের ভাগ্নে। মানা করলে শোনে না। একদিন মেজাজ খারাপ হলে সাবাড় হয়ে যাবে।

কাহ্নুপাদ হঠাৎ করে কিছু বলতে পারে না। ডোম্বি অতিরিক্ত ব্যস্ততায় নৌকোর কাছি খুলে দেয়। কাহ্নুপাদের হাতে বৈঠা। ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে নদীর বুকে ওঠে নামে। দূরে তাকিয়ে দেখে ভুসুকু আসছে। কাহ্নুপাদের বুক তোলপাড় করে ওঠে। ভুসুকুর সামনে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়।

মল্লারী, গতকাল ভুসুকু ফিরেছে।

কি বলছো?

ঐ দেখো এদিকেই আসছে।

না ফিরলেই বুঝি ভালো করতো।

ডোম্বি আস্তে করে বলে। হঠাৎ করেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ডোম্বির যে আবেগ কাহ্নুপাদের জন্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো তা এক মুহূর্তে ধপ্‌ করে পড়ে যায়। তখন ভুসুকু ঘাটে এসে দাঁড়ায়। কাহ্নুপাদ কাদা বাঁচিয়ে লাফ দিয়ে নামে। ডোম্বি আবার চলে যায়। ভুসুকুর সঙ্গে কথা বলা হয়ে ওঠে না।

কাহ্নুপাদ ভুসুকুর কাঁধে হাত রাখে।

কি খবর ভুসুকু? সারারাত ঘুমোওনি মনে হয়।

ভুসুকু হাঁ করে চেয়ে থাকে। রাত্রিজাগরণের ফলে লাল চোখ। বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কাহ্নুপাদের হাত ধরে। মাথায় গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে কানুপা?

তোমার গীত আছে?

না সেটাও হারিয়েছে। আমি আর কোনোদিন লিখতে পারবো না কানুপা। জলদস্যুদের হাতে বন্দী থেকে মনে হয়েছিলো আমি আর কিছু করতে পারবো না। এখানে এসে দেখলাম, সত্যি পারবো না। আমি একদম নিঃশেষ কানুপা।

ভুসুকু দু'হাতে মুখ ঢেকে হুঁ হুঁ করে কাঁদে। কাহ্নুপাদ ওর পিঠে হাত দিয়ে নদীর ধারে ধারে হাঁটে। ভুসুকু নিজেকে থামাতে পারে না। ওর বুকটা কাঁদার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলো। কাহ্নুপাদের স্পর্শে সে মেঘ অবিরল ঝরলো। আহা কান্নাটা কত ভালো। মানুষকে একদম হালকা করে দেয়। নইলে মনটার যে কি হতো। অনেকক্ষণ কাঁদার পর ভুসুকু থামে। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা কাহ্নুপাদের জানা নেই।

আমি কেন এত কষ্ট করে ফিরে এলাম কানুপা? প্রতিটি দিন আমি কার জন্যে নষ্ট করেছি? জলদস্যুর কাছে যা হারিয়েছিলাম তার জন্যে তো কখনো এমন বেদনা হয়নি। এখন কেন বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে? তুমি

কথা বলছো না কেন কানুপা? তুমি কি বোবা হয়ে গেছো? তুমি কিছু বলো। এখানে আসার পর কেউ আমাকে তেমন কিছু বলে না। কেবলই লুকিয়ে যায়। অথচ আমি প্রাণভরে কিছু শুনতে চাই। তোমরা আমাকে কিছু বলো।

ভুসুকু কাহ্নপাদের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনী দেয়। কাহ্নপাদ কিছু বলে না। কি বলবে সেটা ওর জানা নেই। ওর গলার কাছে বেদনা দলা হয়ে আছে। কিছুতেই নড়তে চায় না।

না তোমরা সবাই কেমন যেন হয়ে গেছো। অনেক পাল্টে গেছো। আমি আর কাউকেই তেমন আগের মতো পাচ্ছি না।

ভুসুকু বড় করে শ্বাস ফেলে।

শুধু এই নদীর বাতাস বদলায়নি। বদলায়নি ঘাস-লতা। অবিকল তেমনি আছে। যেমন করে আগে স্পর্শ দিতো এখনও তেমন দিচ্ছে। কিন্তু ওরা কথা বলতে পারে না কানুপা। ওরা আমাকে কিছু বলতে পারে না।

ভুসুকু, চলো ঐ পাহাড়ের দিকে যাই। ওখানে কুক্কুরীপাদ আছে।

তোমাদের সঙ্গ ভালো লাগছে না। আমি একলাই যেদিক খুশি সেদিক যাবো।

ভুসুকু আগে আগে চলে। কাহ্নপাদ সঙ্গ ছাড়ে না। পেছন পেছন হাঁটতে থাকে। এক সময় ভুসুকুর মন ভালো হবে। তখন ভুসুকু আবার বন্ধুর মতো কথা বলবে। ভুসুকুর গীত কেমন নির্মমভাবে ওর জীবনে সত্য হয়ে গেছে। একেই কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে? হাঁটতে হাঁটতে লোকালয় ছেড়ে আসে ওরা। আশেপাশে আর কোনো মানুষ নেই, কেবল গাছগাছালির অসীম বিস্তার। দূরে পাহাড়। অর্জুন গাছের ছায়া ভুসুকুর নিঃসঙ্গ বুকটার কাছাকাছি হয়। শুকনো কালো বীচির খরখরে শব্দ পায়ের নিচে। হঠাৎ সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাহ্নপাদের মুখোমুখি হয় ভুসুকু।

তুমিতো আমার বন্ধু কানুপা। তুমি কবি। তুমি কেন সুলেখাকে আমার কথা শোনাতে পারোনি? কেন বলোনি ভুসুকু একদিন না একদিন আসবেই সুলেখা। ভুসুকু তোমাকে ভুলে যায়নি।

কাহ্নপাদের মনে হয় অর্জুন গাছের বাকল দিয়ে কি যেন একটা ওষুধ হয়। সে ওষুধ দিয়ে কি ভুসুকুর বেদনা কমানো যায় না? পাহাড়টা আর বেশি দূরে নয়। নির্জন পরিবেশ। ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে চারদিক। কাহ্নপাদের ইচ্ছে করছে এক দৌড়ে পাহাড়ে চলে যেতে। ভুসুকু একগাদা অর্জুনের বীচি হাতের মুঠোয় তুলে নেয়। ইতস্তত ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। কখনো অনেক দূরে ছুঁড়ে দেয়। অকারণে হাসে।

বুঝেছি, তুমি আমার কোনো কথারই উত্তর দেবে না কানুপা।

কাহ্নপাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে ভুসুকু আবার সামনে হাঁটতে থাকে। পাহাড়ের গুহায় কুক্কুরীপাদের আশ্রয়। দু'জনেই সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা নেই। নিশ্চয় ফলমূল কুড়োতে গেছে। কুক্কুরীপাদ যোগী ধ্যান নিমগ্ন। ডেকে সাড়া পাওয়া গেলো না। ভুসুকু হাত ওল্টায় তারপর পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। নরম সবুজ ঘাস, কোনো ব্যবহারে মলিন নয়। স্পর্শ শরীরে ঝিম ধরিয়ে দেয়।

আচ্ছা কানুপা, সুলেখা কি ভেবেছিলো আমি মরে গেছি?

তা কি করে ভাববে?

তবে ও কেন অপেক্ষায় রইলো না?

জীবনের অনেক কিছুই আমি জানি না ভুসুকু।

এতক্ষণে ভুসুকু হো হো করে হাসে। প্রাণখোলা হাসি। কাহ্নুপাদের ভালো লাগে।

সত্যি কথা বলেছো কানুপা। জীবনের কিছুই আমিও জানি না।

মাথার ওপর সূর্য। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে যায়। ভুসুকু টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। রোদের এই অলো-আঁধারি আলসেমি ধরায়।

শরীর ম্যাজম্যাজ করে। ঘাসের ডগা চিবুতে মন্দ লাগে না কাহ্নুপাদের।

ঘুম পাচ্ছে কানুপা।

ঘুমোও।

মনে হচ্ছে কতকাল ঘুমোইনি। এতদিনে নিজের মতো একটা বিছানা পেয়েছি। বিশেষ সময়ে সুলেখা যেমন বুকে জড়িয়ে ধরতো, ঘাসটা আজ তেমন। আমাকে মেয়েমানুষের সোহাগ দিচ্ছে।

তুমি ঘুমোও ভুসুকু।

ভুসুকুর এমন নিঃস্ব কণ্ঠের কথা কাহ্নুপাদের অনুভূতি অবশ করে দেয়। ও উঠে গুহার ভেতর যায়। কুক্কুরীর ধ্যান এখনো ভাঙেনি। ও যেভাবে বসেছিলো ঠিক সেভাবেই রয়েছে, একটুও নড়াচড়া করেনি। কেউ যেন ওকে আসনের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। কাহ্নুপাদ সে মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে। ঐ ধ্যানস্থ মূর্তি ওর বুকের ভেতর কেমন ওলোটপালোট করে দেয়। ভালো লাগে না।

ভুসুকু ঘুমিয়ে গেলে ও ওকে রেখেই চলে যাবে।

কাহ্নুপাদ গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন কোঁচড়ে একগাদা ফল নিয়ে ফিরে আসে সন্ধ্যা।

বাব্বা! আজ কি ভাগ্য! কার মুখ দেখে যে উঠেছি। কেমন আছো ভুসুকু? সন্ধ্যা কল্‌কলিয়ে ওঠে। কাহ্নুপাদকে দেখে চেঁচায়, কানুপা তুমিও?

এলাম তোমাদের খোঁজখবর নিতে। তোমরা অনেকদিন গাঁয়ের দিকে যাওনি।

যাই-যাই করেও যাওয়া হয়নি। কবে ফিরেছো ভুসুকু?

তোমার কথা শুনতে ভালো লাগছে না। কিছু খাবার থাকলে দাও। পেটটা চোঁ-চোঁ করছে।

বোসো, আসছি।

ঘুমোওনি ভুসুকু?

ঘুম এলো না। একটা গীত আমার মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কানুপা। সত্যি?

হ্যাঁ। পুরোটা হয়নি। আরম্ভটা করতে পারিনি। মাঝের একটু শোনো : 'আপনা মাঁংসে হরিণ বৈরী'

বাঃ চমৎকার। চমৎকার বানিয়েছো।

বানাইনি কানুপা। আমার ভেতর থেকেই শব্দগুলো এলো। ভেবে দেখলাম সুলেখার কোনো দোষ নেই। ওর যৌবনটাই ওর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। হরিণের মাংস যেমন হরিণের শত্রু। আমরা জাল বেড় দিয়ে ধরে মারি। আসলে আমরা তো এমন করেই নিজের কাছে হেরে যাই কানুপা। কেমন করে হারলাম বুঝতে পারিনা।

ভুসুকু তুমি অনেক বড় কবি।

কাহ্নপাদ ভুসুকুকে জড়িয়ে ধরে।

কি হচ্ছে দুই বন্ধুর? নাও বোসো।

সন্ধ্যা কলাপাতার ওপর চিঁড়ে আর কলা নিয়ে এসেছে। ভুসুকু দেরি না করে খাবারটা নিয়ে বসে পড়ে।

কতদিন যে এমন খাবার খাইনি।

কি যে বলো?

এমন মানে, এমন যত্নের খাবার খাইনি। এমন খাবার খেলে পেট যেমন ভরে, মনও তেমন ভরে।

কিই বা করতে পেরেছি। কেন যে লজ্জা দাও!

সন্ধ্যা উঠে গিয়ে ঘড়ায় করে জল নিয়ে আসে।

তোমাকে আরো চারটে চিঁড়ে দেই ভুসুকু?

না। তুমি বসো।

সন্ধ্যার মুখে আনন্দের হাসি। ভুসুকু তাকিয়ে থাকে। সুখদুঃখ কোনো কিছুতেই ওদের আর তেমন কিছু আসে যায় না। ওরা এখন সংসারের বাইরে।

দেখবো কি তাকিয়ে? খাও।

ভালো লাগছে না।

বললে যে অনেক খিদে?

এখন নেই।

খাও ভুসুকু। তোমার খিদে আছে।

আমি আবার বাণিজ্যে যাবো কানুপা।

কবে?

যে-কোনোদিন। নদীর বুকে ঘুরতে ভালোই লাগে। ঘরে আমার মন বসে না।

ভুসুকু একটু খাবার মুখে দেয়।

কিছুই খেলে না ভুসুকু? যত্নের কথা বললে কিন্তু যত্নটা নিলে কৈ?

বেশি যত্নে কষ্ট বাড়ে বৌদি।

ভুসুকু উঠে পড়ে।

চলো কানুপা?

সেকি, ওর সঙ্গে কথা বলবে না?

না, তোমার যোগীর ধ্যান আজ আর ভাঙবে না। আর একদিন আসবো। আজ যাই।

এসো কিন্তু মনে করে। গাঁয়ে গেলে যেন না শুনি যে বাণিজ্যে চলে গেছো।

না, তা শুনবে না। আসবো। কুক্কুরীর সঙ্গে দেখা না হলে নিজেরই খারাপ লাগবে।

ভুসুকু আগে আগে হাঁটে। কাহ্নুপাদ পেছনে। শেষ বিকেলের আলোয় ভুসুকুর ছায়া ঘাসের বুকে লম্বা হয়ে কাঁপে। কাহ্নুপাদ আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ভুসুকুর গীতের ঐ একটুখানি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কাহ্নুপাদের বুকে গেঁথে গেছে ঐটুকু। আহা বড় চমৎকার। দারুণ তৈরি করেছে ভুসুকু।

কিছুদূর গিয়ে ভুসুকু দাঁড়িয়ে যায়। কাহ্নুপাদ এগিয়ে গেলে বলে, আমার গীতের একটুখানি বানালাম কানুপা।

বলো শুনি।

তিন ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী।

হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী।

বুঝলে কানুপা, হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না, জল ছোঁয়না। হরিণ হরিণীর নিবাস কোথায় তা জানে না।

কথা কয়টা বলে ভুসুকু হো হো করে হেসে ওঠে।

তুমি অমন করে হেসো না ভুসুকু?

ভুসুকু হাসতেই থাকে। অনেকক্ষণ হাসে। তারপর বুক চেপে ধরে।

না, আমি আর হাসবো না কানুপা। বুকটায় কিছু নেই। হাসলে ব্যথা লাগে। জলদস্যুর হাতে পড়েছিলাম। নির্যাতন করেছে, কষ্ট পেয়েছি। শরীরে ব্যথা হয়েছে। কিন্তু বুকে ব্যথা হয়নি। এখন আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। নরক কি কাহ্নুপাদ, তুমিও জানো না, আমিও না। তবু আমার বাড়িঘর, গাছপালা, নদী নরকের মতো অসহ্য। আমি আবার চলে যাবো।

না, তুমি যাবে না। তোমাকে আমরা যেতে দেবো না।

ভুসুকু ঘুরে দাঁড়ায়।

কেন? যেতে দেবে না কেনো?

কেন যাবে? আমরা রয়েছি না? এই মাটি, নদী, আমরা সবাই তোমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবো ভুসুকু।

পারবে কানুপা পারবে?

ভুসুকু কাহ্নুপাদের হাত আঁকড়ে ধরে।

পারবো ভুসুকু। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

ভুসুকু গলা ছেড়ে হা হা করে হেসে ওঠে। কাহ্নুপাদের ঘাড়ে হাত রাখে। শেষ বিকেলের আলোতে দু'জন মানুষ খুব কাছাকাছি এসে যায়। ভুসুকু হাসতেই থাকে। হাসতে হাসতে বলে, আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। বুঝলে কানুপা ভুসুকু আবার গীত বানাবে। অনেক গীত। একদিন সারারাত তোমাকে গীত শোনাবো।

কাহ্নুপাদ কথা বলে না। ওর দু'কান ভরে শুধু বাজে, আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।

১০

সে রাতেই কাহ্নুপাদ একটা গীত বানাবার চেষ্টা করে :

নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহরি কুড়িয়া।

ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।।

লিখে ওর ভালোই লাগে। এমন সরাসরি এর আগে ও আর কখনো লিখতে পারেনি। এখন মনে হয় সরাসরি লেখা দরকার। সরাসরি না লিখলে প্রকাশটা তীব্র হয় না। শবরী গীতটা শুনে প্রথমে থমকে থাকে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, ঠিকই লিখেছো কানু। ঐ এক জায়গায় বামুনরা ছোটলোকের শরীরের কথা ভুলে যায়। তখন সব পবিত্র হয়।

শবরী ব্যঙ্গের হাসি হাসে। শবরীকে বড় ভালো লাগে কাহ্নুপাদের। শবরী কখনোই খুব একটা মনোযোগ দিয়ে ওর গীত শোনে না। আজ কাহ্নুপাদের গীত শবরীকে অন্যরকম করে দেয়। সকালে পটহ মাদল নিয়ে ডোম্বি ঐ গীত গায়। বুনো উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠ। দুপুরের মধ্যে পুরো পাড়াতে গীতটা গাওয়া হয়ে যায়। দারুণ উত্তেজনা সর্বত্র। জোয়ান ছেলেরা হাততালি দিয়ে পথেঘাটে গীতটা গায়।

দেশাখ বলে, কানুদা এতদিনে মনের কথা লিখেছো।

কাহ্নুপাদকে জড়িয়ে ধরে ও। কাহ্নুপাদের চোখ দীপ্র হয়ে জ্বলে। সব মেদ ঝরে গেছে। শরীরের কাঠিন্য দৃষ্টিতে ঝলসে ওঠে।

ওরা তোমাকে রেহাই দেবে না কানুদা?

কাহ্নুপাদ দেশাখের কাঁধে হাত রাখে :

ভয় পাইনা দেশাখ। এক কানু গেলে কি হবে? তোরা তো আছিস।

পরদিন রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে গেল কাহ্নুপাদকে। কাহ্নুপাদ শান্তই ছিলো। হৈ চৈ করেনি। ও জানতো হৈ চৈ করলে শারীরিক অত্যাচারই বাড়বে আর কোনো ফল হবে না। ওর হাতিয়ার কলম। কাহ্নুপাদ সেটাই অটুট রাখতে চায়। একটি অস্ত্র নিয়ে ওদের কাছে নতি স্বীকার করবে না। কাহ্নুপাদ শান্ত ছিলো। তবু কাহ্নুপাদের কোমরে দড়ি বেঁধেছিলো ওরা। পিছমোড়া করে হাতও। শবরী কাঁদতে কাঁদতে নদীর ঘাট পর্যন্ত এসেছিলো। এসেছিলো আরো অনেকে। নদীর ঘাটে ডোম্বির চোখে জল ছিলো না। ছিলো আগুন। দপ্‌দপ্‌ করছিলো। কাহ্নুপাদ সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো। যেন বলতে চায়, এক কানু গেলে কি হবে, তোরা তো আছিস?

মুখ ফুটে বলা হয় না। সামনে পিছে রাজার লোক। ডোম্বি আজ বড় অশান্ত। হাতের বৈঠায় উথাল-পাথাল আবেগের প্রকাশ। মনে মনে কাহ্নুপাদকে ছিঁড়ে ফেলতে চায় : কানু তুমি এত নির্বিকার কেন? রেগে ওঠো। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ো।

ডোম্বির ঠোঁট নড়ে। কাহ্নুপাদ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। নড়ে-ওঠা ঠোঁটের ভাষা বোঝে। ডোম্বি। আমার আর তোমার মতো একজন দু'জন করে সকলে যখন রেগে উঠবে তখনই ফাটার সময় হবে যে। নদী কি ভীষণ শান্ত। গর্জন নেই, ঢেউ নেই। যেন কোথাও কোনো আক্রোশ নেই। নদীর পাড়ে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই দেখছে রাজার লোক কাহ্নুপাদকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যে লোকটিকে ওরা ভালোবাসে, যে লোকটি ওদের সকলের মনের কথা বলতে পারে তার জন্যে ওদের মনে যত বেদনাই থাক না কেন, তাকে জোর করে ধরে

রাখার ক্ষমতা ওদের নেই। তবু সেই দিকে তাকিয়েই কাহ্নুপাদ তার পায়ের নিচে মাটির অনুভব পায়। সে শূন্যে দাঁড়িয়ে নেই। তার জন্যে শক্ত মাটি আছে। বন্যায়, ঝড়ে সে মাটি শক্ত থাকে। কাহ্নুপাদ মুহূর্তে ভয়শূন্য হয়ে যায়।

প্রাথমিক শাস্তিস্বরূপ রাজার লোকেরা কাহ্নুপাদকে চুণের ঘরে আটকে রাখে। রাতে ঘুম আসে না ওর। চুণের গন্ধটা কেমন তাও প্রকাশ করতে পারে না—মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস আটকে আসতে চায়। বুক ধড়ফড় করে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। থক্থকে আঁধারে দৃষ্টি ফেলা যায় না। কাহ্নুপাদের মনের ভেতর একটি একটি শব্দ কবিতার মুক্তো হওয়ার জন্যে ফোঁটায় ফোঁটায় জমতে থাকে। ওর মনে হয় বুকের ভেতর কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। পরদিন পিছমোড়া করে বেঁধে রাজার সামনে হাজির করা হয় কাহ্নুপাদকে। দেবল ভদ্রের গনগনে দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েও কাহ্নুপাদের বুক একটুও কাঁপে না। ও অবিচল, নির্বিকার থাকে। যেন ওর কোন সুখ-দুঃখ বোধ নেই।

তুই দেবতুল্য ব্রাহ্মণদের যেভাবে অপমান করেছিস, সে অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

দেবল ভদ্রের চেহারা ভয়ানক মনে হয় ওর কাছে। পরক্ষণে তা মুছে গিয়ে ফাঁসি-গাছের দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে ওটে। বহুবার এ দৃশ্য ওকে বিচলিত করেছিলো। কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না ও। দেবল ভদ্র আবার গর্জে ওঠে।

মৃত্যুদণ্ড থেকে তুই এক শর্তে ক্ষমা পেতে পারিস, যদি তুই রাজার প্রশস্তি লিখিস।

কাহ্নুপাদের চোখের তারা কেঁপে স্থির হয়ে যায়। ও কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ও ভীষণ আশ্চর্য হয়ে অনুভব করে যে ওর হাঁটু কাঁপছে না, মাথা ঘুরছে না, চোখের সামনে থেকে আলো সরে যাচ্ছে না। ও দারুণ শক্তি অনুভব করছে।

কথা বলছিস না যে?

দেবল ভদ্র হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

রাজাকে আমি চিনি না।

বলিস কি?

আমি আমার লোকদেরই চিনি। আমি তাদের কথাই বুঝি।

রাজার কথা তোকে লিখতে হবে কানু।

রাজা আমার কেউ না।

এ্যাই একে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখ। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ওর আরো শাস্তি দরকার।

রাজার লোক কাহ্নুপাদকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। ধাক্কা দিয়ে আবার চুণের ঘরে ফেলে দেয়। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওর হাঁটুতে চিনচিনে জ্বালা শুরু হয়। উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার দরুন থুতনিতেও লেগেছে। না, কাহ্নুপাদের বুকে কোন ব্যথা নেই। কাহ্নুপাদ দেয়ালে ঠেস দিয়ে শরীরের যন্ত্রণা ভুলবার চেষ্টা করে।

শবরীর কাছে দিনরাত সব সমান হয়ে যায়। কখনো শুকনো মুখে চাঁচরবেড়ার ঘরে বসে থাকে, কখনো একা একা ঘোরে। উসকোখুসকো রুক্ষ চেহারা কবিতার ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটে ওঠে। কানু ছাড়া ও আর কিছু বোঝে

না। সেই কানুর জন্যে কখনো শবরীর চোখে জল আসে, কখনো দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে ওঠে। জল আর আগুন এখন শবরীর রাত দিনের সঙ্গী। শুয়ে শুয়ে পোষা ময়ূরটার সঙ্গে কথা বলে, তোর কি মনে হয় কানুকে রাজা মেরে ফেলবে? নারে না, তুই একটা পাগল। কানুকে যে আমি ভীষণ ভলোবাসি। আমার এত ভালোবাসা রেখে কানু মরবে কেন? কানু মরতে পারবে না। কিন্তু শবরীর কানু মরবেনা, কানুকে মারবে। ওকে ফাঁসি-গাছে ঝুলিয়ে রাখা হবে। না, তাহলে আমি রাজবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবো। দাউদাউ আগুনে জ্বলে উঠবে ঐ বাড়ির সব মহল। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শবরীর চোখের আগুনে আবার জল আসে। একলা ঘরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয় ও। নাওয়া খাওয়া কিছুই ভালো লাগে না। কানুর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। বেড়ায়-গোঁজা কলমটা লুকিয়ে রাখে। কত রাতে ও স্বপন দেখেছিলো যে রাজার লোক এসে পুরো ঘর তছনছ করে কলম খুঁজছে। কলমটার জন্যে শবরীর উপর অত্যাচার করেছে, তবু কলমটি দেয়নি ও। কিছুতেই বলেনি কোথায় রেখেছে। রাজার লোকেরা শেষ পর্যন্ত ওকে শাসিয়ে চলে গেছে। ঘুম ভাঙার পর কেমন নিথর হয়েছিলো শবরীর অনুভূতি। রাত কত বুঝতে পারেনি। বিছানা থেকে উঠে জানালায় দাঁড়িয়েছিল। বুকটা হু হু করে ওঠে। ভেঙে আসতে চায়। শবরী নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বিছানা ভালো লাগে না, ঘর ভালো লাগেনা। ইচ্ছে করে অনেক দূরে চলে যেতে। কানু ফিরে এলে, কানুকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে ও। সেখানে মনের সুখে গীত লিখবে কানু। অনেক লোক নিয়ে আসর বসবে। সেখানে গীত পড়া হবে, গাওয়া হবে। কানুর বুকের ভাষা সকলের বুকের ভাষা হয়ে মুখে মুখে ফিরবে। ওদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তেমন একটা জায়গা কি হবে না যেখানে ওদের মুখের ভাষায় গীত লিখলে রাজার লোক মারতে আসবে না? সেখানে রাজা প্রজা সব এক হয়ে যাবে। তেমন একটি জায়গা কি কোনো দিন হবে না? খুব বড় জায়গা ওদের দরকার নেই। ছোটো একটু জায়গা হলেই হয়। ওরা ঠাসাঠাসি করে থাকবে। মোটা কাপড়, মোটা ভাতে ওদের দিন কেটে যাবে। স্বপ্ন দেখে শবরী। স্বপ্ন দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। অন্তত কিছুক্ষণ ওর কষ্ট থাকে না।

স্বপ্ন দেখে কাহ্নুপাদ। বন্ধ কুঠুরির অন্ধকারে বসে স্বপ্ন দেখা ছাড়া ও আর কিছু করতে পারে না। চুণের গন্ধে যখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, দম আটকে আসে; তখন স্বপ্ন দেখলে নিঃশ্বাস সহজ হয়ে ওঠে। বুক হালকা হয়ে যায়। সারাদিনে একবার খাবার দেয় দ্বাররক্ষী। তাও পরিমাণের তুলনায় একদম কম। পেট ভরেনা। ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি ওলোটপালোট করে। কাহ্নুপাদ নির্বিকার থাকায় চেষ্টা করেও পারে না। দেয়ালের গায়ে লাথি মারে, ঘুঁষি দেয়। হাতে ব্যথা পায়। তখন চিৎকার করে দেবল ভদ্রকে গালাগাল করে। চারদেয়ালের ফাঁক-ফোকরে সে গালি বাইরে যায় না। তাই কেউ ছুটে আসে না। দমাদম ঘুঁষি মারে না। টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে ফেলে না। অথচ কাহ্নুপাদ চায় কেউ ছুটে আসুক। দরজা খুলুক। ও আলো দেখতে পাবে। সে আলোয় দৃষ্টি ধুয়ে নেবে। চিৎকার করে এক সময় নিজের জায়গায় ফিরে আসে। আজ এক মাস চার দিন হলো ওকে এ ঘরে আটকে রেখেছে। এভাবেই ওকে দুর্বল করতে চাইছে দেবল ভদ্র। সেদিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর আর একদিনও এ ঘর থেকে বের করেনি। কাহ্নুপাদ বুঝতে পারে ক্রমাগত ওর শরীর দুর্বল হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করে। পা কাঁপে। শরীরে শক্তি নেই যেন। অথচ সবকিছু কমে গেলেও কাহ্নুপাদের সাহস কমেনি। তা ক্রমাগত জমাট হচ্ছে, নিরেট হচ্ছে। সেখানে কোনো ছিদ্র নেই। ছিদ্রপথে ভয়ের স্রোত গলগলিয়ে ঢোকে না। আর সে কারণেই কাহ্নুপাদের চিত্তে সুখ থৈথৈ করে। ও চুণের ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা নতুন দ্বীপের স্বপ্ন দেখে। তিন দিন পর রাজার

লোক ওকে দরবারে নিয়ে এলে দেবল ভদ্রের ক্রুর হাসি দু'কানে এসে বাজে। কাহ্নুপাদের মাথা ঝিম ঝিম করে। দাঁড়াতে কষ্ট হয়। ও ধপ্ করে মেঝের ওপর বসে পড়ে।

কি রে তেজ কমেছে?

কাহ্নুপাদের মাথা মাটির দিকে। দেবল ভদ্রের দিকে তাকায় না। এভাবেই উপেক্ষা করতে চায়। ওর বারবার মনে হয় ওর পায়ের নিচে শক্ত মাটি আছে। কিন্তু দেবল ভদ্রের নেই। দেবল ভদ্রের সব প্রতাপ, ক্ষমতা, দম্ভ, অহংকার নিয়েও সে চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যাই, মাথা ওঠা।

কাহ্নুপাদ মাথা সোজা করে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও টান হয়ে যায়। কেমন বুঝছিস? এবার আমার কথায় রাজি তো?

কাহ্নুপাদ কথা বলে না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

এ্যাই, কথা বলছিস না যে? লিখবি আমাদের রাজার কথা। লিখবি আমার কথাও। রাজা কত দয়ালু। কত মহান। প্রজাদের সুখের জন্য রাজার প্রাণ কাঁদে।

না।

শব্দটা কাহ্নুপাদের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

না?

দেবল ভদ্র মাটিতে পা আছড়ায় ঃ

আমার মুখের ওপর না-বলার সাহস তোর কোথা থেকে হলো শুনি? ধরাকে সরাজ্ঞান করতে শিখেছিস?

না, তা কেন? আমার ভাষায় আমার লোকের কথাই হয়। রাজরাজড়ার কথা হয়না।

ঠিক আছে। মজাটা টের পাবি। একবারে মারবো না তোকে, তিলে তিলে মারবো। এ্যাই, নিয়ে যা একে। আগামী রোববার ওর দু'হাত কেটে ফেলা হবে। তোরা ওর শাস্তির আয়োজন কর।

রক্ষী কাহ্নুপাদকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

একজন ওকে বলে, কেন যে মিছেমিছি গোঁ ধরেছিস? হাত দু'খান গেলে লিখবি কি দিয়ে?

যা বুঝিস না, তা বলতে আসিস না।

কাহ্নপাদ রুখে দাঁড়ায়।

বাব্বা, তেজ এখনো কমেনি। শালার ভয়ও নেই!

কাহ্নুপাদের হাঁটতে কষ্ট হয়। মাথার ঝিমঝিম ভাবটা তীব্র হয়েছে। বমিবমি লাগছে। অন্ধকার কুঠরীতে ফিরে আসার পর কাহ্নুপাদ অবসন্নের মতো বসে থাকে। ইচ্ছে করে পেট ভরে ভাত খেতে। ইচ্ছে করে শবরীকে দেখতে। ইচ্ছে করে ডোম্বির কাছে ছুটে যেতে। দেয়ালের গায়ে মাথা ঠেস দিয়ে রেখেও কাহ্নুপাদ স্বস্তি পায়না।

ডোম্বির মেদহীন ধারালো শরীর ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের ফলা হয়ে গেছে। এখন আর শুধু নৌকা বাইতে ভালো লাগে না। মনে হয় দেশাখের কাছে তিরধনুক ছোঁড়া শিখবে। তাহলে হয়তো একটা কিছু করতে পারবে। শুধু দড়ি, কাছি আর বৈঠায় কিছু হয় না। এখন হাত চায় অন্য কিছু। হাত চায় অন্য জিনিস। ডোম্বি অন্যমনস্ক হয়ে

নৌকার ওপর বসে থাকে। দেবল ভদ্রের ভাগ্নের মুখ ভেসে ওঠে। বড় জ্বালায়। রাতের অন্ধকার হলেই হলো বেড়াল হয়ে দরজার পাশে এসে শব্দ করে। ডোম্বির মনে হয়, বড় গ্লানি। এ গ্লানির কথা কানু তার গীতে লিখেছে। কানু ব্যঙ্গ করেছে। অপমানে ডোম্বির বুক জ্বালা করে। আর এটা লেখার জন্যেই কানুকে ধরে নিয়ে গেছে। দপ্ করে জ্বলে ওঠে ও। প্রতিশোধ নিতে হবে। কোমরে-গোঁজা ছুরির ওপর হাত রাখে।

দু'দিনের মধ্যেই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে ডোম্বি। রাতের অন্ধকারে দেবল ভদ্রের ভাগে ওর ঘরে আসতেই মন স্থির করে ও। উত্তেজনার চরম মুহূর্তে ছুরিটা আমূল বসে যায় দেবল ভদ্রের ভাগ্নের বুকে। বাধা দেবার কোনো সুযোগই ছিল না তার। ওর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ে ডোম্বি। রক্তের রেখা ওর ঘরের মেঝেয় সাপের মতো এঁকেবেঁকে যায়। সে রক্তের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় কানুও কি এমন রক্ত ছড়িয়ে মরে যাবে? বুকটা খালি হয়ে যায়। চেপে আসে নিঃশ্বাস। ডোম্বি তর্জনী দিয়ে রক্তের রেখায় আঁকিবুঁকি কাটে। কানুর জন্যে বুকটা ফেটে চৌচির। কানু ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। ডোম্বির বুকে শোকের পাহাড় গড়ে ওঠে। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ভোর হতেই ওর ঘরে লোক এসে ভরে যায়। ডোম্বি কারো দিকে চায় না। কথা বলে না। কেবল কাঁদে। মরার আগে কানুর সঙ্গে একটিবার দেখা হলো না। দেশাখ একরকম জোর করে ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। পিপুল গাছের ছায়ায় বসিয়ে দেয়। কাঁদছিলি কেন ডোম্বি? ভয় কিসের?

ভয়?

মুহূর্তে ডোম্বির চোখ জ্বলে ওঠে।

ভয় পেলে আর মারবো কেন? ঐ বামুনের মুখের ওপর থুতু ছিটোতে ছিটোতে আমি মরতে যাবো দেশাখ। শুধু বুকটা ভেঙে যায় যখন ভাবি মরার আগে কানুর সঙ্গে দেখা হবে না।

দুঃখ করিস না। আরেক জন্মে হবে।

তাই যেন হয়।

ডোম্বি আঁচলে চোখ মোছে। দেশাখ অভিভূতের মতো ডোম্বিকে দেখে। এই মুহূর্তে ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। ডোম্বি বড় একরোখা, সাহসী। ডোম্বি দুর্বিনীত। এই সাহসটা সবার বুকের মধ্যে থাকলে ওদের অবস্থা অন্যরকম হতো।

গাঁয়ের লোকের মুখে কথা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং পরবর্তী সময়ের ভয়াবহতার চিন্তায় সকলেই নির্বাক। ওরা ভাবতে পারছে না যে এরপর কি হবে। ওদের জীবনে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। বড় এক তরফা ভাবে সব অত্যাচার সইতেই ওরা অভ্যস্ত। প্রতিবাদের সাহস ছিলো না। ডোম্বি বড় বেশি দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছে। এখন ওরা কি করবে? কি ভাবে বাঁচবে? নিমাই বুড়ো ভিড়ের মধ্য থেকে দেশাখকে একপাশে ডেকে নিয়ে আসে।

কেমন হলো দেশাখ?

কি আর? কানুদার অপমানের প্রতিশোধ নিলো ডোম্বি।

কিন্তু এখন আমরা বাঁচবো তো? ওরা আমাদের শেষ করে দেবে।

বাঁচতে না পারলে, মরাই ভালো কাকা।

তোদের কথাবার্তা আমি বুঝিনা। তোরা পেয়েছিস কি বল তো?

আঃ কাকা চুপ করুন। এমনিতেই গাঁয়ের লোক ভয়ে চুপসে গেছে, আপনি এমন করলে ওরা আরো ভয় পাবে।

নিমাই বুড়ো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

চুপ করুন কাকা, চুপ করুন।

ছেলে বুড়ো নারী সকলের চোখ ছলছল করে।

কত পাপ জমা হয়েছে আমাদের? কি পাপে এমন হলো? কান্নার রোল ওঠে। সকলেই কাঁদে। দেশাখ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাকে বোঝাবে? এখনো যারা নিজেদের কথা ভাবতে শেখেনি তাদের কাছে দেশাখের উপদেশ অর্থহীন। ও দাঁত কিড়মিড় করে। এখন ওদের জন্যে বড় ধরনের একটা আঘাত প্রয়োজন। সে আঘাতে ওদের চেতনায় পল্কা ছায়া ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তারপর ওরা দাঁড়াবে। কোমর সোজা করে। বুক টান করে। তার আগে নয়। ও চুপচাপ সরে পড়ে। ডোম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়।

এতদিনেও কানুকে ছাড়লো না। কানুকে কি ওরা মেরে ফেলবে দেশাখ?

জানিনা।

দেশাখের গলা কেঁপে যায়। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

কানু আমাদের সবার জন্যে লড়ছে। একটা বামুন মেরে দেখালাম আমরাও মারতে পারি। আমরা শুধুই ছোটলোক নই। ... এই সুখ নিয়েই আমি মরতে পারবো দেশাখ।

ডোম্বির মুখে ক্ষীণ হাসি।

দেশাখ আমার কথা তোর মনে থাকবে?

ডোম্বি, ডোম্বি রে!

দেশাখ কথা বলতে পারে না। দেশাখের যেন কি হয়। ওর ঠোঁট কাঁপে।

তোর ছেলে হলে তাকে আমার কথা বলবি দেশাখ?

বলবো রে বলবো। তোকে আমরা কেউ কোনোদিন ভুলবোনা। আমাদের তেমন সুযোগ হলে তোর সোনার মূর্তি বানিয়ে রাখবো ডোম্বি।

দেশাখ কান্না চাপতে দ্রুত ওর সামনে থেকে সরে যায়। ডোম্বি পিপুল গাছে ঠেস দিয়ে চোখ মোছে।

রাজার লোক যখন গাঁয়ে আসে সূর্য তখন মাথার ওপর। ডোম্বির হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে, কোমরে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আশেপাশে কেউ নেই। ডোম্বি একা। এতক্ষণ যারা মজা দেখার জন্যে ভিড় জমিয়েছিলো তারা রাজার লোক আসতে দেখেই পালিয়েছে। শুধু দেশাখ অনেকদূর থেকে ওর সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত আসে। কাছে আসতে পারে না। রাজার লোকদের শরীরে আগুন। হাতে লাঠি। মুখে গালাগালির বর্ষণ। নৌকায় ওঠার সময় ওদের একজন ডোম্বির পাছায় লাথি মারলো। তাল সামলাতে না পেরে ডোম্বি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো নৌকার ওপর। দেশাখের ইচ্ছে করলো ছুটে গিয়ে ডোম্বিকে বুকে তুলে নেয়।

এই ঘটনার পর কারো চোখে ঘুম নেই। সারা পল্লীতে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কোনো বাচ্চা কেঁদে উঠলেও সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। এই বুঝি রাজার লোক এলো। একলা ঘরে ঘুম আসে না শবরীর। ডোম্বির জন্যে মন খারাপ করে। ও কানুর জন্যে প্রতিশোধ নিয়েছে এটা ভাবলেও বুক টনটন করে। রাগ হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায় গোঁজা ময়ূরপালক ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। জানালায় বসে থেকে লোক দেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু কাউকে দেখা যায় না। একজন লোককে দেখার জন্যে শবরীর বুক খাঁ-খাঁ করে। মাঝে মাঝে দেশাখ আসে। শুকনো মুখে বসে থাকে। দু'চারটে কথা হয়। দেশাখের গলা ভাঙা। ফ্যাসফ্যাস করে। কিছু ভেবোনা বৌদি? কানুদা নিশ্চয় ফিরে আসবে।

কানু তো ওদের কথা শুনছে না। কানুকে ওরা মেরেই ফেলবে।

অকস্মাৎ দু'জনের কথা ফুরিয়ে যায়। শবরী জানালার কপাটে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে।

আজও সন্ধ্যার দিকে দেশাখ আসে। ডোম্বিকে নিয়ে যাবার পর থেকে ও কোথাও দু'দণ্ড বসে স্বস্তি পাচ্ছে না। ছটফট করছে। অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। শবরী ঘরে আলো জ্বালেনি। দেশাখের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

কে?

আমি দেশাখ, বৌদি।

এসো।

আলো জ্বালোনি কেন?

ভালো লাগছে না।

তোমার মুখে এছাড়া কথা নেই। আলো জ্বালাও দেখি।

শবরী মাটির প্রদীপ জ্বালায়। মিট্‌মিটে আলোয় অন্ধকার তেমন কাটে না। শবরী হরিণের চামড়া বিছিয়ে দেয়। দেশাখ ধপ্ করে বসে হাঁটুতে মুখ গোঁজে। শরীরের ভার কোথাও ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। আজ ওর হৃদয় শুধু ডোম্বির জন্যে। সেখানে আর কেউ নেই। এমন কি বিশাখাও না। সকালের ঘটনার পর থেকে ডোম্বি ওর হৃদয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে—দড়ি, কাছি, বৈঠা হাতে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে। এর বাইরে ডোম্বির অন্য কোনো ভঙ্গি নেই।

দেশাখ?

বলো।

ডোম্বি কি আমার চাইতেও কানুকে বেশি ভালোবাসতো?

এসব কথা থাক বৌদি।

তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো?

না তা নয়। আমি বুঝি ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন ছিলো। ডোম্বি সেটা করেছে। কানুদা করেছে। একে একে আমরা সবাই করবো।

আর আমি বুঝি, ডোম্বি আমার চাইতে কানুকে বেশি ভালোবাসতো। সে কারণে ওর জন্যে মরতে পেরেছে। আমি পারিনি।

ডোম্বিকে তুমি চিনতে পারো নি বৌদি। তোমার মন খারাপের কারণ নেই।

শবরী কথা বলে না। দেশাখও না। বেশি কথা বলতে ওর ভালোও লাগে না। অনেকক্ষণ দু'জনের চুপচাপ কেটে যায়।

কি ভাবছো দেশাখ?

কিছু না।

অমাবস্যার রাতে এমন অন্ধকার আর কখনো দেখিনি।

এটা তোমার মনের ভুল।

মনের ভুল?

হ্যাঁ, তুমি দুশ্চিন্তায় আছো, তাই এমন ভাবছো। সব অমাবস্যার রাতই একরকম। কৈ তেমন অন্ধকার তো আমার মনে হচ্ছে না।

কোনো কিছুই আমার ভালো লাগে না দেশাখ। একা একা থাকতে আমার ভয় করে।

বাইরে পেঁচা ডাকে। শব্দটা দু'জনের মনের মধ্যে খট্‌খট্‌ আওয়াজ ওঠায়। যেন ভীষণ দুঃসংবাদ বহন করে একটা ঘোড়া ছুটে আসছে।

কিছু বলছো না কেন দেশাখ?

আজ আমারও কিছু ভালো লাগছে না। আমি যাই। তোমার কিছু দরকার হলে আমাকে খবর দিও।

শবরী কিছু বলার আগেই টিলার গা বেয়ে দ্রুত নামে দেশাখ। অন্ধকারে ওকে দেখা যায় না। শবরী আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। দেশাখ থাকলে সময়টা ভালো কাটতো। এখন শবরী কিছু করতে পারছে না। কান পেতে একটানা পেঁচার ডাক শোনে।

দেশাখ হাঁটতে হাঁটতে বিশাখাদের বাড়ির কাছে আসে। চারদিক নির্জন। ভীষণ অন্ধকার। তবু একটুও ভয় করে না ওর। হাঁটতে ভালো লাগে। এক মুহূর্ত ঘরে থাকতে মন চায় না। ঘরে ফিরলেই ভুসুকুর মুখোমুখি হতে হয়। ভুসুকু ওর দিকে কেমন দৃষ্টিতে যেন চায়। মুখে কিছু বলে না। অথচ ঐ চোখের ভাষা ভয়ানক তীব্র। ভুসুকুর দৃষ্টি পাল্‌টে গেছে। তেমন দৃষ্টি থাকলে মুখ দিয়ে কথা বলতে হয় না। দেশাখ ভুসুকুর সামনে থেকে পালিয়ে বেড়ায়। ভুসুকুর জন্যে ওর মন কেমন করে। কিছুদিনের মধ্যে ও হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

এসব ভাবনা ভাববে না বলে দেশাখ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে টিলা বেয়ে বিশাখাদের বাড়ির দরজায় আসে। বিশাখার মা শুকনো মুখে বসে আছে।

কেমন আছো মাসী?

আর থাকাথাকি! বিশাখার বাবার শরীর ভালো না। তুমি বোসো বাবা।

দেশাখ দরজার কাছেই বসে। ঘরে মিটমিটে আলো। একসাথে ভাইবোনগুলো ঘুমুচ্ছে। বিশাখা ওর বাবার মাথার কাছে বসে আছে। বুড়ো কাশছে।

আমাদের কি হবে বাবা?

কেন মাসী?

সকালে কেমন একটা কাণ্ড হলো? এমনিতেই আমাদের অবস্থা ভালো না। তারপর সারাক্ষণ মনে হচ্ছে ঐ বুঝি রাজার লোক এলো। বিশাখা তো সারাদিন কিছু খায়নি। কেবলই ভয় পাচ্ছে। জানালার কাছে বসে থাকে। রাস্তা দেখে।

দেশাখ চুপ করে থাকে। ভয় কোথায় নেই? ওর নিজের মনের মধ্যেও আছে। সেটা প্রবল নয়। ও সাহস বজায় রাখতে পারে।

তোমার মা কেমন আছে দেশাখ?

ভালো।

বাবা?

বাবা বেশি ভালো না। এখন-তখন অবস্থা। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। তুমি বোসো। বিশাখা ওকে চারটে মুড়ি দে।

বিশাখার মা উঠে চলে যায়। দেশাখ কি করবে বুঝতে পারে না।

বিশাখার বাবার গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ আসছে। দেশাখ একমনে সেটা শোনে।

মুড়ি খাও।

বিশাখার মুখ শুকনো। কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না। দেশাখ হাসে। আস্তে করে বলে, ভয় পাচ্ছো কেন? তোমাকে না তীরধনুক চালানো শিখিয়েছি?

দেশাখ মুড়ির বাটি টেনে নিয়ে একমুঠি মুখে পোরে। বিশাখা চলে যায়। ও কথা বলতে পারে না। দেশাখের মতো বুকের পাটা ওর নেই। সাহসের কথা ওর মুখে আসে না। সেজন্যে কিছু বলতে পারে না।

বিশাখার মা কাছে আসতেই দেশাখ উঠে দাঁড়ায়।

মাসী, শবরী বৌদি একা থাকতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। আজ রাতে বিশাখা তার ওখানে থাকুক। আমি তাকে বলেছি বিশাখাকে এনে দেবো।

বিশাখার মা চুপ করে থাকে।

কিছু অসুবিধা হবে না মাসী। ভোরে উঠেই ও চলে আসবে।

আচ্ছা, নিয়ে যাও। মেয়ে বড় হলে কত যে চিন্তা হয়।

বিশাখার মা দেশাখকে না করতে পারে না। দেশাখ বলেছে মাস দু'য়েকের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে।

দু'জনে টিলা বেয়ে নেমে আসে।

দেখলে তো কেমন কৌশলে তোমাকে নিয়ে এলাম।

মানে?

শবরী বৌদির ওখানে তুমি রাতে থাকবে সেটা ঠিক। তার আগে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ। বৌদি কিছু বলেনি। তোমাদের ঘরে বসে থাকতে খারাপ লাগছিলো। ভাবছিলাম তোমাকে নিয়ে বেরোই কেমন করে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা এসে গেলো।

উঃ তুমি—

গাল দিও না। তুমিও খুশি হয়েছো আমি জানি।

দু'জনে হাসে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না। শুধু হাতে হাত ধরা। দেশাখের মনে হয় সারাদিনের পর এতক্ষণে ও খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গুমোট অবস্থাটা কেটে গেছে। বিশাখা, ইচ্ছে করছে তুমি আর আমি প্রাণখোলা হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তুলি। সকলের বুকের ভয় তাড়িয়ে দেই।

তা কেমন করে হবে। আমাদের সর্বনাশ হবে।

ঠিক আছে এখন এসব কথা থাক। তুমি একটা গান গাও বিশাখা।

আমি গান জানি না।

ডোম্বি খুব ভালো গাইতে পারতো।

আবার আবহাওয়া ভারি হয়ে যায়।

ডোম্বিকে ওরা মেরে ফেলবে দেশাখ?

হয়তো।

আমাদের উৎসবগুলো মাতিয়ে রাখবে কে?

দেশাখ কথা বলে না।

কানুদার কি হবে দেশাখ?

জানি না।

খারাপ কিছু ভাবতে আমার ভালোলাগে না।

আমারও না।

দু'জনে চুপচাপ হাঁটে। এই অন্ধকারে হাঁটতে ওদের ভালোই লাগে। শবরীর টিলা বেশ খানিকটা পর। চালতা গাছের কারুকার্যময় ঘন পাতার আড়ালে বসে পেঁচা ডাকে। মহুয়া ফুলের গন্ধ আসছে। এখনও তোমার ভয় করছে বিশাখা?

হ্যাঁ।

জোরে জোরে কথা বলো ভয় কেটে যাবে।

জোরে কথা বলতেও আমার ভয়।

তাহলে কি করবো?

জানিনা। উঃ যা অন্ধকার।

চলো দৌড়াই এবং প্রাণখুলে হাসি।

দু'জনে হাত ধরাধরি করে দৌড়ায়। বিশাখা হোঁচট খেলে দেশাখ ওকে বুকে তুলে নেয়।

১১

পরদিন সকালে ডোম্বিকে ফাঁসি-গাছে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। চারদিক থম্‌থম্‌ করছে। ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হয়না। দেশাখ নদীর ঘাটে বসে থাকে। কি করবে বুঝতে পারে না। নিমাই এসে ওর কাঁধে হাত রাখে, দেশাখদা চলো তীরধনুক নিয়ে বনে যাই। হাত কেমন নিশ্‌পিশ্‌ করছে।

আজ থাক নিমাই। ভালো লাগছে না।

কেন?

ডোম্বির জন্যে মনটা কেমন করছে? আমরা কেউ ডোম্বির মতো সাহসী হতে পারলাম না।

চল ডোম্বির লাশ নিয়ে আসি।

দেবেনা তো?

জোর করে আনবো।

সেটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু লাভ কি? তাহলে হয়তো কানুদাকেও মেরে ফেলবে। কানুদাকে আমাদের ভীষণ দরকার নিমাই।

ঠিক বলেছো। কানুদাকে ছাড়া আমরা কেমন একা হয়ে যাই।

দু'জনে বসে থেকে নদীর বয়ে যাওয়া দেখে। আকাশ দেখে। দূরের বন দেখে। এবং দু'জনে একসঙ্গে লক্ষ্য করে আজ কোনো খেয়া পারাপার নেই। ডোম্বির নৌকা বাতাসের ধাক্কায় এপাশ ওপাশ করে। রাজার আইন ফাঁসি-গাছে তিনদিন ঝুলিয়ে রাখা হবে ডোম্বির লাশ।

সেদিনই কাহ্নুপাদকে বের করে নিয়ে আসা হলো চূণের ঘর থেকে। ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। মাথা টলে। দ্বাররক্ষী ওকে ধাক্কা দিয়ে দরজা দিয়ে বের করে দিতে দিতে বলে, তোমাদের একটাকে তো শেষ করা হয়েছে। এবার তোমার পালা।

কাহ্নুপাদ দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিতে নিতে আঁতকে ওঠে। বুকের ধুক্‌পুকানি বেড়ে যায়। তবু জোরে শ্বাস নিয়ে বলে, কাকে শেষ করা হয়েছে?

ঐ যে মেয়েলোকটা নৌকা বইতো? সাহস কত! বামুনের গায়ে ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলেছে! বাপের জন্মেও এমন কথা শুনিনি। কি যে শুরু করেছে এরা!

কাহ্নুপাদের মনে হয় ও পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে। হাতের কাছে শক্ত অবলম্বনও। না খাওয়ার ফলে শরীরটা কেমন ঝিমিয়ে গেছে। কেমন এদিক ওদিক লোপাট খায়। এতক্ষণে কাহ্নুপাদ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ডোম্বির হাসি বুকের ভেতর বাজে। কি গো কানু বড্ড ভয় পেয়েছিলে বুঝি? আর কেউ না থাকুক আমি তো আছি তোমার কাছে। একটুও ভয় পেয়োনা তুমি।

রাজ দরবারে যাবার পথে দূর থেকে ডোম্বির লাশ দেখতে পায় ও। কাহ্নুপাদ চোখ ফেরাতে পারে না। অবিকল তেমনি আছে ডোম্বি। একটুও বদলায়নি। চোখ ঠিকরে আসেনি। জিহ্বা ঝুলে পড়েনি। দড়ি, কাছি, বৈঠা হাতে সেই দুর্বিনীত অথচ মোহন ভঙ্গি, যাকে বুকের ভেতর রেখেও কোনোদিন বোঝা যায় না। যার সাহসের থৈ পাওয়া মুস্কিল। কান্নায় ভেঙে পড়ে কাহ্নুপাদ।

হয়েছে আর অতো ঢঙ দেখাতে হবে না। একটু পরে তো তুমিও ওর সঙ্গী হবে।,

রক্ষীর গুঁতো খেয়ে স্থির হয়ে যায় কাহ্নুপাদ। চোখের সামনে সবকিছু সাদা দাগে। ঝাপসাও।

দেবল ভদ্র গর্জন করে ওঠে, না ওকে ফাঁসি-গাছে ঝোলানো হবে না। ওকে মেরে ফেলবো না। ওর হাত দু'টো কেটে ফেলো। গীত লেখার সাধ বুঝুক।

তারপর আর কোনোকিছু মনে নেই কাহ্নুপাদের। জ্ঞান ফেরার পর দেখে শবরী ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে।

এখন দিন না রাত?

বিকেল হয়েছে।

ও।

ওগো, এখন কেমন লাগছে?

কাহ্নুপাদ কথা বলে না। শবরী মুখ হাঁ করিয়ে দুধ দেয়। কখনো তা গলা দিয়ে নেমে যায়। কখনো ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা তুলতে পারে না কাহ্নুপাদ। জগা কবিরাজ ওর কেটে ফেলা হাতের মাথা গাছগাছালির ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। এরই মাঝে অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শুধু মনে হয় ওর চারপাশে অনেক লোক। অনেক কথা। অনেক গুঞ্জন। আজ সকলে ওর বড় কাছাকাছি এসে গেছে। সকলেই কাহ্নুপাদের কথা বুঝতে পারছে। কাহ্নুপাদ জানে না যে পরপর দু'টো ঘটনায় ওর আশেপাশে লোকজন বড় দ্রুত বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। একসময় সকলে চলে গেলেও দেশাখ চুপচাপ বসে থাকে। অজ্ঞান অবস্থায় রাজার লোক কাহ্নুপাদকে নদীর ধারে ফেলে গেলে ওরা ওকে নিয়ে আসে। বারুয়া মাঝি ওদের খবর দিয়েছিলো। দারুণ সময়ে ওরা খবর পেয়েছিলো। দেরি হলে হয়তো কাহ্নুপাদকে বাঁচানো যেতো না। সেই থেকে দেশাখের মুখে কথা নেই। ওর মনে হয় ওর বুকের গুহার মুখে কেমন করে যেন একটা বড় পাথর পড়ে গেছে। সেটা ঠেলে কিছুতেই কথা বেরিয়ে আসতে পারছে না। দেশাখ বোবা হয়ে থাকে। কাহ্নুপাদের আঙুলগুলো নেই। নইলে সেগুলো জড়িয়ে ধরলে দেশাখ একটা অবলম্বন পেতো।

সন্ধ্যার দিকে চোখ খোলে কাহ্নুপাদ। দেশাখ ওর মুখের উপর ঝুঁকে আছে।

কেমন লাগছে কানুদা?

একটু ভালো।

চুপচাপ শুয়ে থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে। জগা কবিরাজের ওষুধ তো নয় যেন ধন্বন্তরী।

এতদিনে আমার ভুল ভাঙলো দেশাখ। আমি যেন বুঝতে পারছি যে শুধু রাজ-দরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতের বড়াই করুক ওটা কারো মুখের ভাষা নয়। বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাখ।

ঠিকই বলেছো কানুদা।

বংশপরম্পরায় আমাদের মুখের ভাষা নদীর মতো বইবে। কোনোদিন তা মরে হেজে যাবে না।

কাহ্নুপাদ হাঁফায়। কথা বলতেও কষ্ট।

ওগো আর কথা না। তুমি ঘুমোও।

কাহ্নুপাদ চোখ বোঁজে। বড় করে শ্বাস নেয়। জগা কবিরাজের ওষুধে কাজ হয়েছে। ব্যথা এখন অনেক কম। দেশাখ আস্তে উঠে আসে।

আজ রাতে তুমি আর আমি সারারাত কানুদার পাশে বসে থাকবো বৌদি। আমরা কেউ ঘুমুবোনা।

ঘুম কি আর আসবে?

আমি একটু ঘরে ফিরে আসি বৌদি। দেখি—নিমাই ওরা কি করছে। ওদেরকেও ডেকে নিয়ে আসি। খুব সজাগ থাকো বৌদি।

দেশাখ চলে গেলে শবরীর কেবল কান্না পায়। অনেক রাতে শবরীর কান্নায় ঘুম ভেঙে যায় কাহ্নুপাদের।

কাঁদছো কেন সই?

শবরী আঁচলে চোখ মোছে।

আমার কিছু হয়নি সই। এখন থেকে আমি বলবো আর তুমি লিখবে। দেবল ভদ্র ইচ্ছে করলেই কি আর আমার গীত লেখা বন্ধ করতে পারবে? তুমি আমার কাছে এসে ঘুমোও।

ঘুম আসে না শবরীর। কাহ্নুপাদ আবার ঘুমিয়ে যায়। শবরী কাঁথাটা কাহ্নুপাদের গলার কাছ পর্যন্ত টেনে দেয়। কপালের চুলগুলো সরিয়ে দেয়। কানু একদম শুকিয়ে গেছে। গালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। অনেকদিন ঘুমোয়নি কানু। শবরীর আশ্রয়ে এখন নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে। শবরীর হৃদয় ফুঁসে ওঠে। কানুকে কেউ আর আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। শবরী জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় যে কোনো সময় কানু উঠতে পারে।

রাত কত বুঝতে পারে না শবরী। আজ পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় ভেসে গেছে প্রান্তর। এমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না ও অনেকদিন দেখেনি। হঠাৎ করে শবরীর খুব ভালো লাগে। দেশাখ এখনও আসছেনা কেন? কোথায় গিয়ে আটকে গেলো? তখুনি একটা মৃদু কোলাহল ওর কানে আসে। আস্তে আস্তে সেটা বাড়ে। শবরী ভালো করে খেয়াল করে। পুব পাড়ার ওদিকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। শবরীর ভয় হয়। কিছু বুঝতে পারে না। ও দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ঠিকই ধরেছে। বাড়ি পুড়ছে। চড়চড় শব্দে বাঁশ ফাটছে। তবে কি রাতের অন্ধকারে রাজার লোক ওদের ওপর হামলা চালালো? শবরীর হাঁটু কাঁপে ঠক্‌ঠক্ করে। ও দরজার কাছে বসে পড়ে।

ছুটতে ছুটতে দেশাখ আসে।

বৌদি?

কি হয়েছে দেশাখ?

রাজার লোকেরা আমাদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে।

কি হবে?

শবরী কেঁদে ফেলে।

পারো কেবল ফ্যালফ্যাল করে কাঁদতে। এখন কান্নার সময় নাকি বৌদি? নিমাই, অরুণ আরও বাকি সবাইকে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। ওরা অন্ধকার থেকে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদের অনেকগুলোকে ঘায়েল করেছে। তবে ওদের সঙ্গে আমরা পারবোনা। ওরা তো অনেক। তাই আমি ছুটে এসেছি কানুদার জন্যে। কানুদাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

কোথায় যাবে?

বনের কাছাকাছি যে বড় টিলাটা আছে ওখানেই আমি সবাইকে যেতে বলেছি। লোকজন ঐদিকে দৌড়ুচ্ছে। নিমাই আগে ব্যাপারটা টের পেয়েছিলো। দেখেছিলো ওরা দলে-দলে আসছে। আমরা অনেক জায়গায় খবর দিতে পেরেছি।

যাদের খবর দিতে পারো নি তাদের কি হবে?

জানি না।

দেশাখের গলা ভার।

দুঃখ এই যে ওদের সঙ্গে আমরা বেশিক্ষণ লড়তে পারলাম না বৌদি।

তবে প্রতিশোধ আমরা নেবোই।

আর কথা না। তাড়াতাড়ি চলো বৌদি। কানুদাকে ধরো।

জিনিষপত্র?

বেঁচে থাকলে ওগুলো আবার হবে।

দু'জনে কাহ্নুপাদকে নিয়ে দৌড়ুতে থাকে টিলার দিকে। চারদিকে আগুন। একটা একটা করে বাড়ি পুড়ছে। মানুষের চিৎকার, কান্না ইত্যাদি অনেক শব্দ ভেসে আসে ওদের কাছে।

ওরা সবাই টিলার কাছে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। কারো মুখে কথা নেই। বাচ্চারাও চুপ। মাথার ওপর ছাউনি নেই। বিশাল আকাশ অন্ধকারে ঢাকা। ওরা কতজন আসতে পেরেছে কেউ জানে না। ওরা কারো মুখ দেখতে পায় না। ওরা পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ পায় কেবল। বাতাসে কিসের গন্ধ ভেসে আসে। কাহ্নুপাদ নাক টান করে। তারপর বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে।

কানুদা?

কিরে দেশাখ?

কানুদা কিসের গন্ধ?

চামড়া পোড়ার গন্ধ।

কাহ্নুপাদ নির্বিকার উত্তর দেয়। গলার স্বর একটুও কাঁপেনা।

কানুদা?

দেশাখের কণ্ঠ চিরে যায়।

কেউ হয়তো আরামের ঘুম ঘুমিয়েছিলো দেশাখ। জানতেও পারেনি। ভিড়ের মধ্যে নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ ওঠে।

তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ। আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজ দরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ।

ভিড়ের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। দম আটকানো উৎকণ্ঠা এক-ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে নড়াচড়া করছে।

কাহ্নুপাদ দম নিয়ে আবার বলে, একটা ছোট্ট ভূখণ্ড আমদের দরকার। সে ভূখণ্ডটুকু সবুজ, শ্যামল আর পলিমাটি ভরা হলেই হয়। সে ভূখণ্ডের দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।

কাহ্নুপাদ থামতেই দেশাখ চেঁচিয়ে ওঠে : আঃ কানুদা! কেমন করে যে মনের কথা বলো। তুমি না থাকলে আমরা স্বপ্ন দেখতেই পারিনা। তখুনি চামড়া-পোড়া গন্ধটা বাতাসের প্রবল ঝাপ্‌টায় ওদের সবার নাকে মুখে কলগলিয়ে ঢোকে। সে গন্ধ প্রাণভরে বুকে টেনে হো হো করে হেসে ওঠে ভুসুকু :

কাহ্নিলা রে, আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলী।

৩.২ লেখিকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালে রাজশাহিতে, ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বদেশের মুক্তির ঠিক দু-মাস আগে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন সবটাই রাজশাহিতেই। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন তিনি; বাংলা একাডেমির (ঢাকা) মহা-পরিচালক হিসেবেও দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে মহিলাদের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেত্রী। মহিলাদের সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি অভিধান প্রণয়নেও নিরত রয়েছেন।

সেলিনা হোসেন অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িত্রী। তাঁর প্রখ্যাত বইগুলির মধ্যে (উপন্যাস-গল্প) : 'হাঙর-নদী-গ্রেনেড' (১৯৭৩), 'খেল-করতাল' (১৯৮২), 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩), 'চাঁদ বেনে' (১৯৮৪), 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯), 'কালকেতু-ফুল্লরা' (১৯৯২), 'কাকতাড়ুয়া' (১৯৯৬) আর (প্রবন্ধ) : 'স্বদেশে-পরবাসে' (১৯৮৫), 'উনসত্তরের গণঅন্দোলন' (ঐ) এবং 'একাত্তরের ঢাকা' (১৯৯০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, মহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক, লেখিকা সংঘের স্বর্ণপদক—ইত্যাদি পুরস্কারেও সেলিনা হোসেন সম্মানিত হয়েছেন। প্রগতিশীল ভাবধারায় প্রবুদ্ধ এই লেখিকার রচনার একটি বিশেষ দিক হল অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে বিচিত্র সমন্বয় ঘটানো।

৩.৩ রাজনৈতিক ভাবনা ও 'নীল ময়ূরের যৌবন'

'নীল ময়ূরের যৌবন' সেলিনা হোসেন লিখতে শুরু করেছিলেন যখন, তখন কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র : ৬.১০.১৯৭২-৫.৫.১৯৮০ এর রচনাকাল। কিন্তু, প্রায় আট বছর ধরে এই ১৮০ পাতা ডি-ডি মাপের ১২-পয়েন্ট টাইপে মুদ্রিত ছোট্ট বইটি লিখতে হয়েছিল কেন?...আসলে এর মধ্যে ১৯৪৮-'৫২-'-৫৬'৫৮-'৬৩-'৬৬-'৭১—পুব বাংলার জনজীবনের অসংখ্য সংগ্রামের অভিক্ষেপ তির্যক পরোক্ষতায় নানাভাবে ছায়া ফেলে গেছে। এই বইতে 'ক্রীতদাসের হাসি'-র মতো রূপকবিন্যাস অত জটিল নয়; কিন্তু নানাভাবেই এর মধ্যে সমকালের পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-সুখ, প্রেম-বিচ্ছেদ, প্রতিবাদ-পরিগ্রহণ—সবকিছু বিম্বিত হয়েছে। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটা এখানে বৃহত্তম সঙ্কেত হয়ে দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদীদের ফতোয়া জারির ব্যাপারগুলোও এতে এসেছে বারংবার। পূর্ব-পাকিস্তানের পুতুল-প্রতিম শাসকরা, রাজার মধ্যে প্রতিভাসিত। ...আর এখানেও প্রতিবাদের প্রথম সৈনিক এক কবি : চর্যাগীতিকার কাহ্নপাদ; কাহ্নিলা, কানুপা। রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র এখানে ব্রাহ্মণ্য-মহিমার বিধান দিয়ে পীড়ন ও শোষণ করেছেন মানুষকে। এই 'ব্রাহ্মণ'-রা তো আসলে মৌলবাদী- মৌলবিদেরই বিম্বিত-মূর্তি, যারা হরওয়াক্ত তহ্‌জিব-তমুদ্দুন-মজ্‌হবের দোহাই পেড়ে সাধারণ বাঙালির ওপর শোষণ পীড়নের স্টিম রোলার চালিয়েছে। বাংলা ভাষাকে রাজ-দরবারে সংস্কৃতের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ায় কানুপা মন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন। (ঠিক যেমনভাবে বাংলাকেও উর্দুর মতনই সমান গুরুত্ব দিয়ে পূর্ব-পকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫২ থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন।) মন্ত্রীর ঘোষণামাফিক পীড়ন-শোষণকে না মেনে, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে শত্রুনিধন করে, ফাঁসিকাঠে ঝুলে শহিদ হয়েছে। খেয়াপারানি ডোম্বি; সে কাহ্নপাদের প্রেমিকা। স্ত্রী শবরীকেও

ভালবাসে কানু; কিন্তু ডোম্বি তার জীবনে অনন্য এক অভিভব। ডোম্বি, তার কাছে গানের সুর; সে তার মল্লারী। তার জীবনের রিমঝিম বর্ষার স্নিগ্ধ রাগিনী। সমকালের রাষ্ট্রীয় সংঘাত, অতীতের ধূলিবিলীন ইতিহাস আর কল্পনার সৃষ্টিলাবণ্য— একই সঙ্গে এভাবেই মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে অনবদ্য দক্ষতায়।

৩.৪ চর্যাপাদের প্রতিবিম্বন ও সমকাল

চর্যার বিভিন্ন পদের বর্ণনামাফিক চরিত্র এবং ঘটনার বিবরণ এতে আছে। কাহ্নু, কুক্কুরী, ভুসুকু, শবরী, ডোম্বি-প্রমুখ নামের বিভিন্ন সব চরিত্রের পাশে এসেছে দেশাখ, বিশাখা, ধনশ্রী, ভৈরবী, সুলেখা এবং আরো অনেকে। তিন ধাতুর খাটে বাসরশয়ন, গুঞ্জামালায় ময়ূরপুচ্ছে নিজেকে সাজানো, বন ঘিরে হরিণ শিকার, নিরন্ন সংসারে নিত্য অতিথির আবির্ভাব, পথায় জলদস্যুর হাতে পড়া, ডোম্বির নৌকাবাওয়া, কাকের ডাকে দিনের বেলা ভয়-পাওয়া, রাতের আঁধারে গৃহবধূর পরপুরুষের অভিসারে বেরোনো—প্রভৃতি বহু পরিচিত চর্যাই এর ছোট-বড় ঘটনায়-গাঁথা কাহিনিটি গড়ে তুলেছে। এইসব ঘটনার কুশীলবদের জীবনচর্যার অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেলিনা। কিন্তু সেসব হল এই কাহিনির একটা মাত্রা; অন্য মাত্রায় তারা বাংলা ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে; ব্রাহ্মণদের অনাচারী বিধিবিধানকে ধিক্কার দেয়; মুখোমুখি সংগ্রামের জন্য তিরধনুক চালাতে শেখে নারী-পুরুষে; স্বাধীন এক দেশের স্বপ্ন দেখে, যেখানে তারাই রাজা; আর দমন-পীড়নকে তুচ্ছ করে আপন মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হয় বেপরোয়া। এই দুই মাত্রায় বিন্যস্ত গল্পে সেলিনা হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুই দশকের লড়াইকে যেন বিচিত্র এই টাইম-মেশিনের সাহায্যে নিয়ে গেছেন চর্যাপর্বের বাংলায়, কানু-ভুসুকুদের দেশ-কালে।

আশ্চর্য কিছু সংলাপ এবং বর্ণনা আছে এই বইতে, যেগুলি সেলিনা হোসেনের নিজের সমকালের রাজনৈতিক ভাবনার মুন্সিয়ানার যথার্থ দ্যোতনাবাহী। যেমন :

(ক) "এসো আমরা ছোটলোকেরা আলাদা হয়ে যাই। আমাদের ভেতর থেকে একজনকে রাজা বানাই..জমির সব মালিক হবো আমরাই।"

(খ) "ধরো এই বনটা আমাদের রাজ্য। গাছপালা, পশুপক্ষী, সব প্রজা—তুমি আমার রাণী।"

(গ) "কোথায় যেন আপন নিয়মে ফোকর তৈরি হচ্ছে। সেটা ঠেকাবার সাধ্য কারুর নেই।"

(ঘ) "কেউ যদি সামান্য কথাও এদিক-ওদিক করে বলে, সঙ্গে-সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবে। গাঁয়ে থম্‌থমে পরিবেশ ভূতুড়ে হয়ে থাকে।"

(ঙ) "দেশাখ সারা বিকেল ছেলেদের তির ছোঁড়া শিখিয়েছে।"

(চ) "তাহলে করবি কী? গীত লিখবি?...হ্যাঁ, ঐ আমার কাজ।"

(ছ) "এক কানু গেলে কী হবে? তোরা তো আছিস?"

(জ) "তাহলে আমি রাজবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব। দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠবে সব মহল।"

(ঝ) "কানুর বুকের ভাষা সকলের বুকের ভাষা হয়ে মুখে-মুখে ঘুরবে।"

(ঞ) "দুঃখ করিস নে দেশাখ, আমাদের তেমনই একটা জায়গা হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা-প্রজা সমান হবে।

আমাদের ভাষা রাজদরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ।"

(ট) "একটা ছোট ভূখণ্ড আমাদের দরকার। সে ভূখণ্ডটুকু সবুজ, শ্যামল আর পলিমাটি ভরা হলেই হয়। সে ভূখণ্ডের দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন, আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।"

(ঠ) "আঃ! কানুদা, কেমন করে যে মনের কথা বলো?"

(ড) "কাহ্নিলা রে! আজি ভুসুকু বঙ্গালি ভৈলী।"

—"৫২ থেকে '৭১, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার আগের দু-দশকের সমস্ত আবেগই এই কয়েকটি উদ্ধৃতির ছত্রে-ছত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে না কী? ভাষা নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, সেটাই বিশ বছরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে পরিণতি পেয়েছিল। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বপ্নের-আকাশ-থেকে-নামা এক স্বাধীন, আপন অধিকারে ঋদ্ধিমান দেশের। এই সংগ্রাম-এবং-স্বপ্নই হাজার বছর আগের পটভূমিতে সাজিয়েছেন সেলিনা হোসেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদেরই শিরোনাম "অপনা মাঁংসে হরিণা বৈরী" দিয়েছেন তিনি : এই হরিণী, বাংলাদেশ—বাঙালির ঐতিহ্য। বৈরিতার কথা, শাসকদের শোষণটাকে সঙ্কেত করেই বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে।

৩.৫ বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা : স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ

এই গল্পটা শুরু হয়েছিল, মানুষগুলির সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে। তাদের অভাব, দারিদ্র্য, প্রেম, বেদনা, শ্রম ও ঘর্মের কাহিনি হিসেবে। সেই আবেগ এবং অভিব্যক্তির ব্যত্যয় ঘটেনি কাহিনিতে। কানু-শবরী-ডোম্বি, বিশাখা-দেশাখ, সুলেখা-ভুসুকু-সুদাম, ভৈরবী-ধনশ্রী-কামোদ—এদের পারস্পরিক টানা-পোড়েনের পাশাপাশি— রাজা-মন্ত্রী-সৈন্য-সাবুদ বনাম সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্বও সমান্তরাল—কাহিনির শেষে কুশীলবরা সবাই নিজেদেরকে ছাপিয়ে, সকলে মিলে এক সুসংহত বিশাল সত্তায় পরিণত।

কানু রাজদরবারের কবিসভায় বাংলায় লেখা নিজের গীত পড়তে চেয়েছিল। সংস্কৃত-নিষ্ঠ মন্ত্রী দেবল ভদ্র তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। লাঞ্ছিত কানুর পাশে এসে দাঁড়ায় তার ডোম্বি; তার মল্লারী। রাজমন্ত্রী ব্রাহ্মণ দেবল ভদ্রের ফতোয়া খেয়াপারানি সেই বিদ্রোহিনীকে করে তোলে আরও উত্তপ্ত। "ছোই ছোই জাইসি বাম্ভন নাড়িয়া" পদটি স্মরণে রেখে সেলিনা হোসেন একটা সামাজিক উপপ্লবের সঙ্কেত নির্দেশ করেছেন। 'ছোটলোক' বলে যাদের ঘৃণা করে ব্রাহ্মণরা, তাদের মেয়েদের সর্বনাশ করতে কিন্তু ওদের কোনও ঘেন্না হয় না। বিদ্রূপে ফেটে পড়ে ডোম্বি—গ্রামের ঐ তথাকথিত 'ছোটলোক' যারা, "ছোই ছোই জাইসি বাম্ভন নাড়িয়া" গান হয়ে মুখে-মুখে ফেরে তাদের সবার। রাতের আঁধারে ঐ সরকারি ফরমান কার্যকরী করতে-আসা দেবল ভদ্রের ভাগ্নেকে ডোম্বি হত্যা করে নিজের কুঁড়ের মধ্যে পেয়ে। তার আগে রাজপ্রশস্তি গাইতে অস্বীকার করেছে কানুপা—মন্ত্রীর আদেশ অমান্য করার জন্য শাস্তি বিহিত হয়, তার হাতের সব আঙুল কেটে ফেলা হবে। তার আগেই সে গ্রেপ্তার হয়েছে, বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে রাজসভায় পাখা টানার সামান্য চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ায়। আর ডোম্বিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় রাজশক্তি।

ডোম্বির ফাঁসি, কানুপার আঙুল কেটে দেওয়া এবং সবশেষে গোটা গাঁয়ের ঐ ডোম, শবর, নিষাদ-প্রমুখ 'বঙ্গালি'-দের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, সেই মানুষগুলি ভেঙে পড়ে না। তারা তিরধনুক নিয়ে লড়ে,

শত্রুকে মারে, স্বপ্ন দেখে সবুজ, শ্যামল, সাগর-ঘেরা এক দেশের, যা শুধু তাদেরই। "উঁচা উঁচা পাবত"—বাসী এই মানুষগুলো যে সমুদ্র-মেখলা স্বদেশের কথা ভাবতে পারছে, তার কারণ তো সুস্পষ্ট : ১৯৭২-এ বসে যখন সেলিনা এই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখন কানু-ভুসুকু-দেশাখ-সুদাম-শবরী-ডোম্বির সেই স্বপ্নের দেশ বাস্তব হয়ে গেছে। সে তো সাগর-মেখলা সেই সবুজ দেশই, যার দক্ষিণে সুন্দর একটা বিশাল অরণ্য। সে যে তাদের বাংলাদেশ, সে তাদেরই বাংলা রে!

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৭ মার্চ, ১৯৭০ তারিখে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের 'সাপ্তাহিক গণশক্তি' পত্রিকায়। এই লেখাটির শিরোনাম ছিল : 'জনগণের সংগ্রামী কাফেলা এগিয়ে যাবে'। উমর যা লিখেছিলেন, তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি : "জনগণের সংগ্রামী চেতনা এবং উদ্যম আজ যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সেখানে...রাজনীতির কোনো স্থান নেই। জনগণ এখন সরাসরিভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে হামলার মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে এগিয়ে চলেছেন এবং সেই কাফেলায় এসে শরীফ হয়েছেন... সর্বস্তরের মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী...এর মাধ্যমে তাঁদের সকলের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে একটা নতুন রাজনৈতিক প্রত্যয়, আপসহীন সংগ্রামের এই কাফেলাকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরও দৃঢ় সংকল্প।"

এই স্মৃতি, ১৯৮০-র ৫ই মে যখন সেলিনা এ-কাহিনি শেষ করেন তখনও অটুট ছিল। যেমন অটুট ছিল রফিক, বরকত-সালাম-জবরদের স্মৃতি—মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ-লক্ষ শহীদের স্মৃতি। দেশাখকে শুধিয়েছিল মৃত্যুর আগে—"আমাকে তুই মনে রাখবি দেশাখ?...তোর ছেলে হলে তাকে আমার কথা বলবি দেশাখ?" দেশাখ বলেছিল, "বলবো রে বলবো। তোকে আমরা কেউ কোনোদিন ভুলবো না। আমাদের তেমন সুযোগ হলে তোর সোনার মূর্তি বানিয়ে রাখবো ডোম্বি।"

সোনার মূর্তি নয়, বানিয়ে রাখা হয়েছে যারা আত্মদান করেছেন তাঁদের স্বর্ণিম স্মৃতিতে এক শহীদ মিনার। ডোম্বি, কাহ্নু, রফিক, বরকত, জব্বর, সালাম, রৌশনারা, মুনীর, শহীদুল্লাদের উত্তরকাল ভোলেনি। ভোলেনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ অবধি লক্ষ শহীদকে। ডোম্বি চেয়েছিল উত্তরকালের স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে। সেই স্মৃতি, সমস্ত জাতির সত্তায় মিশে গিয়ে ভবিষ্যতের পথ দেখিয়েছে। উত্তরকাল নিশ্চয়ই তাকে ভোলেনি। রফিক-জব্বর-মুক্তিশহীদদেরও ভোলেনি বাংলাদেশ। সেলিনার কল্পনার বাংলা আর আমাদের প্রত্যক্ষ, বাস্তবের বাংলাদেশ তাই এক হয়ে মিশে গেছে একটা অনবচ্ছিন্ন রূপকে।

৩.৬ কাহিনী-নির্যাস

'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের উপজীব্য পটভূমি হল হাজার বছর আগে বাংলা; কুশলীবরা কেউ চর্যাপদ-রচয়িতা বাস্তব চরিত্র, কেউ চর্যায় উল্লেখিত কল্প-বাস্তব চরিত্র, আর বাকিরা পুরোপুরিভাবেই কল্পনায় গড়া। চর্যার পদগুলিতে যে-জীবনযাত্রার টুকরো-টুকরো ছবি মেলে, তাদের অনেকগুলিই এই উপন্যাসে পরোতে-পরোতে সাজিয়েছেন সেলিনা হোসেন। তার সেই সব-কিছুর সমাহারে গড়ে উঠেছে এক আবেগনিবিড় রূপকাশ্রয়ী কাহিনি, যার গভীরে সঞ্চরণশীল রয়েছে '৫২-পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তনের দাবী-প্রতিবাদ-সংগ্রামের উদ্দীপ্ত ধারাপ্রবাহ।

এই কাহিনির নায়ক চর্যাকার কবি কাহ্নুপাদ (ওরফে কানু) এবং তার সঙ্গে আরো দুজন চর্যা-রচেতা ভুসুকুপাদ ও কুক্কুরীপাদও এই উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। ডোম্বি এবং শবরী—বিভিন্ন চর্যায় উল্লেখিত দুই নারী এখানে কানুপার (যথাক্রমে) প্রেমিকা এবং পত্নী। অন্য প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সব ক'টিই সেলিনা হোসেনের মানস-জাত; রাজমন্ত্রী দেবল ভদ্র; ভুসুকুর স্ত্রী সুলেখা এবং ছোট দুই ভাই দেশাখ, অরুণ আর দুই বোন লোকী, গুণী; দেশাখের প্রেমিকা বিশাখা—তার বাবা-মা; সুলেখার দ্বিতীয় স্বামী সুদাম—ভুসুকু সুদীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ থাকার সময়ে যার হাত ধরে সুলেখা বাড়ি ছেড়েছিল; কুক্কুরীপাদের সহচরী সন্ধ্যা; এবং রামক্রী-দেবকী, ভৈরবী-ধনশ্রী প্রমুখ আর অজস্র মানুষ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের অনেকের নামই আবার চর্যায় উল্লেখিত রাগ-রাগিনীর অনুসারী : মল্লারী (ডোম্বির নাম—গোপনে কাহ্নিলা তাকে এই বলে ডাকে), রামক্রী, ভৈরবী, ধনশ্রী, কামোদ, দীপক ইত্যাদি।

মূল কাহিনিটা আবর্তিত হয়েছে দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে—কানুর এবং নিরুদ্দেশ ভুসুকুর। কবি এবং দরবারের পাংখাচালক কানু তার বউকে ভালোবাসে, আবার ডোম্বিকেও বাসে। শবরীর জীবনে অবশ্য কানুই সর্বস্ব—ডোম্বির সঙ্গে তার স্বামীর হৃদয়াবেগের সম্পর্কটা জানা সত্ত্বেও। প্রোষিতভর্তৃকা সুলেখার গৃহিণীপনায় এবং দেওর দেশাখের শ্রমের অর্জনের বিরাট সংসার চলে কোনওমতে টেনেটুনে। বিশাখাদের টানাটানির গেরস্থালিকেও কিছুটা সামাল দেয় দেশাখই। স্বামীবিচ্যুতা ডোম্বি খেয়াপার করে অন্নের সংস্থান করে বটে, কিন্তু তার অ-সহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজপুরুষ এবং সমাজের আরও কিছু লম্পট-গণ্যমান্য রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে তার ঘরে জোরজার করেই ঢুকে পড়ে—ফলে, নিজের অনিচ্ছাতেই তাকে প্রকারান্তরে গণিকার জীবনও যাপন করতে হয় কিছু পরিমাণে। রামক্রী-দেবকী শুঁড়িখানা চালায়। কুক্কুরী-সন্ধ্যা সমাজের বাইরে বাস করে তাদের সাধনা নিয়ে। সুদাম চাষী। বিপত্নীক, একাই থাকে। ধনশ্রী-ভৈরবীরও টানাটানির সংসার। ভৈরবীর বাল্যপ্রণয়ী কামোদ তার বেনেতি দোকানের জিনিষপত্র দিয়ে মাঝে-মাঝে তাকে বিব্রত হওয়ার হাত থেকে বাঁচায় বউ তপতীর অগোচরে। দেশাখ তার দলবদল নিয়ে জঙ্গল থেকে হরিণ, পাখি, শুয়োর, খরগোশ শিকার করে আনে। তার দুই বোন অভাব এবং 'নিষিদ্ধ জ্ঞান'-এর উচাটনে এক নগণ্য রাজকর্মীর সঙ্গে অনুচিত-ঘনিষ্ঠতা করে। সুলেখা দারিদ্র্য, বিরহ এবং যৌবনসন্তাপে হয়ে থাকে করুণ। ঘাটবাবু অরণী উঁচু সিঁড়ির রাজপুরুষদের অবিচারের বেড়াজালে-পড়া কাউকে খুইয়ে, নিরুপায় হয়েই দাপট দেখিয়ে গরিব মানুষগুলোর কাছ থেকে সমীহ আদায়ের চেষ্টা করে। ঘরের বউ আর বাইরের প্রেমিকা—শবরী আর ডোম্বিকে নিয়ে সময় কাটায় কানু। একজন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী, অন্যজন তার সৃষ্টির।

এক উৎসবের রাতে সুলেখা আর সুদাম খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। ভুসুকু হয়ত বেঁচেই নেই : বাণিজ্যের নৌকোয় চাকরি নিয়ে সে কতদিন আগে ঘর ছেড়েছে। আর হয়ত কোনোওদিনই ফেরার সম্ভাবনা নেই। সারাটা জীবন শুধু নিরুদ্দেশ স্বামীর বাপ-মা, ভাই-বোনদের সংসার সামলেই কাটাতে হবে তাকে, বয়ে বেড়াতে হবে শূন্য মনের হতাশ ব্যর্থতা, ভরা যৌবনের বঞ্চনা? দেশাখকে বলে সুলেখা সব কথা—ঘর ছেড়ে চলে যায় সে, সুদামের সঙ্গে নতুন সংসার পাতে। আর সংসার ভাঙে ভৈরবীর। দেশের শাসনবিধিতে ব্রাহ্মণ্য-অনুজ্ঞার বলি হয়ে ধনশ্রীর স্ত্রী ভৈরবী স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয় যমজ সন্তানের জননী হবার 'অপরাধে' : ব্রাহ্মণ্য-বিধানে 'অসতী' নারীরই শুধু যমজ জাতক হয়। পারিবারিক জীবন পর্যন্ত এভাবে রাজকীয় কুশাসনে হয় বিধ্বস্ত।

রাজা বুদ্ধমিত্রের আশ্বাস-থাকা সত্ত্বেও রাজসভায় সংস্কৃত কাব্যচর্চার আসরে বাংলায় কবিতা পড়তে গিয়ে নিদারুণভাবে অপমানিত হয় কাহ্নুপাদ। বিতাড়িত হয় সে আসর থেকে। মন্ত্রী দেবল ভদ্র বিদ্রূপ করে তাকে।

লাঞ্ছনা আর অপমানে জর্জর হয়ে কানু এসে আশ্রয় খোঁজে ডোম্বির খেয়ায়। উৎকণ্ঠিতা শবরী তার প্রতীক্ষায় রাত জাগে। কানুর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য ডোম্বি পণ করে।

ইতিমধ্যে হঠাৎই একদিন ভুসুকু ফিরে আসে। পদ্মার বুকে জলসদ্যুদের হাতে বন্দী হয়েছিল সে। সুলেখা যে এখন অন্যের ঘরণী, তার সন্তানের মা হতে চলেছে—এই নির্মম সত্য তাকে প্রায় বিবাগী করে তোলে। আবার কবিতা লেখার মধ্যে ডুবে গিয়ে সান্ত্বনা খোঁজে ভুসুকু। অন্যদিকে, রাজসভার পাখাটানার কাজটা ছেড়ে দেয় কানু তার ওপর অবিচারের প্রতিবাদে। মন্ত্রীর হুকুম উপেক্ষা করে সে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে দেবল ভদ্রের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়—শাসায়। দু-হাতের আঙুলগুলো কেটে দেয় তারা যাতে আর কখনও কলম ধরে কবিতা লিখতে না-পারে সে। গল্পের শেষে শবরী আগলে রাখে তার পঙ্গু-করে-দেওয়া আপনতম মানুষটিকে। আর অন্যদিকে ডোম্বি কানুর ওপর অত্যাচারের বদ্‌লা নেয় রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে তার ঘরে ফুর্তি-করতে-আসা দেবল ভদ্রের ভাগেনেকে খুন করে।

রাজশক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ডোম্বিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা নেয়। মহল্লাশুদ্ধু মানুষরা, যারা সংখ্যায় অজস্র হয়েও আর্থ-সামাজিক অবস্থানে প্রান্তিক—সেই গরিবের দল দেশাখের নেতৃত্বে 'মিলিশিয়া' তৈরি করে; মাতৃভাষার সম্মান রাখতে, জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে—ডোম্বির হত্যার, কানুর ওপর উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিতে গণবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয় তারা। তিরধনুকের যুদ্ধে প্রথমবার দেশাখরা হেরে যায় ঠিকই, রাজার লোকেরা এসে গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু ওরা দমেনা। আবার প্রস্তুত হয়। স্বপ্ন দেখে তাদের 'নিজস্ব' একটা দেশের, যেখানে তাদের জাতি-ভাষা-কৃষ্টি-ঐতিহ্য-সৃষ্টি—সমস্ত কিছুই হবে পরম সমাদরের বিষয়; একান্ত সম্মানের, চূড়ান্ত শান্তির অভিজ্ঞান ভুসুকুর কবিতার চরণ অনুসরণ করে যেখানে সবাই মিলে তারা বলবে "আজি 'হাঁউ' বঙ্গালি ভৈলী!"

৩.৭ কাহিনির মুখ্য কুশলীবরা

'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিনটি : কাহ্নুপাদ, ডোম্বি এবং শবরী। এদের পরেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল—দেশাখ, সুলেখা এবং স্বল্পক্ষণব্যাপ্ত হলেও ভুসুকু। আর সকলে মিলে এক বৃহৎ জনসত্তার অনবচ্ছিন্ন অংশ। এদের বিপরীতে আছে রাজশক্তি, যার মুখ্য নায়ক হল মন্ত্রী দেবল ভদ্র; রাজা বুদ্ধমিত্র প্রকৃতপক্ষে তার হাতের পুতুল,। শাসন-ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক বিধিবিধান নিয়ন্ত্রিত হয় মন্ত্রীর দ্বারাই।

কাহ্নুপাদ এই কাহিনির নায়ক। কবি এবং শ্রমিক ; জীবিকার জন্য রাজসভায় পাখা টানে, সৃষ্টির আবেগে কবিতা লেখে। দুই নারী তাকে ঘিরে রেখেছে; স্ত্রী এবং প্রেমিকা। একজন সেবা এবং ভালোবাসা দিয়ে তাকে সঞ্জীবিত রাখে, অন্যজন কবিতার প্রেরণা জোগায়। কখনও তার অনুভূতিলোকে দুজনে যেন মিশে একাকার হয়, ক্ষণিকের তরে। দুজনের কারুর প্রতিই সে অবিশ্বস্ত নয়, দুজনকে সে রাখে হৃদয়ের দুটি মহলে। নেশা করতে ভালোবাসে কিন্তু নেশায় সে আচ্ছন্ন হয় না। মাতৃভাষাকে সে বসাতে চায় রাজসভার সম্মানিত আসনে। সেই প্রয়াসের পরিণতি হয়, প্রথমে অপমানে এবং তার পরে উৎপীড়নে তার জর্জরিত হওয়া। কিন্তু পীড়ন, অবমাননা তাকে দমাতে ব্যর্থ হয়েছে, একান্ত আপনজন ডোম্বি—যে তারই অপমান, অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শহিদ হয়েছে—তার মৃত্যুতেও কাহ্নুপাদ ভেঙে-নুয়ে পড়েনি—দেশের মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে কানুর মুখে এমন কিছু শুনতে পাই আমরা, যা প্রকৃতপক্ষে '৫২-পরবর্তী পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম

সংখ্যক মানুষেরই মনের কথা—কানুর কথার মাধ্যমে সেগুলিকে প্রায় রূপকমুক্ত করেই সেলিনা হোসেন ব্যক্ত করেছেন। যেমন :

১। "আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো।
রাজাপ্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজদরবারের ভাষা হবে।
তেমন দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ।"

২। "একটা ছোট্ট ভূখণ্ড আমাদের দরকার। সে ভূখণ্ডটুকু সবুজ, শ্যামল আর পলিমাটি ভরা হলেই হয়। সে ভূখণ্ডের দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।" যে "স্বপ্ন" কানু "দেখিয়েছে" (দেশাখের কথায়)—সেই স্বপ্নই দেখিয়েছেন ৫২-থেকে-৭১ অবধি পুব-বাংলার কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিরা—কানুর মতোই তাঁরা উৎপীড়িত হয়েছেন রাজশক্তির হাতে। সেলিনা সেই ইতিহাসকেই এই বইতে সাজিয়েছেন হাজার বছর পিছনের জীবন-রঙ্গমঞ্চে। কানু এই হাজার হাজার পেরিয়ে এসেও এ উপন্যাস রচিত হবার সময়ও সমান প্রত্যক্ষ। তাই সে শুধু এই কাহিনিরই নায়ক নয়—হাজার বছরের সংগ্রামী বাঙালির জাতিসত্তার প্রতীক-প্রতিভু।

এই কাহিনির নায়িকা অবশ্য এক নয়, দু-জন : শবরী এবং ডোম্বি, কাহ্নুপাদের জীবনের দুই নারী। কাহিনিতে এরা ঠিক পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়, বরং খানিকটা পরিপূরকই বলা যায় একে অন্যের। শবরী স্ত্রী হিসেবে যা-যা করণীয় তার, সে সবের কোনওটিতে ঘাটতি রাখে না; সব সময়ে কানুর মনোযোগ পায় না সে, তাতেও সে ক্রুদ্ধ বা ক্ষিপ্ত হয় না; বরং নীরবে কাঁদে। এমন কি কানু যখন বলে "নেশা হওয়ার পর তোমাকে..বৌ বলে মনে হয় না। মনে হয় অন্য নারী। যে নারীর ওপর কোন অধিকার নেই অথচ যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠে..." তখনও সে শান্ত, সংযত থাকে ক্ষুব্ধ হলেও!

আসলে শবরী হল সেই ধরনের মেয়ে, যারা না থাকলে পুরুষের জীবনে শান্তির স্নিগ্ধতা আসে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় "মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে" যে বলতে পারে, শবরী হল ঠিক তেমনই এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী পুরুষের জীবনে। কানুর কবিতার প্রেরণা সে নয় ঠিকই, কিন্তু সে তার অস্তিত্বের ঠিকানা। শবরী একান্তভাবেই ঘরণী, কল্যাণী। লাস্যময়ী নয়, তবে উৎসবের রাতে কাহ্নুপাদের কবিতার মতো শবরী নিজেকে সাজায় ('ময়ূরের পাখায় গুঞ্জার মালায়')। আর সেই একবারেই সে প্রকাশ্যে ডোম্বিকে 'পরাভূত' করার 'আনন্দে' হাসে। নারীর সহজাত অধিকারবোধ নিজের একান্ত আপনজনের ওপর, ঐ একবারই তার আচরণে স্পষ্ট ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পায়।

কিন্তু তার অভিমান যে নেই কানুর ওপর, এমনও নয়। তার উজাড়-করা ভালবাসায়-ভরা গার্হস্থ্যকে যখন কানু অন্যমনস্কতার বশে, উপেক্ষা না-করলেও সে-সম্পর্কে মনোযোগ দেখায় না, তখন সে কাঁদে। আবার কানুর সোহাগে সব কিছুই ভুলেও যায় শবরী।

কিন্তু এটাও আবার ঠিক যে, জীবনের চূড়ান্ততম অপমানের অভিজ্ঞতার পর কানু যার কাছে আশ্রয় খুঁজেছিল সে শবরী নয়, ডোম্বি। রাজসভায় ঘাড়ধাক্কা খেয়ে নিজের যন্ত্রণা ভুলতে সে প্রথমে দেবকীর পানশালায় গিয়ে আকণ্ঠ মদ্যপান করে, তারপরে আনমনেই ডোম্বির কাছে চলে যায়। আসলে ডোম্বিও তার কাছে একটা সুতীব্র নেশা, শবরী যা নয়। শবরী, স্নিগ্ধ নীড়; ডোম্বি উদ্দাম নদী।

কানুর কাছে দুজনের অভিভব দু-রকমের। হারজিতের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। তবে ডোম্বির কাছে শবরী একটা সময়ে সত্যিই পরাভূত বলে মনে করেছে নিজেকে। কাহ্নুপাদের ওপর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বদলা নিতে ডোম্বি যখন রাজমন্ত্রীর ভাগ্নেকে হত্যা করেছে, তখন তার 'শাস্তি' স্বরূপ তাকে মরতে হয়েছে ফাঁসিকাঠে। সেই খবরে,

শবরী দেশাখকে বলেছে, "আমি বুঝি, ডোম্বি আমার চাইতে কানুকে বেশি ভালোবাসতো। সে কারণে ওর জন্যে মরতে পেরেছে আমি পারিনি।" তবু, ডোম্বির অভাব সে কানুকে না-বুঝতে দেবারই প্রয়াসী হয় : রাজার লোকেরা এসে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার সময়ও সে আগলে রাখতে সচেষ্ট হয় পঙ্গু-হয়ে-যাওয়া স্বামীকে। কাহ্নুর জ্ঞান ফেরে শবরীর সেবাতেই। আর তখন নতুন করে সে, সবাইকে প্রেরণা দেয় লড়াই করতে। সেই প্রেরণা, শবরীর সেবার উৎস থেকেই সঞ্জাত।

ডোম্বিও একদা গৃহবধূ ছিল শবরীর মতোই। এখন নয়। খেয়াপারের পাটনি হয়ে তাকে বাঁচার সংস্থান করতে হয়। জীবনের সংগ্রাম তাকে রূঢ় এবং রুক্ষ করে তুলেছে। পাশে কেউ না-থাকার কারণে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ছোট-বড় সবাই তাকে সহজলভ্যা বলে ধরে নেয়। ঘৃণা-এবং-অনিচ্ছাসত্ত্বেও দারিদ্র্যের পীড়নে সেটা মানতেও বাধ্য হয় সে। একমাত্র কানুই তাকে ভালোবাসে, সম্মান দেয়। বিনিময়ে নয়, প্রতিদানে কানুকে সে সেই শক্তি জোগায়—সৃষ্টির শক্তি—যা পারে না শবরী। অথচ কানুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা দেহের সীমানা ছাড়িয়ে। সেখানে ডোম্বি শবরীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না চোরের মতন! শবরীর মতো সবার সামনে কানুর ওপর সে দাবী জানাতে পারে না বলে চাপা একটা দুঃখ তার আছেই।

কিন্তু একটা জায়গায় সত্যিই ডোম্বি শবরীকে অতিক্রম করে গেছে। কানুর অপমান, উৎপীড়নে সে শবরীর মতো শুধু কাঁদে না, বরং সে বদ্‌লা নিয়েছে দেবল ভদ্রের কুটুমকে খুন করে। দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদ-শাসিত সমাজের মাথারা তাদেরকে অপমান, উৎপীড়ন করে আসছে। আবার, তারাই ফের রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে এসে তার 'অস্পৃশ্য' শরীরটাকে পেতে চায়! মন্ত্রীর আত্মীয়ও তাদেরই একজন। কানুর অবমাননা, উৎপীড়ন আর তার নিজের নারীত্বের লাঞ্ছনা দুয়েরই জবাব দিতে পেরেছে সে তাকে খুন করে।

শহিদ হয়েছে ডোম্বি। তার আগে উত্তরকালের কাছে প্রেরণা হয়ে উঠবে সে—এমনই তাকে বলেছে দেশাখরা। আবার কানুর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না ভেবে সে করুণও হয়ে পড়ে। কানুর সে সৃষ্টির প্রেরণা, সেটা সে জানে। সে না-থাকলে কানুর কাব্যরচনা হয়ত থেমে যাবে, এমনও ভাবে ডোম্বি।

ডোম্বি এক বিচিত্র নারী। সবার পিছনে থেকেও, সে সবার আগে চলে আসে তার দুঃসাহসী একক যুদ্ধের অনুষঙ্গে। আবার নিজের তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সুখ-অসুখ—সে সব কিছুর আবর্তে ঘূর্ণায়িত হয়েও, নিজেকে ছাপিয়ে যায়—তার একান্ত গোপন প্রেম আর সর্বপরিজ্ঞাত সামাজিক-প্রতিরোধ, এ দুয়ের টানাপোড়েনকে নিয়েই। শবরীর তুলনায় ডোম্বি অনেক বেশি জটিল মানসিকতার নারী। কিন্তু ঐ জটিলতাই তাকে অনন্যা করে তুলেছে এই উপন্যাসে। সেদিক থেকে দেখলে, ডোম্বি হয়ত কানুর চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাবার অধিকারী এই উপন্যাসের পাঠকের কাছে।

৩.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র

'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র হিসেবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দেশাখ এবং সুলেখা। তার পরে ভুসুকু। বিশাখা, দেবকী, ভৈরবী, রামক্রী এবং কুক্কুরীপাদ—এরাও কমবেশি কাহিনির প্রয়োজন মিটিয়েছে। খলচরিত্র হিসেবে দেবল ভদ্র এবং নিরুপায়-এক-রাজকর্মচারী অরণীও আলোচ্য কিছুটা।

দেশাখ কানুর পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র। ভুসুকু নিরুদ্দেশ হবার পর বাবা-মা-বৌদি-চার ভাইবোনে গড়া বিশাল সংসারকে টেনেছে সে-ই। বিশাখাদের অভাবের ঘরেও কিছুটা সাহায্য করে গেছে সে নিয়মিতই। বিশাখার সঙ্গে তার নিবিড় হৃদয়াবেগের সম্পর্ক—কিন্তু কখনওই কর্তব্যকে অবহেলা করতে দেয়নি তার সেই আবেগ। আবার ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যেই যে সে আবদ্ধ থেকেছে, তাও নয়। দল বেঁধে শিকার করতে গেছে সে-ই নেতৃত্ব দিয়ে—যাতে সমস্ত গ্রামের মানুষেরই মুখে খাবার জোটে। আবার, যখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন গাঁ-শুদ্ধু ছেলেকে তির-ধনুক চালাতে শিখিয়ে দেশাখই তাদেরকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছে। বৌদি সুলেখার হাহাকারে-ভরা জীবনকে সে-ই ঘোচাতে চেয়েছে, পারিবারিক সম্পর্কের জালে বন্দি না-করে রেখে সে সুলেখাকে নতুন করে ঘর বাঁধার, জীবনকে নিজের মতো করে পাবার পথনির্দেশ করেছে বলেই না, সুলেখা সুদামের হাত ধরতে পেরেছে। প্রাথমিকভাবে এ নিয়ে হয়তো তার কিছুটা দোনামোনা ছিল, কিন্তু পরে যুক্তি দিয়ে নিজেই বুঝেছে যে—এটাই শ্রেয়। আবার বিশাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেমের প্রহরেও দেশাখ তাকে একান্ত নিজের কথা শোনাতে-শোনাতেও দেশের, জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখায়। দেশাখের চরিত্রের এই বহুমুখিনতা স্বাভাবিক অধিকারেই তাকে এই উপন্যাসের উপনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সুলেখা অভাব-অনটনের সংসারকে সামলে রেখেছে স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও। জীবনের তৃষ্ণা তার আছে, রূপযৌবনও আছে—তবু সে ভেসে যায়নি বা সমাজপতিদের ফাঁদে পা দেয়নি। দারিদ্র্য এবং নিঃসঙ্গতা—দুয়ের সঙ্গেই নিয়ত সংগ্রাম করতে-করতেও সে কিন্তু শুকিয়ে যেতে দেয়নি তার মনটাকে। বয়সে ছোট দেওর হওয়া সত্ত্বেও দেশাখের কথাগুলো তার কাছে গুরুত্ব পেয়েছে—ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেয়নি সে। ভুসুকুর যখন আর কোনো আশাই ছিল না ফিরে আসার, শুধু তখনই সে সুদামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে—তাই তাকে স্খলিতচরিত্রা বলেও মনে করার কোনো সুযোগ নেই—প্রচলিত তদনীন্তন দেশাচার এমনকি, ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রাচার (যা তাদেরকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে রেখেছিল)-অনুসারেও তার এই কাজটা অসঙ্গত নয়।

এখানে একটা অভিযোগ করার অবকাশ অবশ্য আছে, সুলেখা নয়—তার সৃষ্টিকর্ত্রীর সম্পর্কে : ভুসুকু ফিরে-আসার পর সেলিনা হোসেন আর সুলেখাকে পাঠকের চোখের সামনে আনেননি। ফলে, "নিঅ ঘরিণী" অন্যের গৃহলক্ষ্মী হবার পর ভুসুকুর যে-বেদনা, শূন্যতা ("হরিণা হরিণীর নিলয় না জানি")—তাকে তিনি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন ঠিকই—কিন্তু, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুলেখার মানসিক দ্বন্দ্ব-উচাটনের ছবিটা আঁকলে, নিঃসন্দেহে সেই ত্রিকৌণিক-জটিলতা এই উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিচারের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রাবিন্যাস করত। সেটার অভাবে যে-সুলেখার চরিত্র অসামান্য দক্ষতার মাধ্যমে চিত্রিত হতে শুরু করেছিল প্রথম থেকেই, উপন্যাসের শেষাংশে তার আর কোনো পূর্ণায়তি দেখি না। সেখানে পৌঁছনোর আগেই—এ গল্পে সে অনস্তিত্ব—হারিয়ে গেছে।

ভুসুকু এই কাহিনির সবচেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র। জলদস্যুদের হাতে বন্দি হয়ে সুদীর্ঘকাল লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা পেয়েছে সে। ফিরে এসেছে যখন, তখন তার "নিঅ ঘরিণী" অপরের অঙ্কলক্ষ্মী। অথচ, শুধু সেই নারীর মুখটাকেই ভেবে-ভেবে শুধু সে কাটিয়েছে তার সুদীর্ঘ-বন্দিত্বের-প্রবাসজীবন। কবি ভুসুকু অবশ্য এরপর ভেঙে, গুঁড়িয়ে চুরমার হয়নি নিজে, বা সুলেখার নতুন সংসারেও সে হানা দেয়নি ভয়াল কালপুরুষের মূর্তিতে। তার চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই সংরক্ষণ-তিতিক্ষা। হয়তো কবি বলেই সে জানত "সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালো বাসিলাম।" পরম যন্ত্রণার চরম মুহূর্তেও সে হা-হা করে হাসতে পারে, নিজের ওই বিপর্যয়কে নিয়েও সে কাব্যছন্দে সেটাকে সহজ-পরিহাসের

ভঙ্গীতে ব্যক্ত করতে পারে। এই ব্যক্তিত্ব, বাস্তবিকই ভুসুকুকে একটা বিশেষ মহত্ত্বের মাত্রায় অন্বিত করতে পেরেছে। তাই দুঃখসুখের ঢেউয়ের ঝাপ্টাকে অতিক্রম করতে-করতে কাহিনির শেষলগ্নে সেও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার গণসংগ্রামে শামিল হতে পেরেছে। তারই মুখে এই উপন্যাসের পরম অভীপ্সিত শব্দটি ঝংকৃত করেছেন সেলিনা : "বঙ্গালি ভৈলী।"

বিশাখা সারা গল্পেই ছড়িয়ে আছে। দেশাখের চরিত্র যেভাবে একটু-একটু করে বিকশিত হয়েছে এখানে, তার সেই বিকাশের অধিকাংশ মুহূর্তগুলিরই প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হল বিশাখা। ডোম্বি, শবরী এবং সুলেখার তুলনায় তার অভিঘাত উপন্যাসের গঠনে কম হলেও, উপনায়ক দেশাখের প্রেরণাদাত্রী প্রেমিকা হিসেবে তার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

গ্রামের যে-মানুষগুলি নানাভাবে, নানা সময়ে এসেছে এই উপন্যাসে, সামগ্রিকভাবে তারা একটি জাতিপরিচয়কেই বিবৃত করেছে। ধনশ্রী-ভৈরবী, রামক্রী-দেবকী, কুক্কুরী-সন্ধ্যা—এরা শুধু এক-একটি দম্পতিই নয় এদের মাধ্যমে, যে-সময়টাকে সরাসরি এঁকেছেন সেলিনা, তার সার্থক রূপায়ণ করেছেন তিনি। রাজপুরুষদের কুশাসন এবং অনুশাসনের চাপে কীভাবে তাদের যন্ত্রণা-দুঃখ-অবমাননা নিত্য-নিয়ত বেড়েই চলে—অথচ তার মধ্যেই তারা সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় বেঁচে থাকে। একসময়ে গোটা গ্রামের মানুষ সংঘবদ্ধ হয় যখন, তখন আর উল্লেখিত এই নারী-পুরুষগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না—সংগ্রামী এক উন্মুখ জাতিসত্তার ব্যাপ্তিতে তারা মিশে গেছে। মদ বেচে দিন গুজরান-করা রামক্রী-দেবকী, যমজ সন্তানের জন্ম-দিয়ে অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন সরকারি বিধানে বিপন্ন ভৈরবী-ধনশ্রী, গাঁয়ের বাইরে ঘর-বেঁধে যোগ-সাধনায় মগ্ন-থাকা কুক্কুরী-সন্ধ্যা—সবাই মিলেই আরও বহু মানুষের সঙ্গেই ওই বিশাল "বঙ্গালি" সত্তার অনবচ্ছিন্ন শরিক। ঠিক সেইভাবেই সেলিনা তাদেরকে এঁকেছেন।

দেবল ভদ্র এই কাহিনির মূল ভিলেন। রাজা বুদ্ধমিত্র-রানি চন্দ্রলেখা এঁরা বস্তুতপক্ষে গল্পের প্রয়োজনে নিরস্তিত্বই। রাজার হুকুম থাকা সত্ত্বেও সেটা অগ্রাহ্য করে মন্ত্রী দেবল ভদ্র কানুকে সভায় কবিতা পড়তে দেয়নি। ঠিক এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই রাজায়-প্রজায় সংগ্রামের শুরু এ-কাহিনিতে। উৎপীড়ক এবং স্বৈরশাসক দেবল ভদ্র এ-কাহিনির মুখ্য নঞর্থবাচক চরিত্র হিসেবেই উপস্থিত; কানুর অপমান, বন্দিত্ব ও উৎপীড়ন, ডোম্বির হত্যা—সবই তারই প্রত্যক্ষ নির্দেশে ঘটেছে। ভৈরবীর অসহায়তা, অরণীর নিরুপায়তা—সব কিছুই মুখ্য প্ররোচক সে-ই। তাই উপন্যাসের দুই প্রতিস্পর্ধী শক্তির একটি রূপে প্রত্যক্ষত তাকেই গণ্য করতে হয়। এ উপন্যাসের গণজাগরণ মূলত তার অপশাসনের বিরুদ্ধেই—দুই প্রতিস্পর্ধী শক্তির একটি—রাজশক্তি—তার মাধ্যমেই প্রতীকায়িত।

৩.৯ গ্রন্থনাম আর পরিচ্ছেদনাম : তাৎপর্য-অন্বেষণ

সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাসের গ্রন্থনাম এবং পরিচ্ছেদনাম—দুইই প্রতীকী। পরিচ্ছেদগুলির একটাই শিরোনাম : 'অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'—চর্যাপদাবলী থেকে সংগৃহীত একটি অতি-পরিচিত পংক্তি। এ-সম্পর্কে কিছু বলার আগে গ্রন্থনামটির বিষয়েই বরং দু-একটা কথা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

এ প্রশ্ন না-উঠে পারে না যে, 'নীল ময়ূর' এবং 'যৌবন'— এই কথাগুলি এখানে কিসের দ্যোতনা সৃষ্টি করে?..... এ কাহিনির অন্যতমা মুখ্য নায়িকা শবরীর একটি পোষা ময়ূরের উল্লেখ দু-চারবার উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়।

ময়ূরের পাখায় নিজেকে সাজিয়েছে শবরী। চর্যার পদেও এমনই বর্ণনা আছে। কিন্তু সেটা এমন কিছু তাৎপর্যসম্পন্ন নয়।

আসলে 'নীল ময়ূর' বা 'ময়ূর' এখানে একটা প্রতীক হিসেবেই বিচার্য। চর্যাপদের দেশ-কাল-সমাজ—সমস্তটা মিলে-মিশে ওই 'ময়ূরের' মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হচ্ছে। 'উঁচা-উঁচা-পাবত'-অঞ্চলের 'টালত ঘর'-গুলির বাসিন্দা যে-মানুষেরা এই উপন্যাসের কুশীলব এবং তাদের নিত্যদিনের শোক-সুখ, জীবন-মৃত্যু, প্রেম ও ঘৃণা, সংগ্রাম এবং নিরাসক্তি—সব কিছুকেই এই একটি বিশেষ শব্দের সঙ্কেতে চিহ্নিত করতে ব্রতী হয়েছেন সেলিনা হোসেন।

আর, হাজার বছর আগের বাঙালিদের সেই জীবনচর্যার জীবনসংগ্রামের অনবচ্ছিন্ন ধারা যে, ১৯৫২-র পরবর্তী কালের বঙ্গভূমিতে সহসাই উদ্বেল, উচ্ছল হয়ে উঠেছিল—সেই উচ্ছ্বাসই এখানে 'যৌবন' শব্দের সঙ্কেতে চিহ্নিত হয়েছে। হাজার বছর আগের সেই 'নীল ময়ূর'-সেই চর্যাপদের বাঙালিরা, আবার 'যৌবন' ফিরে পেয়েছে, সর্বময়ী এক সংগ্রামী-অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রেরণায়। নিজের সমকালকে অতীতের মোড়কে মুড়িয়ে সেলিনা হোসেন এই বিশেষ নামের অনুষঙ্গে হাজার বছর সময়কালের দুই প্রান্তের মধ্যে সেতু বেঁধেছেন।

'অপনা মাঁংসে হরিণা বৈরী' কথাগুলি নীল ময়ূরের থেকেও অনেক বেশি এক ঘনিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় নিবিড়। চর্যার এই বিখ্যাত প্রবচনকল্প চরণটি, এ উপন্যাসের কুশীলবেরা কীভাবে জীবনের বেড়াজালে পড়ে, সেটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরোবার জন্যে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ল ক্রমে-ক্রমে, সেটিই এই পরিচ্ছেদনামের নিগূঢ় ইঙ্গিত বলে বুঝতে হবে। প্রথম থেকে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কীভাবে সেটাই বিকশিত হয়েছে, দেখানো হয়েছে। আর ঠিক সেই জন্যেই সবগুলি পরিচ্ছেদেরই গোড়ায় বিন্যস্ত করা হয়েছে ওই একটিই সাধারণী শিরোনাম।

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১০.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের গ্রন্থনাম এবং পরিচ্ছেদনামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

২. 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে সমকাল এবং অতীত কীভাবে মিশে গিয়ে এই কাহিনিকে দ্বিমাত্রিকভাবে বিন্যস্ত করেছে, দেখান।

৩. রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে 'নীল ময়ূরের যৌবন' কতখানি বিচার্য হতে পারে, বলুন।

৪. চর্যাপদের সমকালের দেশ-ও-সমাজকে কীভাবে এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আলোচনা করুন।

৫. 'নীল ময়ূরের যৌবন' প্রকৃতপক্ষে একটি রূপক-কাহিনি—এই বক্তব্য কতখানি গ্রহণযোগ্য, বলুন।

৬. 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের কাহিনিগত বিবর্তন কেমনভাবে হয়েছে, দেখান।

৭. কাহ্নপাদ কবি-ও-শ্রমিক, প্রেমিক-ও-সংগ্রামী একটি মানুষ—এই মূল্যায়ন কতটা যথাযথ, বিচার করুন।

৮. শবরী এবং ডোম্বি, এই উপন্যাসের দুই প্রধান নারীচরিত্রের তুলনামূলক বিচার করুন।

৯. 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের উল্লেখনীয় কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের মূল্যায়ন করে, এ-কাহিনিতে তাদের গুরুত্ব কতটা, দেখান।

১০. "নগর বাহিরি ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া/ছোই ছোই যাইসি বাম্ভন নাড়িয়া"—চর্যাপদাবলীর এই সুপরিচিত পংক্তিদুটিকে অবলম্বন করে, সেলিনা হোসেন তাঁর 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের অন্তর্গত রাজনৈতিক তাৎপর্যটিকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—এ কথা কতটা ঠিক বিচার করুন।

৩.১০.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. ডোম্বিকে কাহ্নপাদ 'মল্লারী' বলে সম্বোধন করত মাঝে-মাঝে; কেন?

২. "এই সুখ নিয়েই আমি মরতে পারব দেশাখ।"—এই কথার অন্তর্লীন তাৎপর্য কী?

৩. সুলেখা চরিত্রটিকে অর্ধসমাপ্ত বলে মনে হয় কেন?

৪. 'মল্লারী' নামটির ব্যঞ্জনা কী?

৫. অরণীবাবুর যন্ত্রণার হেতু কী ছিল, বুঝিয়ে বলুন।

৬. "নম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষীতবৈ।"—এই শব্দদুটির গুরুত্ব কতটা এই উপন্যাসে?

৭. "কেবল তুই আমার কানু হতে পারলি না নদী!'—এ কথার অর্থ কী?

৮. কাকের ডাকে ভীতা নারীকে নিয়ে যে-চর্যার পদটি আছে, সেটা এই উপন্যাসে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. একটি সমবেত-লোকনৃত্যের উপলক্ষ্য এই কাহিনিতে কোনো মাত্রা সংযোগ করেছে?

১০. "তিন ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় না জানী।"—এই চর্যাটি কীভাবে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে?

৩.১০.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. কামোদ কী করত?

২. "আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা"—কার লেখা?

৩. রামলাল কে ছিল?

৪. তরপতির আসল নাম কী?

৫. "আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখেই বেঁচে থাকবে।"—কার কথা?

৬. ডোম্বির মৃত্যুর পর দেশাখ কী করবে বলেছিল?

৭. লোকী, গুণী, অরুণ কে?

৮. ডোম্বি কাকে খুন করেছিল?

৯. নীল ময়ূরের যৌবন'-এর রচনাকাল কী?

১০. "আমি বুঝি, ডোম্বি আমার চাইতে কানুকে বেশি ভালোবাসতো।"—কে, কেন বোঝে এই সত্যটি?

১১. "নীল ময়ুর'-এর তাৎপর্য কী?

১২. কানুকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়?

১৩. রাজার লোকেরা কানুর বাড়িতে এসে কী খুঁজেছিল?

১৪. "আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে।" কে বলেছিল?

১৫. "স্বপ্ন দেখলে মন ভালো হয়ে যায়"—কে ভাবত?

১৬. ছুটকি কে?

১৭. সুদাম কী করত?

১৮. কানু কিসের খাটে শুত?

১৯. 'সুখরাত্রিব্রত' পালন করত কে?

২০. শবরী কী পরে সাজত?

পর্যায় ৩

পূর্বকথা

বিগত ছয় দশক সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ-তথা-প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে-বুদ্ধিজীবীরা সে-দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্নমাত্রিক বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং আজও ঘটিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে সর্বাগ্রগণ্য কয়েকজনের লেখা কয়েকটি বিখ্যাত প্রবন্ধকে এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে যে-নানামুখিন চিন্তাভাবনা সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে চলেছে, এই প্রবন্ধগুলি তারই প্রমাণ স্বরূপ।

একক ১ □ সাহিত্যের পথ ও সাধনা : আবুল ফজল

১.০ মূল প্রবন্ধ
১.১ লেখক পরিচিতি : আবুল ফজল
১.২ বিষয় সংক্ষেপ
১.৩ ভাবনা বিশ্লেষণ

১.০ মূল প্রবন্ধ

আমার বিশ্বাস বয়সের হিসাবটা ভুলে থাকতে পারলেই ভালো। আমি নিজেও বোধ করি ভুলে ছিলাম। করাচিতে একবার এক বাঙ্গালি মহিলা কিছুটা অবাক কণ্ঠে আমাকে বলেছিলেন—"আপনার লেখা পড়লে তো মনে হয় না আপনার এত বয়স হয়েছে।"

কথাটা শুনে এই ভেবে খুশি হয়েছিলাম যে, তা'হলে মনটা আমার এখনো তাজাই আছে। কারণ আসলে মনই তো লেখে, জোগায় লেখার প্রেরণা। "সাহিত্যশিল্প" তো মনেরই ফসল। আজ আপনারা সমবেত কণ্ঠে যেভাবে ঘটা করে, এমনকি রাজধানী থেকেও গুণীজনদের ডেকে এনে আর এ প্রদেশের আইনের সর্বাধিনায়ক প্রধান বিচারপতিকে সামনে রেখে—আমার বয়স যে ষাট হয়েছে অর্থাৎ আমি যে বুড়ো হয়েছি তা ঘোষণা করলেন তাতে আমার পক্ষে লেখার ক্ষেত্রে বয়সকে আর ফাঁকি দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। লেখকের পক্ষে বুড়ো হওয়া তেমন বড় কথা নয়—মনে বুড়ো হওয়াই মারাত্মক। এখন থেকে হয়তো আমার সব সময় মনে হতে থাকবে আমার বয়স ষাট হয়েছে, বুড়ো বলে যখন পেয়েছি জন-স্বীকৃতি, তখন আমাকে বুড়োর মতোই লিখতে হবে—লেখার আর ছেলেমানুষি করলে চলবে না। ছেলেমানুষি মানে বে-হিসেবি হওয়া, কররাজ্যেও বেপরোয়া হওয়া। আমি মনে করি সাহিত্যিক ও শিল্পীর জন্য বে-হিসেবিয়ানা বেপরোয়া ভাব এক প্রধান শর্ত। এখন থেকে এ শর্ত পালনে যদি ত্রুটি ঘটে সেটাই হবে আশঙ্কার কথা। কিন্তু মানুষের প্রীতি-ভালোবাসাও তো কম মূল্যবান নয়। লেখকের জন্য ওটাও এক বড় সম্পদ। সে প্রীতি-ভালোবাসারই অভিব্যক্তি আজকের এ অনুষ্ঠান। এতগুলি গুণীজনের প্রীতি-ভালোবাসা আমি পেয়েছি এটা আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের।

প্রশংসা মাত্রই একদিকে যেমন শ্রুতিমধুর অন্যদিকে তেমনি অতিরঞ্জন। এত সব প্রশংসার আমি যে যোগ্য নই তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? তবুও খুশি হইনি বললে মিথ্যা বলা হবে। বিশেষ করে খুশি হয়েছি তরুণ সহযাত্রী ও এ অনুষ্ঠানের কর্মীদের আন্তরিকতা দেখে। আজকের দিনে আন্তরিকতা প্রায় দুর্লভ বল্লেই চলে। আমি নিজেকে আজ বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান মনে করছি এ কারণে যে আজকের এ অনুষ্ঠানের পেছনে এর সব ক্ষেত্রে—সর্বত্রই একটা আন্তরিকতা বড় হয়ে উঠেছে। সর্বাগ্রে আপনাদের এ আন্তরিকতাকে আমি তসলিম জানাই।

এ সম্মান আমার জন্য আরো এক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা এ সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন আর যাঁরা এঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, পেছন থেকে জুগিয়েছেন প্রেরণা তাঁরা সবাই আমার কাছের লোক অথবা আমিই তাঁদের

কাছের মানুষ। কাছের মানুষকে সম্মান দেখানো অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ কাছের মানুষের গুণের চেয়ে দোষটাই নজরে পড়ে সর্বাগ্রে এবং কাছের মানুষের তিল পরিমাণ ত্রুটিকেও তাল পরিমাণ মনে হয়। ফলে কাছের মানুষ সম্মানের যোগ্য হলেও অনেক সময় সম্মান পায় না। কথায় বলে—"গাঁয়ের ফকির ভিখ পায় না"। আজ আপনারা এ সুপরিচিত ও বহু পরীক্ষিত প্রবচনকেও মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন।

আর এও আপনাদের অজানা নয় যে আমি কোনোরকম ক্ষমতার অধিকারী তেমন নই। কোনোদিন ছিলামও না, ভবিষ্যতেও কোনো আশঙ্কা নেই। অথচ এ যুগ হচ্ছে ক্ষমতার যুগ—ক্ষমতার পূজা এ যুগের এক বিশেষ ধর্ম। ক্ষমতাহীনকে সম্মান দেখানো এ যুগের স্বভাব নয়, রেওয়াজও নয়। এ যুগধর্ম অর্থাৎ যুগের রেওয়াজ ভঙ্গ আজ আপনারা আমার মতো এক ক্ষমতাহীনের সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন। আপনাদের আয়োজনের এও এক বড় বৈশিষ্ট্য—এ বৈশিষ্ট্যটুকুও স্মরণীয়। বিশেষ করে তরুণ সাহিত্যব্রতী ও আমাদের ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজের উচিত এ বৈশিষ্ট্য ও তার তাৎপর্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করা।

প্রশ্ন করা যায় : কেন এ সম্বর্ধনা? মনে করুন এটি আমার আত্মজিজ্ঞাসা। আমি এমন কি কাজ করেছি যার জন্য আমি সম্বর্ধনা দাবি করতে পারি? আমি কি মনে করতে পারি এ যাবৎ আমি যে নীতি অনুসরণ করে এসেছি, সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছি তার প্রতি আমার দেশের অন্তত কিছু সংখ্যক লোকের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আছে? তা না হলে ক্ষমতা-রিক্ত লোককে সম্বর্ধনা জানাতে তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসবেন কেন?

আমার সাহিত্যকর্মে আমি সততা ও আন্তরিকতা কখনো বিসর্জন দিইনি। নিজের মনের সঙ্গে কখনো করিনি কপটতা। যাকে বলে ভাবের ঘরে চুরি—তার থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেয়েছি। আমার বা আমাদের সব চিন্তা নির্ভুল এমন দাবি অচল। এমন দাবি কোনো চিন্তাবিদই করতে পারেন না। তবে আমার বিশ্বাস কোনো চিন্তাই ব্যর্থ নয়—যদি তার পেছনে থাকে সততা ও আন্তরিকতা। আমি মনে করি এ সম্বর্ধনাও সে সততা ও আন্তরিকতারই স্বীকৃতি।

অবশ্য আমি জানি, ব্যক্তি আমি আজ গৌণ—শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার যে যৎসামান্য সেবা, এসবের পেছনে তার প্রতিও রয়েছে সমর্থন। আমি আপনাদের দেওয়া সম্মান সবিনয়ে গ্রহণ করছি ব্যক্তি হিসেবে নয়, দেশের শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যসেবীদের নগণ্য প্রতিনিধি হিসেবেই।

সাহিত্যকে আমি কোনোদিন বিলাসের বস্তু মনে করিনি। মানুষের জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। তাই দেশের মানুষ ও সমাজের সমস্যা বার বার আমার লেখায় ছায়াপাত করেছে। ভয়ে বা প্রলোভনে আমি কখনো আমার কথাকে সাহিত্যের তথা সত্যের পথ থেকে বিপথগামী হতে দিইনি। দেশ ও সমাজের কথা ভেবে যখনই আমার মন আলোড়িত হয়েছে তখন আমি তা নির্ভয়ে প্রকাশ করেছি—আমার কণ্ঠস্বর কখনো চাপা থাকেনি। চেষ্টা করেছি লেখায় যথাসম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর হতে। যা তার খেলাপ তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে কোনোদিন দ্বিধা করিনি। লেখকের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম লেখা—লেখার ভিতর দিয়েই তিনি তোলেন আওয়াজ। আমার আওয়াজও আমার লেখার ভিতরই খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমি কোনো বড় লেখক নই। আমাকে বড় লেখক মনে করা হলে ভুল করা হবে। আমি এক সাধারণ লেখক। তবে আমি বিশ্বাস করি সাধারণ লেখকেরও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। বলা বাহুল্য সব দেশেরই অধিকাংশ লেখক সাধারণ বা Minor লেখক। সাহিত্যের যে প্রাণ—সে প্রাণের ধারা এরাই জারি রাখেন, রাখেন অব্যাহত।

বড় লেখক বা বিরাট প্রতিভা মৌসুমি ফুল নয়। মহৎ প্রতিভা সম্বন্ধে কেন এবং কখন প্রশ্নেরও কোনো জবাব নেই। মনে হয় তা অনেকটা দৈবের হাতে। রবীন্দ্রনাথের আরো ভাই ছিল তাঁরা কেউ ছোটখাটো রবীন্দ্রনাথও হননি। কাজেই বড় প্রতিভা সম্বন্ধে কোন রকম ভবিষ্যৎবাণীই করা যায় না।

তাই বলে সাহিত্য কি হবে না? সাহিত্য না হলে জাতি তার মন-মানসের খোরাক পাবে কোথায়? কি নিয়ে গড়ে উঠবে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি? তার মন ও মননশীলতা বেঁচে থাকবে কেমন করে? এসবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে কারা?

উত্তর : সাধারণ লেখকরা, মাঝারি লেখকরা। বড় প্রতিভার অধিকারী না হয়েও তাঁরাই সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যের ধারাকে জীবিত ও বহতা রাখেন। সব দেশের সাহিত্যেই সাধারণ লেখকের এই আমি কিছুমাত্র অগৌরব বোধ করি না। বরং আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে—গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি যেটুকু অবসর পেয়েছি, তাতে সাহিত্যের সেবাই করেছি এ মনে করে কিছুটা আত্মতৃপ্তি যে আমি পাই না তা নয়। তবে তা সাফল্যের আত্মতৃপ্তি নয়— নিজের পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ারই আত্মতৃপ্তি। দেশের সাধারণ সাহিত্য কর্মীদের একজন—এ বোধ আমার পক্ষে পরম সান্ত্বনার।

এ-কারণে আপনাদের অনুষ্ঠানের "হীরক" ও "জয়ন্তী" শব্দ সম্বন্ধে আমি গোড়া থেকেই আপত্তি জানিয়ে এসেছি। এসব শব্দ আমাদের মতো সাধারণ লেখকদের বেলায় মানায় না। সাহিত্যের এক কাজ—মনের ভিতর পরিমিতি জাগিয়ে তোলা। আমার ভিতর যে সমালোচক মানুষটি আছে এ শব্দ তার পরিমিতি বোধে আঘাত হেনেছে বলেই আমার আপত্তি। বন্ধুদের উত্তর : এসব শব্দ পরিচিত ও চলতি আর যে বিশেষ বয়সকে তাঁরা স্মরণীয় মনে করেছেন তাকে এ শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা সহজ। এ উত্তরেরও যে উত্তর নেই তা নয়, তবে তাঁরাই যখন কর্মকর্তা তাঁদের মতামত যে প্রাধান্য পাবে তা সহজে অনুমেয়। বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমার যেমন হাত ছিল না তেমনি অনুমোদনও ছিল না।

কোনো কোনো শব্দের নিজস্ব একটা মোহ আছে—সে মোহ কাটিয়ে ওঠা অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে অনেক শব্দেরই যথেষ্ট অপব্যবহার ঘটতে থাকে। চট্টগ্রামের শ্রোতাদের অজানা নয় কীভাবে 'বিপ্লব' শব্দটার প্রতিনিয়ত অপব্যবহার করা হয়,—মাইকের মুখে এমন সব লোকের নামের আগে "বিপ্লবী" বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয় যাঁরা হয়তো বিপ্লব শব্দটার শব্দগত অর্থও জানেন না। তাঁরা কখন কি বিপ্লব করবেন, এক মাইকের মুখে ছাড়া তার কোনো পরিচয় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একদলকে তাড়িয়ে আর এক দলের ক্ষমতায় বসাকেও কেউ কেউ বিপ্লব বলে থাকেন ফলে ক্ষমতাসীনরাও বিপ্লব শব্দটার অপপ্রয়োগ করতে কারো চেয়ে কম যান না।

আমার আপত্তি, নেহাৎ শব্দের মোহেও মানুষ অনেক সময় অকারণে ও বিনা প্রয়োজনে তার শিকার হয়ে পড়ে। তরুণ সাহিত্যব্রতীদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। না হয় অর্থহীন শব্দে তাঁদের রচনাও অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য লেখকের একমাত্র হাতিয়ার ভাষা। সে ভাষা অর্থ-গর্ভ না হলে রচনা ব্যর্থ-লক্ষ্য হতে বাধ্য।

কথায় বলে মানুষ শুধু অন্নে বাঁচে না। আর এ কথা একমাত্র মানুষ সম্বন্ধেই বলা হয়ে থাকে। মানুষের অন্নের উপর অন্যও দরকার। অন্য মানে সাহিত্য ও শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র উপকরণ। যা মানুষের মন ও আত্মাকে শুধু সজীব ও সচেতন রাখে না, তার সামনে বিকাশেরও সহস্র পথ খুলে দেয়। অন্যত্রও আমি বহুবার বলেছি—মানুষ

হচ্ছে বিকাশধর্মী জীব। এ বিকাশের পথ, পথ্য, খোরাক, উপকরণ সবই সাহিত্য শিল্প জুগিয়ে থাকে। না হয় নিছক ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে একজন কৃষক আর একজন সাহিত্যকর্মীর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। বরং কৃষকের অবদান আরও বেশি মূল্যবান এ হিসেবে যে, কৃষকের শ্রমের ফল ছাড়া কবি সাহিত্যিক শিল্পীও বাঁচতে পারে না। কিন্তু এ যে বলেছি অন্য—যে অন্যের সাধনা মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে, মানুষের মনের আবেগ-অনুরাগ, চিন্তা-অনুভূতি, ন্যায়-অন্যায় বোধ সত্য ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, নানাভাবে বিকশিত করে—তার মূল্য আরো বেশি এ কারণে যে তা না হলে মানুষে আর অন্য জীবে কোনো পার্থক্যই থাকতো না। জৈব ব্যাপারে মানুষ ও পশু এক। মানব সভ্যতা নিয়ে মানুষের যে অত বড়াই একটুখানি তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে—তার মূল সাহিত্য ও শিল্প। ধর্মগ্রন্থগুলিও এক উৎকৃষ্ট সাহিত্য। বলা বাহুল্য মানুষের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়—এ মনুষ্যত্বের সাধনাই সাহিত্যের সাধনা। মনুষ্যত্বের বিকাশই সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ।

সাহিত্য মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, ভাবতে শেখায়, শেখায় কল্পনা করতে—তার ফলে মানুষের সামনে উপলব্ধি আর উপভোগের দিগন্ত যায় খুলে, মূল্যবোধ যায় বেড়ে, জীবনের পরিধি ও পরিসর হয় প্রসারিত। এ কারণে সাহিত্যের জন্য চিন্তার স্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। এ স্বাধীনতা খর্বিত হলে—স্বাধীন চিন্তায় লেখকরা বাধা পেলে, একদিন চিন্তা করতেই তাঁরা ভুলে যাবেন—তাঁরা ভুলে যাওয়া মানে জাতি ভুলে যাওয়া। কারণ তাঁরাই তো জোগাবেন জাতিকে নব নব চিন্তার উপাদান। যে জাতি চিন্তা করতে ভুলে যায়—জীবনোপলব্ধির পাথেয় থেকে যারা হয় বঞ্চিত তারা অচিরে বন্ধ্যাত্ব ও নিষ্ক্রিয় জড়তার শিকারে পরিণত হবেই। তেমন জাতির ভাগ্যলিপি ভবিষ্যৎ-হীন ভবিষ্যৎ।

মানুষ শুধু টিকে থেকে সন্তুষ্ট নয়, থাকেনি কোনোদিন সন্তুষ্ট, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া জীব—সে স্বর্গ-বিতাড়িত মানুষ, সে দেবতা নয়, ফেরেশ্‌তা নয়। দেবতা বা ফেরেশ্‌তার আরো কয়েক ধাপ উপরে তার স্থান। সেও স্রষ্টা—এ পৃথিবীটাকেই সে স্বর্গ বানাতে চায়। শুধু পেট আর পিঠ নিয়ে টিকে থাকলে তার চলে না, তাকে বাঁচতে হয়। তার বাঁচার সাধনাই স্বর্গ রচনার উপকরণ। এ তার এবাদৎ বা তপস্যা। এসবেরই অভিব্যক্তি—ধর্ম-কর্ম, সাহিত্য-শিল্প, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র পথে। মানুষের জীবন থেকে এসব বাদ দিলে, বিয়োগ করে দেখলে মুহূর্তে দেখা যাবে মানুষের জীবন আর জঙ্গল-জীবন এক হয়ে গেছে। মানুষ ছাড়া পৃথিবীকে স্বর্গ বানাবার স্বপ্ন আর কেউ দেখেনি, সব মানুষও দেখেনি—যারা দেখেছে তারা জৈব ব্যাপারে অন্য শ্রমজীবীদের সঙ্গে এক হয়েও একক অন্নের ব্যাপারে এক কিন্তু 'অন্যের' ব্যাপারে একক ও স্বতন্ত্র। স্বর্গভ্রষ্ট মানুষ শুধু একখানি নগ্ন দেহ নিয়েই এ মর্ত্যভূমে এসেছে কিন্তু অন্তরপুটে বহন করে এনেছে জ্ঞান-বৃক্ষের একটুখানি স্ফুলিঙ্গ। জগতের সাহিত্যিক শিল্পীরা যে স্ফুলিঙ্গেরই উত্তরাধিকারী—এরাই তার বাহক ও ধারক। এদের বহু যুগের সাধনায় তা আজ দীপ-শিখায় পরিণত। এ দীপশিখাকে ভালোবাসা—তাকে অনির্বাণ রাখা, ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। আজকের অনুষ্ঠানেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সে দীপ-শিখাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। আগেই বলেছি—ব্যক্তি-আমি গৌণ; উদ্দেশ্যই আসল। আমার ভূমিকা স্রেফ প্রতীকের ভূমিকা।

সাহিত্যের একটি বিশেষ ভূমিকার প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাইরের বন্ধন মানুষ সহজেই কাটাতে পারে কিন্তু মনের বন্ধন কাটানোই কঠিন। যে শত্রুকে দেখা যায় তার সঙ্গে মোকাবেলা সহজেই করা সম্ভব কিন্তু অদৃশ্য ও অশরীরী শত্রুই সাঙ্ঘাতিক। দিনের আলোয় যারা ভূতের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, রাতের অন্ধকারে তেমন

লোককেও ভূতের ভয়ে বুক দুরু দরু হতে দেখা যায়। মানুষের মনোরাজ্য আর তার দিগদিগন্তে সাহিত্য হচ্ছে দিনের আলো, দিনের আলোরও বেশি, কারণ দিনের আলোতেও মনের যে সব ভূত পালায় না, সাহিত্যের ভয়ে সে সব ভূতও পালাবার পথ খোঁজে। মানুষের মন কত রকম ভূতের যে আড্ডা তার ইয়ত্তা নেই—ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, শাস্ত্র ও দেশাচারে হাজারো রকমের ভূত তথা সংস্কারের বন্ধনে মানুষের মন বাঁধা। ভয়, মোহ ও অহমিকা এসব বাঁধনকে প্রায় অচ্ছেদ্য করে তোলে। সাহিত্য হচ্ছে এ বাঁধন কাটার মন্ত্র। এসব বাঁধন কাটাতে পারলেই মুক্ত বুদ্ধির দিনের আলোয় বিচরণ সহজ হয়।

আমরা যে দেশে ও সমাজে জন্মেছি সেখানে সংস্কারের বন্ধন আরো দৃঢ় মূল। এ সংস্কার শুধু যে ব্যক্তিগত বিকাশের অন্তরায় তা নয়—দেশ ও সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিতেও তা জগদ্দল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ যুগের আরো অনেক লেখকের মতো আমিও এসব সংস্কারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি—আমার বিভিন্ন রচনায় তা নানাভাবে রূপ নিয়েছে। এ কারণে আমার লেখায় দেশ ও সমাজকে খোঁচা দেওয়া বা আঘাত হানার দৃষ্টান্ত প্রচুর। সন্দেহ নেই আঘাতের পর আঘাত হেনে আমার পাঠকের মনকে সংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছি। ভুল-ত্রুটি করিনি তা নয়। বিশেষ করে প্রথম বয়সে অদম্য আবেগ অনেক সময় আমার মন ও হাতের কলমকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে রচনায় শিল্প-রূপ ও সাহিত্য-ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে হয়তো লঙ্ঘিত হয়েছে—ভারসাম্য হারিয়ে অনেক রচনাই হয়ে পড়েছে বাড়াবাড়ি।

তবুও আমার রচনার মোটামুটি এক সুর, মানুষের মন সংস্কার মুক্ত হোক, জীবন হোক সুন্দর ও সুস্থ। মানুষ হোক অধিকতর বিবেকী। আজকের আবার নতুন করে আমার রচনার মূল সুরের পুনরাবৃত্তি করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের প্রীতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতাকে আমি আবার তসলিম জানাই।

১.১ লেখক পরিচিতি : আবুল ফজল

সাহিত্যিক আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ সালের ১লা জুলাই অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। ১৯৩৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. এবং দু বছর পরে ১৯৪০ সালে ওই একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। এরপর আবুল ফজল শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম কাজেম আলী হাইস্কুল, সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার খুলনা জেলা স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলার লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন আবুল ফজল। ১৯৫৬-তে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়ে তিন বছর বাদে অবসর নেন। ১৯৬৪-তে চট্টগ্রাম কলেজে সাম্মানিক শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং অবশেষে ১৯৭৩-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে মনোনীত হন অধ্যাপক আবুল ফজল। দুবছর বাদে ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রূপে নিযুক্ত হন তিনি, মন্ত্রীর পদমর্যদায় সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩-র ৪ মে চট্টগ্রামেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করন তিনি।

গ্রন্থ পরিচয় :

প্রবন্ধ : ১। বিচিত্র কথা, ২। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন, ৩। সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র ইত্যাদি।

উপন্যাস : ১। চৌচির, ২। প্রদীপ ও পতঙ্গ, ৩। রাঙা প্রভাত ইত্যাদি।

ছোট গল্প : ১। মাটির পৃথিবী, ২। মৃতের আত্মহত্যা, ৩। শ্রেষ্ঠ গল্প, ৪। নির্বাচিত গল্প।

১৯৬২-তে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, '৬৩-তে প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সহ বেশ কিছু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

১.২ বিষয় সংক্ষেপ

জীবনের ষাট বছর অতিক্রম করার উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজনের উত্তরে লেখকের এই প্রবন্ধ রচনা যা অত্যন্ত সুপাঠ্য ও মননধর্মী। যে উপলক্ষ্যে এই সংবর্ধনা তা এবার থেকে লেখককে কেবলই ভাবাবে যে তাঁর বয়স হয়েছে, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন আর কল্পরাজ্যেও বে-হিসেবি হওয়া তাঁকে মানাবে না। যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই সে এক বিষম বালাই। তবু, বহু গুণীজনের অকুণ্ঠ প্রীতি-ভালোবাসা আর প্রশংসা যে তিনি পেলেন, তার মূল্যই বা কম কী? তাই আপ্লুত হয়ে যে-প্রবন্ধ তিনি রচনা করলেন তা উত্তমপুরুষের জবানীতে লেখা। নিজেকে বারংবার সবিনয়ে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ও লেখক হিসেবে পরিচিত করে তিনি সাহিত্যসাধনা বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন।

সারা জীবনের সাহিত্যকর্মে লেখক সৎ ও আন্তরিক, তবু তাঁর সব চিন্তাই যে নির্ভুল এমন দাবি তিনি করেননি। তবে তাঁর বিশ্বাস, কোনো চিন্তাই ব্যর্থ নয়, যদি তার পেছনে থাকে সততা ও আন্তরিকতা। তাঁর লেখায় বারংবার মানুষ ও সমাজের নানা সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে কারণ তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে মানুষের জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর ন্যায়ের প্রতি সাধুবাদ তিনি অকুণ্ঠভাবেই জানিয়েছেন। আর এসব করতে-পেরেছেন, সে কেবল সাধারণ বা 'Minor' লেখক হওয়ার জন্য। সাধারণ লেখকরাই দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যের প্রাণের ধারা অব্যাহত রাখেন। মহৎ প্রতিভাবান না হয়েও তারাই সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যের ধারাকে জীবিত ও বহতা রাখেন। এঁদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। প্রাবন্ধিক তাই সাধারণ লেখক হিসেবে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। তিনি আত্মতৃপ্ত।

সাহিত্যের কাজ হল মনের ভিতর পরিমিতিবোধ জাগিয়ে তোলা। কোনো কোনো শব্দের নিজস্ব একটি 'মোহ' আছে—সে মোহ কাটিয়ে ওঠা বেশিরভাগ সময়েই সম্ভব হয় না। তাই সেসব শব্দের অপব্যবহার ঘটলে কানে বাজে। উদাহরণ হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'বিপ্লব' শব্দটার প্রতি চট্টগ্রামের লোকের আলাদা একটি অনুভূতি আছে, তাই মহিকের মুখে মাঝে মাঝে অত্যন্ত সাধারণ কারও নামের আগে যখন 'বিপ্লবী' শব্দ বসানো হয় তখন তাঁরা সত্যিই ব্যথিত হন। প্রাবন্ধিকের মতে তরুণ সাহিত্যব্রতীদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। কেননা—"লেখকের একমাত্র হাতিয়ার ভাষা। সে ভাষা অর্থগর্ভ না হলে রচনা ব্যর্থ-লক্ষ্য হতে বাধ্য।"

প্রাবন্ধিক খুব সুন্দর বলেছেন যে মানুষ শুধু অন্নে বাঁচে না, অন্নের উপর অন্যও দরকার। এই 'অন্য' মানেই হল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা। একজন কৃষক এবং একজন সাহিত্যব্রতীকে দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ব্যবহারিক দিক দিয়ে কৃষকের অবদান অনেক বেশি মূল্যবান। কেননা তার শ্রমের ফল ব্যতীত সাহিত্যব্রতীও বাঁচবেন না। কিন্তু যে অন্যের সাধনা মানুষকে অন্তর থেকে উদ্ভাসিত করে তোলে, বিকশিত হতে সাহায্য করে, তার মূল্য কি আরও বেশি নয়? প্রাবন্ধিক তাই বলেন : "মানুষের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়—এ মনুষ্যত্বের সাধনাই সাহিত্যের সাধনা। মনুষ্যত্বের বিকাশই সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ।" সাহিত্য মানুষকে দেয় মনন, চিন্তন। সাহিত্যিকের জন্য তাই চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। যে-দেশ লেখনির স্বাধীনতাকে খর্ব করে তার উন্নতি হতে পারে না। সেই দেশ বা জাতির 'ভাগ্যলিপি ভবিষ্যৎ-হীন ভীবষ্যৎ"। কেননা 'রক্তকরবী' নাটকের তিন হাজার বছরের পুরোনো ব্যাঙটির মতো মানুষ তো শুধু 'টিকে' থেকে সন্তুষ্ট নয়, সে চায় বেঁচে থাকতে, কেননা সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া জীব। দেবতা বা ফেরেশ্‌তার আরও কয়েক ধাপ উপরে তার স্থান। তার বাঁচার সাধনাই যে তার স্বর্গরচনার উপকরণ। যুগে যুগে এক মানুষ ব্যতীত কে-ই বা পৃথিবীকে স্বর্গে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছে? 'যারা দেখেছে তার জৈব ব্যাপারে অন্য শ্রমজীবীদের সঙ্গে এক হয়েও একক। অন্নের ব্যাপারে এক, কিন্তু 'অন্যের' ব্যাপারে একক ও স্বতন্ত্র।' সাহিত্য বা শিল্পপ্রীতি মানে জ্ঞানবৃক্ষরূপ দীপশিখাকে ভালোবাসা। প্রাবন্ধিক নিজেকে সেই দীপশিখার বহু প্রজ্জ্বলনকারীদের একজন বলে মনে করেন।

বহির্বন্ধন ও অন্তর্বন্ধন বলে দুটো শব্দ রয়েছে। প্রথমটিকে অতিক্রম করা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে যায় কি? দৃশ্যমান শত্রুর মোকাবিলা করা যায়, অদৃশ্য শত্রুর নয়। মানুষের মনে বহু রকমের শত্রু রয়েছে—সমাজ, সম্প্রদায়, শাস্ত্র, দেশ, জাতি, লোকাচার; সাহিত্যই হল এই সব অদৃশ্য বাঁধন কাটার মন্ত্র। তাই মানুষকে সাহিত্যের সাধনা আবশ্যিকভাবে করতে হবে, সেটাই হবে মুক্ত ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার একমাত্র ও অন্যতম পথ।

১.৩ ভাবনা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখক রচনা করেছেন একটি সাহিত্যসভার আয়োজনে তাঁর জীবনের ষাট-বছরপূর্তির উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার উত্তরে। অজস্র প্রশংসা, অভিনন্দন তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে পেয়েছেন, কিন্তু তবু আজ সবিনীত চিত্তে ভাবছেন, এসবের আদৌ উপযুক্ত কি তিনি? তিনি তো দেশের বহু সাধারণ বা 'Minor' লেখকদের একজন মাত্র, যাঁরা যুগযুগ ধরে সাহিত্যের প্রাণের ধারাকে বহতা রাখেন। সকলেরই কি মহৎ প্রতিভা থাকতে পারে? রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সহোদরেরা কি কেউ 'ছোটখাটো রবীন্দ্রনাথ'-ও হতে পেরেছেন? তবু সাহিত্যধারা বহমান, কারণ সাধারণ বা মাঝারি মাপের লেখকরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেন, নিছক অভিবাদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

এরপর লেখক চলে এসেছেন মন ও শরীরের খোরাকের প্রসঙ্গে। কথায় বলে যে, মানুষ শুধু অন্নে বাঁচে না, অন্নের উপর তার অন্যও দরকার। 'অন্য' মানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা। ব্যবহারিক দিক দিয়ে অন্নের উপযোগিতা অনেক বেশি। তাই একজন সাহিত্যব্রতীর তুলনায় একজন কৃষকের অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে-'অন্য' মানুষকে মানুষ করে তোলে; বিকশিত হতে, উদ্ভাসিত হতে সহায়তা করে, তার জোগান দেন সাহিত্যিকই। যে-

মানবসভ্যতা নিয়ে মানুষের এত অহংকার, তার মূল কিন্তু সাহিত্য শিল্পেই নিহিত আছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলিও উৎকৃষ্ট সাহিত্য। মানুষের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। সাহিত্যিক সেই মনুষ্যত্বেরই সাধনা করেন। মানুষকে তিনি মননশীল করতে উদ্যোগী হন। সাহিত্যিকের তাই চিন্তা ও প্রকাশক্ষমতার স্বাধীনতা একান্ত প্রাপ্য। নতুবা অচিরেই মানুষ মানসিক বন্ধ্যাত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার শিকার হতে বাধ্য।

যে-দেশে বা সমাজে আমরা জন্মেছি সেখানে সংস্কারের বেড়াজাল দৃঢ়বদ্ধ। এই সংস্কার বিকাশের অন্তরায়। প্রাবন্ধিকের রচনায় বারবার তাই সংস্কারকে আঘাত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আঘাতের পর আঘাত হেনেই পাঠকমনকে সংস্কারমুক্ত করতে হবে। লেখক উপসংহারে এসে তাই কামনা করেছেন—"মানুষের মন সংস্কারমুক্ত হোক, জীবন হোক সুস্থ ও সুন্দর। মানুষ হোক অধিকতর বিবেকী।"

একক ২ ❑ সাহিত্যের স্বরূপ : আহমদ শরীফ

২.০ মূল প্রবন্ধ

২.১ লেখক পরিচিতি : আহমদ শরীফ

২.২ বিষয় সংক্ষেপ

২.৩ ভাবনা বিশ্লেষণ

১.১ মূল প্রবন্ধ

সাহিত্যের রূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে আজকালকার লোকের প্রশ্ন ও গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু চিরকাল এমনটি ছিল না। পড়তে শুনতে বা ভাবতে ভালো লাগলেই আগেরকার দিনে যে-কোনো রচনাকেই নির্বিচারে সাহিত্য বলে গ্রহণ করা হত। আজকের যুগে মানুষ বড় সচেতন, অত্যন্ত হিসেবি। তাঁরা লাভ-ক্ষতির তৌলে সব কিছুর মূল্য ও সারবত্তা যাচাই করতে চান। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে যা-কিছু মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়, তা-ই সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করাই বিধেয় বলে ফতোয়া জারি হচ্ছে। মনোজীবন বলে ব্যবহারিক জীবন নিরপেক্ষ কোনো জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা তাঁদের যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমুখী মন ও মননে অসম্ভব হয়ে উঠছে। তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। আজকের দিনে ব্যবহারিক জীবন-সমস্যা এমন উৎকট ভাবে দেখা দিয়েছে যে নিতান্ত বেঁচে থাকার সাধনা অন্য সর্বপ্রকার জৈব-সাধনাকে ছাপিয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, কলকারখানার স্থাপন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং যন্ত্র-শক্তির বদৌলতে বিশাল পৃথিবীর বিশালতা ও বৈচিত্র্য ঘুচে গিয়ে পৃথিবী হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র ও একাকার। জীবনধারণের প্রয়োজনানুরূপ সামগ্রীর অভাবে পারস্পরিক হানাহানি কাড়াকাড়ি লেগেই আছে। মূলত সবদেশের সবলোকের সংগ্রামের রূপ একই—তা হচ্ছে জীবনসংগ্রাম, বেঁচে থাকবার আকুল আগ্রহে-ই তাঁদের চিত্ত হয়ে উঠছে বিক্ষিপ্ত ও হিংস্র। এই সমস্যা-বিমূঢ় সমাধান-কাতর জগতে তাই জাগতিক ও জৈবিক সর্বব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও পথ। এমনি অবস্থায় কারো দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকার কথা নয়। নির্লিপ্ত আর অনাচ্ছন্ন বিবেক ও চিন্তাপ্রসূত নয় বলেই বিভিন্ন মত ও পথগুলো দেখা দিয়েছে পরস্পরের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। স্বার্থ প্রসূত বিভিন্ন আদর্শগুলোর সমন্বয়সাধন তাই একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না।

সাহিত্যেও তাই প্রধানত দুটো আপশহীন নীতি ও আদর্শের সংঘাত দেখা দিয়েছে। একটা হচ্ছে বাস্তবতা, অপরটা কল্পনা সর্বস্বতা, একটা প্রয়োজনানুগ অপরটা রসবিলাস, একটা গণসাহিত্য অপরটা বুর্জোয়া সাহিত্য, একটি প্রগতি কামী অপরটি রস-লীলাপরায়ণ, একটা ধর্ম ও স্থানীয় বা জাতীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রচারক অপরটা নৈর্ব্যক্তিক সংস্কৃতির স্ফুরক।

আমরা এই আলোচনার বিষয়টা খোলসা করে বুঝে নেবার চেষ্টা করবমাত্র কোনো সমাধান পাবার আশা না রেখেই।

প্রথমত সাহিত্য হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। তা কাব্য হোক, নাটক হোক বা প্রবন্ধ হোক। অনুভূতি সঞ্জাত যে-ভাবে আমাদের মনে ও মাথায় (তথা হৃদয়ে) আলোড়ন জাগায়, তা-ই বাণীরূপ লাভ করে হয় সাহিত্য। অবশ্য

আমাদের সবকথার মূলে ভাব থাকে এবং তার পশ্চাতে থাকে অনুভূতি অর্থাৎ সব প্রকারের ভাবের মূলে থাকে Cognition, Volition ও emotion বা feeling. তথাপি সব বাণীই আমরা যথাযথ সচেতনতা ও যত্নের সাথে প্রকাশ করিনে, সুতরাং যা কিছু সযত্নে ও স্বচৈতন্যে প্রকাশ করি তাই আমাদের সাহিত্য। কারণ তখন আমাদের বাণী অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তা' বিশেষ অর্থে রসাত্মক হয়ে উঠে। যত্ন ও প্রয়াসের সাথে শক্তির যোগ না হলে তা' অপর অনুরূপ ভাব বা অনুভূতি সঞ্চারের সামর্থ্য পায় না, তাই সব রচনা সর্বজনগ্রাহ্য সাহিত্য হয় না। এখানে একথা স্বীকার করা ভালো যে সব রচনাই পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত হয়।

দ্বিতীয় অনুভূতি মাত্রেই ভাবের সত্য অর্থাৎ বিশেষ মনের বিশেষ অবস্থার সত্য। সে-সত্যের সাথে বহির্জীবনের সত্যের সামঞ্জস্য থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যেমন 'আজি রাতে তোমার অভিসার প্রাণ সখা বন্ধু-হে আমার' অথবা 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে।' এসব হচ্ছে অনুভূতি জাত ভাবের সত্য—বাস্তবের সত্য নয়। তেমনি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বা রবীন্দ্রনাথের 'পোস্ট-মাস্টার' গল্পদ্বয়ে বর্ণিত অবস্থাও ভাবের সত্য বাস্তবে কত গফুর, কত রতন—কার খবর কে রাখে? কিন্তু লেখকের হৃদে মনে-মাথায় এমনি অবস্থার অনুভূতি যে-ভাব-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তাই প্রকাশিত হয়েছে রচনায় এবং সে-রচনা সযত্নে ও স্বচৈতন্যে সম্ভব-অসম্ভবে, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধি-বোধি সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে এ সৃষ্টি। দার্শনিক তত্ত্বগুলো যেমন বাস্তব-নির্ভর হয়েও বাস্তব নয়—অনুভূতি ও প্রজ্ঞার সত্য, সাহিত্যও তেমনি অনুভূতি-উপলব্ধির সত্য; বাস্তব থেকে পাওয়া কিন্তু বাস্তব-সত্য নয়।

অতএব, অনুভূতি বাস্তবাহৃত, বাস্তব-নির্ভর ও বাস্তবানুগ হয়েও তা' বাস্তবাতিরিক্ত এবং কল্পনা-নির্ভর হয়েও কল্পনা-সর্বস্ব নয়। মূলত তা' জীবন-চেতনা-প্রসূত—সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রচেতনা জাত নয়। কারণ,তা' অনুভূতির জারক রসে রসায়িত হয়েই অভিব্যক্তি লাভ করে, তার আগে নয়।

তৃতীয়ত মানুষের মন স্বভাবত ভাবগ্রাহী, বৃহত্তর অর্থে মানব জীবন ভাব-সর্বস্ব। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতি সবকিছুই অনুভূতি মাত্র। অনুভব করি তো কোনো ঘটনা পর্বত প্রমাণ মনে হবে, আর অনুভব না করি তো তৃণবৎ তুচ্ছই থেকে যাবে। যেমন, শিশুটি উঠানে একপাত্র অপ্রয়োজনীয় পানি ফেলে দিলে আমার কোনো ক্ষয় ক্ষতি নেই তাই আমি নির্বিকার, কিন্তু যদি একপাত্র সদ্যকেনা দুধ ফেলে দেয় তখন? একটি বাঘ নিহত হলে মানুষ খুশি হয়, একজন মানুষের অপমৃত্যু হলে তখন? যে-দুঃখ যে-ক্ষোভ আমি অনুভব করছি তা তো স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তা হচ্ছে বিবেচনাপ্রসূত। মানুষের মনন ও অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই অনুভূতির জীবন বিস্তৃত হয়েছে। তাই বলে কোনো অনুভূতি বাহ্য-বস্তু নিরপেক্ষ নয়, বস্তুত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ থেকেই সব অনুভূতি আসে কারণ যা স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তার কল্পনাও সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষের সব কর্ম-চিন্তা ও কামনা-বাসনার মধ্যে 'জীবন-চৈতন্য' রয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা আমরা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ লাভ করি এর ফলে আমাদের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, প্রেম, স্নেহ, ভালোবাসা, আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি হরেক রকম বোধ জন্মে। বস্তুত এইসব বোধ বা ভাব কিংবা অনুভূতি বা ভাবরাশির সঙ্গে আমাদের জীবন-চৈতন্যের কোনো মূলগত পার্থক্য নেই। অন্য কথায় জীবন-চৈতন্য মানে দাঁড়ায় বাহ্য-পরিবেশের সঙ্গে মনের গভীরতর যোগ-চৈতন্য। এই ব্যাখ্যা যদি মেনে নিই তবে আমরা দেখতে পাই জীবনচৈতন্য ও সমাজচৈতন্য বলে আলাহিদা কিছুই নেই। ব্যবহারিক জীবনের অভাব-অভিযোগ, বাধা-বিঘ্ন মানসলোকে অর্থাৎ আমাদের অনুভূতির জগতে কীরূপ প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি করে তার বিশিষ্ট রূপ যদি সাহিত্যে বিধৃত না হয়, তবে তা' রসগ্রাহী তথা ভাবসর্বস্ব মনে ভাব বা অনুভূতি সঞ্চার করতে সমর্থ হবে না, এক কথায়, বহিরোত্থিত ঘটনার সংঘাতে আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রক্রিয়া কি বিচিত্র রূপ ধারণ করে, 'তা কার্য-কারণ পরম্পরায় চিত্রিত না হলে, সব সৃষ্টি-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই ব্যাখ্যার আলোক যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব সাহিত্যে বাস্তব-অবাস্তব, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, বা গণ-বুর্জোয়া বলে কোনো বিশিষ্ট ধারা নেই। তবে বস্তুভেদে অনুভূতিভেদ আছে। তা হচ্ছে নিতান্ত স্তর ভেদ সুতরাং রূপগত নয় রসগত। শাকের স্বাদ মাছে নেই আবার মাছের স্বাদ মাংসে অসম্ভব। তাই বলে শাক ও মাছে স্বাদ আছে মাংসে নেই, অথবা মাছে বা মাংসে স্বাদ আছে শাকে নেই এমন কথা কোনোক্রমেই বলা চলে না। প্রত্যেকটাই বিশিষ্টরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবু এদের মধ্যে স্তর ভেদ আছে। তেমনি সাহিত্যেও বিষয়বস্তু অনুসারে স্তরভেদ আছে। আমি দেশি সাহিত্য থেকেই কয়েকটি উদাহরণ নিচ্ছি। যেমন জসীমউদ্দিনের কাব্যে রস আছে তা পাঠক চিত্ত আকৃষ্ট করে। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের বলাকার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তেমনি নজরুলের 'সাম্যবাদী' আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু এর সঙ্গে নক্সীকাঁথার মাঠের কোনো বিষয়গত ও ভাবগত ঐক্য নেই। তবু আমরা এই তিন প্রকারের কাব্যকেই স্বীকার করে নিয়েছি। এবং এই তিন প্রকার রচনায় তিনটি স্তরও স্বীকার করেছি, কিন্তু রসহীন বলিনি। রসের তারতম্য নিয়ে উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার চলে, কিন্তু অন্য নামে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নিত করা চলে না।

আগেই বলেছি সৃষ্টি মাত্রেই কল্পনাধর্মী। কুলি-মজুরের কথাই লিখি, বা রাজপুত্র-রাক্ষসের গল্পই বলি, বসন্তের জয়গানই করি বা বর্ষার চিত্রই আঁকি—সবকিছুই মূলত অনুভূতিজাত ভাবেরই অভিব্যক্তি; বাস্তবের প্রতিকৃতি নয়। তবে অনুকৃতি বটে; গল্পও বাস্তবের অনুকৃতি বইতো নয়; কারণ পূর্বেই বলেছি ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কল্পনা অসম্ভব। এই অর্থে সাহিত্যে বাস্তবতা বলে কিছুই নেই। এবং এই অর্থেই সাহিত্য মাত্রেই কল্পনা বা ভাব বা অনুভূতি আশ্রয়ী। এই কল্পনা, ভাব বা অনুভূতির বৈচিত্র্যানুসারে সাহিত্যে রসবৈচিত্র্য ঘটে। এই বৈচিত্র্য আসে স্রষ্টার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বোধি-বুদ্ধি, রুচি-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য থেকে। একই পরিবেশ বা প্রকৃতি থেকেও বিভিন্ন মনোভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে, তাই মন ও মননের পার্থক্য বশত সাহিত্যেও রস বৈচিত্র্য ঘটে, আদর্শ বৈচিত্র্যও এর আনুষঙ্গিক ফল। সুতরাং সৃষ্টি পরিকল্পনায় কোনো সচেতন প্রয়াস বিশেষ কার্যকর হয় না—মগ্নচৈতন্যের উপলব্ধি—যা' অন্য অর্থে লেখকের জীবন বোধ বা জীবন-চৈতন্য তা-ই—রচনায় ব্যক্ত হয়ে পড়ে। অতএব, গণসাহিত্য বা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে আসলে কিছুই নেই। লেখক বিশেষের স্বকীয় মনোভঙ্গিরই অর্থাৎ রুচি-সংস্কারের রূপ-বৈচিত্র্য বিশেষ। লেখকের কলমের ডগায় যে বিশেষ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মত, পথ বা ধর্মীয় আদর্শ প্রকাশিত হয়, তা নিতান্ত আকস্মিক নয়। আকস্মিক নয় এই জন্যে যে সেটা লেখকের উপরি পাওয়া জিনিস নয়, মর্মমূল নিঃসৃত সত্য বিশেষ। তথাপি তা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে, কারণ লেখক ও পাঠক নির্বিশেষের শিক্ষা, রুচি, সংস্কার ও পরিবেশ এক রকমের হয় না। যেমন আবর্জনা দেখলে আমাদের গা ঘিন-ঘিন করে, কিন্তু একজন মেথরের তেমন হয় না। একজন মুসলিম তরুণীর কাছে বৈধব্য তেমন বড় সমস্যা নয়, কিন্তু হিন্দু তরুণীর বৈধব্য মানে নিজেরও অপমৃত্যু। অতএব উপরোক্ত অবস্থায় উদ্ভূত দুই অনুভূতিতে রস-বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী।

তারপর কোনো সাহিত্য বা অনুভূতি সর্বজনগ্রাহ্য হতে হলে তা জীবনের তথা হৃদয়ের গভীরতর বৃত্তি-প্রবৃত্তির সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ তা দেশ, কাল ও পাত্রের ছাপ-বিহীন একটি সর্বজনীন রূপ লাভ করবে। যতক্ষণ তা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ তা দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যেই থাকবে আবদ্ধ। যেমন পানি বলতে জগতে যেখানে যত

পানি আছে সবগুলোকে বুঝায়। কিন্তু তবু ডোবার পানি, নদীর পানি, দীঘির পানি, বা সমুদ্রের পানি এক নয়, এদের কারো সব-পানির প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা নেই। কারণ এগুলো আধারের ছাপ মুক্ত নয়। কিন্তু distilled water এর সঙ্গে সব পানির ঐক্য আছে। অর্থাৎ ওই পানি নির্বিশেষ পানির প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতাসম্পন্ন—কারণ তা বিশেষ আধারের ছাপমুক্ত। সাহিত্য সম্পর্কেও একই নিয়ম, দেশ-কাল জাতি ও ধর্মের ছাপমুক্ত সর্বজনীন অনুভূতি বা ভাব যে-সাহিত্যে প্রকাশ পাবে তা হবে চির-মানবের সাহিত্য। অন্য প্রকারের সাহিত্য হবে বিশেষ দেশের; জাতির, কালের বা ধর্ম সম্প্রদায়ের। আধুনিক সাহিত্যে Yeats, রবীন্দ্রনাথ T. S. Eliot ও ইকবাল এই চার জনই অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু Yeats ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস প্রসূত। পক্ষান্তরে T. S. Eliot ও ইকবালের সাহিত্য বিশিষ্ট আদর্শের ছাপযুক্ত। সে-জন্যে তা' নির্বিশেষ পাঠকের গ্রাহ্য নয়। সুতরাং T. S. Eliot ও ইকবাল বিশেষ দেশ-কাল ও জাতি ধর্মের কবি ও শিক্ষক। আর Yeats ও রবীন্দ্রনাথ দেশ-জাত নিরপেক্ষ মানুষের কবি।

তারপর আসে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা। এক হিসেবে সাহিত্যমাত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অবাস্তব। কারণ সাহিত্য হচ্ছে মূলত মানুষের ভাব-লব্ধ সত্য—অনুভূতি ব্যতিরেকে বাস্তবে তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া অসম্ভব। এবং সাহিত্য কোনো বাস্তব-প্রয়োজন প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধ করে না। আর এক হিসেবে সাহিত্য—মনুষ্য জীবনে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। যে-প্রেরণায়, যে-অব্যক্ত-প্রয়োজনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সে-প্রয়োজন পরিহার করে চলা মানুষের পক্ষে তেমনি অসম্ভব, আমরা যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস, বাল্মীকি, ফেরদৌসী-রুমী-জামীকে স্মরণে রেখেছি, তাঁদের রচনা পড়ে চলেছি—তা-ই আমাদের প্রয়োজনের যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি? পক্ষান্তরে অগ্নি যিনি আবিষ্কার করলেন, কয়লা যিনি জোগালেন, রেডিও-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-টেলিভিশন যাঁরা দান করলেন তাঁদের কেন আমরা স্মরণে রাখার গরজ বোধ করিনে? এতেই প্রমাণিত হয় এসবের ব্যবহারিক প্রয়োজন যেমনই হোক, তা-ই আমাদের জীবনসর্বস্ব। তবু তা শিল্প মাত্র! অন্য দশ শিল্পকর্মের মতো এ'ও আমাদের প্রয়াসপ্রসূত সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সাহিত্যে বাস্তবতা ও কল্পরসবিলাস সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। কোনো বিষয়বস্তুই সাহিত্যে নিরর্থক নয়, কারণ যে-কোনো ব্যাপারে মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয়। হৃদয়-সংযুক্ত বহির্জীবনের সমস্যার সমাধান-চিত্র যেমন মানুষকে জীবন-পথে প্রেরণা দান করে, তেমনি রাক্ষস-রাজপুত্রের কাহিনিতেও মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি রূপায়িত হয়—দুটোরই প্রয়োজন আছে। ফলত বুর্জোয়া ও গণসাহিত্য বলে সাহিত্যকে দ্বিধা বিভক্ত করা নিরর্থক। কারণ আমরা বলেছি, মূলত মানুষের জীবন ভাবসর্বস্ব বা অনুভূতি-সমষ্টি মাত্র। কাজেই অনুভূতির জগতে স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রবণতানুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং মনোভঙ্গির পার্থক্যবশতই আমরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে ও রসে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় এবং বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা রেখা টানতে প্রয়াসী হই। আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা ও মতগত অনৈক্যের মূলও এখানে। সাহিত্যে রস সর্বস্বতা, জীবন-সর্বস্বতা, সমাজ-সর্বস্বতা, রাষ্ট্র-সর্বস্বতা বা প্রয়োজন-সর্বস্বতা বলে কিছুই নেই—যা আছে তা অনুভূতি ও উপলব্ধির সর্বস্বতা। এর প্রকার ভেদেই আদর্শ, নীতি, রস ও বিষয় ভেদ ঘটে।

এপর্যন্ত আমরা যা বলেছি, তা সংক্ষেপে এই—সাহিত্য হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। সাহিত্যে রসভেদ আছে কিন্তু রূপভেদ নেই। কারণ মানুষের জীবন হচ্ছে অনুভূতির সমষ্টিমাত্র অর্থাৎ ভাব-সর্বস্ব, সুতরাং সাহিত্যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বাস্তব-অবাস্তব, গণ-বুর্জোয়া বলে কোনো সীমা রেখা টেনে দেওয়া নিরর্থক। তারপর বলেছি, মানুষের মানস-সংস্কৃতি যখন দেশ, কাল ধর্ম ও জাতীয়তার ছাপ মুক্ত হয় তখন সাহিত্যে যে-অনুভূতি বিধৃত হয় তা হয় সর্ব

কালের, দেশের ও চিরমানবের সম্পদ। অতএব সাহিত্যে একমাত্র কাম্য বস্তু হচ্ছে বহির্ঘটনার সঙ্গে হৃদয়ের গভীরতর সংযোগ সন্ধান। বাস্তবের ঘটনা সংঘাতে মনে দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-উল্লাসের যে-আবেগ সৃষ্টি হয় তা যতক্ষণ যথার্থরূপে বাণী লাভ না করবে, ততক্ষণ তা মনান্তরে বা হৃদয়ান্তরে সহানুভূতি সঞ্চারে সমর্থ হবে না। এই জন্যে সৃষ্টি মাত্রই নিরর্থক—'সাথে হৃদয় নহিলে'। অনুভূতি বা ভাবের যথার্থ প্রকাশ মানেই হৃদয়ের বৃত্তি-প্রবৃত্তির বাণী-চিত্র দান করা। এক কথায় বাহ্যবস্তুকে বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অন্তর্নিহিত রূপ সাহিত্যে বিধৃত হওয়া চাই। একমাত্র এরই নাম সাহিত্য।

২.১ লেখক পরিচিতি : আহমদ শরীফ

আহমদ শরীফের জন্ম ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডী পাটিয়া অঞ্চলে। একুশ বছর বয়সে ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি. এ এবং এর দুবছর বাদ ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—'সৈয়দ সুলতান; তাঁর যুগ ও গ্রন্থাবলী'। এরপর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকেই তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন। ১৯৮২ সালে একষট্টি বছর বয়সে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেন।

অতঃপর আমরা গবেষক ও সুপ্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ রচিত প্রবন্ধাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিতে পারি।

গ্রন্থ পরিচয় :

প্রবন্ধ : ১। পুথি পরিচিতি, ২। পুথির ফসল, ৩। বিচিত্র চিন্তা, ৪। স্বদেশ অন্বেষা, ৫। জীবনে সমাজে সাহিত্যে, ৬। বাউল তত্ত্ব, ৭। যুগযন্ত্রণা, ৮। সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা ইত্যাদি।

মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত আহমদ শরীফের জীবনে বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। যেমন ১৯৬৮তে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৯১তে একুশে পদক, ১৯৬৮তে আদমজী পুরস্কার ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আহমদ শরীফ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২.২ বিষয় সংক্ষেপ

যন্ত্রশক্তির দৌলতে আজকের পৃথিবী হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র। সব দেশে সমস্ত মানুষের জীবনযাপনের রূপ এখন একই—মূলত জীবনসংগ্রাম। বেঁচে থাকার তীব্র বাসনাই এদের অনেককেই করে তুলেছে বিদ্বিষ্ট ও হিংস্র। জাগ্রত বিবেক বা মননশীলতার অভাবে মানুষের বিভিন্ন মত ও পথগুলো দেখা দিয়েছে পরস্পরের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। সমস্যা প্রচুর, কিন্তু কোথাও যেন এদের কোনো সমাধান নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের হিসেবি মানুষ যখন সাহিত্যের রূপ ও আদর্শ বিচার করতে বসে তখন যা-কিছু তার ব্যবহারিক জীবনে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, তাকেই সাহিত্য থেকে নির্বাসন করে দিতে চায়। সাহিত্যে তাই প্রধানত দুটো আপসহীন নীতি ও আদর্শের সংঘাত দেখা দিয়েছে।

একটি হল বাস্তবতা, অপরটি কল্পনা সর্বস্বতা; একটি প্রয়োজনীয়, অপরটি রসবিলাস; একটি গণসাহিত্য, অপরটি বুর্জোয়া। লেখক তিনভাবে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেছেন।

ক. সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। যে-কোনো সাহিত্যেরই উৎসে থাকে সাহিত্যিকের অনুভূতি বা emotion বা feeling। তবু সমস্ত রচনাই আমরা যথাযথ যত্নের সাথে নির্মাণ করি না, যেগুলো করি সেগুলোই প্রকৃত সাহিত্য। কেননা সেসময় আমাদের রচনা পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে রসাত্মক হয়ে ওঠে। যত্নের সঙ্গে শক্তির যোগ না হলে তা অপর হৃদয়ে প্রবেশের যোগ্য হয় না। তাই অনুভূতির সঙ্গে লেখনিশক্তির মিশ্রণ চাই।

খ. অনুভূতি মাত্রেই ভাবের সত্য অর্থাৎ বিশেষ মনের বিশেষ অবস্থার সত্য। এই সত্যের সঙ্গে বাস্তবের সাদৃশ্য নাও থাকতে পারে। যেমন লেখক বলেছেন—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণ সখা, বন্ধু হে আমার' অথবা 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে/পাগল আমার মন জেগে ওঠে'—এগুলি হল কবির নিজস্ব অনুভূতিজাত সত্য, বাস্তবের সত্য নয়। অথচ এই সৃষ্টিগুলি অমর হয়ে আছে এদের শৈল্পিক আবেদনের জন্য। দার্শনিক তত্ত্ব যেমন বাস্তবনির্ভর হয়েও বাস্তব থেকে দূরে, সাহিত্যও তেমনি অনুভূতি উপলব্ধির সত্য, বাস্তব-কল্পনার মিশেল।

গ. মানুষের মন স্বভাবত ভাবগ্রাহী, বৃহত্তর অর্থে মানবজীবন ভাবসর্বস্ব। মন চাইলে কোনো ঘটনাকে পর্বতপ্রমাণ গুরুত্ব দিয়ে দেখা যায়, মন না চাইলে দেখা যায় তৃণবৎ তুচ্ছ করে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের মাধ্যমে আমরা যথাক্রমে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস ও স্পর্শ লাভ করি। যার ফলস্বরূপ হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, প্রেম, স্নেহ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিচিত্র বোধের সৃষ্টি হয়। এই বোধগুলিই আমাদের জীবনচৈতন্য। এই জীবনচৈতন্যই সৃষ্টি করে সাহিত্যের। তবে বস্তুভেদে অনুভূতিভেদ রয়েছে। লেখক উদাহরণ দিয়েছেন এই বলে যে, কবি জসীমউদ্দীনের কাব্যে রস আছে, তা পাঠককে আকৃষ্ট করে। তা বলে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র সঙ্গে তার তুলনা চলে না। আবার নজরুলের 'সাম্যবাদী' ভালো, কিন্তু এর সঙ্গে 'নকসীকাঁথার মাঠ'-এর কোনো ঐক্য নেই। তদ্‌সত্ত্বেও আমরা তিনরকম কাব্যকেই পছন্দ করেছি।

সাহিত্যে বৈচিত্র্য আসে স্রষ্টার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, রুচি-প্রকৃতি ভেদে। একই পরিবেশে থেকেও দুজন স্রষ্টার দুরকম মনোগঠন হতে পারে। তাই মন ও মননের পার্থক্যবশতও সাহিত্যে রসবৈচিত্র্য ঘটে। লেখকের মতে গণসাহিত্য বা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে আসলে কিছুই নেই, সবই লেখকবিশেষের স্বকীয় মনোভঙ্গিরই প্রকাশ। লেখকের মতের সঙ্গে পাঠকের মতের মিল নাও হতে পারে। আবার কোনো সাহিত্যকে সর্বজনগ্রাহ্য হতে গেলে তাকে দেশ-কাল-পাত্রভেদে জীবনের গভীরতর বোধের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ লেখক বলেছেন : ইয়েট্‌স, এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল—চারজনই অধ্যাত্মবাদী কবি। ইয়েট্‌স ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসপ্রসূত। পক্ষান্তরে এলিয়ট ও ইকবালের সাহিত্য বিশিষ্ট আদর্শের ছাপবাহী ফলে নির্বিশেষ পাঠকের নয়। তাই প্রথম দুজনের আবেদন দেশ-কাল নিরপেক্ষ, শেষ দুজনের তা নয়।

আরেক হিসেবে, কোনো কোনো শ্রেণির মানুষের কাছে সাহিত্য কোনো বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধ করে না, অন্য শ্রেণির মতে সাহিত্য মনুষ্যজীবনে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। আমরা হোমার-দান্তে-মিল্টন-বাল্মিকী-কালিদাস-ফেরদৌসীকে যে পড়ি, তা-ই আমাদের প্রয়োজনের প্রমাণ। অন্যদিকে অগ্নি-কয়লা-রেডিও-টেলিভিশনের আবিষ্কারকদের নাম স্মরণে রাখি না, কারণ, এগুলির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনই আছে। তবু এগুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ জীবনে। সাহিত্যেও তাই—একদিকে বাস্তবতা, একদিকে কল্পনা। উভয়ই প্রয়োজনীয়।

"সাহিত্যে জীবন-সর্বস্বতা, সমাজ-সর্বস্বতা, রাষ্ট্র-সর্বস্বতা বা প্রয়োজন-সর্বস্বতা বলে কিছু নেই, যা আছে তা অনুভূতি ও উপলব্ধি-সর্বস্বতা। এর প্রকারভেদেই আদর্শ, নীতি, রস ও বিষয়ভেদ ঘটে।

২.৩ ভাবনা-বিশ্লেষণ

'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধের উপসংহারে এসে প্রাবন্ধিক স্বয়ং এর একটি সারমর্ম বা সংক্ষিপ্তসার করেছেন। সাহিত্য হল ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। রসভেদ থাকলেও সাহিত্যে রূপভেদ নেই। কারণ মানবজীবন বস্তুত বিচিত্র-বিভিন্ন অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। এই অনুভূতির আরেক নাম ভাব। সুতরাং প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বাস্তব-অবাস্তব, গণ-বুর্জোয়া বলে সাহিত্যকে বিশ্লিষ্ট করে দেওয়া যায় না। লেখক ও পাঠকের মতের মিল সর্বদা ঘটে না, ঘটলে সেই সাহিত্য চিরকালের, চিরমানবের সাহিত্য হয়ে যায়। মানুষের মানস-সংস্কৃতি যখন দেশ-কাল-ধর্ম ও জাতীয়তা-নিরপেক্ষ হয়, তখন যে সাহিত্য নির্মিত হয় তা-ই সর্বদেশের সর্বকালের চিরমানবের সম্পদ।

তারপর আসে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা। এক হিসেবে সাহিত্যমাত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অবাস্তব। কেননা সাহিত্য হচ্ছে মূলত মানুষের ভাবলব্ধ সত্য। বাস্তবের ঘটনা-সংঘাতে দুঃখ আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দ-উল্লাসের যে আবেগ সৃষ্টি হয় তা যতক্ষণ যথার্থ ভাষায় প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ তা মন থেকে মনে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে ভাব সঞ্চারিত করবে না। সেক্ষেত্রে সৃষ্টিমাত্রেই নিরর্থক। লেখকের ভাষায়—"অনুভূতি বা ভাবের যথার্থ প্রকাশ মানেই হৃদয়ের বৃত্তি-প্রবৃত্তির বাণীচিত্র দান করা। এক কথায় বাহ্যবস্তু বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অন্তর্নিহিত রূপ সাহিত্যে বিধৃত হওয়া চাই। একমাত্র এরই নাম সাহিত্য।"

একক ৩ ☐ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য : বদরুদ্দীন উমর

৩.০ মূল প্রবন্ধ
৩.১ লেখক পরিচিতি
৩.২ বিষয় সংক্ষেপ
৩.৩ ভাবনা বিশ্লেষণ

৩.০ মূল প্রবন্ধ

সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন লোকে, বিশেষত বিভিন্ন শ্রেণির লোকে, ভিন্ন ভিন্নভাবে দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে কে কী বোঝাতে চান তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই, এবং সে বিষয়টি হল এই যে সংস্কৃতি বলতে যা কিছুই বোঝানো হোক সেটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কোনো নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার সেটা হতে পারে না। কারণ সংস্কৃতি কোনো না কোনো সমাজের নিজস্ব গঠন চরিত্রের প্রতিফলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সংস্কৃতি বলতে যদি সঙ্গীত চর্চা, অথবা যে-কোনো ধরনের শিল্প চর্চা বোঝায়, যদি তার দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি প্রভৃতির আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালী বোঝায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই সংস্কৃতির বিশেষ চরিত্র আছে। এবং এই চরিত্রের ভিত্তি হচ্ছে মূলত সামাজিক। তাই কোনো বিশেষ সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো ধরনের বিশেষ সংস্কৃতির চিন্তা করা অথবা কথা বলা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক।

ইতিহাসে মানবিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন অনেক ব্যক্তির আবির্ভাব প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেখা গেছে যাঁদেরকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে এত প্রতিভাসম্পন্ন, গড়পড়তা লোকের থেকে এত বেশি উঁচে, যে তাঁরা যে সমাজে বসবাস করেছেন অথবা করেন সে সমাজের থেকে তাঁদের উদ্ভব নয়, তাঁরা যেন স্থান কাল উভয়েরই ঊর্ধ্বে। এ্যারিস্টটল, প্লেটো, কান্ট, হেগেল, মার্কসের মতো দার্শনিক ও চিন্তাবিদ : কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানী; হোমার, শেক্সপীয়র, গ্যোটে, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মতো কবি সাহিত্যিক রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, লেনার্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখের মতো শিল্পী; আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন, হিটলার, লেনিন প্রমুখ ইতিহাসের একেক জন নায়ক সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা অনেকেই করে থাকেন। তাঁদের যে এই ধারণা অনেকে পোষণ করেন তা অভিব্যক্তি তাঁদের এই চিন্তার মধ্যে দেখা যায় যে, বিশেষ পর্যায়ে অমুক ব্যক্তির আবির্ভাব না ঘটলে তমুক কাজটি সম্ভব হতো না। অর্থাৎ ব্যক্তির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে এমন যা তাঁর সামাজিক অবস্থান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর অপর একটি অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ওই ধরনের কোনো বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব ইতিহাসে না ঘটলে তিনি যে কীর্তি মানব সমাজে রেখে গেলেন সে কীর্তি তাঁর অবর্তমানে অন্য কারো দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হতো না এবং সে ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা চিরদিনের জন্য বিদ্যমান থাকত।

আসলে চিন্তা চেতনা, সাহিত্য ও শিল্প সাধনা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমাজ পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে যাঁরা ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখে থাকেন তাঁরা নিজেরাও নিজেদের সমসাময়িক ইতিহাসেরই সৃষ্টি। কাজেই ইতিহাসে

ব্যক্তির ভূমিকা যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তি ইতিহাসের গতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও কোনো ব্যক্তিরই অবস্থান অথবা কৃতিত্বকে তাঁর নিজের সমাজের এবং নিজের ঐতিহাসিক কালপর্বের ঊর্ধ্বে মনে করা একেবারে ভুল।

সংস্কৃতি সমাজ থেকেই উদ্ভূত হওয়ার কারণে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ সমাজের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কর্মধারা ও কর্মতৎপরতা দেখা যায় তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট সে সময়ে জাতকের বিখ্যাত কাহিনি এবং অজন্তা ইলোরার চিত্রকর্মের সম্পর্ক এ কারণেই খুব ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে ভারতীয় সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদিতে যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ইউরোপীয় সঙ্গীত, চিত্রশিল্পে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইউরোপীয় ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, বাণিজ্যের প্রসার, ভাষার বিকাশ, ধর্মীয় আন্দোলন, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ইত্যাদি এক পারস্পরিক যোগসূত্রে গ্রন্থিত। কাজেই শুধু ব্যক্তিই নয়, সমাজের জনগণের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব কাজকর্মে জড়িত থাকেন সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ সমাজের অন্তর্নিহিত তাগিদগুলি সমাজে অবস্থানকারী জনগণের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্যসহ নিজেদের ব্যক্ত করে। সে সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি সেই সব তাগিদের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হন। এই ব্যক্তিদের ভূমিকাই ইতিহাসে বিরাট ব্যতিক্রমী ভূমিকা হিসেবে দেখার চেষ্টা অনেকেই করে থাকেন। যাঁরা এ কাজ করেন তাঁদের চিন্তা যে অবাস্তব এবং ভুল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যক্তি বিশেষের কীর্তি যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সামাজিক তাগিদেরই প্রতিফলন একথা সত্য। কিন্তু সমাজ বলতে কী বোঝায়? সমাজ বলতে কি এমন এক যৌথ জীবন বোঝায় যেখানে বড় ধরনের কোনো পার্থক্য নেই, কোনো বৈষম্য নেই, কোনো দ্বন্দ্ব বিরোধিতা নেই? মানব ইতিহাসের প্রারম্ভিক আদিমতম পর্যায়ে মানুষের যে ধরনের একটা যৌথ জীবনের মোটামুটি ধারণা ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে মানব সমাজে গুরুতর ভেদাভেদের সৃষ্টি হয় এবং এই ভেদাভেদের মধ্যে সর্ব প্রধান হয় শ্রেণি বিভেদ। বিশেষ কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে সমাজে দেখা দেয় শ্রেণিবিভাগ ব্যক্তিগত সমাজ বিভক্ত হয় দুটি মূল অংশে যার একটি হলো, শোষক ও নির্যাতক এবং অপরটি হলো শোষিত ও নির্যাতিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অবলম্বন করে গঠিত হয় পরিবার, গঠিত হয় রাষ্ট্র এবং মানবজীবন প্রবাহে দেখা দেয় অনেক নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ।

এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ইতিহাসের কোনো বিন্দুতে স্থির থাকে না। তার মধ্যে যে সকল পরিমাণগত অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সংগঠিত হতে থাকে তার পরিণামে সমাজের মধ্যে ঘটে এক ধরনের গুণগত পরিবর্তন। ব্যক্তি সম্পত্তি-ভিত্তিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই গুণগত পরিবর্তনের অর্থ দাঁড়ায় সম্পত্তি মালিকানার ধরনের মধ্যে পরিবর্তন, ব্যক্তি সম্পত্তির অবসান নয়। ইতিহাসে এই ধরনের গুণগত পরিবর্তনের ফলে আবির্ভাব ঘটে দাস প্রথার পর সামন্ত প্রথার এবং সামন্ত প্রথার পর পুঁজিবাদী প্রথার। এই পুঁজিবাদী প্রথাই মানব ইতিহাসে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়। এই পর্যায়ের পর আবির্ভাব ঘটে সমাজতান্ত্রিক সমাজের, যে সমাজের লক্ষ্য হয় সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা।

সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ ও শ্রেণি সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলি বলার দরকার হল এ জন্যেই যে, সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা যেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে করা চলে না তেমনি তাকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না শ্রেণি

থেকেও। কাজেই যে-কোনো সংস্কৃতির এবং সেই সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী এক অথবা একাধিক ব্যক্তির সাংস্কৃতিক চরিত্র শ্রেণি নিরপেক্ষ নয় এবং তা হতে পারে না।

মানব ইতিহাসে সংস্কৃতি চর্চার শুরু এমন এক পর্যায়ে যখন সে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে সৃষ্টি করেছে অবসর। আহার নিদ্রা মৈথুনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে অতিরিক্ত সময় হাতে না আসা পর্যন্ত সংস্কৃতি চর্চার—শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য চর্চার যে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

এবার দেখা দরকার এই অবসরের অধিকারী হল কারা? এ অধিকারী হল তারাই, সেই শ্রেণির লোকেরাই, যারা হল সম্পত্তি মালিক। কাজেই মানব ইতিহাসে সংস্কৃতির সর্বোচ্চ ধারক ও বাহকে যে ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকরাই হবে সেটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতি চর্চাকে এখানে খুব সংকীর্ণ অর্থে বুঝলে অথবা ধরে নিলে ভুল হবে। এই সংস্কৃতি চর্চা বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত সাধনা, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা সমস্ত কিছুই।

শ্রেণি বিভক্ত সমাজে সম্পত্তিশালী শ্রেণি নিজের শোষণ স্বার্থেই সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে, গড়ে তোলে নিজের জীবনযাপন ও জীবন উপভোগের বিশাল ব্যবস্থা। এ কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে অবশ্যম্ভাবীরূপে এমন কতকগুলি কাজ করতে হয় যে কাজগুলি একদিকে সম্পত্তিশালী শ্রেণি হিসেবে তার নিজের অবস্থানের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে ঘটায় সামাজিক অগ্রগতি। এই অগ্রগতির মূল ধারা নির্ধারিত হয় উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনের দ্বারা।

সমাজের অল্প সংখ্যক সংখ্যালঘু অবসরভোগী সম্পত্তি মালিকরা যে-কোনো শ্রেণি বিভক্ত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চতম শিখরগুলি সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করলেও তাদের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতির মধ্যেই সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। তার জন্য তাকাতে হয় উৎপাদনের সঙ্গে স:..সরি সম্পর্কিত শ্রমজীবী জনগণের জীবনের দিকে। এই জনগণের অবসর এবং সুযোগসুবিধা অন্যদের তুলনায় অনেক কম থাকলেও যেহেতু তাঁরা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু তাঁদের শ্রমের দ্বারাই সৃষ্টি হয় সম্পদ ও সম্পত্তি এবং যেহেতু তাঁদেরও একটি সমষ্টিগত অর্থাৎ সামাজিক জীবন আছে সেজন্য তাঁদেরও আছে এক ধরনের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির মান শোষক শ্রেণির সংস্কৃতির মানের থেকে অনেক নিম্ন। কিন্তু নিম্ন হলেও তার একটি নিজস্বতা আছে, একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যে শক্তি নিয়ে তাঁরা নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার্থে শোষক শ্রেণির মুখোমুখি হন, তাদের মোকাবিলা করেন।

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত ও নির্যাতিত মানুষদের সংস্কৃতির মান শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অন্যদের থেকে নীচুস্তরের হলেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজের মধ্যে কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার মান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নিজেদের সেই চেতনার উপর দাঁড়িয়ে শিল্প সাহিত্য এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতির অন্যান্য সাহায্যে তাঁরা শোষক শ্রেণির মুখোমুখি হন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের এই মুখোমুখি অবস্থান শোষক শ্রেণির সঙ্গে তাঁদের শ্রেণি-সংগ্রামের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উপরন্তু তাঁদের এই সাংস্কৃতিক সংগ্রাম সাধারণভাবে তাঁদের শ্রেণি-সংগ্রামেরই একটি বিশেষ রূপ।

শোষক শ্রেণির সংস্কৃতি চর্চার, তাদের কীর্তিমান শিল্পী সাহিত্যিকদের শিল্প সাহিত্য চর্চার নির্দিষ্ট শ্রেণি চরিত্র থাকলেও তারা সব সময়ই সেই শ্রেণি চরিত্রকে আড়াল করে শিল্প সাহিত্যকে সমাজ বিচ্ছিন্ন, রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হিসেবে

তত্ত্বগতভাবে এবং অবিশ্রান্ত প্রচারের মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থিত করে থাকেন। কিন্তু যখনই শোষিত শ্রেণির লোকেরা অথবা তার পক্ষভুক্ত লোকেরা শোষিত শ্রেণির অবস্থান থেকে সংস্কৃতি চর্চা, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত চর্চা করতে নিযুক্ত হন তখনই শোষক শ্রেণির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সেই ধরনের সংস্কৃতি চর্চা কোনো সত্যিকার সংস্কৃতির চর্চা নয়, তা হল সংস্কৃতি চর্চার নামে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের অবমূল্যায়ন মাত্র। সংস্কৃতি চর্চার নামে সেই ধরনের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক প্রচার ধর্মী এবং সে কারণেই তা কখনোও সৃষ্টিশীল শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের জন্ম দিতে পারে না।

শোষক শ্রেণির পক্ষে তার বিপরীত শ্রেণির সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতা এভাবে করা তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কারণ শোষিত সংস্কৃতি চর্চা শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে তার রাজনৈতিক সংগ্রামের এমন এক অতি শক্তিশালী হাতিয়ার যে হাতিয়ার ব্যতিরেকে সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সংস্কৃতি বলতে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি যাই বোঝানো হোক, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তা একেকটি তত্ত্বের দ্বারা কাঠামোগতভাবে সীমিত থাকে। শোষক শ্রেণি যে সংস্কৃতি চর্চা করে তারও একটা নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো থাকে এবং একইভাবে শোষিত শ্রেণিরও থাকে সংস্কৃতি চর্চার একটা নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো। এই তাত্ত্বিক কাঠামো ইতিহাসের নিম্নতর পর্যায়ে খুবই অস্পষ্ট থাকে। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ একের পর এক মূল পর্যায় অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে তা স্পষ্টতর হতে থাকে। এই তত্ত্বের রূপ সব থেকে স্পষ্ট আকার ধারণ করে যখন শ্রেণি বিভক্ত সমাজ উপনীত হয় তার সর্বশেষ পর্যায়ে অর্থাৎ পুঁজিবাদী পর্যায়ে এবং শোষিত শ্রেণি প্রস্তুত হতে থাকে শোষণমূলক সমাজ উচ্ছেদের জন্য, যখন তারা নিযুক্ত থাকে শ্রেণি সংগ্রামকে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে। এই পর্যায়ে তত্ত্ব নির্মাণই হয়ে দাঁড়ায় শোষিত শ্রেণির সর্বশেষ বা চূড়ান্ত সংগ্রামের এমন এক শর্ত যা পূরণ না হলে শ্রেণিসংগ্রামকে সঠিক ভাবে দাঁড় করানো, সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং সেই সংগ্রামের মাধ্যমে শোষক শ্রেণি উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। লেনিনের বিখ্যাত উক্তি, "বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতীত কোনো বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না" এ কারণেই শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এত তাৎপর্যপূর্ণ।

লেনিন কথিত এই তত্ত্ব যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে শুধু যে সঠিক রাজনৈতিক সংগ্রামই শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে অসম্ভব হয় তাই নয়, সেই রাজনৈতিক সংগ্রামের সহায়ক শক্তি হিসেবে একটি সঠিক তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্গতভাবে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চাও সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা চলে যে, শ্রমিক রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রাম উভয়েরই নিশ্চিত ভিত্তি রচিত হয় তত্ত্বের দ্বারা এবং এই তত্ত্ব রচনাই তাঁদের সংস্কৃতি চর্চা ও সংস্কৃতি সাধনার ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ।

শ্রমিক শ্রেণি সম্পত্তি মালিক পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষের সামাজিক জীবনকে শোষণমুক্ত করতে, তারা জীবন থেকে সম্পত্তি মালিকানা সৃষ্ট সকল প্রকার কুৎসিত সম্পর্ক উচ্ছেদ করতে এবং এ সবের মাধ্যমে জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে।

সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা ইত্যাদি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও সংস্কৃতির মূল চরিত্রটি ধরা পড়ে মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণের মধ্যে। মানুষ যে সৌন্দর্য সাধনা করে তার অভিব্যক্তি ঘটে তার শিল্প সাহিত্য সংগীত ইত্যাদির মধ্যে। কিন্তু সেই অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ রূপ হল সুন্দর জীবন। সুন্দর জীবনের চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই। এজন্য সুন্দর জীবন সৃষ্টিই সংস্কৃতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য অর্জন রাজনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত সম্ভব নয়। রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন এবং ওতপ্রোত হলেও সাধারণ সময়ে এই সম্পর্ক খোলাখুলিভাবে চোখের সামনে ধরা পড়ে না। সেটা ধরা পড়ে সমাজের এক এক সংকট মুহূর্তে, ক্রান্তিকালে, এক চরিত্র থেকে পরিবর্তিত হওয়ার অথবা উত্তরণের সময়। এক কথায় বলা চলে বিপ্লবী পরিস্থিতিতে।

আমাদের এই বাঙলাদেশেও আজ সেই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ জন্য এখানে সংস্কৃতির মূল চরিত্র এখন খুব স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক। এবং ঠিক এ কারণেই আজকের বাঙলাদেশে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সংস্কৃতি চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম একেবারে অবিচ্ছিন্ন।

৩.১ লেখক পরিচিতি : বদরুদ্দীন উমর

বদরুদ্দীন উমরের জন্ম ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়। ১৯৫৩ সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং দু বছর বাদে ১৯৫৫ সালে ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর বদরুদ্দীন শিক্ষকতাকেই জীবনে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে একে একে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৬৯ সালে।

অতঃপর আমরা বদরুদ্দীন উমর রচিত প্রবন্ধগুলির পরিচয় নিতে পারি।

গ্রন্থ পরিচয় :

প্রবন্ধ : ১। সাম্প্রদায়িকতা, ২। সংস্কৃতির সংকট, ৩। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ৫। বাংলাদেশের কৃষক, ৬। যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, ৭। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, ৮। ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ৯। সাময়িক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি ইত্যাদি। রাজনৈতিক বিষয়ই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন।

১৯৭২ সালে অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন উমর বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

৩.২ বিষয় সংক্ষেপ

সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ ব্যক্তিগত কোনো কিছু নয়, বরং তা সমষ্টিগত। কেননা সংস্কৃতি কোনো না কোনো সমাজের নিজস্ব গঠনের প্রতিফলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণির সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীতচর্চা বা শিল্পচর্চাই হল সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতির আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সমাজ বা গোষ্ঠীটির আলোচনাও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আবার একথাও ঠিক যে প্লেটো, মার্কস, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, হিটলার, লেনিন প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত মনীষীরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তাঁদের আবির্ভাব না ঘটলে তাঁদের কর্মকাণ্ড অন্য কারও দ্বারা পূরণও হত না। অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের সমসাময়িক ইতিহাসেরই সৃষ্টি। ব্যক্তি ইতিহাসের গতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও কোনো ব্যক্তিরই অবস্থান তার আপন সমাজের এবং ঐতিহাসিক কালপর্বের উর্ধ্বে নয়।

এখন প্রশ্ন, সমাজ কী? সমাজের অর্থ কি এমন এক যৌথ জীবন যেখানে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, বৈষম্য নেই, দ্বন্দ্ব-বিরোধিতা নেই? প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের তেমনই একটা যৌথজীবনের সন্ধান পাওয়া গেলেও তার পরবর্তী সময়ে সেই সমাজে সৃষ্ট হয় মারাত্মক শ্রেণি বিভাজন, যার উৎসে রয়েছে মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যে-দুটি অংশে সেই সমাজ বিভক্ত হয়েছিল তা হল শোষক ও শোষিত; বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। ইতিহাসে এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে আবির্ভাব ঘটে দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা এবং পুঁজিবাদী প্রথার। তাই সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোনো আলোচনা যেমন সমাজ বিবিক্ত নয়, তেমনি শ্রেণিনিরপেক্ষও নয়।

সংস্কৃতি চর্চার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অবসরের। প্রাত্যহিক বা নৈমিত্তিক ক্রিয়াকরণের বাইরে অতিরিক্ত সময় হাতে পেলে তবে মানুষ শুরু করেছে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত চর্চা। কিন্তু প্রশ্ন, সকলেই কি এই অবসরের অধিকারী হয়েছিল? না, শুধু সম্পত্তির মালিকেরাই পেয়েছিল সেই অধিকার। অথচ তারা কতটা বুঝেছে সংস্কৃতিকে? লেখক বলছেন, সেকালে সংস্কৃতি চর্চা বলতে অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও বোঝাত। সুতরাং সম্পত্তির মালিক এদিক থেকে যোগ্য ধারক-বাহকই বটে। তারাই তাদের প্রয়োজনমতো সংস্কৃতিকে গড়ে-ভাঙে, নিয়ন্ত্রণ করে। তবু তাদের দ্বারা সৃষ্ট এই সংস্কৃতির মধ্যে কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়া যায় না। এই সামগ্রিক চিত্রকে পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত শ্রমজীবী মানুষদের দিকে। যদিও তাদের সংস্কৃতির মান মালিক-সংস্কৃতির তুলনায় নিম্নতর, তবু তার একটি নিজস্বতা আছে, একটি শক্তি আছে, যে শক্তি নিয়ে তারা শোষক শ্রেণির মোকাবিলা করে। সংখ্যায় এরাই গরিষ্ঠ। তবু যখনই তারা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা করতে প্রয়াসী হয়েছে তখনই শোষক শ্রেণির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এ কোনো সত্যিকার সংস্কৃতিচর্চা নয়, বরং সংস্কৃতিচর্চার নামে শিল্পের অবমূল্যায়নমাত্র, রাজনৈতিক প্রচার। তা কখনো সৃষ্টিশীল হতে পারে না।

যে-কোনো সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো থাকে, সে শোষক শ্রেণিরই হোক বা শোষিত শ্রেণির। আদিম যুগে এই তাত্ত্বিক কাঠামো তেমন সুদৃঢ় ছিল না। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এই তাত্ত্বিক কাঠামো সবচেয়ে স্পষ্ট আকার ধারণ করে যখন শ্রেণিবিভক্ত সমাজ উপনীত হয় তার সর্বশেষ পর্যায়ে অর্থাৎ পুঁজিবাদী পর্যায়ে এবং শ্রমজীবী মানুষ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদে উদ্যোগী হয়। প্রসঙ্গত লেখক এখানে লেলিনের একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করেছেন—"বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতীত কোনো বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না।" বলা যায়, শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রাম উভয়েরই নিশ্চিত ভিত্তিমূল রচিত হয় তত্ত্বের দ্বারা, যে তত্ত্ব রচনা তাদের সংস্কৃতিচর্চার বা সাংস্কৃতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ।

আলোচ্য প্রবন্ধের ক্রমপরিণতিকে লেখক বলেছেন যে সংস্কৃতির মূল চরিত্র ধরা পড়ে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণের মধ্যে। মানুষের সৌন্দর্য সাধনার অভিব্যক্তি ঘটে তার সংস্কৃতির চর্চার মধ্যে। সুন্দর জীবনের সৌন্দর্যই আলাদা। এজন্য সুন্দর জীবন সৃষ্টিই সংস্কৃতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

৩.৩ ভাবনা-বিশ্লেষণ

সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকেন। তাই বোঝা যায়, সংস্কৃতি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। তা কোনো না কোনো সমাজের নিজস্ব গঠন চরিত্রের প্রতিফলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সমাজই সংস্কৃতির উৎস বলে দেখা যায়, বিশেষ সমাজের বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে যে কর্মধারা দেখা যায় তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক

থাকে। তাই বৌদ্ধ জাতকের কাহিনির সঙ্গে অজন্তা ইলোরার চিত্রকর্মের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু প্রশ্ন হল, সমাজ কী? ইতিহাসের আদিতম যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত সমাজের বিবর্তনের চেহারাটা কেমন? প্রাথমিক পর্বে মোটামুটি বৈষম্যহীনতা থাকলেও ক্রমশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে রচনা করে শ্রেণিবিভাজন। এর ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় মালিক ও শ্রমিক তথা শোষক ও শোষিত শ্রেণি। আরও পরবর্তীকালে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দেখা গেল মালিক শ্রেণিই সেই অবসরের অধিকারী, সেখানে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা চলে। অথচ সত্যিই কি তারা সংস্কৃতিচর্চার যোগ্য? প্রকৃত যোগ্য সংস্কৃতিচর্চার বাহক হল শ্রমজীবী, শোষিত মানুষেরা। তারা অভিজ্ঞ, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের একটি সমষ্টিগত জীবন আছে বলে রয়েছে একজাতীয় সংস্কৃতিও। যুগযুগ ধরে তাদের এই সংস্কৃতিচর্চাকে শোষক শ্রেণি অবদমিত করতে চেয়েছে, অবমূল্যায়নও করেছে। এভাবেই জন্ম নিয়েছে শ্রেণিসংগ্রাম, শোষণমূলক সমাজ উচ্ছেদের পরিকল্পনা। শ্রমিক শ্রেণি এই সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের জীবনকে সুন্দরতর করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সুন্দর জীবন সৃষ্টিই সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য।

রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন হলেও সাধারণত তা চোখে পড়ে না। তা ধরা পড়ে সমাজের কোনো এক সংকটমুহূর্তে, ক্রান্তিকালে, বিপ্লবী আবহাওয়ায়। ১৯৮৯-তে, এই প্রবন্ধ লেখার সময় লেখক অনুভব করেছেন যে বাংলাদেশেও এখন এক ক্রান্তিকাল চলছে। তাই এখানে সংস্কৃতির চরিত্র রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

একক ৪ ❑ স্বরূপের সন্ধানে : আনিসুজ্জামান

৪.০ মূল প্রবন্ধ

৪.১ লেখক পরিচিতি

৪.২ বিষয়-সংক্ষেপ

৪.৩ ভাবনা-বিশ্লেষণ

৪.০ মূল প্রবন্ধ

ব্রিটিশ-রাজ বিদায় নিলেন, ভারতবর্ষ বিভক্ত হল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পত্তন হল। এখন যে ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ, তখন তার পরিচয় হল পূর্ব পাকিস্তান বলে, পাকিস্তান-রাষ্ট্রের পূর্ব বাংলা প্রদেশ হিসেবে। দেখা গেল, পূর্ব বাংলা তার রাষ্ট্রীয় শরিক পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন; আর রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ভারতীয় প্রদেশ পশ্চিম বাংলার থেকে—যে অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব বাংলা দীর্ঘকাল ধরে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে এসেছে।

পূর্ব বাংলা কি সত্যিই বহন করে এসেছে একই ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার? করে থাকলে তার অংশ কতটুকু? পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন নিজেদেরকে। এসব কথা ঠিক হঠাৎ ওঠেনি। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে আসছিলেন। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ শুধু সেসব জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করার একটা জরুরি তাগিদ এনে দিয়েছিল তাঁদের মনে।

১৯৪৭ সালের আগে তাঁরা যে-ধরনের বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে পটভূমিটা বোঝা সহজ হবে। সংগীত বা চিত্রকলা, নাট্যাভিনয় বা নৃত্যকলা সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাস-আশ্রিত এক ধরনের আপত্তি প্রচলিত ছিল। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় থিয়েটারের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় তার মুসলমান সম্পাদককে নিদারুণ ভর্ৎসনা করেছিলেন *ইসলাম প্রচারক*-সম্পাদক। ঘটনাটা ১৯০০ সালের।[১] ইসলামে সংগীত সিদ্ধ কিনা, এ নিয়ে ১৯২০-এর দশক জুড়েই বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। এই ধরনের বিচারের উলটোদিকে প্রকাশ পেয়েছিল একরকম আধুনিক মনোবৃত্তি : ধর্মীয় নির্দেশ যাই হোক না কেন, বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রবণতা।[২] এর উদাহরণ পাওয়া যায় সেইসব লেখকের রচনায়, যাঁরা মনে করেছিলেন যে, ইসলামের অনুশাসন যাই হোক না কেন, নাট্যাভিনয়ের সামাজিক সুফল আছে বলে তার বিকাশ সাধিত হওয়া উচিত।[৩]

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, এসব তর্ক-বিতর্ক ছিল নিতান্ত কলমের লড়াই। কেননা গ্রামাঞ্চলে তো সব সময়েই কোনো না কোনো ধরনের সংগীত বা নাট্যাভিনয়ের চল ছিল আর তার পৃষ্ঠপোষকতা তো করতেন সাধারণ মানুষ—মুসলমানের অংশও সেখানে কম ছিল না। সেকথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, উনিশ শতকের মুসলিম সংস্কার-আন্দোলনের ধারাটা ছিল এ-ধরনের শিল্পচর্চার বিরোধী। এর আড়ালে যা উপভোগ্য ছিল, প্রকাশ্যে হয়তো তা ছিল বিব্রতকর।

এইসব বাধানিষেধ ভেসে গেল নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাবে—বিশেষত তাঁর ইসলামি গানের বন্যায়। এসব গান গেয়ে আব্বাসউদ্দীন (১৯০১-৫৯) লাভ করলেন অসামান্য জনপ্রিয়তা। সেই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়াও সমাদর পেল; তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালি মুসলমানের গর্বের বিষয়। তেমনি, বুলবুল চৌধুরী (১৯১৬-৫৩) যখন রচনা করলেন *হাফিজের স্বপ্ন*, তখন অন্তত শহরে বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানের গৌরবগাথার নৃত্যরূপ বলে তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। আবার, পঞ্চাশের বিষয়ে তাঁর *যেন ভুলে না যাই* নৃত্যনাট্যের বিষয় ইসলামি না হলেও মুসলমান শিল্পীর অসামান্য সাফল্যের নিদর্শনরূপে তা নিয়ে গর্ববোধ জেগেছিল। বলা বাহুল্য, মন্বন্তর বিষয় শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল জয়নুল আবেদীনের (১৯১৪-৭৬) ছবি। এখানেও, বিষয়গৌরবে নয়, মুসলমান শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় হিসেবেই, এসব চিত্র নিয়ে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল মুসলমান সমাজে। ঠিক একই কারণে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করায় গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৪৬) কবিতা লিখেছিলেন[৫], এবং সে কবিতা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি, চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমানের উদ্যোগে প্রথম চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রয়াস দেখা দিলে নিন্দার বদলে আনন্দের প্রকাশই ঘটেছিল অধিক।

বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে এ-ধরনের গৌরববোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল—বাঙালি সংস্কৃতির প্রধানতম উপাদান—সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের একটা বিশেষ মনোভাব। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে তাঁদের মনে ছিল এক সশ্রদ্ধ গর্ববোধ। মুসলমান শাসকরা যে প্রধানত হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং অনুবাদ করিয়েছিলেন সংস্কৃত পুরাণের, তা নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি। মধ্যযুগে যে বহু মুসলমান কবি কাব্যরচনা করেছিলেন, তাও ছিল গর্বের বিষয়। যদিও, যারা গর্ব করতেন, তাঁরা জানতেন যে, এসব কাব্যের ভাব সর্বত্র ইসলামি ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়নি।

তবে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ যে-যুগের সূচনা হয় উনিশ শতকে, সেই আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের মনে দ্বিধা ছিল প্রবল। ইংরেজি-শিক্ষিত অমুসলমান সাহিত্যিকরা ছিলেন এই যুগের স্রষ্টা; উনিশ শতকের শেষার্ধে তাঁদের রচনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে-ভাব দেখা দিয়েছিল, মুসলমানেরা তা অনুমোদন করতে পারেননি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শিল্পগত উৎকর্ষের কথা মেনে নিয়েও সে-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা তিন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন : এক, মুসলমানের নিত্যব্যবহার্য আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানি শব্দ আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় স্থান পায়নি; দুই, এ-সাহিত্যে মুসলিম জীবনের কোনো পরিচয় নেই; তিন, তার চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, ইতিহাসাশ্রিত যেসব কাব্য-নাটক-উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র স্থান পেয়েছে, সেসব রচনায় মুসলমানের শ্রদ্ধেয় বহু ঐতিহাসিক চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে।

মুসলমান লেখকেরা আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন ১৮৭০-এর পরে। তখন তাঁদের একটা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বাংলা সাহিত্যের উপরিউক্ত ত্রুটি দূর করা এবং ওই অভাব পূরণ করা। এ-বিষয়ে তাঁরা যে খানিকটা সাফল্য অর্জন করেন, এতে সন্দেহ নেই। তবু সমালোচকেরা খুশি হননি। 'পতিত' মুসলমান সমাজের উন্নতির পথপ্রদর্শন এবং ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশসাধনাকে যাঁরা লেখকের কর্তব্য বলে স্থির করেছিলেন, তাঁরা মুসলমান লেখকদের রচনায় বহু দোষ পেয়েছিলেন। যেমন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর (১৮৭০-১৯৬৮) কুরআন অনুবাদে পৌত্তলিক শব্দের ব্যবহার ("তিনি এ-কাজ করতে গিয়ে ইসলামি পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছেন!")[৬] মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) উপন্যাসে সমাজ-অননুমোদিত প্রণয়চিত্র-অঙ্কন ('ধর্ম এবং সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ওরূপ

পূর্ববিবাহ-প্রেম আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে'।)[৮], রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) প্রবন্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি ('খ্রিস্ট-ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরি সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে।')[৮] এবং নজরুল ইসলামের রচনায় ধর্মদ্রোহিতা ('খোদাদ্রোহিতা, পয়গম্বরদ্রোহিতা, প্রতিমা ও দেব-দেবী পূজা, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, জেনা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা—এই সমস্তই যদি তাঁহার বাণী হইল, তবে ইসলামের কিছু রহিল কি?')[৯]। অন্যপক্ষে উদারনৈতিক সাহিত্য-সমালোচকরা মুসলমান লেখকদের রচনায় মৌলিকতার অভাবের অভিযোগ আনলেন এবং ধিক্কার দিলেন তাঁদের সাহিত্যবিচারের পদ্ধতিকে।[১০]

তবু একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, ভালো হোক, মন্দ হোক, মুসলমান লেখকদের সাধনায় বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। তখনকার সমাজে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদের যে ভাবটা পরিব্যাপ্ত ছিল, এসব রচনায় তার ছায়া পড়েছে; এসব রচনা আবার সে-ভাবকে পুষ্ট করতেও সাহায্য করছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, লেখকেরা সবসময়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির ধ্বজা বহন করেছেন। যাঁরা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পক্ষে লিখেছেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে লেখনি চালনা করেছেন, অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন কিংবা সামাজিক সংস্কারের পক্ষে প্রচার করেছেন, তাঁরাও ভুলে যাননি যে, তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁরা এই পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও প্রধানত মুসলমান সমাজ-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন মুসলমান পাঠকের উদ্দেশেই। এর ব্যতিক্রম ছিলেন বিশের দশকে নজরুল ইসলাম, ত্রিশের দশকে জসীমউদ্দীন (১৯০৪-৭৬) এবং চল্লিশের দশকে নতুন লেখককুল।

রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমা-অতিক্রমকারী এক বিশ্বব্যাপী ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার চেতনা থেকে পরিচালিত হয়েছিলেন বলে বাঙালি মুসলমানেরা দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তি ও ঘটনা, ভাব ও বস্তু, স্থান ও ভাষাকে মুসলমানের নিজস্ব বলে নির্ণয় করেছিলেন এবং সেদিকে তাকিয়েছিলেন বিমুগ্ধচিত্তে, অব্যক্ত আকুলতা আর বিশেষ গর্ব ও অধিকারবোধ নিয়ে। অনেকটা এই কারণেই তাঁরা পীড়িত হয়েছিলেন তথাকথিত ভাষা-সমস্যায়। আরবি তাঁদের ধর্মের বাহন, ফারসি সংস্কৃতির ভাষা, উর্দু সর্বভারতীয় যোগাযোগের, ইংরেজি সরকারি কাজকর্মের, আর বাংলা জন্মসূত্রে লব্ধ। এতগুলো ভাষা তাঁরা সামলাবেন বা কী করে, আর কী করেই বা নির্ণয় করবেন এদের অগ্রাধিকারের ভিত্তি—এই ছিল সমস্যা। মুসলমান লেখকদের সচেতন ও অবিরাম প্রয়াস এই দ্বন্দ্ব ঘোচাতে সাহায্য করেছিল। এক সময় ছিল, উর্দুকে মাতৃভাষা বলে পরিচয় দিতে পারলে খুশি হতেন অনেকে। তারপরে দিন যত গেছে, তত প্রবল হয়েছে এই ঘোষণা যে, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা এবং উচ্চকিত হয়েছে এই দাবি যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ভাষাকে ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তো বাংলা ভাষাকে অনেকে জাতীয় ভাষা বলে অভিহিত করেছিলেন, যদিও সে-প্রয়াস নিন্দিত হয়েছিল আরবি ভাষাকে তার যথার্থ স্থান থেকে বিচ্যুত করার অপচেষ্টা বলে।[১২] তবু দৃষ্টিভঙ্গির যে কতখানি বদল হয়েছিল, তা বোঝা যায়, ১৯২৮ সালে যখন বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্রদের জন্য উর্দুকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় আবশ্যকীয় বিষয়রূপে প্রবর্তন করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন রক্ষণশীল *মোহাম্মদী* পত্রিকার বিরোধিতা থেকে।[১৩]

মুসলমান হিসেবে পরিচয়দানের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বাঙালি হিসেবে নিজেদের সত্তাকে তুলে ধরার একটা বিশেষ প্রয়াসও দেখা গিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত মুসলিম-ধারার অনুসরণ করতে গিয়ে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা তাই অনুভব করেছিলেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরা একদিকে যেমন মুসলমান হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের পূর্ণতাসাধনের পালাও রচনা করছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশিরভাগ মুসলমান লেখকের কাছে মনে হয়েছিল যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁদের পক্ষে এই দ্বৈত ভূমিকা পালনের পথ প্রশস্ত হবে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব-গ্রহণের কাল থেকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত সংস্কৃতিক্ষেত্রে পাকিস্তানি জাতীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি। তবে স্বঘোষিত তাত্ত্বিকেরা পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা যে করেননি, তা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে দুটি সাহিত্য-সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪২ সালে : ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। প্রতিষ্ঠান দুটির নামও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ : কেননা এর আগে পর্যন্ত মুসলমান পরিচালিত সভা-সমিতির নামকরণে মুসলমান কথাটা বিজ্ঞাপিত করাই ছিল প্রচলিত প্রথা। ১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) বলেছিলেন যে, 'পাকিস্তান শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী নিয়ে এসেছে।' সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাকে তিনি দেখেছিলেন—মুসলমানের স্বকীয়তার উদ্‌বোধন ও আত্মোপলব্ধির প্রকাশ বলে। বাংলার মুসলমান লেখকের ভাবে-ভাষায় শুধু হিন্দু লেখকদের অনুকরণ করেছেন—এই ছিল তাঁর বিশেষ উদ্বেগের কারণ। তাই তিনি পরানুকারিতা পরিহার এবং কী বিষয়বস্তুতে, কী প্রকাশভঙ্গিতে, সাহিত্যে মুসলমানের নিজত্বের প্রতিষ্ঠার দিকে সকলকে মনোযোগী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৮] পরের বছরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রথম সম্মেলন : এই সম্মেলনে অমুসলমান বুদ্ধিজীবীরা শুধু আমন্ত্রিত হননি, কোনো কোনো শাখার সভাপতির পদেও বৃত হয়েছিলেন। মূল সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)—অল্পকাল আগে তিনি পাকিস্তান দাবির সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন—পাকিস্তানি জাতীয়তার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এরকম :

১. 'রাজনীতিকের বিচারে 'পাকিস্তানে'র অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আযাদি, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারেল অটনমী।'
২. 'এ-কথা মানি যে হিন্দুর সংস্কৃতিতে ও মুসলমানের তমদ্দুনে এক শ একটা মিল রয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, তাদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে প্রচুর।'
৩. 'ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে-সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ ও সমৃদ্ধি।'
৪. 'পূর্ব পাকিস্তানের [সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ও আসাম প্রদেশের] বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।'
৫. 'পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাঙলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এ-সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছেন।

   তবু এ-সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ কোনো প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর বিষয়বস্তুও মুসলমান নয়। এর স্পিরিটও মুসলমানি নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।'

৬. 'বস্তুত বাঙলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানি বাঙলা সাহিত্য বা পুথি-সাহিত্য।'
৭. 'পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না।'
৮. 'ভাষার কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। ...আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, বাঙলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবো না।...'[১৫]

পরে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছিলেন যে, তাঁর অভিভাষণটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।[১৬] হয়তো এর বিক্রি হয়েছিল খুব ভালো। কিন্তু যতই তিনি লাহোর প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে থাকুন না কেন, ওই সম্মেলনে উপস্থিত খাজা নাজিমউদ্দীন, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের মতো শীর্ষস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা তাঁর ত্রিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, একথা কল্পনা করা সহজ নয়। তেমনি সাংস্কৃতিক অতীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কতখানি যে লেখক-শিল্পীরা মেনে নিয়েছিলেন, তাও নিরূপণ করা দুরূহ। আবুল মনসুর আহ্‌মদ একটা দিক নির্ণয় করেছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটার অপেক্ষায় বহু প্রশ্নের মীমাংসা যে মুলতবি রয়ে গিয়েছিল, তাতেও সন্দেহ করার কারণ দেখি না।

দুই

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যখন ঘটল, তখন তার কল্পিত রূপের অনেকখানি গেল বদলে। মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলা প্রদেশকেই পাকিস্তানের অংশস্বরূপ দাবি করেছিলেন। কার্যত সে-প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হল। আর এর ফলে দেখা দিল নতুন কিছু প্রশ্ন। মুসলমান লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা যিনি অর্জন করেছিলেন, সেই নজরুল ইসলাম ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে পড়ে রইলেন কলকাতায়। ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব সত্ত্বেও কি তাঁকে পাকিস্তানিরা এখন নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশস্বরূপ বলে দাবি করতে পারবে? আর প্রশ্ন তো শুধু নজরুলকে নিয়েই নয়। অন্যরাও আছেন। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) কী এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯) কী গোলাম কুদ্দুস স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫-৭৪) অচিরেই পাকিস্তান থেকে চলে গেলেন ভারতে। এমনকি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন বা আবুল মনসুর আহমদও পাকিস্তান-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নতুন রাষ্ট্রে চলে আসেননি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা-সম্পাদনে তাঁরা ব্যস্ত রইলেন। তাই একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে উঠল যে, কয়েক লক্ষ পাকিস্তানি অমুসলমানের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে যদি ধর্মীয় বিচারের মাপকাঠি প্রয়োগ করা যায়, তাহলেও সুরাহা হয় না। আবার যদি নতুন রাজনৈতিক সীমানার ভিত্তিতে ভাগাভাগি করতে হয়, তাহলেও ছেড়ে দিতে হয় অনেক লাভ, মেনে নিতে হয় অনেক দায়। নিদানস্বরূপ তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল ভাবাদর্শগত এক মাপকাঠি প্রয়োগের।

এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যেমন ছিল দুরূহ, মতৈক্য স্থাপন হওয়াও তেমনি ছিল দুঃসাধ্য। তাই বিচিত্র নয় যে, সেদিন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে একাধিক মতবাদ দেখা দিয়েছিল। একটি মতবাদ শুধু বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানকেই স্বীকার করেছিল, অমুসলমান লেখকদের কীর্তি হয় উপেক্ষণীয় নয়তো বর্জনীয় বলে বিবেচনা করেছিল। এই ভাবনার একটি কৌতূহলদ্দীপক অভিব্যক্তি ঘটেছিল ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেবের কাছে প্রদত্ত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত' রাষ্ট্রভাষা

কর্মপরিষদের স্মারকলিপিতে। এই স্মারকলিপিতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষার দাবির পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তার একটিতে বাংলাভাষার সমৃদ্ধিসাধনে 'আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসীমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকের অবদানের উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ মুসলমান বলে ভারতবাসী নজরুল ইসলাম ও ওয়াজেদ আলীর কথা স্মরণ করা গিয়েছিল অসঙ্কোচে, কিন্তু অমুসলমান বলে লোকান্তরিত রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়নি। স্মারকলিপির অপর একটি যুক্তিতে বলা হয় যে, এই 'ভাষার শব্দসম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।'[১৭] এই তথ্যে অতিরঞ্জনের ভাগ ছিল মাত্র পনেরো গুণ। তবে এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে কর্মপরিষদ যে-রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 'মুসলিম'-চরিত্রের ওপরেই অতিরিক্ত গুরুত্বদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আর তা হয়তো অকারণ ছিল না। কেননা বিরোধীপক্ষ ইতোমধ্যেই বাংলাভাষাকে 'রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত' বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিলেন।[১৮]

তবে ব্যাপারটা সর্বত্র শুধু সাময়িক কৌশলের ছিল না। যাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের কথা ভাবছিলেন তাঁদের জন্যে তা হয়ে উঠেছিল এক সজ্ঞান প্রয়াসের বিষয়, সৈয়দ আলী আহসান (জ. ১৯২২) এই সজ্ঞান অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে :

> প্রাক্তন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষিত হবে না। সেগুলোর উপর উভয় বাংলারই পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে, এই সাহিত্যের ট্র্যাডিশনও আমরা গ্রহণ করব। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজব। সে সঙ্গে একথা সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি।... পূর্ব বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার হল ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য, অগণিত অমার্জিত পুথিসাহিত্য, অজস্র গ্রাম্যগাথা, বাউল ও অসংস্কৃত অঙ্গের পল্লীগান।[১৯]

এই উপলব্ধি থেকে পরিচালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর সম্পাদিত দুখণ্ড *গল্প সংগ্রহে* (ঢাকা ১৯৫২) কোনো অমুসলমান লেখকের গল্প স্থান পায়নি। এ-ধরনের আরেকটি সংকলন হল পাকিস্তান পি. ই. এন. প্রকাশিত Poems from East Bengal (করাচি, ১৯৫৪)। এতে চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ স্থান পায়। সংকলনে নজরুলের এগারোটি এবং হুমায়ুন কবিরের একটি কবিতা স্থান পেয়েছিল। অমুসলমান কবিদের মধ্যে ছিলেন শুধু সমকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন অপ্রধান কবি : গ্রন্থভুক্ত তাঁর একমাত্র কবিতার বিষয়বস্তু ছিল ঈদ-উৎসব। কেন যে এ-ব্যতিক্রম সাধিত হয়েছিল, এই বিষয়বস্তু থেকে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। নির্বাচনের এই পদ্ধতির সঙ্গে অনুবাদিকা-সম্পাদিকার নিম্নোক্ত বক্তব্য মিলিয়ে নেওয়া চলে :

> Rural Bengal, comprising of weavers, artisans and peasants, is mainly Muslim. ... They delve into the store-house of Muslim legends and Islamic history, besides native customs and rites for their matter and material. ...

> Often the charge is made against the heathen character of East Pakistan Literature. ...But it is perhaps the most unjustified of charges ... images drawn from a romantic pagan past became nevertheless the stock-in-trade of Urdu poetry. Precisely in the same manner the East Pakistani poet used terms such as "Rudra", "Tandav", "Binapani", "Mahakaal"—which are pregnated with associations abstract or personified—effortlessly.

তবে যাঁরা এ-ধরনের শব্দকে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক ভাষা থেকে নির্বাসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, তারা উপরিউক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারতেন না।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-৮২)। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে এক পরিত্যক্ত ধারণাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর মতে, বাংলাভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে প্রমাণ করার যে চেষ্টা করেছেন হিন্দু পণ্ডিতেরা, তা অগ্রাহ্য। আসলে বাংলাভাষা আর্য-আগমনের পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা—সংস্কৃত বা আর্য ঐতিহ্যের সঙ্গে এ-ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই।[২১] এই তত্ত্বের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। যদিও বাংলাভাষার সকল পণ্ডিত এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবু ষাটের দশকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য বাংলা সাহিত্য-সংকলনের ভূমিকায় গোলাম মোস্তাফা এই মত প্রচারের সুযোগলাভ করেছিলেন।

তবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-সংক্রান্ত বিতর্কে গোলাম মোস্তাফার একটি নিজস্ব অবদান ছিল। ইসলামি ভাবাদর্শের মাপকাঠিতে অতীত বা সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের একটি তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেন ১৯৫০ সালে। বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার ভাব ও আদর্শের এবং প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইসলামের 'চমৎকার সৌসাদৃশ্য' লক্ষ্য করে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কবির।[২২] এখন নজরুল ইসলামের কবিতায় এসব গুণের অভাবের জন্যে নজরুলকে যথোচিত আক্রমণ করলেন তিনি। কাব্যবিচারের এই বিশেষ পদ্ধতিকে পাকিস্তানি আদর্শ বলে অভিহিত করে গোলাম মোস্তফা প্রস্তাব করলেন যে, হিন্দু ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কিত হবার দায়ে নজরুলের কাব্যে অধিকাংশ—তাঁর ভাষায়, যা অবাঞ্ছিত অংশ—বর্জিত হোক।[২৩] নজরুলের বিরুদ্ধে আবার তিনি এই আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন ১৯৫৮ সালে।[২৪] তার দুবছর আগে মাইকেল মধুসূদনকে তিনি পাকিস্তানের মহাকবি বলে অভিহিত করেন। তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করে গোলাম মোস্তাফা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন : মধুসূদনের জন্মভূমি পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরে পড়েছিল (গোলাম মোস্তফার নিজের জন্মভূমির অদূরে), মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বরণ করেছিলেন খ্রিস্টধর্ম; আর রামায়ণের পাষণ্ড চরিত্র রাবণকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন মহাকাব্যের নায়করূপে।[২৫] অনেকটা গোলাম মোস্তাফার মতো ইসলামি ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য থেকে আবদুর রহমান খাঁ (১৮৮৯-১৯৬৪) পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যকারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন নারী-ভূমিকা বর্জিত নাটক রচনার জন্যে।[২৬]

সাংস্কৃতিক অতীত সম্পর্কে দুধরনের বক্তব্যের পরিচয় আমরা পেলাম। একটিতে ছিল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজনের আয়োজন, অপরটিতে ছিল ভাবাদর্শগত পরীক্ষার প্রস্তাব। তৃতীয়টিকে বলা যেতে পারে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি : মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বিশেষ গর্ববোধ সত্ত্বেও বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সমগ্রতা সম্পর্কে সচেতনতা এতে প্রকাশ পেয়েছিল। এই মতের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা যায় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলে প্রদত্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের (১৯০৬-৬৪) বক্তৃতায়। তিনি খুব সহজভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে 'হিন্দু-মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্য।' তাই তাঁর বক্তৃতায় কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অসংকোচ উল্লেখ ছিল। তাঁর মতে :

> বাঙ্গালার বিরাট জনসমাজ এখনো সাহিত্যে স্থান পায়নি। আজ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকের কাজ হবে রিক্ত সর্বহারাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া। এদের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা। এক কথায় সত্যিকারের গণ-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা হবে আমাদের সাধনা।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে হবীবুল্লাহ বাহার আরেকবার সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২৮] এই সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) যেসব মতামত প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কয়েকটি ছিল এ-রকম :

১. 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়।'

২. 'আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।'

৩. 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।'

এই বক্তব্যের জন্যে সেদিন ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌কে অনেক বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচিব, সিভিল সার্ভিসেস উর্দুভাষী সদস্য, জনাব ফজলে আহমদ করিম ফজলি সম্মেলনের সভামঞ্চেই শহীদুল্লাহর তীব্র সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অধিকাংশ শ্রোতার তিরস্কারধ্বনির মধ্যে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু পরদিনই প্রায় একই ধরনের ভাষায় শহীদুল্লাহকে আক্রমণ করে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *আজাদ*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল বলে মনে হয় না; বরঞ্চ সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকাও শহীদুল্লাহ-বিরোধীতায় *আজাদ*-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[৩০]

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে এই তিন ধরনের মতামতই পাশাপাশি অভিব্যক্ত হতে থেকেছিল। গোলাম মোস্তাফা-প্রবর্তিত ভাবাদর্শগত তত্ত্বের সংকীর্ণতা এতই স্বপ্রকাশ ছিল যে, তা নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। তবে স্কুলপাঠ্য-পুস্তকাদি প্রণয়নে তাঁর মতামত অনেকখানি গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয়। সেই পরিচয় বিধৃত হয়েছিল যেমন রচনাদির নির্বাচনে, তেমনি মূল পাঠের পরিবর্তন-সাধনে (যেমন, নজরুলের কবিতাংশে 'ভগবানে'র বদলে 'রহমান পাঠ-সন্নিবেশ)। পরে বেতার-কর্তৃপক্ষও এই ধরনের একটা নীতি অনুসরণ করেছিলেন : তবে পাঠ পরিবর্তনের চেয়ে প্রচারযোগ্য রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সে নীতির প্রকাশ ঘটেছিল অধিক।

সম্প্রদায়গত পরিচয়ের তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। মুখ্যত এই তত্ত্বের প্রভাবে—হয়তো অংশত ভাবাদর্শগত অনুপ্রেরণায়—উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যতালিকায় অমুসলমান লেখকদের বইপত্রের বদলে মুসলমান লেখকদের রচনাদি সন্নিবেশ করার একটা দাবি উঠেছিল। সে দাবি মেনেও নেওয়া হয়েছিল অনেকখানি; তবে

পণ্ডিতেরা একটা পর্যায়ের পর আর পরিবর্তন করতে সম্মত হননি—আরো পরিবর্তন করলে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হবে, এই যুক্তিতে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে এই তত্ত্বের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কয়েকটি সংকলনগ্রন্থে তার উদাহরণ মেলে। যেমন, আহমদ শরীফ-সম্পাদিত *মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ* (ঢাকা, ১৩৭০) ও *আধুনিক গদ্য-সংগ্রহ* (ঢাকা, ১৩৭১)। এসব ছিল শুধু মুসলমান কবি ও গদ্য লেখকদের রচনার সংগ্রহ। তেমন সংকলন প্রণয়নে কারো আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু এসব গ্রন্থের নামকরণ থেকে সংকলনের সেই প্রকৃতি কোনো উপায় নেই। একই তত্ত্বের অনুপ্রেরণায় নজরুল ইসলামকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন চলেছিল। এই বিচারে নজরুল যেমন হয়ে উঠেছিলেন কবি ইকবালের বাংলাভাষী সম্পূরক, তেমনি পরিণত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কার্যকর প্রতিপক্ষে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আরো পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে ঢাকায় ইসলামি সংস্কৃতি সম্মেলন এবং ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলভী আবদুর রহমান তাঁর ভাষণে স্পষ্টতই ঘোষণা করেন : "এখন আমি আর বাঙালি নই। আমি পূর্ব পাকিস্তানি।"[৩১]

তবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমগ্রতা সম্পর্কে নতুন করে আস্থাজ্ঞাপনের ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে ভাষা আন্দোলনের অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী। এরপর থেকে তাই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অতীতের বিচার করা সহজতর হয়েছিল। অন্য মতে সমালোচনা প্রসঙ্গে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-৭১) প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, সোহ্‌রাব-রুস্তমের কাহিনির মতো প্রাক্-ইসলামি ফারসি উপাখ্যান যদি মুসলমানের পক্ষে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে যুধিষ্ঠির অর্জুনের কাহিনির মতো প্রাক্-ইসলামি ভারতীয় উপাখ্যান গ্রহণযোগ্য হবে না কেন?[৩২] কুমিল্লায় ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকায় ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এবং কাগমারীতে ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে গতি দিয়েছিল। সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিরুদ্ধ পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছিলেন এই ভাষায় :

> ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি পারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙ্গালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ কেউ এতে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন।[৩৩]

যে-ভূতের ভয়ের উল্লেখ তিনি করেছিলেন, তা আবার বড় করে দেখা দেয় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়ে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টাকে সরকার যতদূর সম্ভব বাধা দিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই নিজেদের বলে দাবি করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৬৩ সালে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্‌যোগে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়; সেখানে সভাগৃহের ভেতরে ও বাইরে অজস্র শ্রোতা দুর্বোধ্য চর্যাগীতি থেকে শুরু করে দুরূহ আধুনিক কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে যাঁদের কবিতা, গদ্যরচনা ও গান আবৃত্তি, পঠিত ও গীত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই ছিলেন। ছিলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় হলেও যাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ভারতীয় হিসেবে। তাঁর কবিতায় পূর্ববাংলার যে-বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরা পড়েছিল, তার জন্যে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এ-জনপ্রিয়তা অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঢেউ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে।

ওই আবহাওয়ায় পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক আবুল মানসুর আহমদ ১৯৬২ সালে লেখেন :

> পূর্ব ও পশ্চিম বাংগালিদের ভাষা এক হরফ এর। আমাদের উভয়ের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম ও সত্যেন দত্ত উভয় বাংলার গৌরবের ও প্রেরণার বস্তু।

আর, পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক স্বকীয়তা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> এ-স্বকীয়তায় পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলেই সমভাবে শামিল ও শরিক। তাদের সকলের সম্মিলিত রূপ প্রতিফলিত হইবে এই স্বকীয়তায়।[৩৫]

আবুল মনসুর আহমদ যদিও তাঁর পুরনো মতামতের অনেকখানি বজায় রেখেছিলেন, তবু সময়ের অধঃগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৪ সালের বক্তব্য থেকে যে তিনি কতদূর সরে এসেছিলেন, ওপরের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়।

তবে আবুল মনসুর আহমদ নতুন কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধি ছিলেন না। সে-স্বর শোনা গিয়েছিল আবদুল হকের (১৯২০-৯৭) কণ্ঠে :

> পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ-প্রদেশের যাত্রা, কবি-গান, লোকগাথা, লোকগীতি, হস্তশিল্প, নৃত্যকলা, নাট্যমঞ্চ, সাহিত্য এবং এমনি আরও অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রায় একাধিপত্য রয়েছে, যেমন যাত্রায়, সাঁওতালি নৃত্যে, মনিপুরি নৃত্যে। এ-সব ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অবদান যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, এবং ভবিষ্যতেও যে তাদের এইসব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চলবে না এবং তারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।
>
> পূর্ব পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু সংস্কৃতিকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে পারি না এবং এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপরও আমরা জোর করে ইসলামি সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারি না।
>
> ...এই মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু সংস্কৃতি যোগ করে যে সামগ্রিক সংস্কৃতি, তাই পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি এবং তা পাকিস্তানেরও সংস্কৃতি।...
>
> পাকিস্তানি সংস্কৃতিতে "অনৈসলামিক" বস্তুর পরিমাণ কম নয় সংখ্যালঘু সংস্কৃতি এর মধ্যে ধরা হোক বা না হোক। এই "অনৈসলামিক" সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে যদি আমরা বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতিকেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলি, তবে আমাদের সংস্কৃতি অনেক কিছু এমনকি হয়তো অধিকাংশই বাদ দিতে হবে এবং সে দাবি হবে যেমন অযৌক্তিক, তেমন অবাস্তব।...

আমাদের যে-সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তা হবে জাতিভিত্তিক,তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধান হতে পারে, অপ্রধানও হতে পারে। যে সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করলেই খুশি হব, সেটাই হবে তার বিচারের মানদণ্ড।...[৩৬]

আর বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১) উপস্থাপন করলেন নৈয়ায়িক যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :

'আমরা বাঙালি না মুসলমান?' এ প্রশ্ন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মনকে কিছুদিন থেকে আলোড়িত করে এলেও আজ সেটা আবার অল্পসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে নতুন করে দেখা দিয়েছে।

... কেউ যদি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কি বাঙালি, না মৎস্যভোজী, না সঙ্গীতামোদী, না বিশ্বশান্তিকামী?' তাহলে প্রশ্নকারীকে অনেকেই অস্বচ্ছ চিন্তা করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন।... 'আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি?' এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা বলা যেতে পারে।...

কিন্তু বাঙালি বলতে কাদেরকে বোঝায়? এর উত্তর খুবই সহজ। বাংলাদেশের যে-কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে, তারাই বাঙালি।... কিন্তু একথাও আবার অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনেকক্ষেত্রে নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ বোধ করেন। এই দ্বিধা এবং সঙ্কোচের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িকতায়। সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুসলমানেরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত হন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে একথা সত্য ছিল এবং এখনও পূর্ব বাংলার অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে এ-সংশয় এবং প্রশ্ন রীতিমতো জাগ্রত। তাঁদের ধারণা আমরা বাঙালি বলে নিজেদের পরিচয় দিলে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় ইসলামবিরোধিতা করে বসবো। এ-ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেটা অন্যান্য দেশ এবং জাতির ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে।[৩৭]

আরো পরে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) খুব সহজভাবে লিখেছিলেন :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সহস্র বৎসর পুরাতন। এই ভাষায় রচিত সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৩৮]

মুনীর চৌধুরীর এই ঘোষণা প্রকাশ পেয়েছিল দেশব্যাপী এক বিতর্কের পটভূমিকায়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে জানান যে, 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী' বলে বেতার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জন করা হবে। এই তথ্য সংবাদপত্রে মুদ্রিত হলে ঢাকার উনিশজন লেখক শিল্পী-সাহিত্যানুরাগী এক বিবৃতিতে সরকারি সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' আখ্যা দিয়ে বলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্যদান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।' সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি বিবৃতি প্রচারিত হয় এবং তার স্বাক্ষরকারীরা পাকিস্তানি সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথমোক্ত বিবৃতিতে অভিব্যক্ত ধারণার প্রবল প্রতিবাদ করেন।[৩৯] আরো কয়েকটি বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারি ইঙ্গিতে সংবাদপত্রের এই বাদানুবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এই বিষয় নিয়ে পূর্ব বাংলার সর্বত্র একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। জুলাই মাসে ঢাকায় সাংস্কৃতিক কর্মী-সম্মেলনে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা

পরিষদ' নামে এক সংগঠনের পত্তন করা হয়। পরের মাসে প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলায় বিশেষ সমারোহে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। চল্লিশের দশকের গোড়ায় 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার' কথাটা প্রথম শোনা গিয়েছিল। ষাটের দশকের শেষে তার অর্থ গেল একেবারে পালটে। সত্তরের দশকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথেরই একটি গান বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাহনে পরিণত হল। অল্পকাল পর সেই গানটিই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

তিন

চল্লিশের দশকে যখন 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র দাবি প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন সেই সঙ্গে ঘোষিত হয় বাংলা বানান পদ্ধতি ও বর্ণমালার আশু সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্দেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন, তার সর্বশেষ সংস্করণ (১৯৩৬) প্রচারিত হয় এর অল্পকাল আগে। কিন্তু 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'বাদীরা তাতে সন্তুষ্ট হননি। কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিল বাংলা বর্ণের সংখ্যা 'হ্রাস' করে তারপর বানান 'সরল' করে ফেলা। মনে হয়, তাঁরা যাকে 'সংস্কৃতের প্রভাব' বলে নির্ণয় করেছিলেন, তার থেকে মুক্তিলাভের অভিপ্রায় থেকেই তাঁরা এই সংস্কার-প্রস্তাব করেছিলেন।[৪০]

সংস্কারের প্রস্তাব আরও অনেকে করেছিলেন, তবে তাঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সংশোধন করতে চেয়েছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (এবং যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি)। সাক্ষরতা বৃদ্ধির আশায় এক ধরনের লিপিসংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন আবুল হাসনাত (১৯০৫-৮৫)। ভিন্ন লিপিতে বাংলাভাষা লেখার প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল। *আল এসলামের* একজন প্রবন্ধকার ১৯১৫ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করেছিলেন।[৪১] তিরিশের দশকে বাংলা লিপির পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা গ্রহণের প্রস্তাব সোৎসাহে সায় দিয়েছিলেন *সাওগাত ও বুলবুল* পত্রিকা।[৪২]

আরবি হরফের সমর্থনে প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, যেহেতু কুরআন শরিফ মুসলমান-মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য, সুতরাং আরবি হরফ তাকে শিখতেই হবে; আর আরবি হরফে যদি বাংলাভাষা লিখিত হয়, তবে একবারের বর্ণপরিচয়েই তার পক্ষে দুটি ভাষা পাঠযোগ্য হবে। আরবি-ফারসি হরফে বাংলা লেখার কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ঘটেছিল আঠারো শতকে—প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলে। বিংশ শতাব্দীতে এই ধারার উত্তরসাধক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন মৌলানা জুলফিকার আলী : চট্টগ্রাম থেকে *হরুফুল কুরআন* নামে আরবি হরফে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন।

কিন্তু অন্য হরফে বাংলা লেখার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা শুধু আরবি-ফরাসির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আগেই ওড়িয়া, দেবনাগরি, মৈথিলি ও সিলেটি নাগরিতেও বাংলা লেখার প্রয়াস হয়েছিল। সিলেটি নাগরি তো বেশ জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া, মিশনারিদের লেখা বাংলা গদ্যের বই লিসবন থেকে রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল আঠারো শতকে। কিন্তু বাংলা লিপির নিজস্ব ধারা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

বিশ ও তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের সকল ভাষার জন্য একটি লিপি গ্রহণ করা যায় কি-না, এ নিয়ে ভাবনা দেখা দেয়। অনেকে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব লিপি রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; অনেকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে রোমান ও দেবনাগরির কথা বলেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) ছিলেন রোমান বর্ণমালার সমর্থক, বিকল্পে দেবনাগরি ব্যবহারের পক্ষপাতী (শেষোক্ত ধারণা অবশ্য পরে তিনি পরিহার করেছিলেন)। এই বিতর্কের কালেই

সওগাত ও *বুলবুল* রোমান হরফের সমর্থন করেন। এ-সমর্থন যে শুধু দেবনাগরির বিরোধিতা করার জন্য ছিল না, তা বোঝা যায় *বুলবুলে* মন্তব্য থেকে।

শুধু ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের (১৯০৬-৮২) কণ্ঠে ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছিল। 'গায়ের জোরে কোনো সংস্কার' সাধনের বিপত্তি সম্পর্কে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ১৯৪৪ সালে।

পাকিস্তান-আন্দোলনের কালে এই আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিকেরা বাংলা বর্ণমালার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ কামনা করেননি। কিন্তু পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পরে সরকারি উদ্‌যোগ সেই পথ নিল। এর প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রদত্ত হবীবুল্লাহ্ বাহারের বক্তৃতায়। বাংলা-লিপি-সংস্কারের পক্ষে মত-প্রকাশ করে তিনি সম্ভাব্য তিনটি উপায়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন : বাংলা বর্ণমালার সংস্কারসাধন, আরবি হরফের প্রবর্তন অথবা রোমান লিপি গ্রহণ।[৪৪] এই ১৯৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় ফেরদাউস খানের (জ. ১৯১২), পুস্তিকা, A Comparative Study of Three Scripts : এতে বাংলা বর্ণমালার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের কিছু সমর্থকও তিনি পেলেন সঙ্গে সঙ্গে : যুক্তি হিসেবে তাঁরা সকলেই দিয়েছিলেন ধর্মের দোহাই। কিছুকাল পরে আরবি হরফের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় মোস্তাফা যে-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, তার থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই :

> Not only Bengali literature, even the Bengali Alphabet is full of idolatry. Each Bengali letter is associated with this or that god or goddess of Hindu pantheon...
>
> In my opinion Pakistan and Devanagari script cannot co-exist. It looks like defending the fronti[e]r or Pakistan with Bharati soldiers!
>
> ...To ensure a bright and great future for the Bengali language it must be linked up with the Holy Quran which is a great power-house of energy and inspiration. Hence the necessity and importance of Arabic script.
>
> ...Islam is the best of all religions, the Quran is the best of all revealed Books : similarly the Arabic language and the script must be the best language and the best script of the world.[৪৫]

আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবে প্রবল বিরোধিতা করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। সরকারি প্রশ্নমালার জবাবে এবং পৃথকভাবে প্রবন্ধ লিখে তিনি বলেন যে, আরবি হরফ প্রবর্তনের ফলে জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলাভাষার জন্যে তা হবে অনেক পেছনে চলে-যাওয়া।[৪৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পক্ষ থেকে সরকারি উদ্‌যোগের প্রতিবাদ করা হয়। এমনকি, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ববঙ্গ ভাষাসংস্কার-কমিটিও এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[৪৭] ভাষাসংস্কার-কমিটি রিপোর্ট ১৯৫০ সালে সরকারের কাছে পেশ করা হলেও ১৯৫৮ সালের আগে তা প্রকাশিত হয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে বাংলায় আরবি হরফ প্রচলনের জন্যে সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

আরবি ও রোমান হরফ প্রত্যাখ্যান করলেও ভাষা-সংস্কার-কমিটি বাংলা বর্ণমালা ও বানানপদ্ধতি সংস্কারের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তবে তাঁদের রিপোর্ট যতদিনে প্রকাশিত হয়, ততদিনে সামরিক সরকার দেশের ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের ইচ্ছে হল, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষার জন্যে রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করা। এবারে দোহাই দেওয়া হল জাতীয় ঐক্যের। এই মতের কিছু সমর্থকও দেখা দিলেন, তবে দুই ভাষার অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক একযোগে সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।[৪৮] বিষয়টি নিয়ে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজও বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিছুকাল পরে সেই প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়। সামরিক সরকারের আরেকটি সঙ্কল্প ছিল, বাংলা ও উর্দু মিশিয়ে দেশের জন্যে একটি সাধারণ ভাষার বিকাশ ঘটানো। রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস ব্যর্থ হলে সে-প্রচেষ্টাও স্থগিত রাখা হয়।

তবে পণ্ডিতদের অনেকেই বাংলা লিপি-সংস্কারের প্রস্তাব কখনো না কখনো উত্থাপন করতে থাকলেন—সরকারের কাছে নয়, গবেষণামূলক পত্রিকায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে। এ-সম্পর্কে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ফেরদাউস খানের প্রবন্ধ এবং ১৯৬২-৬৩-তে প্রকাশিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-৬৯) ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর রচনা উল্লেখযোগ্য।[৪৯] বাংলা একাডেমি কর্তৃক গঠিত একটি উপসংঘ বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারের সুপারিশ করেন ১৯৬৩ সালে।[৫০] এই সুপারিশ কার্যকর করার কোনো চেষ্টা হয়নি এবং এই নিয়ে কোনো বিরোধও দেখা দেয়নি। শুধু রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৩৪) একটি প্রবন্ধ লিখে উপসংঘের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।[৫১]

১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা আকস্মিকভাবেই বাংলা বর্ণমালা, বানানপদ্ধতি ও ব্যাকরণের সংস্কার ও সরলীকরণের উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন। এবারে দেওয়া হল বৈজ্ঞানিকতার দোহাই। কিন্তু হরফের প্রসঙ্গটি ততদিনে একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট যখন ১৯৬৮ সালে দাখিল করা হল তখন দেখা গেল যে, কমিটির তিনজন বিশিষ্ট সদস্য—মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী—লিপি ও বানান-সংস্কার-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।[৫২] যাঁরা কোনো না কোনো সময়ে লিপি-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে—মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ছাড়াও—অনেকেই এখন প্রকাশ্যে সংস্কার প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিলেন। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো আন্দোলন দেখা দিল। সেই আবেগমুখর সময়ে শামসুর রাহমান (জ. ১৯২৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮২) এবং আরও কোনো কোনো কবি বাংলা বর্ণমালার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করে যেসব কবিতা রচনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। অল্পকাল পরে শিল্পী কামরুল হাসান-উদ্ভাবিত বর্ণতরু শোভা পেতে লাগল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিংবা জনপথের সংযোগস্থলে। ১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারি-উপলক্ষ্যে নতুন অভিজ্ঞান সংযুক্ত হল নাগরিকদের পোশাকে। তাতে বড় করে ছাপা একটি বাংলা বর্ণ, আর তার উপরে-নিচে লেখা : 'একটি বাংলা অক্ষর—একটি বাঙালির জীবন।'

চার

আধুনিক যুগে—অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে সাহিত্যের যে-শিষ্ট ভাষা গড়ে উঠেছিল বাংলায়, মুসলমান লেখকেরা সাধারণভাবে তা অনুসরণ করেছিলেন। ফলে, প্রাত্যহিক জীবনে তাঁরা যেসব আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করতেন, সৃষ্টিধর্মী রচনায় তা অকুণ্ঠিতভাবে ব্যবহার করতে তাঁরা সাহস করেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় অচিরেই দেখা দিয়েছিল এই দ্বিধা অতিক্রম করার চেষ্টা ও দাবি। তবে বাংলা সাহিত্যে সুচারুভাবে আরবি-ফারসি শব্দের প্রথম বহুল ব্যবহার দেখা দেয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) রচনায়। অল্পকালের মধ্যে এক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম করে যান নজরুল ইসলাম। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে মুসলমান লেখকেরা প্রায়ই এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন এবং জানাতেন যে, রচনারীতির স্বাভাবিকতা ও মুসলিম সত্তার পরিচয়দানের জন্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করা অপরিহার্য। তবে কীভাবে ও কতদূর পর্যন্ত এসব শব্দের প্রয়োগ শোভন হবে, এ-নিয়ে মতৈক্য ছিল না। ১৯১৮ সালে

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) আরবি-ফারসি শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন; ১৯২৯ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নজরুলের *'মোহররম'* কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তার ভাষাকে 'আরবি-ফারসি-উর্দু-বাংলার এক অপূর্ব খিচুড়ি' বলে অভিহিত করেছিলেন।[৫৪] তবে শহীদুল্লাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন ১৯১৮ সালে :

> খোদা, পয়গম্বর, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, নমাজ, রোজা প্রভৃতি পারসি শব্দ যদি ব্যবহার করিতে আপত্তি না থাকে তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি তো হিন্দি বা রাজপুতানি। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন?

এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তাঁর মতে, মুসলিম-বিজয়ের ফলে পারস্য শুধু আরবের ধর্ম নেয়নি, তার ভাষা ও বর্ণমালাও নিয়েছিল। 'এ-অবস্থায় পারস্যের মুসলমান যাহা করিয়াছিল, বাঙ্গালার মুসলমানের পক্ষে তাহা করিতে পারা সম্ভব নহে।' তবে তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে, 'বিশেষ আবশ্যক না হইলে অপ্রচলিত নূতন আরবি-পারসি শব্দের আমদানি করা বা জেদ করিয়া বাঙ্গলার মধ্যে কতকগুলি কঠিন আরবি-পারসি চালাইয়া দিবার চেষ্টার কোনো মূল্য নাই।'[৫৫]

১৯৪৭ সালের পর স্বাভাবিকভাবেই আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার অবারিত হয়েছিল। মুসলমান-পরিবারের নিত্যব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের পাশাপাশি দেখা দেয় প্রচলিত বাংলা শব্দের দলে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি ব্যবহারের প্রয়াস। কোনো কোনো দৈনিক পত্রিকা এবং বেতার এক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছিল, তবে এর চরম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল মীজানুর রহমানের (১৯০০-?) *জিন্দা মুসলমান,* (ঢাকা, ১৯৪৯) এবং মুফাখখারুল ইসলামের (জ. ১৯২১) *হে পাক ফৌজ* (করটিয়া, ১৯৪৯) কাব্য। প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেও যিনি পাঠকের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে পারতেন, তিনি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪)। অনেকদিন ধরে এই কবিভাষাই তাঁর আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক বাহন হয়েছিল। তালিম হোসেনও (১৯১৮-৯৯) একই ভাষারীতির চর্চা করেছিলেন, যদিও তাঁর সাফল্য ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। তবে আর যাঁরা উৎসাহের সঙ্গে এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেককেই অচিরে পাঠকেরা প্রত্যাখান করেছিলেন : কেননা তাঁদের রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের ভিড়ে বাংলা শব্দ হারিয়ে গিয়েছিল।

পূর্ববঙ্গ ভাষাসংস্কার কমিটিও সরাসরিভাবে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার করেননি। তাঁরা বাংলাভাষার সংস্কৃতীকরণের বিরুদ্ধে এবং সহজ শব্দপ্রয়োগ ও সরল বাক্যগঠনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। যেসব শব্দ ও বাগ্‌বিধি পূর্ব বাংলায়—বিশেষত 'পুথিসাহিত্যে' অর্থাৎ দোভাষী পুথিতে প্রচলিত, তার অধিকতর ব্যবহার তাঁরা কাম্য বিবেচনা করেছিলেন এবং মুসলমান লেখকদের ইসলামি ভাবাদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ শব্দব্যবহারে নিষ্ঠাবান হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই আদর্শ ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তাঁদের ভাষা বিষয়ক সাব-কমিটির সুপারিশে। 'আমায় দুটো ভাত দাও'—এই অনুজ্ঞা তাঁরা অনুমোদন করেননি প্রথমোক্ত নিয়ম ভঙ্গ হয় বলে : দুটোর জায়গায় তাঁরা 'চারটা'র ফরমায়েশ করেছিলেন। দ্বিতীয় নিয়মের অনুবর্তিতার ফলে 'আমি তোমায় জন্ম-জন্মান্তরে ভুলিব না'—এমন প্রতিশ্রুতিদানকে অবিবেচনাপ্রসূত বলে স্থির করেছিলেন সাব কমিটি; তার বদলে অনুমতি দিয়েছিলেন 'আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না'—এই ঘোষণা করার।[৫৬]

এসব বিধান যাঁরা মানতে উৎসাহী ছিলেন, শুধু তাঁরাই তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন সংবাদপত্রে কী বেতারে। স্কুল পাঠ্যবইতে এই আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল সাধারণভাবে : প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সুপরিচিত রচনায়ও এই নিয়মানুযায়ী কলম চালানো হয়েছিল।

আরবি-ফারসি শব্দের কবিতায় লক্ষযোগ্য হয়েছিল, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তার প্রসার ঘটেনি। ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে তার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রচুর আরবি-ফারসি প্রয়োগের একটা ধারাবাহিকতা ছিল। কিন্তু এই ধারা পাকিস্তান আমলে তেমন পুষ্টিলাভ করেনি। ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস হিসেবে শওকত ওসমানের (১৯১৯-৯৮) *ক্রীতদাসের হাসি* (ঢাকা, ১৯৬২) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। খলিফা হারুন-অর্-রশীদের বাগদাদের পটভূমিকায় এই কাল্পনিক উপাখ্যানে আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক সংযোজন বাস্তবতার বিভ্রম ঘটাতে ও ব্যঙ্গের আঘাত হানতে সাহায্য করেছে।

ভাষাপ্রয়োগে সাধারণ প্রবণতা দেখা গিয়েছিল আদর্শ চলতি ভাষার দিকে। তবে ভাষাগত পরীক্ষা যেখানে বিশেষভাবে সফল হয়েছিল, তা হল আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তিরিশের দশকে কবিতায় জসীমউদ্দীনই দেখিয়েছিলেন এই পথ। তাঁকে অনুসরণ করে 'পল্লীকবিতা' লিখতে অগ্রসর হয়েছিলেন অনেকে। তবে তুলনামূলকভাবে আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬) ও ওমর আলীর (জ. ১৯৩৯) মতো আধুনিক কবিরাই আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতির প্রয়োগে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কথাসাহিত্যে ভাষার ব্যবহার ঘটেছিল বেশি—যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত সংলাপের ক্ষেত্রে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র (১৯২২-৭১) *লালসালুতে* (১৯৪৮) নোয়াখালির, শামসুদ্দীন আবুল কালামের (১৯২৬-৯৭) *কাশবনের কন্যায়* (ঢাকা, ১৯৫৫) বরিশালের, আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলীতে* (ঢাকা, ১৯৬৮) চট্টগ্রামের এবং আবুল মনসুর আহমেদের আবেহায়াতে ময়মনসিংহের উপভাষার প্রয়োগ এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। অবশ্য এঁদের মধ্যেও কেউ কেউ উপভাষাকে খানিকটা পরিমার্জিত করে নিয়েছিলেন। সরদার জয়েনউদ্দিনের (১৯২৩-৮৬) *পান্নামোতি* (১৯৬৪) উপন্যাসে আদর্শ চলতি ভাষার সঙ্গে পাবনার উপভাষার মিশেল আছে; হাসান আজিজুল হকের (ড. ১৯৩৮) গল্পেও আছে যশোর-খুলনার আঞ্চলিক ভাষার একটা রূপ। কোনো আঞ্চলিক আনুগত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি (আবুল মনসুর আহমদ হয়তো ব্যতিক্রম), বরঞ্চ পরিচালিত হয়েছিলেন বাস্তবতার অনুরোধে—আর তাতেই বিশেষভাবে যে-ভাষা পূর্ববঙ্গীয়, তা রূপায়িত হয়েছিল সাহিত্যে।

পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলোকে একটা সাধারণ ও শিষ্ট রূপদান করে তাকে সাহিত্যের আদর্শ ভাষায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বাংলা সাহিত্যে যে-ভাষা আদর্শ বলে স্বীকৃত তার বিকাশ কলকাতা-কেন্দ্রিক হওয়ায় এবং তার গঠনে পশ্চিম বাংলার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় সে-ভাষাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত আদর্শ ভাষার নমুনা পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় এবং শেষদিকে লেখা প্রবন্ধাবলিতে। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি আরবি-ফরাসি-ইংরেজি ভাষা এবং ময়মনসিংহের উপভাষা থেকে অবাধ শব্দচয়ন করেছেন। ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ও আবুল কাসেম (১৯২০-৯১) এ-বিষয়ে তাঁর মতানুসারী : তাঁদের রচনায় আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ ও বাগ্‌বিধির যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। তবে ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ ও বাগ্‌বিধির যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। তবে ভাষার এই ভঙ্গি তাঁদের নিজস্ব রীতি বলেই পরিগণিত হয়েছে, সাহিত্যের সাধারণ ভাষার রূপলাভে সমর্থ হয়নি।

ষাটের দশকের তরুণ লেখকেরা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটি বিবেচনা করতেই সম্মত ছিলেন না। নগরবাসী বুদ্ধিজীবীরূপে নিজেদের যে-ভাবমূর্তি তাঁরা গঠন করেছিলেন, তাতে উপভাষা তো দূরের কথা, কথোপকথনের সরল ভাষা আমলে আনাও তাঁরা সংগতিপূর্ণ মনে করেননি। এঁদের অগ্রগণ্য আবদুল মান্নান সৈয়দ (জ. ১৯৪৩) জটিল ভঙ্গিতে প্রবল সংস্কৃতানুসারী ভাষা ব্যবহার করেন। বাঙালি প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬১) ছাড়া বোধহয় তাঁর রচনা পড়তেই অভিধানের সাহায্য নিতে হয় সবচেয়ে বেশি। মান্নান সৈয়দের ভাষা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক এবং লেখকের স্বকীয়তার প্রকাশক। এ-ভাষা সকলের ব্যবহারযোগ্য হোক, তা তাঁর কাম্যও নয়। তবে এইভাবে নতুন লেখকেরা আমাদেরকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত নিয়ে গেছেন : আরবি-ফারসির বাহুল্য থেকে সংস্কৃতের বহুলতায়।

পাঁচ

মুসলমানের জীবচিত্র-অঙ্কনের যে-অঙ্গীকার একদা লেখকেরা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি।

সত্যেন সেনের (১৯০৭-৮১) *'পদচিহ্ন'* (ঢাকা ১৯৬৮) উপন্যাসের এক শহুরে মুসলমান যুবক কৌতূহলপরবশ হয়ে গ্রামে গিয়েছিল হিন্দুদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে। পূর্ব বাংলার মুসলমান লেখকেরা এ-চরিত্র থেকে খুব ভিন্নলোকের নন। এইসব লেখকের রচনায় কদাচিৎ স্থান পেয়েছে ইউরোপীয় খ্রিস্টান কি এদেশীয় হিন্দু, উপজাতীয় বা বেদে-চরিত্র, তাঁদের মুখ্য অবলম্বন হয়েছে মুসলমান পাত্র-পাত্রী। মুসলমানের জীবনকেই তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাই সে-জীবনের বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে তাঁদের রচনায়।

তবে কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লেখকেরা যখন মুসলমানের ধর্মীয় পার্বণের সামাজিক উৎসবের পরিচয় দেন, যখন পীর-মুরিদের বিশেষ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন, যখন রাগের মাথায় তালাক-দেওয়া স্ত্রীকে আবার বিয়ে করার সমস্যা তুলে ধরেন, মারী-মন্বন্তরের সময়ে কাফনের অভাবের কথা যখন বলেন, তখন তাঁরা জীবনযাত্রার এমন একটা দিকের পরিচয় দেন, ধর্মীয় বিশিষ্টতার ছাপ যেখানে স্পষ্ট। বন্যার করাল তরঙ্গ, ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল আঘাত বা জলোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব যখন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তখন মুসলমান-অমুসলমানকে পৃথক করে নেওয়া খুব কঠিন হয়। তেমনি যে-মাঝি তার নৌকার সঙ্গে একাত্ম, যে-কৃষাণ তার জমির সঙ্গে বাঁধা, জঠর-যন্ত্রণায় যে-নারী লালসার শিকার, তার ধর্মপরিচয় লেখকের পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক নয়। নিরুদ্ধ যৌনকামনা কী মানসিক বিপর্যয়ের কথা যিনি লেখেন, পাত্র-পাত্রীর নামের মহিমা তাঁর মুখ্য বিবেচ্য নয়।

কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহারে মুসলমানদের ইতিহাস এবং আরব-ইরানের সাহিত্য থেকে উপাদান গ্রহণ করেছিলেন কবিরা। এই সীমাতেই আবদ্ধ না থেকে অনেকে ঋণ করেছিলেন হিন্দু পুরাণ কী ভারতীয় সাহিত্য, গ্রিক-রোমান পুরাণ কী পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেও।

চিত্রকল্পের এই অনৈসলামিকতায় ভাবাদর্শবাদীরা যে ক্ষুণ্ণ হননি, তা নয়। তবে তাঁরা অন্তত এই দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, মুসলমানের ধর্মকথা ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখা হচ্ছে বেশ। শুধু যে ইতিহাস-জীবনী-ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়; সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেও তার প্রকাশ ঘটেছিল। যেমন, আদম-হাওয়ার স্বর্গচ্যুতি নিয়ে মহাকাব্য লেখেন গোলাম মোস্তাফা, হজরত মুহম্মদের জীবন সম্পর্কে কাব্যরচনা করেন রওশন ইজদানী (১৯১৭-৬৭), হাতেম তাইয়ের উপাখ্যানকে নতুন করে কাব্যরূপ দেন ফররুখ আহমদ। মুসলমানদের স্পেন বিজয় সম্পর্কে নাটক লেখেন

ইব্রাহিম খলীল (জ. ১৯১৭), আসকার ইবনে শাইখ (জ. ১৯২৫) লেখেন সিপাহি বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকা-বিষয়ে। ফকীর বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাস লেখেন চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২-৭৭) ফারায়েজি আন্দোলন নিয়ে বাবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-৮৯)।

মুসলমানদের ইতিহাসের পটে নাটক-উপন্যাস রচিত হয়েছিল অনেক, তবে গৌরবগান সকল রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন, শওকত ওসমানের উপন্যাসে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিবরণ আছে তাঁর বর্ণিত কাহিনির পটভূমিকে স্পষ্টতাদানের জন্যে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে নাটকের বিষয়রূপে নির্বাচন করে মুনীর চৌধুরী প্রধানত যুদ্ধের তাণ্ডব এবং নরনারীর অন্তরের ক্ষতবিক্ষত রূপকে প্রকটিত করেন। পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞানসাধকের সংগ্রামের কথাই সত্যেন সেনের *আলবেরুনী* (ঢাকা, ১৯৬৯) উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।

এই ধারাদ্বৈতের পরিচয় অন্যত্রও সুস্পষ্ট। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, সাহিত্যকর্মে তার স্বাক্ষর আছে। গোলাম মোস্তাফা পদ্য লিখে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানে কিছুরই অভাব নেই। আজমের জীবনকাহিনির যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩), তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণে নাম-চরিত্রের অন্তিম মুহূর্তের বিবরণ-সংবলিত একটি নতুন দৃশ্য সংযোজিত হয়। পাকিস্তান-আন্দোলন ও সিলেটের গণভোট নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছিল, পাকিস্তানের উভয় অংশের সংহতি কামনা করে লেখা হয়েছিল উপন্যাস ও নাটক। উপন্যাসে এই সংহতি দেখা দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানি তরুণ ও পশ্চিম পাকিস্তানি তরুণীর পরিণয়-বন্ধনের মাধ্যমে। আর নাটকে পর্দা-উন্মোচনের আগেই এই গুরুতর ব্যাপারটি সমাধা হয়ে গিয়েছিল : নাট্যাংশে তাই সংহতি ঘটলো বাংলা-উর্দু দ্বিভাষিক সংলাপের সাহায্যে।[৫৭]

পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তৎকালীন বাংলাদেশের জটিল পরিস্থিতির নিপুণ উপস্থাপন এবং হিন্দু-মুসলমানের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের প্রক্রিয়ায় গভীরতর উপলব্ধির পরিচয় আছে অন্য কয়েকটি উপন্যাসে। যেমন, শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-৭১) সংশপ্তক (ঢাকা, ১৯৬৫), রশীদ করিমের (জ. ১৯২৫) *উত্তমপুরুষ* (ঢাকা, ১৯৬১), সরদার জয়েনউদ্দীনের *অনেক সূর্যের আশা* (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭) এবং আবু রুশদের (জ. ১৯১৯) *নোঙর* (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭)। শেষোক্ত উপন্যাসে পাকিস্তানের উষালগ্নের উদ্দীপনা ও পরবর্তী ব্যর্থতাবোধের উল্লেখযোগ্য চিত্র আছে, প্রসঙ্গক্রমে আছে দেশের রাষ্ট্রভাষা-বিতর্কের কথা।

দেশ-বিভাগের ফলে রাজনৈতিক সীমানার উভয়দিকে বাস্তুত্যাগীদের শোচনীয় অবস্থার পরিচয় আছে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র একটি অসাধারণ গল্পে, আছে আরও কোনো কোনো রচনায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়ে আছে আবুল ফজলের জনপ্রিয় উপন্যাস, মুনীর চৌধুরীর সার্থক একাঙ্কিকা, হাসান হাফিজুর রহমানের মর্মবিদারী গল্প। আমলাদের দুর্নীতি ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণা নিয়ে নাটক লিখেছেন শওকত ওসমান। নতুন রাষ্ট্র সম্পর্কে আশার উজ্জীবন এবং পরে আশাভঙ্গের বেদনার রূপ সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

সৃষ্টিধর্মী লেখকদেরকে অনেক বেশি করে নাড়া দিয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকা, জহির রায়হানের (১৯৩৪-৭২) উপন্যাস, আবদুল গাফফার চৌধুরীর (জ. ১৯৩৪) গান এবং একাধিক কবির ভালো কবিতা সেই উপলব্ধির ফসল। সেই থেকে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বিক্ষোভ রূপায়িত হয়েছে সাহিত্যে—মুখ্যত কবিতায়। মানসিকতার অলক্ষ্য পরিবর্তনের একটি সূত্র পাওয়া যায় সেইসব অরাজনৈতিক কবিতায়ও, যেখানে পূর্ব বাংলার নিসর্গ আর কবির স্বদেশ এক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিষয়টির পরিণত

রূপ লক্ষ করা যায় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের কাল থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত; তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাণীর প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল কবিতা। একটি জাতির অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতাস্পৃহার সঙ্গে কবিতার এই একাত্মতার কথা শোনা যায় মুক্তিসংগ্রামের কালে রচিত শামসুর রাহমানের একটি কবিতায়[২৮] :

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্ত জোড়া মত্ত ঝাপটাট
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক।
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।

স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙীন কোর্তা
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. *"এবনে মাআজ"*, "মিহির ও সুধাকরের রুচিবিকার", *ইসলাম-প্রচারক*, তৃতীয় বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা (মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০)।

২. মোহাম্মদ রুহোল আমিন, "ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার", *ইসলাম দর্শন*, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩২৭); মোহাম্মদ কে. চাঁদ, "গীতিবাদ্য শ্রবণ করা বিধিসঙ্গত কি নিষিদ্ধ", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (মাঘ ১৩২৭); কাজী আবদুল ওদুদ, "বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা", *শিখা*, প্রথম বর্ষ, (১৩৩৩)।

৩. কাজী আবদুল ওদুদ, উপরিউক্ত প্রবন্ধ।

৪. আবদুস সালাম খাঁ, *"নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ"*, *শিখা*, প্রথম বর্ষ (১৩৩৩)।

৫. গোলাম মোস্তাফা, "লীগ-বিজয়", *বুলবুলিস্তান* (ঢাকা : মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৪৯), পৃ. ২০২-৬ :

"নয় রে নয় এ লীগ-বিজয়—
আজকে মোদের দিগ্‌-বিজয়...
সতর জন সৈন্য নিয়ে বীর-কেশরী বখ্‌তিয়ার

করল ফতে বাংলা—তাতে কীর্ত্তি এমন কীই বা আর?
আজকে দেখ এগারো জন বীর বাচ্চা মুসলমান,
মুক্ত মাঠে যুদ্ধ করে জয় করিল বিশ্বখান!..."

তুলনীয় [সম্পাদক], *"ইতিহাস-স্রষ্টা"*, *বুলবুল*, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৪৩) : 'ইংলন্ডে ওয়াটারলু জয় হইয়াছিল ইটনের খেলার মাঠে—আশা হয়, মোসলেম ভারতের ওয়াটারলু জয়ের সূত্রপাত হইবে মোহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলার ময়দানে।'

৬. আবদুল মজিদ, "বাঙলার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য", *সওগাত*, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৩৩)।

৭. গোলাম মোস্তাফা, "আনোয়ারা", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২৬)।

৮. "গ্রন্থ-সমালোচনা", *নবনূর* তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩১২)।

৯. এম, আজিজার রহমান, "ইসলাম ও নজরুল কাব্য সাহিত্য", *মোহাম্মদী*, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ ১৩৩৫)। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য "মিঠেকড়া", *ইসলাম-দর্শন*, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক ১৩২৯); মোহাম্মদ রোয়াজুদ্দিন আহমদ, "লোকটা মুসলমান না শয়তান?" ঐ।

১০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, "[১৯৪৩ সালে... পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে] সভাপতির অভিভাষণ", সারদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮) পৃ. ১২১; 'কাজেই মেঘনাদ বধে'র অনুকৃতি কাসেম-বধ গীতাঞ্জলী'র অনুকৃতি 'প্রেমাঞ্জলী', 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুসরণে রচিত 'রায়-নন্দিনী' প্রভৃতি কাব্য-উপন্যাস মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হল বটে, কিন্তু, মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হল না।... আগেকার মুসলিম সাহিত্যিকগণও তেমনি বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র মিত্র, বা বিষ্ণু দে-সুধীন দত্তের অনুসরণ করেছেন। কথাসাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের স্বকীয়তা ফোটাবার যথেষ্ট সুস্পষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু সেখানেও আমরা পরানুকারিতার গড্ডলিকাই দেখতে পাই।' প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য একই লেখকের "কাব্যসাহিত্যে বাঙালি মুসলমান", *সওগাত*, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় থেকে সপ্তম সংখ্যা ভাদ্র-পৌষ ১৩৩৩)। শেষোক্ত সংখ্যায় তিনি অভিযোগ করেছেন : "এই বাঙ্গলাদেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধহয় কাব্যকে ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই।"

১১. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (মাঘ ১৩২৫) এবং সেই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট সম্পাদকের টীকা।

১২. ঐ; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙ্গালা ভাষা ও মোছলমান সাহিত্য", *আল-এসলাম* চতুর্থ বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫)।

১৩. "আলোচনা", *মোহাম্মদী*, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (মাঘ ১৩৩৫)।

১৪. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, "সভাপতির অভিভাষণ", সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), *পাকিস্তান-আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৫. আবুল মনসুর আহমদ, *পাক বাংলার কালচার* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬), পৃ. ১৫৬-৫৭; ১৬১-৬৯, ১৭৬-৭৭।

১৬. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* (দ্বিতীয় সংস্করণ; ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০), পৃ. ২৪০-৪১।

১৭. স্মারকলিপির মূল পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন* ও *তৎকালীন রাজনীতি* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০), পৃ. ১১৪-১৫।

১৮. যেমন ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭ তারিখের *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য। দ্র অ, পৃ. ৩৪।

১৯. সৈয়দ আলী আহসান, "পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা", *মাহে নও* তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা (আগস্ট ১৯৫১)। পরবর্তীকালে তিনি এই মত বর্জন করেছিলেন : তাঁর *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (ঢাকা : লালন প্রকাশনী, ১৩৮১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কবিতা এবং *রবীন্দ্রনাথ : কাব্যবিচারের ভূমিকা* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৫) এ-প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

২০. Yusuf Jamal Begum, Poems from East Bengal (Karachi : PEN, 1954), pp. 13-15.

২১. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, *বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস* (ঢাকা ১৯৫০)। পৃ. ৪৪।

২২. গোলাম মোস্তাফা, "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা,* পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩২৯)।

২৩. মহ্ফুজা খাতুন (সম্পাদিত), *গোলাম মোস্তফা : প্রবন্ধ-সঙ্কলন* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৫), পৃ. ১৯১-২১৫, ২৩৪-৬১।

২৪. ঐ, পৃ. ১৫৪-৬৪।

২৫. ঐ, পৃ. ১১৩-১৬।

২৬. আবদুর রহমান খাঁ, 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন/অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' (ঢাকা, ১৯৫৪)।

২৮. ঐ, পৃ. ১৭৮।

২৯. ঐ, পৃ. ১৭৯-৮০-তে উদ্ধৃত। মুহম্মদ সফিয়াল্লাহ্ (সম্পাদিত), *শহীদুল্লাহ্-সংবর্ধনা গ্রন্থে* (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ১৯৬৭) প্রদত্ত এই অভিভাষণের পাঠে মূলের কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে বলে মনে হয়। যাহি হোক, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র এই বক্তব্য ১৩৩৬-এ নেত্রকোণার মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীতে দেওয়া অভিভাষণের ঠিক বিপরীত। সেখানে তিনি বলেছিলেন : "আমরা বাঙ্গালি যেমন সত্য, তার থেকে বেশি সত্য আমরা মুসলমান"—আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্* (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৮), পৃ. ৭৯-তে উদ্ধৃত।

৩০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন...,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০-৮৪।

৩১. আবদুর রহমান, "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ", *মোহাম্মদী,* উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৬৫)। কল্যাণীয় সঈদ-উর-রহমান এই ভাষণটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩২. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, "সংস্কৃতি সঙ্কট", *সওগাত,* পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০)।

৩৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন...,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫-তে উদ্ধৃত।

৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, *পাক বাংলার কালচার,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

৩৫. ঐ, পৃ. ৮৬।

৩৬. আবদুল হক, *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ. ১৭৪-৭৯।

৩৭. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সঙ্কট* (ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৬৭), পৃ. ৩-৬।

৩৮. মুনীর চৌধুরী, "রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর", আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা : স্টুডেন্টওয়েজ, ১৩৭৫), পৃ. ৩২৩।

৩৯. তিনটি বিবৃতির মূল পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য : আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম* (ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২), পৃ. ১৮-২১। প্রথম বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সারও ছিলেন, কোনো কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণীতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি এবং সেই কারণে এই গ্রন্থেও তাঁর নাম অনুল্লিখিত।

৪০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদের পূর্বকথিত অভিভাষণ দ্রষ্টব্য। সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫-২৬ ও ১৫২।

৪১. "খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী", "বাঙ্গালির মাতৃভাষা", *আল-এসলাম,* প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩২২)।

৪২. "কালস্রোতা", *বুলবুল,* পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫)।

৪৩. মুহম্মদ এনামুল হক, *বাংলা-ভাষার সংস্কার* ['এই প্রবন্ধ বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত হয় নাই'; ১৯৪৪]।

৪৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন...,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-এ উদ্ধৃত।

৪৫. Gholam Mustafa, Arabic & Bengali Scripts (Dacca : Muslim Bengal Library [1950]

৪৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আমাদের সমস্যা* (ঢাকা : রেনেসাঁস পাবলিকেশন্‌স ১৯৪৯) পৃ. ৬৫-৭৩ এবং পরিশিষ্ট iii।

৪৭. Report of the East Bengal Language Reconstruction Committee 1949 (Dacca : Government of East Pakistan, 1958) p II.

৪৮. এই প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই, "রোমান বনাম বাংলা হরফ", এবং মুহম্মদ এনামাল হক, "রোমান অক্ষর সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব", *সমকাল,* দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (চৈত্র ১৩৬৫) দ্রষ্টব্য। একই পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত "সাময়িকী"-তেও এ-বিষয়ে কিছু মতামত উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৯. ফেরদাউস খান, হরফ-সমস্যা, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, "বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার", ঐ, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র ১৩৬৭) এবং *"বাঙলা লিপি ও বানান সংস্কার",* ঐ, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯); মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, "বাঙলা বানান ও লিপি সংস্কার", ঐ, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯) এবং মুহম্মদ আবদুল হাই, *"বাঙলা লিপি ও বানান-সমস্যা", সাহিত্য পত্রিকা,* পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শীত ১৩৬৮) দ্রষ্টব্য।

৫০. উপসংঘের সদস্য ছিলেন : সৈয়দ আলী আহসান (সভাপতি), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাত, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গনি, ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। এঁদের সুপারিশ প্রকাশিত হয় *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০)।

৫১. রফিকুল ইসলাম, "বাঙলা বানান বনাম বাঙলা একাডেমী" *পরিক্রমা,* তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৭০)।

৫২. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরীর ভিন্নমতপোষক টীকার জন্যে দ্রষ্টব্য মুনীর চৌধুরী, *বাঙলা গদ্যরীতি,* (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), পৃ. ১৯৭-২০২। উপরের তিনটি পাদটীকায় বর্ণিত প্রবন্ধ (একটি ছাড়া) ও সুপারিশ এবং এ-বিষয়ে আরও কয়েকটি রচনা এই বইয়ের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

৫৩. সৈয়দ এমদাদ আলী, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা,* প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩২৫); আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, [তৃতীয়] "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ", ঐ, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, (মাঘ ১৩২৫); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ "[মুসলিম সাহিত্য সমাজের ১৩৩৫ সালের বার্ষিক অধিবেশনে] অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ", *শিখা,* তৃতীয় বর্ষ (১৯২৯)। শেষোক্ত প্রবন্ধটি গ্রন্থকারের *আমাদের সমস্যা,* পূর্বোক্ত, গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত; সেখানে নজরুলের কবিতার বদলে দোভাষী পুথির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তবে এই পরিবর্তনের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

৫৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ "[দ্বিতীয়] বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা,* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২৫)।

৫৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন—সভাপতির অভিভাষণ", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা,* প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (মাঘ ১৩২৫)।

৫৬. Report ... 1949, op, cit, pp 102-3

৫৭. পরিণয়-বন্ধনকে যে নানান সমস্যার সমাধান বলে বিবেচনা করেন অনেক লেখক, তার পরিচয় পাই সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্পর্কে লেখা একাধিক উপন্যাসে। আরেকটি উপন্যাসে মুসলমান যুবক ও হিন্দু কন্যার প্রণয় বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু—সময়মতো দাঙ্গা না ঘটায় হয়তো—তাদের মিলন দেখানো যায়নি।

৫৮. শামসুর রহমান, *"স্বাধীনতা তুমি", বন্দী শিবির থেকে* (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭২) পৃ. ৬-৭।

৪.১ লেখক পরিচিত : আনিসুজ্জামান

মননশীল লেখক আনিসুজ্জামানের জন্ম কলকাতায় ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান ভারতবর্ষের ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট অঞ্চলে। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ (সাম্মানিক) ও ১৯৫৭-য় এম.এ ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যে গবেষণাকর্মের জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন তার বিষয়টি হল : 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা'। ১৯৬৪-৬৫-তে আনিসুজ্জামান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো এবং কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলো হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর হিসেবে কর্মজীবন চালনা করেন।

অতঃপর আমরা গবেষক ও সুপ্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামানের রচিত গ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থিত করতে পারি।

গ্রন্থ পরিচয় :

প্রবন্ধ : ১। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ২। স্বরূপের সন্ধানে, ৩। আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, ৪। পুরোনো বাংলা গদ্য ইত্যাদি।

নাটক : ১। আদর্শ স্বামী, ২। পুরোনো পালা ইত্যাদি।

অধ্যাপক এবং মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত আনিসুজ্জামান জীবনে বহু সম্মান পেয়েছেন। যেমন, ১৯৬০-এ দাউদ পুরস্কার, ১৯৭১-এ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে ২১-এর পদক সহ আরও অনেকগুলি পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন।

৪.২ বিষয় সংক্ষেপ

আনিসুজ্জামানের এই প্রবন্ধটি আয়তনে দীর্ঘ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত হল দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তান। অধুনা বাংলাদেশ তখন পরিচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান নামে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব বাংলা প্রদেশ হিসেবে। বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কতটা সে বহন করে এসেছে, এটাই প্রশ্ন। এই বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি মানে শুধু হিন্দুর চর্চা নয়, মুসলমানেরাও অবশ্যই রয়েছেন। যেমন নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) গান রচনা, আব্বাসউদ্দীনের (১৯০১-৫৯) গায়ন, বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৬-৫৩) 'হাফিজের স্বপ্ন' রচনা, জয়নুল আবেদিনের অসামান্য চিত্রাঙ্কন তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে আলোড়ন ফেলেছিল।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সে-যুগের সূচনা হয় উনিশ শতকে, তার স্রষ্টা ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত অমুসলমান সাহিত্যিকরা। বস্তুত তাঁদের রচনার উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদকে মুসলমানেরা অনুমোদন করতে পারেননি। তাঁদের আপত্তি ছিল বিবিধ। যেমন—

১. মুসলমানের নিত্যব্যবহার্য আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানি শব্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষায় স্থান পায়নি।
২. এ সাহিত্যে মারাত্মক, ইতিহাসাশ্রিত যেসব কাব্য-নাটক-উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র স্থান পেয়েছে, সেসব রচনায় মুসলমানের শ্রদ্ধেয় বহু ঐতিহাসিক চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে।

১৮৭০-এর পরে যখন মুসলমান লেখকেরা আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের লক্ষ্যই হয় উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করা। একাজে সফলতাও এসেছিল। তাঁদের সাধনায় বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। যাঁরা 'মুসলমান সম্প্রদায়' নামক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন তাঁরাও প্রধানত মুসলমান সমাজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন মুসলমান পাঠকের উদ্দেশ্যেই। ব্যতিক্রমী শুধু নজরুল, জসীমউদ্দীন এবং চল্লিশের দশকের নবীন লেখকগোষ্ঠী। প্রথমদিকে অনেকেই উর্দুকেই নিজেদের মাতৃভাষা মনে করে গর্বিত হতেন। কিন্তু ক্রমশ সে জায়গায় স্থান পেতে শুরু করেছে বাংলা। এভাবে মুসলমান হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিসেবেও নিজেদের সত্তাকে প্রকাশ করার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তাঁদের। ১৯৪৩-এ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আবুল কালাম সামসুদ্দীন বলেন : "পাকিস্তান শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়,

সাহিত্যক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী নিয়ে এসেছে।" পরের বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মূল সভাপতি আবুল মনসুর আহমেদ পাকিস্তানি জাতীয়তার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বিষয়ে বলেন :

১. রাজনীতিবিদের বিচারে পাকিস্তানের অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ সাংস্কৃতিক স্বরাজ।

২. ধর্ম ও সংস্কৃতি এক নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তমদ্দুন পারে না, বরং সে সীমাকে আশ্রয় করেই সমৃদ্ধ হয়।

৩. বাংলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সেই সাহিত্যের নাম মুসলমানি বাংলা সাহিত্য।

৪. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে-ভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না।

৫. ভাষার কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। "আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, বাঙলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবো না"।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটার পর নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজদ আলী, হুমায়ুন কবীর বা সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব। তাই সেদিন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে একাধিক মতবাদ দেখা গিয়েছিল। একটি মতবাদ বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র মুসলমানদের অবদানকেই স্বীকার করেছিল। তাই এক স্মারকলিপিতে বাংলাভাষার সমৃদ্ধিসাধনে অন্যান্য মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে অনাবাসী নজরুল ও ওয়াজেদ আলীর কথাও স্মরণ করা হয়েছিল, অথচ অমুসলমান বলে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখও করা হয়নি। সৈয়দ আলী এহসানের সম্পাদিত দুখণ্ড গল্প সংগ্রহে (প্রকাশ : ১৯৫২) কোনো অমুসলমান লেখকের গল্প স্থান পায়নি। অথচ এর কিছুকাল আগেও (৬.৪.১৯৪৮) স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের বক্তৃতায় আমরা দেখি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অসংকোচ উল্লেখ। তিনি বলেন : "হিন্দু-মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্য।"

সম্প্রদায়গত পরিচয়ের তত্ত্ব অবশ্য বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই তত্ত্বের প্রভাবে বা অনুপ্রেরণায় উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যতালিকায় শুধুমাত্র মুসলমান লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাতে অবশ্য কিছুটা হলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হয়েছিল। আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ (ঢাকা, ১৯৬২), একাডেমির আধুনিক কাব্যসংগ্রহ (ঢাকা, ১৯৬৩) ইত্যাদি এরই প্রমাণ। কিন্তু এসব গ্রন্থের নামকরণ থেকে ভিতরের প্রকৃতি বোঝা যায়নি। নজরুলকে সেসময় পাকিস্তানের জাতীয় কবি করার আয়োজন চলছিল, ফলে তিনি ক্রমশ পরিণত হচ্ছিলেন রবীন্দ্র প্রতিপক্ষে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির আরো পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে। যেমন, ১৯৫৮-তে চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি মৌলবী আবদুর রহমান স্পষ্টই ঘোষণা করেন : "এখন আমি আর বাঙালি নই, আমি পূর্ব পাকিস্তানি।"

তবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমগ্রতা সম্পর্কে নতুন করে আস্থাজ্ঞাপনের ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। এর পরবর্তীকালে নানা সময়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনগুলি ধর্মনিরপেক্ষতাকেই প্রাধান্য দেয়। তাই ১৯৬৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সপ্তাহে দুর্বোধ্য

চর্যাগীতি দুরূহ আধুনিক কবিতার আবৃত্তি অগণিত শ্রোতা মন দিয়ে শুনেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে যাঁদের পদ্য-গদ্য-গান আবৃত্ত বা গীত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই ছিলেন। ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় (বরিশাল) হলেও যাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ভারতীয় হিসেবে। বদরুদ্দীন উমর নৈয়ায়িক যুক্তিতে বললেন—বাংলাদেশের যে কোনো অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলা ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে, তারাই বাঙালি। আরো পরে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বললেন—"বাংলা ভাষায় রচিত সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ"।

পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে বাংলা বানান পদ্ধতি ও তার সংস্কার। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিছু সমর্থকও পেয়ে যান। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এর প্রবল বিরোধিতা করেন কেননা তাতে বাংলা জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যাবে। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও ব্যাকরণের সংস্কারে উদ্যোগী হন। আরও পরে কবি শামসুর রহমান প্রমুখ অত্যন্ত মমতায় কবিতা রচনা করেন, যা জনপ্রিয় হয় খুব। '৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে নতুন অভিজ্ঞান সংযুক্ত হল নাগরিকদের পোশাকে। তাতে বড় করে ছাপা একটি বাংলা বর্ণ আর তার উপরে-নিচে লেখা—"একটি বাংলা অক্ষর—একটি বাঙালির জীবন।"

গল্প উপন্যাস-নাটকেও মুসলমান জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে বাংলা ভাষায়, তা এমনকি হিন্দু লেখকের কলমেও যেমন, সত্যেন সেনের 'পদচিহ্ন' (১৯৬৮) উপন্যাস। বিচিত্র সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনা বা সমস্যা যেমন দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশভাগ, ধর্মবিরোধ, ভাষা-আন্দোলন—সবই স্থান পেয়েছে উভয় বাংলার লেখকদের রচনায়, বাংলা ভাষায়।

৪.৩ ভাবনা-বিশ্লেষণ

আনিসুজ্জামানের আলোচ্য প্রবন্ধটি আয়তনে দীর্ঘ, বিষয় বাংলা ভাষার স্বরূপের সন্ধান, বাঙালি মুসলমানের ভাষার সন্ধান। অধুনা বাংলাদেশ বা পূর্ব-বাংলা ছিল তখন পাকিস্তান। বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কতটা সে বহন করে এসেছে সেটাই প্রশ্ন। এই বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির চর্চা মানে শুধু হিন্দুর দ্বারা নয়, মুসলমানেরাও তার মধ্যে পড়েন। যেমন কবি নজরুল ইসলাম, গায়ক আব্বাসউদ্দীন, চিত্রকর জয়নুল আবেদীন প্রমুখ। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল বাঙালি মুসলমানের ভাষা কি বাংলাই হবে, হিন্দুর মতো? না কি অন্য কিছু, অন্য কোনো হরফ? একটা সময় পর্যন্ত অবশ্য এঁরা উর্দুকেই নিজেদের মাতৃভাষা বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। কিন্তু ক্রমশ এই দাবিই উচ্চকিত হয়েছে যে, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা হবে বাংলা। তবে এই দুই অবস্থার মধ্যে যে বিরাট আন্দোলন ইত্যাদি চলেছিল সেটিই বলা যায় প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের কাল থেকে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত সংস্কৃতিক্ষেত্রে পাকিস্তানি জাতীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটার

পরে মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলা প্রদেশকেই পাকিস্তানের অংশস্বরূপ দাবি করেছিলেন। কিন্তু কার্যত সে-প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হল। ফলস্বরূপ অনেকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব, নজরুল তো আগে থেকেই কলকাতায় ছিলেন, এছাড়া গেলেন কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজেদ. আলী, হুমায়ুন কবীর বা গোলাম কুদ্দুসের মতো অনেকে। ফলে কী হবে জাতীয় ঐতিহ্য, কী হবে সাহিত্যের ঐতিহ্য—ঠিক করা যাচ্ছিল না। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায় কিন্তু বলেছিলেন (৬.৪.১৯৪৮) : "হিন্দু মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলাসাহিত্য"। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

১. "আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।"

২. "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।"

এরপর ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমগ্রতা সম্পর্কে নতুন করে আস্থার ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তবু ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে সরকার যদ্দুর সম্ভব বাধা দেন; প্রতিবাদও ওঠে বিরোধী পক্ষ থেকে। তাই দুবছর বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে অজস্র শ্রোতা দুর্বোধ্য চর্যাগীতি থেকে শুরু করে দুরূহ আধুনিক কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন গভীর মনোনিবেশে।

চল্লিশের দশকে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী বাংলা বানান পদ্ধতি ও বর্ণমালার আশু সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। ভিন্ন লিপিতে বাংলা ভাষা লেখারও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আগেই ওড়িয়া, কায়থি, দেবনাগরি, মৈথিলি ও সিলেটি নাগরিতে বাংলা লেখার প্রয়াস হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মনেত অনেক সমর্থক পেলেও বিরোধী পক্ষই জয়ী হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, এমনটি ঘটলে জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হবে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলা ভাষার জন্যে তা হবে অনেক পেছনে চলে যাওয়া। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা আকস্মিকভাবেই বাংলা ব্যাকরণ ও বানানপদ্ধতির সংস্কার ও সরলীকরণের উদ্যোগ করেন। কিন্তু দেখা গেল, কমিটির তিনজন বিশিষ্ট সদস্য মুহম্মদ এনামুলক হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনার চৌধুরী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো আন্দোলনই শুরু হল। সেই আবেগমুখর সময়ে কবি শামসুর রহমান প্রমুখ বাংলা বর্ণমালার প্রতি মমতায় যেসব স্পর্শকাতর কবিতা রচনা করেন তা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে নতুন অভিজ্ঞান সংযুক্ত হল নাগরিকদের পোশাকে, সেখানে বড় করে ছাপা একটি বাংলা বর্ণ যার উপরে-নিচে লেখা : 'একটি বাংলা অক্ষর—একটি বাঙালির জীবন'।

কবিতাতেই আরবি-ফারসি শব্দের সু-আমদানি হয়েছিল, অন্য ক্ষেত্রে নয়। বিদ্রূপাত্মক রচনায় তো প্রচুর সুযোগ ছিল, কিন্তু এই ধারা পাকিস্তান আমলে তেমন পুষ্টিলাভ করেনি। তবে ভাষাগত পরীক্ষা বিশেষভাবে সফল হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তিরিশের দশকের কবিতায় জসীমউদ্দীনই দেখিয়েছিলেন এই পথ। আবার কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ঘটেছিল বেশি। যেমন ওয়ালিউল্লাহের 'লালসালু' (১৯৪৮)-তে নোয়াখালির,

শামসুদ্দীন আবুল কালেমের 'কাশবনের কন্যা'য় (১৯৫৫) বরিশালের, আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী'-তে (১৯৬৮) চট্টগ্রামের উপভাষা প্রযুক্ত হয়েছে। আসলে বাংলা সাহিত্যে যে-ভাষা আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত তার বিকাশ কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং গঠনে পশ্চিম বাংলার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় অনেকেই সে-ভাষাকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। ষাটের দশক থেকে তরুণ লেখকেরা আবার আঞ্চলিক ভাষা তো বটেই, সরল কথ্যভাষাকেও বর্জন করতে চাইছিলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য আবদুল মান্নান সৈয়দ। বাঙালি প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ব্যতীত বোধহয় তাঁর রচনা পড়তেই সর্বাধিক অভিধানের সাহায্য নিতে হয়।

গল্প-উপন্যাস-নাটকেও মুসলমান জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে বাংলা ভাষায়, তা এমনকি হিন্দু লেখকদের কলমেও। যেমন সত্যেন সেনের 'পদচিহ্ন' (১৯৬৮) উপন্যাস। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনা বা সমস্যা, যেমন দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ধর্মবিরোধ, ভাষা আন্দোলন—সবই স্থান পেয়েছে উভয় বাংলার লেখকদের রচনায়, বাংলা ভাষায়।

একক ৫ ❑ বিশ্বাসের জগত : হুমায়ুন আজাদ

৫.০ মূল প্রবন্ধ

৫.১ লেখক পরিচিতি

৫.২ বিষয় সংক্ষেপ

৫.৩ ভাবনা বিশ্লেষণ

৫.০ মূল প্রবন্ধ

পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ জন্ম নিয়েই দেখছে তার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুত হয়ে আছে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন বিশ্বাসের জগত। নিজের জন্যে কোনো বিশ্বাস খুঁজে বের করতে হচ্ছে না তাকে, জন্মেই দেখছে পরিবার ও সমাজ, কখনো কখনো রাষ্ট্র, তার জন্যে বিশ্বাস তৈরি করে রেখেছে, মনে করছে ওইটিই শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস, এবং তাঁকেও পোষণ করতে হবে ওই বিশ্বাস। মানুষ জন্ম নিচ্ছে, বেড়ে উঠছে পূর্বপ্রস্তুত বিশ্বাসের মধ্যে, তার জন্যে বিশ্বাসের জামাকাপড় সেলাই করা আছে, তার দায়িত্ব ওই জামাকাপড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে শান্তি পাওয়া। বিশ্বাসী হওয়া প্রশংসিত ব্যাপার; প্রথাগতভাবে ভালো মানুষ সৎ মানুষ মহান মানুষ বলতেই বোঝায় বিশ্বাসী মানুষ। তারা কী বিশ্বাস করছে, তা বিবেচনার বিষয় নয়, বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তারা বিশ্বাস করছে; তাই তারা ভালো, সৎ এমনকি মহৎ। পৃথিবী জুড়ে মানুষ গড়ে তুলেছে বিচিত্র বিশ্বাসের জগত, বিশ্বাস দিয়ে তারা ভাগ করে ফেলেছে বিশ্বকে, তারা কাউকে বিশ্বাসের জগতের বাইরে থাকতে দিতে রাজি নয়। একটা কিছু বিশ্বাস করতে হবে মানুষকে, বিশ্বাস না করা আপত্তিকর। আপনার পাশের লোকটি স্বস্তি বোধ করবে যদি জানতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন, তার বিশ্বাসের সাথে আপনার বিশ্বাস মিলে গেলে তো চমৎকার; আর খুবই অস্বস্তি বোধ করবে, কোনো কোনো সমাজ আপনাকে মারাত্মক বিপদে ফেলবে, যদি সে জানতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস কয়েক হাজার বছর ধরে দেখা দিয়েছে মহামারীরূপে; পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী মহামারীর নাম বিশ্বাস।

বিশ্বাস কাকে বলে? আমরা কি বলি আমি পিঁপড়ে বিশ্বাস করি, সাপে বিশ্বাস করি, জলে বিশ্বাস করি, বা বজ্রপাতে, বা পদ্মানদীতে বিশ্বাস করি? এসব, এবং এমন বহু ব্যাপারে বিশ্বাসের কথা ওঠে না, কেননা এগুলো বাস্তব সত্য বা প্রমাণিত। যা সত্য, যা প্রমাণিত, যা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; কেউ আমরা বলি না যে আমি বিদ্যুতে বিশ্বাস করি, বা রোদে বিশ্বাস করি, বা গাড়িতে বিশ্বাস করি, কেননা সত্য বা প্রমাণিত ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হয় না, বিশ্বাস করতে হয় অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক বিষয়ে। অসত্য, অপ্রমাণিত, কল্পিত ব্যাপারে আস্থা পোষণই হচ্ছে বিশ্বাস। 'বিশ্বাস কর' ক্রিয়াটি নিশ্চয়তা বোঝায় না বোঝায় সন্দেহ; আর এ-ক্রিয়ার সাথে অকর্তাপদে দু-রকম বিভক্তি হয়, এবং বাক্যের অর্থ বিস্ময়করভাবে বদলে যায়। আমি বলতে পারি 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না এ-বাক্যে প্রথম ঈশ্বর অধিকরণ কারক, এতে বসেছে 'এ' বিভক্তি; আর দ্বিতীয় ঈশ্বর কর্মকারক, এতে বসেছে 'কে' বিভক্তি; এবং বাক্যটি বোঝাচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও আমি তার

ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি। বাঙলায় কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্যে অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। বিশ্বাস নিশ্চয়তা বোঝায় না, নয়, যদিও প্রত্যেকে তার বিশ্বাসকে তাই মনে করে। *পবিত্র* শব্দটিই নিরর্থক, এর কোনো সার্বজনীন তাৎপর্য নেই; একজনের কাছে যা পবিত্র আরেকজনের কাছে তা ঘৃণার বস্তু হতে পারে, সাধারণত হয়ে থাকে; যেমন উগ্র ধার্মিকের কাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের সব কিছুই ঘৃণ্য। ধার্মিক হিন্দু মুসলমানের পবিত্র গৃহ পোড়াতে দ্বিধা করে না, ধার্মিক মুসলমান অবলীলায় পদদলিত করে হিন্দুর পবিত্র দেবদেবীমূর্তি; খ্রিস্টান-ইহুদিও নির্দ্বিধায় একই আচরণ করে। তাই পবিত্রতার বোধ সার্বজনীন নয়, পবিত্রতার বোধ উঠে আসে নিজের বিশ্বাস থেকে, ভয় থেকে, আসলেই *পবিত্রতা* নিরর্থক শব্দ কোনো কিছু পরিচ্ছন্ন হতে পারে, পবিত্র হতে পারে না, পবিত্রতার কোনো বাস্তব রূপ নেই, কোনো কিছুই শাশ্বত নয়; মানুষের কোনো কোনো বিশ্বাস একশো দুশো বা দু-তিন হাজার বছর ধরে চলছে, তাও অবিকল একইভাবে চলছে না, কিন্তু মানুষ ওগুলোকেই শাশ্বত বলে ভাবছে; মনে রাখছে না পৃথিবী থেকে বহু বিশ্বাস লোপ পেয়ে গেছে, যেগুলোকে এক সময় শাশ্বত মনে করা হতো, যেগুলো কয়েক হাজার বছর টিকে ছিল। ধ্রুব নয় কোনো কিছু; যদিও বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসকে তাই মনে করে। ধ্রুব বলতে বুঝব তা, যা অবিকল একক একমাত্র সত্য; কিন্তু বিশ্বাসের কোনো শেষ নেই, এবং বিশ্বাসগুলো পরস্পরবিরোধী। এগুলোর একটি ধ্রুব হতে পারে, সবগুলো ধ্রুব হতে পারে না; কিন্তু এগুলোর প্রতিটিই এতো ত্রুটিপূর্ণ যে এগুলোর একটিকেও ধ্রুব মনে করতে পারি না।

বিশ্বের রহস্যীকরণে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে ধর্ম; এবং ধর্ম সব কিছুকে গ্রাস করে মানবপ্রতিভার সব কিছুকে বাধ্য ও উৎসাহিত করেছে বিশ্বের রহস্যীকরণে অংশ নিতে। ধর্মপ্রবর্তকেরা, ও তাঁদের অনুসারীরা, বুঝেছেন যে দখল করতে হবে শক্তিকেন্দ্র; এবং শক্তিকেন্দ্র দখল করতে পারলে আর কিছুই তাঁদের বাহুর বাইরে থাকবে না। মানুষের প্রতিভার সব এলাকায় যেতে চাই না আমি, থাকতে চাই শিল্পকলা, বিশেষ করে সাহিত্যে, এবং দেখতে পাই যে সাহিত্য বিশেষভাবেই অংশ নিয়েছে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে। সাহিত্য তাই একটি সুন্দর অন্ধকারের এলাকা। চিত্রকলায়ও এটা খুবই ঘটেছে; হিন্দু ও খ্রিস্টান চিত্রকারেরা উৎসাহের সাথে, হয়তো আর্থ অনুপ্রেরণায় অনেকটা, রহস্যীকরণে যোগ দিয়ে বিশ্বকে ঢেকে দিয়েছেন রহস্যের আবরণে। দেবদেবী, মেরি ও ক্রাইস্টের অজস্র ছবি এঁকেছেন ও মূর্তি তৈরি করেছেন তাঁরা, যেগুলোর কোনো কোনোটি আমার প্রিয়; কিন্তু ওই সব মূর্তি ও ছবির সৌন্দর্যের থেকে বিশ্বাসীদের কাছে ওগুলো আকর্ষণীয় রহস্যীকরণের জন্যে, বিশ্ব সম্পর্কে মনে ভুল বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে, তাদের মনের ভুল বিশ্বাসকে গভীর করে তোলার জন্যে। মুসলমানদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, বিশেষ করে স্রষ্টা ও প্রবর্তকের ছবি আঁকা আত্মহত্যার থেকেও শোচনীয় বলে মুসলমান চিত্রকরেরা এ থেকে বিরত রয়েছেন। সাহিত্য রহস্যীকরণের কাজ করেছে প্রবলভাবে, বিশ্বের গৌণ ও প্রধান লেখকেরা কবিতা, গান, উপাখ্যান ও সন্দর্ভে দলবেঁধে অংশ নিয়েছেন বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে। তাই সাহিত্য প্রধানত অপবিশ্বাসের জগত; এখনো সাহিত্যে যে-প্রবণতা দেখতে পাই, তা অন্ধকারের প্রবণতা, ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রবণতা। অজস্র বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে সাহিত্য হয়ে আছে এক ভুলের বিশ্ব, যদিও তার সৌন্দর্য অশেষ। শুধু সত্যের নয়, মিথ্যেরও সুন্দর রূপ রয়েছে; অনেক সময় মিথ্যের রূপই বেশি সুন্দর সত্যের রূপের চেয়ে, তাই কবিরা ও নানা ধারার লেখকেরা অজস্র মিথ্যের সৃষ্টি করেছেন সুন্দর রূপ। মিথ্যেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেছেন সত্য বলে।

বিশ্বের সাহিত্যের বড়ো অংশ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; অর্থাৎ যা অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক, তার ওপর। পরিবার ও প্রথা থেকে পাওয়া বিশ্বাস কবিরা প্রকাশ করেছেন তীব্র আবেগে, তাকে করেছেন রূপময়; কিন্তু তার ভিত্তিটাকে সরিয়ে নিলে ওই আবেগ ও রূপ সম্পূর্ণ কাঠামোসহ ভেঙে পড়তে পারে, একদিকে পড়বে। অধিকাংশ কবিই পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া বিশ্বাস যাচাই করেননি, যাচাই করার শক্তি নেই অনেকেরই, তাঁরা ভেসে গেছেন আবেগে। কবিতা ও গানের বিনোদক ভূমিকা রয়েছে, তাঁরা দেখেছেন যাচাই না করে আবেগে ভেসে গেলে বিনোদনের কাজটি সম্পন্ন হয় আরো ভালোভাবে। জনগণ প্রাপ্ত বিশ্বাসে স্বস্তি পায়, ওই বিশ্বাসকে যখন কেউ প্রবল করে তোলে তখন তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত উপভোগ্য, তখন তারা একই সাথে ভোগ করে শিল্পকলা ও বিশ্বাস। শিল্পকলার সৌন্দর্য অবশ্য অধিকাংশ মানুষই উপভোগ করতে পারে না, তারা উপভোগ করে তার ভেতরের মানবিক ও বিশ্বাসগত আবেগ, এবং কবিরা তা কাজে লাগিয়ে থাকেন। কবিতায় বিশ্বাস যতটুকু থাকে ততটুকু অকবিতা, বিশ্বাসের বাইরে যতটুকু থাকে ততটুকু কবিতা; যুগে যুগে বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, কিন্তু সৌন্দর্য অতো সময়ে ভেঙে পড়ে না। বিশ্বাসের কবিতা হচ্ছে ভুল কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো আবেগগত সৌন্দর্য।

রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় বিশ্বাসের পরম রূপ; বিশ্বকে রহস্যীকরণের এক প্রধান ঐন্দ্রজালিক। তাঁর কবিতা ও গানে, এবং বহু প্রবন্ধে, পাই বিশ্বাসের কাঠামোর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা ভেতর থেকে উঠে আসেনি তাঁর; উঠে এসেছে পরিবার থেকে, এবং তাকে তিনি উপনিষদের বহু সুন্দর মিথ্যেয় সাজিয়েছেন জীবন ভরে। তিনি বিশ্বাস করতেন এক পরমসত্তায়, ওটা তাঁর নিজের উপলব্ধি নয়, পরের উপলব্ধি; তাঁর পিতা বহুদেবতাবাদী ধর্ম ছেড়ে একদেবতাবাদী পরমসত্তায় বিশ্বাস না আনলে, তাঁর পরিবার ওই একক পরমসত্তার স্তবে মুখর না হলে তিনিও থেকে যেতেন বহুদেবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তায় বিশ্বাসের সাথে প্রথাগত ধর্মের বিশেষ মিল নেই; তাঁর বিশ্বাসে প্রথাগত ধর্মের স্বর্গনরক নেই, অবিশ্যিক আরাধনা নেই, তাঁর পরমসত্তা সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে নেই। তিনি পরমসত্তার সাথে পাতিয়েছিলেন এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যা অনেকটা প্রবল শক্তিমান প্রেমিকের সাথে আবেগকাতর অসহায় প্রেমিকার সম্পর্কের মতো; তাঁর পরমসত্তা অনেকটা ধর্ষকামী—যে সুখ পায় পীড়ন করে, তার পীড়ন মধুময় আর তিনি নিজে অনেকটাই মর্ষকামী—যিনি সুখ পান পীড়িত হয়ে, পরমসত্তার পীড়নে দলিত দ্রাক্ষার মতো তাঁর ভেতর থেকে মধু উৎসারিত হয়। সম্পর্কটি অনেকখানি হৃদয়গত ও শারীরিক। বিশ্বজগতের রহস্যীকরণের কাজ রবীন্দ্রনাথ করেছেন বিচিত্ররূপে; এবং এ-কাজে তিনি একটি শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন, শব্দটি হচ্ছে *সত্য*। বিশ্ব রহস্যীকরণে তাঁর চাবিশব্দ *সত্য*, যখনই তিনি তাঁর বুঝতে-না-পারা পরম উপলব্ধি বা বিশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছেন, যা সম্পর্কে তাঁর নিজেরই ধারণা অস্বচ্ছ, তখনই তিনি ব্যবহার করেছেন এ-শব্দটি; এবং অনুরাগীরা এক সুখকর বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করার স্বাদ পেয়েছেন। 'সত্য যে কঠিন,/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' বা 'সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে' ইত্যাদি উক্তিতে কবিতা কম, বিভ্রান্তি বিপুল; তবে রহস্যীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, *সত্য* একরকম অলৌকিক সামগ্রী এ-বোধ তৈরি হয়েছে চমৎকারভাবে।

সত্য শব্দটিকে রহস্যীকরণের কাজে তিনি কতভাবে ব্যবহার করেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ দিই *ধর্ম* বইটির একটি প্রবন্ধ থেকে।

১. সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন (উৎসব, *ধর্ম*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, ৩৩৫)।

২. বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না (উৎসবে, ওই, ৩৩৫)।

৩. মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ (উৎসব, ওই, ৩৩৫)

৪. আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি (উৎসব, ওই, ৩৩৬)।

৫. সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় (উৎসব, ওই, ৩৩৬)।

৬. তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ (উৎসব, ওই, ৩৩৭)।

সত্য শব্দটি উদ্ধৃতিগুলোতে নিরর্থক, যদিও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় শব্দ এটি, শব্দটি সুস্পষ্ট কোনো বোধ প্রকাশ না করে করছে রহস্যীকরণ; আর শেষ উদ্ধৃতির বক্তব্য তাঁর নিজের নয়, যদিও এটি তাঁর খুবই প্রিয়, জীবনে বহুবার নানা রূপে এটি প্রকাশ করেছেন তিনি; কীটসের বিখ্যাত 'Beauty is truth, truth beauty'-কে একটু রূপান্তরিত করেছেন, 'সুন্দর' বা 'সৌন্দর্য'-এর বদলে ব্যবহার করেছেন 'আনন্দ'; বলতে পারতেন 'আনন্দই সত্য, সত্যই আনন্দ'; কিন্তু দুটিকে অভিন্ন না করে করেছেন পরস্পরের উৎস। রহস্যীকরণের কাজ তিনি অজস্ররূপে করেছেন; বাস্তবকে বাস্তবরূপে, পরিচিত মূর্ত বস্তুকে মূর্ত বস্তুরূপে না দেখে রহস্যের প্রকাশরূপে দেখতেই তাঁর ভালো লাগলো। *শান্তিনিকেতন* বইটির প্রথম প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই পাই;

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সকাল বেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্তেই ভেঙে যায় ('উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, ৪৪৭)।

বেশ ভালো লাগে পড়তে, একটুখানি অপার্থিব আবেগেও আক্রান্ত হই, মনে হয় বেশ একটা রমণীয় রহস্যালোকের মধ্যে পড়ে আছি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সকালবেলার ওই আলো 'ঈশ্বরের আলো' কেন? এ-আলো হতে পারতো শুধুই 'আলো', বা 'সূর্যের আলো'; 'ঈশ্বরের আলো' বলার সাথে সাথে আমাদের পরিচিত রোদ রহস্যময় বস্তুতে পরিণত হয়, রহস্যীকরণ ঘটতে থাকে দিকে দিকে। সূর্যের আলোকে তিনি সূর্যের আলো বলে মানতে পারেন না, তাঁর মন ভরে ওঠে না হয়তো, তিনি ওই আলোতে তাঁর বিশ্বাসের ছোঁয়া চান, বস্তুজগতকে রঙিন রহস্যময় করে তুলতে চান তাঁর বিশ্বাস দিয়ে। এমন কাজ পৃথিবী জুড়েই করেছেন বিশ্বাসীরা, যাঁদের অনেকে ভুগেছেন বিশ্বাসের প্রচণ্ড দুরারোগ্য উন্মত্ততায়, যেমন ভুগেছেন অনেক অতীন্দ্রিয় উন্মাদ, বা উইলিয়ম ব্লেইক, যাঁর কাছে ভোরের তরুণ অরুণকে অরুণ মনে হয়নি, মনে হয়েছে দেবদূতরা দলেদলে স্তব করছে পরমেশ্বরের। আমরা জানি সূর্যের আলো ঈশ্বরের আলো নয়, এটা নিরন্তর জ্বলন্ত গ্যাসের কাজ, তার ভোরের সূর্যে দেবদূতরাও স্তবগান করে না, ওই ঈশ্বর আর তাঁর দেবদূতরা অবাস্তব অলীক কল্পনামাত্র। পুরোনো প্যালেস্টাইন বা পুরোনো ভারতের সত্যদ্রষ্টারা আজ এসে টেলিভিশন, বিমান, নিয়ন আলো দেখলে এগুলোও তাঁদের মনে হবে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ; এবং অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করে ফেলবেন নানা রকমের বেদ ও সংহিতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যেগুলোকে বলেছেন 'পূজা', সেগুলোতে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণ প্রক্রিয়া নিয়েছে চূড়ান্ত রূপ; ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারকের মতো তিনি কাজ করেননি, কবি তিনি এবং তাঁদের থেকে বহু দূরবর্তী, তাঁদের মতো তাঁর হাতে শেকল নেই, মানুষকে বন্দি করার জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়েননি, মানুষকে তিনি করতে চেয়েছেন মুক্ত,

কিন্তু অলীক পরমসত্তায় বিশ্বাস আলো বাতাসের মতো এগুলোতে কাজ করে চলছে। এগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; এগুলো উপভোগ করার জন্যে বেশ খানিকটা বিশ্বাস দরকার। তবে বিশ্বাস করেন না যাঁরা, পরমসত্তা যাঁদের কাছে হাস্যকর, তাঁরা এগুলো কীভাবে উপভোগ করেন, বা আদৌ কি উপভোগ করেন? রবীন্দ্রনাথের প্রভু বা পরমসত্তায় বিশ্বাস হাস্যকর আমার কাছে, তবে আমি উপভোগ করি এগুলো; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন উপভোগ করি? এমন হতে পারে আমি এখনো রহস্যীকরণ প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে আছি, নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারিনি তার প্রভাব থেকে, তবে বোধ করি এগুলো উপভোগ করি আমি এগুলোর তীব্র আবেগ মানবিক অনুভূতির অতুলনীয়তা, অসাধারণ সৌন্দর্য, পার্থিব চিত্রের পর চিত্র, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতির জন্যে। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা, আবেগতীব্রতা ও রূপময়তার জন্যে মাঝেমাঝে যা বিশ্বাস করি না, তাও আমাকে অভিভূত করে, শিউরে দেয়। তাঁর পরমসত্তা অবশ্য সুধীন্দ্রনাথকথিত 'ইহুদির হিংস্র ভগবান' নয়, চণ্ডরোষে ধেয়ে আসার জন্যে সে উদ্যত হয়ে নেই; তাঁর পরমসত্তা পরম প্রেমিক, সুন্দর, প্রিয়তমের মতো কখনো কখনো সুখকররূপে নিষ্ঠুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমসত্তাকে শুধু দয়াময় প্রেমিক হিসেবেই দেখতে পছন্দ করতেন না, নিষ্ঠুরতাও চাইতেন তার কাছে, তা অবশ্যই মোহন নিষ্ঠুরতা। তিনি সব কিছু পরিবৃত দেখতেন পরমসত্তার অস্তিত্ব দিয়ে। তা যেমন হতে পারে এমন প্রাত্যহিক : 'যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,/সবারে আমি নমি।/যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,/সবারে আমি নমি।' বা তা হতে পারে এমন, মহাজাগতিক : 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা.' প্রাকৃতিক সব কিছুতে তিনি দেখছেন পরমসত্তার স্পর্শ :

সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ।

এ হচ্ছে রহস্যীকরণ, সূর্য গ্রহ চাঁদ কারো আশীর্বাদ নয়, এগুলো এক বিশাল মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফল (এর স্থূল রূপও পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পসুন্দর স্তব নজরুলের হাতে হয়ে উঠেছে এমন স্থূল : এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি/(খোদা) তোমার মেহেরবাণী)। *পুরোনো বাইবেল*-এর 'গীতসংহিতা'র ১৯-সংখ্যক সঙ্গীতের শুরুর দুই পংক্তি এমন :

আকাশমণ্ডল প্রচার করে ঈশ্বরের গৌরব,
আর ভূলোক প্রকাশ করে তাঁর হস্তকর্ম।

রাজা ডেভিড বা অন্য কেউ যিনি এ-গান লিখেছিলেন, তাঁর কাছে আকাশমণ্ডলকে খুবই বিশুদ্ধ পবিত্র ব্যাপার মনে হয়েছিল, যা চারপাশের মাটি-পাথর-জলের জগত থেকে অনেক পরিশুদ্ধ। ওই গীতরচয়িতা আকাশমণ্ডল দেখে বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি যেমন সূর্য কী নক্ষত্র কী বোঝেননি, তেমনি তাদের অকল্পনীয় বিশালত্ব সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তাঁর কাছে সূর্য আর নক্ষত্র ছিল ভিন্ন ব্যাপার, এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র; মহাকাল ও মহাজগতের অনন্ততা ও বিশালত্ব বুঝি আমরা, তিন হাজার বছর আগের মানুষের মহাজগত মহাকালের অনন্ততা অসীমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না, ধারণা করার শক্তিও দেখা দেয়নি। তাঁর বিস্ময়ের পর তিন হাজার বছর কেটে গেছে, বহু কিছুর সাথে চাঁদ তারা সূর্যও হারিয়েছে মহিমা; আমরা এখন জানি ওগুলো কী। আকাশমণ্ডল কোনো বিশুদ্ধ পবিত্র স্থান নয়, তার সদস্যরাও কারো গৌরব প্রকাশ বা প্রচার করে না; এবং আমরা, আমাদের পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলেরই

সদস্য, আমরাও ভ্রমণ করে চলছি সূর্যের চারদিকে-মহাজগতে। হেবইনবার্গ, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও *প্রথম তিন মিনিট* ও *চূড়ান্ত তত্ত্বের স্বপ্ন*-এর লেখক, বলেছেন, আমাদের চারপাশের পাথরগুলো যতটুকু ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করে নক্ষত্রগুলো তার থেকে একটু ও কম বা একটুও বেশি প্রচার করে না ঈশ্বরের গৌরব।' এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ঈশ্বরের, কোনো দেবতার; আর সূর্য গ্রহ চাঁদ আলো বাতাস মেঘ বৃষ্টি কোনো প্রভুর আশীর্বাদ নয়। কিন্তু বাইবেলের গীতিকার ও একালের সঙ্গীতকার লিখেছেন একই গান, যা সুন্দর লাগে, কিন্তু মহাজগতের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে না; সব কিছুকে ঢেকে দেয় রহস্যে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথাগত বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রথাগত গ্রন্থনির্ভর ধার্মিকদের মতো তিনি নিশ্চিত ছিলেন না চরম পরিণতি সম্পর্কে। যদিও মৃত্যুই চরম পরিণতি, তিনি জানতেন, তবু আরো কিছু আশা তাঁর ছিল; সন্দেহও ছিল। যা তিনি এতো আদর্শায়িত করে দেখেছেন, তা মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাওয়ার মতো এতোই নিরর্থক, এটা ভাবা কষ্টকর ছিল তাঁর কাছে। একটি ব্যাকুল গানে তিনি প্রশ্ন করেছেন :

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে?

এর কাতরতা আমাকে মুগ্ধ করে, সুর আলোড়িত করে; কিন্তু এমন প্রশ্ন আমি করবো না। মোহগ্রস্ত নই আমি, আমি সৎ থাকতে চাই, সিসিফাসের মতো মেনে নিতে চাই জীবনের নিরর্থকতা, এবং অস্বীকারও করতে চাই নিরর্থকতাকে। কিছুতেই বিভ্রান্ত হতে চাই না, মোহের কাছে সমর্পণ করতে চাই না নিজেকে; আমি জানি পথের শেষ মৃত্যুতে, সব কামনা ও সাধনার শেষে রয়েছে নির্বিকার মাটি ও ক্ষুধার্ত আগুন, কিন্তু আমি ভেঙে পড়তে চাই না। রূপময় জীবনের শেষে মানুষের এই পরিণতিকে এক অপূর্ব কবিতায় পরিণত করেছিলেন জীবনানন্দ। মৃত্যুর আগে তো আমরা অজস্র রূপ আর রসের ভেতর দিয়ে চলেছি; নির্জন খড়ের মাঠে পৌষের সন্ধ্যায় আমরা হেঁটেছি, মাঠের পারে দেখেছি কুয়াশার ফুল ছড়িয়ে চলছে নদীর নরম নারী; দেখেছি অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভরে গেছে, দেখেছি বুনোহাঁসগুলির আঘাত এড়ায়ে উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভেতরে, আলো আর বুলবুলিকে খেলা করতে দেখেছি হিজলের জানালায়, আমরা দেখেছি ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ। কিন্তু এই রূপময় জীবনের পরে কী, আর কী বুঝতে চাই আমরা? জীবনানন্দ হাহাকার করে ওঠেন নি, মেনে নিয়েছেন সুন্দর নিরর্থকতাকে :

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনায় শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোনো মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর? ...রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

রবীন্দ্রনাথে শুনতে পাই 'এত কামনা'র হাহাকার, জীবনানন্দে কামনা আরো রূপময়—সব রাঙা কামনা—কিন্তু হাহাকার নেই, এর শেষে জেগে আছে নিরর্থক দেয়ালের মতো ধূসর মৃত্যুর মুখ। যত স্বপ্ন যত সোনা ছিল জীবনে,

তা যেন কোনো জাদুকরের খেলার সামগ্রী। জীবনানন্দ আর বুঝতে চাননি, বোঝার কিছু নেই বলে; শেষে শুধু মুগ্ধ করেছেন দুটি অধরা চিত্রকল্প দিয়ে, যে-দুটি শুধু ঢেউ তুলে চলে স্থির জলে—রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক/শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

বিশ্বাসীদের সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর, তবে ওই ভিত্তিটা দাঁড়ানো শূন্যতার ওপর। তাঁরা ওই শূন্যতার দিকে তাকাতে চান না। বিশ্বাসীরা সাধারণত ভীত ও লুব্ধ মানুষ, তাদের ভেতরে ভয় ও লোভ একসাথে কাজ করে, শূন্যতাকে ভয় পেয়ে তারা স্বর্গের কল্পিত পূর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ওই ধরনের বিশ্বাসী ছিলেন না, তাহলে তিনি ধর্মপ্রবর্তক হতেন, কবি হতেন না। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে একবার তাকিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিটির দিকে। তাঁর যে এই গভীর সর্বব্যাপী বিশ্বাস, তা কি উঠে এসেছিল তাঁর নিজের ভেতর থেকে? যাকে তিনি সত্য আর পরম বলে মেনেছিলেন, তা কি তাঁর একান্ত আপন সত্য উপলব্ধির? যে-সুন্দর নিঠুরের কাছে তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে, যার চরণধূলার তলে মাথা নত রাখতে ভালোবাসতেন তিনি, যার ইচ্ছে তিনি পূর্ণ দেখতে চাইতেন নিজের জীবনে, যার অঙ্গদ সুন্দর কিন্তু খড়্গ আরো মনোহর মনে হতো তাঁর, সুখে না থেকে যার কোলে থাকতে চাইতেন তিনি, যার সাথে নিত্য বিরোধ তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, যার সম্মুখে তিনি দাঁড়াতে চাইতেন প্রতিদিন, তাকে কি তিনি পেয়েছিলেন নিজে? না কি পেয়েছিলেন প্রথা থেকে? বিশ্বাস কয়েক হাজার বছর ধরে সবাই পাচ্ছে প্রথা থেকে, তিনিও তাই পেয়েছিলেন। *পত্রপুট*-এর পনেরো সংখ্যক কবিতায়, যে-কবিতাটির নাম দিতে পারি 'ব্রাত্য', তিনি স্বীকার করেছেন আসল সত্য। তিনি বলেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
আজ আপন মনে ভাবি,
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে

তাঁর স্বীকারোক্তিতেই দেখছি তাঁর পরম বিশ্বাস নিজের নয়, প্রথাগত; তাঁর পরমসত্তাকে পেয়েছেন তিনি পরিবার সমাজের কাছে থেকে, পেয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে—গ্রন্থের কোনো শেষ নেই, গ্রন্থের প্রতারণারও কোনো শেষ নেই; প্রতারক গ্রন্থ লিখতে পারেন, বিভ্রান্ত গ্রন্থ লিখতে পারেন, অসৎ গ্রন্থ লিখে চালাতে পারেন বিধাতার নামে; তাই বুঝতে পারি তাঁর নিজের ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ নির্মম সংকীর্ণ স্বার্থপরায়ণ ধর্মের কবলে

নিজেকে সমর্পণ করেননি, কতগুলো বইয়ের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি; কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কল্পজগতটিই দাঁড়িয়ে আছে শোচনীয় শূন্যতার ওপর, যে-শূন্যতার রহস্যীকরণে তিনি নিজেকে ব্যয় করেছেন সারা জীবন। তিনি নিজে যদি খুঁজতেন নিজের বিশ্বাস, তাহলে হয়তো বিশ্বাস করতেন না; তাঁর সে-মানসিকতা ছিল না, পরিবারের পরমসত্তাকে অস্বীকার করার মতো প্রথাবিরোধীও ছিলেন না তিনি। তাঁর মতো অসাধারণ মানুষই যেখানে বিশ্বাস লাভ করেন পরিবার, প্রথা, সমাজ, গ্রন্থ থেকে, এবং ভুল বিশ্বাসকে দীর্ঘ জীবন ধরে মহিমামণ্ডিত করতে থাকেন, সেখানে সাধারণ মানুষ আর কী করতে পারে। প্রথা মেনে নেওয়ার সুবিধা অনেক, না মানার বিপদ অজস্র।

যখন আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিল্পকলা, বিশশতকের স্বভাব বিষয়ে পড়া শুরু করি আমি কৈশোর পেরিয়ে নতুন যৌবনে পড়ার চাঞ্চল্যকর বয়সে, ভালো লাগতে থাকে ওই কবিতার অভাবিত চিত্রকল্প, অপ্রথাগত সৌন্দর্য, এতদিন ধরে শেখা অনেক কিছুকেই মনে হতে থাকে হাস্যকর, তখন বহু বইয়ে বিশশতকের একটি ব্যাখ্যায় আমি আহত হই। বহু সমালোচক, এখন তাঁদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি আমি, বিশশতককে নিন্দা করেন বিশ্বাসহীনতার শতক বলে, তাঁদের কাছে শতকটিকে মনে হয় মরুভূমি-বিশ্বাসহীনতার মরুভূমি, যা টিএস এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি, বুঝে উঠতে অনেক দিন লাগে, এবং হাসি পায়। আমি বুঝতে পারি ওই সমালোচকদের মনে, যেমন এলিয়টের ভেতরে, বাস করে পুরোনো বিশ্বাস, অজস্র বাজে ধারণা, তাই এ-মহান শতাব্দীকে তাঁদের এমন মনে হয়। বিশশতক বিশ্বাস বাদ দিয়েছে, এতে এটি মরুভূমি হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে সৎ, এর থেকে সৎ শতাব্দী আর নেই। এর আগে তথাকথিত সভ্য মানুষ তিরিশ চল্লিশটি বিশ্বাসের শতাব্দী যাপন করেছে, কিন্তু ওই বিশ্বাস মানুষের কোনো কাজে আসেনি, ওই বিশ্বাস মানুষকে অসুস্থ বন্দী দরিদ্র অসহায় পীড়িত করে রেখেছে; ওই বিশ্বাস ছিল মোহগ্রস্ত আর সুবিধাবাদীদের পরিকল্পিত বিশ্বাস। অতীতের দিকে তাকিয়ে বিশশতকের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো শতক দেখতে পাই না আমি, আমার মনে হয় না অন্য কোনো শতক আমার জন্যে এর চেয়ে বেশি বসবাসযোগ্য হত। আগের কোনো শতকে আমি হতাম হয়তো ক্রীতদাস বা ভূমিদাস, কোনো শতকে আমার জীবন কেটে যেত প্রভুদের স্তবগানে, আমি থাকতাম অসুস্থ, অন্ধ, স্বাধিকারহীন। বিশশতক, দুটি মহাযুদ্ধ ও বহু রোগে আক্রান্ত বিশশতক, আমাকে যা দিয়েছে, তা আর কোনো শতক দিতে পারতো না। এলিয়টের কবিতার অজস্র চিত্রকল্প আর উক্তিতে আমি মুগ্ধ। এ-মুহূর্তেও মনে আসছে :

> Let us go then, you and I,
> When the evening is spread out against the sky
> Like a patient etherised upon a table;
>
> In the room the women come and go
> Talking of Michelangelo.
>
> And time for you and time for me,
> And time yet for a hundred indecisions,
> And for a hundred visions and revisions

Do I dare
Disturb the universe?
I have measured out my life with coffee spoons

I grow old...I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

I have heard the mermaids singing, each to each.
I do not think that they will sing to me.

Every street-lamp that I pass
Beats like a fatalistic drum

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

After such knowledge, what forgiveness? Think now

History has many cunning passages, contrived corridors.
And issues, deceives with whispering ambitions

April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.

What are roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the circket no relief.
And the dry stone no sound of water.

'You gave me Hyacinths first a year ago.
They called me the Hyacinth girl.'

Unreal city,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many

I had not thought death had undone so many

Sweet Thames, run softly till I end my song.
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.

Gentile or Jew
O you who run the wheel and look to mindward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rocks without water

Where the hermit-thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water

Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you

আর উদ্ধৃত করছি না, অনুবাদের চেষ্টাও করতে চাই না, এগুলো ষাটের দশকে ... আলোড়িত করতো আমাকে, যেভাবে আমার চোখের সামনে দাঁড় করাতো অবর্ণনীয় দৃশ্যের পর দৃশ্য, আজও করে। ইথারিত রোগীর মতো সন্ধ্যা, বা কফির

চামচে জীবন পরিমাপ, বা প্রলয়ের ঢাকের মতো প্রতিটি বাতিস্তম্ভের বেজে চলা, বা এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস আজও অভিভূত করে আমাকে। আজও আমি গুনগুন করতে ভালোবাসি :

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road
বা
Who is the third who walks always beside you?

তবে আমি এগুলোর যে-ভাষ্য পাই, এবং এলিয়ট যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা মেনে নিই না। এখানে জল নেই শুধুই পাথর, পাথর এবং জল নয় শুধু বালুপথ—এ-দৃশ্য ও ধ্বনি আমি উপভোগ করি; তবে আমার ভালো লাগে না জল মানে বিশ্বাস আর পাথর মানে অবিশ্বাস, এ-ব্যাখ্যা। বিশ্বাসের কোনোই দরকার নেই, দরকার রহস্যমুক্ত সত্যের। পরিহাস বলে মনে হয় পরের পংক্তিটি—Who is the third who walks always beside you? মনে হয় বেশ একটা অলৌকিক অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়ছি; আমরা ছিলাম দুজন হঠাৎ তৃতীয় একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছি, গুনতে গেলে পাচ্ছি দুজনকে, কিন্তু দেখতে গেলে দেখছি আমাদের দুজনের মধ্যে রয়েছে আরেকজন। খুবই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, এলিয়ট নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও লেখেননি পংক্তিটি, লিখেছেন দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতা থেকে ধার করে। প্রচণ্ড শীতে আর ক্ষুধায় মৃত্যুর ভীতির মধ্যে দক্ষিণ মেরুযাত্রী একজনের মনে এ-বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল, যে-বিভ্রম ওই পরিস্থিতিতে জাগা স্বাভাবিক, যা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, তাকেই এলিয়ট ধর্মীয় উপলব্ধির রহস্যে পরিণত করেছেন। অলৌকিক উপলব্ধি এমনই অসৎ।

এলিয়ট তাঁর ধর্মীয় ও রাজনীতিক রক্ষণশীলতা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে ধর্মবিশ্বাসে তিনি ক্যাথলিক আর রাজনীতিক বিশ্বাসে রাজতন্ত্রবাদী। তাঁর কবিতা ও নাটকে খ্রিস্টধর্মীয় রক্ষণশীলতা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর *দি-রক*-এর একটি অংশ পড়ে আমি বেশ মজা পাই, চমৎকার উক্তি আমোদ দেয় আমাকে, কিন্তু এর সবটাই বাজে কথা :

O perpetual revolution of configured stars,
O perpetual recurrence of determined seasons,
O world of spring and autumn, birth and dying!
The endless cycle of idea and action.
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence;
Knowledge of words, and ignorance of the Word,
All our knowledge brings us nearer to our ignorance,
All our ignorance brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to GOD.

Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of Heaven is twenty centuries
Bring us farther from GOD and nearer to the Dust.

I journeyed to London, to the timekept City,
Where the River flows, with foreign flotations.
There I was told; we have too many churches,
And too few chop-houses, There I was told:
Let the vicars retire, Men do not need the church
In the place where they work, but where they spend their Sundays.
In the City, we need no bells:
Let them waken the suburbs.
I journeyed to the suburbs, and there I was told:
We toil for six days, on the seventh we must motor
To Hindhead, or Maidenhead.
If the weather is foul we stay at home and read the papers.
In the industrial districts, there I was told
Of economic laws.
In the pleasant countryside, there it seemed
That the country now is only fit for picnics.
And the Church does not seem to be wanted
In country or in suburb; and in the town
Only for important weddings.

হায় নক্ষত্রমণ্ডলির অনন্ত আবর্তন,
হায় নির্ধারিত ঋতুসমূহের অনন্ত পুনরাবর্তন,
হায় বসন্ত ও শরৎ, জন্ম ও মৃত্যুর জগত।
চিন্তা ও কর্মের অন্তহীন চক্র,
অন্তহীন আবিষ্কার, অন্তহীন পরীক্ষানিরীক্ষা,
আনে গতির জ্ঞান, স্থিতির জ্ঞান নয়;

ভাষার জ্ঞান, নৈঃশব্দের জ্ঞান নয়;
শব্দের জ্ঞান, এবং শব্দ সম্পর্কে অজ্ঞানতা।
আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার,
আমাদের সব অজ্ঞানতা আমাদের নিকটবর্তী করে মৃত্যুর,
তবে মৃত্যুর কাছাকাছি হওয়া ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়া নয়।
কোথায় জীবন যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি জীবনযাপনের মধ্যে?
কোথায় প্রজ্ঞা যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি জ্ঞানের মধ্যে?
কোথায় জ্ঞান যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি তথ্যের মধ্যে?
বিশটি শতক ধরে নক্ষত্রমণ্ডলির আবর্তন
আমাদের দূরে সরিয়ে নেয় ঈশ্বরের থেকে এবং কাছাকাছি করে ধুলোর।

আমি গেলাম লন্ডনে, সময়নিয়ন্ত্রিত নগরে,
যেখানে বয়ে চলে নদী, বিদেশি নৌবহরসহ।
সেখানে আমাকে বলা হলো : আমাদের বড়ো বেশি আছে উপাসনালয়,
এবং খুব কম আছে খাবার দোকান। সেখানে আমাকে বলা হলো :
অবসর দাও পুরোহিতদের। মানুষের কর্মস্থলে কোনো দরকার নেই উপাসনালয়ের,
উপাসনালয় দরকার যেখানে তারা রোববার কাটায়।
নগরে, আমাদের দরকার নেই ঘণ্টাধ্বনির :
ঘণ্টাধ্বনি জাগাক শহরতলিকে।
আমি গেলাম শহরতলিতে, এবং সেখানে আমাকে বলা হলো :
ছ-দিন আমরা খাটাখাটি করি, সপ্তম দিনে আমাদের যেতেই হয়
হাইন্ডহেটে, বা মেইডেনহেডে।
যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে আমরা ঘরে বসে পড়ি খবরের কাগজ।
শিল্প-এলাকায় আমাকে বলা হলো
আর্থিক আইনের কথা।
মনোরম পল্লী-অঞ্চলে গিয়ে মনে হলো পল্লী এখন উপযুক্ত শুধু বনভোজনের।
উপাসনালয়ের কোনো দরকার নেই পল্লীতে বা শহরতলিতে;
আর শহরে দরকার শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিবাহানুষ্ঠানের জন্যে।

পড়তে বেশ লাগে, শুনতেও বেশ লাগবে,—এটা নাটকের অংশ; তবে এর বহু 'উপলব্ধি' বড়ো রকমের বাজে কথা, বিশ্বের রহস্যীকরণের জন্যে বানিয়ে তোলা, যদিও বাজে কথাগুলো অনেকের মনে হতে পারে মহৎ উপলব্ধি; আর দ্বিতীয়াংশে উপাসনালয় বিমুখতার যে-বিবরণ রয়েছে, তাতে ব্যথিত হওয়ার কিছু নেই, মানুষ এগুলোর কবল থেকে

যে মুক্ত হচ্ছে, এগুলোকে যে গুরুত্বহীন চক্র, অন্তহীন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষা আর গতির জ্ঞানকে ভালো ব্যাপার মনে করছেন না, চাচ্ছেন স্থিতির জ্ঞান বা ধ্যান; তবে স্থিতি বা ধ্যান বাজে কথা মাত্র, তিনি নিজেও স্থিতি বা ধ্যানের চর্চা করতেন না, ব্যাংকে ও পরে প্রকাশনাসংস্থায় কাজ করতেন, পালিয়ে বেড়াতেন উন্মাদ প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেন তরুণী ব্যক্তিগত সহকারিণীকে। ধ্যানের কথা বাতিল বইগুলোতে খুবই পাওয়া যায়, তবে চিন্তা, কর্ম, আবিষ্কার, আর পরীক্ষানিরীক্ষার পাশে ধ্যান বা স্থিতি হাস্যকর ব্যাপার। 'আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার',—একে কি সত্য বলে মানতে হবে? জ্ঞান কি মুক্ত করছে না আমাদের অজ্ঞানতা থেকে? এখনকার কিশোররাও কি অনেক ব্যাপারে বেশি জানে না অ্যারিস্টটল, মোজেস বা মহর্ষিদের থেকে? জ্ঞান আমাদের অজ্ঞান করে না, বরং ক্রমশ আরো নির্মোহ সত্যের দিকে এগোই, জ্ঞানী হই, যেমন আমরা পুরোনো ধ্যানীদের থেকে জানি অনেক বেশি। তাঁরা আসলে কোনো সত্যই উদঘাটন করেননি, উচ্চারণ করেছেন কিছু বিভ্রান্ত শ্লোক, ওই বিভ্রান্ত শ্লোক উচ্চারণকে জ্ঞান বলতে পারি না। এলিয়ট যে-জীবন, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের কথা বলেছেন, যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি বলে আর্তনাদ করছেন, তা কিংবদন্তিমাত্র; ওই জীবন, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের থেকে বিশশতকের জীবন, জ্ঞান, তথ্য অনেক উন্নত। ঐশী গ্রন্থগুলোর প্রণেতারা আজকের জ্ঞানের বিকাশের কথা কখনো ভাবতেও পারেননি। আর ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়া? শুধু হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। জনগণের উপাসনালয় বিমুখতায় খুবই মর্মাহত এলিয়ট; বুঝতে পারি যে বিশশতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির থেকে জনগণ অনেক বেশি এগিয়েছে চেতনায়। তারা কতকগুলো ভুল বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে নেই; তারা উঠে এসেছে আদিম বিশ্বাস থেকে, বিশ্বকে রহস্যমুক্ত করছে তারা, আর আধুনিক কবি, আদিম মানুষের মতো, করছেন বিশ্বের রহস্যীকরণ।

এলিয়টের মতে চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে, যাঁর মহিমা তিনি বর্ণনা করেছেন বহুবার, যাঁর *দি ডিভাইন কমেডি* বা *স্বর্গীয় মিলন* পৃথিবীর বিখ্যাততম কাব্যগুলোর একটি। বিশ্বাস ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি আমি, বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে, কিন্তু কবিতার মূল্য আছে; তাই এর কাব্যত্ব অনুভব করি আমি, কিন্তু যে-বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কাব্যটি, তা শিশুসুলভ ও হাস্যকর। এর রূপকার্থ—পরমসত্তার সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মার মিলন প্রবীণ শিশুদের কাছে মধুর, তাদের এটা পরম রূপকথার স্বাদ দেয়; আমি কৌতুক বোধ করি। মধুসূদন *মেঘনাদবধকাব্য*-এর অষ্টম, *প্রেতপুরী,* সর্গ দান্তের কাব্যের *নরক* সর্গের অনুসরণে লিখেছিলেন, তবে দান্তের মতো বিশদ হওয়ার ধৈর্য বা সুযোগ ছিল না মধুসূদনের। এ-কাব্যের নরক খণ্ডের তৃতীয় সর্গে নরকের তোরণে বড়ো বড়ো বর্ণে লেখা আছে :

THROUGH ME THE ROAD TO THE CITY OF DESOLATION.
THROUGH ME THE ROAD TO SORROW DIUTURNAL,
THROUGH ME THE ROAD AMONG THE LOST CREATION...
LAY DOWN ALL HOPE. YOU THAT GO IN BY ME.

এর দ্রুত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন মধুসূদন :

আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে;—"এই পথ দিয়া

যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;

হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"

দান্তের কাব্য ও প্রতিভাকে অস্বীকার করার কথা ওঠে না, তাঁর কবিত্ব মুগ্ধ করে আমাকে, কিন্তু অস্বীকার করি তাঁর বিশ্বাসকে। তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়; বিশ্ব, পৃথিবী, নরক, স্বর্গ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হাস্যকর। বার্ট্র্যান্ড রাসেল নিজেকে খ্রিস্টান বলতে অস্বীকার করেছিলেন যে-সমস্ত কারণে, তার একটি হচ্ছে নরক—ঈশ্বরের অগ্নিকুণ্ড, তার অবাধ পীড়নসুখের এলাকা; তাঁর মতে যে-ঈশ্বর নরকেরও ঈশ্বর, যে তার সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে পরিকল্পনার কোনো শেষ রাখেনি, যে এতো হিংস্র, তাকে মানা যায় না। ঈশ্বরকে প্রচণ্ড শাস্তিদাতারূপে ভাবতে পারেন না রাসেল; যে এমন শাস্তি দিতে পারে, তাকে মহৎ বলে ভাবাও কঠিন। নরক পরিকল্পনায় সব ধরনের ঈশ্বরের থেকে নিপুণ দান্তে, তারা নতুন নরক নির্মাণের দরকার বোধ করলে দান্তেকে নরকের স্থপতির দায়িত্ব দিলে যে অভাবিত হিংস্র নরক পাবে, তা দেখে তারাই ভয় পাবে,—আমি ভেবে পাই না একটি মানুষ কতটা নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ হলে এমন বিশদভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন নরকের, এবং তাতে অন্তহীন শাস্তি দিতে পারেন তাঁর সব ধরনের শত্রুকে। দান্তের নরকের পীড়নের কোনো তুলনা পাই না, শুধু কিছুটা পাই হিটলারের বন্দিশিবির ও সোলঝিনিৎসিনের *গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ*-এ।

দান্তের কাব্য মৃত্যুর পর পরমসত্তার (একটি ভুল বিশ্বাস) সাথে আত্মার (আরেকটি ভুল বিশ্বাস) মিলনের রূপক। পরমসত্তা, নরক, শুদ্ধিস্থল, স্বর্গ কিছুই দান্তের নিজের কল্পনা নয়, এগুলো পেয়েছেন তিনি ক্যাথলিক বিশ্বাস থেকে; সেগুলোকে ভরে তুলেছেন নিজের কল্পনায়, ওই কল্পনাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস। এ-কাব্যের সব বিশ্বাসই ভুল। শুরু বিয়াত্রিচেকে নিয়ে; কৈশোরে প্রথম দেখেছিলেন এই পবিত্র স্বর্গীয় মুখ, যা কখনো ভোলেননি, এবং ওই মুখের অধিকারিণী হয়ে ওঠে তাঁর কাছে শুদ্ধতমা। শুদ্ধতাও এক কৌতুককর ব্যাপার, বিশ্বাসীদের অন্তরে তা কখনো মলিন হয় না, যদিও আমরা জানি কিছুই অমলিন শুদ্ধ নয়। বিয়াত্রিচের বিয়ে হয়ে যায় এক ব্যাংক-কর্মকর্তার সাথে, দান্তে নিজেও বিয়ে করেন; কিন্তু তাঁর হৃদয়ে জেগে থাকে শুদ্ধতমার জন্যে শুদ্ধতম প্রেম। কত সহস্রবার বিয়াত্রিচে ঘুমোলো পতিদেবতার নীচে, কতভাবে তৃপ্ত করলো পতির বিচিত্র সখ, কতবার চিৎকার করে উঠলো, গর্ভবতী হল কতবার, দান্তেও কতবার উঠলেন তাঁর নারীর ওপরে, ভেঙে পড়লেন কতবার; কিন্তু তা কোনো ব্যাপার নয়, বিশ্বাসীদের শুদ্ধতা শৃঙ্গারে সঙ্গমে মলিন হয় না। বিয়াত্রিচেকে তিনি পথেঘাটে যতবার দেখেছেন ততবার মনে হয়েছে তিনি দেখেছেন ঈশ্বরকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভালো বিষয় হতে পারেন দান্তে, মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেন কী উন্মত্ততায় ভুগতেন দান্তে—প্রতিভাস, ভ্রান্তবিশ্বাস, না মতিভ্রমে? সব মহাধার্মিক ঈশ্বরদ্রষ্টাই মনোবিকলগ্রস্ত। ফ্লোরেন্সের ওই তরুণীর মধ্যে তিনি দেখেন ঈশ্বরের সশরীরী গৌরব, যার মধ্যে একাকার হয়ে আছে খ্রিস্টীয় উপাসনালয়, মা মেরি, আর ক্রাইস্ট নিজে। তিনি নরক, শুদ্ধিস্থল, ও স্বর্গের যে-ভূগোল নির্দেশ করেছেন, খুবই নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করেছেন দান্তে, যে-ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে মনে করেছেন ধ্রুব, তা আজকের চোখে শুধু ভুলই নয় হাস্যকরও। তিনি নরক কল্পনা করেছেন একটি চোঙাকৃতি সুড়ঙ্গরূপে, যা জেরুজালেমের নিচ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে নেমে গেছে। ওই নরককে ভাগ করেছেন তিনি স্তরে স্তরে, একেক স্তরে দণ্ডিত করেছেন একেক ধরনের পাপীকে। তাঁর নিজের শত্রুদের তিনি দিয়েছেন কঠিন শাস্তি। তারপর কল্পনা করেছেন পারগ্যাটোরি বা শুদ্ধিস্থল, যেখানে ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুসারে, বাস করে পাপমুক্ত আত্মারা, যা অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো এক দ্বীপের

কোনে এক পর্বতের চূড়োয়। এখানে রয়েছে সাতটি স্তর, যাতে ঘুরে ঘুরে আত্মারা মুক্তি পায় সাতটি সাংঘাতিক পাপ থেকে, এবং উপযুক্ত হয়ে ওঠে স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের। স্বর্গ হচ্ছে স্বর্গবাসের প্রবেশপত্র পাওয়া আত্মাদের বাসস্থান। স্বর্গকে তিনি স্থাপন করেন মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত দশ আসমানে, যার ওপর ফুটে আছে অতীন্দ্রিয় রহস্যগোলাপ।

বিশ্ব সম্পর্কে কী ধারণা ছিল বিশ্বাসী দান্তের? মধ্যযুগে এ সম্পর্কে যতটুকু জানা হয়েছিল, তিনি জানতেন ততটুকু; তাঁর পবিত্র বই ও বিশ্বাস তাঁকে যে-সব ভুল ধারণা দিয়েছিল, তিনি পোষণ করতেন সে-সব ভুল ধারণাই। দান্তের ঈশ্বর বিশ্ব সম্পর্কে বেশি জানতো না, যতটুকু জানতো তাও শিখেছিল আলেকজান্দ্রিয়ায় টলেমির বইপত্র থেকে। ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের কল্পনা আগে থেকেই ছিল, টলেমি তা বিধিবদ্ধ করেন, যা ষোড়শশতকে, দান্তের দু-শো বছর পর, বাতিল করে দেন কোপারনিকাস; এবং প্রতিষ্ঠা করেন সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব। তবে মহাবিশ্ব এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; একটি গরিব নক্ষত্র সূর্য, তাকে কেন্দ্র করে মহাজগতের একপ্রান্তে আছে সৌরলোক; আরো কোটি কোটি নক্ষত্রলোক আছে মহাবিশ্বে। এসব জানা ছিল না ঈশ্বরের, ও দান্তের। দান্তে বিশ্বাস করতেন পৃথিবীই বিশ্বের কেন্দ্র, আর ওই বিশ্ব বেশি বড়ো ছিল না, এখনকার মহাবিশ্বের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের খণ্ডাংশমাত্র। আলোর গতি ও আলোকবর্ষের কথা ঈশ্বর ও দান্তে কখনো ভাবতে পারেননি। টলেমি বিশ্বজগতের ক্রিয়াকলাপের ভেতরে ঢোকেননি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাকেই মনে করেছেন সত্য, আর তাকে অন্যরা মনে করেছে চিরসত্য, এবং ওই সত্য ঈশ্বরের ধ্রুবসত্য হয়ে ঢুকে গেছে ঈশ্বরদের বইগুলোতে।

সূর্য উঠতে দেখি আমরা, দেখি ডুবতে; টলেমিও দেখেছিলেন সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। এ দেখেই মনে করেছিলেন সূর্য এভাবেই ঘোরে পৃথিবীর চারিদিকে, যা খুবই বড়ো ভুল। সূর্য ওঠেও না ডোবেও না; পৃথিবীই ঘুরছে নিজের অক্ষরেখার ওপর ও সূর্যকে ঘিরে নিজের কক্ষপথে। প্যালেস্টাইন অঞ্চলের ধর্মবইগুলোতে এ-ভুলই ঈশ্বরের সত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় এগুলো ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে; টলেমি এগুলোর গোলাকার পথগুলোকে ভাগ করেছিলেন সাতটি পথ। এগুলোই ধর্মগ্রন্থের পবিত্র সাত আসমান : পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরবর্তী চাঁদ, বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), সূর্য, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), ও শনির (Saturn) কক্ষপথ (তখনো ইউরেনাস, নেপচুন, এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহাণুগুলো আবিষ্কৃত হয়নি; আবিষ্কারের পর ধার্মিকেরা আরো তিন আসমান যোগ করে দশ আসমানে বিশ্বাস আনেন)। মধ্যযুগের ইউরোপের কত না কবিই মুগ্ধ ছিলেন 'স্ফেয়ার' বা কক্ষপথের অশ্রুত সঙ্গীতে, এ নিয়ে কতই কবিতা লিখেছেন তাঁরা। এই সাত আসমানের পরে স্থির নক্ষত্রদের পথ বা অষ্টম আসমান, তারপর আদিচালকের (Primum Mobile : First Mover) অবস্থান, যা নিজে চলে না কিন্তু চালায় সব কিছু। এই নয় কক্ষ বা পথ বা আসমানের পর হচ্ছে দশম স্বর্গ, ঈশ্বরের ও তার সন্তদের প্রকৃত বাসভবন। এর কোনো অবস্থান নেই, গতি নেই, চলাচল নেই; এটা শাশ্বত ও অনন্ত। এমন কল্পনায় বিশ্বাসীদের চোখ জলে ভরে যায়, ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করে তারা স্বর্গের সুখ অনুভব করে। কিন্তু এ হচ্ছে অপকল্পনার চমৎকার উদাহরণ। মানুষের সব ধরনের কল্পনা আমার ভালো লাগে, কিন্তু সেগুলোতে আমি বিশ্বাস করি না, মজা পাই। দান্তের কাব্য সুন্দর, কিন্তু বিশ্বাস ভুল; তাঁর বিশ্বাসের কাজ হচ্ছে বিশ্বকে মিথ্যেয় বা রহস্যে ঢেকে দেয়া।

বাঙলা লেখকদের লেখা পড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম, যখন তাঁরা চিন্তা করেন তখন তাঁরা অনেকটা শিশু; তাঁদের অধিকাংশই অবিকশিত, অনেকাংশে অজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞানের অভাবে আদিম বিশ্বাস প্রবল তাঁদের তাঁরা স্বস্তি পান কুসংস্কারে পুরোনো বাজে কথায়। কুসংস্কারকীর্তনে তাঁরা অকুণ্ঠ। তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়, তিনি মাঝারি লেখক বলে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক বলে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বাঙালি মুসলমানের ওপর; বাঙালি মুসলমান তাঁকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারবে না বহু দিন। বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীলেরাও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল, আর তারা পড়ে না, শুনে শুনে বিশ্বাস করে যে নজরুল বিদ্রোহী। প্রচারে প্রচারে তাঁকে আমি বিদ্রোহী বলেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশ কিছু পদ্যে-গদ্যে দেখেছিও তাঁর বিদ্রোহীরূপ, কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান। বেশি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গানের পরে গানে তিনি লিখেছেন 'নামাজ পড়, রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।/তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই'; 'শোনো শোনো য়্যা এলাহি আমার মুনাজাত।/তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস-রাত'; 'আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়'; 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,/যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই'; 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা'; 'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে'; 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়/আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।' অবশ্য এগুলোকেও অনেকে মনে করতে পারেন খুবই বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল কাণ্ড; কিন্তু এখনো কোনো বিদ্রোহীকে পাচ্ছি না, পাচ্ছি একজন ইসলাম অন্ধকে।

রবীন্দ্রনাথ করতেন রহস্যীকরণ, তিনি কোনো প্রথাবদ্ধ ধর্মের গীতিকার ছিলেন না; তিনি তাঁর বিশ্বাসকে জড়িয়ে দিতেন মহাজগতের সাথে। নজরুলে সেই রহস্যীকরণ নেই, তিনি স্থূলভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশ্বাস বা উদ্দীপনা। নজরুলের বিশ্বাসও সন্দেহজনক, মনে হয় তিনি এক বিশ্বাসের সাথে আরেক বিশ্বাসের পার্থক্য বোঝেন না। বিধিবদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো কঠোর, একটি মানলে আরেকটি মানা যায় না, ইসলাম মানলে হিন্দুধর্ম মানা যায় না, একই সাথে কেউ হতে পারে না মুসলমান ও হিন্দু; কিন্তু নজরুল তাঁর এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। আমি বিস্মিত হই যিনি লেখেন 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়/ আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়', তিনি কী করে লিখতে পারেন 'কালী কালী মন্ত্র জপি বসে লোকের ঘোর শ্মশানে'; 'বল্ রে জবা বল্!/কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল'; 'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল' ও আরো এমন বহু পৌত্তলিক পদ। তিনি কি একই সাথে হতে পারেন খাঁটি মুসলমান, আর কালীভক্ত? অনেকে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেন যে নজরুল দুই সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়েছিলেন; যদি তিনি তাই করে থাকেন তাহলে তিনি মিলন ঘটিয়েছিলেন দুই খারাপের। আমি কি এমন মিলন ঘটাতে পারি? আমি কি আজ আল্লার স্তব লিখে কাল কালীমায়ের পায়ে সঁপতে পারি নিজেকে? নজরুলের কী কোনো বিশ্বাস ছিল? না কি তিনি স্বতঃস্ফূর্ত উদগীরণ করেছেন বিদ্রোহ; আর বাণিজ্যিক প্রেরণায় লিখে গেছেন একই সাথে হামদ, নাত, আর কালীকীর্তন? নজরুলের ইসলামি আর শাক্ত গানগুলো তাঁকে প্রচুর অর্থ এনে দিয়েছিল, আমরা জানি, আর ওই অর্থই হয়তো তাঁকে মাতিয়েছিল কুসংস্কৃত উদ্দীপনায়।

বাঙলা লেখকদের মধ্যে চেতনায় সবচেয়ে আধুনিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; সভ্যতা ও মানুষের বিবর্তন বুঝেছিলেন তিনি ভালোভাবে, এবং ঈশ্বর নামের অলীক ব্যাপারটি ছিল তাঁর কাছে স্পষ্ট। তিরিশের আধুনিক কবিরা অবিশ্বাসী ছিলেন; তবে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটি, শুধু সুধীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যাননি। বারবার ঈশ্বর এসেছে তাঁর কবিতায়, তাঁর ঈশ্বর ঠিক হিন্দু নয়, ঈশ্বর বলতে তিনি মুসার ঈশ্বরকেই বুঝেছেন বেশি। তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, পরিহাস করেছেন, ওই অলীক কল্পনার মূলও দেখিয়েছেন। 'উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা', সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা।' ইউরোপে উনিশশতকের শুরু থেকেই ঈশ্বরের মৃত্যুর সংবাদ রটতে থাকে, যা চরম সংবাদে পরিণত হয় নিটশের 'ঈশ্বর মৃত : গড ইজ ডেড' ঘোষণায়। বহু শতক ধরেই অসুস্থতায় ছিল ইউরোপি ঈশ্বর, নিটশে তার মৃত্যুর সংবাদ সংবাদপত্রের শিরোনামের মতো প্রচার করেন। কিন্তু সে কি অচিকিৎসায় বা বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গেছে? না, তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিটশের *প্রফুল্ল বিজ্ঞান* (১৮৮২) বইটিতে এক পাগল বাজারে গিয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি। আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি।' তার কথা শুনে বাজারের লোকজন হেসে ওঠে; মজা করার জন্যে তারা জিজ্ঞেস করে ঈশ্বর কি হারিয়ে গেছে, না কোথাও লুকিয়েছে, না কি ভ্রমণে বেরিয়েছে? তখন ওই পাগল ঘোষণা করে : 'ঈশ্বর মারা গেছে। ঈশ্বর মৃত। আর আমরাই খুন করেছি তাকে।' সুধীন্দ্রনাথই সম্ভবত প্রথম, বাঙলা ভাষায়, ঈশ্বরের নিহত হওয়ার সংবাদটি দেন।

বেদবেদান্তের পাতা ছিঁড়ে মরুর বায়ে উড়িয়ে দিয়ে একসাথে তিনি বাতিল করেছেন প্যালেস্টাইনি ও আর্য ঈশ্বর। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শূদ্রের অলক্ষ্যভেদে নিহত আমার ভগবান।' এতে মনে পড়ে *মহাভারত*-এর কৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনা। প্রত্যাদেশকেও বাতিল করেছেন সুধীন্দ্রনাথ, এবং পরিহাস করেছেন ধর্মবোধকে। ধার্মিকেরা 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন' তত্ত্বে বিশ্বাসী, যাকে দর্শনে পরিণত করেছেন বহু দার্শনিক, যেমন লাইবনিৎস, আর একে পরিহাসও করেছেন অনেকে, যেমন ভলতেয়ার *কাঁদিদ*-এ দেখিয়েছেন উপদংশও দয়ালু ঈশ্বরের দয়া, মঙ্গলের জন্যেই তিনি দান করেছেন উপদংশ; আর সুধীন্দ্রনাথ গভীর বেদনায় বলেছেন : 'শর্বরীর রুগ্ন মুখ ভরে গেলে মারী গুটিকায়/ভাবিব না উৎসুক আমরা/আমাকে ও-পার থেকে আরত্রিকে আহ্বান পাঠায়।' তাঁর কাছে ভগবান হচ্ছে 'ভগবান, ভগবান, ইহুদির হিংস্র ভগবান',—জিহোভা, ইহুদি মহাপুরুষদের কল্পিত প্রচণ্ড ঈশ্বর, যে ক্ষিপ্ত হয় সহজে, যে এতোই পবিত্র যে তার নাম নেয়াও নিষেধ, তাই তার নাম এমনভাবে বানান করা হয়, **JHWH**, যাতে তা উচ্চারণও করা না যায়। সুধীন্দ্রনাথ প্রচুর ধর্ম আর ঈশ্বর দেখেছেন, তাদের সর্বশক্তির অনেক উপাখ্যান শুনেছেন, কিন্তু তার পরিচয় পাননি। অবিশ্বাসে বলেছেন :

> ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?
> তুমি কি সত্যই
> আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন?
> তপস্ত তপন
> কাহারা-গোবির বক্ষে জ্বলে না কি তোমার আজ্ঞায়?

তাঁর ভগবান সংজ্ঞাটি চমৎকার : আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন। ভারতীয় ভগবানকে তিনি বলেছেন 'যাযাবর আর্যের বিধাতা', আর 'লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান'। ঈশ্বর কার স্বার্থ দেখে? চিরকাল ঈশ্বর বাস করে গরিবের

উঠোনে, আর স্বার্থ দেখে অসুরদের : 'তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে?' বিধাতার ক্রিয়াকলাপ দেখে পরিহাস করেছেন সুধীন্দ্রনাথ :

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।

অগ্রজের অটল বিশ্বাস কিসে? ঈশ্বরে? না, তারা বিশ্বাস করেছে নিজেদের ক্ষমতায়। তারা সৃষ্টি করেছে সর্বশক্তিমানদের, লাগিয়েছে নিজেদের কাজে, এবং নিজেরা রয়ে গেছে কুয়োর ব্যাঙ। সুধীন্দ্রনাথের প্রার্থনা যেন পূরণ করেছে বিধাতা, তাই এখন বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে অটল বিশ্বাসী কূপমণ্ডূকগণ।

৫.১ লেখক-পরিচিতি : হুমায়ুন আজাদ

জন্ম : ১৯৪৭, পিতা : আবদুর রাশেদ, জন্মস্থান ও তারিখ : রাড়িখাল, বিক্রমপুর, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, শিক্ষা-মাধ্যমিক-রাড়িখাল স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৬২ সালে পাশ করেন, ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান (বাংলা) (১৯৬৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা এম.এ (১৯৬৮), পিএইচ.ডি (ভাষাবিজ্ঞান)-এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৬), পেশা অধ্যাপনা। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা—'অলৌকিক ইস্টিমার' (১৯৭৩), জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০), 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে', হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৩), কাব্যসংগ্রহ (১৯৯৮)।

সমালোচনা/প্রবন্ধ : রবীন্দ্র প্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা (১৯৭৩), শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা (১৯৮৩), 'ভাষা আন্দোলন' : সাহিত্যিক পটভূমি (১৯৯০), নারী (১৯৯২), প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নীচে (১৯৯২), 'নিবিড় নীলিমা' (১৯৯২), বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র (১৯৮৩), বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪), তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯৮), অন্যান্য : হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ (১৯৯২), আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা (১৯৯৭)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৬)।

স্বাধীন ও প্রগতিবাদী মতামত প্রকাশের জন্য একাধিকবারই বাংলাদেশের এই অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হিংসার শিকার হয়েছেন।

৫.২ বিষয়-সংক্ষেপ

হুমায়ুন আজাদের আলোচ্য প্রবন্ধটি অসম্ভব আবেদনমূলক। এই আবেদন যতটা না হৃদয়ের কাছে, ততধিক মস্তিষ্কের কাছে। 'বিশ্বাস' শব্দটির বিভিন্ন দিক, বিচিত্র মাত্রা নিয়ে তিনি যেন খেলা করেছেন। মানুষ জন্ম নিচ্ছে, বেড়ে উঠছে পূর্বপ্রস্তুত বিশ্বাসের মধ্যে। বিশ্বাসী হলে প্রশংসা লভ্য। কিন্তু বিশ্বাসী না হলে? সমাজ তাহলে নির্ঘাত বিপদে ফেলবে, যদি জানতে পারে। বিশ্বাস সহস্র বছর ধরে দেখা দিয়েছে মহামারীরূপে। যা সত্য বা প্রমাণিত তাকে বিশ্বাস করতে হয় না, বিশ্বাস করতে হয় অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক বিষয়ে। তাই বিশ্বাস যেন অন্ধকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। অন্ধকার যেমন বস্তুকে অদৃশ্য করে, রহস্যময় করে, বিশ্বাসও তেমনি বরং বিশ্বাস চায় মিথ্যেকে শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে। কথিত আছে প্রাচীন পৃথিবীর মহাপুরুষেরা বহু বিস্ময়কর কাজ করেছেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক মতে সে সব শুধুই তুচ্ছ জাদু, প্রকৃত বিস্ময়কর কাজ করেছে আধুনিক মানুষ।

মানুষ বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না। বরং জন্মের পর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তার ভিতর এগুলোকে ঢুকিয়ে দেয়। সেই অন্ধ বিশ্বাসের বশেই উগ্র ধার্মিকের কাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের সমস্ত কিছুই ঘৃণ্য। তাই হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-ইহুদী সকলেই পরস্পরকে আক্রমণ করছে। বিশ্বাসীরা মনে করে তাদের বিশ্বাস ধ্রুব। কিন্তু লেখকের মতে তা নয়, বিশ্বাসের কোনো শেষ নেই, তা পরস্পরবিরোধী। এগুলোর একটি ধ্রুব হতে পারে, সবকটি নয়। এরপর প্রাবন্ধিক সরাসরি চলে এসেছেন এই বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যকে বুঝতে। তিনি দেখেছেন যে সাহিত্য এই বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। তাই 'সাহিত্য একটি সুন্দর অন্ধকারের এলাকা'। চিত্রকলারও এমনটা ঘটে থাকে। কবি-চিত্রকরেরা অজস্র মিথ্যের সৃষ্টি করেছেন সুন্দর রূপে, যে-মিথ্যে উঠে এসেছে তাঁদের পরিবার ও প্রথা থেকে অর্জিত বিশ্বাস থেকে। কবিতায় যতটুকু অংশ বিশ্বাস থাকে প্রাবন্ধিকের মতে ততটুকু হচ্ছে অ-কবিতা। বিশ্বাসের কবিতা হল ভুল কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো আবেগগত সৌন্দর্য।

কবি রবীন্দ্রনাথ যেন বিশ্বাসের পরমরূপ। তাঁর পিতা ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনিই পরিবারে বহুদেবতাবাদী ধর্ম ছেড়ে একদেবতাবাদী ধর্মের বিশ্বাস ঢুকিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তায় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রথাগত ধর্মের বিশেষ মিল নেই। বিশ্বজগতের রহস্যীকরণের ক্রিয়াটি তিনি সম্পন্ন করেছেন বিচিত্ররূপে এবং একটি শব্দকে এক্ষেত্রে তিনি বারংবার কাজে লাগিয়েছেন, সে হল 'সত্য'। যখনই তিনি তাঁর না-বুঝতে-পারা পরম উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছেন তখনই ব্যবহার করেছেন এ শব্দটা। উদাহরণ হিসেবে প্রাবন্ধিক বেশ কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন, যেমন—

১. "সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই, সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়।" [উৎসব/'ধর্ম']

২. "তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ।" [ওই]

'সত্য' শব্দটি এসব ক্ষেত্রে নিরর্থক, তা সুস্পষ্ট কোনো বোধ প্রকাশ না করে রহস্য ঘনিয়ে তোলে। শেষোক্ত উদ্ধৃতিও তাঁর নিজস্ব নয়, কীট্‌সের 'Beauty is truth, truth beauty'-র রূপান্তর মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ পূজা পর্যায়ের গানগুলিতে এই রহস্যীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। প্রত্যেকটি গানই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের উপর প্রভু বা পরমসত্তায় বিশ্বাস। সেই পরমসত্তাকে তিনি শুধু দয়াময় প্রেমিক হিসেবেই দেখতে চাইতেন

না। একধরনের 'মোহন নিষ্ঠুরতা'-ও চাইতেন তাঁর কাছ থেকে। প্রাবন্ধিকের কাছে এসব হাস্যকর, তবে কবির আন্তরিকতা, আবেগময়তা ও রূপময়তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে বারংবার। কিন্তু তা বলে :

"সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু তোমার আশীর্বাদ"—

এটা কী অকারণ রহস্যীকরণ নয়? প্রাবন্ধিকের মতে সূর্য গ্রহ চাঁদ কারো আশীর্বাদ নয়, বরং এক বিরাট মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফল। তিনি বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ফেইনবার্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "আমাদের চারপাশের পাথরগুলো যতটুকু ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করে, নক্ষত্রগুলো তার থেকে একটুও কম বা একটুও বেশি প্রচার করে না ঈশ্বরের গৌরব।" এগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। গানে অবশ্য শুনতে ভাল লাগে। যাঁর চরণধূলায় 'ধূসর' হতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কাছে সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে, তাকে কি শেষপর্যন্ত লাভ করেছিলেন তিনি? না কি শুধুই প্রথাগত বিশ্বাস? 'পত্রপুট'-এর ১৫ নং কবিতায় বসে তিনি যেন স্বীকার করলেন :

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
আজ আপন মনে ভাবি,
কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'

এরপর বিংশ শতাব্দী কিন্তু ক্রমশ এইসব বিশ্বাস আর রহস্যকে বাদ দিয়েছে, তাতে কিন্তু এটি মরুভূমি (waste land) হয়ে ওঠেনি, হয়েছে সৎ। প্রাবন্ধিকের মতে এর থেকে সৎ শতাব্দী আর নেই। দু-দুটো মহাযুদ্ধ ও বহু রোগে আক্রান্ত বিশশতক তাঁকে যা দিয়েছে তা আর কোনো শতক দিতে পারে না। প্রসঙ্গত এলিয়টের কবিতার অনেকখানি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, 'The Rock' নাটকের অনেকখানি অনূদিত করেছেন। তবে খুব কম হলেও রহস্যীকরণ রয়েছে সেখানেও। "আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার" একে সত্য বলে মানা যায় না। কেননা জ্ঞান চিরদিন আমাদের অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করেছে। এলিয়টে যে হারিয়ে যাওয়া জীবন-প্রজ্ঞা-জ্ঞানের কথা বলেছেন তা কিংবদন্তী মাত্র। ওসবের থেকে বিংশ শতাব্দীর জীবন-প্রজ্ঞা-জ্ঞান অনেক উন্নত।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচীন মহাকবি দান্তের 'দি ডিভাইন কমেডি' যে বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, প্রাবন্ধিকের মতে তা শিশুসুলভ ও হাস্যকর। এর রূপকার্থ—'পরমসত্তার সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মার মিলন।' বিশ্বাস সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়। তাঁর সৃষ্ট নরকের পীড়নের কোনো তুলনা পাওয়া যায় না, বরং কিছুটা প্রাবন্ধিক পান হিটলারের বন্দী শিবিরের সঙ্গে। কৈশোরে তিনি বিয়াত্রিচে নামের এক নারীর পবিত্র সুন্দর মুখ তিনি দেখেছিলেন যা আজীবন তাঁর কাছে শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এই শুদ্ধতাও যেন এক কৌতুককর বিষয়। সবই কি অমলিন, শুদ্ধ হতে পারে? এটাও তো বিশ্বাসেরই ব্যাপার। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাল বিষয় হতে পারতেন দান্তে, কী উন্মদনাতেই না ভুগতেন তিনি। ফ্লোরেন্সের বিয়াত্রিচের মধ্যে না কি একাকার হয়ে ছিল খ্রিস্টীয় উপাসনালয়, মা মেরি আর ক্রাইস্ট স্বয়ং।

বাঙালি লেখকদের লেখা পড়বার সময়ও বিব্রত বোধ করতে হয় বারংবার কেননা তাঁদের মধ্যেও শোচনীয়ভাবে লেখকেরও বিদ্রোহী বলে মনে হয়েছিল। "কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান"। প্রচুর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে উদাহরণের পর উদাহরণ সাজিয়ে। রবীন্দ্রনাথ করতেন রহস্যীকরণ, নজরুলে তা নেই, তবে তাঁর বিশ্বাসও সন্দেহজনক। তিনি তাঁর এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে যাতায়াত করেছেন আগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। তিনি লেখেন 'আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়"। তিনিই লেখেন 'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল'! অনেকে মনে করেন, এ হল দুই সংস্কৃতির মিলন, লেখকের মতে এ দুই 'খারাপের' মিলন।

বাঙালি লেখকদের মতে চেতনায় সবচেয়ে আধুনিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিরিশের যুগের আধুনিক কবিরা ছিলেন অবিশ্বাসী; 'ঈশ্বর' নামক অলীক ব্যাপারটি তাঁরা এড়িয়ে গেছেন, অথচ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ঈশ্বর বারংবার এসেছে; ঠিক হিন্দু হয়ে নয়। তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এ জাতীয় অলীক কল্পনার উৎসমূলও দেখিয়েছেন। ইউরোপে ১৯ শতকের শুরু থেকেই ঈশ্বরের মৃত্যু সংবাদ রটতে থাকে। সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথই প্রথম, বাংলা ভাষায় ঈশ্বরের নিহত হওয়ার সংবাদটি দেন :

'উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্ত পাতা
বলেছি পিশাচ হয়ে নিহত বিধাতা।'

সুধীন্দ্রনাথের ভারতীয় ভগবান হলেন 'যাযাবর আর্যের বিধাতা' আর সামগ্রিক অর্থে 'আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন'। ঈশ্বরে নয়, তিনি বিশ্বাস করেছেন আপন ক্ষমতায়। তাঁর এই দৃঢ়, ঋজু মনোভাবই প্রাবন্ধিককে চমৎকৃত করেছে।

৫.৩ ভাবনা-বিশ্লেষণ

পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ জন্মেই দেখেছে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে পূর্ব নির্ধারিত বিশ্বাসের জগৎ। 'বিশ্বাস'— এ এমন এক শব্দ যা মানুষকে তথা দেশ-কাল-সমাজকে ক্রমশ পিছনের দিকে আকর্ষণ করছে, যারা বিশ্বাসী, তারাই প্রথাগতভাবে ভাল মানুষ, সৎ মানুষ। আর যারা অবিশ্বাসী, সমাজ তাদের বেঁচে থাকবার পক্ষে মারাত্মক। যদি প্রশ্ন ওঠে, কাকে বলে বিশ্বাস? উত্তর হল, যা কিছু বাস্তব বা প্রমাণিত সত্য তাতে বিশ্বাস করতে হয় না। অসত্য, অপ্রমাণিত বা কল্পিত ব্যাপারে আস্থা পোষণই হচ্ছে বিশ্বাস! তাই বিশ্বাস মানেই যেন আলোর বিপরীত দিক; অন্ধকারের আত্মজ বিশ্বাস।

মানুষ যত বিশ্বাস পোষণ করে তার প্রথম ও প্রধান উৎস হল পরিবার। তারপর সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা। মুসলমান পরিবারে জন্ম নিলে প্রথম তার ভেতরে ঢুকবে মুসলমানীয় বিশ্বাসগুলো, হিন্দু-পরিবারে জন্ম নিলে হিন্দুর বিশ্বাস ইত্যাদি। সুতরাং বিশ্বাস সহজাত নয়, তা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক। কোনো বিশ্বাসই পবিত্র-ধ্রুব হতে পারে না। বস্তুত 'পবিত্র' শব্দটিই নিরর্থক বা আপেক্ষিক। একজনের কাছে পবিত্র, অন্যজনের কাছে তা ঘৃণ্যও হতে পারে। যেমন ধার্মিক হিন্দু মুসলমানের পবিত্র গৃহ পোড়াতে দ্বিধা করে না, বা ধার্মিক মুসলমান হিন্দুর পবিত্র দেবমূর্তিকে অকুণ্ঠায়

পদদলিত করে। বিশ্বের রহস্যীকরণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে ধর্ম এবং *সাহিত্য*—একথা শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কেননা বিশ্বসাহিত্যের বড় অংশই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর। রবীন্দ্রনাথকে লেখকের মনে হয়েছে বিশ্বাসের পরম রূপ। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বাস পোষণ করেছেন তা তাঁর ভেতর থেকে উঠে আসেনি, এসেছে পরিবার থেকে এবং তাকেই তিনি জীবনভ'র সাজিয়েছেন উপনিষদের বহু সুন্দর মিথ্যেয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথ পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন না করলে হয়তো তিনিও থেকে যেতেন বহুদেবতাবাদী। বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে বারংবার রবীন্দ্রনাথ একটি শব্দকে ব্যবহার করেছেন—'সত্য'। প্রাবন্ধিকের মতে—'সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালবাসিলাম বা 'সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে' ইত্যাদি উক্তিতে কবিতা কম, বিভ্রান্তি বিপুল। আবার বাস্তবকে তার নিজস্ব রূপে না দেখে রহস্যের প্রকাশরূপে দেখতেই তাঁর ভাল লাগত। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন : "উক্তিটি জাগ্রত। সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায়।"

['শান্তিনিকেতন'/রবীন্দ্ররচনাবলী১৩]

প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন যা হতে, পারত শুধুই 'আলো' তা অকস্মাৎ 'ঈশ্বরের আলো' কেন? এমন অকারণ রহস্য তাঁর পূজাপর্যায়ের গানেও খুব পাওয়া যায়। যেমন—

'সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ।'

কবি কি বোঝেননি যে সূর্য গ্রহ চাঁদ কারো আশীর্বাদ নয়। এসব হল এক 'বিশাল মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফল'। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হেরেইনবার্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"আমাদের চারপাশের পাথরগুলো যতটুকু ঈশ্বরের
গৌরব প্রচার করে, নক্ষত্রগুলো তার থেকে একটুও
কম বা একটুও বেশি প্রচার করে না ঈশ্বরের গৌরব।"

এরপর প্রাবন্ধিক এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, যাঁর চরণধুলার তলে মাথা নত রাখতে চেয়েছেন কবি, যে- সুন্দর নিষ্ঠুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, শেষপর্যন্ত কি পেয়েছিলেন তাঁর দেখা? হয়তো পাননি। তাই 'পত্রপুট' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতায় (ব্রাত্য') কবির স্বীকারোক্তি—'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।'

যৌবনে উপনীত হয়েই প্রাবন্ধিক বিশ্বসাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থ পড়েন। বহুক্ষেত্রে প্রথাগত বিশ্বাসের ছোঁয়া থাকলেও এলিয়টের কবিতার অপেক্ষাকৃত কঠিন বাস্তবতা তাঁর ভাল লেগেছিল। সেই এলিয়টের মতে চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে। প্রাবন্ধিকও মুগ্ধ দান্তের কবিত্বশক্তিতে। কিন্তু অস্বীকার করেন তাঁর মধ্যযুগীয় বিশ্বাসগুলোতে। যেমন, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি। দান্তের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে বেশি 'জানত' না; যতটুকু জানত তাও শিখেছিল টলেমির বইপত্র থেকে যা ষোড়শ শতকীয়। যে-মত দান্তের দুশো বছর পর বাতিল করে দেন কোপার্নিকাস।

অন্যদিকে বাঙালি লেখকদের লেখা প্রাবন্ধিককে বিব্রত করেছে বারংবার, কেন না এঁদের লেখায় তেমন কোনো মৌলিকত্ব খুঁজে পাননি তিনি। যেমন, নজরুল তাঁর কাছে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত' লেখক। তাঁর লেখায় বাঙালি

মুসলমান প্রগতিশীলেরাও বিদ্রোহী রূপ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু প্রাবন্ধিক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে নজরুল ইসলাম অন্ধ। তিনি যুগপৎ দুই বিশ্বাসের মধ্যে যাতায়াত করেছেন, হিন্দু-বিশ্বাস থেকে মুসলমান বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পূর্বতনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, তেমনি বিপরীতক্রমও ঘটেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধ শেষ হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা উল্লেখে। চেতনায় তিনিই সবচেয়ে আধুনিক। তিরিশের যুগে তাঁর সমকালীন কবিরা ছিলেন অবিশ্বাসী, 'ঈশ্বর' নামক অলীক বিষয়টি তাঁরা এড়িয়ে গেছেন সচেতনে। অথচ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ঈশ্বর বারংবার এসছে। কেন? না, তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এ জাতীয়, অলীক কল্পনার উৎসমূলও দেখিয়েছেন। ইউরোপে উনিশ শতকের শুরু থেকেই ঈশ্বরের মৃত্যুসংবাদ রটতে থাকে। সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথই প্রথম, বাংলা ভাষায় এই খবরটি দেন।

সুধীন্দ্রনাথের ভারতীয় ভগবান হলেন 'যাযাবর আর্যের বিধাতা' আর সামগ্রিক অর্থে 'আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন'। ঈশ্বরে নয়, তিনি বিশ্বাস করেছেন আপন ক্ষমতায়।

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. আবুল ফজলের মতে সাহিত্যের সাধনার পথ হওয়া উচিত, তা তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে নিজের বিশ্লেষণ সহ লিখুন।

২. পাঠক তথা মানুষের জীবনে সাহিত্যের ভূমিকা বা গুরুত্ব কতদূর অবধি বিস্তৃত, সে বিষয়ে আবুল ফজলের 'সাহিত্যের পথ ও সাধনা' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখুন।

৩. আহমদ শরীফের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধের উপজীব্য ভাববস্তুটির বিশ্লেষণ করুন।

৪. বাস্তবতা ও কল্পনাসর্বস্বতা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন কীভাবে সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটি আহমদ শরীফের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৫. পুঁজিবাদী সমাজে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, বদরুদ্দীন উমরের 'সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখুন।

৬. বদরুদ্দীন উমরের 'সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য' প্রবন্ধটির মূল ভাববস্তু নিজের ভাষায় পুনর্নির্মাণ করুন।

৭. আনিসুজ্জামানের 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধটির মূল উপজীব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালি মুসলমান লেখকদের অবদান বহুকাল আগে থেকেই প্রত্যক্ষ হলেও, উত্তর-আধুনিক যুগ পর্যন্ত এসে তাঁরা নিজেদের বিবর্তিত স্বরূপকে কীভাবে সন্ধান করেছে আনিসুজ্জামানের সেটি 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখুন।

৯. হুমায়ুন আজাদের 'বিশ্বাসের জগত' প্রবন্ধটিতে বিশ্বাস শব্দের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক যে দিকগুলির প্রতি লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন, সেগুলির তাৎপর্য বিচার করুন।

১০. হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের বিশ্বাসের জগতের পরিচয়দানের পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের জগতের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

('সাহিত্যের পথ ও সাধনা')

১. সাহিত্যিক ও শিল্পীর জন্য "বে-হিসেবীয়ানা তথা বেপরোয়া ভাব" একটি প্রধান শর্ত বলে সত্যিই কি গণ্য হতে পারে?

২. সাহিত্যকে কি "বিলাসের বস্তু" হিসেবে বাস্তবিকই গণ্য করা চলে?

৩. "মনুষ্যত্বের সাধনাই সাহিত্যের সাধনা"—একথা কতটা ঠিক?

৪. "মানুষের জীবন" আর "জঙ্গল-জীবন" কখন এক হয়ে যায়?

('সাহিত্যের স্বরূপ')

৫. "সব রচনা সর্বজনগ্রাহ্য সাহিত্য হয় না" কেন?

৬. "সাহিত্যে বাস্তব-অবাস্তব, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, বা গণ-বুর্জোয়া বলে কোন বিশিষ্ট ধারা নেই"—একথা কতদূর সত্য?

৭. "ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত কল্পনা অসম্ভব" কেন?

৮. কবি হিসেবে ইয়েট্‌স, রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট ও ইকবাল—কে কোন্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন?

('সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য')

৯. "শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ইতিহাসের কোন বিন্দুতে স্থির থাকে না" কেন?

১০. সংস্কৃতি ও শ্রেণিসংগ্রাম কেন অবিচ্ছিন্ন থাকে?

১১. সংস্কৃতির চর্চা, সাধনা ও সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপটি কী?

১২. রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্নতা কখন প্রত্যক্ষ করা যায়?

('স্বরূপের সন্ধানে')

১৩. উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বৃহদংশের আপত্তি কোথায়, কেন ছিল?

১৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদ নাজিবর রহমান, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং নজরুল ইসলামের রচনা সম্পর্কে কী-কী অভিযোগ করা হতো?

১৫. মাইকেল মধুসূদনকে "পাকিস্তানের মহাকবি" আখ্যা কে, কেন দিয়েছিলেন?

১৬. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব কে, কেন করেছিলেন?

('বিশ্বাসের জগত')

১৭. "পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী মহামারীর নাম বিশ্বাস" কেন?

১৮. বিশ্বাসের বিভিন্ন উৎসগুলি কী-কী?

১৯. ধর্ম কীভাবে "বিশ্বের রহস্যীকরণে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে ধর্ম"?

২০. দান্তের নরক-কল্পনার সঙ্গে কিসের-কিসের, কেন তুলনা করা চলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

('সাহিত্যের পথ ও সাধনা')

১. মন ও মননশীলতাকে ধারাবাহিকভাবে কারা বাঁচিয়ে রাখেন?

২. মানুষের "অন্নের উপর অন্য" কী দরকার হয়?

৩. "মানুষের মন কতরকম ভূতের আড্ডা"?

৪. মানুষ ও দেবতা-বা-ফেরেশতাদের সম্পর্ক কী?

('সাহিত্যের স্বরূপ')

৫. "মানুষের সব কর্ম চিন্তা ও কামনা, বাসনার মধ্যে" কী রয়েছে?

৬. "রসের তারতম্য দিয়ে" সাহিত্যের কী বিচার করা চলে?

৭. "মন ও মননের পার্থক্যবশত" কী ঘটে?

৮. "কোনো বিষয়বস্তুই সাহিত্যে নিরর্থক নয়" কে কোথায় বলেছেন?

('সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য')

৯. "অজন্তা ইলোরার চিত্রকর্মের সম্পর্ক" কিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ?

১০. "অবসরের অধিকারী" কারা?

১১. "উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত" শ্রেণির মানুষদের দিকে কেন তাকাতে হয়?

১২. "বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতীত-কোনো বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না" একথা কে বলেছিলেন?

('স্বরূপের সন্ধানে')

১৩. কোন্ "ক্লাব ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন" হওয়ায় কে কবিতা লিখেছিলেন?

১৪. ১৯৪২ সালে কোথায়-কোথায়, কী-কী সাহিত্য-সংগঠন গড়ে উঠেছিল?

১৫. 'Poems from East Bengal' কে সম্পাদনা করেছিলেন?

১৬. "বর্ণতিরু" কে উদ্ভাবন করেছিলেন?

১৭. পূর্ব-পাকিস্তানে কথাসাহিত্যের কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বেশি ঘটেছিল?

১৮. "বাঙলার বর্তমান বর্ণনার আবর্জনা আমরা রাখবো না"—কার উক্তি?

('বিশ্বাসের জগত')

১৯. "আদম-হাওয়ার স্বর্গচ্যুতি নিয়ে মহাকাব্য" কে লেখেন?

২০. "পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞানসাধকের সংগ্রামের কথা" কার, কোন্ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়?

২১. "দেবতা বা বিধাতাদের বয়সের থেকে" বেশি প্রবীণ কে?

২২. "পবিত্রতার বোধ উঠে আসে" কোথা থেকে?

২৩. "প্রধানত অপবিশ্বাসের জগত" কোনটি?

২৪. "বিশ্বজগতের রহস্যীকরণ প্রক্রিয়া" কার, কোন ধরনের গানে "চূড়ান্ত রূপ" পেয়েছে?

২৫. 'ব্রাত্য' কোন্ কবিতার নাম হতে পারে?

২৬. "April is the cruelest month" কে লিখেছেন?

২৭. 'স্বর্গীয় মিলন' কার রচিত?

২৮. নিজেকে খ্রিস্টান বলতে অস্বীকার করেছিলেন কে?

২৯. বিয়াত্রিচে কে ছিলেন?

৩০. দান্তের মতো হবার ক্ষেত্রে মধুসূদনের কিসের-কিসের অভাব ছিল?

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

'বাংলাদেশ : সংস্কৃতি ও সাহিত্য' ☐ ক্ষেত্র গুপ্ত; কলকাতা, ২০০১

'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ☐ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; কলকাতা ১৯৮৭

'বাংলাদেশের উপন্যাস : চার দশক' ☐ কল্যাণ মিরবর; কলকাতা, ১৯৯২

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্' ☐ আবদুল মান্নান সৈয়দ; ঢাকা, ১৯৮৬

'একুশে ফেব্রুয়ারী' ☐ সম্পাদনা : জিয়াদ আলী; কলকাতা, ১৯৮০

'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা' ☐ সম্পাদনা : নির্মল দাশ; কলকাতা, ১৯৯৪

'বাংলাদেশের সাহিত্য' ☐ বিশ্বজিৎ ঘোষ; ঢাকা, ১৯৯১

'পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা' ☐ সঈদ-উর-রহমান; ঢাকা, ১৯৮৩

'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা' ☐ সম্পাদনা : রামেন্দু মজুমদার; ঢাকা, ১৯৮৬

'রাজনৈতিক চেতনা, বাংলাদেশের কবিতা' ☐ আমিনুর রহমান সুলতান; ঢাকা, ১৯৯২

'বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ' ☐ রফিক উল্লাহ খান; ঢাকা, ১৯৯৭

'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা' ☐ সুকুমার বিশ্বাস; ঢাকা, ১৯৯৮

পর্যায় 4

পিজিবি : ৭(গ)

বাংলাদেশের সাহিত্য

পর্যায়
৪

একক ১ : শকুন

একক ২ : পরীবানুর কাহিনী

একক ৩ : একটি তুলসীগাছের কাহিনী

একক ৪ : মাটির আদম

একক ৫ : পরজন্ম

একক ৬ : একটি দিন

একক ৭ : তাস

একক ৮ : সাদা কফিন

একক ৯ : অপঘাত

একক ১০ : লোকটি রাজাকার ছিল

একক ১১ : প্রশ্নাবলী

একক ১ ❑ শকুন

মূলগল্প :

কয়েকটি ছেলে বসেছিল সন্ধ্যার পর। তেঁতুলগাছটার দিকে পিছন ফিরে। খালি গায়ে ময়লা হাফশার্টকে আসন করে। গোল হয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করছিল। একটা আর্তনাদের মতো শব্দে সবাই ফিরে তাকাল। তেঁতুলগাছের একটা শুকনো ডাল নাড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে, সোঁ সোঁ শব্দে একটা বিরাট কিছু উড়ে এলো ওদের মাথার ওপর। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে গভীর নিকষ একতাল সজীব অন্ধকারের মতো প্রায় ওদের মাথা ছুঁয়ে সামনের পোড়ো ভিটেটায় নামল জিনিসটা।

হৈ চৈ করে উঠল ছেলেরা, ছুটে এলো ভিটেটার কাছে। আবছা অন্ধকারে খানিকটা উঁচু মাটি আর অন্ধকার একটা ঝোপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। কিন্তু ওদের সর্দার ছেলেটি বুঝতে পারল হামেশা দেখা যায় এমন পাখিদের মধ্যে শকুনই তীব্রবেগে মাটিতে নেমে তাল সামলানোর জন্য খানিকটা দৌড়ে যায়। তাই তার চোখেই প্রথম পড়ল অন্ধকারের তালটা দৌড়তে দৌড়তে খানিকটা এগিয়ে বিরত, হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেটি বলল, ভয়চকিতস্বরে। কিরে ওটো? আর একজন জবাব দিল, মুটেই বুঝতে পারচি না।

পাখি ওটো।

পাখি-টাখি হবে।

ক্যা জানে, সজেব্যালায় ক্যার মনে কি আচে? সে বুকে থুথু দিল। অনড় হয়ে রয়েছে অন্ধকারের দলাটা। লুকিয়ে যাওয়ার একটা ভাব, পারলে কোনো বহু পুরনো বটের কোটরে, কোনো নোংরা পুরীষর গন্ধের বিকট আবাসে, কোনো নদীর তীরে চেনাঝোপের নীচে শেয়ালের তৈরি গর্তে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব।

শ্যালা। ক্যারা মনে কি আচে, ক্যা কি চায়, ক্যার ড্যাকে ক্যা আসে। চ' বাড়ি যাই।

দলের মধ্যে গোরু চরানো রাখাল আছে। স্কুলের ছাত্র আছে। স্কুলের ছাত্র অথচ সুযোগ পেলেই গোরু চরায়, ঘাস কাটে, বীজ বোনে এমন ছেলেও আছে।

তু তো ভীতু, দ্যাখলাম একটো জিনিস, শ্যায পর্যন্ত দেখি দাঁড়া।

না, আমি চলে যাব।

তু যা গা তবে, আমরা যাব না।

ক্যারে বাড়ি যেচিস, তেঁতুলতলাটা পার হয়ে মজা দ্যাখগা। স্কুলে পড়ে সেই ছেলেটি বলল, জিনিসটো দেখতে হবে।

প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বড় ছেলেটা এগিয়ে গেল। অতি সন্তর্পনে পা টিপে টিপে।

এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত সুন্দর জিনিসের বিরুধে বিদ্রোহের মতো সেই কুৎসিত জীবটা।

সর্দার ছেলেটি জানত, সেটা একটা বুড়ো শকুনি। নির্বাক, নিরুদম, নিরুৎসাহ।

একেবারে কাছে এগিয়ে গেল সে। এত কাছে যে হাত বাড়ালে ধরা যায়।

শ্যালা, ক্যার মনে কি আচে, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—রাখালটা তখনও বিড়বিড় করছে।

একটা দমকা বাতাসে অজস্র শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। পুকুরের পানিতে প্রথম মৃদু কম্পন, তারপর আস্তে আস্তে ঢেউ উঠল—কার হাত থেকে কোথায় ধাতব কিছু পড়ে বিশ্রী অস্বস্তিদায়ক একটা শব্দ হলো।

ছেলেটা একদম কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল সত্যিকারেই সেটা একটা শকুনি-আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফিরতে পারেনি। এখন রাতকানা। বিকট উগ্র একটা দুর্গন্ধ ওর নাকে এলো—ভাগাড়ের আঁশটে গন্ধ মাখানো, গলিতজন্তুর শবদেহের পচা পাঁকে সে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। শকুনি কুকুরে লড়াইয়ের শেষচিহ্ন এখনো একটা ছিটকে বেরিয়ে আসা মোটা খসখসে, নোংরা পালক থেকে টের পাওয়া যায়।

মারামারি করেচে শালা ঠিক সারা দোপরবেলা। এখন ধুঁকচে। পলটু এগিয়ে এলো। পিছু পিছু জামু, এদাই। আরও অনেকে যারা ছিল।

পলটু বলল, শিকুনি লয়?

হ্যাঁ দেখতে পেচিস না?

মোল্লা শিকুনি লয় তো?

বোধহয় মোড়ল শিকুনি।

রাখাল জামু বলল, মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ!

সর্দার রফিক বলল, তু তো গোরু। তাই গোরুর মতন কথা বলিস।

শকুন তখনো দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ হয়ে। বোধহয় সে পছন্দ করছে না এই বিরক্তকর ক্লান্তিজনক পরিস্থিতি। রফিক হাঁক দিল, আয় খানিক মজা করি-আর নাচাই খানিকটো ওটোকে।

হৈ হৈ করে উঠল ছেলের দল। বাড়ি যাবার ইচ্ছা অথচ ভয়ে তেঁতুলতলাটা পার হতে পারছে না সেই যে ছেলেটি, সেও চেঁচিয়ে উঠল।

রফিক এগিয়ে শকুনির ডানা ধরে ফেলল। ততক্ষণে চেতে উঠল কুৎসিত পাখিটা, অত সহজে সে ধরা দিতে চায় না। নোংরা বিরাট দুটো পাখা মেলে বিচ্ছিরি খেওয়ালা পা দুটো চরম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালিয়ে দৌড়তে শুরু করল সে গাঁয়ের সরু গলিটার মধ্যে দিয়ে।

এইভাবেই ওরা ওড়বার প্রস্তুতি নেয়, ভারমুক্ত করবার চেষ্টা করে নিজেকে। বোধহয় সে শেষ পর্যন্ত উড়তে পারত—অন্তত মুক্তি পেত এই অসহনীয় শিশুদের হাত থেকে—তাদের হিংস্র কৌতূহল আর প্রাণান্ত খেলার খপ্পর থেকে। কিন্তু তার চোখে দৃষ্টি নেই—চলার কোন সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নেই। শকুনিটার মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। পেছনে পেছনে একদল খুদে শয়তানের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ ছেলের দল নিষ্ঠুর আনন্দে ধাওয়া করেছে।

কিন্তু পাখিটা পার হতে পেরেছে অন্ধকার গলিটা। কারণ গলিটা কানাগলি নয়। গলির দু'পাশের দেয়ালের ফুটোয় যে সাপগুলো গ্রীষ্মের গরমে গলা বের করে থাকে ও প্রতীক্ষা করে—যদি তারা সেই অবস্থায় থাকত তাহলে নিশ্চয়ই মাথা আবার গুটিয়ে নিয়েছে।

কুলতলার পাশ দিয়ে, আরো দুটো পোড়ো ভিটের ওপর দিয়ে, হাড়গোড় জড়ো করা টুকরো জমিটার নীরস আর্তনাদ উপেক্ষা করে জীবটা অনবরত ডানা মেলে ওড়বার চেষ্টা করছে, আরো দ্রুত দৌড়চ্ছে, আরো শক্তি ব্যয় করছে, আরো পরিষ্কারভাবে পথ চিনতে চাচ্ছে—পালাতে চাচ্ছে। কিন্তু সে নিস্তেজ, উপায়হীন। আক্রমণ করতে জানে না। দারুণ রোষে ছেলেদের দলের মধ্যে পড়ে তীক্ষ্ণ ঠোঁটে এদের খেলার আয়োজন বন্ধ করে দিতে পারছে না। তাই সে পালাচ্ছে। আর একটা দমকা জীবন তার পিছে পিছে তাড়া করেছে।

চিৎকার করে কে আর্তনাদ করে উঠল। তার পায়ে শুকনো হাড়ের সুক্ষ্মদিক ফুটে গিয়েছে।

আচ্ছা, উ বসে থাকুক, শকুনিটোকে ধরবুই। চেঁচিয়ে বসে উঠল রফিক।

হাঁ, তু বোস, আমরা ওটোকে ধরবুই।

নাইলে তু বাড়ি যা।

এঃ লউ পড়ছে যি।

যাকে লেগেছে সেই বলল, পড়ুক গা। বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার ছুটল। সামনেই একটা এঁদো ডোবা। মোড় ফিরেই মাটি ছাড়ল—উড়ল সে। কিন্তু বড় ইতস্তত বড় বিব্রত ও অনিশ্চয় তার পদসঞ্চালন। হয়ত হাঁফ ধরে গিয়েছে, হয়ত ক্লান্ত হয়েছে সে। হয়তা দিকনির্ণয় করতে পারেনি। সে পড়ল ডোবাতে। পানি ছিটকে নোংরা মোটা পানির ঢেউ তুলে—যেগুলো আঁধারে চকচকে চোখে চেয়ে রইল—প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে আঘাত করল তীরে।

অজান্তে আরো কিছু মাটি মিশল পানিতে।

একটি কদর্য-কিন্ন জীব হিঁচড়ে উঠল ওপাড়ে।

পরিবর্তিত, ভিজে, ধুলিকীর্ণ।

ছেলেরা দৌড়ে এসেছে এপাড়ে।

গ্রামের ঘনবসতি পাৎলা হতে হতে এখানে ছিটিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার স্তুপের মতো হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। একান্ত সহজ বুদ্ধিতে ফাঁক-ফোকর দিয়ে জন্তুটা পড়ল মাঠে। খোলা বিস্তৃত মাঠ।

প্রাণভরে শক্তির শেষ সীমানা পর্যন্ত দৌড়বার বিস্তারে।

ছেলেরা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তারাও হাঁফিয়ে উঠেছে।

শালা কত দড়বি দড়-যিখানে যাবি চ'।

আর লয় মানিক, আর লয়।

তুমার ইবার হয়ে আলচে।

অকে ধরবুই আজ।

হাঁ, ধরবুই।

এবার আল টপকে উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো জমি পেরিয়ে পগার আর শিশুশস্যের ওপর দিয়ে-শেয়াকুলের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মরণ প্রতিজ্ঞায় ক্ষেপে উঠল ছেলের দল।

এদাই জিগ্‌গেস করল রফিককে, কি করবি উটোকে ধরে?

কিছু করব না, শুধু ধরব।

তা'পর?

হুঁ।

হুঁ ক্যানে, তা'পর কি করবি?

এগু ধরে তা'পর অন্য কাজ।

কেউ আর কথা বলছে না। বলতে পারছে না। সব ভূতের মতো অন্ধকারে চলন্ত চঞ্চল বিভীষিকার মতো ছুটছে।

দক্ষিণ দিকের বাতাস গায়ে লাগছে না। দূরে বাবলাবনের পাশে আমের পাতা ভাঙার মড়মড় মসমস শব্দ কানে আসছে না।

কিংবা শেয়ার ডেকে উঠল, কি ঝিঁ ঝিঁ একটানা, সিমেন্টের মেঝেতে পাথর ঘষার মতো শব্দ করছে, কি প্রতি পদক্ষেপে পায়ের নীচের নাড়া গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—অন্ধকার ঘনতর হয়েছে এসব কিছুই না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই ধরে ফেলল ওকে। আঁকড়ে, জাপটে, দুমড়ে ধরে ফেলল শকুনিটাকে। তারা বুক দিয়ে অনুভব করল হাঁপরের মতো ফ্যাসফেসে শূন্য শব্দ উঠছে ঐ জন্তুটার যন্ত্রের ভিতর থেকে। দীর্ঘশ্বাসের মতো—ফাঁপা, শূন্য, ধরা পড়ার, ক্লান্তির, ক্ষোভের।

ছেলেগুলোর কৌতূহল, আধিক্যের নিষ্ঠুর তুষ্টির, তৃপ্ত ক্লান্তির, সম্ভাব্য পীড়ন দেওয়ার উত্তেজনাকর বক্ষস্পন্দন পাখিটা অনুভব করতে পারল কি?

সেই, সেটোই বটে তো?

যেটোর পেছু পেছু এ্যালোম এটো সেই শিকুনিটেই বটে তো?

ক্যানে, পেত্যয় হচে না তোর?

কি জানি ক্যামন পারা লাগচে।

যেটা দৌড়ে আসছিল, যেটা পালিয়ে আসছিল সেটা এখন থেমে গিয়েছে, দাঁড়িয়ে গিয়েছে, যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

ক্যামন ভকভক করে বই বেরুইচি দেখচিস?

বই কিরে, বল দুর্গন্ধ।

তাতে বই কমচে কি?

অর্থাৎ দুর্গন্ধ কমছে কি?

ভিজে গিয়ে চিমসে গন্ধ ছাড়ছিল শকুনটি। জমাট গন্ধ তরল হয়ে এসেছে। গলা গলা দম আটকানো গন্ধ।

রফিক বলল, লে এ্যাখন ধর এটোকে-ঠৌটটো ধরতে হবে না-দোম বন্ধ হয়ে যাবে।

রাখালটা এগিয়ে এলো, সালাকে আমি ধরব। পীরিত ক্যাকে বলে দেখবি শালা।

একদিকে জামু আর একদিকে রফিক ছড়িয়ে মেলে ধরল শকুনির বিশাল শক্তিহীন পাখাদুটো।

কি পেল্লাই ড্যানা রে—আট দশ হাত হবে।

গোটানো ঘনবুনুনির পালক মেলে গেল। বুনট যেন পাতলা হয়ে এলো। স্তরে স্তরে সাজানো পালক পাশাপাশি চওড়া হয়ে কারকিত করা গালিচার মতো বিছিয়ে যাওয়ার কথা-কিন্তু শকুনিটা ভিজে গিয়েছে, ধুলো লেগে গুটিয়ে গিয়েছে তার পালক। এখন তাই অনেক ফাঁক-পাশাপাশি পাখনা অনেক ছিটানো ছিটানো। দুই ডানা অসহায়ভাবে, নিরুপায়ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল শকুনিটা।

এবার দ্বিতীয় দফা দৌড়। প্রত্যাশার পিছু পিছু নয়। প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। অকারণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। আত্মতৃপ্তির নিষ্ঠুরতা।

দড় দড়-লেঙগুর তুলে দড়।

শকুনির পা পারে না অত জোরে তাল দিতে। কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়। পা না হয় মাটিতে পড়ছে না। ছেলেদের দৌড়ের গতিই টানছে তাকে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।

এ্যাদা, মুখটো ঠুকে গেল। কি টেনে লিয়ে যেচিস দ্যাক, মরে গেল লিকিন দ্যাক, এগু।

ক্যার গরজ কেঁদেছে দ্যাখবার। মরাটোকেই টানব।

ভয়ানক হুল্লোড় করে ওরা দৌড়চ্ছে এই টানার পিছু পিছু। চেঁচাতে চেঁচাতে। ভারি মজা পেয়ে। অদ্ভুত রকমের খেলা পেয়ে। কি লাভ?

লাভ?

লাভ তোকে দেখে লোব—তু তো শকুনি, তোর পায়ে গন্ধ, তু ভাগাড়ে মরা গোরু খাস, কুকুরের সাথে ছেঁড়াছিঁড়ি করিস—তোকে দেখে অমন লাগে ক্যানে?

ছেলেদের কথায় শকুনিটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে—মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনির খাদ্য-তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের বিকৃত গন্ধভরা নোংরা পালকের মতো-সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুনি বলে কেন। আর এই কিছুক্ষণ আগে সে যে শূন্য নিশ্বাস ফেলল, কেন তা তাদের বাপমায়ের দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শোনালো। কেন মনে হয় শকুনিটার বদহজম হয়েছে। যে ধূসর রঙটা দেখলেই মনটা দমে যায় তার সঙ্গেই এর রঙয়ের এত মিল থাকবে কেন। প্রায়-জীবন্ত, অপরাধ করে ফেলে দেওয়া যে শিশুগুলোকে গর্তে, খানা-ডোবায়, তেঁতুলতলায় ছেলেরা দেখে, না বোঝার যন্ত্রণায় মন যখন করুণ হয়ে ওঠে, কেমন জানি এইসব শিশুগুলিকে ভাইবোন বলে মনে হয় তখন তাদের কচিমাংস খেতে এর এতা মজা লাগে কিসের!

কে বলল, ভোক লেগেছে।

কিছু খাস নাই?

দোপর বেলায় গোস্ত দিয়ে ভাত।

আমিও—আমার ভোক লেগেছে।

তোর জামার রঙটো দেখে রাগ লাগে।

য্যামন মোটা, তেমনি খসখসে।

ঠিক শ্যালা, শকুনিটোর মতুন।

আমাদের সবারই ভাই—রফিক বলল।

হামবুর বাপটো দু'একদিনের ভিতরেই মরবে। আজ সারা বৈকালি কি করেছে জানিস?

জানি—খালি হাঁফিয়েছে—এই শালোর মতুন।

জামু বলল, সব শালোর হাঁফানির ব্যায়রাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম।

অঘোর বোষ্টমের চেহারার কথা মনে করে হা হা করে হেসে উঠল সবাই।

মাতামাতি চলে, আল টপকে টপকে, উচু-নীচু জমির উপর দিয়ে, ক্ষত-বিক্ষত মনে আর দাগরা দাগরা ঘায়ে, শেয়াকুল আর সাঁইবালার বনে, লম্বা শুকনো ঘাসে, পগারে, সাপের নিশ্বাসের মতো উষ্ম ফাটা মাটির ভ্যাপসা হাওয়ায়, আখ আর অড়হর কাটা জমির বল্লমের মতো সূক্ষ্মাগ্র সরল গুঁড়ির আক্রমণে ও আর্তনাদে। একটা মাটির ঢেলার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে, নিঃশেষে শক্তির বেদনা-বোধের অতীত অবস্থায় আচ্ছন্ন চেতনাহীন তন্দ্রার মধ্যে শকুনিটা শুধুই চলেছে। তখন ছেলেরা বিশ্রাম নিচ্ছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে—ক্ষতের রস মুছছে প্যান্টে, শকুনিটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। জোরে নিশ্বাস নিয়ে ক্লান্তি কাটানোর অসম্ভব চেষ্টা করছে না সে।

কত তারা উঠেচে দ্যাক।

কিন্তুক আলো তো হচে না।

চাঁদ নাইকো যি।

বাতাস দিচে লয়রে।

দিচে, তা শালার গরম বাতাস।

আমার কিন্তুক জার লাগচে।

তোর ভয় লেগেছে।

কতদূরে এ্যালাম র‍্যা?

উরে সব্বোনাশা, মাঝমাঠে এসে পড়েচি, মানুষমারী মাঠ যে র‍্যা। উইটো নিচ্চয় কোলনের পাড়।

চ' কোলনের পাড়ে যাই, আর একবার পা ধোয়াই গা চ' শকুনিটোকে।

পথটা ঠহর করা যায় না। চারিদিকের গাঁ ঝাপসা। দিশাহারা মনে হয়—এতবড় আকাশ, এত অন্ধকার।

জামু বলে, শুনিচিস রাত দোপরে কি সব হয়?

হেই ভাই পায়ে পড়ি, বলিস না।

যিখানে সিখানে তেঁতুলগাছ দেখা যায়। ঘরের খিল খুলে মেয়ে হোক আর মরদ হোক ঘুমের ঘোরে ঘোরে মাঝমাঠে চলে আসে। দ্যাখে, খালি শালা তেঁতুলগাছ আর মিসমিসে কালো বিলুই। যিদিকে তাকাও খালি বিলুই আর বিলুই। ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—শকুনিটাকে হঠাৎ কালা বিড়াল বলে মনে হয়।

ছেলেদের আর কারো গায়ে হাত দেবার সাহস নেই। নিজের নিজের বুকে হাত দিয়ে অনুভব করে।

একটা বেপার তো হতে পারে, ধর সবাই ভূত আর সবাই মানুষের ভ্যাকে এয়েছে।

না না, আমি ভূত নই, এ্যাকা আমি মানুষ।

তাইলে আমাকে ছুঁয়ে দ্যাক, আমি যদি মানুষ না হই, আমি উড়ে মিলিয়ে যাব। ছোঁ আমাকে।

আমি তোকে ছুঁতে পারব না।

সবাই সবাইয়ের থেকে সাবধান হয়ে ক্যানেলের পাড়ে বসল। একে অপরের দিকে তীব্র চোখে তাকাচ্ছে। তারপর নিজের হাতে চিমটি কাটছে। শকুনিটাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। সে দুটো ডানা চেপে, পা দুমড়ে মাটিতে গোঁজ হয়ে পড়ে আছে।

রাত দোপর ঘুরে গেয়েছে লয়?

এ্যাকন সাঁজও লাগতে পারে আবার দোপর রাতও হতে পারে।

বোধহয় তাই। তাদের হিসাব নেই। এ সময়টুকু ঠিক সময় নয়। এ খেলাটা তাদের সময়ের বাইরে ঘটেছে যেন।

তবু কে বলল, তিনবার শেয়াল ডেকেছে।

তাইলে পেরায় শ্যাষ রাত।

চা ভাই, পানিতে নামি।

কাদা আর পানিতে ছুটে পাগলের মতো নামল ছেলেরা।

একটা বাতাসও সঙ্গে অগভীর পানির ওপর দিয়ে সরসর করে এসে ওদের চোখে মুখে লাগল কি একটা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো।

আর একবার স্নান করল শকুনিটা।

শ্যালা কিছু খাবে না?

কি খাবে—মরা আচে এখানে যে খাবে।

জামু বলল, ভুঁইয়ের লাড়া ছিঁয়ে লিয়ে আয়, ঐ খাক শালা।

তাই নিয়ে এলো কে। রফিক বলল, গোরু তো লয় যে খ্যাড় খাবে। কিন্তুক এখন ঐ শালাকে তাই গিলতে হবে।

হ্যাঁ, লাও গেলাও।

দেখি র‍্যা, তোর ছড়িটা দে।

হ্যাঁ, ঠিক অমনি করে অর ঠোঁঠটো চিরে ধর।

খ্যাক খ্যাক করে শব্দ করে উঠল শকুনিটা। তার ঘাড় মুচড়ে, ঠোঁট ফাঁক করে অতি সাবধানে ছেলেরা তাকে খড়ের টুকরো খাওয়াচ্ছে।

খা, শালা, মর্ শালা।

আমি একটো পাখনা লোব। কলম করব।

আমিও লোব, মুটুক করব।

রফিক সবথেকে বড় পালকটা ছিঁড়ে নিলো। মাংসের ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো পালকটা। শিউরে উঠল যেন শকুনিটা। তারপর সবাই ছিঁড়ল।

কদাকার বড় মুরগির মতো দেখতে লাগল তাকে।

তারা সবাই ফিরছে। টলতে টলতে। বসে দাঁড়িয়ে। হোঁচট খেতে খেতে। ছেঁড়া শার্ট দেখতে দেখতে। আগামীকালের কথা চিন্তা করতে করতে। গাঁয়ে ঢুকতেই এপাশে তালগাছ ওপাশে ন্যাড়া বেলগাছের যে ছোট তোরণটি আছে তারই আবছা ছায়ায় শাদা মতো কি দেখা যাচ্ছে।

জামু বলল, উদিকে যাস না-চ' ঘুরে যাই।

তোর বাড়ি তো উদিকেই-চ' দেখিনা উ দুটো কি।

বাড়ি কাচে বলেই জানি উ শালা-শালী ক্যা?

কা র‍্যা?

দরকার কি তোর শুনে?

বল্ ক্যানে।

উ হচে জমিরদ্দি আর কাজু শ্যাখের রাঁড় বুন।

কি করচে উখানে?

আমনার আঁটি। চ' বাড়ি যাই।

পুবদিকে রঙ ধরবার ঠিক আগেই যখন গভীর অন্ধকার নেমে আসে তখন ছেলেরা ছেঁড়া মাদুরে, সোদা মাটিতে অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়—ক্লান্তি একদম মুছে যায় যখন তখন অসুবিধের মধ্যে, অশান্তির মধ্যে না খেয়ে খালি পেটে ছেলেগুলো বেঘোরে ঘুমোয়। যখন সূর্য উঠল, রোদ উঠল, গাছপাতা ঝকঝক করে উঠল তখন এবং তারপর যখন রোদ চড়া হয়, বাতাস গরম হয়, মাঠে ছেড়ে দেওয়া গোরুগুলো মাটি শুঁকে শুঁকে শুকনো ঘাস খেয়ে ফেরে তখনো ছেলেদের ঘুম শেষ হয় না।

ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গতরাতের শকুনিটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। কত বড় লাগছে তাকে। কত শূন্য কত ফাঁপা—ঠোঁটের পাশ

দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। ডানা কামড়ে, চিৎ হয়ে, পা দুটো ওপরের দিকে গুটিয়ে সে পড়ে আছে। দলে দলে আরো শকুনি নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুনি শকুনির মাংস খায় না। মরা শকুনিটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধোস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনির দল। চিৎকার করতে করতে। উন্মত্তের মতো। কিন্তু শিশুটার পেটে প্রথম দুর্বল ঠোঁটের আঘাত বোধহয় মরা শকুনিটারই।

আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে নিয়ে আসছে মৃত শিশুটি।

ই কাজটো ক্যা করল গা?—মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমে গেল আস্তে আস্তে। এলো না শুধু কাদু শেখের বিধবা বোন। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মরা শকুনিটার মতো।

১.১ লেখক পরিচিতি

১.১ হাসান আজিজুল হক :

হাসান আজিজুল হকের জন্ম ভারতের বর্ধমান জেলার যবগ্রাম নামক গ্রামে, ১৯৩৮ সালে। ১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ভারত থেকে পূর্বপাকিস্তানে যান। ঐ বছরেই খুলনার দৌলতপুর কলেজে দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। পরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। হাসান তাঁর বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় 'সন্দীপন' নামক শিল্প ও সাহিত্যকেন্দ্রিক এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ ছিলো বিচিত্র। ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারত ও স্বাধীন ভারত-এ জীবনের ষোলটা বছর কেটেছে। তারপর পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অবস্থান করে দু'ধরনের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের নিগড়ে আবধ্ধ জনগণের দুর্দশা তিনি স্বচোক্ষে দেখেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ বা ধর্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর মনে দাগ না ফেললেও দাঙ্গার পরবর্তী কালে উদ্বাস্তু জীবনের নানা স্মৃতি তাঁর মনকে যে আচ্ছন্ন করেনি একথা বলা যায় না। কারণ তাঁর প্রথম দিকের লেখা গল্পগুলিই সেকথা প্রমাণ করে। এছাড়াও ১৯৫৮ সালে আয়ুবখানের সামরিক শাসনকে তিনি দেখেন, দেখেন কিভাবে একজন ফ্যাসিষ্ট নেতা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুধ্বিকে হাতিয়ার করে শাসনের নামে শোষণ ও পীড়নের বিচিত্র লীলায় মেতে ওঠেন। ৬৯-এর গণ আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের বিরুধ্বে পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণের প্রবল বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি হাসান লক্ষ্য করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই গণরোধের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে মুক্তিযুধ্বের (১৯৭১) নজিরবিহীন ভয়াবহতা। এই মুক্তিযুধ্বে ত্রিশ লাখ বাঙালীকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিলো। এইসব ঘটনা থেকেই জীবনকে দেখার পাঠ নিয়েছিলেন হাসান আজিজুল হক। পড়েছিলেন মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ, জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মত খ্যাতিমান লেখকদের সাহিত্য। কিন্তু এঁদের লেখায় জীবনের শেকড়কে তিনি খুঁজে পান নি, 'মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যাকে তিনি দেখেন নি, যেমনটি দেখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। মানিকের লেখায় যে ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তার দ্বারা তিনি নিজে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং 'বিজ্ঞাপন পর্ব', শ্রাবণ, ১৩৯৫-এর এক সাক্ষাৎকারে তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন—'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমি হয়তো সমস্ত জীবনই বারবার পড়বো।'

কৈশোর থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। কাশীশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ে রাজা সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রশস্তিবাচক একটি রচনা দিয়ে তাঁর লেখক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ম্যাট্রিক পাশ করে লেখেন 'মাটি ও মানুষ' নামে একটি উপন্যাস, যা অপ্রকাশিত। কলকাতার মাসিক স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতার জন্য লেখেন ১৯৫৭ সালে 'শামুক' নামে আর একটি উপন্যাস। এছাড়াও যশোর থেকে প্রকাশিত নাসিরুদ্দিন আহম্মদ সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। কলেজ বার্ষিকীতে মুদ্রিত প্রথম ছোটগল্পের নাম 'লাঠি', কবিতা 'সাগর পারের পাখিরা'। ১৯৫৭ সালে একসঙ্গে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন তিনি, যার অনেকগুলিও অপ্রকাশিত। তাঁর কবিতাগুলি হল ঃ 'বিনতা রায়', 'আমি', 'নিরর্থক', 'গ্রামে এলাম', 'দিনাবসান', 'কথা থাক', 'রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। ১৯৬০ সাল থেকে লেখক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার বাসনা জাগে তাঁর মনে। ঐ বছরেই সিকান্দার আবুজাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'শকুন' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গল্প 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', প্রকাশিত হয় 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায়। ৬০ থেকে ৭০ দশকে 'পূবালী', 'কালবেলা', 'গণসাহিত্য', 'ছোটগল্প' এবং বিশেষ করে 'নাগরিক', 'পরিক্রম', 'কণ্ঠস্বর', 'পূর্বমেঘ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে লেখক সংঘের 'পরিক্রম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ 'বিষাদ ও নৈরাজ্যের সাহিত্য'। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' মুনীর চৌধুরীর উদ্যোগে লেখক সংঘের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪-তেই।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্প গ্রন্থের জন্য হাসান আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পান। তাঁর সমগ্র সাহিত্য কর্মের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলি হল ঃ লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭০), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদ পুরস্কার (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), ওসামানি সাহিত্য পদক (১৯৮৪), 'হুজ হু ইন দি কমনওয়েলথ্' এও তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল ঃ

১। 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪)

২। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' (১৯৬৭)

৩। 'জীবন ঘষে আগুন' (১৯৭৩)

৪। 'নামহীন গোত্রহীন' (১৯৭৫)

৫। 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৭৫)

৬। 'পাতালে হাসপাতালে' (১৯৮১)

৭। 'নির্বাচিত গল্প' (লেখককৃত, ১৯৮৭)

৮। 'আমরা অপেক্ষা করছি' (১৯৮৮)

তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ

১। 'কথা সাহিত্যের কথকতা' (১৯৮১)

২। 'অপ্রকাশের ভার' (১৯৮৮)

তাঁর রচিত উপন্যাস ঃ

১। 'মাটি ও মানুষ' (১৯৫৪)

২। 'শামুক' (১৯৫৭)

৩। 'এই সব দিনরাত্রি' (অসমাপ্ত)

১.২ গল্পের আলোচনা : শকুন

হাসানের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য'-এর প্রকাশকাল ১৯৬৪। এই পঠে হাসানের গল্প মোটামুটি ভাবে যৌন সর্বস্বতাবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও এই সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ যে আসলে আর্থ-রাজনীতিক জীবনের নানা অসঙ্গতি তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির যৌন জীবনের স্খলন যা আমাদের সমাজের মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পাপাচারণ, হাসান তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হবার চেষ্টা করেছেন। 'শকুন' গল্পটি বিশ্লেষণ করলেই সেই সত্যটি পরিস্ফুট হবে।

গ্রামের কয়েকটি ছেলে দিনের আলোয় ফিরতে না পারা শকুনকে নিয়ে সাংঘাতিক খেলায় মত্ত হলো। এদের মধ্যে স্কুলের ছাত্রও আছে। এরা সুযোগ পেলে গোরু চরায়, ঘাস কাটে, বীজ বোনে। অর্থাৎ যে সমস্ত ছেলেদের সন্ধেবেলায় পড়াশোনা করার কথা তারা পড়াশোনা ছেড়ে গৃহশাসনহীন ছন্নছাড়া বালকরূপে হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে একটা অসুস্থ শকুনকে তাড়া করলো। বালকদলের তাড়া খেতে খেতে সে দ্রুত গতিতে নানা গলিপথ অতিক্রম করে মাঠের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল। যখন সে এইভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছেছে তখন ছেলেরা তাকে খড় খেতে দিল। কিন্তু শকুনতো পচা মাংস খায়, খড় খায় না। এমন সময় রফিক পাখিটাকে ধরতে চাইলো, মেলে ধরলো তার শক্তিহীন পাখাটা। তাদের অত্যাচারে শকুনটার মুখটা ঠুকে গেল ফলে একসময় অসহায় ভাবেই সে আত্মসমর্পণ করল। তারা থামার পাত্র নয়, বরং তাদের বক্তব্য 'মরাটাকেই টানব'। কিন্তু কেন? কেন ছেলেরা তাকে নিয়ে এহেন মজার খেলায় মেতেছে? কেনই বা লেখক একথা বলছেন যে, 'ছেলেদের কথায় শকুনিটিকে দেখে তাদের রাগ লাগে—মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনির খাদ্য—তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের বিকৃত গন্ধভরা নোংরা পালকের মতো—সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুনি বলে কেন?

বস্তুতঃ 'শকুন' নামের রূপকের অন্তরালে লেখক এক ভাঙ্গন ধরা সমাজ ব্যবস্থা এবং এই সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা মহাজনদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই সকল মহাজনেরাই সাধারণ মানুষকে শোষণ করে চলে নির্বিচারে। লেখক সেই মহাজনদেরকে একটা শকুনের প্রতীকে দেখিয়েছেন। যে ধূসর রং দেখলে মানুষের মন একেবারে নিভে যায়, সেই রং এর সঙ্গে শকুনের গাত্র বর্ণের মিল। মহাজনকে দেখলে যেমন মানুষের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়, শকুন ঠিক সেই রকমই ঘৃণ্য এক মূর্তিমান কদাকার প্রতীক। সমাজটার মজ্জায় এমনই ঘুণ ধরেছে, তার মূল্যবোধের এতটাই হানি হয়েছে যে খানা-ডোবায়, তেঁতুল গাছের তলায় ফেলে যাওয়া জীবন্ত শিশুর ভিড় দেখে ছেলেদের মনটা হুহু করে ওঠে। অথচ শকুনটা এই সব শিশুদের কচিমাংস খেতেই মজা

অনুভব করে। হামিদের বাপ, সুদখোর অঘোর বোষ্টম এরা সকলেই শকুনের মত ঘৃণ্য। না হলে এই বালকের দল কেন বললে 'হামবুর বাপটে দু'একদিনের ভিতেরই মরবে। আজ সারা বৈকালি কি করেছে জানিস? জানি—খালি হাঁপিয়েছে—এই শালোর মতন।' জামু বললো—'সব শালোর হাঁফানির ব্যরাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, সালা শকুনি, সালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম।' সমাজের এইসব মহাজন রূপ মানুষগুলো শেষ বয়সে হাঁফিয়েই মরে, এই মরা শকুনটার মত।

এইভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে করতে তারা দেখতে পেল শকুনটা অন্ধকার মাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তখন কেউ তার দেহ থেকে পালক খুলে নিতে চাইলো, কেউ বা শকুনের পালক দিয়ে কলম বানাবার কথা ভাবল। রফিক সব থেকে বড় পালকটা ছিঁড়ে নিল। কদাকার মুরগির মত মনে হতে লাগল শকুনটাকে। ছেলেরা কোনরকমে টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে রাতের অন্ধকারে বাড়ির পথে চলেছে আগামীকালের কথা ভাবতে ভাবতে। গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই তারা দেখতে পেয়েছে কাজুশেখের বিধবা বোনকে। সেও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে। জামু তাদের ভালো করেই জানে, তারা হল—'....জমিরদ্দি আর কাজুশেখের রাঁড় বুন।' তাদের কাজকারবার সম্পর্কে জামু ভালোমতই অবগত। যাইহোক তারা বাড়ি ফিরে পূর্বদিকে রঙ ধরবার পূর্বে যে শেষবারের মত অন্ধকার নেমে আসে সেই সময়কালে যে যার মত ছেঁড়া মাদুরে, কেউবা মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ে। খালি পেটে অঘোরে ঘুমতে থাকে ছেলেগুলো। সূর্য উঠল সকাল হলো, ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটুদূরে সকলেই মরা শকুনটাকে দেখলে পেলো, দেখতে পেলো তার পাশে শুয়ে থাকা একটা অর্ধেস্ফুট মানুষের সন্তানকেও। নাম গোত্রহীন এই শিশুর পরিচয় কি কেউ জানে না। অথচ এই শিশুটিকে খেতে চিৎকার করে ছুটে আসছে একদল শকুন। সবাই ভিড় করে দেখতে আসছে, কিন্তু 'এলো না শুধু কাজু শেখের বিধবা বোন। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মরা শকুনিটার মতোই'।

বস্তুতঃ হাসান আজিজুল হকের রচিত 'শকুন' একটি নির্মম, নিষ্ঠুর, গল্প, যেমন রমেশচন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা' গল্পটি। জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য এখানে এসে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। কুৎসিৎ, কদাকার, বীভৎস, কদর্য এক নির্মম জীবনের বাস্তব রূপ এ গল্পে বাণীরূপ পেয়েছে। এ গল্পে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের একটি প্রেক্ষাপট বর্তমান। যেখানে পৃথিবীর সব মানুষ ঘুমায়, তখন কিছু ছেলে জেগে থাকে, তাড়া করে ফেরে একটা শকুনকে। এরা যেন প্রথাবদ্ধ গৃহজীবনের বাইরের বাসিন্দা। এদের ঘুমোবার স্থানটিও যে কোন স্থানই হতে পারে। এরাই পৃথিবীর নতুন প্রজন্ম। এই ছন্নছাড়ার দলও যেন কাজুশেখের বিধবা বোনের সদ্যজাত সন্তানদের মত। রাত্রির অন্ধকারই তাদের জন্ম এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাদের মৃত্যু। প্রথা বহির্ভূত, নীতিনিয়মহীন এই জন্মের পরিণামকে কোন মহৎবাণীর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না বা মুছে দেওয়াও সম্ভব নয়। চিরকাল উৎকট দুর্গন্ধের অধিকারী, পচা মাংস ভক্ষণকারী যে খেচর প্রাণী পৃথিবীর আবর্জনাকে পরিশুদ্ধ করে আসছে, আজকের পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাব যেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সূর্যের আলোয় সেই শকুনের দল নেমে এসে পৃথিবীর পাপরাশিকে নির্মূল করে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলবে।

'শকুন' একটি অসামান্য গল্প। এ গল্পে 'শকুন' কে লেখক সুদখোর মহাজনদের প্রতীক করে এঁকেছেন। অত্যাচারী নিপীড়নকারীর প্রতীক হিসেবে শকুনকে আনা হয়েছে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ কয়েকজন বালকের প্রচেষ্টায়

সেই শোষণকারী শকুনটির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো। শকুনটিকে প্রথম যখন কিশোরেরা দেখে তখন তাদের প্রশ্ন ছিলো শকুনটা 'মোল্লা' না 'মোড়ল'। এই প্রশ্নের ইঙ্গিত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের কথায় শকুনের জাত নির্ণয়ের প্রচেষ্টা আপাত দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও একসময় তারা যখন অত্যাচারী হাম্বু-র বাবা ও সুদখোর মহাজন অঘোর বোষ্টমের সঙ্গে তুলনা করে বসে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঐ মোল্লা-শকুন ও মোড়ল-শকুন আমাদের সমাজে বসবাসকারীই একদল শোষক শ্রেণীর মানুষের প্রতিভূ। তাই শকুনটাকে অত্যাচার করা, তার পালক খসিয়ে নেওয়া, চরম প্রতিশোধেরই নামান্তর। একটি সফল প্রতীক ধর্মী গল্প হিসেবে নন্দিত হবার দাবী রাখে 'শকুন' গল্পটি। সহজ সরল বর্ণনায় হাসান অবক্ষয়িত সমাজের মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। দেখিয়েছেন সমগ্র সমাজ-মানস এক অন্ধকার সমাজের বাসিন্দা। তাই নবজাতকের আবির্ভাব এখানে মৃত্যুর দ্বারা গৃহীত হয়। ভোরের সূর্যোদয়ের পূর্বেই আগামী সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে—এই ব্যঞ্জনাই 'শকুন' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য যেন। বাস্তবের এমন নির্মম চেহারা খুব বেশি গল্পে দেখা যায় না। বাস্তববাদ যেখানে যথাস্থিতবাদে এসে রূপ নেয় এ গল্প যেন তারই বলিষ্ঠ বাণীরূপ। বাস্তবের মধ্যে কোথায় যেন সামান্য হলেও রোমান্টিকের একটা স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক ছোট গল্প আছে যেখানে বাস্তবের রূপায়ণ ঘটলেও রোমান্টিকতা একেবারে অদৃশ্য নয়। কিন্তু 'শকুন' গল্পে বাস্তব নয়, বাস্তবের এক বিশ্বস্ত রূপ ধরা পড়েছে অনবদ্য ভঙ্গীমায়। একেই বোধহয় ন্যাচারালিস্টরা (যথাস্থিতবাদী) বলবেন—শিল্প হচ্ছে 'way of thinking, of seeing, of reflecting, of studying, of making experiments, a need to analyse in order to know.'

একক ২ □ পরীবানুর কাহিনী

মূলগল্প :

একেবারেই চিনতে পারিনি। চিনতে যে পারিনি, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, চিনতে পারলেই বরঞ্চ আশ্চর্য হতাম। এক মুখ দাড়ি, উষ্কখুষ্ক চুল, চোখে কেমন এক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। একটা ছেঁড়া আর ময়লা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কোনমতে তার কঙ্কালসার দেহটাকে ঢেকে রেখেছিল। যে-কেউ দেখলে পাগল বলেই মনে করবে। আমিও তাই মনে করেছিলাম।

কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার রাত্রি। রাত বেশি হয়নি, কিন্তু এর মধ্যে সারা অঞ্চলটা নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেছে। একটা আসন্ন মহাবিপদের আশঙ্কা যেন একটা গুরুভার পাথরের মত সবার মনের ওপর চেপে বসে আছে। পাকসেনারা জেলা শহরটাকে দখল করে নিয়ে এবার গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। খবর আসছে, নদীর দশ-পনেরো মাইল দূরের গ্রামগুলোতে ওদের তাণ্ডব চলেছে। সেসব বর্ণনা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। নদী পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ। তাই এপারের মানুষ ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা পালা করে রাত জাগে, ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ওই দুশমনরা যদি সত্য সত্যই এসে হানা দেয়, এই গ্রামরক্ষী বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করতে যাবে না, তারা শুধু আগে থেকে বিপদসঙ্কেত দিয়ে গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ার করে দেবে। তার প্রয়োজনও কম নয়।

একটা বই পড়ছিলাম। পড়তে বসেছিলাম বটে, কিন্তু পড়ার দিকে মন ছিল না। যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আছি, তাকেই কেন্দ্র করে চিন্তাটা পরিক্রমণ করে চলেছিল। এমন সময় ভেজানো দরজাটা ঠেলে সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, চমকে উঠেছিলাম বুঝিবা, একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। ত্রস্তভাবে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম—কে?

আমি স্যার।

'কে আমি কে?' গলাটা যেন চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চিনে উঠতে পারছিলাম না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছিল, তাই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি হারুন, স্যার, আপনারই ছাত্র, সেই যে আপনাদের এখানকার প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। মনে নেই আপনার, আপনিই তো জুটিয়ে দিয়েছিলেন কাজটা।

এবার মনে পড়ল, ভাল করে মনে পড়ল, ও, আমাদের সেই হারুন। আমাদেরই কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেছিল। গরীব ঘরের ছেলে, অনেক কষ্টেসৃষ্টে এ পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর পড়াশোনায় খতম দিয়ে চাকুরির সন্ধানে নামল; কিন্তু এই দুর্দিনে চাকুরি পাওয়া কি সহজ কথা। শেষ পর্যন্ত আমিই তাকে আমাদের এই প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কয়েকটা বছর এখানে কাজ করেছিল, শিক্ষক হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিল। পাঁচ-ছ' বছর বাদে একদিন হঠাৎ কোন কিছু না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেল, তারপর আরও তিন-চারটি বছর কেটে গেছে। আজ এতদিন বাদে কোত্থেকে এল সেই হারুন?

ও, তুমি হারুন! কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? এতদিন ছিলে কোথায়?

হারুন সংক্ষেপে তার গত কয় বছরের ইতিহাসটা বলল, এতদিন নিজের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করছিল। কিন্তু ক'মাস আগে স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম যখন জোর বেধে উঠল, তখন 'জয় বাংলা' বলে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কোথায় রইল তার স্কুল, কোথায় বা ঘরসংসার। তারপর থেকে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে আর পথে পথে তার ভ্রাম্যমাণের জীবন কাটছে।

বললাম, সে তো ভাল কথা। কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থা এমন হয়েছে কেন? আন্দোলন তো আমরাও করছি হে, কিন্তু তোমার মত—মনে হচ্ছে কতকাল যেন তুমি খেতে পাও না।

সত্যি কথাই বলেছেন স্যার, নিয়মমত খাবার খুব কমই জোটে। মাস দেড়েক হয় পশ্চিমা সৈন্যরা আমাদের ওখানে এসে জেঁকে বসেছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম হামলা করে চলেছে আর তাদের সঙ্গে জুটেছে একদল ফেউ—মুসলিম লীগের গুণ্ডার দল। আমাদের ওখানকার মুক্তিবাহিনী আমিই গড়ে তুলেছিলাম। ওরা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে গেছে, তাই আমার জন্য এবং আরও কয়েকজনের জন্য সারা এলাকা জুড়ে পাতিপাতি করে খোঁজাখুঁজি চলছে। সবাই সন্ত্রস্ত, কেউ ভয়ে জায়গা দিতে চায় না। কি মনে হয় জানেন? মনে হয় যেন নিজেদের দেহের মাংসগুলোকে খেয়ে খেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি। তাই তো সারা শরীরের এমন হাল হয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম, একটু আগে বলেছিলাম, আমরাও তো আন্দোলন করছি হে—সেই কথাটা মনে করে ভেতরে ভেতরে একটু লজ্জাবোধ করছিলাম। সেও আন্দোলন করছে আর আমরাও আন্দোলন করছি, কিন্তু এক যাত্রায় এমন পৃথক ফল কেন? সে করছে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে, সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। আর আমার আন্দোলন শৌখিন আন্দোলন, আমি সংসারের সবদিক রক্ষা করে অনুকূল বাতাসে পাল তুলে চলেছি। ইতিপূর্বে এই কথাটা আর কখনও এমন করে মনে হয়নি।

হারুন, তুমি কিছু খেয়ে নাও আগে, তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে।

সত্যি কথাই বলেছেন স্যার, আপাতত একপেট বোঝাই করে খেয়ে নেওয়াটা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে সেই জন্যই আমি এতদূর থেকে আপনার কাছে আসিনি। আমার কাজের কথাটা শুনুন আগে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না, আগে খেয়ে নাও, তোমার যা কিছু কথা আগে, পরে শোনা যাবে। কথা বলার সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি ভেতরের ঘরে চলে এলাম, এমন অসময়ের অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হবে শুনে গৃহিণীর মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। আমি মুখটাকে কাঁচুমাচু করে বললাম, আমার ভাগেরটা না হয়—

থাক থাক, তোমার এত বেশি বিবেচনা না দেখালেও চলবে। তুমি যাও, আমি বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে গেলাম, একটু বাদেই খাবার আসার সাথে সাথেই হারুন ক্ষুধার্ত পশুর মত তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চক্ষুলজ্জার অবসর নেই তার, সামনেই পানি ছিল, কিন্তু সে হাতটা ধুয়ে নেবার প্রয়োজনটুকুও বোধ করল না। কোনোদিকে না তাকিয়ে গোগ্রাসে গিলে চলল। দেখে মনে হচ্ছিল এমন ভাল খাওয়া সে যেন অনেকদিন খায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর আলাপ হল। হারুন বলছিল, স্যার, আমার বাড়ি এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে। নিজের এলাকা ছেড়ে এতটা পথ ভেঙে আপনার কাছে কেন এসেছি শুনুন তবে। এসেছি অস্ত্রের খোঁজে। আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা আছি, কিন্তু অস্ত্রের মধ্যে আছে তিনটি অচল আর সচল রাইফেল। এদিকে রাইফেল আছে তো কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে। ওদের মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমরা কি দিয়ে লড়াই করব? অস্ত্রের অভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনী ভেঙে যেতে বসেছে। খালি হাতে তো আর লড়াই চলে না। তাদের মন ভেঙে যাচ্ছে। ফলে কেউ কেউ চলে গেছে বর্ডারের ওপারে, আর যারাও বা আছে তারাও এদিক-ওদিক কেটে পড়ছে। সেই জন্যই বলছি, আপনারা তো রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকের সাথে যোগাযোগ করে দিতে পারেন—

হতাশ হয়ে উত্তর দিলাম, আমাকে একথা বলা বৃথা হারুন, আমাদেরও এই একই অবস্থা। আমাদের এখানেও মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, বেশকিছু দিন ধরে প্যারেড চলল, কিছুটা রাইফেল ট্রেনিংও হ'ল, কিন্তু হলে হবে কি, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আমরা অস্ত্র তুলে দিতে পারছি না। ওরা যখন আমাদের এখানে হামলা করতে আসবে, তখন আমাদের মুক্তিবাহিনী কি দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করবে, আজ শুধু আমাদের এখানেই তো নয়, সব জায়গাতেই এই এক সমস্যা।

আমার কথা শুনে হারুন একেবারেই চুপ মেরে গেল। অনেক আশা করে কত দূর থেকে এসেছিল কিন্তু এখন মুখ কালো করে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কি করতে পারি আমি? এ ব্যাপারে আমিও যে ওদেরই মত অসহায়। হারুনও আমার অবস্থাটা বুঝল। তাই এই নিয়ে আর বেশি পীড়াপীড়ি করল না।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য প্রশ্ন করলাম, তোমার স্ত্রীর খবর কি, হারুন? তুমি তো ঘুরে বেড়াও, তার দিন কিভাবে চলছে?

হারুনের স্ত্রী পরীবানুকে জানতাম। তার বাপ-মা তার 'পরী' নামটা বৃথাই দেয়নি। পরীর মতই সুন্দরী মেয়ে। শুধু রূপই নয়, রূপও আছে গুণও আছে। কিন্তু দু'জনের এই ছোট্ট সংসারটুকুতে শান্তি ছিল না। এটা-ওটা নিয়ে দু'জনের মধ্যে খিটমিট বেধে যেত। আর সেই খিটমিট যখন তখন তুমুল কলহের মধ্য দিয়েই বিস্ফোরণের মতই ফেটে পড়ত। মনোমালিন্যের প্রদাহটা যখন উচ্চতম তাপমাত্রায় গিয়ে পৌঁছাত, তখন আমাদের হারুন মাষ্টার সবার সামনেই গবেষণা করত যে, এমন বউ নিয়ে সংসার করা তার পোষাবে না, সে ওকে তালাক দেবে, আবার মাথাটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসত, ওসব কথা চাপা পড়ে যেত। এমনিভাবে তাদের উর্মিমুখর জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছিল।

এসব কথা ওদের পাড়ার লোকেদের মুখ থেকে শুনেছি। আহা, পরের কথা ছেড়ে দিলাম, হারুন নিজেই কতদিন এসব কথা আমায় বলেছে। কিন্তু কোন্ সংসারে ঝগড়াঝাটি না হয়, এই সংসারের জোয়ালের তলায় বছরের পর বছর ঘেঁষাঘেষি আর ঠেলাঠেলি করে চলতে হলে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে এমন ঠোকাঠুকি হবেই, না হয়ে পারে না, হারুনকে অনেক জেরা করে যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি, তা থেকে মনে হয়েছে, এই পরীবানু মেয়েটির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণত যেসব বিষয় নিয়ে বচসা বাধে, এদের বেলায় ঠিক তা নয়। পরীবানু সাধারণ ঘরের মেয়ে হলেও কিছুটা লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিল। ওর মনে অনেক উচ্চাশা। সে চেয়েছিল রান্নাঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে না থেকে বাইরের মুক্ত পরিবেশে আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে। এ যুগে সেটা দোষের কথা নয়, গুণের কথাই। তার মত আরো অনেক

মেয়ের মনেই হয়তো এই ইচ্ছাটা গুমড়ে গুমড়ে মরে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মুসলমান ঘরের কুলবধূর পক্ষে সেই পথে এগোতে গেলে পদে পদে অনেক বাধা। এই উচ্চাশার পাখাটাকে ছড়িয়ে দিতে গেলে তার উপর প্রচণ্ড ঘা পড়ে। তখন হয়তো সেই উদ্ধত পাখাটাকে গুটিয়ে নিতে হয়, নয়তো চূর্ণ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে জেনেও বিদ্রোহ করতে হয়। দ্বিতীয় পন্থাটাকে বেছে নেবে, পরীবানু সেই ধাতের মেয়ে।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর কলহ-বিবাদের পেছনে এইটাই ছিল মূল কারণ। অন্ততপক্ষে হারুনের মুখে নানা উপলক্ষে ওর সম্পর্কে যে সমস্ত কথা শুনেছি, তা থেকে আমার মনে এই ধারণাটাই গড়ে উঠেছিল।

আজ কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। পরীবানুর প্রসঙ্গটা তুলতেই সে তার প্রশংসায় আর আনন্দ-গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ওর মুখ যেন থামতে চায় না। ওর মত এমন মেয়ে নাকি হয় না। তার এই অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস দেখে না হেসে থাকতে পারলাম না, বললাম, কিন্তু হারুন, তুমি একদিন ওর সম্পর্কে—

সেসব দিনের কথা রেখে দিন, স্যার। সেদিন যত কিছুই বলে থাকি না কেন, আজ একথা ভাল করেই বুঝতে পারি, সেদিন দোষটা ছিল আমারই, আমি দৃষ্টির ঘোরে সোজা জিনিসটাকে বাঁকা করে দেখতাম। সেই জন্যেই ওর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে চেপে রাখতে চাইতাম।

বিস্মিত হলাম। আমাদের এই সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের এই মনোভাব খুবই স্বাভাবিক ও সুলভ। কিন্তু তাই নিয়ে এমন সরল স্বীকারোক্তি ক'জন দিতে পারে। প্রশ্ন করলাম, তোমার এই দৃষ্টির ঘোর কবে থেকে কাটল এবং কেমন করে কাটল?

বেশিদিনের কথা নয়, হারুন হেসে বলল, মাত্র মাস কয়েক আগে আমাদের এবারকার এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সত্যটা প্রথমবারের মত আমার কাছে ধরা পড়ল। আন্দোলনের ভাবনায় ও কাজকর্মের ধান্ধায় মগ্ন হয়েছিলাম, ওর দিকে তাকাবার মত সময় ছিল না, মনও ছিল না, এমন সময় একদিন পরী আচমকা এক প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা, এই বাংলাদেশটা কি তোমাদের পুরুষদেরই, মেয়েদের কিছু নয়? আমাদের মেয়েদের নামগুলো কি শুধু সেন্সাস রিপোর্টের পাতা ভর্তি করে রাখবার জন্যই।

এ আবার কেমন প্রশ্ন। আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম, কেন, এই প্রশ্ন করছ কেন?

কেন? সে কথাও আবার জিজ্ঞাসা করছেন? এতদিন ধরে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন চলছে। আপনারা সভা করছেন, মিছিল করছেন, কিন্তু আমাদের মেয়েদের কোনদিন কোন কাজে ডাক দিয়েছেন?

একটু সময় চুপ রইলাম। সেই সংগ্রামী আবহাওয়ায় ওর কথাটা শুনে বড়ই ভাল লাগল। সত্য কথাই তো মেয়েরা যদি আন্দোলনে সাথে সাথে বেরিয়ে আসে, তাহলে আমাদের শক্তিটা কতটা বেড়ে যাবে। সাথে সাথেই পুরানো দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই পরীবানুকেই একদিন উপদেশ দিয়ে একটু শাসনের সুরেই বলেছিলাম মেয়েদের স্থান ঘরে, বাইরে নয়। তথাকথিত 'সভ্য' মেয়েদের মত বাইরে গিয়ে মাতামাতি করবে, স্বেচ্ছাচার করবে, সেটা কোনমতেই আমি বরদাশ্‌ত করতে পারব না। কে জানে পরীবানুও হয়তো সেই মুহূর্তে সেই কথাটাই ভাবছিল। কিন্তু সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে আমাকে অপ্রস্তুত করতে চাইল না।

একটু ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়েরা কি এতদিনের পর্দা ভেঙে আমাদের সঙ্গে পথে বেরিয়ে আসবে? আমাদের সমাজ—

আমার কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল, আসবে না? কেন আসবে না? তাদের মন কি আসতে চায় না? তারা কি আপনাদের মতই এদেশের মানুষ নয়। আপনারা জোর করে দরজাটা বন্ধ করে রাখেন, তাই তারা বাইরে আসতে পারে না। দরজাটা খুলে দিয়ে তাদের ডেকে দেখুন না একবার।

এই বলে একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকাল সে। তারপর আবার বলল, আচ্ছা, আর সকলের কথা পরে হবে, আগে আমার কথাটাই হোক। আমি যদি আপনাদের সঙ্গে কাজে নামি, আপনাদের কোন আপত্তি হবে না তো? আবার এই নিয়ে সেই আগেকার দিনের মত আমাদের দু'জনের মধ্যে যেন হাঙ্গামা বেধে না যায়। বলেই সে একটু মৃদু অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

পরীবানু নেমে এল কাজে। দিনের পর দিন নতুন নতুন মেয়েকে কাজের সাথী করে নিয়ে আসল। তার দলবল ক্রমশই বেড়ে চলল। বাধা দেব দূরে থাক, আমি তাকে সাগ্রহে আমাদের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে কখনও কাছে, কখনও বা দূরে, আমরা মনে মন মিলিয়ে কাজ করে চলে আসছি। স্যার, আপনি শিক্ষক, আমি ছাত্র, আপনার কাছে এসব কথা বলা হয়তো সাজে না। কিন্তু একটা কথা না বলে আমি থাকতে পারছি না। এতদিন আগে আমাদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার গভীর আস্বাদ এবারই যেন প্রথম পেলাম। পরীবানুর উজ্জ্বল হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, এটা যেন তারও মনের কথা। বেশকিছু দিন থেকে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে গ্রামে যাওয়া সম্ভব নয়। সে কোথায় আছে, কেমন করে দিন চলছে, তাও জানি না। তবে দেখা হয় না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে লোক মারফত চিঠিপত্রের চলাচল হয়।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, এই দুঃসময়ে একা মেয়েমানুষ কিভাবে তার দিন চলছে? কি লেখে সে?

হারুন বলল, সুখে নেই, সে কথা ঠিক; কিন্তু ওর মন বড় শক্ত, কোন কিছুতে ভেঙে পড়ে না। কি লেখে? সব চিঠিতেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে লেখে। একবার লিখেছিল, নিয়মমত খেয়েদেয়ে শরীরটাকে ভাল রাখবেন, একথা বলার মত পরিস্থিতি এখন নয়, তাহলেও বলছি, শরীরটাকে যতটা সম্ভব সুস্থ রাখতে চেষ্টা করবেন। আর এক কথা, খুব সাবধান, ওদের হাতে কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না। আমার জন্য ভাববেন না। আমি মেয়েমানুষ। আমার পক্ষে অনেক সুবিধা, আমি পানি হয়ে এক রাশি পানির সঙ্গে মিশে আছি।

তোমাদের ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে কি লিখেছে?

সে কথা আর বলবেন না। কিছুদিন আগে ওর শেষ চিঠিটা পেয়েছি। তাতে লিখেছে, ওরা যেন আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কী যে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। মাঝে মাঝেই এসে হামলা করছে। বাজার, বন্দর জ্বালিয়ে ছারখার করছে। কোন জোয়ান ছেলেকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়। শুধু তাই? মাঝে মাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঢুকে বয়স্কা মেয়েদের টেনে নিয়ে যায় ওদের ঘাঁটিতে। এসব দেখে দেখে আমার আর সহ্য হয় না। কিছু একটা করবার জন্য পাগল হয়ে উঠি; কিন্তু কি করব, মনের আগুন মনেই চেপে রাখি। আল্লাহর কাছে আমার এই একমাত্র আরজ, মরবার আগে ওদের অন্তত একটাকেও যেন নিজের হাতে মেরে যেতে পারি।

এ পর্যন্ত বলে হারুন একটু থামল, তারপর আবার বলল, এইটাই ওর শেষ চিঠি। কিন্তু সারা চিঠিটার মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে আর কোন কথাই নেই। কোথায় আছে, কেমন আছে, সে সম্পর্কে কিছুই লেখেনি। যে লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল সেও সঠিক কোন কিছু বলতে পারল না।

আশ্চর্য মেয়ে, মনে মনে সে কথাই ভাবছিলাম। বললাম, হারুন, তুমি ওকে নিয়ে চলে এসো আমাদের এদিকে। ওখানে থাকলে তোমরা দু'জনেই মারা পড়বে। তার ওপর তোমার যা চেহারা হয়েছে—

তা হয় না, স্যার। হারুন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। সবাইকে এমন বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমি কেমন করে এখানে চলে আসব। আর ওর কথা যদি বলেন তবে বলি, ও বড় শক্ত মেয়ে। ওকে কিছুতেই সেখান থেকে সরিয়ে আনা যাবে না। আমি নিজেও ওকে বলে দেখেছি, কিন্তু আমার এসব কথায় মোটে কানই পাততে চায় না। ভীষণ শক্ত মেয়ে, আর ভীষণ জেদী মেয়ে। এই ক'দিনের মধ্যে আমি ওকে ভাল করেই চিনে নিয়েছি। এখন আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে। আমি ওকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি—

সে রাতটা হারুন আমার বাড়িতেই কাটাল। ইচ্ছা ছিল যাওয়ার সময় ওকে কিছু টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু সে সুযোগ হ'ল না। সকালবেলা উঠে দেখি রাত ভোর হবার আগেই হারুন কাউকে কিছু না বলেই তার নিজের পথে চলে গেছে।

এর কিছুদিন বাদে সেই হামলাকারী বর্বর সৈন্যরা নদী পাড়ি দিয়ে আমাদের এপারে এসে উঠল। তাদের প্রতিরোধ করবার মত কোন প্রস্তুতিই ছিল না। আমাদের মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যে যেদিকে পারে ছুটল। আমিও সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে সরে এলাম। তারপর অনেক ঝড়-ঝাপটায় ঘা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কোথায় রইল হারুন, আর কোথায় রইল পরীবানু, তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। বহু কষ্টে বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় কলকাতায় মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাঁই করে নিয়েছি। কোনমতে টানাটানি করে দিন চলছিল। সকাল-বিকেল চায়ের দোকানে বসে চা খাই আর চায়ের টেবিলের উপর যে খবরের কাগজটা থাকে, তা থেকে বাংলাদেশের খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা, বাংলাদেশ আর তার এই পলাতক সন্তানের মধ্যে এটুকুই শুধু সম্পর্ক। একদিন একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের প্রতিরোধের এক বিচিত্র কাহিনী।

গ্রামটা আমার কাছে পরিচিত না হ'লেও মনে হ'ল হারুনদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও হবে। সারা অঞ্চলটার ওপর মিলিটারি জেঁকে বসেছিল। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হত্যা আর অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন তিনজন রাইফেলধারী সৈন্য বিকেলবেলা শিকারের আশায় এক জনবহুল পল্লীর ভেতরে ঢুকল। দেখতে দেখতে পথ জনশূন্য হয়ে গেল, দু'দিকের বাড়ির দরজা-জানলাগুলো বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। সৈন্যদের সন্ধানী দৃষ্টি শিকার খুঁজে ফিরছিল। চলতে চলতে ওরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড়ার ভেতর থেকে চার-পাঁচটা তরুণী সেজেগুজে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যদের দেখে ওদের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের ভাব নেই, মুখের হাসিতে আর চোখের কটাক্ষে ওরা তাদের আমন্ত্রণের গূঢ় সঙ্কেত জানাল। মুগ্ধ পতঙ্গের দল সেই মেয়েদের পেছন পেছন অনুসরণ করে তাদের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আর এই মেয়েরা জেনেশুনে, স্বেচ্ছায় তাদের পশু প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পন করল।

সন্ধ্যা ছাড়িয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসছিল। দীপশিখার স্তিমিত আলোকে সেই.. সেই স্বৈরিণীদল সৈনিকদের মুখের কাছে পানপাত্র তুলে ধরল। সেই সুধাপানের ফলে ওদের চেতনা একটু একটু করে ঝিমিয়ে পড়ছিল। উপযুক্ত মুহূর্ত বুঝে সেই স্বৈরিণীরা রণরঙ্গিনীর মূর্তি ধরে লাফিয়ে উঠল, তারপর ধারাল দা দিয়ে

ওদের কুপিয়ে কুপিয়ে কাটল। যারা শত শত নিরীহ লোকের রক্তে তাদের হাত লাল করেছে, ঘাতকের দল তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তাদের রক্ষা করবার জন্যে কেউ এগিয়ে এল না। এইভাবে তিনজন সশস্ত্র সৈন্য এই মেয়েদের হাতে মারা পড়ল।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রতিরোধ কাহিনীটি আমার মনকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। এই ঘটনা কি সত্য, না কল্পিত কাহিনী। এই ঘটনা কি সত্য হতে পারে? আমাদের ঘরের মেয়েরা কি কখনও এমন কাজ করতে পারে? দেশের শত্রুদের ধ্বংস করবার সংকল্প নিয়ে, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত সতীত্বের সহজাত সংস্কার কি তারা এমন করে অতিক্রম করে যেতে পারে?

কিছুদিন বাদেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে গেলাম। ধারাবাহিক হত্যা আর অত্যাচারের ফলে যে সমস্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে শরণার্থী কলকাতায় চলে আসছিল, ঘটনচক্রে তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্য, এই ঘটনাটা আমাদের পাশের গ্রামের।

তবে এই ঘটনাটি সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে আরও কিছুটা বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। সে বলছিল, সেই সৈন্যদের হত্যা করার ব্যাপারে একটি মেয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বয়স যে তার খুব বেশি তা নয়, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ছোটবড় অনেকেই তাকে 'আপা' বলে ডাকত। মুক্তিবাহিনীর একজন বিশিষ্ট নেত্রী বলে সে তার নামটা সবার কাছে প্রকাশ করতে চাইত না। কিন্তু তাহলেও তার আসল নামটা আমাদের কাছে চাপা ছিল না।

কি তার নাম? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

পরীবানু।

কি, কি, কি, কি বললেন তার নাম—পরীবানু?

হ্যাঁ, পরীবানু।

একমুহূর্তে কত কিছু মনে পড়ে গেল। কিন্তু পরীবানু কি এই সংসারে মাত্র একজনই আছে? আবার প্রশ্ন করলাম, সে দেখতে কেমন? আপনি দেখেছেন কোনদিন তাকে?

না তাকে দেখিনি আমি। তবে শুনেছি তিনি খুব সুন্দরী।

লোকে বলে, পরীবানু পরীর মতই দেখতে।

তারপর কি হল পরীবানুর? সে কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বেঁচে আছে বলে মনে তো হয় না। সৈন্যদের লাশ তিনটাকে গুম করে ফেলে দিয়েছিল বটে কিন্তু খবরটা ওদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলল। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিল গ্রামটাকে। যাকে পেয়েছে, তাকেই মেরেছে। এর মধ্যে কে কে বাঁচল আর কে মরল, তার হিসেব কে দেবে! আমরা তারপরেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছি।

পরীবানুর মুখের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর একখানি মুখ। এ মুখ হারুনের, আমার এই সংবাদদাতাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের ওই অঞ্চলের হারুন মাষ্টারকে চেন তুমি, মুক্তিবাহিনীর হারুন মাষ্টার?

সে উত্তর দিল, আমাদের ওই অঞ্চলের হারুন মাষ্টারকে চেনে না এমন লোক নেই। চিনি বই কি। তাকে চেনে না ওই অঞ্চলে এমন লোক আছে বলে তো মনে হয় না।

তার খবর কি? ভাল আছে তো সে?

ভাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? আজকালকার দিনে ভাল থাকাটা বড় কঠিন। বিশেষ করে হারুন মাষ্টারের মত লোকেদের পক্ষে। খবরটা সঠিক কিনা বলা কঠিন, তবে একটা কথা শোনা যাচ্ছে, সে নাকি রাজাকারদের হাতে মারা পড়েছে। এরপর তার কাছে আর কোন প্রশ্ন করিনি।

রাতের বেলা আমার স্ত্রী হালিমার কাছে পরীবানুর কাহিনীটা খুলে বললাম। হালিমা নিঃশব্দে আমার কথা শুনল, শোনার পর তাকে চুপ থাকতে দেখে তার মনোভাব সম্পর্কে কেমন একটা খটকা লাগল। একটু বাজিয়ে দেখবার জন্য বললাম, আশ্চর্য মেয়ে পরীবানু! আচ্ছা হালিমা, তুমি সত্যি করে বল দেখি, এ অবস্থায় তুমি এমন একটা কাজ করতে পারতে?

হালিমা এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। ফোঁস করে উঠল। বলল, আমি করব এমন কাজ! ছি ছি, এমন একটা কথা বলতে পারলে! কোন ভাল ঘরের ভাল মেয়ে একাজ করতে পারে না। এরা আলাদা জাতের মেয়ে। এবার চুপ করে থাকার পালা আমার। একটু সময় চুপ করে থেকে বললাম, সত্যি কথাই বলেছ হালিমা। এরা আলাদা জাতের মেয়ে। এদের চিনে ওঠা আমাদের সাধ্য নয়।

২.১ লেখক পরিচিতি

২.১ সত্যেন সেন :

১৯০৭ সালে বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জের সোনারঙ গ্রামে সত্যেন সেন জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে আই.এস.সি. এবং বি.এ. পাস করার পর ইতিহাস এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন এবং সম্পৃক্ততার জন্য ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হন। জেলে বসেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। জেল থেকে মুক্তিলাভের (১৯৩৮) পর শান্তিনিকেতনে গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর সমাজতন্ত্রের পক্ষে মেহনতি মানুষকে সংগঠিত করার জন্য সোনারঙ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন এবং কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। ঢাকা জেলায় কৃষক সমিতির নেতৃত্ব প্রদানও করেন তিনি। ১৯৪৯-এ দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হন, ১৯৫৩-তে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে পূর্ববাংলায় '৯২ ক' ধারা জারি হলে পুনরায় গ্রেফতার হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দৈনিক সংবাদে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৮-র ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক আইনজারি করা হলে আবার গ্রেফতার হন, ১৯৩৬-এর শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন। দৈনিক সংবাদে পুনরায় সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় আসেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২-এ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর কমিউনিস্টপার্টির সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৮১ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৭০-এ উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ

উপন্যাস

১। 'পুরুষমেধ'

২। 'অভিশপ্ত নগরী'

৩। 'পাপের সন্তান'

৪। 'বুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ'

৫। 'পদচিহ্ন'

৬। বিদ্রোহী কৈবর্ত

৭। আলবেরুনী

৮। উত্তরণ

৯। ভোরের বিহঙ্গী

১০। পদচিহ্ন

গল্প ঃ

১। ছোটগল্প সংগ্রহ

২.২ গল্পের আলোচনা : পরীবানুর কাহিনী

গল্পটি শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে হারুন নামক এক স্কুল শিক্ষকের পরিচিতি দিয়ে। কিন্তু কাহিনীর কেন্দ্রে আছে সেই স্কুল শিক্ষকের স্ত্রী বিদ্রোহিনী পরীবানু। কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে সমস্ত অঞ্চলটা একটা মহাবিপদের আশঙ্কায় যেন প্রহর গুনছে। খবর পাওয়া গেছে পাকসেনারা এই জেলাশহরটাকে দখল করে এগিয়ে আসছে। নদীর দশ-পনের মাইল দূরের গ্রামগুলোতে এখন তারা অবাধে তাণ্ডব চালাচ্ছে। এই সংবাদে সমস্ত অঞ্চলটা ভীত, সন্ত্রস্ত। মানুষ অপেক্ষা করে আছে নদী পার হয়ে তারা কতক্ষণে এসে পড়বে। গ্রামরক্ষীবাহিনী তাদের প্রতিরোধ করবে না, শুধু তারা আসার পূর্বে একটা বিপদ সংকেত দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দেবে। এরকম এক পরিবেশে গল্প কথক একটা বই নিয়ে কখন মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করছেন, এমন সময় ভেজানো দরজাটা ঠেলে হারুনের প্রবেশ ঘটলো। একমুখ দাড়ি, উষ্কখুস্ক চুল, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি ময়লা গেঞ্জি গায়ে হারুনকে দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার পরিচয়। সে বুঝতে পেরেছিল, তাই পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি হারুন, স্যার, আপনারই ছাত্র, সেই যে আপনাদের এখানকার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম।' হারুনকে এই কাজটা তিনিই যোগাড় করে দিয়েছিলেন। বছর কয়েক প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করে একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে সে উধাও হয়ে গেল। আজ এতদিন বাদে সেই হারুন তাঁর সামনে।

হারুনের কঙ্কালসার চেহারা দেখে তিনি স্তম্ভিত। জিজ্ঞাসা করলেন—'... এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? এতদিন ছিলে কোথায়? হারুন এবার তার এতদিনের ইতিহাসটা জানিয়ে বললো, প্রথমে সে নিজের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করছিল। কিন্তু কয়েকমাস আগে স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে সে যোগ দিয়েছে। তারপর থেকেই তার পথে পথে এই ভ্রাম্যমানের জীবন কাটছে। লেখকের মনে হল আন্দোলন তো তাঁরাও করছেন, তবে তার এমন চেহারা হবে কেন? হারুন জানালো নিয়ম করে খাবারটুকুও তার জোটে না। মাস দেড়েক হল পশ্চিমা সৈন্যরা এখানে জেঁকে বসেছে, তারা গ্রামের পর গ্রাম হামলা করে চলেছে। আর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কেউ মুসলিম লীগের গুন্ডার দল। তারাই খবর দিয়েছে হারুনের মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে। সেই কারণে হারুন এবং তার দলের কয়েকজনকে তারা পাতিপাতি করে খুঁজছে। সবাই ভয়ে এমনই সন্ত্রস্ত যে জায়গা দিতে চায় না। ফলে পথে পথে অনাহারে ঘুরে ঘুরে কাটাতে হচ্ছে তাকে। 'তার মনে হয় যেন নিজেদের দেহের মাংসগুলোকে খেয়ে খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে।' তার কথা শুনে লেখক স্তব্ধ হয়ে গেলেন আর ভাবলেন 'আমরাও তো আন্দোলন করছি হে—সেই কথাটা মনে করে ভেতরে ভেতরে একটা লজ্জাবোধ করছিলাম।' বস্তুত লেখকের আন্দোলন ছিল শৌখিন আন্দোলন, সংসারের সব দিক রক্ষা করে তিনি সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু হারুনের আন্দোলন ছিল ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মুক্তি যুদ্ধে জীবনকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। এবার হারুন কাজের কথাটা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু লেখক হারুনকে কিছু খেয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। হারুন 'ক্ষুধার্ত পশুর মতো' খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'দেখে মনে হচ্ছিল এমন ভালো খাওয়া সে যেন অনেক দিন খায় নি।'

আহারাদির পর শুরু হল তাদের আলাপ। লেখকের বাড়ি থেকে হারুনের বাড়িটা ছিল প্রায় বিশ মাইল দূরে। এই এতটা পথ ভেঙে হারুন তাঁর কাছে এসেছে অস্ত্রের খোঁজে। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের কাছে আছে মাত্র তিনটি অচল ও সচল রাইফেল। আবার রাইফেল থাকলেও কার্তুজের অভাব দেখা যাচ্ছে। ওদের ওই মেশিনগানের বিরুদ্ধে সামান্য এই অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা যায় না। অস্ত্রের অভাবে মুক্তিবাহিনী ভেঙে যেতে বসেছে, খালি হাতে লড়তে লড়তে তাদের মন ভেঙে যাচ্ছে। কেউ কেউ বর্ডারের ওপারে চলে যাচ্ছে, কেউ বা পালিয়ে যাচ্ছে। তাই 'আপনি যদি বলে করে আমাদের জন্য কিছু অস্ত্র যোগাড় করে দিতে পারেন'-। কিন্তু লেখক জানালেন, শুধু হারুনদের নয়, তাঁদের এখানেও অস্ত্রের একান্ত অভাব, 'সব জায়গাতেই এই একই সমস্যা।' তাঁর খারাপ লাগতে লাগল, তাই প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে তিনি হারুনের স্ত্রীর কথা জানতে চাইলেন। এইখান থেকে শুরু হল গল্পের ভেতরকার গল্প; শুরু হল পরীবানুর গল্প। মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থান আজও যথেষ্ট গৃহবন্দী। অথচ সেই সমাজে বাস করেও পরীবানু কতটা সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে, দেশের জন্য কতটা আত্মত্যাগ করতে পারে এ গল্প তারই কাহিনী।

পরীর মতই সুন্দরী বলেই বাপ-মা তার নাম রেখেছিল পরীবানু। শুধু রূপ নয়, গুণও ছিল তার। কিন্তু তাদের বিবাহিত জীবন খুব সুখের ছিল না। প্রায়ই তাদের মধ্যে একটা অশান্তি লেগে থাকত। তবে এই অশান্তি আর পাঁচটা পরিবারের মত নয়। পরীবানুর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সামান্য লেখাপড়াও করেছিল। রান্নাঘরের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ যে জীবন, তা তার পছন্দ ছিল না। তার মনে অনেক উচ্চাশা ছিল। আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চাইত সে এবং তার জন্য বিদ্রোহ করতেও সে পিছপা হয় নি। এই নিয়েই

ছিল তাদের সংসারে অশান্তি। কিন্তু আজ হারুনকে তার স্ত্রীর কথা জানতে চাইলে সে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শুধু উচ্ছ্বসিত হওয়া নয়, বরং হারুন আজ অকপটে স্বীকার করে 'সেদিন দোষটা ছিল আমারই', আমি দৃষ্টির ঘোরে সোজা জিনিসটাকে বাঁকা করে দেখতাম। সেই জন্যই ওর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে চেপে রাখতে চাইতাম।' হারুনের মত এমন 'সরল স্বীকারোক্তি কজন দিতে পারে' একথা ভেবে লেখক বিস্মিত হয়েছেন। হারুন জানাল মাস কয়েক পূর্বে আন্দোলন নিয়ে যখন সে অতি মগ্ন ছিল তখন একদিন পরীবানু প্রশ্ন করে বসল এই বলে যে,—'আচ্ছা, এই বাংলাদেশটা কি আপনাদের পুরুষদেরই, মেয়েদের কিছু নয়? আমাদের মেয়েদের নামগুলো কি শুধু সেন্সাস রিপোর্টের পাতা ভর্তি করে রাখবার জন্যই?' পরীবানুর এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে হারুন? পুরুষশাসিত এ সমাজে দাঁড়িয়ে হারুনের কাছে সত্যিই কি এ প্রশ্নের কোন উত্তর আছে? কারণ এই হারুনই তো একদিন স্ত্রীকে বলেছিল 'মেয়েদের স্থান ঘরে, বাইরে নয়। তথাকথিত 'সভ্য' মেয়েদের মত বাইরে গিয়ে মাতামাতি করবে, স্বেচ্ছাচার করবে, সেটা কোন মতেই আমি বরদাস্ত করতে পারব না।' কিন্তু পরীবানুর আজকের কথাটা ফেলতে পারল না হারুন। ফলে ক্রমে পরীবানু হারুনদের সঙ্গেই কাজে যোগ দিল। দিনের পর দিন সে নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে আসতে লাগল দলে। হারুন তাকে সাগ্রহে এই কাজে টেনে নিয়ে এসেছিল। হারুন অকপটে স্বীকার করেছে তাদের ভালোবাসার কথা—'স্যার, আপনি শিক্ষক, আমি ছাত্র; আপনার কাছে এসব কথা বলা হয়তো সাজে না। কিন্তু একটা কথা না বলে আমি থাকতে পারছিনা। ......ভালোবাসার গভীর আস্বাদ এবারই যেন প্রথম পেলাম।' পরীবানুর ক্ষেত্রেও যেন তাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে হারুনের পক্ষে গ্রামে যাওয়াও সম্ভব নয়। ফলে পরস্পর দূরে থেকেই চিঠির মাধ্যমে যতটুকু খবরাখবর রাখা যায় সেটুকুই হচ্ছে। লেখক এসব শুনে আতঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে এই দুঃসময়ে মেয়েমানুষ একা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে! কিন্তু হারুন জানালো, সে খুব শক্তধাতের মানুষ, কোনকিছুতে ভেঙে পড়ে না। হারুনকে লেখা তার চিঠিই সেকথা প্রমাণ করে—'শরীরটাকে যতটা সম্ভব সুস্থ রাখতে চেষ্টা করবেন। আর একটা কথা, খুব সাবধান, ওদের হাতে কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না। আমার জন্যে ভাববেন না। আমি মেয়েমানুষ। আমার পক্ষে অনেক সুবিধা, আমি পানি হয়ে এক রাশি পানির সঙ্গে মিশে আছি।' অথচ হারুন ও লেখকের কথোপকথন থেকে জানা যায় সেখানে পাকসেনারা যেন তাদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে, বাজার বন্দর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলছে। এমনকি বাড়ি বাড়ি থেকে মেয়েদের জোর করে নিয়ে গিয়ে অবাধে অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের ঘাঁটিতে। এই অত্যাচারের মাঝে দাঁড়িয়ে সে কি করবে ভেবে পায়না, মনের আগুনকে মনেই চেপে রাখে এবং আল্লাহর কাছে তার একমাত্র আরজ 'মরবার আগে তাদের অন্তত একটাকেও যেন নিজের হাতে মেরে যেতে পারে'। পরীবানু এত জেদী মেয়ে যে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা যাবে না ভেবেই হারুন তাকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

সেই রাতটা হারুন লেখকের বাড়িতেই কাটালো। তাঁর ইচ্ছে ছিল সে যাবার সময় তার হাতে কিছু টাকা তিনি দিয়ে দেবেন। কিন্তু হারুন সে সুযোগ না দিয়ে ভোর হবার আগেই কাউকে না জানিয়ে চলে গেছে। এর কিছুদিন পর হামলাকারী সেই বর্বর সৈন্যরা নদী পার হয়ে এপারে এসে উঠল এবং অত্যাচার শুরু করল। যে যে দিকে পারল পালালো। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গা ঢাকা দিল। লেখক সপরিবারে অনেক ঘা খেতে খেতে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে অবশেষে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। কোনরকমে বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায়

কলকাতায় একটা থাকবার ব্যবস্থা করলেন। হারুন এবং পরীবানুর কথা ভাববার মত সময় তখন আর ছিল না। সকাল বিকেল চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ থেকে বাংলাদেশের খবর পড়েন— 'লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা, বাংলাদেশ আর তার এই পলাতক সন্তানের মধ্যে এইটুকুই সম্পর্ক।' প্রাণ বাঁচাতে কোনরকমে চলে এসেছেন তিনি কিন্তু দেশের প্রতি টান মানে তো শিকড়ের প্রতি টান, তাকে ভুলবেন কি করে। কিন্তু একদিন একটা খবর পড়ে তিনি চমকে উঠলেন। খবরটা হল এইরকম, বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার গ্রামের মেয়েদের এক বিচিত্র প্রতিরোধ কাহিনী। গ্রামটা হারুনদের গ্রামের কাছাকাছি হবে বলেই লেখকের মনে হয়েছে। এই গ্রামে মিলিটারিরা জাঁকিয়ে বসেছিল। একদিন বিকেল বেলায় তিনজন সশস্ত্র সৈন্য শিকারের আশায় গ্রামে প্রবেশ করল। মুহূর্তে সমস্ত গ্রামটা জনশূন্য হয়ে গেল, দুদিকের বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। ঠিক সেই সময় চার-পাঁচজন তরুণী সেজেগুজে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখের কটাক্ষে এবং মধুর হাসিতে ওরা সৈন্যদের সংকেত জানালে মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় তারা মেয়েদের অনুসরণ করে তাদের ঘরে গিয়ে উঠলো। এই তরুণীরা জেনেশুনে তাদের পাশবিক চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করল। তারপর সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার যখন নেমে এলো তারা সৈন্যদের সামনে পানপাত্র তুলে ধরল। সুধাপানে তাদের চেতনা যখন আচ্ছন্ন হয়ে এলো তখন স্বৈরিনীর দল রণরঙ্গিনীর মূর্তি ধরে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ধারালো দা দিয়ে তাদের কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল। যারা শতশত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, সেই সশস্ত্র ঘাতক তিনজন এই মেয়েদের হাতে মারা পড়ল।

সংবাদপত্রে এই কাহিনীটি পড়ে লেখকের মন প্রশ্নব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি বিস্ময়ভরে ভাবতে লাগলেন এমন ঘটনাও কি ঘটতে পারে। 'এ ঘটনা কি সত্যি, না কল্পিত কাহিনী!' দেশের শত্রুদের ধ্বংস করবার জন্য দীর্ঘকালের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কারকে ভুলে আপন সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে মেয়েরা কি সত্যি একাজ করতে পারে! কিন্তু খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যে লেখক এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। ধারাবাহিক হত্যা আর অত্যাচারের ফলে মানুষ দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে শুরু করেছিল। সেই শরণার্থীদের মধ্যে একজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হতে সে জানাল ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। সে আরও জানাল, সেই সৈন্যদের মারার জন্য একটি মেয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর বিশিষ্ট নেত্রী বলে সে তার নামটা গোপন করে রাখত, মেয়েরা তাকে 'আপা' বলেই ভাবত। এই 'আপা'রই আসল নাম পরীবানু। এক মুহূর্তে লেখকের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু পরীবানু নামে তো আরো অনেকে থাকতে পারে। এই সত্য জানবার উদ্দেশ্যে তিনি সেই মেয়েটির সম্পর্কে আরো খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করলেন। পরে জানা গেল এই পরীবানুও খুব সুন্দরী, পরীর মতই দেখতে তাকে। তিনি জানতে চাইলেন-'সে কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে?' ওপার থেকে আসা মানুষটি জানাল, 'বেঁচে আছে বলে মনে তো হয় না।' কারণ সৈন্যদের লাশ তিনটেকে গুম করে ফেললেও এখবর ওদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়নি। ফলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সবাই কোনরকমে প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে বেঁচেছে। সংবাদদাতাকে তিনি হারুন মাষ্টারের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হারুন ভালো আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আজকালকার দিনে ভালো থাকাটা বড় কঠিন। বিশেষ করে হারুন মাষ্টারের মতো লোকেদের পক্ষে।' তিনি আরও জানালেন, 'শোনা যাচ্ছে, সে নাকি রাজাকারদের হাতে মারা পড়েছে।' এরপর আর কিছু জানার অবশিষ্ট ছিল না।

রাত্রে স্ত্রী হালিমার কাছে লেখক পরীবানুর কাহিনীটা সবিস্তারে বললেন। কিন্তু হালিমাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি পুনরায় বললেন ঃ 'আশ্চর্য মেয়ে পরীবানু! আচ্ছা হালিমা, তুমি সত্যি করে বল দেখি, এ অবস্থায় তুমি এমন একটা কাজ করতে পারতে?' লেখকের একথায় হালিমার প্রতিক্রিয়া এবার জানা গেল—'আমি করব এমন কাজ! ছি ছি, এমন একটা কথা বলতে পারলে? কোনো ভালো ঘরের ভালো মেয়ে এ কাজ করতে পারে না। এরা আলাদা জাতের মেয়ে।' বস্তুতঃ হালিমা আর পাঁচজন সাধারণ নারীর মত সংস্কার নিয়ে গড়ে ওঠা একান্ত গৃহবধূ। তার কাছে পরীবানুর এই কাজ সতীত্বহানির নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। তাই লেখক তার সঙ্গে তুলনা করলে তিনি প্রতিবাদ করে উঠেছেন। কিন্তু লেখক বলেন, দেশকে কতটা ভালোবাসলে তবে একজন নারী একাজ করতে পারে। নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ইজ্জত, তার সতীত্ব। সেই সম্পদকে যে উৎসর্গ করতে পারে আপন জন্মভূমির রক্ষার উদ্দেশ্যে সে তো সাধারণ কেউ নয়, সে সত্যিই 'আলাদা জাতের মেয়ে।'

'পরীবানুর কাহিনী' একটি অসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প। গল্পকার সত্যেন সেন স্বয়ং সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যুক্ত ছিলেন কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে। ফলে হারুন এবং তার স্ত্রী পরীবানুর মত অসংখ্য মানুষদের তিনি জানতেন, যারা দেশ মাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ করেছে। এখানে সেইরকমই একটি বিদ্রোহিনী নারীর কথা আছে যে গৃহকর্ম ফেলে রেখে মনে করেছিল দেশের জন্য তারও কিছু করার আছে। সেই অসাধারণ নারীর গল্প হল 'পরীবানুর কাহিনী'। গল্প হিসাবে একটি সার্থক ছোটোগল্পের মর্যাদায় ভূষিত হবার দাবী রাখে।

মূলগল্প :

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম জাম-কাঁঠালগাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছা আবৃত মাটিতে ভাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হত?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিত। যত্ন করে লাগাত মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস থেকে ফিরে সেখানে বসত। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হালকা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিত। তারপর গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করত। আমজাদের হুঁকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিত। কাদের গল্পপ্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠত। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই-বা কী এসে যেত? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করত তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে-থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ-শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। অবশ্য সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সে-দিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্ত উম্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোনো অপরাধের চেতনা যদি-বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে,কী দেখছেন, জায়গা নেই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন-তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুটের চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে,

আপনাদের তকলিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সে-ই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয় সমবেদনা-ভরা উক্তিতে।

ঐ ঘরটা?

নিচের তলায় রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখলেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্চিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হল অ্যাকাউন্টস-এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানা-পত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হত।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টাদুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানলার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনোদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্বি চলে যাবে।

বা কিপ্পনতা যদি করতে চায়—

অবশ্য এ-সব পরাহত বাড়ি-সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বে-আইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না। দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময়মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিস্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায়, কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকার-স্বত্ব এক কথা, ন্যায়ের ওপর ভাগ্য লভা অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইনকানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

'কাদের কেবল কাতর রব তোলে। যাব কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি?

সদলবলে সাব-ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক-না-বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে। এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বোলো না কাউকে কিন্তু। কথাটা অবশ্য কারোরই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটি গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উসকানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে-আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না—শুধু এ-বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে এ-বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তুলনায় এ-বাড়ির বড়-বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশনে মস্ত-মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান-এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো এক-একখানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো-বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে ধমনিতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দুহাজারওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপট্‌কা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলায় আবর্জনাভরা ডাস্টবিন। সে-গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁতস্যাঁতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার-বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকত যে রাস্তার ড্রেনের গচাদুর্গন্ধ নাকে পৌঁছাত না, ঘরের কোণে ইঁদুর-বেড়াল মরে-পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজ্বারি লেগেই থাকত, থেকে-থেকে শেষরাতে কাশির দমক উঠত। তবু পাড়াটি ছাড়ে নি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য-তো করতই, সময়-সময় আপিস থেকে ফিরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিশ্চিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নিত। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মোঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেরই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ ধরনের পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষ পর্যন্ত অখাদ্য খাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোনো-কোনো সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীথ রাত পর্যন্ত একটি অব্যক্তব্য সঙ্গীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ-সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ-হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের উপর তুলসীগাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে-করতে মোদাব্বের উঠানে পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ-রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে-আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ-কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার?

চোখ খুলে দেখ।

কী? কী দেখব?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসীগাছটা নজরে পড়ে না তাদের। দেখছ না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসীগাছটা দেখতে পাচ্ছ না?

উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ-বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসীগাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গম সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়ে নি।

কী দেখছ? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল।

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। আকস্মিক এ-আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে-বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা—ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে-বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে-বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসীগাছটি হঠাৎ সে-বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ্য করে মোদাব্বের আবার হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবছ কী অত? উপড়ে ফেল বলছি।

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে-তুলসীগাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ সময়ে, কিন্তু এ-প্রদীপ-দেওয়া-অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ-তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন একসময়ে রেলওয়েতে কাজ করত। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে-মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে-শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্ণভাবে সে-শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানলার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে-দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ-তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে,

থাক্‌না ওটা। আমরা-তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসীগাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলবী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাসও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কোরান-তালাওয়াত করে। সে-পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসীগাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে সেটি রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয়, তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছপা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সে-দিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাক-বিতণ্ডার স্রোতে মনের সে-দুর্বলতা-অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

—ওরাই তো সবকিছুর মূলে, মোদাব্বের বলে। উলঙ্গ বাল্‌ব-এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে।—তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হল।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে-উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

মোদাব্বেরের ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে-দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসীগাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে-আগাছা জন্মেছিল সে-আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে-গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে-পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসীগাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে-লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে।

মোদাব্বেরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি শাঁ করে কচু-কাটার কায়দায় সে তুলসীগাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসীগাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসীপাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো-হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে-বিশ্বাস দৃঢ় পরিণত হবার জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদারুণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে এমন সময় বাইরের সিঁড়িতে ভারি জুতার মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তা থেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুজে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ-বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্যে?

পুলিশদলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোনে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট্‌ করে উত্তর দেয়। আপনারা বে-আইনিভাবে এ-বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

অ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনস্টেবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশদলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

তবে?

গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।

এবার আর হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোন কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়।

আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কনস্টেবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে-বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী-ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে-তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাত দিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাব্বের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না-বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকে খবর কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতার খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় না। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

কেন পড়ে নি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

৩.১ লেখক পরিচিতি

৩.১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ :

১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট, পূর্ববাংলার এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে ওয়ালীউল্লাহ্রে জন্ম। পিতা আহমদউল্লাহ্ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর এম.এ. এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। পিতা সরকারি কর্মচারি হওয়ায় বাল্য কৈশোরে তৎকালীন পূর্ববাংলার নানাস্থানে তৎকালীন বসবাস করায় তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি হয়েছে প্রচুর ও বিচিত্র।

ওয়ালীউল্লাহ্'র প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজে Annual-এ। সৃজনশীল কথাশিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাক-ভারত উপমহাদেশে অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর কাছে বিলাসিতা নয়, নয় নাম-যশ-অর্থের মাধ্যম। তাঁর কথায় 'সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা-সে ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা......'। তাঁর লেখার বিষয় নিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন—'I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে—আমার সমগ্রমনের ইচ্ছে সে-দিক পানে। ......মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা, এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত করতে চাই।' আপন মতাদর্শে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ছিলেন এই মহান কথাশিল্পী। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু', রচনারীতি এবং বিষয়বস্তুতে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। আরো দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'। এছাড়াও তাঁর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ আছে। ১৯৭০ সালের ১০ই অক্টোবর এই মহান শিল্পী লোকান্তরিত হন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস—

১। 'লালসালু'

২। 'চাঁদের অমাবস্যা'

৩। 'কাঁদো নদী কাঁদো'

গল্প ঃ

১। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'

২। গল্প সংগ্রহ

৩.২ গল্পের আলোচনা : একটি তুলসীগাছের কাহিনী

সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ওয়ালীউল্লাহের একটি অসামান্য গল্প। এই গল্পের বিষয়, দেশবিভাগের অশান্ত পরিবেশে কোন এক হিন্দু-মালিকের পরিত্যক্ত একটি বাড়ি ও তার তুলসী গাছকে ঘিরে একদল মুসলীম মানুষের হিন্দু বিদ্বেষ। স্বয়ং লেখকই জানিয়েছেন, মুসলমান সমাজের অধঃপতন-ই তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়। আলোচ্য গল্পে সেই অধঃপতনের ছবিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পটি শুরু হয়েছে ধনুকের মত বাঁকা কংক্রিটের পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ির বর্ণনা দিয়ে। বাড়িটির সামনে কোন ফুটপাত নেই, কিন্তু তার ভেতরে প্রশস্ত উঠোন এবং আরও ভেতরে গোসলখানার পরে আম-জাম কাঁঠালগাছে ভরা জঙ্গল সমেত অনেকখানি জায়গা বর্তমান। দেশভঙ্গের হুজুগে এই বাড়ির মালিক দেশপলাতক। মতিন, আমজাদ, কাদের, হাবিবুল্লা, মোদাব্বের এরা এই বাড়িটা দখল করেছে। দেশবিভাগের ফলে এদেশে এসে তারা আশ্রয়হীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পায় জনমানবশূন্য এই বাড়িটাকে। উদ্বাস্তু ঘুরে ঘুরে অবশেষে এরকম একটা বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া তাদের কাছে সৌভাগ্যের কথা। অনেকটা যেন 'বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনার' মত একটা ব্যাপার, ফলে কোন অপরাধ বোধ জাগ্রত হয়নি

কারুর মনে। পরদিন খবরটা শহরে ছড়িয়ে পড়তে সেখানে অগণিত অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। কিন্তু ছোট ছোট ঘরেই বিছানা পড়েছে চারটে করে, এরপর চেয়ার টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না; এ অবস্থায় জায়গা দেওয়া অসম্ভব। একজন সমবেদনার সুরে বললো 'আপনার তকলিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সে-ই হচ্ছে আসল কথা।' আর একজন জানাল— 'যদি ঘণ্টাদুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন।' কিন্তু এসব কথা তাদের কাছে বিষবৎ বলে মনে হয়।

বাড়িটাকে ঘিরে মতিনদের মনে নানা রকম স্বপ্ন জাগ্রত হয়। তার বাগানের বড় শখ। একটু জমি পেলে সে এখানে নানান ফুল গাছ লাগাত, তারপর অফিস থেকে ফিরে সে বাগানে একটু বসত, আমজাদ গুড়গুড়িতে টান দিত, গল্প প্রেমিক কাদের ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠকে কাহিনীময় করে তুলত। অথবা পুষ্পশোভিত মদির জ্যোৎস্নারাতে, কখনও বা সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য উপভোগ করত।

যথাসময়ে এই বে-আইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্য পুলিশ আসে। পুলিশকে দেখে এ বাড়ির বাসিন্দাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে? কিন্তু দুদিনের মধ্যে যে সমগ্র বাড়িটাকে খালি করে দেশ থেকে উধাও হয়েছে তার পক্ষে এসব ভাববার অবকাশ আছে বলে তাদের মনে হয় না। আসলে যারা সময় মতো না আসার জন্য এ বাড়ি দখল করতে পারেনি, খবর দিয়েছে তারাই পুলিশকে। কিন্তু এ বাড়ির দখলদারেরা রুখে দাঁড়ায়, তারা বোঝাতে চায় যে, তারা দরিদ্র কেরানি মানুষ হলেও ভদ্র ঘরের সন্তান। বাড়ি দখল তারা করেছে বটে কিন্তু তাই বলে তারা জানালা-দরজা ভাঙেনি, ইট-পাথর ভেঙে চোরাবাজারে চালান করেনি। তারা শুধু আশ্রয় নিয়েছে। ফলে নালিশটা যেই করুক সেটা যথাযথ নয়। সাব-ইনস্পেকটর ভালো-মন্দ গোছের একটা রিপোর্ট জমা দিয়েছে এইভেবে যে, 'এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।' বিপদটা কেটে যেতে সকলেই যেন আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

রাতারাতি বাড়িটা সরগরম হয়ে ওঠে। ঝকঝকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। এ বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া মানুষদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা কলকাতার দুর্গন্ধযুক্ত গলিতে বাস করত। তারা আজ এ বাড়ির বড় বড় ঘর, মস্ত জানালা, প্রশস্ত উঠোন, আম-জাম কাঁঠালের বাগান পেয়ে ভিন্ন এক দুনিয়ার আস্বাদ গ্রহণ করছে। সপ্তাহব্যাপী মোগলাই খানা প্রস্তুত করেছে, কেউ নানির কাছে শেখা পিঠে তৈরি করেছে; কোনো কোনো সন্ধ্যায় গানের আসর বসিয়েছে। এই সময়ে তারা একদিন হঠাৎ সকালবেলায় উঠানের প্রশস্ত প্রান্তে রান্নাঘরের পিছনে একটা তুলসীগাছের মঞ্চ দেখতে পায়। রবিবার সকালে নিমের ডাল মুখে চিবোতে চিবোতে মোদাব্বের তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। এমনিতেই সে একটু হুজুগে ধরনের মানুষ, সামান্য কথাতেই আওয়াজ করা তার অভ্যাস। কিন্তু আজকের চিৎকারে এমন একটা সুর ছিল যাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারল না, কী ব্যাপার দেখার জন্য ছুটে এলো—সবাই ভেবেছিলো সাপ-খোপ দেখবে, তাই তুলসীগাছটা তাদের নজরে পড়ে নি। তারা কী দেখবে ভেবে পায় না। মোদাব্বের ক্রোধের সঙ্গে বলে ওঠে—'এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসীগাছটা দেখতে পাচ্ছ না?' তার এই ক্রোধের কারণ সম্বন্ধে লেখক জানাচ্ছে—'উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ-বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।' অর্থাৎ 'তুলসীগাছ' এখানে হিন্দুয়ানির প্রতীক।

মুসলিম মোদাব্বের তাই তাকে উপড়ে ফেলতে চায়। সকলে তুলসীগাছটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে বহুদিন জলের অভাবে গাছটা মরে যেতে বসেছে। কিন্তু মোদাব্বের তাদের এই নিঃশব্দ আচরণে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বলে উপড়ে ফেলতে। কিন্তু 'আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে।' লেখক তাঁর অনবদ্য লেখনীতে সামান্য একটি রেখার আঁচড়ে এক গভীর সত্য প্রকাশ করলেন এভাবে—'আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসীগাছটি হঠাৎ সে-বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।' মুসলিম মোদাব্বের দমবার পাত্র নয়, সে কিছুতেই হিন্দুর এই সংস্কার স্বরূপ গাছটিকে মেনে নিতে পারে না। তাকে উপড়ে ফেলার জন্য সে বধ্য পরিকর। কিন্তু বাকিরা কিছুটা যেন স্তব্ধভাবে এই গাছটিকে কেন্দ্র করে হিন্দু নারীর রীতি-নীতি সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের কল্পচোক্ষে সিঁদুরে সজ্জিতা গৃহকর্ত্রীকে দিনান্তে ঐ তুলসীগাছের তলায় প্রদীপ জ্বালতে দেখে। হয়ত দুর্দিনে ঝড় এসেছে ঘরে, হয়ত কারো জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে চিরতরে, তথাপি এখানে প্রদীপ জ্বালার অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বধ থাকে নি। অথচ আজ সেই গৃহকর্ত্রী হয়ত আসানসোল, বৈদ্যবাটি বা লিলুয়ায় কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। অথবা মহিলাটি কোন এক চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে আছে। তবে যেখানেই সে থাকুক না 'আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ-তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়ত ছলমল করে ওঠে।'

এই তুলসীগাছটিকে কেন্দ্র করে একেক জনের একেক রকম প্রতিক্রিয়া। ইউনিসের সর্দি হয়েছে বলে সে ভাবে 'থাক্না ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসীগাছ থাকা ভালো। সর্দি কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।' শুধু ইউনিসের নয়, সবারই যেন এই মত। এমনকি মৌলবী ধরনের মানুষ এনায়েতেরও। ফলে অক্ষত দেহে তুলসীগাছটি বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে একটা যেন অস্বচ্ছন্দতার ভাব দেখা যায়। ফলে সান্ধ্য আড্ডায় আজ আর অন্য কোন বিষয় নয়, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িকতা। মোদাব্বের হিন্দুদের অবিচার অত্যাচারের কথা তোলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বামপন্থায় বিশ্বাসী মকসুদ প্রতিবাদ করে। কয়েকদিন পরে তুলসীগাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে দেখে তুলসীগাছের তলায় যে আগাছা জন্মেছিল সেগুলো আর নেই। গাছটাও আগের চেয়ে অনেক বেশি সতেজ হয়েছে। অর্থাৎ কেউ তাতে লুকিয়ে লুকিয়ে জল দিচ্ছে। তার হাতের কঞ্চিটা সে তুলসীগাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু গাছটা অক্ষতই থাকে।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত তারা এই আলো হাওয়ার মধ্যেই তাদের নতুন জীবনটাকে শুরু করতে চায়। কিন্তু এই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। সেদিন যখন তারা অফিস থেকে ফিরে খিচুড়ি রান্নায় ব্যস্ত তখন বাইরের সিঁড়িতে পুলিশের ভারি জুতোর শব্দ শোনা যায়। মতিন সবিনয়ে প্রশ্ন করে 'কাকে চাই?' উত্তরে অফিসার বলেন, 'আপনাদের সবাইকে। ....আপনারা বে-আইনিভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।' সরকারের নিয়মানুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ি ছাড়ার কথা তিনি জানান। মোদাব্বের জানতে চায় বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে কিনা। পুলিশ অফিসার সহাস্যে জানান, 'গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।' ফলে কারুর মুখে আর কোন কথা জোগায় না। প্রকাণ্ড বাড়িটায় একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে তাদের মাথায় খুন চড়ে, নানারকম বিদ্রোহীভাব দেখা দেয়। কেউ বলে বাড়ির খুঁটি ধরে পড়ে থাকব......। একসময় মাথা ঠাণ্ডা হয় সকলের। পরদিন মোদাব্বের যখন এসে জানায় চব্বিশ ঘণ্টার বদলে সাতদিন আরো পাওয়া গেছে তখন সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে, তবু গম্ভীর জমাট ছায়াটা কাটে না। অতঃপর দশম দিনে তাদের বসবাসের চিহ্নস্বরূপ কিছু কাগজের

ছেঁড়া পাতা, পুরানো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো উড়ে বেড়াতে থাকে। গল্পের একেবারে শেষে লেখক পুনরায় তুলসীগাছটির প্রসঙ্গ এনেছেন। তুলসীগাছটা শুকিয়ে গেছে, তার পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। পুলিশ আসার পর থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আর কেউ এ গাছে জল দেয়নি। গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কারুর মনে হয় নি। গল্পের শেষ লাইনটা লেখক এভাবে লিখলেন 'কেন পড়ে নি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।'

বস্তুতঃ 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পে তুলসীগাছটি সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা পরিত্যক্ত বাড়িকে ঘিরে কাহিনী গড়ে উঠলেও সমগ্র গল্পের কেন্দ্রে বিরাজ করছে এই তুলসীগাছটি। তুলসীগাছ হিন্দুজাতির ধর্মের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সেই গাছটির অস্তিত্ব মুসলিমরা মেনে নিতে পারে নি। অথচ হিন্দু গৃহকর্ত্রীর বাড়িটিকে তারা জবরদখল করে বাঁচার আশ্রয় করেছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের নির্বুদ্ধিতার অথবা স্বার্থপরতার ছবি এঁকেছেন লেখক এ গল্পে। ধর্ম মানুষকে, মানুষেরই বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে, তার পক্ষে নয়। তাই তুলসীগাছটিকে মোদাব্বের উপড়ে ফেলতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধির জয় হয়, ফলে তুলসীগাছটির প্রাণ রক্ষা পায়। কিন্তু 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' বলে যে প্রবাদটি আছে সেটি যেন সহসা সত্য হয়ে ওঠে গল্পের শেষে। তাই গভর্নমেন্ট রিকুইজিশন দেয়, ফলে যে বাড়ি তাদের পরম আশ্রয় দিয়েছিল, অথচ সেই বাড়িওয়ালার ধর্মস্বরূপ তুলসীগাছটিকে যাদের ছেঁটে ফেলার কথা মনে হয়েছিল, আজ তারা সবাই সেখান থেকে বিতাড়িত হল। গল্পের শেষে তুলসীগাছের শুকিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ এনে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন—মানুষ কত স্বার্থপর। যেদিন তারা জানতে পারল যে এ বাড়ি তাদের ছেড়ে দিতে হবে সেইদিন থেকে কোন একজনও এই গাছের গোড়ায় জল দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। নিঃসঙ্গ তুলসীগাছটি মানুষের সেই স্বার্থপরতার পরম নিদর্শন স্বরূপ বিরাজ করতে থাকে।

একক ৪ ☐ মাটির আদম

মূলগল্প :

মসজিদে ফজরের নামাজের জামায়াত শেষ হয়েছে একটু আগেই। শেষরাতে কাল বৃষ্টি হয়েছে। চারদিকে দুলছে বৃষ্টি ধোয়া ভোর। মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভেজা মাটির গন্ধ মাখা ভোরের স্নিগ্ধতাটুকু বড় ভাল লাগল তালেব মিয়ার। গন্ধটাকে খুব মমতায় বুকের ভেতর জড়িয়ে নিল একটু। তারপর নেমে এল সিঁড়ি থেকে। টানা পাথে বাড়ি ফিরতে গিয়ে বাঁক বদলাল। ঘুরপথে চক বরাবর হাঁটল। এসে দাঁড়াল ধানক্ষেতের আলের ওপরে। তার পনের কানি জমির ধান বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। ভোরের তাজা বাতাসে দোল খাচ্ছে। চমৎকার দৃশ্যটা মুগ্ধ করল তালেবকে। ভোরের হাওয়ায় ঢেউ তোলা ফসলের ক্ষেত তাকে আরেকবার আত্মবিশ্বাসী করল।

ক্ষমতাশালী বড় মানুষের মত দুই এক কদম হাঁটল সে। নিজেকে মনে হল রাজাবাদশাহ। মনে মনে একটু হাসল তালেব। কথা বলল নিজের সঙ্গে—কেমুন বুঝতাছ তালেব আলী! পনের কানি জমিন জুড়াইছ। সবেদ গাজীর বন্ধকি ভিটা কিন্যা ফালাইছ। অহন আর ভাতে মরা তালেব নাই। অহন মেম্বরে খাতির করে। মসজিদের ইমামস ইসকুলের মাশটর সাবে তালাশ লয়। সবই এই জমিনের গুণে, বুঝলা নি।

খুব আত্মপ্রসাদে হাসল তালেব। নিজেকে বাহ্বা দিল। হিসেবি মানুষ তালেব এখন জানে পরিশ্রম আর কষ্ট করলেই আল্লাহর তৈরি এই জমিন হাতের মুঠোয় থাকে। নইলে নয়। গেল ক'টা মাস একটানা খরায় কাটল। মেঘ নেই। বাও বাতাস নেই। ধানক্ষেতের মাটি ফেটে ফেটে চৌচির। ক্ষেত বাঁচাবার জন্য কম কষ্ট করতে হয়েছে নাকি। তালেবের জোয়ান ছেলে আদম আলী নালা কাটতে কাটতে আর পানির ভারা টানতে টানতে হাঁপিয়ে পড়ত। এক কুড়ি কামলার কাজ কি আর পাঁচ কামলায় হয়! বলেই বসেছিল—এই আজাইরা মেহনত করনের কুনো মাইনি নাই। লস্কর মিয়ার পাম্প মেশিনটা ভাড়ায় আনলেই তো সারত।

ছেলের ওপর ক্ষেপে উঠেছিল তালেব—পয়সা নি গাছের গোটা। ঝাঁকি দিলেই যান পড়ে। পাম্প ভাড়া করতে ট্যাকা লাগে না?

বেজার মুখে বাপের কথার জবাব দিয়ে ফেলেছিল আদম—পাম্প একটা কিন্যা লইলেই তো সারে।

পৃথিবীর আশ্চর্যতম কথাই যেন বলে ফেলেছে তালেব। কিছুক্ষণ কথা ফোটেনি তালেবের মুখে। তারপরই ছেলেকে তীক্ষ্ণ চোখ বিঁধিয়ে ভেংচি কেটেছিল—কস কী তুই। পাম্প মেশিন কিনুম পয়সা দিয়া আমি। ফুটানিখান তো দেহি জব্বর শিখা ফালাইছ। কী না কয়, মায়ের নাম কেটকী বান্দী, পুতের নাম শাহ সুলতান। ইঃ ট্যাকার গরম কত।

—ক্যান, টাকা পয়সা কি তোমার নাই? তাইলে জমিন কিনতাছ ক্যামনে?

আদমের বেআক্কলীপনার জবাব খুঁজে পায়নি তালেব।

এখন ধানক্ষেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেরে আর একবার বেকুব বলল মনে মনে। টাকা তো আর হরিলুটের বাতাসা নয় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে হবে। কথাটা ছেলের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ

চেষ্টা করছে তালেব। পারছে না কেবল ওর মা ছালেহার জন্য। মেয়ে মানুষটার রাতদিন ঘ্যানঘ্যানানির স্বভাব। ঘরের চালের শন বদলে টিনের ছাউনি দাও। মেয়ের জামাইকে ভ্যানগাড়ি কিনে দাও। এটা দাও, সেটা দাও। দাও বলা ছাড়া আর সব কথা যেন ভুলেই বসেছে বিশ বছরের সংসার করা ছালেহা। ক'দিন আগে বায়না ধরেছে, এইবার ধান উঠলে আমারে সোনার বালি বানাইয়া দিবেন কইলাম। ছোট মেয়েটা বারো বছর ছাড়িয়েছে। এখনই তার জন্য পাত্র খোঁজা শুরু করেছে ছালেহা। কথা পেড়েছে দু'দিন আগেই—সম্বন্ধ একখান পাইছি। পোলায় সৌদি গিয়া বহুত পয়সা কামাইয়া আনছে। চৌচালা টিনের ঘরে টিনের বেড়া। ঘরে টিভি আছে, রেডিও আছে, ঘরের ভাত খায়। এমুন সম্বন্ধ কি কেউ হাতছাড়া করে! প্রস্তাবটা লোভনীয়। কিন্তু এমন পাত্রের বাজারদর তালেব আলীর অজানা নয়। কমসে কম পঞ্চাশ হাজার টাকা তো হাঁকবেই। তবু প্রশ্ন করে—টাকা চায় কতডি?

—সত্তর হাজার নগদ, আর একখানা ভ্যানগাড়ি, তার উপর জামাই সাজানি।

—চোপ, চোপ। আর কথা কবি না। প্রচণ্ড ধমকে স্ত্রীকে থামিয়ে দিতে হয়েছে। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বাড়ি ফাটিয়েছে তালেব আলী—আমার মাইয়া কি পচা আলুর বস্তা যে লাখ টাকা দিয়া পার করামু! দিমু না মাইয়ার বিয়া। ওই ট্যাকায় জমিন রাখলে এমুন বহুত কাউয়ারে কামলা খাডাইতে পারব আমার মাইয়া।

এরপর থেকে সাবধান হতে হয়েছে তালেবকে। জমি-জমার কথা আর ভুলেও আলাপ করেনি ছেলেমেয়ে আর ওদের মায়ের সামনে। নিকারী বাড়ির হরি দাশকেও ব্যাপারটা সম্পর্কে সাবধান করেছে। মহাজনের পাওনা শোধ করবার জন্য চরের তিন কানি জমি অনেক কম দামেই সে দিচ্ছে। তবু হুঁশিয়ার করেছে তালেব—খবরদার, জমিন বেচাকিনির খবরডা কইলাম কাউয়া-চিলেও য্যান টের না পায়। দাঁতের ফাঁক আলগা করছ কী, জমিন তোমার আর নিমু না।

হরি দাশ এই কথাতেই রাজি—হেইডা আর কওন লাগে। আমার ঘরের ইস্তিরিও জানব না।

আলের ওপর কয়েক চক্কর দিয়ে জাউল্যা পাড়ার পথে উঠল তালেব। হরি দাশকে সঙ্গে নিয়ে আজ তার শ্রীনগরে যাবার কথা। জমির বায়না করা হয়ে গেছে সেই কবে, দলিল করা নিয়ে নানা টালবাহানা করছে হরি। এ নিয়ে তালেব অবশ্য চিন্তিত নয়। সাদা কাগজে হরি দাশের টিপ সই নিয়ে রাখতে সে ভোলেনি। জমি না দিয়ে যাবে কোথায়!

দিনের শরীর থেকে ভোরের স্নিগ্ধতা মুছে গেছে। এদিক সেদিক দু'চারজন মানুষের আনাগোনা চোখে পড়ছে। নিচু ডাঙার তেঁতুল গাছের আড়াল থেকে হুট করে বেরিয়ে এল গাছি বাড়ির মকদুম। কাঁধে গামছা। হাতে ঝুলছে প্লাস্টিকের বদনা। ভোরের প্রাকৃতিক কাজটা তেঁতুল গাছের লাগোয়া মজা ডোবাতেই সেরে এল। ব্যাটা কঞ্জুসের হাঁড়ি। পয়সা খরচের ভয়ে বাড়িতে পায়খানা তৈরি করে না। এদিকে ধানের ব্যবসার টাকার গরমে বাঁচে না। কোমর বেঁধে নেমেছে জমি বেচা-কিনির কারবারে। আশ্বিন মাসে কৈখোলার চৌধুরীদের ভিটি জমিটা তালেবের হাতছাড়া হল তো ওরই জন্য। ওকে দেখলে তারপর থেকে তালেবের মেজাজ নিম-তেতো হয়ে যায়। ঠিক তালেবের সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল মকদুম। বাসি মুখে বেহায়া হাসি ফুটিয়ে তুলল, এই যে তালেব কাকা! যাও কই এই আন্ধার বিহানে?

ভোরের প্রসন্নতা ঝরে গেল তালেবের পাশ থেকে। ভুরু কুঁচকে জবাব দিল, যাই গাংগের ঢেউ গুনবার।

হি হি করে হাসল মকদুম। খুব যেন মজার রসিকতা করেছে তালেব। হাসিটা থামিয়ে ফেলল তখনি। কপালে দুশ্চিন্তার আঁচড় তুলে বলল—গাঙ এইবার বড় বেসামান। পানি বাড়তাছে ধুমাইয়া। গতিক তো ভাল ঠেকাতাছে না। কী জানি কী হয়।

মেজাজ বিগড়ে গেল তালেবের। সাতসকালে খেজুরে আলাপ জুড়তে এসেছে বেহায়াটা। বর্ষায় গাঙের পানি বাড়বে না তো বাড়বে কি উন্নায়!

ওকে আর আমল না দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে এল তালেব নিকারী পাড়ায়। হরি দাশের ঘরের সামনে এসে হাঁক দিল—বাড়িত্ আছসনি হইর‍্যা?

ভাতে মরা হরির মতই যেন ধুঁকছে ওর ভাঙা কুঁড়ে। সামনে মেলা রয়েছে মাছ ধরার ছেঁড়া জাল। হাঙর মাছের কংকালের মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা ভাঙা নৌকা। তার ওপর বসে সাজিতে মুড়ি নিয়ে খাচ্ছে হরির ন্যাংটো ছেলেটা। পাশে দাঁড়ানো নেড়ি কুকুরকে এক মুঠো মুড়ি ছুঁড়ে দিয়ে বলল—বাবায় বাড়িত্ নাই।

মেজাজ চড়ে গেল তালেবের। হরি দাশ তাকে একটু বেকুব বানাবার চেষ্টায় আছে নাকি। হরির ছেলেকেই রুক্ষ ধমক দিল তালেব—কই গ্যাচে তর বাবায়?

—জানি না।

নিরাসক্ত জবাব দিয়ে ছেলেটা ঘেয়ো কুকুরকে মুড়ি খাওয়াতে ব্যস্ত হল।

ঝনাৎ করে খুলে গেল উইয়ে খাওয়া কাঠের দরোজা। হরির রোগা ঢ্যাঙা বউ বকের মত গলা বাড়াল—ক্যাঠায়?

—আমি গো বাসী। মুন্সী পাড়ার তালেব আলী। হরি বাড়িত্ নাই?

মাথায় আঁচল টেনে ঘরে অদৃশ্য হল হরি দাশের বউ। সেখান থেকে গলা তুলে বলল—হ্যায় তো নাও লইয়া গ্যাছে মাওয়ার ঘাটে। আইতে বেইল হইব।

মনটা দমে গেল। কী যেন, বেশি দামের লোভ দেখিয়ে মতলববাজ মকদুমটা হরির জমি কব্জা করার তাল করছে কি না কে জানে? মনে মনে তৈরি হয়ে গেল তালেব পলকে। বেঈমানি করে দেখুক না একবার হরি দাশ। সাদা কাগজের টিপ সইকেই জমি দখলের অস্ত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে ফেলল তালেব আলী। তারপর জোর কদমে একটানে হেঁটে চলে এল গাঙপারের বাজারখোলায়। মদন গাজীর চায়ের দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। গজারি কাঠের খুঁটির মত তার এক জোড়া শক্ত মজবুত পা হালকা পাটখড়ি হয়ে কেঁপে উঠল। বুঝি পায়ের তলায় কঠিন মাটির আশ্রয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পঞ্চাষ বছরের শক্তিশালী প্রৌঢ় তালেব আলীর মনে হল—শরীরটা তার কাদামাটি হয়ে গলে পড়বে এখুনি।

চুলোয় সবে আঁচ ধরিয়েছে মদন। বড় কড়াইতে বাসি দুধ টগবগিয়ে ফুটতে শুরু করেছে। বেড়ায় ঝোলান রেডিওতে গান বাজছে। মাটির হাঁড়িতে চায়ের কাপ-পিরিচ ধুতে ধুতে অবাক চোখে তালেবকে দেখল সে। প্রশ্নের ভুরু তুলে বলল—এমুন সব্‌বিরে আইলা যে। সমাচার কী?

জবাব দিল না তালেব। তার আতংকিত দৃষ্টির সামনে বিশাল এক নদী ভয়ংকর ঢেউয়ের মাতন তুলে হুংকার দিচ্ছে। এগিয়ে আসছে কূলের দিকে।

কাজ রেখে উঠে এল মদন। তালেবের পিঠে হাত রেখে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল আবার—হইছে কী তালেব মিয়া? মুসিবত আইল নি কুনো?

হালকা মাথা নাড়ল তালেব। দুর্বল জড়ান শব্দে বলল—হ।

তারপর নদীর দিকে আঙুল তুলে আশংকিত চোখে তাকাল মদনের দিকে—গাঙ ক্যান এমুন করতাছে? দেখছ, কেমুন মোচড় দিয়া উঠছে? কেমুন ডাক ছাড়তাছে।

মদন আবার কাপ-পিরিচ ধুতে বসল। কালি ধরা বড় কেটলি চুলোয় বসিয়ে দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল—রেডিওতে খবর কইল উজানে অবস্থা খুব খারাপ। হেইদিকে বইন্যা। আবার হেইপারে গাঙ ফরিদপুরের কানি ধইরা ভাঙতাছে জবর। ঠেইলা নামতাছে পানি। এইবার জমি-জিরাত যাইব। ধানপান খাইয়া শ্যাষ করব ঠ্যাকে।

যেন অবিশ্বাস্য কিছু বলছে মদন। অবাক হতভম্ব ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল তালেব। এমনও হতে পারে! এতটা বছর ধরে যে নদী ধু ধু চরের মাঝে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে থাকল, চরের পর চর জাগিয়ে জমিনের সীমানা বাড়িয়ে দিল, কোন্ যাদুমন্ত্রে সেই বয়সী নদী আবার দুর্বার যৌবনে ভাঙনের খেলায় মেতে উঠল! নদীর ভাঙনকে তো গাঙপারের মানুষ তালেবের চিনতে বাকি নেই।

ভাঙন-লাগা নদী তো রাক্ষুসী। তালেব আলীর ইচ্ছে হল তার ধানক্ষেত আর জমিগুলোকে তুলে বুকে জড়িয়ে পালিয়ে যায় অন্য কোনো পৃথিবীতে। এই মুহূর্তে মকদুম নয়, এই রাক্ষুসী নদীই তার বড় শত্রু।

বাতাসে উড়ে আসছে অশান্ত নদীর গম্ভীর গর্জন। ছুটে আসছে নদী। ঢেউয়ের সহস্র লোভী হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তালেব আলীর স্বপ্নের জমিনের দিকে।

স্বপ্নাহতের মত দাঁড়িয়ে গেল তালেব। চরাচর জুড়ে গর্জন করছে এক সর্বগ্রাসী নদী। যক্ষী বুড়ির মত একে একে পৃথিবীর সব মাটি টেনে নিচ্ছে গভীর অতলে।

বাজারখোলা ডুবল। নিকারীপাড়া ছাড়িয়ে নদী এসে গেল চৌধুরী বাড়ির ডাঙায়। আমবাগান, কাঁঠালবাগান ভাসিয়ে চক, বিল একাকার করে পৌঁছে গেল তালেবের উঠোনে। বিলের ধারে শ্মশান ঘাটার মঠের চুড়োটা পর্যন্ত ডুবে গেল। মসজিদের পেছনের একশ' বছরের পুরনো অশথ গাছটা বুক অবধি তলিয়ে গেল। দিন কাটল, মাস কাটল। পানি বাড়ছেই। নদী আর নদী নেই। গ্রাম আর গ্রাম নেই। আছে শুধু পানি। নিষ্ঠুর হিংস্র পানি।

তালেব আলী এখন কোনো কূলভাঙা বানডাকা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। সে বসে আছে মাচায়। আর এক মাচায় শোকে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে ছালেহা। ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করে কাঁদছে তার বারো বছরের মেয়ে। কাল রাতে তালেবের বেআক্কেল ছেলে আদম আলী সাপের কামড়ে মারা গেছে। মসজিদের সামনে অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে খেজুর গাছ, সেই গাছে বাঁধা রয়েছে তালেবের কোশা নৌকা। সেই নৌকার ওপরেই শুয়ে আছে আদমের লাশ। একটু আগে, যোহরের নামাজের পর তার জানাজা পড়ান হয়ে গেছে।

পানি সাঁতরে মাচার কাছে এল তালেবের বিশ্বস্ত বন্ধু মদন গাজী। কোমরের লুঙ্গি খুলে মাথায় জড়িয়েছে। এক পা বাঁশের সাঁকোতে তুলে লুঙ্গিটা পরে নিল। মাচায় না উঠেই ডাকল—নাইমা আহ তালেব। আদমরে তো বিদায় দেওন লাগে। সাঁইঝা লাগলে আর গাংগের সীমানা থিত্ পাওয়া যাইবে না।

বাস্তব বর্ণনা ঃ

মদনের কথা এসে যেন পৌঁছয় নি তালেবের কানে। শূন্য দৃষ্টি তার দূরে নিবদ্ধ। দেখবার মত দৃশ্য অবশ্য দূরে বা কাছে তেমন কিছুই নেই। চরাচর জুড়ে কেবল ঢেউ খেলছে অথৈ পানি। ডুবে যাওয়া ঘরের জেগে থাকা চালের মাথায় ক্ষুধার্ত কাকের জটলা। ডুবন্ত কিছু গাছ পানির তলা থেকে ডালপালা শূন্যে তুলে আঁকড়ে ধরতে চাইছে যেন বাঁচার অবলম্বন। দৃশ্যগুলো একটানা দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে গেছে। নতুন করে দেখারও কিছু নেই। ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটেছে। পানি সাঁতরে কিছু পাড়াপ্রতিবেশী এসেছে তালেবের বাড়িতে। আশেপাশের কয়েকজন বয়সী স্ত্রীলোক জ্ঞানহারা ছালেহাকে ঘিরে রেখেছে। এইটুকুই ব্যতিক্রম।

মসজিদের ইমাম লগি ঠেলতে ঠেলতে নৌকা নিয়ে এসে থামলেন তালেবের উঠোনে। পাকা দাড়ি থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। জোব্বা ভিজে সেঁটে গেছে শরীরে। নৌকায় দাঁড়িয়েই তালেবকে ডাকলেন—তালেব মিয়া, আর তো দেরি করন যায় না। লাশা ফালাইয়া রাখলে রুহের তো কষ্ট হয়। দাফন করন লাগে জলদি।

দাফন! শব্দটায় ভীষণভাবে চমকে উঠল তালেব। দূরে নিবদ্ধ দৃষ্টি তার ঘুরল চারপাশে। কোথায় দাফন করবে আদমকে? গ্রামের গোরস্তান এখন এক বাঁশ সমান পানির তলায়। মাটির আদমকে তো মাটির কোলেই ফিরিয়ে দিতে হয়। নসীব আদমের! এক চিলতে মাটি কোথাও জেগে নেই।

মদন উঠে এসেছে মাচার ওপর। এক হাত রাখল সে তালেবের কাঁধে—আল্লাহর মাল আল্লায় নিছে। বান্দার কি কোনো হাত আছে? বইয়া থাকলে তো চলব না। লও উঠ। লাশ ভাসাইয়া দিয়া আহি।

মুখ তুলল তালেব—ভাসাইয়া দিমু! কই ভাসাইয়া দিমু!

প্রশ্নটা করেই মনে পড়ে গেল। কথাটা এ রকমই হয়েছে। লাশ দাফন করার মাটি যখন নেই, তখন লাশ ভেলায় করে ভাসিয়েই দিতে হবে।

মসজিদের ভেতরে এক কোমর পানি। সেখানে দাঁড়িয়েই জানাজা পড়িয়েছেন ইমাম সাহেব। মুনাজাত করবার সময় তার ভেজা দাড়ি আবার ভিজল চোখের পানিতে।

'ইয়া মাবুদ! মাটি দিয়া বানাইলা তুমি আদমরে। আবার মাটি দিয়া বানাইলা জমিন। আদমরে বেহেস্ত থিকা নামাইয়া দিলা সেই জমিনে, মাবুদ। আদমের মাটির শরীর মিশ্যা যায় মাটিতে... সেই মাটির জমিন... এই আদমের লাইগ্যা মিলাইয়া দেও মাবুদ। দেও মাবুদ শুধু একটু কবরের মাটি।'

ইমামের মুনাজাতের শেষেই ভেলায় ভাসিয়ে দেবার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল সবাই। মকদুম এসেছিল জানাজায়, সে বলল—সাপে কাটা লাশ ভাসাইয়া দেওনই তো নিয়ম।

মাচার ওপর থেকে নিঃশব্দে নামল তালেব। উঠোনের বুকপানি ঠেলে মসজিদের সামনে এল।

ছালেহার জ্ঞান ফিরেছে। বুকফাটা চিৎকারে উঠোনের পানি কাঁপিয়ে তুলছে। তার কান্নার ভাঙা টুকরোগুলো ভেজা বাতাসে ভেসে পৌঁছে গেল তালেবের কাছে—ওই যে জমিনের বাদশা। জমিন কিনা কিনা ভুর দিছে। অহন আমার আদমরে ক্যান এক কবরের জমিন দিবার পারে না। ক্যান আমার বা'জানরে পানিতে ভাসাইয়া দেয়?

রুখে উঠল তালেব—চুপ। চুপ। ওই বেটিরে চুপ করতে কও। অরে কইয়া দেও আদমরে আল্লায় মাটি দিয়া বানায় নাই। বানাইছে পানি দিয়া...।

ইমাম সাহেব এসে থামাল তালেবকে।

কলাগাছের ভেলা তৈরি হতে হতে সূর্য নেমে গেল পশ্চিমে। গোধূলির রং মাখা একখণ্ড মেঘ সে থমকে দাঁড়াল সূর্যের কোল ঘেঁষে।

নিঃশব্দে লগি ঠেলছে তালেব। তার কোশা নৌকার সঙ্গে বাঁধা ভেলায় ভেসে চলেছে আদমের লাশ। গাঙপারে চৌধুরীদের ইটখোলার ইটের স্তূপের মাথা সামান্য জেগে আছে পানির ওপরে। সেদিকে তাকিয়ে মদন বলল—থাম তালেব। নাও থামাও। এহানেই লাশ নামান লাগব। পানি এহানে গভীর। লগি বাও পায় না।

বৈঠা তুলে নিল মদন। ইমাম আর মাস্টার সাহেবও এসেছেন লাশ ভাসাতে। কলমা পড়তে পড়তে ভেলার রশি আলগা করলেন ইমাম সাহেব। শরীরে জড়ান চাদরের তলা থেকে একটা বোতল বের করলেন মাস্টার সাহেব। বোতলটা রাখলেন ভেলায় আদমের লাশের পাশে। বোতলের ভেতর এক টুকরো লেখা কাগজ।

লাশের ভেলা নামিয়ে ঠেলে দিল তালেবই। ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল হল ভেলা। ঘুরপাক খেল কয়েকবার। তারপর ভেসে গেল দূরে। মাস্টার সাহেব খুব আস্তে বললেন—কাগজে লেইখা দিছি।

—কী লেখছেন মাস্টার সাব? অর নাম-ঠিকানা?

মদনের প্রশ্নে মাথা নাড়লেন মাস্টার সাহেব—লেখছি যদি এই ভেলা কুনো শুকনা জমিনে গিয়ে ঠ্যাকে, যদি কেউ এই লাশ পায় তবে য্যান এই আদম সন্তানরে দয়া কইরা মাটির তলে দাফন কইরা দেয়।

ইমাম সাহেব আস্তে বললেন—সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ কবুলের মালিক। আর কেউ কোনো কথা বলল না।

সূর্য নেমে এসেছে নদীর নাগালের কাছাকাছি। যেন আসমান থেকে গড়িয়ে পড়ছে সোনালি আলোর ধারা। সেই উজ্জ্বল তীব্র আলোয় অদৃশ্য হল আদমের লাশের ভেলা। এতক্ষণ নৌকার ওপর স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তালেব। ভেলা অদৃশ্য হতে পাটাতনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আবেগে কেঁদে উঠল—ইয়া আল্লাহ! চাই না জমিনের বাদশাহি। মাটির আদমরে খালি এক টুকরো কবরের মাটি দিও। খালি এক টুকরা জমিন। আর কিছু না। ইয়া রহমানুর রহীম।

চারদিকের বাড়ো বাতাসে ঢেউয়ের গর্জন। সূর্য ডুবছে। ইমাম সাহেব মৃদু কণ্ঠে বললেন—নায়ের মুখ ঘুরা মদন।

৪.১ লেখক পরিচিতি

৪.১ রিজিয়া রহমান :

১৯৩৯-এর ২৮শে ডিসেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ওপার বাংলার অন্যতম কথা সাহিত্যিক রিজিয়া রহমান। ১৯৬৭-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। লেখালেখিকেই তিনি তাঁর পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর গল্প উপন্যাস রচনার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও অন্যান্য সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ

উপন্যাস ঃ

১। ঘর ভাঙা ঘর

২। উত্তর পুরুষ

৩। বং থেকে বাংলা

৪। অরণ্যের কাছে

৫। শীলায় শীলায় আগুন

৬। উপাখ্যান

৭। ধবল জ্যোৎস্না

গল্প ঃ

১। অগ্নিস্বাক্ষরা (১৯৬৭)

২। নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮)

অনুবাদ ঃ

১। সোনালী গরাদ (১৯৯৫)

৪.২ গল্পের আলোচনা : মাটির আদম

'মাটির আদম' গল্পটি তালেব মিয়া নামক একটি মানুষের ট্রাজেডির গল্প। পনের কানি জমি ও সাবেদ গাজীর বন্দকি ভিটা কিনে সে আত্মপ্রসাদে ভরপুর। নিজেকে সে ক্ষমতাশালী মানুষ বলে ভেবে আনন্দ পায়। কিন্তু সংসারের প্রয়োজনে একটি পয়সাও খরচ করতে সে রাজি নয়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া,বা জমি চাষের জন্য পাম্প কেনা, অথবা ঘরে ছাউনি দেওয়া—এসব তার কাছে বড় মানুষি। তাই আজকাল সে জমিজমা কেনার কথা বাড়িতে জানায় না। এ হেন তালেবের কোল শূন্য করে একদিন আদম চলে যায়। কিন্তু তাকে কবর দেবার জন্য একটুকরো জমি খুঁজে পায় না। পনেরো কানি জমির মালিক তালেব মিয়া।

এক বৃষ্টিভেজা ভোরে মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তালেব মিয়া ভোরের স্নিগ্ধতাটুকু আস্বাদ করল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাড়ির পথ ধরলো। কিছুটা আসার পর বাঁক বদল করে সে এসে দাঁড়াল ধান ক্ষেতের মাঝে। তার পনের কানি জমির ধান বেশ সতেজ হয়ে দোল খাচ্ছে। চমৎকার দৃশ্যটা তাকে মুগ্ধ করল এবং আত্মবিশ্বাসীও। নিজেকে সে রাজাবাদশাহ মনে করল—'কথা বলল নিজের সঙ্গে—কেমন বুঝতাছ তালেব আলী। পনের কানি জমিন জুড়াইছ। সবেদ গাজীর বন্দকি ভিটা বিদ্যা ফলাইছ। অহন আর ভাতে মরা তালেব নাই।' সে জানে এখন তাকে সবাই খাতির করে এই জমির জন্যই। নিজেকে সে বাহবা দিল। মানুষ তালেব এখন বুঝেছে পরিশ্রম আর কষ্ট করলে আল্লাহর তৈরি জমিন তার হাতের মুঠোয়।

অনেকগুলো মাস খরায় কাটল। আকাশে মেঘ নেই, মাটি ফেটে চৌচির। ক্ষেত বাঁচাবার জন্য তালেব মিয়ার ছেলে আদম নালা কাটতে কাটতে আর পানির ভারা টানতে টানতে হাঁপিয়ে পড়ত। তাই সে লস্কর মিয়ার পাম্প মেশিনটা ভাড়ায় আনার কথা বলেছিল। ছেলের ওপর ক্ষেপে উঠেছিল তালেব, বলেছিল, 'পাম্প ভাড়া করতে ট্যাকা লাগে না?' তার উত্তরে সে আরও একটা সত্য কথা বলেছিল 'পাম্প একটা কিন্যা লইলেই তো সারে।' 'পৃথিবীর আশ্চর্যতম' কথাই যেন বলে ফেলেছে সে। তালেব একথা শুনে ভেঙচি কাটল ছেলেকে, তারপর বলল—'কস কী তুই! পাম্প মেশিন কিনুম পয়সা দিয়া আমি। কুটানিখান তো দেহি জব্বর শিখা ফালাইছ।' টাকা যে হরিলুটের বাতাসা নয়, একথাটা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে তালেব তার ছেলেকে। কিন্তু পারছে না তার মায়ের জন্য। নিজের স্ত্রী, তালেবের কাছে মেয়েমানুষ। মনে মনে সে বলে 'মেয়ে মানুষটার রাতদিন ঘ্যানঘ্যানানির স্বভাব। ঘরের চালের শন বদলে টিনের ছাউনি দাও। মেয়ের জামাইকে ভ্যান গাড়ি কিনে দাও। এটা দাও, সেটা দাও।' 'দাও' বলা ছাড়া আর অন্য কথা ভুলে গেছে বিশ বছরের সংসার করা স্ত্রী ছালেহা। এবারে তার বায়না ধান উঠলে সোনার বালি বানিয়ে দিতে হবে। ছোট মেয়ের বারো বছর ছাড়িয়েছে, এখনই ছালেহা তার জন্য পাত্র খোঁজা শুরু করেছে। একটা সম্বন্ধও পেয়েছে, ছেলে সৌদি আরব গিয়ে অনেক পয়সা কামিয়ে এনেছে। ঘরে তার টিভি আছে। রেডিও আছে, ঘরের ভাত খায়। এমন সম্বন্ধ কি কেউ হাতছাড়া করে। কিন্তু অত্যন্ত কঞ্জুস তালেব মিয়ার এসবে কিছু যায় আসে না। সে জানে এমন পাত্রের বাজার দরও অনেক। অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো হাঁকবেই। তবু জানতে চায় সে 'টাকা চায় কতাডি?' সত্তর হাজার নগদ, আর একখান ভ্যানগাড়ি, তার উপর জামাই সাজানি।' রেগে ওঠে তালেব, চুপ করতে বলে স্ত্রীকে। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে 'আমার মাইয়া কি পচা আলুর বস্তা যে লাখ টাকা দিয়া পার করামু! দিমু না মাইয়ার বিয়া। ওই ট্যাকায় জমিন রাখলে এমুন বহুত কাউয়াকে কামলা খাডাইতে পারব আমার মাইয়া।'

এরপর থেকেই জমি-জমার কথা সে বাড়িতে বলা বন্ধ করেছে। এমনকি হরি দাশকেও সে সাবধান করেছে। মহাজনের টাকা শোধ করার জন্য চরের তিনকানি জমি সে খুব কম দামে বিক্রি করছে তালেবকে। তাই হুঁশিয়ার করেছে এই বলে 'দাঁতের ফাঁক আলগা করছ কি, জমিন তোমান আর নিমু না।' জমি বায়না হয়েছে অনেক দিন, শুধু দলিল করা নিয়ে হরি দাশ দেরি করছে। তবে তালেব সাদা কাগজে হরি দাশকে দিয়ে সই করিয়ে রেখেছে আগেই। ফলে জমি না দিয়ে যাবে কোথায়! এসব ভাবতে ভাবতে জটল্যা পাড়ার

পথে চলতে থাকে তালেব। এমন সময় চোখে পড়ে মকদুম কে। টাকার গরমে সে যেন বাঁচে না। তারই জন্য কৈখালার চৌধুরীদের ভিটা খারাপ হয়ে যায়। সাতসকালে খেজুরে আলাপ তার ভালো লাগে না। তাই ওকে বিশেষ আমল না দিয়ে তালেব হনহনিয়ে নিকারী পাড়ায় হরির বাড়িতে এসে দাঁড়ায়। হরিকে না পেয়ে তার মনে সংশয় দেখা দেয়। তাহলে কি মকদুমের কাছে বেশি দামে জমি বিক্রির তাল করছে। তাই যদি করে তাহলে সাদা কাগজের টিপ সই নিয়ে সে লড়াই করবে। মনটা তার দমে গেল। হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হল গাঙপারের বাজারখোলায় মদনগাজীর চায়ের দোকানে। গাঙের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল সে, তার শক্ত মজবুত পা দুটো কেঁপে উঠলো এক আশঙ্কায়। গাঙপারের মানুষ সে, নদীর ভাঙন তার অচেনা নয়। এত বছর ধরে যে নদী ধু ধু চরের মাঝখানে ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিল, আজ সে যৌবনের ভাঙনের খেলায় হয়ত মেতে উঠবে-এই অজানা আশঙ্কায় তালেব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে হল এই রাক্ষুসী নদীর হাত থেকে 'তার ধানক্ষেত আর জমিগুলোকে তুলে বুকে জড়িয়ে পালিয়ে যায় অন্য কোনো পৃথিবীতে।' এই মুহূর্তে তার একমাত্র শত্রু হল রাক্ষুসী নদীই।

তালেব মিয়ার আশঙ্কাই সত্য হল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সব মাটি টেনে নিল সর্বগ্রাসী নদী। বাজারখোলা ডুবল, ডুবল নিকারী পাড়া। আমবাগান, কাঁঠালবাগান, চক, বিল সব ভাসিয়ে জল এল তালেবের উঠোনে। শ্মশান ঘাটের চুড়োটা পর্যন্ত ডুবে গেল। দিন গেল, মাস গেল তবু কমল না জল। গ্রামগঞ্জ ছাপিয়ে শুধু চারিদিকে পানি আর পানি। একশ বছরের পুরনো অশত্থ গাছটাও ডুবে গেল। তালেব আলীর বাস এখন মাচায়। আর এক মাচায় তার বউ পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে, বারো বছরের মেয়েটা কাঁদছে। নদীর জল তালেব আলীর সাধের জমিন শুধু ভাসায় নি, তার ছেলেটাকেও কেড়ে নিয়েছে তার বুক থেকে। নদীর জলে চারিদিক ভেসে গেছে, সাপ, খোপ ঘোরাফেরা করছে। তালেবের ছেলে আদম সাপের কামড়ে মারা গেছে। খেজুর গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে তালেবের নৌকা, তাতে শুয়ে আছে আদমের লাশ। অতল জল সাঁতরে তালেবের বিশ্বস্ত বন্ধু মদন গাজী কাছে এলো, বললো—'নাইমা আহ্ তালেব। আদমরে তো বিদায় দেওন লাগে। সাঁইঝা লাগলে আর গাংগের সীমানা থিত্ পাওয়া যাইবে না।' কিন্তু তালেবের দৃষ্টি তখন শূন্যে নিবদ্ধ। কোন কথাই তার কানে আসে না। চরাচর জুড়ে শুধু অথৈ পানি। সেই পানি সাঁতরে সকলে এসেছে তার বাড়িতে। এসেছে মসজিদের ইমাম, আদমের দাফন করার জন্য। কিন্তু কোথায় দাফন করবে তারা আদমকে। কোথাও যে এক চিলতেও মাটি নেই। মসজিদের ভেতরে এক কোমর জল, মাটির চিহ্ন কোথাও নেই। মকদুম এসে জানাল, সাপে কাটা লাশ 'ভাসাইয়া দেওনই তো নিয়ম।' ছালেহা চিৎকার করছে, তালেব রুখে উঠে বলছে—'ওই বেটিরে চুপ করতে কও। অরে কইয়া দেও আদমরে আল্লায় মাটি দিয়া বানায় নাই। বানাইছে পানি দিয়া......।'

শেষ পর্যন্ত আদমের জন্য কলাগাছের ভেলা তৈরি হতে হতে সূর্য পশ্চিমে অস্ত গেল। নিঃশব্দে লগি ঠেলতে ঠেলতে তালেব নিয়ে চলেছে আদমকে। মাষ্টার সাহেব একটা বোতল বের করে আদমের পাশে রাখলেন। সেই বোতলের ভেতরে একটি কাগজে তিনি লিখে দিয়েছেন—'যদি এই ভেলা কুনো শুকনো জমিনে গিয়ে ঠ্যাকে, যদি কেউ এই লাশ পায় তবে যান এই আদম সন্তানরে দয়া কইরা মাটির তলে দাফন কইরা দেয়।' ইমাম সাহেব তার এই কাজে জন্য তাকে বাহবা দিলেন। তখন সূর্য আকাশপাট থেকে নেমে এসেছে নদীর

কাছাকাছি। শেষবারের মত যেন সোনালি রোদের ধারা মুছে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। সেই সময় সকলের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আদমের লাশ। নৌকার পাটাতনের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ল তালেব, কেঁদে উঠলো প্রচণ্ড এক বুকমোচড়ানো কান্না—'ইয়া আল্লাহ! চাই না জমিনের বাদশাহি। মাটির আদমরে খালি এক টুকরো কবরের মাটি দিও। খালি এক টুকরা জমিন। আর কিছু না। ইয়া রহমানুর রহীম।' ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। যে তালেব একদিন পৃথিবীর প্রায় সব জমিকে তার হস্তগত করার নেশায় মেতে উঠেছিল, সেই তালেবের সন্তান আদমকে আজ কবর দেওয়ার জন্য একটুকরো জমিন পাওয়া গেল না।

একক ৫ ❑ পরজন্ম

মূলগল্প :

আটষট্টি বছর বয়সে কাজেম আলী আবার একা হয়ে যায়। ছিপছিপে শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছে কিন্তু ভাঙেনি। ভেতরে শোকটা কতখানি চেহারা দেখে একটুও বোঝার উপায় নেই। এক মাথা সাদা ধবধবে চুল নিয়ে সে দিব্যি হাট-বাজার করে, ঘরে ফিরে ভাত রেঁধে খায়। বাকী সময়টা কাজেম আলী ডুমুর, খয়ের কিংবা বাবলা গাছের ডাল নুইয়ে লাক্ষার বেড়ে ওঠা দেখে। একদিনের জন্যেও তার কাজে কোনো ভুল হয় না।

গত সপ্তাহে কাজেম আলীর বৌ এবং ছোট দু'ছেলে কলেরায় মারা যায়। চার ছেলে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো। এখন কাজেম আলীর সংসারে আর কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। শোবার জায়গা অনেক। হাঁড়িপাতিল, বাসনকোসনের দিকে তাকালে মনে হয়, একজনের জন্যে এত কিছু দরকার নেই। ও জানে জ্ঞাতি কুটুম্ব যারা আছে অনেকেকেই ডাক দিলে এ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা হতে চাইবে। কিন্তু আপাতত তার সে ধরণের কোনো ইচ্ছে নেই। কাজেম আলী একাই থাকতে চায়, যেমন ছিলো আসমানী খাতুনকে বিয়ের আগে। চারপুরুষ ধরে কাজেম আলীরা এই ভিটেয় বাস করছে। এরপর কি হবে? ভাবতেই কাজেম আলীর বুক কেঁপে ওঠে। তার মৃত্যুর পর এই ভিটে অন্যের দখলে চলে যাবে যার জন্ম কাজেম আলীর ঔরসে নয়। নিজের ওপর রাগ হয় ওর। এসব কথা ভাবতে চায়না। যে সব কথায় মন দুর্বল হয়, আত্মা সংকুচিত হয়ে আসে সেসব কথায় কাজেম আলীর ঘৃণা। ও চুপচাপ দাওয়ায় বসে বৈশাখের খরতাপ দেখে। রান্নাঘরের বারান্দায় সিধুর মা চমৎকার ডাল পিষছে। যাঁতার ঘরঘর শব্দ কাজেম আলীর মগজের চারপাশ বেষ্টন করে রাখে। এখনও তার মাথা পরিষ্কার, চিন্তা স্বচ্ছ। আটষট্টি বছর বয়স কাজেম আলীকে একটুও ঘায়েল করতে পারেনি। সিধুর মা চমৎকার ডাল পেষে। যাঁতার ফাঁক দিয়ে লেপা-বারান্দার ওপর ডালের গুঁড়ো অবিরাম পড়ছে। খরতাপ থেকে চোখ ফিরিয়ে কাজেম আলী ডালের গুঁড়ো দেখে। দারুণ আকালেও ঘরে তার কখনো খাবার অভাব হয়নি। এখন এইসব খাবার খাবে কে? কাজেম আলীর বুক ভার হয়ে আসে। বৈশাখের হঠাৎ গুমোট যেন। কিছুই ভালো লাগেনা। কাজেম আলী উঠানে নেমে দাঁড়ায়।

—চাচামিয়া আজ কালাইয়ের রুটি খ্যাবেন না ভাত?

—কালাইর রুটি।

কলাইর রুটির সঙ্গে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর আচার তার প্রিয় খাবার। আসমানী খাতুনের চমৎকার রান্নাবান্নার হাত ছিলো। সিধুর মা ঘোমটার ফাঁকে যখন জিজ্ঞেস করছিলো, চমকে উঠেছিলো কাজেম আলী। সেজন্যে এখন আবার নিজের ওপর বিরক্ত হয়। হাঁটতে হাঁটতে বাগানে আসে। বিঘা সাতেক জমিতে কাজেম আলী লাক্ষা চাষ করে। প্রতি বছর নিজের হাতে বেছে গাছ লাগায়। বেশি পুরোনো গাছ কেটে ফেলে। বরই, বাবলা, খয়ের, ডুমুর, কুসুমি, পলাশ, পাকুড় গাছে ভরা বাগান। লাক্ষা চাষের জন্যে গাছ ভাগ করা আছে। জ্যৈষ্ঠ মৌসুমের জন্যে এক ভাগ, কার্তিকের জন্যে অন্য ভাগ। ছয়মাস করে এক একভাগের গাছের বিশ্রাম। লাক্ষা চাষের ব্যাপারে এই এলাকায় কাজেম আলীর জুড়ি নেই। বাগানের ভূগোল সব তার মুখস্থ। একটুও এলোমেলো হয়না। আটষট্টি বছর বয়সেও কাজেম আলীর মস্তিষ্কে কোনো বিভ্রান্তি নেই।

কাজেম আলী পলাশ গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। গত আশ্বিনে পলাশ গাছগুলো ছেঁটে দিয়েছিলো। এখন চমৎকার নতুন পাতা গজিয়েছে। এই নতুন পাতাগুলোই লাক্ষাকীটকে খরতাপ থেকে রক্ষা করে। কাজেম আলী প্রত্যেকটি গাছ ঘুরে ঘুরে দেখে। না, সব ঠিক আছে। কোথাও ত্রুটি নেই। এ বছর লাক্ষার ফলন দারুন। বুকটা ফের চেপে আছে। এ বছর কাজেম আলী একদম একা হয়ে গেছে। শেষ ছেলে দু'টো আর বউ মরেছে। এখন কাজেম আলী কার কাছে মনের কথা বলে? ধুত! যত্তসব! তবু শুনতে পায় আসমানী খাতুন যেন বলছে, হ্যাঁ গো পৌষ মাসে বরই গাছগুলা ছাটা দিল্যা না? আসমানী খাতুনের ঘর সংসারের বাইরেও লাক্ষার দিকে কড়া নজর ছিলো। তার বাপের লাক্ষার চাষ ছিলো। তইতো সব জানতো সে। কার্তিক ফসলের জন্যে বসন্তে এবং জ্যৈষ্ঠের ফসলের জন্য আষাঢ়ে গাছ ছাঁটাই করলে বেশি ফলন হয়। এই সময় ছাঁটাই করলে লাক্ষার শুককীটগুলো ছয়মাস বয়সের ডালপালা থেকে খাবার পেতে পারে। এ সবকিছুই আসমানী খাতুন জানতো। কোনো কিছুই তাকে শেখাতে হয়নি। কাজেম আলীর বড় নির্ভরতা ছিলো বৌ-র ওপর। ছেলেগুলোও ছিলো সরেস। বাপের সাঙ্গে ডানেবামে কাজ করতো। আহা, ওরা কি যে বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ছিলো। ওদের তুলনা হয়না। কাজেম আলীর বুক মুচড়ে ওঠে। এ বছর লাক্ষার ফলন তুলতে অন্য লোক আনতে হবে। একা কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

বাগানটা বেশ ছায়াছন্ন। এখানে এলে বৈশাখের খরতাপ টের পাওয়া যায়না। এখানে ধুলোর ঘূর্ণি নেই। এখানে কাজেম আলীর পুরো পরিবার শুয়ে আছে। সেজন্যেই কি বাগানটা এতো শীতল? কাজেম আলীর ফুসফুসের হাজার ফুটোয় বাতাস ভরে যায়। এমন হয় কেনো? কোনো কোনো জায়গা কাজেম আলীকে এমন বদলে দেয় কেনো? শিবগঞ্জ বাজারে গেলে কাজেম আলী একরকম থাকে। মহানন্দার ধারে গেলে অন্যরকম। লাক্ষার গুদামের সামনে একদম উল্টো। কাজেম আলী অনেক হিসেব করে দেখেছে যে প্রতিটি জায়গার আলাদা মেজাজ আছে। ও যখন লাক্ষার শাবক সংগ্রহ করে, যখন গাছ ছাঁটাই করে, পাকা লাক্ষার ডাল কাটে, পরিষ্কার করে গুঁড়ো করার জন্যে তৈরি করে তখন মেজাজ বাঁধা থাকে। বদলায়না। কাজের সময় কাজেম আলী একদম ফিট। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জায়গা ওকে ভিন্ন মানুষ করে। কাজেম আলী ভেবে দেখলো, এগুলো হচ্ছে তার চারটি জোয়ান ছেলে যুদ্ধে মারা যাবার পর। আগে ওর এমন হতো না। যুদ্ধ এবং মৃত্যু এটাই কাজেম আলীর জীবনে প্রথম বড় রকম ঘটনা। আর এখন ও বোঝে বড় রকমের ঘটনা না ঘটলে মানুষ বদলায়না। একরকমই থাকে। একইভাবে জীবন বয়ে যায়। যেমন এই বাগানের মাঝ দিয়ে বাতাস বয় রোদ আসাযাওয়া—পাখি ডাকে—গাছের পাতা হাল্কা সবুজ থেকে গাঢ় হয়—পাতার ফাঁকে বৃষ্টির ফোঁটা চুঁইয়ে পড়ে। কাজেম আলী আনমনে হাঁটে।

আর কিছুদিন পরই জ্যৈষ্ঠ ফসল উঠবে আসমানী খাতুন বলতো জেঠা বন্দ। কার্তিকী ফসলকে বলে কাইতকা বন্ধ। কাজেম আলী তা বলেনা। কিন্তু এই অঞ্চলে এই নামগুলো বেশ প্রচলিত। হাঁটতে হাঁটতে কাজেম আলী যখন বরই গাছের সামনে দাঁড়ায় তখন আসমানী খাতুনের কণ্ঠ শুনতে পায়, হ্যাঁ গা জেঠা বন্দের সময় এ্যানুনা? হামাকেরে চালুনী আর মাইট্যা গামলা গুলান কুণ্ঠে র‍্যাখমো? ধুত! ফের আসমানী খাতুন। কাজেম আলী মহা বিরক্ত হয়ে দু'হাতে নিজের চুল টেনে ধরে। আবার যদি আসমানী খাতুন মনে ঢোকে তাহলে তুই একটা কুত্তার বাচ্চা। কাজেম আলী বরই গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। ওর মনে হলো এ গাছের লাক্ষায় পোকা

লেগেছে। ভালো করে ঠাহর করার পর দেখলো ঠিকই। কাজেম আলী কোমরে গোঁজা দা খুলে নেয়। দু'টো কোপে মৃত ডালগুলো আলাদা করে ফেলে। ডালগুলো কয়েকদিন পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে পোকামাকড়ের ডিম নষ্ট হয়ে যাবে। মৃত ডালগুলো হাতে নিয়ে কাজেম আলীর মনে হলো আসমানী খাতুনের কবর এখনো কাঁচা। এখনো সবুজ ঘাস জন্মায়নি। কাছে গেলে সোঁদামাটির গন্ধে মাথা পাক দিয়ে ওঠে। আসমানী খাতুনের সঙ্গে কাজেম আলী পঁয়ত্রিশ বছর ঘর করেছে।

ও ডালগুলো হাতে নিয়ে কড়ুই গাছের নিচে এসে বসে। আশেপাশে বেশ কয়েকটা ডুমুর গাছও আছে। কাজেম আলী নিজ হাতে এ গাছগুলো লাগিয়েছে, বিশেষ করে শাবক সংরক্ষণের জন্যে। এসব গাছ দারুণ উপযোগী। বৈশাখের খরতাপ এখন মাথার ওপর চড়বড় করছে। কাজেম আলী বিড়বিড় করে, হামি অক্কুন কি করমো? তুমি কচুর ঘণ্টা ব্যানাও। নিজেই নিজেকে জবাব দেয়। তারপর হে হে করে হাসে। হাসতে হাসতে কাজেম আলীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ওর চোখে কোনো ছানি পড়েনি। সবকিছু ভালোই দেখতে পায়।

কাজেম আলী ঘরে ফিরে পুরু করে বানানো কালইয়ের ডালের রুটি খায়। আজকে সিন্ধুর মা রুটিতে প্রচুর ঝাল দিয়েছে। ঝাল কম হলে কাজেম আলীর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ওর মনে হয় মরিচের মতো উপাদেয় খাবার আর হয় না। আসমানী খাতুন বলতো, জিভ পুড়্যায়, বুক পুড়্যায় বুল্যাইতো সোয়াদ। কাজেম আলীর ধারণা অন্য। জিভ এবং বুক ভরায় বলে এত স্বাদ। যুদ্ধের আগে বড় ছেলেটার বিয়ে ঠিক করেছিলো। ঘরে ছেলে বৌ এনে ছয় পুরুষের পত্তন করবে। কাজেম আলী পর্যন্ত তিন পুরুষ কাটিয়েছে এই ভিটেয়। কাজেম আলী চার। শহীদ, বাসেত, রতন, মানিক ওরা ছিল পাঁচ। শহীদের ঘরে ছেলে হলে হতো ছয়। কিন্তু না, তার আশা পূরণ হয়নি। তার আগেই শহীদ মিলিটারীর হাতে নিহত হয়। ওরা চারজন শহীদ হবার পর লোকে এই ভিটেকে শহীদের ভিটে বলে। কাজেম আলীর ভালোই লাগে। রুটি খেয়ে কাজেম আলী দাওয়ায় বিছানো খেজুরের পাতার বোনা চাটাইয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। ঘর বড় বেশি স্মৃতির জঞ্জালে ভরা। দারুণ কষ্ট। কষ্ট কালাইয়ের রুটির মতো গলা বেয়ে বুকে নামে। নামতেই থাকে। হাজার গেলাশ পানি খেলেও নড়ে না।

—চাচামিয়া হামি গেনুগা?

—যাও।

সিধুর মা কাজ সেরে চলে যায়। হাঁটলে সিধুর কোমরের ঘুন্টিটা টুংটুং বাজে। কাজেম আলী চাটাইয়ের ওপর উঠে বসে। হাঁটুতে থুত্নী রাখে। আসমানী খাতুন ওদের ছয় ছেলের কোমরে ঘুন্টি বেধে দিতো। ছোটবেলায় ছেলেগুলো দেখতে প্রায় একই রকম ছিলো। চারটে ছিলো একদম পিঠেপিঠি। বোঝা যেতো না কোনটা কে। ওদের স্বাস্থ্য ছিলো চমৎকার। দুরন্ত ছেলেগুলো সারাবাড়ি মাতিয়ে রাখতো। কাজেম আলী কখনো বিরক্ত হয়ে পিটুনী লাগাতো। হা হা করে ছুটে আসতো আসমানী খাতুন। আসমানী খাতুন বড় বেশি বুকে আগলিয়ে রাখতো ছেলেগুলোকে। অন্য মা-য়েরাও কি এমন করে? কৈ কাজেম আলীর তো তেমন স্মৃতি নেই। ওর মা কাজের ফাঁকে ওর দিকে নজর দেবার সময়ই পেতো না। কতদিন কাজেম আলী রাত্রিবেলা না খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে, ওর মা ডাকেনি। আসমানী খাতুন এত বেশি করতো কেনো? নিজ হাতে নাওয়ানো-খাওয়ানো না হলে তার স্বস্তি ছিলো না। কাজেম আলী একটু বড় হলে সবকিছু একা একাই করতো। কখনো দুপুরবেলা নিজের হাতে ভাত নিয়ে খেয়ে বেরিয়ে যেতো। ওর মা জানতওনা। অত বড় সংসার মা ছিল বড় বৌ। সবার দিক খেয়াল

রাখতে রাখতে নিজের কথা আর ছেলের কথা ভুলেই যেতো। কাজেম আলী একা একাই মানুষ হয়েছে। সেজন্যই কৈশোরে মা মরে গেলে ওর তেমন কষ্ট হয়নি। এখন কষ্ট হয় ভিটেয় বাতি জ্বালানোর কেউ থাকবেনা বলে। সে একপুরুষ পিছিয়ে গেছে। যে ভিটেয় ছয় পুরুষের বসতি হতে পারতো সে ভিটে এখন চার পুরুষে শেষ হতে চলেছে। হামি অক্যান কি করমো? তুমি বুড়া আঙুল চোষো। কাজেম আলী একমাথা সাদা চুলের ভেতর হাত ডোবায়। খরতাপ এখন ভাটিতে। উঠোনে বরই গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে। ও একবার ভাবে, বাজারে গেলে মন্দ হয় না? পরক্ষণে বলে, থাক গিয়ে। লোকে এত সান্ত্বনার কথা বলে যে বুকের জ্বলুনী বাড়ে। বাতাসে সাঁই সাঁই ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে। দাওয়ার পর একগাদা পাতা উড়ে আসে। জিভ ধুলোয় কিচ্ কিচ্ করে। কাজেম আলী মনে মনে ভাবে, দ্যাওয়া নামলে বাঁচি। দিনতো না য্যান ইটের ভাটা। আগুন আর নেবেনা। ও উঠোনে এসে দাঁড়ায়। আড়িমুড়ি ভাঙে। হাই তোলে।

হাটে যাবার পথে সিকান্দার এসে দাঁড়ায়।

—মিয়াভাই চলেন হাটত য্যাই।

—না বাহে।

—ক্যান, যাবেন না ক্যান?

—য্যাবার মন চায়না।

কাজেম আলী সিকান্দারের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘাড়ে হাত রাখে।

—হামি গেলে এই খোলা ঘরত কে থ্যাকবি হ্যানে?

কাজেম আলীর গলার স্বর ভারী। সিকান্দারের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

—হাপনার কিছুক ল্যাগলে হামাক কন?

—কিছুক ল্যাগবিনা।

কাজেম আলী গভীর করে ঢোক গিলে। ফোঁত করে একটা শব্দ হয়। সেই শব্দ সিকান্দারকে মনমরা করে দেয়।

—হাপনার মরিচ ল্যাগবি? পেঁয়াজ?

কাজেম আলী কথা বলে না। এসব লাগবে কিনা সব জানতো আসমানী খাতুন। এসবের হিসেব রাখার কথাতো ওর নয়। সিকান্দারকে কিছু না বলে কাজেম আলী বাড়ির দুয়ারের বড় আম গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়।—হাপনার ল্যাগা স্যার দু'য়েক মরিচ নিয়ে আসমো হ্যানে।

সিকান্দার চলে যায়। সূর্যের বিদায়ী আলো ছড়িয়ে আছে বাড়ির চত্বরে। একটু পর সন্ধ্যা হবে। কাজেম আলী ঘর থেকে হ্যারিকেন এনে বারান্দায় বসে পরিষ্কার করে। চিমনিগুলো কালো হয়ে আছে। এ কয়দিন ধরাই হয়নি। ন্যাকড়া দিয়ে খুব সুন্দর করে মোছে কাজেম আলী। একটু পরেই ফক্‌ফকে আলোয় ভরে দেবে ঘর। ভিটেতে বাতি দেবার জন্যে এখনো কাজেম আলী নিজেতো বেঁচে আছে।

হ্যারিকেন পরিষ্কার করে কাজেম আলী লাক্ষার গুদামের সামনে এসে দাঁড়ায়। এখনো অনেক লাক্ষা রয়ে গেছে। আগামী ফসল ওঠার আগে এগুলো বিক্রি করে দিতে হবে। আসমানী খাতুন মরে না গেলে এত

দিনে এইসব বেচাবিক্রী হয়ে যেতো। গুদাম পরিষ্কার হতো, মাটির বড় গামলাগুলো ধোয়াপালা শেষে রেডি হয়ে থাকতো। কাজেম আলীর হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসে। সামনে অনেক কাজ বাকী। একা হয়ে গেলে মানুষ অসহায় হয়ে যায়। কাজেম আলী আবার ঘরের শিকল তুলে দেয়। একটা মানুষ আর একটা মানুষকে কেমন তছনছ করে ফেলে। কাজেম আলী রান্নাঘরের সামনে আসে। হাঁড়িকুড়ি নাড়াচাড়া করে। সব ময়লা, এলোমেলো। সিধুর মা ঠিকমতো পরিষ্কার করে না। কাঁসার থালা গেলাস কালচে হয়ে গেছে। আটটা থালা কি সুন্দর সারি করে সাজানো। আসমানী খাতুন আর ছেলে দুটো মারা যাবার পর কাজেম আলী একদিনও কাঁসার থালায় ভাত খায়নি। সিধুর মাকে বলে দিয়েছে, ওগুলো অমনই থাক। কাজেম আলী এ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত খায়। রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বড় ঘরে আসে। হারিকেন জ্বালিয়ে দাওয়ার ওপরে রাখে। সিকান্দারকে বলে দিলে ও পাইকারকে খবর দেবে। আগামী হপ্তায় ওর লাক্ষা ঘর খালি হয়ে গেলে নিজের হাতেই কাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করবে। আসমানী খাতুন লাক্ষা ঘর অন্য কাউকে পরিষ্কার করতে দিতোনা। বলতো, লাক্ষা হামাকের রিজিক। হামার লক্ষ্মীর ঘরত অন্য মানুষকে হাত দেব্যার দ্যামু ক্যান গো? হামি মরলে ঘরডা তুমিই সাফ করব্যা। নইলে হামার বেটার বৌ করবি হানে। এখন আসমানী খাতুনও নেই, বেটার বৌ-ও নেই। আটষট্টি বছরের কাজেম আলীর কোমর নুইয়ে ঘর ঝাড়ু দিতে বড় কষ্ট হয়। কষ্ট কাজেম আলীকে পেয়ে বসেছে। ছাড়তে চায়না। ঘরে কষ্ট, বাগানে কষ্ট, কবরের ধারে দাঁড়ালে কষ্ট। কাজেম আলী হাঁটুর ওপর থুতনী রেখে বারান্দায় বসে থাকে। হাট থেকে ফেরবার পথে সিকান্দার আবার আসে। মরিচের ঝোলাটা বারান্দায় ওপর রাখে। এই জিনিসটা কাজেম আলীর সংসারে বেশি খরচ হয়।

—মরিচের কি দর বাহে?

—বারো টাকা সের।

কাজেম আলী ঘর থেকে টাকা এনে দেয়।

—ভাত খ্যাছেন মিয়াভাই?

—না বাহে।

—খ্যাবেন না?

—খ্যামো। তুমি হামার এটি খাও।

—না মিয়াবাই বাটিত যাই।

—বসো বাহে।

কাজেম আলী সিকান্দারের হাত চেপে ধরে। একজন লোক কাছে থাকলে ওর কষ্ট অনেক কমে যায়। দূর সম্পর্কের এক ফুফাতো বোন ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে থাকতে চেয়েছিলো। কাজেম আলী রাজী হয়নি। পরের হাতে ভিটেটা তুলে দিতে চায়না। ও এখনো নিজের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট চিন্তা করতে পারে। তার হিসেবে ভুল নেই। আটষট্টি বছর বয়স হলেও কাজেম আলী এখনো শক্ত। শোকে মোহ্যমান বুকে আগুনের হাপর গনগনায়। ও নতুন নির্মাণ চায়। লাক্ষা পোকাগুলো যেমন মুখের রস দিয়ে নিজের চারদিকে একটা সুন্দর আবরণী তৈরি করে। সেই ঠাণ্ডা শীতল ঘরে ওদের পুরুষ পরম্পরায় বাস।

—মিয়াবাহি?

—কহ্য।

—গাজনের মেলাতে যাবেন?

—তুমি হামাক ছোট ছাওয়াল প্যাছ সিকান্দার?

—ম্যালা কি ক্যাবল ছাওয়াল কিরি জন্যে? ম্যালাত নাচগানের পার্টি অ্যাসছে। সারারাত চলে। যাবেন?

—বিড়ি খ্যাও সিকান্দার।

কাজেম আলী ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে দেয়। উঠোনে ভরা জ্যোৎস্না দাপায়। সিকান্দার বিড়ি টানে। বারান্দায় এক কোনে ওর সওদা পড়ে আছে বাড়ি ফেরা দরকার। বৌ অপেক্ষা করছে। বেশ কয়েকবার মেলায় গিয়েছে সিকান্দার। নাচুনে মেয়েগুলো ওর রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘরে ফিরতে ভালো লাগেনা। মেলা ওকে বেড় দিয়ে রাখে। এমনই হয়। হাট থেকে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে। সঙ্গে সওদা থাকে। সংসারের কথা মনে হয়। বৌ ছেলেমেয়ের মুখ ভেসে ওঠে। মেলা অন্য জগতে নিয়ে যায়। পিছুটান ভুলিয়ে দেয়। সংসারে ফিরতে দিতে চায়না।

—পরমানিক একটা খবর দেব্যা সিকান্দার।

—বেবাক লাঙ্কা বেচ্যা দেবেন বাহে?

—হ বাহে।

—কাইলই খবর দিয়্যা অ্যাসমো।

—জেঠা ক্যাটার তো সময় হলো বুল্যা? দু'চার জন্য মুনীষ ঠিক কর্যা ল্যাগে।

—হামি থ্যাকমো আপনার সাত।

—থ্যাকো বাহে। তুমি থাকলে হামি হামার ছাওয়ালগুলোর মতো তাকদ প্যাই।

—আহারে হাপনার চার চারডা জোয়ান বেটা! মিয়াবাহি হাপনে যে কেমুন কর্যা বাঁচা আছেন। মাগো হামার বুক ফ্যাট্যা যাবার চ্যায়।

—তুমি ভাত খ্যাও সিকান্দার।

কাজেম আলী ভাত বেড়ে আনে। থালা গেলাস, সালুনের বাটি সাজায়। দু'জনে বসে ভাত খায়। সিকান্দার তাড়াতাড়ি খায়। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, বউটা রাগ করবে। মানুষটা রাগ করলে অন্ধ হয়ে যায়। আসমানী খাতুনের রাগ ছিলোনা। আহা একদম মাটির মানুষ ছিল গো। আসমানী খাতুন মরে কাজেম আলীকে নিঃস্ব করেছে।

—মিয়াবাহি?

—কহ্য।

—ভাবীর মতো মানুষ শিবগঞ্জে একটাও আচলো না, লয়?

—হামি কি কমো বাহে হামার কি কবার আচে। তুমরাই কহ।

কাজেম আলী দ্রুত ভাত খেতে গিয়ে বিষম খায়। সিকান্দার পানির গেলাস এগিয়ে দেয়। কাজেম আলী পানি খেতে পারে না। প্রবল কাশে। কাশতে কাশতে চোখে পানি এসে যায়। ভাত খাওয়া আর হয়ে ওঠেনা। অথচ ময়া মাছের চচ্চড়িটা পোয়া খানেক কাঁচামরিচ দিয়ে সিধুর মা ভালোই রেঁধেছিলো। বেশিরভাগটাই সিকান্দার খেয়ে ফেলে। কষ্ট কাজেম আলীর গলার কাছে পাকিয়ে থাকে।

—মিয়াবাই একটা কথা?

—কহ।

—জোহ্‌রা বুবু ছাওয়ালপাওয়াল লিয়া কষ্টে থাকিছে। হাপনার সাতি থ্যাকবার চ্যায়। হাপনার দেখাশুনার জন্যিতো একজন মানুষ দরকার মিয়াবাই।

—না। হামার ভিটাত পরের জায়গা ন্যাই।

সিকান্দার দেখলো মুহূর্তে কাজেম আলীর চোখ জ্বলে ওঠে। ও চুপ করে থাকে। সিকান্দার কিছু বুঝতে পারে না। এখনও কিসের ভিটে? কাজেম আলী নিজেই বা আর কয়দিন? মরলে তো ভিটে পরের হাতে চলেই যাবে। সিকান্দার মনে মনে গাল দেয়, বুড়োর হাড়ে ঘাস গজাবে, তবু গোয়ার্তুমী যাবে না। বুড়ো যে কি ভাবছে সে-ই জানে।

—যাই মিয়াবাই।

সিকান্দার অসন্তুষ্ট মনে গজরাতে গজরাতে অন্ধকারে নেমে যায়। কাজেম আলী হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বাসনকোসন গোছায়। হ্যারিকেন নিভিয়ে ঘুমুবার আগে মনে মনে বলে, কাজেম আলী হেরে যেতে পারেনা। ভিটে অন্যের কাছে দিয়ে মরা তার কিছুতেই চলবেনা।

কদিনের মধ্যে জ্যৈষ্ঠী ফসল উঠতে শুরু করে। একটুও ফুরসৎ নেই কাজেম আলীর। পোষক ডাল থেকে লাঙ্কা ছাড়াতে ছাড়াতে দুপুর গড়িয়ে যায়। সিকান্দার ছাড়াও আর পাঁচজন কামলা আছে। প্রতিবছরই লাঙ্কা শুকোনোর কাজটা আসমানী খাতুন করতো। বাগান থেকে উঠোনে এনে স্তূপ করতে পারলেই কাজেম আলীর অনেক দায়িত্ব কমে যেতো। এবার হিমসিম খেতে হচ্ছে। একদিকে ছাড়ানো, অন্যদিকে শুকোনো। কাজেম আলী গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। রোদে গরমে শরীর কাঁই হয়ে আছে। কাঠি-লাঙ্কা নষ্ট হলে যেমন দলা পাকিয়ে যায় তেমনি। মনে হয় শরীরটার উপর থেকে কে যেন চেপে ধরে রেখেছে, ভেতর থেকে আগুনে হল্‌কা বইছে। কাজেম আলী আড়চোখে বেলা দেখে। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে গপাগপ চার-পাঁচটা রুটি খেয়ে নিয়ে আবার বাগানে আসে। বাতাসে কাজেম আলীর সাদা চুল ওড়ে। সিকান্দার বাকী লোকজন নিয়ে লাঙ্কা ছাড়িয়ে টাল করে ফেলেছে। কাজেম আলী বসে বসে ঝুড়ি বোঝাই করে। একটা হলুদ প্রজাপতি বারবার তার কাছে উড়ে আসে। মাথার ওপর দিয়ে চক্কর খেয়ে একসময় চুলের ওপর বসে। সিকান্দার হি হি করে হাসে।

—মিয়াবাই হাপনের মাথায় পেরজাপতি।

কাজেম আলী চুপ করে থাকে। হাত দিয়ে প্রজাপতিটা উড়িয়ে দেয়।

—মিয়াবাই মাথায় পেরজাপতি বসলে নাহি বিয়া হয়। ও মিয়াবাই হাপনের মাথায় পেরজাপতি।

সিকান্দার হো হো হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। কামলাগুলোও হাসে। কাজেম আলী গম্ভীর হয়ে মাথার ওপর ঝুড়ি উঠিয়ে উঠোনে এনে ঢালে। লাঙ্কা ভালো করে রোদে না শুকালে নষ্ট হয়ে যায়। সিকান্দারের হাসি কাজেম আলীর দু'কান ভরে বাজতে থাকে। ও খালি ঝুড়ি নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ হাসি একসময় কারো দু'হাত ভরা কাঁচের চুড়ির মতো রিণরিণ শব্দে কাজেম আলীর শরীরে ঢুকতে থাকে। ও পা দিয়ে লাক্ষাগুলো উঠোনে ছড়িয়ে দেয়। শব্দটা ঢুকতেই থাকে। মতীন আরো এক ঝুড়ি এনে উঠোনে ঢালে। কাজেম আলীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। শব্দটা কাজেম আলীর শরীরে ঢুকতেই থাকে। দু'হাত ভরা রেশমী চুড়ির শব্দ উদ্দাম হয়ে উঠছে। যেমন করে গুলিটা শহীদের বুকের ভেতর ঢুকে তাজা রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলো পলাশের গাছের নিচে। শব্দটা কাজেম আলীর রক্তাক্ত বুকের ওপর দিয়ে ঝোড়ো বাতাসের মতো বয়ে যায়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে কাজেম আলী বারান্দার ওপর পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি ধরায়। সারাদিনের পরিশ্রমে বুকে কেমন হাঁফ ধরেছে। গত বছর যে পরিশ্রম করেছে এ বছর সেটা আর পারছে না। নিজের ভেতরের পরিবর্তন টের পেয়ে কাজেম আলীর মন খারাপ হয়ে যায়। রান্নাঘরের চালের ওপর দুইজোড়া পায়রা বকম্‌বকম্‌ শব্দে দুপুর ভরিয়ে দেয়। সে ডাক শুনতে শুনতে কাজেম আলী আনমনা হয়ে থাকে। কেবলই মনে হয় বয়সটা কি খুব বেশি হলো? নতুন কিছু করার সময় কি শেষ? ওর ঠোঁটের কোনে চিকন হাসি ফোটে।

লাক্ষা ছাড়ানো এবং শুকোনো শেষ। সারাদিনভর যাঁতার ঘরঘর শব্দ বাড়ি মাতিয়ে রাখে। সিকান্দার লাক্ষা গুঁড়ো করে। মতীন, হাবিব চালুনী দিয়ে চালে। সিধুর মা ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিলে কাজেম আলী মাটির বড় গামলায় তা ধুয়ে পরিষ্কার করে। এখন কাজে আবার যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে। কেননা কাজেম আলীর মধ্যে স্বপ্ন ঘনিয়ে উঠছে। উঠোনের এক কোনে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা স্থায়ী চৌবাচ্চা আছে। কাজেম আলী আন্দাজমতো পঁচিশ তিরিশ সের লাক্ষা সেই চৌবাচ্চায় ঢেলে প্রচুর পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। ছয়টা চৌবাচ্চা বানিয়েছিলো আসমানী খাতুন, যাতে একসঙ্গে অনেক লাক্ষা তৈরি করা যায়। প্রতি বছর সিকান্দারই চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়িয়ে লাক্ষার গুঁড়ো আচ্ছামতো মাড়ায়। এ কাজে সিকান্দার এখন এই এলাকার দক্ষ ব্যক্তি। ওর চমৎকার মাড়ানোর ফলে লাক্ষা কোষগুলো ভেঙে মৃত স্ত্রী-লাক্ষাকীটের শরীর থেকে রঞ্জক পদার্থ ধুয়ে বেরিয়ে আসে। চৌবাচ্চার পানি গাঢ় লাল হয়ে যায়। তেমন রঙ কি যেমন রঙ গুলী খাবার পর রতনের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো? কাজেম আলী মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। সবকিছু কেমন শূন্য মনে হয়। সিকান্দারের যাঁতার শব্দ থেমে যায়। ও কাজেম আলীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

—মিয়াবাই য্যান হ্যাওয়ায় বহেন বাহে। বুড়া শরীলে এত শ্রম কি সয়? হাপনার মুখচোখ শাদা হয়্যা গ্যাছে।

—কিছুনা সিকান্দার। যাও তুমি তুমার কাম করো বাহে। হামার কিছু হয়নি।

কাজেম আলী উপুড় হয়ে চৌবাচ্চায় লাক্ষার গুঁড়ো ঢালে। সিকান্দার মনে মনে বুড়োকে গাল দিয়ে বারান্দায় উঠে যায়। কাজেম আলীর শূন্যতা কাটে না। মাথা কেমন ঝিম ধরে যায়। ও চৌবাচ্চার ওপর কনুই ঠেকিয়ে কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গুঁড়ো মেশানো পানিতে বুদবুদ উঠছে। ভট্‌ভট্‌ শব্দ হচ্ছে। সেটা কি মেশিনগানের গুলি বর্ষণের মতো? চৌবাচ্চার পানিতে শহীদের মুখ ভেসে ওঠে। দু'চোখ ভরা আগুন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। জোয়ান তাগড়া স্বাস্থ্য। আসমানী খাতুনের প্রিয় সন্তান।

কাজেম আলীর শূন্যতা বাড়ে। বুদবুদ ফেটে গেলে মিলিয়ে যায় শহীদ। নতুন বুদবুদের সঙ্গে ভেসে ওঠে বাসেত। দু'চোখ ভরা ঘৃণা। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ জুড়ে চাপদাড়ি। হালকা পাতলা গড়ন। সোজা হয়ে থাকে, একটুও বাঁকায়না। আসমানী খাতুনের প্রিয় সন্তান। কাজেম আলীর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে ওঠে। লাক্ষার গুঁড়ো পানির নিচে চলে গেছে। ভট্‌ভট্‌ শব্দ এখন আর নেই। মিলিয়ে যায় বাসেত, ভেসে ওঠে রতন। কাজেম আলীর সবচেয়ে সাহসী ছেলে, আসমানী খাতুনের প্রিয় সন্তান। দু'চোখ ভরা নির্ভীক ভয়শূন্য দৃষ্টি। মেদহীন পেটানো শরীর। দীপ্ত চাউনিতে এক মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝতে পারে। জেদী একরোখা ছেলেটার কোন বিকল্প হয় না। পানির আলোড়ন কমে এসেছে। অনেকটা স্থির। মিলিয়ে যায় রতন, ভেসে ওঠে মানিক। যাকে কাজেম আলী বিনাদ্বিধায় নির্ভর করতে পারতো, যাকে ভরসা করলে ঠকতে হয় না। যে ছিলো কাজেম আলীর ডানহাত, আসমানী খাতুনের প্রিয় সন্তান। ঠাণ্ডা, শান্ত, স্থির। গোলগাল চেহারা। দু'চোখ ভরা অবিচল বিশ্বাসের অনড় প্রতিজ্ঞা। মরতে রাজী, তবু হারতে নয়। কাজেম আলী যখন ওদের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে সৈনিকদের পা ধরেছিলো, তীব্র ঘৃণায় চিৎকার করে উঠেছিলো মানিক। সে চিৎকার শুনে ওরা কাজেম আলীকে এক লাথিতে দূরে ফেলে দিয়েছিলো। ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজেম আলী দু'কান ভরে শুনেছিলো মেশিনগানের ব্রাসফায়ারের শব্দ। সঙ্গে আসমানী খাতুনের প্রাণফাটা চিৎকার। কাজেম আলী আর মাথা তোলেনি। মাটির মধ্যে মুখ ঠেকিয়ে নিঃসাড় পড়েছিলো।

—চাচামিয়া?

সিধুর মা'র ডাকটা অনেক দূর থেকে কাজেম আলীর কানে ভেসে আসে।

—চাচামিয়া?

কাজেম আলী ঘুরে দাঁড়ায়।

—হাপনি ছাওয়ায় য্যান চাচা। রোউদে হাপনার মাথা গরম হয়্যা উঠিছে।

কাজেম আলীর শূন্যতা কমে যায়।

—মাথা গরম হয়নি। গরম হবি ক্যান? যাও, তুমি কামে যাও।

কাজেম আলী আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিজের মধ্যে শক্তি খুঁজে পায়। মতীন সবকটি চৌবাচ্চা ভরে ফেলেছে। সেগুলো তদারক করে। সিকান্দারের যাঁতার ঘরঘর শব্দ জোরদার হয়ে উঠেছে। প্রবলভাবে বাড়ি কাঁপিয়ে তুলছে। কাজেম আলী বারান্দায় উঠতে উঠতে ভাবে, যে লোক চার চারটে বীর সন্তানের জন্ম দিতে পারে, তার মাথা কি সহজে গরম হয়? নাকি গরম হওয়া চলে? সিকান্দাররা যাই কিছু ভাবুক না কেনো কাজেম আলীর শরীরে এখনো যৌবনের শক্তি বর্তমান। ওরা সেটা বুঝতে পারে না।

এইভাবে বারবার ধুয়ে ও ঘর্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে লাক্ষার রঞ্জন পদার্থ ভালোভাবে দূর করে রোদে শুকিয়ে জ্যৈষ্ঠী ফসল ঘরে তোলে কাজেম আলী। ফসল ঘরে উঠলে শুধু আনন্দ নয়, বুকের সাহসও বেড়ে যায়। ফসল উঠলে কদিন শুধু ঘুমোয় ও। বিশ্রাম এবং পরিতৃপ্তিতে ক্ষিধে বেড়ে যায়। শুধু খেতে ইচ্ছে করে। আসমানী খাতুন ফসল তোলার পর প্রচুর ভালো খাবার তৈরি করতো। এখন সিধুর মা সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনটাই পছন্দ হয় না। কাজেম আলী নিজে রাঁধে। কিন্তু খেতে বসলে খেতে পারে না। কিসের যেন

অভাব। কি যেন হয়না। নিজের ওপর রাগ বাড়ে। সিধুর মা-কে বাড়ি চলে যেতে বলে। তারপর একপেট ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আসলে আনন্দে উত্তেজনায় কাজেম আলীর ছটফটানি বেড়েছে। সঙ্গী নেই যে মনের কথা বলে। কাজ শেষ বলে বাড়িতে লোক নেই। সারা বাড়ি নিঝুম। ফাঁকা উঠোনে ছড়ানো ছিটানো লাঙ্কার কুচি। রান্নাঘরের চালে অনবরত কাক ডাকে।

কদিনের ভেতর ফসলের আনন্দ মিইয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভীষণ একা হয়ে যায় কাজেম আলী। রোদ পড়ে গেলে বাগানে আসে। আষাঢ়ের পাঁচ দিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি নামার লক্ষণ নেই। কাজেম আলী চারদিক ঝাপসা দেখে। মনে হয় রোদ থেকে ধোঁয়া বের হয়ে চারদিক ব্যপ্ত করে রেখেছে। কাজেম আলী হাঁটতে হাঁটতে সাতটা কবরের সামনে এসে দাঁড়ায়। আসমানী খাতুন, কুদ্দুস আর তাহেরের কবর সবুজ ঘাসের মখমলে আচ্ছাদিত। দেখলে বুক জুড়িয়ে যায়। এমন শুকনো এলাকায়ও ঘাস দারুণ সবুজ। অথচ বর্ষার মেঘ এখনো নামেনি। মনে মনে ভাবে, আসমানী খাতুনের পুণ্যের ফল। চারটে বীর সন্তানের মা-তো! গতকাল সিকান্দার ওকে ওদের মৃত্যু দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

—মিয়াবাই মনে এ্যাছে তো?

সিকান্দারের দিকে তাকিয়ে কষ্টের হাসি হেসেছিলো কাজেম আলী। এটা কি শুধু মনে থাকবার কথা? দিনটা কি শুধু বিশেষ সময়ের জন্যে মনে রাখলেই হয়?

—মিয়াবাই এ্যাবার কিন্তুক মিলাদ পড়াবি বড় মসজিদের মোল্‌বী সাব। কাজেম আলী মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলো।

—আজ হাটবার মানুষজনকে দ্যাওয়াত দেমোনা?

—হ্ বাহে। তুমি কয়্যা দিও।

সিকান্দার চলে গেলে কাজেম আলী বুকের ভার নামাতে পারে না। এখন আর এই দিনটিতে মানুষকে না বললেও হয়। লোকে মনে রেখেই শহীদের ভিটেতে আসে। স্বাধীনতা যুদ্ধের এই দিনই চারটে ছেলে অপারেশনের সময় ধরা পড়ে মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলো। ছয় বছর হয়ে গেছে কেউ এ দিনের কথা ভোলেনি। ঠিক আসরের সময় কাজেম আলীর ভিটেতে এসে হাজির হয়। কাঙ্গালী ভোজ হয়। ওরা মিলাদ পড়ে। দোয়া করে। ওদের জন্যে কেঁদে বুক ভাসায়। কাজেম আলী শুধু এইটুকুইতো চেয়েছিলো যে ওদের যেন কেউ ভুলে না যায়। ওরা যেন এই এলাকার মানুষের মনে থাকে। কিন্তু সবাই কি মনে রাখে? থাক, তাদের কথা বাদ থাক। কাজেম আলী শুধু ভালোটুকু নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। তবু সিকান্দার প্রতি বছর মহা উৎসাহ নিয়ে সবাইকে দাওয়াত করে। ওরা কেউ আসে না। ওরা বিদ্রূপ করে, হাসে। সিকান্দার গায়ে মাখে না।

প্রিয়জনের সাতটি কবরের পাশ থেকে সরে আসতে আসতে কাজেম আলী গুনে দেখলো এখনো পাঁচ দিন বাকী। এই পাঁচ দিনে কত কাজ? একা সিধুর মা পারবেনা। আর একজন লোক দরকার। গত বছর এই দিনটিতে আসমানী খাতুন ছিলো। ছয় বছর আগে যেদিন এই বাগানে ওদের গুলি করা হয় সেদিনও একটু দূরে আসমানী খাতুনকে বসিয়ে রাখা হয়েছিলো। কি ভয়াবহ সেই দৃশ্য।

কাজেম আলী পলাশ গাছের কাছে এসে দাঁড়ায়। এই গাছটার সঙ্গে মানিককে বেঁধেছিলো। শহীদকে বেঁধেছিলো পাকুড়, বাসেতকে ডুমুর আর রতনকে খয়ের গাছে। নয় আর দশ বছরের কুদ্দুস আর তাহেরকে

নিয়ে কাজেম আলী আর আসমানী খাতুন একটু দূরে উবু হয়ে বসেছিলো। ওদের পিঠের ওপর ছিলো চক্চকে রাইফেলের নল আর একজোড়া বুটের সদম্ভ আক্রোশ। ধোপাডাঙা চৌকি দখল করতে গিয়ে সামনাসামনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওরা ধরা পড়ে। তারপর মিলিটারীরা পুরো এলাকায় ঘোষণা দিয়ে ওদের বেঁধে নিয়ে আসে কাজেম আলীর বাড়িতে। বাবা মা-র সামনে সন্তানদের গুলি করার মহোৎসবে সেদিন শিবগঞ্জের আকাশ ছিলো লাল। আহত মানিকের ডান হাত উড়ে গিয়েছিলো, সেই অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে মানিক ছিলো নিক্ষিপ্ত তীরের চেয়ে শানিত। কাজেম আলী চোখ বন্ধ করলে সেই দৃশ্য দেখতে পায়। মিলিটারীর পা জড়িয়ে ধরলে 'বাবা' বলে ক্রোধের চিৎকার দিয়েছিলো শহীদ। উঃ মাথাটা কেমন ভার হয়ে আসে। এক লাথিতে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনেছিলো গগনবিদারী শব্দ। একটানা অনেকক্ষণ। কাজেম আলী দু'হাতে কান চেপে মাটিতে পড়েছিলো, আর ওঠেনি। আসমানী খাতুনের জ্ঞান ছিলো না। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলো কাজেম আলী? না, মনে করতে পারেনা। মনে হয় অনন্তকাল। সেই সময়কে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপে বাঁধা যায় না। কখনো ঘোর লাগে। মনে হয় এখনো তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। উঠতে কি পেরেছে? এতবড় ঘটনার পর কি ওঠা যায়? আসমানী খাতুন একফোঁটা কাঁদেনি। পরবর্তী ছয়টা বছর বোবার মতো ছিলো। কেউ কিছু বললে হাঁ করে চেয়ে থাকতো। বুকে পিঠে ব্যথা নিয়ে আসমানী খাতুন দোমড়ানো জীবন যাপন করে গেছে। কাজেম আলী সব গাছগুলো জড়িয়ে ধরে। গুঁড়ির সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হু হু করে ওঠে পাষাণ হৃদয়, লোকে তাই বলে। বলে, কাজেম বুড়ো এ্যাতো গুল্যা মউতের মদ্যে দিব্যি খাড়া রইছে। মাগো, লোকটার কলজ্যা কত পাষাণ। কাজেম আলী চোখের পানি মোছে। ফ্যাঁৎ করে সর্দি ঝাড়ে। পাষাণইতো। পাষাণ না হলে কি টিকে থাকতে পারতো। এ ভিটে কে আগলাতো? বাতাসে কদম ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। কাজেম আলী বুকভরে শ্বাস টানে। আর পাঁচদিন পর এই বিশেষ দিনটি, সব কাজ ওকে একলা করতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। নিঝুম হয়ে গেছে গাছগাছালীভরা প্রান্তর। কাজেম আলী লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ফেরে। সন্ধ্যা বাতি জ্বালতে হবে। ওর সামনে কত কাজ।

কাজের উত্তেজনায় কদিন আবার সরগরমে কাটে। বাড়িভর্তি আত্মীয়-স্বজন এসেছে। কাজেম আলীর সময় নেই। মন খারাপ করার ফুরসৎ নেই? নিজের কথা ভাবার, নিভৃতে চার ছেলের মুখ স্মরণ করার ফাঁক খুঁজেও পায়না। সকলেই ওকে বেড় দিয়ে রেখেছে। হাজার কাজের অছিলায় ব্যতিক্রম কাজেম আলী দশই আষাঢ় ব্যাকুল হয়ে পার করে। পেরিয়ে গেলেই হয়ে যায়, ধরে রাখার ক্ষমতা কি কারো থাকে? দিন শেষে একে একে সবাই আবার বিদেয় হয়। আবার শূন্য ঘর, উঠোন, রান্নাঘরের বারান্দা। কাজেম আলীর মগ্ন পায়চারী, বিড়ি টানা, কলাইয়ের ডালের রুটির সঙ্গে কাঁচামরিচের ভর্তা খাওয়া। সময় কেটে যায়। কাজেম আলী ব্যস্ত হয়ে ওঠে শাবক লাক্ষা সংগ্রহের জন্যে। সামনে কার্তিকী ফসলের মৌসুম। ডুমুর ও কড়ুই গাছে শাবক লাক্ষা সংরক্ষণ করেছে। সেখান থেকে ডাল কেটে কেটে বরই, পলাশ, ডুমুর, খয়ের গাছে সুতলী দিয়ে বাঁধে। এ কাজটা কাজেম আলী নিজের হাতে করে। অন্য কাউকে দেয় না। ঠিকমতো যত্নের সঙ্গে করতে না পারলে ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। নির্ধারিত ডালের নিচে লম্বালম্বি করে ডাল বেঁধে দিলে পোষক গাছের গায়ে আঁটোভাবে লেগে থাকে বলে শাবক লাক্ষা দ্রুত পোষক গাছে ছড়িয়ে নিচে বসে। একটু দম নেয়া দরকার। সিকান্দার তাকে সাহায্য করছিলো, বসতে দেখে এগিয়ে আসে।

—মিয়াবাই চিড়া দ্যামো?

—না।

কাজেম আলী বিড়ি ধরায়। অনেক বেলা পর্যন্ত কাজ করতে হয় বলে সিকান্দার চিঁড়া, গুড়, জগভর্তি পানি ইত্যাদি নিয়ে আসে। সিকান্দার ওর সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে গেছে। কাজেম আলীর ওপর ভরসা করেই যে ওর সংসার চলে একথা প্রায়ই মনে থাকে না। বড় আপনভাবে ওকে। দূর সম্পর্কের ভাই, কিন্তু কখনো কাজেম আলীর মনে হয় রক্তের চাইতেও বেশি। গাছের নিচে সিকান্দারও বসে পড়ে। ঢক্‌ঢকিয়ে পানি খায়। বেশি রোদে থাকলে ওর বুকের ছাতি শুকিয়ে যায়। কাজেম আলীর মাথার ওপর দিয়ে হলুদ প্রজাপতি পাক খায়। বসার জায়গা না পেয়ে কখনো সাদা চুলের ওপর বসে আবার উড়ে যায়। কাজেম আলী কিছুই বুঝতে পারে না। ওর মগজে শাবক লাক্ষা ঘোরে। মগজের শিরায় শিরায় দ্রুত ছড়িয়ে যায় শাবক লাক্ষার বীজ। হাজার হাজার কীট। অনবরত বংশ বিস্তার করতেই থাকে। ও অনায়াসে স্বাস্থ্যবান শাবক লাক্ষা চিনতে পারে। সেগুলো লালন-পালন করে ভালো জাতের লাক্ষা ফসল ঘরে তোলে। কাজেম আলী নিজে স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিয়েছিলো। ওরা বীর শ্রেষ্ঠ হয়ে এই এলাকার মানুষের বুকের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। শক্তিধর কাজেম আলী কি ফুরিয়ে যাবে?

—না।

কাজেম আলী মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে। সিকান্দার কাছে এগিয়ে আসে।

—মিয়াবাই কিছু কহাচ্ছেন?

—হ সিকান্দার।

কাজেম আলী সিকান্দারের হাত চেপে ধরে। কিন্তু চট করে কিছু বলতে পারে না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে হলুদ প্রজাপতি উড়তে উড়তে অনেকদূরে চলে যায়।

—মিয়াবাই কিছু কহাবেন?

—হ বাহে।

কাজেম আলীর কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা। কথা বলতে পারে না।

—মিয়াবাই হামি কিছু কমো?

—কহ।

কাজেম আলী ওর চোখের ওপর চোখ রাখে।

—মিয়াবাই নুরুদ্দীনের বহিনটা খুব সোন্দর। জোয়ান, শক্ত সমর্থ। বছর দশেক ধর‍্যা রাঢ়ী।

—ছাওয়াল পাওয়াল?

—একটা মেয়ে ছ্যালো। বিয়া দ্যাছে। হামি নুরুদ্দীনের সাতে কথা কহামো?

—কহ।

—হাপনে দ্যাখবেন না?

—না।

—না সিকান্দার হামি ক্যাবল বৌ চ্যাই না, হামরে শাবকের মা চ্যাই। শক্ত-সমর্থ মানুষ চ্যাই।

—তাই হবি। হামিতো হাপনাকে চিনি। হাপনার দিষ্টির ব্যাইরে কাম করমো না।

সিকান্দার আনন্দে উত্তেজনায় চিঁড়া গুড় নিয়ে গব্‌গবিয়ে খায়। কাজেম আলী দু'চারটে মুখে তোলে। সিকান্দারকে কথাটা বলা হয়ে গেলে ওর বুকের ভেতরটা আবার কেমন শূন্য হয়ে যায়। বুক ভেঙে নিঃশ্বাস আসে। আটবট্টি বছর বয়সে আবার নতুন করে শুরু।

—মিয়াবাই পানি খ্যাবেন?

—দে।

সিকান্দার বড় একমগ পানি এগিয়ে দেয়। ঢক্‌ঢকিয়ে সবটুকু পানি খাওয়ার পরও কাজেম আলীর বুকের শূন্যতা কাটেনা। শুধু মাথা পরিষ্কার। কোন বিভ্রান্তি নেই।

কাজেম আলীর প্রস্তাবে নুরুদ্দীন রাজী হয়ে যায়।

কুলসুম প্রথমে প্রবল আপত্তি করে। কিন্তু নুরুদ্দীনের যুক্তির তোড়ে ওর সব আপত্তি ভেসে যায়। এমন ভরা সংসার—খাওয়া পরার অভাব নেই—সতীনের জ্বালা নেই—সম্পত্তির ভাগীদার নেই—এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? নুরুদ্দীন নিজের উত্তেজনা রাখতে পারে না।

—তোর রানীর কপ্যাল কুলসুম। শ্যাষ বয়সেই সুখের মুখ দেখলু রে।

নুরুদ্দীনের বৌ-ও সায় দেয়। কিছু দ্বিধা এবং সংকোচের পর রাজী হয় কুলসুম। ভায়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকার চাইতে নিজের আর একটা সংসার হবে ভাবতেই কুলসুমের চোখে জল আসে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আবার নতুন করে শুরু।

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেলে সিকান্দার হাটের দিন খবরটা মুখে মুখে রাষ্ট্র করে। কেউ ভ্রু কুঁচকে তাকায়, কি কহাচ্ছ বাহে, কাজেম আলীর বিয়া?

—ক্যান গো বিশ্বেস হয় না বুজি?

—না বাহে, কামডা ভালো লয়।

—ক্যান? ভ্যালো লয় ক্যান?

সিকান্দার রুষ্ট গলায় বলে।

—তিন পাও য্যার কবরে সেন্দাছে, তার আবার বিয়া? মাথা নেড়ে চলে যায় লোকজন।

—বিয়া, কাজেম আলীর বিয়া? ভ্যালোই। কেউ কেউ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—করবি ন্যা ক্যান? করুক। একলা একলা ব্যাংকা করা থাকবি।

—ঠিক কহাছো?

সিকান্দার খুশিতে মাথা নাড়ে। এইভাবে সিকান্দারের খুশি অখুশির ভেতর দিয়ে কাজেম আলীর বিয়ের খবর শিবগঞ্জ এলাকায় প্রচার হয়ে যায়। লাক্ষার বীজ চারানো শেষ হয়ে গেছে। কাজেম আলীর এখন অবসর। সারাদিন দাওয়ায় বসে সময় কাটায়। ঘর-উঠোনের তদারক করে। এসব সাফসুফ করার জন্যে একজন লোক রেখেছে। এখন আর বাড়িতে লাক্ষার কুচি ওড়েনা—শুকনো পাতা গড়ায়না—চৌবাচ্চাগুলো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। কাজেম আলীর অস্থির লাগে। সিধুর মা পিঠা বানাবে বলে চালের গুঁড়ি কুটছে। ও বাড়ির সদরে এসে দাঁড়ায়।

সিকান্দার নওয়াবগঞ্জ গেছে বিয়ের সওদা করতে। এখানকার লোকজন নানা কথা বলে দেখে সিকান্দার নওয়াবগঞ্জ গেছে। ভালমন্দ সওদা সেখান থেকে আনবে। আজ বিকেলেই ও এসে পড়বে। কাজেম আলী সদর ছেড়ে আবার দাওয়ায় এসে বসে। অস্থিরতা কমে না। নির্মেঘ আকাশ দেখে। বারান্দার নিচে সার করে লাগানো বেগুন গাছের ডালে টুন-টুনির দিকে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টি ইতস্তত ঘোরে। শ্রাবণের মাঝামাঝি। তবু তেমন বৃষ্টি নেই। ঘোর বর্ষা কি এখন আর হয় না? আশ্বিনে কাজেম আলীর আটষট্টি বছর শেষ হয়ে যাবে। তখুনি তার ছেলেগুলোর কথা মনে হয়। ছেলেগুলো স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতো। আহা, কোনো কিছু ঘটার আগেই ওরা নিঃশেষ হয়ে গেলো। যে ভিটায় ছিলো ওদের অধিকার তা কার কাছে রেখে যাবে? শহীদের ভিটেতো অন্ধকার হতে পারে না? এখানে চাই প্রতিদিনের প্রদীপের শিখা। ভিটের জন্যে সকলের দরদ থাকতে পারে না। জোর করে কি ভালোবাসা হয়! তারাই ভালোবাসতে পারে শহীদের রক্তের নোনা ঢেউ যাদের জীবনটা তছনছ করে দেয়। কাজেম আলীর চোখে জল আসে। যারা খুব কাছে থেকে ঘটনা দেখে তারা স্বার্থ খোঁজে। তারা যোগ্য উত্তরাধিকার হয় না। স্বার্থের অন্ধিসন্ধিতে জন্মায় ওদের দৃষ্টির বিভ্রম। তেমন পুরুষ চাই যে সেই নোনা রক্তের গন্ধ শুঁকে আপন ঐতিহ্য খুঁজে নেবে। কাজেম আলী হাতের চোখের জল মোছে। বুকের দম-ধরা স্তব্ধতায় এখন হাতুড়ির আঘাত। চোখের জল প্রবল হয়। তেমন পুরুষে গিয়ে ওদের স্বপ্ন স্থিত হবে যখন এ ভিটের সবুজ শ্যামলিমায় কোনো ঈগলের দৃষ্টি পড়বেনা। ওদের স্বপ্ন এখন কাজেম আলীর বুকে। ও চোখের জল মুছে ফেলে।

শ্রাবণের শেষ দিন কাজেম আলীর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়। সকাল থেকেই টিপ্ টিপে বৃষ্টি। কালো মেঘের ভারে আকাশ ঘোমটা পরা বউ।—মিয়াবাই দ্যাওয়া?

সিকান্দার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। কাজেম আলী মৃদু হাসে। বৃষ্টি শুভ লক্ষণ। তাছাড়া এমনিতে যা খরা যাচ্ছিলো, বৃষ্টি জুড়িয়ে দিয়ে গেলো শিবগঞ্জ এলাকা। সেই সঙ্গে কাজেম আলীর শুকনো বুকের চাতাল।

—অক্যন বেশি না ন্যামলেই ব্যাঁচি।

সিকান্দার প্রবল হাঁচি দিয়ে বলে।

—ন্যামলেই ভালো। ন্যামুক।

—ভিজ্যা য্যাবেন যে?

সিকান্দার হি হি করে হাসে।

—আহ্ থাম কল্যাম।

সিকান্দার হাসির বেগ বুঝতে না পেরে রান্নাঘরে সিধুর মা'র কাছে গিয়ে বসে।

বেশ রাতে ওরা যখন ফেরে তখন প্রবল বৃষ্টির তোড়। শ্রাবণের আকাশ যেন উপুড় হয়ে পড়েছে। ভিজে নেয়ে একসা হয়ে ঘরে ফিরতে ভালোই লাগে কাজেম আলীর। যাওয়ার সময় যে প্রচণ্ড শূন্যতা গলার কাছে দলা হয়ে ছিলো সেটা এখন আর নেই। বৃষ্টি কাজেম আলীর শূন্যতা কাটিয়ে দিয়েছে। নাকি কুলসুম? ওর বড় সাধ হয় তিরিশ বছর পিছিয়ে যেতে।

বারান্দায় ওঠার সময় ভিজে জুবুথুবু কুলসুমের হাত ধরে ও। ঠাণ্ডা, ভেজা কিন্তু নরম। কিছুটা মসৃণও যেন। কাজেম আলী রোমাঞ্চিত হয়। বাতাসে কুলসুমের মাথার কাপড় পড়ে যায়। ও একপলক দেখে। এখনো স্নিগ্ধ; মায়াময়। কাজেম আলীর বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে।

ঘরে ঢুকে কুলসুম জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা টানে।—ঘোমটা থাক না অক্ন।

কাজেম আলীর কথায় কুলসুমের হাত থমকে থাকে। এই প্রথম ও কাজেম আলীর দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখে। সংকোচহীন এবং বিনম্র।

তখুনি কাজেম আলী বলে, হামার ভিটাত পাঁচ পুরুষের পত্তন চ্যাই। হামি ভিটা অন্ধকার র‍্যাখা মরব্যার প্যারমো না।

কুলসুমের দৃষ্টি কাজেম আলীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চোখের তারায় স্থির হয়ে যায়।

৫.১ লেখক পরিচিতি

৫.১ সেলিনা হোসেন :

১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন রাজশাহীতে জন্ম গ্রহণ করেন সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। পরে বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। চাকুরি করলেও তিনি উপন্যাস, ছোটোগল্প রচনা করতে ভালোবাসতেন। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক, পেয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে। ১৯৮০তে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮১তে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৮তে ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার এবং অন্যান্য আরও অনেক পুরস্কার তিনি লাভ করেছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল ঃ

ছোটগল্প ঃ 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯), 'খোল করতাল' (১৯৮২)।

উপন্যাস ঃ জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬), মগ্ন-চৈতন্যে শিস (১৯৭৯), 'যাপিত জীবন' (১৯৮১), 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩), পদশব্দ (১৯৮৩), 'চাঁদ বেনে' (১৯৮৮)।

৫.২ গল্পের আলোচনা : পরজন্ম

'পরজন্ম' মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি অসাধারণ গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আটষট্টি বছর বয়সী কাজেম আলী। ছিপছিপে চেহারায় বয়সের ছাপ পড়লেও ভেতরে শোকটা যে তার কতখানি তা বোঝার উপায় নেই। কাজেম আলীর একাকীত্বই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। একমাথা সাদা ধবধবে চুল নিয়ে সে নিজেই বাজার করে, রান্না করে আবার লাঙ্কার চাষও করে। বাকী সময়টা সে তার মন দিয়ে বাগান করে, ডুমুর গাছের

বেড়ে ওঠা দেখে। একদিনের জন্যও কাজের কোন ভুল হয় না। অথচ এই মাত্র গত সপ্তাহেই কাজেম আলীর স্ত্রী আসমানী খাতুন এবং ছোট দুটো ছেলে কলেরায় মারা যায়। এর আগে যুদ্ধে তার চার ছেলে শহীদ হয়। সেই থেকে কাজেম আলী একা। অতবড় বাড়ি শূন্য খাঁ খাঁ করে। জ্ঞাতি কুটুম্ব যারা আছে ডাককেই তারা এসে হাজির হবে। কিন্তু সে ধরনের কোন ইচ্ছে তার নেই। চার পুরুষের এই ভিটেয় সে অন্য কাউকে স্থান দিতে চায় না। তার মৃত্যুর পর এই ভিটে অন্যের দখলে যাবে একথা ভাবতেই কাজেম আলীর বুক কেঁপে ওঠে. কাজেম আলী এসব কথা মনে আনতে চায় না তাই। চুপচাপ দাওয়ায় বসে বৈশাখের রোদ্দুরের খরতাপ দেখে। বারান্দায় সিধুর মা কলাইয়ের ডাল পিষতে থাকে। যাঁতার শব্দ তার মাথার চারদিকের ঘোরা ফেরা করতে থাকে। চারিদিকটা যেন গুমোট হয়ে আসে। কিছুই যেন ভালো লাগে না তার।

হাঁটতে হাঁটতে নেমে আসে তার জমিতে। সাত বিঘা জমিতে সে লাক্ষা চাষ করে। প্রতি বছর নিজের হাতে বেছে বেছে গাছ লাগায়। খুব বেশি পুরানো গাছ কেটে ফেলে। তার বাগান বরই, ডুমুর, খয়ের, বাবলা, কুসুমি, পলাশ, পাকুড় গাছে ভরা। লাক্ষা চাষের জন্য গাছ ভাগ করা আছে—জ্যৈষ্ঠ মৌসুমের জন্য এক ভাগ, কার্তিকের জন্য অন্য ভাগ। লাক্ষা চাষের ব্যাপারে কাজেম আলীর জুড়ি নেই। অবশেষে সে পলাশ গাছের নীচে এসে দাঁড়ায়। গত মরশুমে পলাশ গাছগুলো কেটে ছোট করে দিয়েছিল, এতদিনে সব নতুন পাতা বেরিয়েছে। এই নতুন পাতাগুলোই প্রখরতাপ থেকে লাক্ষাকীটকে রক্ষা করে। কোথাও কোন ত্রুটি তার নজরে পড়ে না। এবছর লাক্ষার কলম হয়েছে দারুন, অথচ এবছরই সে একদম একা হয়ে পড়েছে। মনের কথা বলবার মতনও একটা লোক নেই। সে ঘোরে ফেরে আর যেন শুনতে পায় তার বৌ আসমানী খাতুন বলছে 'হ্যাঁ গা পৌষ মাসে বরই গাছগুলো ছ্যাঁটা দিল্যা না?' ঘর সংসারের বইরেও আসমানী খাতুনের নজর ছিল লাক্ষার ওপর। তার বাবার লাক্ষার চাষ ছিলো, তাই এই চাষের ব্যাপারে সে সব জানতো। সে জানতো কার্তিকী ফসলের জন্য বসন্তে এবং জ্যৈষ্ঠের কাজেম আলী বড় নির্ভর করত স্ত্রীর উপর। ছেলেগুলোও ছিল কাজের। তারা বাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করত, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমীও ছিল। ওদের কথা ভাবলে কাজেম আলীর বুক মুচড়ে ওঠে। তার বাগানটা বেশ ছায়াছন্ন, এইখানেই তার গোটা পরিবার শুয়ে আছে। তাই এখানে এলে তার বুকে একরকমের কষ্ট হয়। শিবগঞ্জ বাজারে গেলে তার এরকম হয় না। মহানন্দার ধারে গেলে তার অন্যরকম মেজাজ হয়। তার জোয়ান চারটে ছেলে যুদ্ধে মারা যাবার পর থেকেই কাজেম আলীর এরকম হয়। কাজের সময় সে একেবারে অন্যরকম, কিন্তু ভিন্ন স্থানে ভিন্ন রকম। যুদ্ধ এবং মৃত্যু দুটো বড় ঘটনা তার জীবনটাকে বদলে দিয়েছে।

কাজেম আলীর স্বপ্ন ছিল ছেলের বিয়ে দিয়ে ছয় পুরুষের পত্তন করবে। এই ভিটেয় কাজেম আলী চারপুরুষ, শহীদ, বাসেত, রতন ও মানিক ছিল পাঁচ; শহীদের ছেলে হলে হতো ছয়। কিন্তু সে আশা তার পূরণ হয়নি। চার ছেলে শহীদ হবার পর লোকে তার ভিটেকে শহীদের ভিটে বলে। কাজেম আলী চাটাইয়ের ওপর বসে বসে এইসব ভাবে। ভাবে স্ত্রী আসমানী খাতুনের কথা, ভাবে নিজের শৈশবের কথা। কাজেম আলী একা একাই মানুষ হয়েছে। রাত্রিবেলা কোনদিন না খেয়ে শুলে তার মা এসে ডেকে তোলেনি। কিন্তু আসমানী খাতুন এরকম ছিলো না। সে ছেলেদের অত্যন্ত ভালোবাসত। নিজে হাতে সন্তানদের নাওয়ানো খাওয়ানো না হলে তার শান্তি ছিলো না। কিন্তু কাজেম আলি অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাই শৈশবে মাতৃহারা হলে তার তেমন কিছু মনে হয় নি। এখন কষ্ট হয় ভিটেয় বাতি জ্বালানোর কেউ রইল না বলে। ছেলেদের মৃত্যুর পর

আসমানী খাতুন ছয়টা বছর কেমন বোবার মত বেঁচেছিলো। কোনরকমে বুকে পিঠে ব্যাথা নিয়ে দোমড়ানো মোচড়ানো জীবন যাপন করে গেছে সে। এসব কথা মনে করে কাজেম আলীর কষ্ট হয়, সে দুহাতে গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরে। গুঁড়ির সঙ্গো পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে কদম ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, কাজেম আলী বুকভরে শ্বাস নেয়। এইভাবেই কি কাজেম আলী ফুরিয়ে যাবে? না—কাজেম আলী মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে। সিকান্দার এগিয়ে আসে বলে, 'মিয়াবাই নুরুদ্দীনের বাহিনটা খুব সোন্দর।' কাজেম আলী চোখ রাখে সিকান্দারের চোখে। তারপর জানতে চায় 'ছাওয়াল পাওয়াল'? সিকান্দার জানায় একটা মেয়ে ছিলো, তার বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাজেম আলী তার ঘরে বৌ চায় না, চায় সন্তান। তাই বলে—'না সিকান্দার হ্যদি ক্যাবল বৌ চাই না, হ্যমার শাবকের মা চ্যাই। শক্তসামর্থ মানুষ চ্যাই।'

শ্রাবণের মাঝামাঝি, তবু আকাশে তেমন বৃষ্টি নেই, আশ্বিনে কাজেম আলীর আটষট্টি বছর শেষ হয়ে যাবে। তখুনি তার ছেলেদের কথা মনে হয়। ছেলেরা তার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সবকিছু ঘটার পূর্বেই সবশেষ হয়ে গেল। যে ভিটেতে তাদের অধিকার ছিল সেই ভিটে সে কাদের দিয়ে যাবে? শুধুই কি তাই? এই শহীদের ভিটে তো শূন্য পড়ে থাকতে পারে না। পারে না অন্ধকার থাকতে। প্রতিদিন এখানে প্রদীপের শিখার প্রজ্জ্বলন চাই। কাজেম আলীর চোখে জল এসে যায়। শেষপর্যন্ত শ্রাবণের শেষদিনে কাজেম আলীর বিয়ের দিন ঠিক হয় নুরুদ্দিনের বোন কুলসুমের সঙ্গে। সেই রাতে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব দূর হয়, দূর হয় কাজেম আলীর জীবনের বন্ধ্যাত্বও। খুব সূক্ষ্ম ভাবে এখানে লেখক একটা উর্বরা মিথের ছবি এঁকেছেন। তাই লেখক লেখেন 'বৃষ্টি কাজেম আলীর শূন্যতা কাটিয়ে দিয়েছে। নাকি কুলসুম?' কুলসুমের বিনম্র দৃষ্টির সঙ্গে কাজেম আলীর দৃষ্টি বিনিময় হয়, কাজেম আলী বলে 'হ্যমার ভিটাতে পাঁচ পুরুষের পত্তন চ্যাই। হ্যমি ভিটা আন্ধার র‍্যাখ্যা মরব্যার প্যারমো না।' তার একথায় কুলসুমের দৃষ্টি 'কাজেম আলীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোখের তারায় স্থির হয়ে যায়।' অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের আশ্বাস দিয়ে গল্পে শেষ টেনেছেন লেখক। তাই গল্পের নাম 'পরজন্ম'। শহীদের মৃত্যু নেই, মৃত্যু হতে পারে না, শহীদের বংশ কখনো শূন্য হতে পারে না, তাই সেখানে পুনরায় প্রাণের আশ্বাস জানিয়ে গল্পকার গল্পের একটা সদর্থক সমাপ্তি টেনেছেন।

মূলগল্প :

'হাসান মাহমুদ না?'

হ্যাঁ, আমারই নাম তো হাসান মাহমুদ। কিন্তু এ কে?

আমার অবাক দৃষ্টি দেখতে ভদ্রলোক বলেন, 'আরে আমাকে চিনলে না? আমি তারেক। তারেক মনজুর। মনে আছে সেই ১৯৬০ সাল? ঢাকা ইউনিভার্সিটি? আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ি, তুমি ইকনমিকসে। হলের ইস্ট হাউসে তুমি, ওয়েস্ট হাউসে আমি। চিনলে না এখনো?' খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাসিমুখে বলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক—কোন্ ফাঁকে আমার হাত তার হাতে নিয়েছেন।

চিনি আবার চিনি না, এরকম মনে হচ্ছিলো আমার। নাম বলতেই, পরিচয় দিতেই—ছবির মতো সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আমার সামনে।

চিনেছি। চিনেছি। চেহারা যতোই ভেঙেচুরে যাক, তারেক মনজুরকে চিনবো না? ইউনিভার্সিটির চার-পাঁচ বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছে যার সঙ্গে? পলিটিক্যাল সায়েন্সের সেই দুর্ধর্ষ ছাত্র, সেই তুখোড় বক্তা, দুর্দান্ত আবৃত্তিকার, হলের বক্তৃতা আর আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একচেটিয়াভাবে যে সবসময় প্রথম পুরস্কারগুলো দখল করতো। কিন্তু এ কী অবস্থা হয়েছে তার?

তারেক মনজুরের চেহারার জেল্লার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। গাল ভাঙা, চোখ কোটরাগত, রঙ বিবর্ণ। শুধু যখন ঐ তোবড়ানো গালে হাসলো, তখন যেন পুরানো দিনের তারেক মনজুর ঝিলকিয়ে উঠলো একবার। হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইনি বোধ হয় ভাবি?'

'হ্যাঁ' বলে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, 'এ তারেক মনজুর, আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের বন্ধু।'

'সালামআলেকুম, ভাবি। অধমের নাম তারেক মনজুর। এইসব সফল মানুষের পাশে নিতান্তই একজন ব্যর্থ মানুষ। ইতিহাস যাদের নাম লেখে না।' তারপর আমার উদ্দেশে বললো, 'চেহারা যতোই চকচকে হোক, ভুঁড়ি যতোই হোক, বয়েস তো হয়েছে আমারই সমান। খুব ভালো করেছো পার্কে এসে। এই বয়সে পার্কে এসে একটু জোর কদমে হাঁটাহাঁটি করা উচিত। ভালো করেছো। তোমরা তো ঘেমে গেছো দেখছি, যদি আপত্তি না থাকে, চলো একটু বসি। বিশুদ্ধ ঘাসের ওপর।'

রিনা আর আমি সত্যিই অনেকক্ষণ জোরে জোরে হেঁটেছি। তাই ক্লান্ত। আমি রিনার দিকে তাকালাম। ও ঘাড় কাৎ করলো। অর্থাৎ বসা যায়।

আমরা একটুখানি হেঁটে ঘাসের ওপরে গিয়ে বসলাম।

তারেক মনজুর বলেছিল, 'সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের এদিকটা তো বন্ধ করে দিয়েছে—ওদিকটা বন্ধ কি না জানি না। তাই দেখছো, এই পার্কে কী ভিড়! রমনা পার্কে কোনোদিন এতো ভিড় দেখিনি....

বললাম, 'তা ঠিক। তবে একটু নজরও দিয়েছে। কিছুদিন আগেও তো কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এখানে ঢোকা সম্ভব ছিলো না। আজেবাজে লোকজন....

আমরা আজই রমনা পার্কে হাঁটতে এসেছি অনেকদিন পরে। সাধারণত আমরা বিকেলে সংসদ ভবনের দিকেই চলে যাই। রোজ তো আর হয় না। সময় পাই যেদিন। ডাক্তার বলেছে প্রতিদিন ৪৫ মিনিট একটানা জোরে হাঁটবার জন্যে। হয় না তাও। রিনার হাঁটা দরকার। ওরও তো বয়েস হচ্ছে।

একটু আগে আমরা দু'জন প্যাডেল-চালানো নৌকোয় চড়েছি লেকে। আলাদা একটা নৌকো রিজার্ভ করে। দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়েকে তাদের মা নৌকোয় উঠিয়ে দিয়েছিলো। আমরা রিজার্ভ করবো বলে ছেলেমেয়ে দুটোকে উঠিয়ে দিয়েছিলো টিকিট বিক্রেতা। রিনার ইশারায় বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোকে নৌকোয় তুলে নিলাম। ওদের মা টাকা দিতে চাচ্ছিলো। বলেছিলাম, 'আমরা তো রিজার্ভ করেছি, আলাদা পয়সা আর দিতে হবে না আপনাকে।' দিনরাত ফাইল আর মিটিং-এসবের পরে এই একটুখানি বৈকালিক নৌকাবিহার খুব ভালো লেগেছিলো। গত বছর সরকারি সফরে জাপানে গিয়েছি। এ বছর তো এখন পর্যন্ত বিদেশে যাওয়া হলো না। একঘেয়ে লাগে জীবন।

তবু এই একটুখানি সবুজ একটুখানি মুক্তি দ্যায়। বিকেলের হাওয়া, পার্কের সবুজ গাছপালা, পার্কের লোকজন সবই লাগে একটু অন্যরকম।

তারেক মনজুর বলে, 'তা তোমাদের ছেলেমেয়ে ক'জন?'

রিনা কিছু বলার আগে আমি বলি, 'দুই ছেলেমেয়ে। দু'জনই দেশের বাইরে।'

হাসে তারেক মনজুর, 'ভালো। আদর্শ পরিবার।'

'আপনার?' রিনা হঠাৎ মেয়েলি কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে।

'আমার?' হাসে তারেক মনজুর। বলে, 'আমার একটিও না, ভাবি। অনেক বছর প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম যাকে, এক বছর এক-পূরতেই আর-একজনের হাত ধরে চলে গিয়েছিলো। তারপর আর বিয়ে করার ইচ্ছেও হয়নি।'

আমি রিনাকে বললাম, 'কী যে জিজ্ঞেস করো। থাক-না এসব কথা।'

রিনা বললো, 'বাহ্-আমি কী....'

'আহ্, হাসান। আমার তো ষাট বছর বয়স হয়ে এলো। এসব বলতে এখন আর খারাপ লাগে না আমার।' বলে তারেক মনজুর।

তারপর বলে, 'তা হাসান, তোমরা থাকো কোথায়?'

'ধানমন্ডিতে।' বললো রিনা।

ধানমন্ডিতে আমরা পাঁচতলায় ফ্ল্যাটে থাকি, সেটা নিশ্চয় তারেক মনজুর এখন আর ভাবতে পারে না। উত্তরায় আমার একটা ছোটো দোতলা বাড়িও আছে। গাড়ি তো কবেই হয়েছে।

রিনা জুতো পরে খানিকটা হঠাৎই উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'তোমরা এখানে বসছো তো? আমি এক চক্কর হেঁটে আসি।'

'ভাবি আবার চিনতে পারবেন তো?' খানিকটা উদ্বেগ নিয়েই জিজ্ঞেস করলো তারেক মনজুর। রিনা ওর দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসলো। বললো না কিছু।

রিনাকে বললাম, 'এই যে পামগাছের মতো গাছগুলো—এর পাশেই মাঠে আমরা বসে আছি—বেশি দেরি কোরো না।'

'ঠিক আছে, বাবা, আমি হারিয়ে যাবো না। হারিয়ে গেলেও ঢাকায় এখান থেকে এখানে—রমনা পার্ক থেকে ধানমন্ডিতে বাসা চিনে যেতে পারবো ঠিকই। আমিও ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেয়ে—' বলে দ্রুত পা বাড়িয়ে দিলো রিনা।

রিনা আড়ালে চলে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোর ব্যাপারটা কি বলতো, তারেক? তোর এ অবস্থা কেন?

তারেক মনজুর বললো, 'বললামই তো। আমি তো ভাবির সামনেও কিছু লুকোলাম না। ঊষা আমার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে বিয়ের এক বছর যেতে না-যেতে চলে গেলো যখন, তখন মন ভেঙে গেল আমার। তারপর আর চাকরিবাকরি কিছুতেই মন বসলো না রে। জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেলো। অথচ কী না করেছি আমি ঊষার জন্যে—তোকে তো দেখলাম বৌয়ের সঙ্গে ধমকে কথা বলতে। আমি ঊষার সঙ্গে জীবনে উঁচু গলায় কথা বলিনি রে।'

'ঐটাই তো ভুল করেছিস। জানিস, আমার কথা না-শুনলে রিনাকে ধরে আমি পেটাই।'

'বলিস কী?'

'ওটাই তো ভুল করেছিস রে। মেয়েলোককে মাথায় চড়াতে নেই। তুই তো প্রথম থেকেই ঊষার কথায় ওঠা-বসা করেছিস। অতো বউ-ন্যাওটা হলে কোনো বউ স্বামীর ঘর করে না।'

'তা-ই হবে।' খুব আস্তে আস্তে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির বিস্তারের দিকে তাকিয়ে বললো তারেক মনজুর।

আমি মুখ লুকিয়ে হাসলাম আড়াল করে। বললাম, 'বাদামঅলা-টলা গেলো কোথায়?' বলে কথা ঘোরানোর জন্যে এদিক-ওদিক যেন খুঁজতে লাগলাম। হাসবো না কেন? তারেক মনজুর শুধু আমার বাইরের দিকটা দেখছে। ভেতরের খবর তো রাখে না। রিনা আমার দ্বিতীয় বউ। আমার দুই ছেলেমেয়ে মানে রিনার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত একটি ছেলে, আর আমার ঔরসজাত একটি মেয়ে। রিনাকে ধমকাবো আমি? রিনার জন্যে আমি উঁচু গলায় কথা বলতে পারি না বাড়িতে। আমার ভাইবোন-আত্মীয়স্বজন সব আমাকে ছেড়েছে—কেউ আমার বাড়িতে আসে না।

পার্কে আস্তে আস্তে ছায়া নামছিলো। দূর থেকে দেখা গেলো, রিনা আসছে।

৬.১ লেখক পরিচিতি

৬.১ আবদুল মান্নান সৈয়দ :

১৯৪৩ সালের ৩রা আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক আবদুল মান্নান সৈয়দ। কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের

উপর তিনি গবেষণা করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা) থেকে পি.এইচ.ডি় উপাধি গ্রহণ করেন। পেশায় শিক্ষক—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ঃ

কবিতা—

(১) জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ

(২) মাতাল মানচিত্র

(৩) নির্বাচিত কবিতা

(৪) আমার সনেট

উপন্যাস—

(১) পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী।

৬.২ গল্পের আলোচনা : একটি দিন

আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখা 'একটি দিন' একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প। এখানে মুক্তিযুদ্ধ নয়, সমাজের কোন প্রতিফলন নয়, একজন মানুষের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কথাই বিষয় হয়েছে গল্পের। মিতায়নে লেখা গল্পটি পড়তে ভালো লাগে। সামান্য কয়েকটি রেখার আঁচড়ে মানুষের প্রেমহীনতার কথা বাণীরূপ পেয়েছে এখানে।

হঠাৎই দেখা হয়ে গেল মনজুরের সঙ্গে হাসান মাহমুদের। দুজনে সহপাঠী বন্ধু, একসঙ্গে ১৯৬০ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ত তারা। তারেক ছিল পলিটিক্যাল সায়েন্সের দুর্ধর্ষ ছাত্র, আর হাসান ছিল ইকনমিকসের। তুখোড় বক্তৃতা দিত তারেক, দুর্দান্ত আবৃত্তি করত, হলের বক্তৃতা ও আবৃত্তি করে সব প্রথম পুরস্কারগুলো সে দখল করত। আর আজ সেই তারেক মনজুরকে দেখে চিনতে পারেনি হাসান মাহমুদ। তার চেহারার জেল্লা বলতে কিছু নেই, 'গাল ভাঙা, চোখ কোটরাগত, রঙ বিবর্ণ।' শুধু সে যখন হাসলো, তখন যেন পুরনো দিনের সেই তারেক মনজুর সহসা সামনে এসে দাঁড়াল। সে রিনাকে দেখে জিজ্ঞেস করল 'ইনি বোধহয় ভাবি।' হাসান পরিচয় করিয়ে দিল তার স্ত্রী রিনার সঙ্গে বন্ধু তারেক মনজুরের। হাসানের পাশে সে এক ব্যর্থ মানুষ। আর তার পাশে হাসান মাহমুদ এক উজ্জ্বল সফল ব্যক্তিত্ব। তারা একসঙ্গে পার্কের বিশুদ্ধ ঘাসে বসলো। যে বয়সে এখন তারা পৌঁছেছে তাতে তাদের একটু হাঁটা প্রয়োজন। ডাক্তার ৪৫ মিনিট একটানা হাঁটতে নির্দেশ দিয়েছে তাদের। আজই তারা তাই রমনা পার্কে এসেছে হাঁটতে। কিছুক্ষণ আগে তারা নৌকা বিহার করেছে। আলাদা একটা নৌকা রিজার্ভ করে হাসান ও স্ত্রী রিনা দুজনে মিলে যখন নৌকায় চড়ে বসলো তখন দেখল দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়েকে তাদের মা নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছে। টিকিট বিক্রেতা তাদের নামিয়ে দিচ্ছিল যেহেতু হাসানরা সেটা রিজার্ভ করেছে। কিন্তু রিনা ওদের সঙ্গে নিয়েছিল। সারাদিন মিটিং মিছিল করে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। এসবের পরে এই প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে তাদের খুব ভালো লেগেছে। গতবছর তারা সরকারি সফরে জাপান

গেছিলো, এবছর এখনও তারা কোথাও যায় নি। প্রাণটা তাই হাঁপিয়ে উঠেছে। একঘেয়ে জীবনে একটুখানি সবুজ যেন মুক্তি এনে দেয়—'বিকেলের হাওয়া, পার্কের সবুজ গাছপালা, পার্কের লোকজন সবই লাগে একটু অন্যরকম।'

সবুজের মাঝে বসে তারা একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। তারেক জানতে চায় তাদের ছেলেমেয়ে কজন? রিনা বলার আগেই হাসান বলে ওঠে 'দুই ছেলেমেয়ে। দুজনই দেশের বাইরে।' তারেক মনজুর হেসে বলে 'আদর্শ পরিবার।' রিনা জানতে চায় অনেকটা মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে 'আপনার?' কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে বলে তারেক 'আমার একটিও না।' না হওয়ার কারণ স্বরূপ সে পুনরায় জানায়, 'অনেক বছর প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম যাকে, এক বছর না পুরতেই আর একজনের হাত ধরে চলে গিয়েছিলো।' এরপর তারেক আর বিয়ে করেনি। হাসান কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে স্ত্রী রিনাকে মৃদু ধমক দেয়—'কী যে জিজ্ঞেস করো। থাক না এসব কথা।' কিন্তু কটি বছরের তারেকের কাছে আজ আর এসব বলতে খারাপ লাগে না। সে জানতে চায় তারা কোথায় থাকে। রিনা জানায় 'ধানমন্ডিতে।' ধানমন্ডিতে তারা একটা পাঁচতলার ফ্ল্যাটে থাকে, এছাড়াও তাদের একটা দোতলা বাড়ি এবং গাড়ি আছে। লেখক এখানে একটা সফল জীবনের পাশাপাশি ব্যর্থ জীবনের ছবি এঁকেছেন বলে মনে হয়; কিন্তু গল্পের অন্তিমে পৌঁছলে বোঝা যাবে নাগরিক সভ্যতার শিক্ষিত মানুষের জীবনের ছবি একটাই—সে ছবি শুধু রঙ বদলের। তাই রিনা উঠে গেলে হাসান একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো—'তোর এ অবস্থা কেন?' তারেক জানালো, বিয়ের একবছর না যেতে যেতে তার স্ত্রী ঊষা যখন তাকে ছেড়ে চলে গেলো তখন তার মনটাই ভেঙে গেল। অথচ সে একদিনের জন্যও স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। হাসান বললো—'ঐটাই তো ভুল করেছিস।' জানিস, আমার কথা না শুনলে রিনাকে ধরে আমি পেটাই।......তুই তো প্রথম থেকেই ঊষার কথায় ওঠা বসা করেছিস। অতো বউ-ন্যাওটা হলে কোন বউ স্বামীর ঘর করে না।' বিষণ্ন তারেক মনজুর যেন কথাটা অস্ফুটে স্বীকার করে নিল। কিন্তু অন্যদিকে হাসান মাহমুদ কোনরকমে মুখ লুকিয়ে হাসলো, কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল। করবে নাই বা কেন? তারও অভিজ্ঞতা তো তারেক মনজুরের থেকে পৃথক নয়। তারেক শুধু তার বাইরেটাই দেখেছে, ভিতরটাতো দেখে নি। রিনাও তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ, তাদের দুই ছেলেমেয়ে 'মানে রিনার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত একটি ছেলে, আর আমার ঔরসজাত একটি মেয়ে।' এই রিনাকে ধমকাবে তার সাধ্য কি? এই রিনার জন্য হাসান উঁচু গলায় কথা বলতে পারে না, এমনকি তার আত্মীয়স্বজন সবাই তাকে ত্যাগ করে গেছে। হাসান যখন এই কথাগুলো মনে মনে ভাবছিলো তখন পার্কে আস্তে আস্তে ছায়া নেমে আসছিলো, দূর থেকে রিনাকে আসতে দেখা গেল।

সবাই যখন মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে গল্প লিখছেন, সেই সময়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষিত মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে গল্পের বিষয় করেছেন। মানুষের হৃদয় বিদারক যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন। সেখানে হাসান মাহমুদ বা তারেক মনজুর কেউ পৃথক ব্যক্তি নয়, একই সত্তার দুই পিঠ।

মূলগল্প :

দুখানা দশহাত-বারোহাত কামরার সামনে এক চিলতে বারান্দা আর বিশ্রী রকমের ছোট এক দরজা এক জানালা নিয়ে রান্নাঘর। রান্নাঘর বলতেও ওই, ভাঁড়ার বলতেও ওই। শোবার ঘর দুটো তাই তৈজসপত্র এটা-সেটায় এত গাদাগাদি যে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গাটুকু খালি নেই। পথ থেকে ডান ধারের কামরায় আবার পার্টিশন দিয়ে একটা বসবার ঘরের মত করা হয়েছে। বারান্দার নিচে হাত তিনেক ঢালু জায়গা, তারও অর্ধেক আবার এক কুয়োয় আটকানো। বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে কখনও আকাশ দেখা যায়।-জানালা দিয়ে মুখ ফেরালে, পথটুকু। বাসা বলতে তো এই ঘষেমেজে সাফ-সুৎরো করবার কোন কথাই ওঠে না। তবুও কি মা দিনরাত কম চেষ্টা করেন একটু ছিমছাম করে তোলবার জন্য? কিন্তু হলে হবে কি, আশপাশের আবহাওয়াই এমনিতর যে, সব সময়ই মনে হয় বাসাটা যেন মুখ ভার করে রয়েছে। এত করেও কিছু হয় না।

তবুও আজ মার যেন কেমন ছায়া-ছায়া অন্ধকার বলে সব মনে হল। মনে হয় কে যেন পুরু করে সারা বাসায় মেখে দিয়েছে গা ছমছম করা নির্জনতা। অথচ সকলেই তো রয়েছে বাসায়। সন্ধ্যে হয়েছে একটু আগেই। কিন্তু কেমন যেন পুরু অন্ধকার করে এসেছে চারদিক এখনই। বারান্দায় চালভরা কুলো হাতে করে মা ভাবলেন, সালেহা রান্না ঘরে, বুলু টুনু বেবী ওই তো বাঁ ধারের ঘরেই তো রয়েছে, হয়ত পড়ছে। আর খোকন—। তবু মার যেন বড্ড একেলা মনে হল, অন্ধকার কোন এক পাথারে তিনি একা। নিঃসঙ্গ। কেউ নেই। পা দুটো মা-র থর থর করে কেঁপে উঠলো। হয়ত দুর্বলতায়। তাড়াতাড়ি তিনি কুলো হাতে করে বসে পড়লেন। তারপর আনমনে যেটুকু আলো এঘর ওঘর থেকে বারান্দায় অন্ধকার মুছে দিচ্ছিল তাতেই তিনি চাল বাছতে বসলেন।

বারান্দায় উত্তর কোনে দাঁড়িয়ে বাঁ ধারের কামরায় দেয়াল ঘড়িটা স্পষ্ট দেখা যায় দরজার ফাঁক দিয়ে। কেমন বড় আর অদ্ভুত এই পুরানো ঘড়িটা। সেকেন্ড থেকে শুরু করে, মিনিট থেকে ঘন্টা অবধি এমন কি মাসের আজ কত তারিখ সব তুমি ঘড়ি দেখে বলে দিতে পারবে। একটুকু কষ্ট হবে না। সেই কবে যে ওটা কেনা হয়েছিল তা মা নিজেই বলতে পারবেন না। এতদিন ওটা দেশের বাড়ীতে বড়ঘরে, পেছনের দেয়ালে, খুঁটিতে ঝুলানো ছিল। খোকন যখন শহরে চাকুরী পেল, তিনিই তো তখন ওটা ছেলেকে বলে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে এক জায়গাতেই ঘড়িটা রয়েছে। একটুও নড়চড় হয় নি।

বেশ মনে পড়ে তাঁর, বিয়ের পর পাঁচগাঁ থেকে যখন কদমতলি শ্বশুর বাড়ীতে এলেন তিনি স্বামীর হাত ধরে, তখন, উৎসবের অত কোলাহল আর নিজের নিদারুণ লজ্জায় যখন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল, তখনও তিনি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন, বড়ঘর থেকে অদ্ভুত গম্ভীর সুরে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। এক দুই তিন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছিলেন তিনি।

তারপর রাতে শোবার পালা। কারা যেন হাত ধরে তাঁকে টেনে বড়ঘরে নিয়ে এসে কানে কানে বলেছিল কি যেন ভাল করে মনে নেই। একথা সে কথায় স্বামী হাত ধরে আরও কাছে এনে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ঘড়ি দেখতে জানো তুমি?

এখনও তিনি চোখের সামনে দেখতে পান স্বামীর বাঁ হাত ঘড়িটার দিকে তুলে ধরা। তর্জনীর দৃঢ় সৌষ্ঠব আজও তিনি ভোলেননি। তারপর হাত ধরে ধরে কেমন তৃপ্তস্বরে স্বামী তাঁকে শিখিয়েছিলেন ঘড়ি দেখা।

আর ওই যে পেতল রঙ সরু কাঁটা দেখছ, ওটা মাসের আজ কত তারিখ তা বলে দেয়।

আশ্চর্য, হুবহু মনে পড়ে তার। একটা হ্যারিকেনই বুঝি মৃদু আলোতে ঘর ভরে দিয়েছিল সে রাতে।

সেই থেকে এইতো সে দিন অবধি কতবার যে ঘড়ি দেখে সময় জেনেছেন, তারিখ জেনেছেন, তার তো আর লেখাজোখা নেই।

নির্জন দুপুর বেলায় গোটা পৃথিবী যখন অলস হয়ে পড়ে, যখন বাসায় কেউ থাকে না, তখন বিধবা মেয়ে সালেহার পাশে বসে এটা সেটা কথা কইতে কইতে তিনি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে তাকান। চোখ ফিরিয়ে আনতে পারেন না।

স্বামীর স্পর্শ যেন এখনও লেগে রয়েছে ঘড়িটার গায়ে। এখনও ঘড়িটা যখন ঢং ঢং করে বেজে ওঠে তখন মাঝে মাঝে কিশোরী বয়সের সেই লজ্জা আর চঞ্চলতা ভীড় করে এসে বিমূঢ় করে দেয়। ঘড়িটার চারধারের ফ্রেম ঘুণে খেয়ে ফেলেছে আর চকচকে লাল বার্ণিশ তো কবেই উঠে গেছে, তাঁর খোঁজ কে রাখে। স্বামী মারা গেছেন আজ প্রায় পাঁচ বছর। এরপর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি নিজহাতে দম দিয়েছেন ঘড়িতে। আর খোকনের সাথে শহরে যখন এলেন, তখন তিনি ছাড়া আর কেউ কি ঘড়িটার দিকে এতটুকু নজরও দিয়েছিল। ক'টা বাজে? খোকন ফস করে বাঁ হাত ওঁচায়। হাত ঘড়িগুলো দুচোখে দেখতে পারেন না তিনি। এত বড় একটা ঘড়ি থাকতে ঘরের মধ্যিখানে খোকনের কাছে সবাই সময় জানতে হুড়মুড় করে পড়ে কেন, মা ভেবে পান না। অবশেষে কি করে যে নিজের ওপরেই শেষকালে দুঃখ হয় তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না।

জানলাটা খুলে দাঁড়ালে এবড়ো খেবড়ো খোলাওঠা পথ চোখে পড়ে। কেমন এঁকে বেঁকে মুদি দোকানের সুমুখ দিয়ে, ক' একটা হালকা একতলা বাড়ীকে ডান হাতিতে ফেলে তারপর মোড় নিয়ে কোন সড়কে উঠেছে, কে জানে? জানলার ধারে কত দিন পথ দেখতে দেখতে মা ভেবেছেন ঃ রাজার মত লোক ছিলেন খোকনের বাবা। দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে ননী দেখে তাতেই না এক চুমুকে সবটুকু খেয়ে ফেলতেন। সে কথাতো আজও ভোলেননি। এলোমেলো খাপছাড়া সব স্মৃতি মার মনে এসে ভিড় করে।

অসহায়ের মত তিনি ভাবেন, বাবাকে খোকন ওরা কেউ ভালবাসে না, একটুও শ্রধা করেনা। নইলে আজ ক'এক সপ্তাহ ধরে, মার জীবনে এই প্রথম, ঘড়িটা বেঠিক চলছে। ভুল সময়ে বেজে ওঠে ঢং ঢং। অথচ খোকনের এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। কতবার বলে বলে হদ্দ হয়ে গেলেন, কই খোকনতো কোন গরজ দেখায়নি। ওরা কি জানে, ঘড়িটা বেঠিক চললে, অন্ধকারে পথ চলার মত তারিখের কাঁটা এলোপাথারি চললে তাঁর মন কেমন করে ওঠে? কেমন একদম আটকানো কান্না তাঁর গলার কাছে এসে পাথরের মত আটকে রয়েছে, ওরা তার কি জানবে? ভারী কান্না পায় মা-র। হয়তো তিনি কাঁদেনও। নইলে হঠাৎ কেন তিনি আঁচল খুলে চোখ মুছতে থাকেন? এটা হয়তো মার বাড়াবাড়ি। স্বামীকে তিনি ভালবেসেছিলেন সত্যিকারের। দেবতার মত তাঁকে করেছেন শ্রধা। আর দেবদাসীর মত করেছেন সেবা। তাই না স্বামীর ব্যক্তিদের প্রভাব আজ অবধি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন নিবিড় ছায়ার মত।

কোন যেন তাঁর ভাল লাগে ভাবতে, সারা জীবন ভেবেছেনও—স্বামীকে তিনি ছাড়া আর কেউ আপন করে দেখেনি। তাই কেউ যদি ওঁকে আপনার বলে দাবী করে, শ্রধ্বা জানায় তাহলে তাঁর চোখ অবিশ্বাসে ভরে উঠে। তিনি ভাবেন এটা ওদের কর্তব্য, তই করে গেল। তাই আজও স্বামীর স্মৃতিকে তিনি একলাই একটু একটু করে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে চান। লজ্জা এসে দেখা দেয়, দ্বিধা জাগে। ভয় হয়, পাছে কেউ জেনে ফেলে। তাই ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেন তিনি। ভাল করে খোকনকে বলতে পারেন না, আদেশের কথা তোলাই থাক, অনুরোধও করতে কেমন সঙ্কোচ দেখা দেয়। কিন্তু এ তিনি কেমন করে ভাবেন যে, তাঁর নিজের ছেলেরা অবধি ওঁকে ঠিক মত শ্রধ্বা করে না, যতটুকু করে তাও হয়তো লৌকিকতা। এটা হয়তো মার বাড়াবাড়ি।

কেন আজকেই তো সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই খোকন বলেছে ঃ মা, আজ মাইনে পাবার তারিখ। আজকেই ভাল মেকার নিয়ে আসব'খন দেওয়াল ঘড়িটা মেরামত করাতে। তারপর একটু থেমে চোখ তুলে বলেছিল ঃ 'ক'দিন মাত্র ঘড়িটা বেতালা হয়েছে আর দেখ দিকি!

কি মনে করে মা ফস করে বলে বসেছিল ঃ কিন্তু অল্পের জন্য কি এতদিনের পুরানো ঘড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে?

সহসা তাঁর দৃষ্টি শঙ্কাতুর হয়ে উঠেছিল গভীরভাবে। কিন্তু কি ভাগ্যি, খোকনের চোখে পড়েনি। খোকন বলেছিল যেমন, কালকের সকালের ভেতরেই দেখবে কেমন নতুন হয়ে গেছে ঘড়িটা। ভাবছি একপোঁচ রঙ করাব এবার ফ্রেমে। আচ্ছা মা, কি রঙ করলে ভাল মানাবে বলতো?

ঃ ঘুণে ধরা কাঠে আবার রঙ দিয়ে শুধু শুধু-তার চেয়ে আগে ঠিক হোক তো ঘড়িটা।

খোকন সহসা মিষ্টি হাসে। ঃ ঠিক হয়েছে, মেহগনি রঙ করাব। গাঢ় মেহগনিতে পুরানো জিনিষ ভারী মানায় কিন্তু।

ঃ আগে ঘড়িটা তো ঠিক কর, তারপর ওসব দেখা যাবে।

খোকন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বিছানায় শুয়ে। মা চলে যেতে চান কিন্তু পারেন না। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন ভেবে পেলেন না।

ঃ মা, চা হলো?

একটা ছুতো পেয়ে মা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

ঃ সালেহা মুড়ি তেল মাখাচ্ছে। আমি নিয়ে আসছি, তুই উঠে বস। যেতে যেতে চা হয়ে যাবে'খন। দু-দমে কথাগুলো বলে মা বেরিয়ে যান।

সালেহার দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খোকন ভাবে, সালেহার বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা বড় আদর করে। অনেক খরচ করে। কিন্তু টেকেনি সে সুখের সংসার। খোকনের চাকুরি পাবার কিছুদিন বাদে নিরাভরণ সালেহা এসে পা দিয়েছিল এই বাসায়।

আর তার চোখ পানিতে ভরে উঠেছিল। বাবা বেঁচে থাকলে দুঃখ পেতেন অনেক। হঠাৎ তার মনে পড়ল মাস খানেক আগে ও একখানা চুল পেড়ে ধুতি চেয়েছিল তার কাছে। মিহি জমিন হলে ভাল হয়,

কত সময় লাগে, এমন কি কি যেন বলেছিল সালেহা। কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সে, জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা সালেহা, কাপড় চেয়েছিলি না তুই?

সালেহা কোন উত্তর করে না।

ঃ কাপড় চাইতেও তোর লজ্জা। একেবারে ছেলে মানুষ তুই। যা দরকার চাইবি বৈকি।

ঃ খুব বেশী দরকার নেই তো আমার।

ঃ মিছে কথা। আজকেই আনব'খন। দেখিস তুই।

ঃ দাঁড়াও—বেবীর পড়া বলে দিয়ে আসি।

ঃ হুঁ।

ঃ পড়তে জানেনা মোটে, তুমি ফোরে ভর্তি করে দিয়েছ, এখন ভুগছে দেখছ তো।

সালেহা কথা বলতে বলতে বাঁ দিকের কামরায় ঢোকে। এ ঘরে বসেও স্পষ্ট বুঝতে পারে সে, সালেহা চুপ করে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল। জানলাটা দিয়ে পথ দেখা যায়।

কেমন এক অদ্ভুত মানসিকতায় মা ভাবতে শুরু করেন, কি বা প্রয়োজন ছিল খোকনের অফিস থেকে ফিরবার পথে রিক্সা করবার। কেন, অন্য দিনের মত বাসে করে এলে কিতাব শাস্ত্র অশুদ্ধ হত? মা ঠিক জানেন না রিকশার ভাড়া অফিস থেকে কত? কিন্তু এটা তো ঠিক জানেন মিছিমিছি কতগুলো পয়সা খোকন অপব্যয় করল।

কিন্তু খোকন যখন সন্ধ্যের একটু আগে বাসার দরজায় রিকশা থেকে নামল তখন তো মা'র মন এই সামান্য অপব্যয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেনি।

খোকনের এটা অনেক দিনের অভ্যাস। মাইনে পেয়ে ফিরতি পথে কোন দিন সে বাসে কিংবা হেঁটে ফেরেনি। পুরানা পল্টনের মোর থেকে একটা রিকশা করে ফেরা অন্ততঃ সেদিনের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেছে।

মাইনে নিয়ে সে আজ একটু সকাল সকালই অফিস থেকে বেরিয়েছিল। পথে এটা সেটা কিনে যখন বাসায় ফিরল তখন সন্ধ্যে হতে আর বেশী বাকি নেই। মা এসে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে চৌকির উপর বসল খোকন। বুলু, টুনু, বেবী আর সালেহা কাছাকাছি ভীড় করে এসে দাঁড়ায়। মা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঃ সালেহা, এই নে তোর মিহি জমিন কাপড়। দেখ তো কেমন হয়েছে। খোকন কাগজের মোড়ক খুলে কাপড়টা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। দাম যদিও নিয়েছে পনের টাকা আট আনা কিন্তু জিনিষ ভাল। আমার মা, এই নাও তোমারও কাপড়। তুমি তো আর কোন দিনই চাইবে না কিছু। নাও।

মা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কাপড়খানা হাতে তুলে নেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, আজকেই তো খোকনের কথা ছিল ঘড়িওয়ালাকে নিয়ে আসবার। কই খোকন তো কোন কথাই বলছে না সে নিয়ে। ভাবলেন তিনি একবার জিজ্ঞেস করবেন, পর মুহূর্তেই আবার সেই লজ্জা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। বুলুর কলমও কিনেছে। হাতে ধরে তুলে দিচ্ছে। তবুও এক অদ্ভুত অতৃপ্তি ক্রমে মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ঃ বুলু এই দ্বিতীয়বার তোমার কলম কিনে দিলাম, এবারও যদি হারাও তাহলে আর রক্ষে নেই। যাও সন্ধ্যে হয়েছে, পড়তে বসো গিয়ে।

ওরা সবাই চলে গেল। মা-ও নিঃশব্দে পেছনে বেরিয়ে এলেন।

তারপর মা অস্থির অশান্ত হৃদয়ে বার ক'এক উঠানে পায়চারী করলেন। দু'একটা তারা ফুটে উঠেছে, তাকিয়ে দেখলেন ক্ষণিক। অবশেষে যখন মোড়ের মসজিদ থেকে বুড়ো মোয়াজ্জিনের আজান ভেসে এল তার কানে তখন চমক ভাঙ্গল। কুয়ার পাড় থেকে ওজু করে এসে বারান্দার এক কোণে পাটি বিছিয়ে মনকে শান্ত সংযত করে বসলেন মগরিবের নামাজ আদায় করতে।

খোকন বিমুগ্ধ হয়ে গেল। মায়ের এমন মূর্তি সে কোনদিন দেখেছে বলে মনে পড়ল না তার। কি সৌম্য সংযত মা-র মুখখানি। আর কি তন্ময়তা তার প্রতিটি মুহূর্তে। খোকন বিস্মিত হয়ে গেল। মাকে খুঁজতে এসে সে দেখল মা নামাজ আদায় করছেন। হাতমুখ ধুয়ে সে পথের দিকের দরজা খুলে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

পেছন ফিরে থেকেও খোকন স্পষ্ট বুঝতে পারল, মা হাঁটছেন বারান্দায়। ডাকলো ঃ মা।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। খোকন পেছন ফিরে মার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। শার্টের পকেট থেকে টাকাগুলো বের করলো। তারপর এক দুই করে দশ টাকার নোট দশ খানা গুণে মা'র হাতে তুলে দিয়ে বললো ঃ এই নাও এ মাসের বাজারের টাকা। ওতেই হবে বোধ হয় তাই না? ওদের স্কুলের বেতন কালকে আমিই দিয়ে দেব'খন। আর শোন, বাড়ীওয়ালা এলে সন্ধ্যের পর আমার সাথে দেখা করতে বোলো।

মা টাকাগুলো হাতে নিয়ে কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন, এমন সময় নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে পাশের ঘরে দেয়াল ঘড়িটা বোকার মত ঢং ঢং করে তিনটে বেজে চুপ হয়ে গেল। মা চকিতে পাশের কামরার দিকে তাকালেন। তিনিও আশা করেন নি, ঘড়িটা এমন বেমওকা বেজে উঠবে। খোকন যেন ঘড়ির ঘণ্টার প্রতিধ্বনি করেই বলল ঃ ঐ যাঃ। দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছি। আসবার সময়, সেই কোন সকাল থেকে মনে করে রেখেছি, চাঁদমিয়া মেকারকে ধরে আনবো ঘড়িটা নিয়ে যেতে—দেখো তো কাণ্ড। মা অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, এমন ভুল মানুষের হয় কখনো। কিন্তু শোনা গেল না। কি আশ্চর্য, একটু পরেই ছোট্ট হাসি হেসে নোট ক'খানা নাড়তে নাড়তে বললেন ঃ সন্ধ্যে বেলায় না ডেকে ভালই হলো, কাল সকালেই সব বুঝে নিতে পারবে। কালকে এলেই হবে।

ঃ সেই ভাল।

খোকন একটু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু মিইয়ে পড়েন মা। চুপসে যান তিনি একেবারেই। তিনি আশা করেন নি খোকন এত ছোট্ট জবাবে দায়মুক্ত হবে। ভেবেছিলেন সে তার কথায় প্রতিবাদ না হোক অমনি একটা কিছু করবে। তাই খোকনের ওই উত্তরে তিনি মুষড়ে পড়লেন বৈকি।

মা ভেবে কোন থৈ পান না, খোকন এত জরুরী কথাটা ভুলে গেল কি করে? কি করে ভুলতে পারে সে? এত আজেবাজে জিনিষ কিনতে তো কই তার এতটুকু ভুলে যাবার কোন প্রশ্ন ওঠেনি। বরঞ্চ না চাইতেই তো ওসব কিছু নিয়ে এসেছে। নাকি খোকন খরচের ভয় করছে? হবেও বা। হয়ত তার মন সেকেলে একটা জুবুথবু দেয়াল ঘড়ির পেছনে খরচ করতে সায় দেয়নি। কিন্তু রিকশা করে খোকন যে খরচ করল সেটার

সার্থকতাই বা কোথায়? মাসের তিরিশ দিন বাসে এসে একদিন রিকশা করলে কিইবা এমন লাভ? পর মুহূর্তেই ভাবেন, ক্ষতিটাই বা কি? এতগুলো টাকাও রোজগার করে সংসারে ঢালছে, দুটো পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করলে কিইবা এমন দোষের হয়। আনমনে চৌকির পাশে খোকনের ছোট্ট টেবিলটায় মা হাত বুলোতে থাকেন। এক সময় কিসে যেন হাত ঠেকতেই তিনি চমকে ওঠেন। মসৃণ আর ঠাণ্ডা। চোখ ফেরান। কিছুই নয়, দেখে তাঁর বুঝতে একটুও কষ্ট হল না, এক প্যাকেট তাস। আনকোরা নতুন, করকরে। মা অজ্ঞাতসারে প্যাকেটটা হাতে তুলতেই খোকন তড়বড় করে বলে উঠলো ঃ কিছু না মা, রেখে দাও তুমি। আসবার পথে কি খেয়াল হল কিনে ফেললাম।

ঃ ও। মা তাসের প্যাকেটটা নামিয়ে রাখেন টেবিলে, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে আনতে পারেন না। কেমন নীল রঙ আর অদ্ভুত ছন্দ প্যাকেটটার গায়ের নক্শায়। ছোট্ট, এতটুকু, কিন্তু চোখ ফেরান যায় না ওইটুকুর জৌলুসেই। মা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লেন ক'একবার নাড়াচাড়া করে তিনি এক সময় হাত টেনে আনেন।

খোকন বলছে ঃ মা, শুনছো?

ঃ কি?

ঃ আজ রাতে ওরা আসবে বলেছিল—

মা কি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন? না মার মনে এই মুহূর্তের চিন্তাধারা সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ল? একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

ঃ কারা।

খোকন একটু অপরাধজড়িত স্বরেই ঃ না, ওসমানরা মানে আমার ক একজন বন্ধু আসবে বলেছিল। আসে না কি না অনেকদিন।

ঃ ও।

ঃ তাই কষ্ট করে একটু চায়ের যোগাড় হয়তো করতে হতে পারে।

মানে—

খোকনের কথা শেষ না হতেই মা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন ঃ আচ্ছা। কুলো হাতে করে সেই কখন মা চাল বাছতে বসেছেন এখনও শেষ হয়নি। এলোপাথারি ভাবতে ভাবতে তাঁর হাত যে কখন থেমে গেছে, নিজেই টের পাননি। সালেহা রান্নাঘর থেকে বলে ঃ কই মা, চাল বাছা এখনও হয়নি তোমার? এ দিকে তো চুলো খালি যাচ্ছে। তাই তো। মা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে চাল বাছা শেষ করেন।

সালেহা খক্ খক্ করে কেশে উঠলো। কাশবে না? রান্নাঘরে একটা জানালা কাটানোর জন্য কতবার মা বলেছেন খোকনকে, অভিমান হলো মা'র, ধোঁয়া আটকে দম বন্ধ হয়ে মরুকগে তার কি? তার কি এসে যাবে? চালের হাঁড়িটা চুলোর ওপর ভাল করে বসিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। এত ঘেমেছেন কখন তিনি।

বাইরে বসবার ঘরে পদশব্দ। খোকনের বন্ধুরা এসেছে, বুঝতে পারলেন। সালেহা মলিন মুখে প্রশ্নোৎমুখ দৃষ্টিকে মা'র দিকে তাকালো। মা জানেন কারা এল, কিন্তু কোন উত্তর করলেন না।

মা জানেন খোকন মিছে কথা বলেছে। ওরা এসেছে তাস খেলতে। নিশ্চই অফিস ফিরতি পথে খোকন ওদের বলে এসেছে, নইলে নতুন তাস কেন ওর টেবিলে? আর ঘড়িটার কথা বেমালুম ভুলে গেল খোকন? মিছে কথা। কিন্তু কি করবেন তিনি, কি করতে পারেন? অসহায় শিশু বৈত তিনি আর কিছু নন। আক্রোশে অভিমানে মা'র মন ভরে উঠল। গলা ধরে এল। তিনি চোখ বুজলেন।

কেমন যেন অন্ধকার ঠেকছে চারদিকে। আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু বন্ধ আবহাওয়া। বিমর্ষতায় ভরে যেন নুয়ে পড়েছে বাসাটা। আর মা'র বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল। কিন্তু কাউকেও বুঝতে দিতে চান না তিনি, তাই সালেহাকে প্রায় এককোণে ঠেলে নিজেই রান্নায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এখনও মাছ চড়েনি, তার ওপর ভাজা চচ্চড়ি তো পড়েই রয়েছে।

বাইরে ঘর থেকে শোনা গেল খোকন বলছে ঃ বুলু, দেখগে ঘরে টেবিলের ওপর চকোলেটের বাক্সের নিচে প্যাড্ রয়েছে, নিয়ে আয় তো।

বন্ধুরা হাসি বন্ধ করে বলল ঃ হুঁ।

রান্না ঘরে থেকে মা দেখতে পেলেন বুলু খেলার প্যাড দিয়ে এলো ঘরে। ফিরতি পথে এসে মাকে বলল ঃ মা চা চাইছে বড়ভাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন ঃ কয় কাপ?

ঃ কেন চার কাপ।

বুলুই আবার চা দিয়ে আসলো।

মা কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করেন বাইরের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ধ্বনিতরঙ্গ।

বিস্ময়, আনন্দ, উল্লাস, বিমর্ষতা, স্তব্ধতা, সব কিছু একের পর এক রেখা কেটে চলেছে ওই চারটি লোকের মনে। স্তব্ধতা. আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আবারও। মাঝে মাঝে খোকনের গলা শোনা যাচ্ছে। আরও কারা যেন। কিন্তু কোন কথাই তাদের বুঝতে পারছেন না তিনি। এক বর্ণও না। মনে হল, এ ভাষার সাথে বুঝি পরিচিত তিনি নন। অদ্ভুত এর বাক্য বিন্যাসভঙ্গি আর বিচিত্র এর ধ্বনি তরঙ্গ কেউ বুঝতে পারেনা সে ভাষা।

খোকন এক সময়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্না ঘরে চাপা অথচ উত্তেজিত সুরে বলে ঃ ধেওর ছ্যাঁকছ্যাঁকানি। বলি ভাজা পোড়ার এত গন্ধ ওঠে কেন? বাইরে লোক বসে তোমাদের খেয়াল হয়না। যত সব। গজ গজ করতে করতে খোকন আবার চলে যায়। মা'র যে কি হয়েছে আজ খালি কান্না পাচ্ছে।

কিন্তু খোকন তাস কিনতে গেল কেন? খেলতে? ও ছাই খেলে কি লাভটাই বা হয়? আর যদি খেলতেই হয়ে তবে পুরান তাসে দোষ করল কি? তাস পুরান হয়ে গেছে বলেই কি ফেলে দিতে হয়? হঠাৎ আবার ঘর থেকে দেয়াল ঘড়িটা ঢং করে বিগত তিরিশ মিনিটের সংকেত ধ্বনি করে চুপ হয়ে গেল। আর মা'র মন এবার শুধুমাত্র স্তব্ধ হয়ে গেল। নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধ।

গোটা গলিপথটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত এখন অনেক। নিবিড় অরণ্যের মত একটানা রাত। ছেদ নেই, যতি নেই ও তমিস্রা প্রপাতের। শুধু রাত। চুলে চুলে ঘষলে কেমন মিহি আওয়াজ বেরোয়, সূক্ষ্ম অথচ গভীর, তেমনি ছন্দময় যেন ও ছায়া রাত।

অস্বচ্ছ আকাশে গুটিকয় তারা। মা খোলা জানালা দিয়ে দেখলেন তাকিয়ে।

হারিকেনটা জ্বলছে ছোট হয়ে আলনার পাশে। ছোট আর বিষণ্ণ। খাওয়া দাওয়া সেই কখন হয়ে গেছে। খোকন ও ঘরে বুলুকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। এ ঘরে মা'র পাশে টুনু। আর ওপাশের চৌকিতে সালেহা বেবীকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমে অকাতর। ঘুম আর ঘুম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে শুধু ঘুম নেই মায়ের চোখে।

গোটা পৃথিবী যখন ঘুমে অচেতন, যখন রাত কুটিল সরীসৃপের মত শুধু বাড়ছে, তখন মা'র মনে সারা দিনের সেই অদ্ভুত, পরস্পর বিরোধী চিন্তাগুলো এসে ভীড় করে দাঁড়াল। এক মনে পড়ল খোকনের কথা। নতুন তাসের প্যাকেট আর দেয়াল ঘড়িটার কথা। ঘড়িটা এখনও চলছে। টিক্ টিক্ টিক্। অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনলেন প্রতিটি সেকেণ্ডের গম্ভীর শব্দ।

সময় বয়ে যাচ্ছে—যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। চোখ বুজে মা স্পষ্ট দেখতে পেলেন যেন, শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ খুলে তাকে হারাতে চান না। তাই তিনি চোখ বুজেই রইলেন নিঃসাড় হয়ে। এক সময়ে স্বামীর মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে এল। তারপর তিনি তাঁর সেই দগ্ধ আবেগ সামলাতে না পেরে দু'হাতে বিছানায় চাদর আঁকড়ে ধরলেন শক্ত মুঠিতে। তারপর এলোমেলো কত কথা স্মৃতি তার মনের পটে নতুন করে ভেসে উঠলো ছায়াময় অশরীরী রহস্যময় হয়ে। এক সময়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল।

তারপর কি ভেবে পা টিপে টিপে খোকনের ঘরে গিয়ে পা দিলেন। দু'টো কামরার মাঝে দরজা সব সময়েই খোলা থাকে, তবু কত সতর্কতা প্রতিটি পদক্ষেপে। কি করবেন তিনি ও ঘরে যেয়ে? কি করতে চান? হারিকেনের আবছা আলোয় ঘর ভরে রয়েছে। মা গিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ভয়, দ্বিধা আর সঙ্কোচ। তবুও দু'হাতে তাসের প্যাকেটটা তুলে নিলেন। তেমনি মসৃণ আর ঠাণ্ডা। ইচ্ছে হল তাসগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন। চিহ্নমাত্র রাখতে চান না তিনি। সন্ধ্যে থেকে যে আক্রোশগুলো মনের অন্ধকার কোঠায় গুমরে মরছিল তারা যেন ছাড়া পেয়ে দলে বেঁধে তাসের প্যাকটটার ওপর নাবলো। আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন ওটা। তিনি ছিঁড়ে ফেলবেনই। আর দ্বিধা নয়। আর সঙ্কোচ নয়।

সহসা ঘুমন্ত খোকন পাশ ফিরে মায়ের দিকে মুখ করল। আর মা ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি প্যাকেট নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। আবার ভয় এসে তাকে ভর করল।

ছোটোবেলা থেকে খোকনের মুখ দিয়ে লালা পড়তো, এখনও পড়ে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে। মা তাকিয়ে দেখলেন লালায় ভরে গিয়েছে বালিশের কোণটা আর খোকনের ডান গাল। তিনি চোরের মত এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন লালাটুকু। খোকনের মুখখানা কি সুন্দর আর কেমন মিঠে। মা দেখেন আর দেখেন ছোট বেলায় সেই কচি আদলটুকু এখন ওর মুখ থেকে উঠে যায়নি। তেমন মাংসল গাল দু'টো আর প্রশস্ত কপাল। দু'এক গোছা চুল এসে কপালে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি আলতো করে সরিয়ে দিলেন। কপালে হাত বুলোতে মা'র ভারী ভালো লাগলো। কতদিন মা খোকনকে ছোটবেলার মত এত আপন করে পাননি। তিনি ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন খোকনের কপালে, মুখে আর সারা গায়ে।

আবার সেই চিন্তাগুলো তাঁর মনে এসে আছড়ে পড়ল উন্মাদের মত। তিনি শুধুমাত্র বিব্রত হয়ে পড়লেন।

খোকনের ঘুম গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে দু'চোখে। কেমন তৃপ্তি গাঢ় ঘুম। আবছা আলোতে তাসের নকশাগুলো চক চক করছিল। তিনি চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন।

সহসা তাঁর সারা অন্তর মথিত করে একটা কথা ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ল—না, তিনি পারেন না অসম্ভব। দু'হাতে মুখ ঢেকে চোখ বুজে একদৌড়ে তিনি নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। সালেহা তেমনি ঘুমুচ্ছে।

ঘুমুচ্ছে বেবী আর টুনু। প্রতিটি মাংসপিণ্ড তারই দেহের রক্ত দিয়ে তৈরী। তিনি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর জীবনে এই প্রথম, সর্বপ্রথম তিনি বিছানার ওপর ঝড়ের মুখে ছিড়ে যাওয়া লতার মত অসহায় হয়ে উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে কেঁদে উঠলেন।

মা কাঁদছেন।

৭.১ লেখক পরিচিতি

৭.১ সৈয়দ শামসুল হক :

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে ঢাকার কুড়িয়াগ্রামে সৈয়দ শামসুল হক জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন, ১৯৫২ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতক সম্মান লাভ করেন। পেশা হিসেবে তিনি সাংবাদিকতা গ্রহণ করেন। বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক হিসেবে তিনি কাজ করেন ১৯৫৩ থেকে ৫৬ সাল পর্যন্ত। এরই সঙ্গে তিনি লেখালেখিও করতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৯-এ আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮২-তে অলক্ত স্বর্ণপদক, ১৯৮৩-তে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৪-তে একুশে পদক লাভ করেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতিকার হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

প্রবন্ধ ঃ

১। হৃৎ কমলের টানে (১ম খণ্ড ১৯৯১ ২য় খণ্ড ১৯৯৫)

গল্প ঃ

১। তাস (১৯৫৪)

২। শীত বিকেল (১৯৫৯)

৩। রক্তগোলাপ (১৯৬৪)

৪। আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭)

৫। প্রাচীনবংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২)

৬। সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প (১৯৯৪)

৭। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯০)

উপন্যাস ঃ

১। এক মহিলার ছবি (১৯৫৯)

২। অনুপম দিন (১৯৬২)

৩। সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪)

৪। নীল দংশন (১৯৮১)

৫। স্মৃতিমেধ (১৯৮৬)

৬। স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৭)

৭। এক যুবকের ছায়াপথ (১৯৮৭)

৮। তুমি সেই তরবারী (১৯৮৯)

৯। কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন (১৯৮৯)

অন্যান্য ঃ

১। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস (১৯৯১)

২। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯১)

৩। শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯১)

৭.২ গল্পের আলোচনা : তাস

গল্প শুরু হয়েছে 'দু'কামরার একটি বাসার বর্ণনা দিয়ে। এত ছোট বাসা যে জিনিসপত্রেই ঘর ঠাসা, সেখানে নিঃশ্বাস ফেলার মত জায়গাটুকুও যেন খালি নেই। ঘষেমেজে তাকে যে সুন্দর করে তোলা যাবে তাও না। তবুও খোকনের মা রাতদিন চেষ্টা করে চলেছেন বাড়িটিকে পারিপাটি করে রাখার। কিন্তু চারপাশের আবহাওয়া এমন যে, সব সময়েই মনে হয় 'বাসাটা যেন মুখ ভার করে রয়েছে।' চারিদিকটা কেমন অন্ধকার বলে মনে হল মা'র একটা গা ছমছম করা নির্জনতা সমগ্র বাড়িটাকে যেন আচ্ছন্ন করে আছে। সবে সন্ধ্যে হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে গম্ভীর রাত। মার কেমন একা বলে মনে হল নিজেকে, ভীষণ নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল। পা দুটো কাঁপতে লাগল, কুলো হাতে বসে পড়লেন তিনি। বাঁ দিকের ঘরের দেয়ালে একটা বড় আর অদ্ভুত ঘড়ি ঝুলছে। 'সেকেণ্ড থেকে শুরু করে, মিনিট থেকে ঘণ্টা অবধি এমন কি মাসের আজ কত তারিখ' সব ঘড়ি দেখে বলা যাবে। এই ঘড়িটি তাঁর স্বামীর স্মৃতি বহন করে চলেছে। তাই ঘড়িটির প্রতি তার দুর্বলতার শেষ নেই।

ঘড়িটি যে কবে কেনা হয়েছিল মার নিজেরই মনে নেই, তবে ওটা এতদিন তাদের দেশের বাড়িতে বড় ঘরের পেছনের দেওয়ালে ঝোলানো ছিল। খোকন শহরে চাকরি পাওয়ার পর তার বাবা ঘড়িটি এই বাড়িতে

নিয়ে এসেছিলেন। বিয়ের পর মা যখন পাঁচগাঁ থেকে কদমতলি শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন স্বামীর হাত ধরে, তখন শুনেছিলেন অদ্ভুত গম্ভীর সুরে ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে। রাতে তাঁর স্বামী হাত ধরে মিষ্টি গলায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ঘড়ি দেখতে জানো তুমি?' তারপর স্বামী তাঁকে ঘড়ি দেখতে শিখিয়েছিলেন। তর্জনীর সেই দৃঢ় সৌষ্ঠব মা আজও ভোলেন নি; তিনি বলেছিলেন—'আর ওই যে পেতল রঙ সরু কাঁটা দেখছ, ওটা মাসের আজ কত তারিখ তা বলে দেয়।' আজও এসব কথা তাঁর হুবহু মনে পড়ে। নির্জন দুপুরে সমস্ত পৃথিবীটা যখন অলসতার ভারে ঢলে পড়ে তখন বিধবা মেয়ে সালেহার পাশে বসে মা নিজের মনেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। চোখ ফেরাতে পারেন না তিনি। স্বামীর স্পর্শ যেন এখনও অনুভব করেন তিনি ঘড়িটার গায়ে। ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠলে এখনও তিনি কিশোরী বয়সের লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে যান। এই ঘড়িটিকে কেন্দ্র করে মায়ের মনস্তত্ব ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক।

ঘড়িটার সে রূপ আর নেই, চারধারের ফ্রেম ঘুণে খেয়ে ফেলেছে, কালো বার্নিশ কবেই উঠে গেছে। স্বামী মারা গেছেন পাঁচ বছর হ'ল, সেই থেকে তিনিই দম দিয়েছেন ঘড়িটায়। ছেলে খোকনের কোন চিন্তা নেই ঘড়ি নিয়ে। আসলে তাঁর মনে হয়, বাবাকেই ওরা ভালোবাসতো না, শ্রদ্ধা করত না। না হলে আজ কতদিন হল ঘড়িটা ঠিক চলছে না, সেদিকে দৃষ্টি নেই খোকনের। ভুল সময়ে বেজে উঠছে ঘড়িটা। মা কতবার খোকনকে বলেছেন, কিন্তু সে কোনও গরজ দেখায় নি। অথচ ওরা জানেই না যে ঘড়িটার ঠিক চলার সঙ্গে মায়ের মনের একটা সম্পর্ক আছে, ঘড়িটার সঙ্গে তাঁর স্বামীর চলমানতার একটা যোগ আছে। মা ভাবেন 'ওরা কি জানে, ঘড়িটা বেঠিক চললে, অন্ধকারে পথ চলার মত তারিখের কাঁটা এলোপাথারি চলতে তাঁর মন কেমন করে ওঠে?' হঠাৎ যেন কান্নাটা গলার কাছে উঠে আসে তাঁর, আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন তিনি। হয়ত তাঁর এই আচরণ বাড়াবাড়ি বলেই মনে হবে। স্বামীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, শ্রদ্ধাও করতেন দেবতার মত, দেবদাসীর মত সেবা; আর তাই স্বামীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব আজও তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এই আচ্ছন্নতা এমনই স্তরের যে, তিনি সারাজীবন ভেবে এসেছেন, তাঁর মত স্বামীকে আর কেউ ভালোবাসেনি, তাঁর মত আপন করে কেউ দেখে নি। অন্য কেউ আপন বলে দাবী করলে তাঁর চোখে অবিশ্বাস ভরে উঠত। নিজেকে তিনি এই বলে বোঝাতেন, ওদের কর্তব্য ওরা করে গেল। আজও তিনি স্বামীর স্মৃতিকে একলাই সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চান। লজ্জা হয়, দ্বিধা আসে, ভয় পান পাছে কেউ জেনে যায়—ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেন। ছেলে খোকনকে আদেশ করতে পারেন না, ভেতর থেকে একটা সঙ্কোচ এসে বাধা দেয় তাঁকে। অথচ খোকন ঘুম থেকে উঠে মাকে বলে, আজই তার মাইনে হবার দিন, তাই 'আজকেই ভাল মেকার নিয়ে আসব খন দেওয়াল ঘড়িটা মেরামত করতে।' তারপরেই বলে 'ক'দিন মাত্র ঘড়িটা বেতালা হয়েছে আর দেখ দিকি।' খোকনের একথা শুনে মা বলেই ফেললেন 'কিন্তু অঙ্কের জন্য কি এতদিনের পুরানো ঘড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে?' একথা বলার পর মা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু তার শঙ্কাতুরা দৃষ্টি খোকনের চোখে পড়ে নি। তিনি কোনরকমে খোকনের জন্য চা করার অছিলায় উঠে এলেন।

বোন সালেহার দিকে তাকাতে তাকাতে খোকন চায়ে চুমুক দেয় আর ভাবে—'বাবা বেঁচে থাকলে দুঃখ পেতেন অনেক।' হঠাৎ তার মনে হয় সালেহা তার কাছে একটা চুল পেড়ে ধুতি চেয়েছিল তার কাছে। সে

ভুলেই গিয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা সালেহা, কাপড় চেয়েছিলি না তুই? সালেহা কোন উত্তর দেয় না, পাশের ঘরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে মা ভাবতে থাকেন, অফিস থেকে ফেরবার পথে কি দরকার ছিলো খোকনের রিকসা করে ফেরার। শুধু শুধু কতকগুলো পয়সা অপব্যয় করল সে। আসলে এটা খোকনের অনেক দিনের অভ্যাস, মাইনে নিয়ে সে প্রতিবার রিকসা করেই ফেরে। এদিনও সে রিক্সা করে ফিরেছিল। ঘরে এসে চৌকির ওপর বসল। তারপর সালেহার কাপড়টা সালেহার দিকে ছুঁড়ে দিল, মাকে ও দিল তাঁর জন্য আনা কাপড়, বুলুকে দিল তার জন্য আনা কলম। এতকিছু সত্বেও একধরনের অদ্ভুত অতৃপ্তি মাকে ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেললো। অশান্ত হৃদয়ে মা পায়চারী করতে শুরু করলেন। তারপর মোড়ের মসজিদ থেকে যখন মেয়াজ্জিজের আজাদ ভেসে এলো তখন মা বারান্দায় 'পাটি বিছিয়ে মনকে সংযত করে বসলেন মগরিবের নামাজ আদায় করতে।' মা কে এভাবে বসতে দেখে খোকন মুগ্ধ হয়ে গেল, মায়ের এমন মূর্তি সে কখনও দেখেনি। কি সৌম্য সংযত দেখাচ্ছিল মাকে।

কিছুক্ষণবাদে মা এসে ঘরে ঢুকলেন। খোকন বাজারের টাকাটা মার হাতে তুলে দিল। মা টাকাগুলো নিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় ঘড়িটা বোকার মত তিনটে বেজে চুপ হয়ে গেল। কেউই আশা করেনি ঘড়িটা এভাবে বেজে উঠবে। কিন্তু ঘড়িটা বেজে উঠতেই খোকনের মনে পড়ে গেল ঘড়িটার কথা। সে ভুলেই গেছিল, সকাল থেকে ঠিক করে রেখেছিল ফেরার সময় চাঁদমিয়া মেকারকে ধরে আনবে। মা যেন অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন 'এমন ভুল মানুষের হয় কখনো।' কিন্তু মুখে একথা বললেও মিইয়ে পড়েন মা। তিনিই ভাবতেই পারেন নি, মা-র এই জবাবে খোকন এত তাড়াতাড়ি দায়মুক্ত হবে! শুধু তাই নয়, মা ভাবতেই পারেন না, এত দরকারি কথাটা খোকন ভুলে গেল কি করে। এত কিছু কেনার কথা তার মনে ছিল অথচ ঘড়ির কথাটাই সে ভুলে গেল। নাকি খরচের কথা ভেবে সে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রিকসা করে আসার জন্য যে পয়সাটা সে খরচ করল তারই বা সার্থকতা কোথায়? পর মুহূর্তে একথাও ভাবেন, 'এতগুলো টাকা ও রোজগার করে সংসারে ঢালছে, দুটো পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করলে কিই বা এমন দোষের হয়!' নিজের মনে মা খোকনের টেবিলটায় হাত বুলোতে থাকেন। একসময় কিসে যেন হাত ঠেকে, চমকে ওঠেন তিনি, তাকিয়ে দেখেন এক প্যাকেট নতুন তাস। মা প্যাকেটা হাতে তুলতেই খোকন বলে ওঠে, 'কিছু না মা, রেখে দাও তুমি। আসবার পথে কি খেয়াল হল কিনে ফেললাম।' তারপরেই জানাল, আজ কিছু বন্ধু আসবে তার কাছে। চায়ের জোগাড় করতে হবে। আক্রোশে মার মন ভরে উঠল, অভিমানে গলা ধরে এল তাঁর। চারিদিকে অন্ধকার, আলো নেই, বাতাস নেই, 'বিষণ্ণতার ভারে যেন নুয়ে পড়েছে বাসাটা।' মা'র ভেতরটা চৌচির হয়ে যেতে লাগলো। তবু তিনি কাউকে বুঝতে দিতে চান না। কিন্তু মা ভেবে পাচ্ছেন না, খোকন নতুন তাস কিনতে গেল কেন! দেয়াল ঘড়িটা বেজে উঠল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সমস্ত গলিটা ঘুমিয়ে পড়েছে, নিবিড় অরণ্যের মত ছেদহীন, যতিহীন একটানা একটা রাত, অস্বচ্ছ আকাশে গুটিকয় তারা মিটমিট করে জ্বলছে। মা খোলা জানালা দিয়ে দেখলেন আকাশটাকে। সারাদিনের পরস্পর বিরোধী চিন্তাগুলো ভিড় করে এলো তাঁর মনে। মনে এলো নতুন তাস ও দেওয়াল ঘড়িটার কথা। ঘড়িটা চলছে টিক্ টিক্ টিক্ শব্দে। তন্ময় হয়ে মা চোখ বুজে যেন কার অস্তিত্ব অনুভব করলেন, চোখ খুললে পাছে তাকে হারাতে হয় তাই মা চোখ বুজেই রইলেন। একসময় স্বামীর মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। মা নিজের আবেগ

সামলাতে না পেরে বিছানার চাদরটা আঁকড়ে ধরলেন শক্ত করে। কত হারানো স্মৃতি ভেসে উঠলো মনের মনিকোঠায়।

একসময় তিনি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে খোকনের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। হারিকেনের আবছা আলোয় ঘর ভরে গেছে। মা টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, একটা ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ ঘিরে ধরে তাঁকে। তবুও তাসের প্যাকেটটা তুলে নিলেন হাতে, ইচ্ছে করল কুচি কুচি করে ফেলতে। সন্ধ্যে থেকে একটা আক্রোশ মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠেছিল, এতক্ষণ তারা দল বেঁধে তাসের ওপর নাবলো। আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন তাসটাকে। মনে ভাবলেন ছিঁড়ে তিনি ফেলবেনই। এমন সময় হঠাৎই ঘুমন্ত খোকন মা'র দিকে মুখ ফেরাল। মা ভয় পেয়ে গিয়ে প্যাকেট নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপরে। মা দেখলেন ছোটবেলার মত লালা গড়িয়ে পড়ছে খোকনের মুখ দিয়ে। তিনি এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন লালাটুকু। প্রত্যক্ষ করলেন খোকনের মুখটা—মাংসল গাল, প্রশস্ত কপাল। কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সযত্নে সরিয়ে দিলেন মা। কপালে হাত বোলাতে লাগলেন। কতদিন তিনি খোকনকে আপন করে পাননি। অতীতের চিন্তা ভিড় করে আসছে তাঁর মনে। খোকন ঘুমিয়ে আছে একটা গভীর তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে তার দু'চোখে। হঠাৎ 'তাঁর সারা অন্তর মথিত করে একটা কথা ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়লো—না, তিনি পারেন না অসম্ভব। দুহাতে মুখ ঢেকে চোখ বুজে, এক দৌড়ে তিনি নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন।' সবাই ঘুমচ্ছে, সালেহা, বেবী, টুনু—এরা সবাই তারই দেহের রক্ত দিয়ে তৈরি। একমুহূর্তে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তারপর 'জীবনে এই প্রথম, সর্বপ্রথম তিনি বিছানার ওপর ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে যাওয়া লতার মত অসহায় হয়ে উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন—তাঁর স্ত্রী সত্তার অবসান ঘটিয়ে মাতৃসত্তার উদ্বোধন হল। এতদিন তিনি একজন মানুষের স্ত্রীর পরিচয়েই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ প্রথম তাঁর মাতৃসত্ত জয়ী হল। আজ তিনি শুধু কারুর স্ত্রী নন, আজ তিনি যথার্থই খোকনের মা। তাই গল্পের শেষ লাইন লেখক লিখলেন এভাবে—'মা কাঁদছেন।' এই সংক্ষিপ্ত বাক্য যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ। 'তাস' এখানে একটি প্রতীক হয়ে এসেছে। এই তাসের মাধ্যমেই খোকনের মায়ের মাতৃত্বের জাগরণ ঘটেছে। ফলে গল্পের নাম 'তাস' সার্থক হয়েছে।

একক ৮ ❑ সাদা কফিন

মূলগল্প :

এতক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ ছিল সমস্ত শহর। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ, লোকজন নেই বললেই চলে, গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। কচিৎ একটা সাইকেল-রিকশা ঝড়ের বেগে ছুটে হয়ত বেরিয়ে গেল, শুধু বাতাস-কাটা আর পীচের সঙ্গে চাকা ঘর্ষণের শব্দ, হয়ত রিকশায় কিছু মালপত্র বোঝাই আছে কিংবা খালি, কিন্তু কোথাও একটা গাড়ির দেখা নেই। মাইল, আধ-মাইল দূরে দূরে ইঁট আর ড্রাম, ওল্টানো গাড়ি ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাতেই রাস্তায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। ছায়া রাস্তা, বড় বড় মেহগিনি ও শিশুগাছ রাস্তাগুলো আরো নির্জন ও নিবিড় করে তুলেছে। জনমানবের গন্ধ নেই রাস্তায়। মনে হঠাৎ এমনও অবান্তর প্রশ্ন জাগে, অবরোধ টিকবে তো? দূর থেকে সেই অবরোধ পাহারা নিচ্ছে মুক্তিফৌজ... বারুদের মুখে আগুন লাগল বলে। পরিবেশটা তেমনি বিস্ফোরণোখী।

জাতীয় সঙ্গীত না বাজিয়ে ঢাকা বেতারের তৃতীয় অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি হন্যে হয়ে একটা রিকশার কথা ভাবছি। গাড়ি তো পাওয়ার সুযোগ নেই, প্রতিরোধ ডিঙিয়ে তবুও কোনমতে রিকশাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। আমাকে অনেক দূরে, মতিঝিল পেরিয়ে বাসাবো অব্দি যেতে হবে। অদ্দুর হেঁটে যাওয়া, কিংবা হেঁটে যেতে ভয় করছে।

লোকগুলো সব মরে গেল নাকি এক নিমেষে।

আমি অনবরত চিন্তা করছি হেঁটে যাওয়া যাবে কি না। বন্ধু-বান্ধব সবাই আজ গেল কোথায়? প্রেসক্লাব কি বন্ধ? সেখানে যাবো কি না আবার ভেবে নিলাম। কয়েক মিনিট। কিন্তু যেন কয়েক লক্ষ সেকেন্ড ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। এভাবে যেন অনন্ত সময়ের হনন চলল; রাস্তার নিস্তব্ধতায়, তারা ঘন আকাশে, নিরিবিলি এবং নীরব পত্রগুচ্ছে, রাস্তার অন্ধকার লাইটপোস্টে, গির্জার চূড়ান্ত ক্রুশে রাত্রিপাত হচ্ছে, প্রবল বেগে; রাত্রিপাত হচ্ছে ঢাকায়, রাজনৈতিক উত্থানের অপেক্ষা নিরবচ্ছিন্ন এক যোগসাজশে। গত দু'দিন কাজের চাপে বাসামুখো হতে পারিনি, অফিসে রাত কাটিয়েছি। আজ একটা কিছু ঘটতে চলেছে এরকম ইঙ্গিত বেতার অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে আছে। এখন সেসব এলোমেলো চিন্তার পর্বতপ্রমাণ একবোঝা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসামুখো চলছি, সারি সারি ইমারত ফেলে, বন্ধ রেস্তরাঁ, হ্যাপি মটরিং-এর ছবি, বাসে ওঠার কিউ—হাইকোর্ট ভবনকে মনে হচ্ছে রূপকথার হাজার দুয়ারী রহস্যময় প্রাসাদ।

হঠাৎ একটা সাইকেল-রিকশা দ্রুতবেগে আমাকে কেটে চলে যাচ্ছে দেখে আমি চিৎকার করে তার পেছনে ধাওয়া করলাম। সে আরো বেগে, আরো দ্রুত ছুটল। কিন্তু আমার যে তাকে ধরতেই হবে। এভাবে আমাকে পাগলের মতো ছুটতে দেখে সে কি ভেবে—হয়ত কিছু না ভেবেই থামল। বলল, শহরে সৈন্য নেমেছে সাব, সরে পড়ুন, এক্ষুণি এদিকে এসে পড়বে। তাদের আছে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, আরো কত কি...

বলো কি? সৈন্য নেমেছে? কোথায়? কতদূরে? আমার মাথা ঘুরে গেল—তুমি কোন্‌দিকে যাবে ভাই, জল্‌দি আমাকে নিয়ে চলো!

না, পারব না সাব। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, পথে পথে বাধা, আপনাকে নিয়ে যাবো কী করে। না, আমি নিতে পারব না—হাঁপাতে হাঁপাতে রিকশাঅলা কথাগুলো বলে ফেলল।

বললাম তুমি যেখানে যাও ভাই আমাকে নিয়ে চল, তোমার সঙ্গেই থাকব আমি। বাধা ডিঙিয়ে দু'জনে রিকশা টেনে নেব। তোপখানা সড়ক, মতিঝিল, কমলাপুর ছাড়িয়ে বাসাবো...

এতসব কথা সংক্ষিপ্ততম সময়েই শেষ হয়েছে। রিকশাঅলা আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কিংবা করুণাবশত হোক, তুলে নিল; তখন আশ্চর্য তোজোদীপ্ত সেই অচেনা রিকশাঅলার গামছা-বাঁধা মাথাটি আমার সামনে এক দৃপ্ত বিজয়ীর মতো উন্নত এবং উদ্যত। কিন্তু কিছুদুর গিয়েই বাধা। আর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ রাত্রি নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। তক্ষুণি সে রিকশা ফেলে দৌড় দিল, আমার সঙ্গে একটা কথা বলা কিংবা একবার ফিরেও তাকাল না। নিশ্চল রিকশা, অপসৃত রিকশাঅলা, ভৌতিক শহর, সৈন্য, রাস্তার ধারের সারি সারি অট্টালিকা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করল। আমিও দৌড়ে প্রেসক্লাবের চত্বরে আশ্রয় নিলাম। ভরসা, সেখানে যদি কাউকে পাই। কিন্তু কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পর অনেক খোঁজাখুঁজিতে চেনা দারোয়ানকে পাওয়া গেল, কিন্তু কোন খবরই সে দিতে পারল না, শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাবেন? এখন তো কেউ নেই। দরজা খুলে দেব? বরং পালিয়ে যান...।

কেউ-ই নেই। কিন্তু যাব কোথায়? গাড়ির অর্থাৎ সামরিক ট্রাক ও কনভয়ের শব্দ একদম এগিয়ে আসছে, ঐ বুঝি দেখা যায়। যদি আসেই—এখানে আশ্রয় নিলাম, পরে যা হবার হবে, আপাতত এখান থেকে নড়ছি না—বুকের ভেতর দুরু কম্পমান একটি বল যেন অবিশ্রাম লাফাচ্ছে, অবিরাম একটি নৌকা ঢেউয়ের আঘাতে কাঁপছে। আমার কি যেন হয়ে গেল, দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে কি যে বলে গেল কিছুই শুনিনি। আমার সামনে পেছনে একটি মাত্র শব্দ শুনছি—আশ্রয়।

প্রেসক্লাবে সাময়িক আশ্রয় নেয়া ভালো মনে করলাম; রাস্তায় যেকোন সময় যা কিছু একটা ঘটে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে, তাই মাথা গুঁজবার একটু আশ্রয় দরকার। অন্ধকার দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবার আগেই দুটো মিলিটারি কনভয় শব্দ করে প্রেসক্লাবমুখো হয়ে থেমে গেল। আমি একটু মাত্র দেরি না করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ না করে সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে হেডলাইটের তীব্র আলাতে রাস্তা দেখলাম। তোপখানা সড়ক ধু-ধু এবং ম্রিয়মান।

কনভয় ইউসিসের সামনে। সমস্ত এলাকাটা অন্ধকার, শুধু ইউসিস আর বি.আই.এস-এর কয়েকটি আলো ছাড়া।

খট্‌খট্‌ শব্দে কয়েকজন ক্রুর সৈন্য নামল। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় মেশিন-গান। ওরা খানিক ভেবে ইউসিস থেকে একটা তার নিয়ে রাস্তার লাইট-পোস্টের তারের সঙ্গে যোগ করে দিল। সমস্ত রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

সৈন্যদের গতিবিধি সন্ধানী। প্রেসক্লাবের দিকেই তাদের দৃষ্টি, তারপর আরো দুটো কনভয়। ট্রাঙ্ক...

বাপ্‌স্‌। এবার সব গুলিয়ে দেবে। আর নয়। আমি জানালা ছেড়ে ঘরের ভেতর চললাম, বিপদ ঘনিয়ে এলো বলে। চারদিকে বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার, অন্ধকার হাতড়িয়ে চেনা দেয়াল-দরজা ইত্যাদি অনুমান করে বাথরুমের দিকে পৌঁছাবার আগেই দুনিয়া কাঁপানো শব্দ হল গুড়-গুড় বুম্‌ বুম্‌। পলকে একরাশ বাতাস তাড়িয়ে বালি-

ইট-প্লাস্টারের গুঁড়োর ঝড় বয়ে গেল, সমস্ত ঘরটি কেঁপে রাতের নিস্তব্ধতাকে আরেকবার ভেঙে চুরমার করে আবার শব্দহীনতায় উধাও হয়ে গেল। ভয় জড়ানো চোখের ফাঁকে দেখলাম উত্তরের দেয়াল ভেদ করে কামানের গোলা পূর্ব দেয়ালে বাধা খেয়ে ছাদ ফুটো করে চলে গেছে। বিরাট গহ্বর আমার পাশে মূর্তিমান হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমিও চোখ খুলে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। দুই কান রইল নতুন শব্দের অনাকাঙ্খিত প্রত্যাশায়। পায়ের কাছে মেঝেতে স্তূপ, জঞ্জাল। অন্ধকারে অনুমান করলাম সারা ঘরের দৃশ্য, বুকের ভেতর একটি একটি পাঁজর নরম হয়ে যাচ্ছে অনবরত, মাথার ভেতর করোটির খাঁজে খাঁজে শিরশির বোধ। তাড়াতাড়ি আবার গোলাবর্ষণের আগে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় নেমে যাওয়া ঠিক করলাম। নেমে যাচ্ছি। সিঁড়ির হাতল মাঝে মাঝে গেছে উড়ে, অন্ধকারে, ভয়ে ভয়ে, আন্দাজে, নামতে নামতে যেন পাতালে নেমে যাচ্ছি। আমি একা মৃত্যুর রাজ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়া একটি প্রাণী নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছি আর অন্ধকার পুরীর দেয়াল, আসবাবপত্র, দরোজা-জানালা, লোহার শিক আমার শরীরে মৃত্যুর নিঃশ্বাস ফেলছে, কাঁপা কাঁপা পায়ে যেন সাপের ঠাণ্ডা স্পর্শ অন্ধকারে মৃত্যুর মহড়া শুরু হয়ে গেছে।

নেমে যেতে যেতে নিচের হলঘরে যখন পৌঁছলাম, দেখি খোলা দরোজার সামনে সেই দুরন্ত এবং অগ্নিক্ষরা প্ল্যাকার্ডগুলো ভূতের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। যেসব ফেস্টুনের মূর্তিমান আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যবহারের পর দরোজার সামনে বারান্দায় দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, সেসব ফেস্টুনের মূর্তিমান বিভীষিকা আমার চোখে পড়ল। রাস্তার স্বল্পালোকে চোখে পড়ল—দু'জন মানুষ একজন আহতকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। নিচে লেখা ঃ আমার ভায়ের তাজা রক্তের বদলা আমি নেবই নেব—আমিও আমার লাশের ছবি দেখলাম। আরো কয়েকটি আছে, আমি সেসব প্ল্যাকার্ড সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবলাম। সরিয়ে নিলে সৈন্যদের চোখে পড়বে না, তারা এদিকে আসবে না, আমি বাঁচব—আমি বাঁচতে চাই, মৃত্যুর গুহা ছেড়ে আমাকে বাসাবো যেতেই হবে। আবার ভাবলাম, না, যেমন আছে তেমনটি থাক, কাজ নেই ঝামেলা করে, ওরা যদি দেখে ফেলে? বরং এখানে কেউ নেই ভেবে তারা ঢুকবে না, তাহলে আমিও নিরাপদ। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অবিশ্রাম গোলাবর্ষণ হচ্ছে, পল্টন ময়দানের দিকে দূরে কোথায় শব্দ হচ্ছে, তারপর ভাবলাম কোন্ দিকে যাব, কোথায় মিলবে—একটা আশ্রয়, একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল নেই, মৃত্যুর ডাক এত পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে ও নিজের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো একান্ত আপন করে ধরা যায়—সেই একটুকু আশ্রয়। আমি আবার হাতড়ে দেখলাম কোথায় যাওয়া যায়, আমি আরেকবার আগাগোড়া ভেবে নিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেমন ভাবা যায়, চারদিকে গোলাগুলির শব্দে একজন মানুষ যতটুকু দ্রুত ভাবতে পারে—যার সামান্য একটি গুলি একজনের পক্ষে যথেষ্ট তার মধ্যে বসে, সেই ভাবনার মুহূর্তে, দুর্বলতার অতল স্রোতে ডুবে, স্বজন-বান্ধবহীন নিঃশব্দ অবস্থায় আমি একটি সঠিক কর্মসূচী তৈরি করতে চেষ্টা করলাম। দশ রকম চিন্তা-ভাবনা নয়, একটি স্থির ভাবনা লাফিয়ে লাফিয়ে মস্তিষ্কে খেলা শুরু করে দিল ঃ পেছনের দিকে সংলগ্ন বাথরুমে যাও, মাথা গুঁজে নিজেকে বাঁচাও। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো বড় চিন্তা নয়, যুদ্ধনীতি, গণহত্যার চার্টার কে মানল কে মানল না সেই ভাবনাও নয়, এমনকি সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও নয়, শুধু নিজেকে বাঁচাও। নির্নিমেষ ভাবনায়, একটি স্থির সিদ্ধান্তের পরও আমি ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ডগুলো টানতে গেলাম—অমনি গর্জন, তখুনি বুম্ বুম্ বুম্। মাথা নিচু করে দু'কানে হাত দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেঝেতে, তারপর সন্তর্পণে প্লেগ রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের মতো নিজেকে টেনে একদম বাথরুমের দরোজায়, বাঁ হাত ও কাঁধের নিচটায়

কি যেন জ্বলে উঠল, সে কথা সম্পূর্ণ ভাবার আগে সবচেয়ে জরুরী কর্মসূচীর মতো চোখে পড়ল দুটো গভীর এবং বড় গর্ত হাঁ করে আছে পশ্চিমদিকের দেয়ালে, অন্য আরেকটি বাথরুমের খানিক পূর্বে গর্তের ওপারে এক অপার শূন্যতা হাঁ হাঁ করে নিঃশব্দে চিৎকার করছে। আমার পায়ের কাছে, সারা মেঝে সুরকি-চুন-বালির সাম্রাজ্য খেলা করছে, বাতাস বারুদের গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে, কপালে শিরশির করে ঘাম দিচ্ছে, সারা শরীরে তরল স্রোত বয়ে চলেছে, যেন আমার সামনে থেমে গেছে এক নিঃশব্দ মিছিল... প্রতিবাদহীন প্রেসক্লাব, সেক্রেটারিয়েট চুপ করে আছে, চার দেয়াল করোটি বের করে আছে, একেকটি ইট খসে মাটির তলায় জমা পড়ছে, কে জানে কতদিনে ঢাকা শহর মহাস্থানগড় ও ময়নামতিতে রূপান্তরিত হবে...। অনেকক্ষণ বাইরের দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে বুকের নিচে কনুই সক্রিয় করে, হাঁটু জোড়া দাঁড়ালাম। বাথরুমের দরোজার কপাট উড়ে গেছে, অন্ধকারে আন্দাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সারলাম, কতক্ষণ আগে সেরেছিলাম মনে নেই, প্যান্টের যথাস্থানে ভেজা ভেজা! এতক্ষণে ভালো করে খবর পেলাম আমি এখনো বেঁচে আছি, শৌচাগারের গন্ধে একাত্মতা অনুভব করলাম, আন্ডারওয়্যার প্রায় ভিজে গেছে, পিঠেও কাপড় নেই। চটচটে রক্তের ধার নিচে নেমে গেছে, কিন্তু মোটা গেঞ্জির কতটুকু রক্তে ভিজেছে এই মুহূর্তে তা খতিয়ে দেখার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই দরকার। তারপর সেই চির পরিচিত অথচ নিঃসঙ্গ প্রেসক্লাব ছেড়ে পেছনের উঠোনে গিয়ে গাছের নিচে আড়ালে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে কনভয় এবং ট্যাঙ্ক ঘর্ঘর শব্দে বহুদূর চলে গেছে, আমি শুকনো গলায় ভয়ে ডাকলাম ঃ কুতুব!

কুতুব প্রেসক্লাবের অত্যন্ত চেনা একজন দারোয়ান। আমার ডাক শুনে সে ছায়াান্ধকার গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে এলো।

বলল ঃ এ্যাঁ, আপনার গায়ে রক্ত।

হ্যাঁ রক্ত। তাই তোমাকে ডাকছি। পারলে ব্যান্ডেজ-জাতীয় একটা কিছু দাও বাঁধি। এক গ্লাস জল।

কুতুব এক দৌড়ে ছুটে গেল। দূরের একটা বাল্ব থেকে আলোর রেখা আড়াল ভেদ করে পায়ের কাছে আবছা ছড়িয়ে আছে, কুতুবকে দেখলাম উঠোনের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের থাকার ঘরে ঢুকতে। এক, তিন, পাঁচ, সাত মিনিট...। কুতুব আসে না। কুতুব ঘর থেকে আর বেরোয় না। ওর দেরি দেখে ভয় ও ভাবনা আবার আমাকে জাপটে ধরল। কি করব কিছু ভাবতে পারার আগে বসে পড়লাম। রক্ত। আগের সমস্ত ঘটনা একের পিঠে একে জড়ো হল। পৃথিবীটা একবার প্রলয় দোলায় আমার শরীরের ওপর দুমড়ে পড়ল। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে কুতুব এসে আমার কাঁধে হাত রেখে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। এক আঁজলা দিল খেতে, হাতে ব্যান্ডেজ করে দিল ডেটল দিয়ে, পিঠেও লাগাল। আমি বসে বসে কুতুবের দিকে তাকালাম, কুতুব তাকাল। আমিও তার হাত ধরে দাঁড়ালাম। বাঁ হাত ঝিমে ধরা দুর্বল, অসাড়। কিন্তু পালানোর এই উপযুক্ত সময়, সৈন্যরা আবার আসতে পারে।

আমি ভাবনা-চিন্তা ফেলে ভাবনা-চিন্তার চেয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে কোথায় তাকালাম বোঝা গেল না। ভাবলাম সেগুন বাগানের কাছাকাছি কোন গলিতে আছি। সেগুন বাগানে আলী রেজা থাকে, শান্তিনগরে সুপ্রকাশ, চামেলিবাগে মালতী আর বায়েজিদ থাকে। আমি কার কাছে যাব? বাসাবো যাওয়া একান্তই প্রয়োজন। হাসান এখন কোথায় কার সঙ্গে আছে কে জানে? চারদিকে অবিশ্রাম বৃষ্টির ছাঁচে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, কামান কিংবা মর্টারের শব্দ অবিরাম শুনছি, একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আমি অবকাশহীন ভাবনায় ভাসছি—

চতুর্দিকে আগুনের হল্কা, আকাশটা ফরসা হয়ে গেছে, পথঘাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, স্বল্প-পরিচিত গলিও এখন চিনতে আর কষ্ট নেই। সৈন্যদের পরিষ্কার করা রাস্তায় আবার অবরোধ তৈরি হচ্ছে। পাড়ার কতক দামাল ছেলে আবার ব্যারিকেড তুলছে। বড় রাস্তা জনশূন্য।

হঠাৎ বাতাসে শব্দ তুলে কনভয়গুলো আবার এগিয়ে আসছে মনে হল। বড় রাস্তা ফেলে তার আগেই আমি ছুটে গেলাম। এবার গির্জায় ঃ প্রভু যীশু, তুমি যুগে যুগে যেমন দুঃখীদের কোলে তুলে নিয়েছ, তুমি নিজেও যেমন অত্যাচারিত, দুঃখী—তুমি আমাকে তুলে নাও প্রভু! ক্রুশের একেবারে কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, গির্জার দরোজায় বিরাট তালা ঝুলছে। হাসান, সুপ্রকাশ, গুণ মালতী কিংবা আর কারো কাছে যাওয়া হল না—প্রভু, আমাকে তুলে নাও। আবার ঝড়ের বেগে গোলা ছুটল, ইতোমধ্যে হাতের ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে একাকার হয়ে গেছে, পিঠের ক্ষতস্থান ঘামে ভেজার দুপুরের ত্বকের মতো থিকথিকে হয়ে গেছে, কামানের গর্জনও সেই মুহূর্তে রাষ্ট্র করে নিজেকে। আরো কিছু শব্দ, ধুলো, বালি, ছাই শরীরে মেখে পাগলের মতো একটা ঘরে ঢুকলাম; বুম্ করে শব্দ হল আকাশে। আমি হঠাৎ খুলে যাওয়া হাট-করা দরোজা দিয়ে ঘরে ঢুকলাম, একটা কাঠের পাটাতন স্পর্শ করলাম, সেই স্পর্শে হাত বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শরীরে প্রবেশ করতেই আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল, স্পর্শটি পরিচিত, একান্ত এবং মনে হল আমার বহু শতাব্দী পরিচিত বন্ধু। মালতী বায়জিদ হাসান গুণ-এর প্রবল পরাক্রান্ত বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ল, আরো নিবিড় করে ওদের বুকে টানলাম, বাইরে লক্ষ কোটি রাউণ্ড গুলির সূচির ঝড় বইছে, চলছে ঢাকা শহরের বক্ষ এবং হৃদয়, বাসাবোর একটি কক্ষের একটি কর্কশ কলিং বেল মিষ্টি সুরে অনবরত বাজছে, আমি আস্তে আস্তে ঐ কাঠের বাক্সের আরো কাছে গেলাম, নিবিড় হাত পাতলাম তার গায়ে কোন বঞ্চনা নেই, কোন রকম প্রতিবাদ না করে কাঠের বাক্সটি আমাকে মায়াবী হাতছানি দিয়ে ডাকল, অন্ধকারে সেই আহ্বান সুরভিত হয়ে আমাকে বিহ্বল করে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরে ধীরে ঐ কাঠের বাক্সে চিৎকার শুয়ে পড়লাম, লম্বমান মসৃণ কাঠের ঠাণ্ডা স্পর্শে মনে হল একটি কফিনে আমি শুয়ে আছি, তারপর নিবিড় এক অনুভূতির মতো কফিনের ঢাকনি মৃদু সঙ্গীতের তালে তালে বন্ধ হয়ে গেল, নাকে লাগল হাজার বছরের প্রাচীন কোন এক কাঠবাক্সের সুগন্ধ, গোলাপ আর চন্দনের মধুর সুগন্ধ অতিক্রম করে গেল আগের গন্ধকে, যেমন এক বাগান থেকে অন্য বাগানে ফুলের গন্ধ প্রবেশ করে তেমনি প্রাচীনকালের কোন এক অজানা অনামা গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগল, চারদিকে আর গোলাবারুদ যুদ্ধ হত্যা ধর্ষণের কোন চিত্র নেই এবং শব্দও নেই, আছে অনুচ্চরিত মধুর এক সঙ্গীত, মধুরতম সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইছেন পৃথিবী, বালক বয়সের জয়ের আনন্দের মতো সমস্ত শরীর-মন পুলকিত, কৈশোরের স্বপ্নের মতো একটি কুঁড়ি ফুল ফোটাতে ব্যস্ত, যৌবনের স্পর্শের মতো বিভোর এক ঘুম সমস্ত চৈতন্যকে প্লাবিত করে দিচ্ছে, এক মালতী একজনকে ভালোবেসে চুমুতে খলখল করে ছুঁয়ে চলছে, একটি বকনদী গ্রাম চোখের সুমুখে ফুলের ছড়িয়ে বুকে লুকিয়ে পড়ছে, ইছামতি নদীর স্বচ্ছ স্রোত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ধুয়ে দিচ্ছে সমস্ত গ্লানি, সেই মধুরতম সঙ্গীতের আবহে কয়েকশো সৈনিক গির্জায় ঢুকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে আমার সাদা কফিনটি কাঁধে তুলে নিল।

সাদা কফিনের মিছিল চলছে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ধরে। রাস্তার দু'পাশের সারিবদ্ধ অট্টালিকা ইমারত আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যায় নবযুগ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে, কখনো তিন দেয়ালে, আবার সমস্ত দেয়ালে জুড়ে যেন বায়ু প্রবাহের সুবিধানুযায়ী অসংখ্য ছোটো বড় ছিদ্র, কখনো ইমারতের চূড়াগুলো মসৃণ না হয়ে থ্যাবড়া

কোথাও শুধু কয়েকটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান, ছাদহীন অট্টালিকা জ্যোৎস্না অপরূপ স্বপ্ন খেলায় বিভোর আর কিছুক্ষণ আগের মারমুখো মেশিনগান এবং কামানের মুখগুলো সাদা কফিনের সম্মানার্থে অবনত, সৈন্যরা অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু'পাশের অসংখ্য গাছ লাল লাল থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ছড়াচ্ছে। একটি রাত্রির নিস্তব্ধতা বেয়ে ভেসে চলছে একটি সাদা কফিন।

৮.১ লেখক পরিচিতি

৮.১ বিপ্রদাস বড়ুয়া :

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিপ্রদাস বড়ুয়া। বিপ্রদাস বড়ুয়ার বর্তমান ঠিকানা ধর্মরাজিক বৌধবিহার, অতীশ দীপঙ্কর সড়ক, ঢাকা। ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে সিটি কলেজ চট্টগ্রাম থেকে উচ্চমাধ্যমিক, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান লাভ করলেন ১৯৬৭ সালে, এবং ১৯৬৮-তে স্নাতকোত্তর বাংলা পাশ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পেশা হিসেবে তিনি চাকুরিকে বেছে নেন। অবসর প্রাপ্ত সরকারী পরিচালক রূপে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ঢাকায় যোগদান করেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও করতে থাকেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক সবক্ষেত্রেই তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল ঃ

ছোটগল্প

১। সাদা কফিন (১৯৪৮)

২। যুদ্ধজয়ের গল্প (১৯৮৫)

৩। গাঙচিল (১৯৮৬)

৪। নদীর নাম গণতন্ত্র (১৯৮৭)

৫। বীরাঙ্গনা প্রেম (১৯৮৭)

৬। উল্কি একটি প্রেমের গল্প (১৯৮৮)

৭। স্বপ্নমিছিল (১৯৮৯)

৮। আকাশে প্রেমের বাদল (১৯৮৯)

৯। স্বপ্ন সমুদ্রে বনদেবীরা আছে (১৮৯০)

প্রবন্ধ ও গবেষণা

১। কবিতায় বাক্‌প্রতিমা (১৯৭৬)

২। গৌতম বুধ্ব ঃ দেশকাল ও জীবন (যৌথ, (১৯৮৬)

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (১৯২২)

৪। মুক্তিযোধ্বার গল্প (১৯৯১)

উপন্যাস

১। অচেনা (১৯৭৬)

নাটক

১। কুমড়োলতা ও পাখি (১৯৯৭)

২। সম্পাদনা ঃ গণ আন্দোলন (গল্প, ১৯৯১)

সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে কথাশিল্পী সাহিত্য পুরস্কার ঢাকা, ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ পদক চট্টগ্রাম, ১৩৯৫ ও ১৩৯৮ সালে অগ্রনী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৯৭ সালে অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি।

৮.২ গল্পের আলোচনা : সাদা কফিন

বিপ্রদাস বড়ুয়ার 'সাদা কফিন' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি বিখ্যাত গল্প। গল্পটি বাস্তব এবং কল্পনার মিশ্রনে এক অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পের শুরুতেই একটা নিস্তব্ধ শহরের ছবি, যেখানে পথে পথে অবরোধ, রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে, গাড়ি পর্যন্ত চলছে না, কখনো কেমন একটা সাইকেল রিকসা যদিও বা দেখা যায়, অন্য গাড়ি তো নয়ই। তাও রিক্সাগুলো প্রাণের দায়ে ঝড়ের বেগে চলছে। শুধু হাওয়ার শব্দ আর চাকার ঘর্ষণ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। দূরে দূরে ইঁট, ড্রাম, ওল্টানো গাড়ি ইত্যাদির সাহায্যে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। রাস্তার ধারে ধারে মেহগিনি ও শিশুগাছ রাস্তাগুলোকে আরও নির্জন ও জনমানব শূন্য করে তুলেছে। দূর থেকে সেই অবরোধ পাহারা দিচ্ছে মুক্তিফৌজ। সব মিলে পরিবেশটা ছিল বিস্ফোরনোখী। এমতাবস্থায় ঢাকা বেতারের তৃতীয় অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে লেখক হন্যে হয়ে একটা রিকশার কথা ভাবছেন। মতিঝিল পেরিয়ে বাসাবো পর্যন্ত তাঁকে যেতে হবে—অনেকটাই পথ, তাই হেঁটে যেতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না।

একটা রিকশার জন্য অনেকক্ষণ তিনি অপেক্ষা করছেন। বন্ধু-বান্ধব কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, প্রেস ক্লাবে যাবেন কিনা ভাবছেন। এইভাবে অনন্ত সময়ের হনন চলতে লাগল; 'রাস্তার নিস্তব্ধতায়, তারা ঘন আকাশে, নিরিবিলি এবং নীরব পত্রগুচ্ছে' রাত্রি বিরাজ করতে লাগল। দুদিন ধরে কাজের চাপে লেখক বাসায় ফিরতে পারেননি, অফিসেই রাত কাটিয়েছেন আজও ফিরতে পারবেন না এরকম একটা ইঙ্গিত আজ বেতারের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিল। এসব যখন ভাবছেন, তখন দ্রুত একটা রিক্সা চলে যাচ্ছে দেখে তিনি তার পেছনে ধাওয়া করলেন। সে জানাল, 'শহরে সৈন্য নেমেছে সাব, সরে পড়ুন, এক্ষুণি এদিকে এসে পড়বে। তাদের আছে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, আরো কত কি?...।' একথা শুনেই লেখকের মাথা খারাপ হয়ে গেলো। তিনি রিক্সাওয়ালাকে অনুরোধ করলেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু রিক্সাওয়া পালাতে পারলে বাঁচে। লেখক অনেক অনুরোধ করার পর সে তুলে নিলো তার রিকসায়। ঠিক সেই মুহূর্তে গামছা দিয়ে বাঁধা রিকসাওলার মাথাটা লেখকের কাছে অনেক বেশি উন্নত মনে হল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বাধা দেখা দিল। পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়—এক দিকে গাড়ির তীব্র শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে যেন খান্ খান্ করে দিল। রিকসাওয়ালা ভয় পেয়ে সেই মুহূর্তে রিকসা ফেলে চলে

গেল। লেখকও দৌড়ে প্রেস ক্লাবের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে গেলেন। জানালার ফাঁক দিয়ে আশা তীব্র আলোয় তিনি রাস্তা দেখলেন—সমস্ত সড়কটা ধূ ধূ ম্রিয়মান। তারই মাঝে কয়েকজন হিংস্র সৈন্য নামল। হাতে তাদের মেশিন গান। তাদের গতিবিধি সন্ধানী, প্রেসক্লাবের দিকেই তাদের দৃষ্টি। আরো দুটি কনভয়, ট্যাঙ্ক... সব মিলে হাড় হিম করা পরিস্থিতি। বিপদ ঘনিয়ে এসেছে মনে করে লেখক জানালা ছেড়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। চারিদিকের অন্ধকার হাতড়িয়ে বাথরুমের দিকে পৌঁছানোর পূর্বেই দুনিয়া কাঁপিয়ে গুড়গুড় বুম্ বুম্ শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তে ইট-বালি-প্লাসটারের গুঁড়োয় ঝড় বয়ে গেল ঘরটিতে, রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। ভীত চোখে লেখক দেখলেন কামানের গোলা ঘরের ছাদ ফুটো করে চলে গেছে। একটা বিরাট গহ্বরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মেঝেতে জঞ্জালের স্তূপ, অন্ধকারেই সমস্ত ঘরের অবস্থাটা অনুমান করে নিলেন তিনি। সমস্ত শরীরে একটা শিরশিরে বোধ অনুভব করলেন। আবার গোলাবর্ষণের আগেই ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় তিনি নামতে লাগলেন। সিঁড়ির ভাঙা হাতল ধরে নামতে নামতে তাঁর যেন মনে হতে লাগল 'অন্ধকারে মৃত্যুর মহড়া শুরু হয়ে গেছে।'

নীচে নেমে তিনি হলঘরে যখন পৌঁছলেন তখন খোলা দরজার সামনে সেই দুরন্ত প্ল্যাকার্ডগুলো ভূতের মত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। রাস্তার স্বল্প আলোয় লেখক দেখলেন—দুজন মানুষ একজন আহতকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার নিচে লেখা আছে— 'আমার ভায়ের তাজা রক্তের বদলা আমি নেবই নেব—।' লেখক যেন আপন লাশের ছবিটাও সেখানে দেখতে পেলেন। কিন্তু তিনি বাঁচতে চান, এই মৃত্যু পুরী থেকে পালিয়ে তিনি বাসাবো চলে যেতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ চলছে, পল্টন ময়দানের দিক থেকে শব্দ ভেসে আসছে, কোথায় যাবেন তিনি, কোথায় আশ্রয় নেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু একটা আশ্রয়, 'একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল নেই, মৃত্যুর ডাক এক পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে ও নিজের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো একান্ত আপন করে ধরা যায়—সেই একটুকু আশ্রয়।' মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন মানুষ যতটা ভাবতে পারে ঠিক ততটাই, স্বজন বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটা সঠিক কর্মসূচী তৈরি করতে চেষ্টা করলেন। পেছনের দিকে বাথরুমে গিয়ে মাথা গুঁজে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বড় চিন্তা নয়, যুদ্ধনীতি নয়, সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও নয়; কেবল নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাই তিনি করতে লাগলেন। বাথরুমের কাছে এসে তাঁর চোখ পড়ল সেখানকার দরজার কপাট উড়ে গেছে, মোটা গেঞ্জির কতটা রক্তে ভিজেছে বোঝা যাচ্ছে না। অতঃপর প্রেসক্লাব ছেড়ে তিনি উঠোনে গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলেন। ততক্ষণে কনভয় ও ট্যাঙ্ক অনেক দূরে চলে গেছে, তিনি কোনরকমে ভয়ে ভয়ে দারোয়ানকে ডাকলেন, সে ডাক শুনে অন্ধকার গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এবং বললো— 'আপনার গায়ে রক্ত!' লেখক তাকে ব্যাণ্ডেজ ও একগ্লাস জল দিতে বললেন। কুতুব একদৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে ব্যান্ডেজ এনে হাত বেঁধে দিল, মুখে জল ছিটিয়ে দিল। বাঁ হাত দুর্বল, কোনরকমে কুতুবের হাত ধরে লেখক দাঁড়ালেন, এটাই পালাবার উপযুক্ত সময় বলে মনে হল তাঁর, এরপরেই আবার সৈন্যরা এসে পড়তে পারে।

চারিদিকে যখন বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ চলছে তখন লেখক ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে কোথায় পালাবেন তাই ভাবছেন। লেখকের ভাষায়—'একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আমি অবকাশহীন ভাবনায় ভাসছি—চতুর্দিকে আগুনের হল্কা, আকাশটা ফরসা হয়ে গেছে, পথঘাট পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, স্বল্প পরিচিত গলিও এখন চিনতে আর কষ্ট নেই।' হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কনভয়গুলো এগিয়ে আসছে। তিনি ছুটে গেলেন একটি গির্জায়—

প্রভু যীশুর শরণাপন্ন ছিলেন। ক্রুশের একেবারে কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—'প্রভু, আমাকে তুলে নাও।' কোনরকমে তিনি ক্রুশের কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন, হাতের ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে গেছে, এমন সময় আবার কামানের গর্জন শোনা গেল; একরাশ ধুলো বালি ছাই মেখে লেখক একটা ঘরে ঢুকলেন, একটা কাঠের পাটাতন স্পর্শ করলেন, সেই স্পর্শে তাঁর শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তাঁর মনে হল স্পর্শটি বহু শতাব্দীর পরিচিত। মালতী, বায়জিদ, হাসান গুন-এর কথা মনে পড়ল, তিনি কাঠের বাক্সটার আরো কাছে এলেন, ওদের নিবিড় ভাবে অনুভব করলেন। বাইরে তখন লক্ষ রাউন্ড গুলি চলছে, দুলছে ঢাকা শহরের হৃদয়। লেখক ঐ কাঠের বাক্সের আরো কাছে গেলেন সেও বিনা প্রতিবাদে এক মায়াবী হাতছানিতে তাঁকে কাছে টেনে নিল। অন্ধকারে সুরভিত হয়ে লেখক কফিনের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর মনে হল চারিদিকে গোলা বর্ষণের কোন চিত্র নেই, 'আছে অনুচ্চকিত মধুর এক সঙ্গীত, মধুরতম সমাপ্তি সঙ্গীত গাইছে পৃথিবী।' তাঁর সমস্ত শরীর মন বালক বয়সের জয়ের আনন্দের মত পুলকিত হয়ে উঠছে, কৈশোরের স্বপ্নের মত বিভোর কুঁড়ি ফুল ফোটাতে ব্যস্ত, যৌবনের স্পর্শের মত ঘুম সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, সকল গ্লানিকে মুছে দিচ্ছে। আর সেই মধুর সঙ্গীতের আবহে বেশ কিছু সৈন্য সামরিক কায়দায় লেখকের সাদা কফিনটি কাঁধে তুলে নিল। কফিনের মিছিল চলেছে শহরের প্রধান সড়ক ধরে, দুপাশের অসংখ্য গাছ লাল কৃষ্ণচূড়া ছড়াচ্ছে আর 'একটি রাত্রি নিস্তব্ধতা বেয়ে ভেসে চলেছে একটি সাদা কফিন।'

সমগ্র গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি বাস্তব গল্প। কিন্তু গল্পের শেষ করেছেন লেখক রোমান্টিক এক আবহ দিয়ে। মৃত্যু যখন জীবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, শরীর থেকে যখন রক্ত ঝরছে অবিরত, তখন লেখক আশ্রয় খুঁজছেন সাদা কফিনের মধ্যে। এই সাদা কফিনেই আশ্রয় পেয়েছিল তাঁর বন্ধুরা, তিনিও তাঁদের স্পর্শ পেতে চেয়েছেন কফিনের পাটাতনে হাত রেখে এবং শেষ পর্যন্ত কফিনেই আশ্রয় পেতে চেয়েছেন। কফিন এখানে শান্তির আশ্রয়ের প্রতীক হয়ে এসেছে। বেঁচে থাকা যখন এতটাই যন্ত্রণার, এতটাই রক্তাক্ত হওয়ার তখন কফিনটাই একমাত্র আশ্রয় হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের কাছে। বস্তুতঃ 'সাদা কফিন' এই নামকরণও ততধিক সার্থক হয়েছে বলা যায়। 'সাদা' তো শান্তির প্রতীক। আর 'কফিন' জীবনের শেষ আশ্রয় স্বরূপ। তাই তো লেখক বলেন—'একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল নেই, মৃত্যুর ডাক এত পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে ও নিজের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো একান্ত আপন করে ধরা যায়—সেই একটুকু আশ্রয়।' এখানেই গল্পটি রাজনীতিকে অবলম্বন করেও সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

———

মূলগল্প :

ডুকরে-ওঠা কান্নার একেকটি ধাক্কায় মোবারক আলীর বন্ধ চোখের মণি কাঁপে, চোখের পাতা আলগা হয়ে আসে, বাঁ পায়ের পাতা তার শিরশির করে। দুই হাঁটুর ভেতর হাতজোড়া ভাঁজ করে ডান কাত করে শুলে বাঁ পায়ের পাতার ওপর একজিমা চুলকাবার জন্যে উঠে উৎসাহ পায় না। এদিকে দেখতে দেখতে কান্নার ফাঁকগুলো সব ভরে যায় এবং একটানা বিলাপে পরিণত হয়ে তাঁর ঝুনা করোটির ভেতরকার ঠক্‌ঠক দেওয়ালে ঘন তালে বাজতে থাকে। বাজনাটা একবার বৃষ্টি বলে মনে হয়েছিলো, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঘরের কান্নাকাটির খবর বাইরে যাবে না—এই আশা করে একটু নিশ্চিন্ত হবার আগেই বৃষ্টির বিভ্রম কাটে। বিলাপের আওয়াজ তার আঁশের মত চুলের গোড়ায় গোড়ায় হ্যাঁচকা টান মারে। টানাটানির ফলে চোখের ঢাকনি সম্পূর্ণ উদোম হলে মোবারক কিছুই দেখতে পায় না, ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার। ভালো করে তাকাবার বলও তার নাই, ঘুম ভাঙ্গা শরীরে স্ত্রীর বিলাপ অবিরাম ঠেলা দেওয়ায় সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তবে কি-না মুডুর প্রতিক্রিয়ার ফলে মোবারক আলী বিরক্ত হওয়ার বলটুকু পায়। এটা কি বিলাপ করার টাইম হলো? এইবয়সেও বুলুর মায়ের কান্ডজ্ঞান হলো না তো হবেটা কবে? ২৫০/৩০০ গজ দূরে হাইস্কুলের দালানে মিলিটারির ক্যাম্প, স্কুলের চওড়া বারান্দায় গাদা গাদা বালুর আড়ালে থাবার মত সব হাতে ধরা রয়েছে কত কিসিমের অস্ত্র, মোবারক ওসবের নাম জানে না, শুনলেও তার মনে থাকে না। সপ্তাহখানেক হলো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসটা মিলিটারি দখল করে নিয়েছে, সে তো ১৫০ গজও হবে না। বুলুর মায়ের বুকের পাটা কত বড়ো যে এইভাবে কাউন্সিল অফিস থেকে দুজন সেপাই এসে পড়লে মোবারক আলীর ক্ষমতা হবে যে তাদের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়? তারপর সেপাই, মানে সেপাই, মানে সেপাই সাহেব যদি জিগোস করে, তোমার বৌ কাঁদে কেন? তো সে কি জবাব দেবে? যদি বলে তোমার ছেলেমেয়ে কটা? তখন না হয় বলা যাবে, জী দুই ছেলে দুই মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে যে মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে, তারা সব স্বামীদের সঙ্গে থাকে। তবে ছোটো মেয়েটা দুমাস হলো এখানে এসেছে তিনদিন আগে সে গেছে তার মামা বাড়ি। তার মামা আলেম মানুষ, ঠনঠনিয়া মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার হেড-মোদাররেস, সারা শীতকালটা ওয়াজ করে বেড়ায়, জেলা জুড়ে তার নাম। সেপাই ধমক দিতে পারে, আরে, এতে তার বিবির কান্নাকাটির কি হলো? ঠিকভাবে কথার জবাব দাও।—তখন বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে তার বড়োছেলের মৃত্যুই হলো তাঁর স্ত্রীর কান্নাকাঠির কারণ। বড়ো ছেলে? জী, আমার দুই ছেলে, ছোটোটা ঘরেই আছে, ক্লাস ফোরে পড়ে। সেপাই চটে যাবে, বাখোয়াজি রাখো। বড়োটা মারা গেছে? হুজুর অপঘাতে মারা গেছে। অপঘাত? অপঘাত কেয়া হ্যায়? না, মানে এ্যাক্সিডেন্ট হ্যায় না? হেঁ হেঁ। ক্যায়সা এ্যাক্সিডেন্ট? সাচ বলো। এরপর মোবারক আলী আর বলতে পারবে না। জী না স্যার, জী না হুজুর, জী না মেজর সাহেব, জী না ক্যাপ্টেন বাহাদুর, আমি কিছু জানি না। শালা তোমার ছেলে মিসক্রিয়ান্ট ছিলো? তোমার ঘরে তুমি মিসক্রিয়ান্টদের শেলটার দাও? না হুজুর। মিসক্রিয়ান্টদের কথা সে জানে

না। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানী মোবারক আলী হাজার হলেও পাকিস্তান গভর্নমেন্টের চাকরী করে, জী, তার বেতন আগে বগুড়া ট্রেজারি থেকে, মিসক্রিয়ান্টদের খবর সে রাখবে কোত্থেকে? না, তার শুকনা এবং কাঠ-কাঠ গলা থেকে এইসব বাণী হাঁজা সহজ নয়। মিলিটারীর সঙ্গে কাল্পনিক বাক্য বিনিময়ের সংকল্পে তার বল তাই বাড়ে না। তার পাশে শুয়ে থাকা ছোটো টুলু ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি বলে। তাতে মোবারক আলীর তন্দ্রা একেবারে ছিঁড়ে যায় এবং সে উঠে বসে। এখন আর শিরশির না করলেও একজিমার খানিকটা চুলকে নেয় এবং পাশের ঘরে দেড় বছরের নাতিটা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তখন তার মগজের ময়লা কাটে, মোবারক আলী বোঝে যে এই একটানা বিলাপের উৎস তার নিজের বাড়ি নয়। আওয়াজ আসছে দক্ষিণ থেকে। নাতি তার ফের কাঁদে এবং মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায় ঃ চেয়ারম্যানের ছেলেটা তা হলে মারা গেলো।

বিকালেও সে চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়েছিলো। ইউনিয়ন কাউন্সিলে মিলিটারি ক্যাম্প হবার পর থেকে অফিসের টুকিটাকি কাজ সারতে হয় চেয়ারম্যানের বাড়িতে। বিকালবেলা চেয়ারম্যানের চোখমুখ একটু হাল্কা মনে হচ্ছিলো। শাজাহান মনে হয় একটু ভালো। না, ভালো আর কোথায়, জ্বরটা রেমিশন হচ্ছে না, তবে লেবু দিয়ে প্রায় এক গ্লাস বার্লি খেয়েছে। চেয়ারম্যান একটু আলাপও করলো, এখানে চিকিৎসা একেবারেই হচ্ছে না, অবস্থা একটু ভালো হলে বগুড়া পাঠাবো। চার গাঁয়ের এক ডাক্তার চেয়ারম্যানেরই কিরকম চাচাতো ভাই, একই বাড়ি, মার্চের প্রথমদিকে দিনাজপুরে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেলো শরণাপন্ন সম্বন্ধীকে দেখতে, গোলমাল শুরু হতেই ওপারে ভাগলবা। আর শেরপুরের বীরু সান্যাল, পুরনো আমলের ন্যাশনাল পাশ-১০/১২ বছর আগেও এই গ্রামের সবাই তার কাছেই যেতো, তা শোনা যাচ্ছে বর্ডার পার হবার সময় বেয়নেটের খোঁচায় বুড়ো সাফ হয়ে গেছে। ছেলেকে নিয়ে চেয়ারম্যান এখন যায় কোথায়? গোরুর গাড়ি করে শেরপুর পর্যন্ত না হয় গেলো, শেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি, খালি মিলিটারি। তা এখানে হাইস্কুল ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে চেয়ারম্যানের একটু আলাপ হয়েছে, তবে ওদের সাহায্য চাইতে ভয় হয়, ঘরে জোয়ান বয়সের মেয়েরা আছে, কিসের বিনিময়ে আবার কি চেয়ে বসে। তা দ্যাখা যাক, আজ তো বার্লি খেলো, অবস্থা একটু ভালো হোক, এর মধ্যে কি অনেকটা নর্ম্যাল হবে না? দেশের অবস্থা নর্ম্যাল হওয়ার আগেই ছেলেটা মারা গেলো? তাহলে সন্ধ্যার পর থেকে কি খারাপ হচ্ছিলো? মনসুর সরকার কয়েক বছর থেকে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করে, কাউকে না পেয়ে তাকে দ্যাখানো হলো। তার ডায়াগনোসিস হলো টাইফয়েড। দূর, টাইফয়েড কি দুটো সপ্তাহ সময় দেবে না? দশ বারো দিনেই সব শেষ হয়ে গেলো? আহা। ছেলেটার মায়ের স্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার সঙ্গে ছলকে উঠে চেয়ারম্যানের মায়ের কান্না। এদের কান্নাকে মোবারক বুলুর মায়ের বিলাপ বলে ভুল করলো কি করে? স্ত্রীর জন্য তার মায়া হয়, শোকে বুলুর মা একেবারে কাঠ হয়ে গেলো। বৌয়ের ওপর যে মিছিমিছি রাগ করেছিলো।

বিছানা থেকে নেমে মোবারক আলী ঘরের উল্টো প্রান্তে বৌয়ের বিছানার দিকে পা বাড়ায়। তক্তপোষের কাছাকাছি যেতে পা লেগে নেভানো হ্যারিকেনটা গড়িয়ে পড়ে। কেরোসিনের ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা আরেকটু পরিষ্কার হয়। মনে পড়ে যে নাতিকে নিয়ে বুলুর মা শুয়ে রয়েছে পাশের কামরায়। এই ঘরটায় থাকতো বুলু। মোবারক আলী একটু দমে যায়, তবু অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বারান্দা দিয়ে পাশের কামরায় ঢোকে। বুলুর মা

বলে ওঠে, 'আস্তে হাঁটো, টেবিলের উপরে দুধের বোতল, কাঁচের গিলাস।' মোবারককে সব বলার দরকার হয় না। রাত্রিবেলা এ ঘরের ভূগোল মোবারকের মুখস্থ। আজ দু'রাত হলো বুলুর মা এখানে শোয়, কিন্তু বুলুর খবর শোনার পর থেকে মোবারক অনেক রাত্রে পেচ্ছাপ করতে বেরিয়ে একবার করে এই ঘরে বসে। অল্পক্ষণ বসে, পাছা ঠেকাতে না ঠেকাতেই উঠে নিজের ঘরে যায়। কিন্তু তার জানা আছে কোথায় বুলুর তক্তপোষ, কোথায় তার কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে পুরনো ক্যালেন্ডারের মলাট লাগানো বইগুলো, খাতা দোয়াত, কলম-কিভাবে, সাজানো সব তার জানা। বিছানার দিকে এগোবার বদলে মোবারক টেবিলের বইপত্র হাতড়াতে শুরু করে। বুলুর মায়ের সাড়া না পেয়ে সে বিড়বিড় করে, দিয়াশলাই পাই না, দূর!

'বাতি জ্বালায়ো না'। ভিজে ভিজে গলায় স্ত্রীর এই সতর্ক নিষেধ শুনে মোবারক এসে দাঁড়ায় তক্তপোষের মাথায়। মাস দেড়েক হলো প্রতিরাতে পেচ্ছাপ সেরে ঘরে এসে ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে মোবারক বিছানাটা ভালো করে ঠাহর করার চেষ্টা করে। আজ তার মাথায় তন্দ্রার রেশ নাই, সুতরাং বুলুর ঢ্যাংগা শরীরটাকে এখানে শুইয়ে অন্ধকারে নয়ন ভরে আর দ্যাখা হয়ে ওঠে না। চোখ জোড়া তাই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে এবং বিছানার ওপরকার শূন্যতা চোখের মধ্যে নুন হয়ে জমতে শুরু করলে নিজেকে সামলাবার জন্য তাকে অনাবশ্যক স্বাভাবিক গলায় বলতে হয়, 'চেয়ারম্যানের ব্যাটা বুঝি মারা গেলো!' শাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বুলুর মা ফোঁপাতে শুরু করে। এই ফোঁপানো দীর্ঘকান্নার রেশ। বুলুর মা তাহলে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। ঘুম ও তন্দ্রার ভেতর দক্ষিণপাড়ার আখন্দবাড়ির বিলাপকে যখন সে স্ত্রীর কান্না বলে ভুল করে, বুলুর মা তখনো কাঁদছিলো। তবে বাইরের বিলাপের তোড়ে রোগা গলার কান্না চাপা পড়েছিলো। স্ত্রী বিলাপ করছিলো বলে একটু আগে তার ওপরে রাগ করায় মোবরকের যে অস্বস্তির মত হচ্ছিলো তা এখন কেটে যায়। স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হবার সুযোগটি সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করে। 'আস্তে! আস্তে কাঁদো! বিপদ বোঝো না?'

চুপ করার চেষ্টায় বুলুর মায়ের কান্না আরো উথলে ওঠে। কান্নায় সম্পূর্ণ মগ্ন থাকায় এবং অন্ধকারের জন্যেও বটে, বুলুর মা স্বামীকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয় ও রাগে মোবারক আলীর চোখমুখ-নাক-ঠোঁটের ওলটপালট হবার দশা ঃ বুলুর মা সারাটি জীবন কি অবুঝ মেয়েমানুষ থেকে যাবে? তার কান্না শুনে মিলিটারির কজন সেপাই যদি এসেই পড়ে তখন এই পুত্রশোকের ব্যাখ্যা করা যাবে কি করে? তখন কি খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না? তারপরে? তারপরের ঘটনা মোবারকের জানা আছে। তাকে ধরে নিয়ে যাবে স্কুলের দালানে, হেডমাস্টারের কামরায় এখন টর্চার সেল। মোবারক আলীর মেরুদণ্ড শিরশির করে। সুতরাং টর্চার সেলের ছবি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলার জন্য সে কাতর হয়। তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। এই পুরনো মাটির বাড়ি, টিনের চাল, বাঁশের সিলিঙ—সব দাউদাউ করে জ্বলবে। আগুনের আঁচ সে এখনি অনুভব করতে পারে। তলপেটে আগুনের আঁচ লাগে। তার ভয় হয় যে লুঙ্গিতে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ছে। একটু বাইরে গেলে হতো। কিন্তু এও তার জানা আছে যে বাড়ির পেছনে ভেরেন্ডা ঝোপে বসলে গুনে গুনে ৮ ফোঁটাও পড়বে কি-না সন্দেহ। সে প্রায় চিৎকার করে ধমক দেয়, 'চুপ করো, বুলুর মা চুপ করো। সোয়াগ দ্যাখাবার টাইম পাও না, না?' ধমকে কাজ হয়। বুলুর মা চুপ করে। এই সুযোগে মাথা তোলে দক্ষিণপাড়ার বিলাপ। মোবারক

আলী হঠাৎ খুব জোরে নিশ্বাস ফেলে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া পাছাটিকে ধপাস করে তক্তপোষের একধারে ফেলে দিলে বুলুর মা বলে, 'আস্তে'। এই একটিমাত্র শব্দে স্বামীর প্রতি তার সাময়িক অনাস্থা প্রকাশ পায়। প্রায় মিনিট দুয়ের পার হলে মোবারক আলীর শিরদাঁড়ায় স্পন্দন থিতিয়ে আসে এবং আপোষ আপোষ গলা করে সে বলে, 'চেয়ারম্যানের একটাই ব্যাটা গো!'

শাজাহানের জন্যে মোবারক আলীর খারাপ লাগে। স্কুলের সাত বছর বুলুর ক্লাসমেট ছিলো। না, স্কুলজীবনে দু'জনের তেমন খাতির হয়নি। শাজাহান ছাত্র খুব ভালো, রাতদিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে। বুলু গড়পড়তা ছাত্র, সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেই খুশী। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও শাজাহানের তৃপ্তি হয় নি, আর ক'টা নম্বর পেলেই সে অনেক ভালো করতো। এই নিয়ে তার আক্ষেপেরও আর শেষ নাই। শাজাহান বছরের একটা মাস কোনো না কোনো রোগে ভোগে, নইলে চেয়ারম্যান কি তাকে গ্রামের স্কুলে ফেলে রাখে? শহরে তাদের কতো আত্মীয়স্বজন, জেলা স্কুলে পড়লে কেবল রোল নম্বর নয়, খবরের কাগজে তার নামও ছাপা হতো। এস. স. সি.-র পর শাজাহান শুনলো না, জেদ করে ভর্তি হলো ঢাকায়। বুলু গেলো বগুড়া কলেজে। অথচ, তখন থেকে দুজনের ভারি ভাব। ছুটিতে বাড়ি এসে দুজন প্রায় সারাদিন একসঙ্গে কাটায়। শাজাহান ছেলেটি ভারি ভদ্র, বাপ-চাচাদের মতো কথায় কথায় খোঁচা মারা কথা বলে না'—বুলুর কথা ভোলার জন্যে মোবারক আলী শাজাহানের কণ্ঠস্বর মনে করার চেষ্টা করে, আহা কি অমায়িক ছেলে, দ্যাখা হলেই 'স্লামালেকুম চাচা, বুলু বাড়ি নাই?—আহা, সেই ছেলে কয়েকদিনের জ্বরে এভাবে। শাজাহানের জন্য শোকটা তারিয়ে তারিয়ে দেখবে, তা বুলুর মা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে লাগল। ছেলের শোক বহন করার চেষ্টা সে এখন করছে একা একা। মেয়েমানুষের দৌড় মোবারক আলীর জানা আছে। একটু পরেই তার হাত জড়িয়ে হাউ-হাউ করতে শুরু করবে। কেন, ছেলেকে আগলে রাখতে পারো নি, এখন হায় হায় করে লাভ কি? বুলুটা বড্ডো বেশি বেড়ে গিয়েছিলো। মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কি? মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজার করে দিচ্ছে, মরা ছাড়া তোরা আর কি বালটা করতে পারিস?—রাগে মোবারক আলী মনে মনে মুখ খারাপ করে। করবে না? মিলিটারি কলেরার মতো আসে, ম্যালেরিয়ার মতো আসে। যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোনো চিহ্ন রাখে না। গতকাল বৃহস্পতিবার গেলো, তার আগের বৃহস্পতিবার মাইল ছয়েক উত্তরে মালিয়ানডাঙায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলো। একদিন পরে, শনিবার দিনগত রাত্রে সিঙরা ক্যাম্প থেকে মিলিটারি এসে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো। প্রাইমারি স্কুলটাও বাদ দেয় নি। মুক্তিবাহিনী, তোরা কি করতে পারলি? সরকার বাড়ির ল্যাংড়া জমির আলীর এক মেয়ে এক ভাইঝিকে নিয়ে গেলো, কি ব্যাপার?—না, তাদের নামে কমপ্লেন আছে।—মেয়েমানুষের নামে কমপ্লেন?—হ্যাঁ, তারা সব ইনফর্মার, মুক্তিবাহিনীকে খোজখবর পাঠায়।—তাদের একজন ফিরে এলো দুসপ্তাহ পর। সেই মেয়েকে নিয়ে ল্যাংড়া জমির আলী যে মুসিবতে পড়েছে কপালে তার আরো কতো যে ভোগান্তি আছে। গজব! এ গজব! ছাড়া সব কি? চেয়ারম্যান সে চেয়ারম্যান, যে সরকারই আসুক, লোকটা ঠিকই সামলাতে পারে, আল্লার রহমতে সবাইকে খুশী রাখার মতো ক্ষমতা তার আছে, তো সেই চেয়ারম্যান পর্যন্ত পরশু দিন সকালবেলা মোবারক আলীকে বলে, 'মোবারক মিয়া, ডাঙর বেটিছেলেক বাড়িত না রাখাই ভালো গো।—'কেন?' মোবারকের অজ্ঞতায়

চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়, 'বোঝেন না? ইউনিয়ন কাউন্সিলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প করলো, এরকম ঘরের মধ্যেই ঢুকলো, না কি কন? মিলিটারির সব মানুষ তো একরকম নয়। হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি সমান হয়? আবার এটাও কই, দুই চারটা মাথাগরম মানুষ না থাকলে মিলিটারি চলে না।

চেয়ারম্যানের পরামর্শে মোবারক আলী তার ছোটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিল সম্বন্ধীর সঙ্গে। চেয়ারম্যানও তার মেজো মেয়েটিকে সঙ্গে দিলো। মেয়েটি বেশ ফর্সা, নাকমুখ চোখে পড়ার মতো, তাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। মোবারক আলীর সম্বন্ধী নামকরা মওলানা, জেলার নামকরা মাদ্রাসার হেড মোদারসের, গোলমালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় বাড়িতেই থাকে, আল্লা আল্লা করে মানুষকে হেদোয়েত খবর পেয়ে বোনভগ্নীপতির সঙ্গে দ্যাখ্যা করতে এসেছিলো। আহা, উপযুক্ত ভাগ্নে তার ওপর কিনা খোদার গজব পড়লো, নইলে এভাবে গুলি খেয়ে মরে? মোবারক আলী ফিসফিস করে জানায় যে এখানে এসব নিয়ে সব কথাবার্তা না বলাই ভালো। মিলিটারি খবর পেলে নির্বংশ করে ছাড়বে। তা মওলানা সাহেব জবান দিয়ে গেছে, বাড়ি গিয়ে বুলুর নামে কোরান খতম করাবে, আরো যা যা করার সব করবে। তারপর মোবারক আলীর এক কথায় ভাগ্নীকেও সঙ্গে নিলো, এমন কি জোহরার দেড় বছরের ছেলেটিকেও নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু মেয়ের পেটের কথা ভেবে বুলুর মা নাতিকে রেখে দিলো। পোয়াতি মেয়ে, জমির আল দিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছাপিয়ে যাবে, কোলে বাচ্চা থাকলে বিপদে আপদে সামলাতে পারবে? জামাই ঢাকায় ব্যাঙ্কের কেরানী, বৌ বাচ্চা পাঠিয়ে দিলো—না ঢাকায় ফুটফাঠ লেগেই আছে, আর এ সময়টা মেয়েরা তো মায়ের কাছেই ভালো থাকে। মায়ের কাছে আর রাখা গেলো কোথায়?—আল্লা না করুক জোহরার যদি কিছু হয়!—জোহরার সম্ভাব্য বিপদের কথা মনে হলে মোবারক আলীর নিয়ন্ত্রণহীন শরীর আরো এলিয়ে পড়তে চায়। শরীর সামলাবার উগ্র বাসনাতেই সে বলে, 'যাই! চেয়ারম্যানে বাড়িতে যাই! একটাই ব্যাটা। কয়টা দিন খুব ভুগলো গো। চেয়ারম্যানের বৌ এই কয়টা দিন একটা মিনিটও ব্যাটার কাছ ছাড়া হয় নাই। ব্যাটা ব্যাটা কর্যা মনে হয় জান দিবি।'

এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে বুলুর মা। বলকানো কান্নার জন্যে প্রথমদিকে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কান্নার স্বর নামে এবং কথা স্পষ্ট হয়, 'সেই কথাই তো কই গো, হামি সেই কথাই কই!' কোন কথা তো শোনার জন্যে মোবারক আলীকে আরো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়, 'দ্যাখো তো চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাই মরলো মায়ের সামনে, বাপের সামনে! মাও তো তার ব্যাটাকে জান ভর্যা দেখ্যা লিবার পারলো! আর হামার বুলু কোটে কার গুলি খাইয়া থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, আমার বুলুর উপরে গজব পড়ে কিসক গো?' বুলু অপঘাতত মরে কিসক গো?—এর জবাব দেওয়া মোবারক আলীর সাধ্যের বাইরে। বুলুর মায়ের এই বিলাপময় প্রশ্নে খাঁড়া থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্য এক্ষুণি তার বাইরে পালানো দরকার। কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে বোঝা যায় ফর্সা হতে এখনো বাকি। অন্ধকার, বাইরে বেরুলেই গুলি করে দেবে। দশ বারো দিন আগে সরকার বাড়ির এক বর্গাদার চাষা পিঠে গুলি খেয়ে মরলো পানধোয়া বিলের ধারে। বিলের কাছে তহসিন সরকারের নাবা জমিতে লোকটা ঘর করে থাকে, তহসিন সরকারের জমিতেই বর্গা চাষ করে। রাত্রে বিলের ধারে পায়খানা করতে বসেছিলো। হাইস্কুলের ক্যাম্প থেকে গুলি করা হয়। পেটে গুলি লাগলো, সেও রাত্রেই। নজীবুল্লা গিয়েছিলো বেলকুচি হাটে। মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ায় এদিককার হাটবাজার

সব লাটে ওঠার অবস্থা,—গত বছরের সের পাঁচেক মরিচ ছিলো, তাই বিক্রি করতে নজীবুল্লার বেলকুচি যাওয়া। ফিরতে একটু রাত হয়েছিলো, রাত আর কতো, এই এশার আজান দিয়েছে কি দেয় নি, স্কুলের সামনে দিয়ে সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে তো মিলিটারি তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামতে বলে। নজীবুল্লা থামবে কি, পড়িমড়ি করে দৌড় দেয় সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি এসে লাগে তার পিঠে। মনে হয় গুলি লাগার পরেও লোকটা দৌড়েছিলো, তার লাশ পাওয়া যায়—আমিনুদ্দিন আয়নুল, পদুমশহরের হামেশ মন্ডল, হাইস্কুলের অঙ্ক স্যার নুর মোহম্মদ—এদের মারা হয়েছে লাইনে দাঁড় করিয়ে, স্কুল দালানের পেছনে, ছোটো ক্লাসের ছেলেরা যেখানে দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু খেলতো, সেখানে এদের পুঁতে রাখা হয়েছে। বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ,—তাইতো একটা মাসে যতোগুলো মানুষ মড়লো সব কটা গুলি খেয়ে মরেছে। সব্বাই। তাই তো। সকলের অপঘাতে মৃত্যু। এমন কি পুব অঞ্চলে বিয়ে হয়েছে তার খালতো বোন আমেনাবুবুর, সে মেলা দুর, যমুনার তীরে কেষটিয়া গ্রামে, প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল আসে আর তারা নদীভাঙার ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে, এবার এসেছে নদীর বাপ মিলিটারি। আমেনাবুবুর দেওরের ছেলে আলী আকবর, চন্দনবাইসা কলেজে আই. কম. পড়ে, তাকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে যমুনায়। চন্দাবাইসা তহশীলদার অফিসে মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে ছেলেটা ধরা পড়ে, তার কাছে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো। আহা, বেচারা বংশের একমাত্র ছেলে, ঐ বাড়িতে আর সবকটা মেয়ে, ছেলেটাকে খুব কষ্ট দিয়ে মেরেছে। না, না বুলুকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ধরা পড়ার আগেই ও গুলি খায়।—সেই অজ্ঞাত জায়গার অশ্রুত গুলির শব্দ—তার মাথাটা দুলে ওঠে, হঠাৎ মনে হয়, তাইতো, কয়েক মাস এই এলাকায়, এমন কি পুব অঞ্চলে কেষটিয়া গ্রাম, সেখানে পর্যন্ত—সবাই মারা গেছে গুলি খেয়ে। সব অপঘাতে মৃত্যু, স্বাভাবিকভাবে লোকে মরে না, গজব, আল্লাহার গজব পড়েছে, গজব না পড়লে মানুষেরা এরকম মৃত্যু হয়?—চেয়ারম্যান লোকটার ভাগ্য।—তার ছেলেরই এমন স্বাভাবিক মরণ। এসব ভাগ্যের ব্যাপার! চেয়ারম্যান লোকটার সবদিকেই ভাগ্য ভালো, তার জমিতে ফসল হয় সবচেয়ে ভালো, যেবার যা বোনে সেবার তাতেই লাভ থাকে। চাল বলো, মরিচ বলো, পেঁয়াজ বলো, আলু বলো—চেয়ারম্যানের জমিতে যার ফলন ভালো সেই ফসলের সেবার দাম উঠবে। আবার দ্যাখো না, তিন তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলো, ইলেকশনে লোকটা কখনো হারে না। একমাত্র ছেলে, ছাত্র কতো ভালো, গত কয়েক বৎসর এই স্কুল থেকে তার মতো রেজাল্ট কেউ করতে পারেনি। আবার দ্যাখো সবাই যখন এদিক ওদিক মরছে, চেয়ারম্যানের ছেলে তখন মায়ের কোলে দোল খেতে খেতে মারা যায়। এটা ভাগ্য ছাড়া কি?—দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপার জন্য মোবারক আলী একটু কাশে। আর বুলু-কি সুন্দর ছেলে তার, কিরকম ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছিলো, তাই না?—মোবারক আলীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, ও ঠিক ওর দাদার মতো হতো, সেই ছেলে দিব্যি ভালো ছেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো, চার মাস পর খবর এলো যে সে গুলি খেয়ে মারা গেছে? কোথায়? না সে এখান থেকে মেলা দুর! একই জেলা, তবে সে হলো পুবের পলি এলাকা। হ্যাঁ, আমেনাবুবুর শ্বশুরবাড়ির কাছে। গ্রামের নাম তার জানা নেই।

দেড় মাস আগে বুলুর মরার খবর পেয়ে মোবারক ভাবছিলো যে বৌয়ের কাছে খবরটা একেবারে চেপে যাবে। তা খবর শোনার পর কয়েকটা ঘন্টা সে চুপ করেই ছিলো, তা যে ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছিলো

তার বিশেষ অনুরোধে। অনুরোধ না বলে আদেশ বলাই ভালো, যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তারা কি অনুরোধ করতে পারে? ছেলেটার নাম কি?—না, নামটা মনে না করাটা ভালো, বাড়ির কাছে মিলিটারি ক্যাম্প, কখন কে এসে ধমক দেবে আর মোবারক আলী তার নাম ফাঁস করে দেবে। নাম মনে না থাকলে কি হয়, তার চেহারা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই মোবারকের সামনে দোলে। ঘন কালো মেঘের সামনে শ্যামবর্ণ একখানা মুখ। ও যখন আসে তখন বিকালবেলা। খুব মেঘ করায় অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। মোবারক হাট থেকে ফিরছিলো পা চালিয়ে। এদিকে, এই ৫/৬ মাইলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প তখনো হয়নি, তাই আকাশে জমাট মেঘ ছাড়া জোরে হাঁটার জন্য কোনো কারণ ছিলো না। ছেলেটিকে সে প্রথম দ্যাখে, বড়োমিয়ার আউশের জমরি পাশে সাইকেল ঠেলে ঠেলে পার হচ্ছিলো। তারপর সাইকেলে উঠে ছেলেটি তাদের গ্রামের দিকে চলে যায়। পাকুড় গাছের তলায় এসে রাস্তা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। ছেলেটি সেখান থেকে আড়াল হয়ে পড়লো। তার দিকে মোবারক আলী ভালো করে লক্ষ্যও করেনি। হাটে, শুনে এসেছে যে শেরপুর শহরে মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর তছনছ করে ফেলেছে। তারপর বগুড়ায় নাকি মিলিটারির আড্ডা, মানুষের লাশের গন্ধে নাকি টাউনে ঢোকা যায় না। আবার এরই মধ্যে কোন এক বড়ো মিলিটারি অফিসার মেরে ফেলেছে কারা। বর্ডারে জোর যুদ্ধ চলছে। এবার পাটের দর বাড়তে পারে। হাটের ভেতরেই লোকজন ফিসফিস করে এইসব আলোচনা করে। মোবারক আলী ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের সামনে এসে পড়ে, না সাইকেলের কখন চিহ্নমাত্র দ্যাখ্যা যায়নি। অফিসের পাকা বারান্দায় উঠে মোবারক অফিস ঘরের তালা দুটো একবার করে টেনে দ্যাখে। না, ঠিক আছে। এ পর্যন্ত ভুল কোনোদিন হলো না, তবু যতোবার এদিক দিয়ে যাবে,—তা সে জমি দেখতে হোক কি হাটে বাজারে হোক বা বিলে মাছ ধরতে হোক—বারান্দায় উঠে তালা দুটো তার পরীক্ষা করা চাই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে একবার আকাশের দিকে মেঘের ভারটা ঠাহর করার চেষ্টা করলো। না, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার, বারান্দা থেকে নিচে নামছে এমন সময় অফিসের পেছন থেকে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো শকলু পরামাণিক। শকলুকে দেখে মোবারক ভ্রু কোচকায় ঃ এইসব চাষা-ভুষাদের মানুষ করা তার বাপের সাধ্যের বাইরে। এতোবার বারণ করা হয়েছে তবু শালাদের হাগামোতা সব এই অফিসের পেছনে। চেয়ারম্যান সাহেব এতো সখ করে শেফালির চারা লাগিয়েছে, তা এদের গুয়ের গন্ধে উঁকি দেওয়া যায় না। কিন্তু তাকে ধমক দেওয়ার আগেই শকলু বলে, "চাচামিয়া, একটা চ্যাংড়া আপনের ঠিকানা পুস করচ্ছিলো। সাইকেল নিয়ে আচ্চে।'

'কেটা?'

'কে জানে বাপু? হামি পুস করলাম তো ক'লো বুলুর সাথে কলেজত পড়ে হামাগোর ইঠানকার মানুষ লয় গো চাচামিয়া হামি এক লজর দেখ্যাই বুঝিছি টাউনের মানুষ!'

'নাম পুস করিছিস?'

'ক্যাঙ্কা কর্যা করি? এ্যানা কথা কতে না কতে সাইকোলত উঠ্যা তাই হাঁটা দিলো। বুলুর ক্লাসমেট? মোবারক আলী যতো তাড়াতাড়ি পারে ছুটতে লাগলো। আজ চারমাস বুলুর দ্যাখ্যা নাই। মার্চের মাঝামাঝি বাড়ি এলো এখানেও তখন খুব তোরজোড়। রাস্তায়, হাটে, বাজারে, পুকুর ধারে খালি মিছিল। গাঁও গেরামে এতো মানুষ কোনদিন দ্যাখা যায় নাই। মানুষ যেন ফুলে ফেঁপে উঠছিলো। মানুষ হয়তো বিশটা কি তিরিশটা

কিন্তু ওদের চিতানো বুদ দেখে মনে হয় এককজনের গায়ে দশ মানুষের বল। বুলুর খাওয়া নাই গোসল নাই, খালি এগ্রাম ওগ্রাম করে জোয়ান জোয়ান ছেলেদের নিয়ে প্যারেড করে, এইসব কালোকিষ্টি চাষাভুষা রাখালদের নিয়ে সে যেন জগৎ জয় করবে। ছেলেটা হঠাৎ ঢ্যাঙা হয়ে গেছে। শহরে দুর সম্পর্কের মামাবাড়িতে থাকে, কি খায়, কি পরে অথচ দেখতে দেখতে তাগড়া জোয়ান হয়ে গেলো। মার্চের শেষে ঢাকায় মিলিটারিরা ঢুকতে দিচ্ছে না, শহরের উত্তরদিকে ব্যাঙ্কের দালানের ওপর পজিশন নিয়ে ফাইট করে যাচ্ছে চেয়ারম্যান, একদিন এসে অভিযোগ করে, মোবারক মিয়া, বুলু এই গোলামদের মধ্যে যাচ্ছে, আপনে শাসন করিচ্ছেন না? আবার হামার শাজাহান খালি খালি চেতারে শাজাহান স্কলার ছাত্র, অর কি ইগলান করা মানায়, কেন?' তারপর আস্তে আস্তে বলে কি পাগলামি শুরু করিছে, কন তো? চ্যাংড়া-প্যাংড়ার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকিছে। গাদাবন্দুক আর দা কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, এ্যাঁ? মোবারক আলীও এসব বোঝে। কিন্তু বুলুকে বোঝাবার আগেই সে একদিন উধাও হয়ে গেলো। ৪ দিন যায়, ৫ দিন যায়। তার পাত্তা নাই। খবর আসে যে বগুরায় মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেখানে থেকে মানুষের ঢল আসে, এই গ্রামের ভেতর দিয়ে যায়, বেশির ভাগই ভদ্দরলোক। কি সুন্দর সুন্দর সব মেয়ে। চশমা চোখে জুতো পায় হাঁটে। জীবনে গ্রামে আসেনি, তারা হাঁটতে হাঁটতে টলে, টলতে টলতে পড়ে যায়। শেরপুর থেকে মানুষ পালালো। এমন কি বগুড়ায় সরকারি ব্যাংক ভেঙে টাকা নিয়ে নেতারা পর্যন্ত এই পথ দিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেলো। সেই টাকা দিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করবে। কিন্তু বুলুর ব্যাখ্যা নাই। বাড়ির দিকে যেতে যেতে মোবারকের বুক টিপটিপ করে, বয়স তো হলো এখন কি অমনি করে ছোটা যায়? সাইকেলওয়ালা ছেলেটি হয়তো বুলুও হতে পারে ছদ্মবেশ ধরে এসেছে। শুকলু হয়তো চিনতে পারে নি। এরকম হতে পারে না?—না।—এরকম যে হয় নি সেই ক্ষোভ মোবারকের আজও কাটে নি। ছদ্মবেশী বুলুকে দ্যাখার আশাভঙ্গের দৃশ্যটি সে তাই মুছে ফেলতে চায়। শুকলু পরামানিকের কথাবার্তা বরং আর একেবারে শোনা যায় না। এর সপ্তাহ দুয়েক পর গ্রামে কজন মিলিটারি ঢোকে শুকলু তখন বড়োমিয়ার জমিতে কাদা মাটিতে উপুড় হয়ে গীঙাতলা থেকে ধানের চারা তুলেছে।

কে ধানের চারা তুলছে। জীপের আওয়াজে সে চমকে উঠে দাঁড়ায়। তার হাতে এক আঁটি কলাপাতা সবুজ ধান গাছের চারা এবং চোখে বোকা ভয়। মিলিটারি সোজা গুলি করে তার পেটে।—মিলিটারি কি বুলুর পেটে গুলি চালিয়েছিল?—অন্ধকার ঘরে নাতিকে নিয়ে শুয়ে থাকা স্ত্রীর পাশে বসে মোবারক আলী নিজের পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। পেটের বাঁ কোণে তার বহুদিনের একটা চিনচিনে ব্যাথা থিলো, আর মাস তিনেক হলো সেটা বোঝা যায় না। নিজের পেটে গুলিবারুদ পেতে নিয়ে বুলু কি তার পেটের ব্যাথা চিরদিনের জন্য শুয়ে নিয়ে গেছে? মোবারকের মনেই থাকে না সাইকেলওলা ছেলেটি বুলুর মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়েছে তাতে পেটে গুলি লাগার কোনো কথা নাই। হয়তো একটু পরেই সেটা তার মনে পড়তো, কিন্তু ফের প্যানপ্যান করতে শুরু করে বুলুর মা, একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখবার পারনু না গো! কোটে কোন পাথরের মধ্যে একলা একলা দাপাদাপি কর‍্যা মরলো, মুখোত এ্যানা পানিও পালো না গো। হামার ব্যাটার উপরে ইক্কা গুজব কিসব পড়তো গো? আল্লার বিচার ক্যাঙ্কা কও তো? তার মাটিও হয় না, কোটে কোন কাদোর মধ্যে পড়া থাকে, কও তো!

'থামো!' মোবারক আলী ভয় পায় না কিসক? বুলুর মা রাগ করে, 'তুমি যায়া তার খবর জিয়ারত করা্যা আসলানা কিসক? অপঘাতত মরছে, তো তাই কি তোমার ব্যাটা লয়? পাষাণ বাপ হছো, ব্যাটা তোমার নিজের পয়দা লয়?—রাগ করতে চাইলেও বুলুর মা রাগ টিকিয়ে রাখতে পারে না। রাগ তার মুখ থুবড়ে পড়ে শোকে, শোকে এবং ভয়ে, নাতির ঘুম ভাঙার ঝুঁকি সত্বেও মোবারকের উরুর ওপর একটা রোগা কালো হাত রেখে ফোঁপায়। 'হামার কি গুনা করেছিলাম গো, হামাগোর উপর গজব পনে কিসক? হামাগোর ব্যাটা অপঘাতত মরে কিসক গো?' মোবারক আলীও ভয় পায়। ছাদের ফুটো দিয়ে বাঁশের সিলিং ফুড়ে ঘরে আলো ঢুকছে। মোবারক জানালা খুলে দেয়, ভোরবেলায় দালানে সাদা আলোয় আকাশ, গাছপালা ও মাটি যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। ঝিরঝির বাতাস ঢুকে মশারি কাঁপায়। জোহরার ছেলেটা হাত পা ছড়িয়ে ঘুমায়, বাতাসের ঝাপ্টায় তার ঘুম গাঢ় হয়।

মোবারকের একটা ভয় হলো, তার বোধ হয় দেরি হয়ে গেলো। চেয়ারম্যানের বাড়িতে এর মধ্যেই মেলা লোক এসে পড়েছে। বাইরে আমতলায় হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসেছিলো কাবেজউদ্দিন। এদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক, বুড়ো হয়ে গেছে, দুটো চোখেই ছানি পড়তে শুরু করেছে, একটু কাছে না এলে লোক চিনতে তার কষ্ট হয়। মোবারক তার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, 'কাবেজ, চেয়ারম্যান সাহেব কৈ?'

'তাই না আপনাকে উটকাচ্ছিলো।'

চেয়ারম্যান তাকে খঁজুছিলো শুনে মোবারক আলী ঘাবড়ে যায়, তার আরো আগে আসা উচিত ছিলো। শুকনো গলা করে ফের জিগ্যেস করে, 'সমাচার কি?'

'ফজারের আগে, আন্ধার থাকতে মিলিটারি খবর দিয়া চেয়ারম্যানকে লিয়া গেছিলো। তাঁই ক'লো, মোবারক মিয়া থাকলে একসাথে গেলামনি।'

দ্যাখা হলে চেয়ারম্যান কিন্তু এসব কিছুই বলে না। মোবারক আলীকে জড়িয়ে ধরে লোকটা হঠাৎ বেগে কাঁদতে শুরু করে। তাকে নিয়ে মোবারক ভেতরের বারান্দায় এক কোণে কেটা জলচৌকিতে বসায়, নিজে পাশে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারম্যান আসে চোখ মোছে, সে আবার নিজের স্বভাবে ফেরার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে বলে, 'মোবারক মিয়া, সাজু তামাম রাত খালি বুলুর কথা বলছে। তার আটটা সাড়ে আটটার সময় প্রলাপ শুরু হলো, যতক্ষণ প্রাণ ছিলো 'খালি বুলুর কথা কয়!' যে জলচৌকিটাতে তারা বসেছিলো তার সঙ্গেই চেয়ারম্যানের শোবার ঘরের দরজা। সেই ঘর থেকে চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কান্নার শব্দ আসছিলো। স্বামীর কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিলাপে সে ছেলের শেষ কথাগুলো যোগ করে, 'খালি বুলু খালি বুলু! তামাম রাত খালি বুলুকে ডাকে, খালি বুলুকেই ডাকে। বুলুর সাথে চল্যা যামু,—বুলুক কও আমাক না লিয়া যেন যায় না বুলুক আটকাও, আমাক ছাড়া উই গেলো!'

মোবারক একবার চাঙা হয়ে ওঠে। শাজাহান বুলুর সঙ্গে কোথায় কোথায় যেতে চেয়েছিলো? চেয়ারম্যানের বৌ এবং এই বাড়ির পুরনো এক দাসী মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত শাজাহানের প্রলাপ উধৃত করতে শুরু করে। শাজাহান তার বাবা, মা, ভাই, বোন কারো কথা বলতে চায় নি। এক ঢোঁক পানিও খেতে চায় নি, কাউকে সে বাতাস

করতে বলেনি, কাউকে বলেনি মাথাটা একটু টিপে দাও। তার শুধু এক কথা বুলুকে ডাকো, বুলুর সঙ্গে আমিও যাবো। চেয়ারম্যানের বৌ জানায় যে এইসব শুনেই বুকের মধ্যে যে সঙ্কেত পেয়েছে, সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, তার শাজাহান বাঁচবে না।—স্ত্রীর এইসব বিলাপে চেয়ারম্যান উসখুস করে। পুত্রবিয়োগ তার বিবেচনাবোধ বিনাশ করতে পারে নি। সে জানে বৌডোবা খালের ব্রীজের ওপর মিলিটারি জীপ উড়িয়ে দেওয়ার পর বুলুর নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে মোবারক আলীর সর্বনাশ হবে। চেয়ারম্যান এই খবরটা মোটামুটি গোপন রেখেছিলো। কিন্তু বৌকে কোন কথাটা না বলে থাকা যায়? চেয়ারম্যান নিজেই মোবারক আলীকে কতোবার সাবধান করে দিয়েছে, এই খবর যেন কিছুতে জানাজানি না হয়। ঘরের দরজায় এখন মিলিটারি, খবরটা মিলিটারির কানে গেলে চেয়ারম্যানের মরা বাপ এসেও মোবারককে বাঁচাতে পারবে না। এখন বৌকে চেয়ারম্যান থামায় কি করে? কিন্তু মোবারক আলীর রক্তমাংসহাড্ডিমজ্জা সব তোলপাড় করে ওঠে? বুলুর সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য শাজাহান তাহলে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। শাজাহান তো সব জানতো, বুলুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য সে তবে ছটফট করেছিলো কেন? শাজাহান আর কি বলেছিলো?—কিন্তু সে সম্বন্ধে বিস্তৃত জানার উপায় নাই। কারণ চেয়ারম্যানের বৌয়ের বিলাপ এখন চাপা পড়েছে বুলুর মায়ের কান্নায়। এই বারান্দারই অন্য প্রান্তে তক্তপোষে শাজাহানের লাশ। লাশের মুখ খুলতেই বুলুর মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। সে যে কখন এসেছে মোবারক আলী লক্ষ্যও করেনি।

বুলুর মায়ের কান্না আওয়াজ ছাপিয়ে বাজে। এর ফলে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে যাদের কান্না নিস্তেজ হয়ে এসেছিলো তারা ফের নতুন করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু বুলুর মায়ের স্বরকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। মোবারক আলী তাড়াতাড়ি ঐদিকে চলে যায়। মা, বৌকে থামাবার কোনোরকম ইচ্ছা তার নাই। এখানে এসে সে যতো ইচ্ছা কেঁদে নিক। কাঁদার এরকম সুযোগ বুলুর মা কতোকালে পায়নি। আবার কবে পাবে তার ঠিক নেই। বুলুর মা কাঁদুক। মোবারক শুধু শাজাহানকে একবার ভালো করে দেখতে চায়।

মরার পর ও শাজাহানের ভুরু মাঝখানে ছোট্টো একটা ভাঁজ। সামনে দুটি দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে নিচের পাতলা ঠোঁট। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে বুলুর সঙ্গে বৌডোবা খালের ব্রীজে গ্রেনেড মারার সুযোগ না পাবার ক্ষোভে বোধহয় এখনও তার হাতে পায়ে দাঁতে ও ঠোঁটে বিঁধে রয়েছে। বুলুর সঙ্গে এর চেহারার কোনো মিল নাই,—বুলু শ্যামবর্ণের; এর গায়ের রঙ ফর্সা; বুলুর গাল ভাঙা, কয়েক দিনের জ্বরে মলিন হলেও শাজাহানের গালের ফোলা ফোলা ভাবটা রয়েই গেছে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দেওয়ায় বুলু হয়তো এরকম অসন্তুষ্ট মুখ করে মরেনি। কে জানে, শাজাহানের বুকে হয়তো গুলির দাগ দুটো একটা লেগে থাকতে পারে। গুলিটা তো বুলুর বুকেই বিঁধেছিলো। সাইকেলওলা ছেলেটি তো তাই বলে গেছে—সন্ধ্যার পর পরই সেদিন খুব চেপে বৃষ্টি আসে। এমনি অন্ধকার, তার ওপর দেওয়ালের মতো বৃষ্টি। ছেলেটার বাইরে যাওয়ার উপায় ছিলো না। সেই রাত্রেই তার চলে যাওয়ার কথা, বৃষ্টিতে আটকে না পড়লে হয়তো এতো কথা বলার সময় কোথায়? ছেলেটি এদিকে এসেছিলো ভবানীহাট গ্রামে, এখান থেকে মাইল দুয়েক পথ। কি কাজে আসে তা একবারো বললো না, খালি বলে ওদিকে ওদের লোক আছে। ফেরার সময় তার মনে হয় যে সুলতানদের গ্রাম তো এদিকেই, একবার ওর বাবার সঙ্গে দ্যাখা করা যাবে। সুলতান হলো বুলুর ভালো নাম, ওর কলেজে বুলু

এই নামেই পরিচিত। সাইকেলওলা ছেলেটি ওর এক ক্লাস ওপরে পড়ে, বগুড়া শহর মিলিটারিদের কব্জায় চলে গেলে ওরা একসঙ্গে পূর্বদিকের গ্রামে পালায়। ছেলেটি অনেকক্ষণ পর পর কথা বলছিলো, প্রথমদিকে খুব রেখেঢেকে, খুব সাবধানে। পরে আস্তে আস্তে সব বলে ফেলে। বুলুর মৃত্যুর সময় ওদের আরেক বন্ধুর সঙ্গে এই ছেলেটিও ছিলো। জায়গাটার নাম?—এখান থেকে পূর্বদিকে। এখান থেকে শেরপুর গিয়ে হাটের ওখানে করতোয়ার পার হয়ে যাওয়া যায়। ওসব জায়গা মোবারক আলী চেনে। তারপর? ধুনট বাজারে মিলিটারির ক্যাম্প বসেছে। ধুনট থেকে আরো অনেকটা পূর্বদিকে দেবডাঙা গ্রাম। দেবডাঙার মুক্তিবাহিনী তখন কেবল এসে জমা হচ্ছে। ঐ গ্রামের এক দালাল শালা ধুনটে গিয়ে খবরটা তাড়াতাড়ি বলে গেছে। এই খালের ওপর ছোটো পাতা ব্রীজ। ওরা তিনজন মাইন পুঁততে যায় ব্রীজের নিচে। মাইন পোঁতার কাজ শুরু করবে এমন সময় জিপের আওয়াজ। জিপ যে এতো তাড়াতাড়ি আসবে ওরা ভাবেনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই নেমে পড়ে রাস্তার ধারে। নিচু জমি, ঘন পাটখেতে মানুষ সমান পাট। পাটখেতে ঢুকে নিশ্বাস বন্ধ করে করে তিনজনেই জিপের অপেক্ষা করে। এই ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা খারাপ, ব্রীজ কোনোমতে পার হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দেবডাঙা। মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলো একটু তৈরি হবার সময়ও পাবে না। উঁচুনিচু রাস্তায় টলোমলো চাকার জীপ যখন ব্রীজের ওপর উঠেছে, বুলু করলো কি, পাটক্ষেত থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিলো জিপ লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ব্রীজ ডিঙিয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচে বৌড়োবার খালে তখন পাঁচ হাত পানি। ড্রাইভার সামলাতে না পারায় গাড়ি গড়িয়ে পড়ে ব্রিজের একটু আগে রাস্তার ঢালুতে, সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে ফের খালের মুখে আটকে গেলো। বুলু এবং সেই ছেলেটি তখন দৌড়ে যায় জীপের দিকে, রাস্তার অন্য ঢালে জীপ, সুতরাং রাস্তা ক্রস করা দরকার। ওদের এখন অস্ত্র চাই। স্টেনগান মেশিনগান তখনো ওরা চোখে দ্যাখে নি, এই থানা টানা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া থ্রি নট থ্রি, গাদাবন্দুক এবং দুদিন আগে পাওয়া কয়েকটা গ্রেনেড ওদের সম্বল। কিন্তু জীপ থেকে এর সেপাই যে আগেই লাফিয়ে পড়েছে তা বোঝা যায় নি। ওদের দুজনকে রাস্তায় উঠতে দেখে লোকটা গুলি ছোঁড়ে রাস্তার ঢাল থেকে। দুটো গুলি লাগে বুলুর বুকে। লোকটা তারপর সোজা ছুটতে থাকে ধুনটের দিকে। কিন্তু বুলুর সঙ্গীদের রাইফেলের গুলি সে এড়াতে পারে নি। তার পায়ে গুলি লাগে, কিন্তু বুলুর সঙ্গীদের রাইফেলের গুলি সে এড়াতে পারে নি। তার পায়ে গুলি লাগে, কিন্তু সে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। গাড়ির শব্দ আসে। ওদের দুজনকে ফের ঢুকতে হত পাটখেতের ভেতর। আহত জওয়ানটিকে হয়তো একটি গাড়ি ঠিক তুলে নিয়েছে। তবে গাড়িগুলো ব্রীজের এখানে এসে এক পলকের জন্যেও গতি কমায় নি। কিছুক্ষণ পর দেবডাঙার দিক থেকে পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণের শব্দ আসে, প্রায় মিনিট পনেরো ধরে ক্রস-ফায়ারিং চলে। এরপর দারুন নীরবতা। আরো কয়েক মিনিট পর সেদিকে আগুনের মস্ত শিখা চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সাংঘাতিক কোলাহল ও আর্তস্বর। গ্রামের লোকজনকে পালাতে হয় যমুনার দিকে, নয়তো মাঠে পার হয়ে এদিকে ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তা কেউ ব্যবহার করতে পারে নি, রাস্তার মুখে কড়া মিলিটারি। বুলুর সঙ্গী দুজন সারারাত এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত পাটখেতেই ছিলো। এর মধ্যে মিলিটারি জীপ বেশ কয়েকবার রাস্তা দিয়ে ধুনট-দেবডাঙা করে।

'বুলুর লাশ?'

ছেলেটি মাথা নিচু করে ছিলো।—না, না তাকে বিব্রত করতে চায় নি মোবারক এমনি জিগ্যেস করেছিলো। বুকে গুলি লেগেছিলো?—হ্যাঁ, দুটো গুলি। বুলু তখনো রাস্তায় সম্পূর্ণ ওঠে নি, রাস্তার অন্য ঢাল থেকে গুলি ছোঁড়া হয় বলে তারা কেউ সাবধান হতে পারে নি। বিপরীত ঢালে সে পড়ে যায়।—চিৎ হয়ে?—হ্যাঁ, চিৎ হয়ে। তার মাথা ছিলো নিচের দিকে, শরীরটা ওপরের দিকে খালের পানিতে মাথা ডুবে যায় নি?—চুলগুলো পানি ছুঁয়েছিলো। তারপর ছেলেটা ওর সম্পর্কে আর তেমন কিছু বলে নি। গুলি দুটো ঠিক কোথায় ঢোকে?—না সে কিছুই না বলে উঠে পড়ে। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে, অন্ধকার ও টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে সে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখে। এখন শাজাহানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকটা এক নজর দ্যাখার জন্য মোবারক আলীর চোখজোড়া নিসপিস করে।

সে নিজেও ঠিক জানে না কেন, হয়তো এই উদ্দেশ্যেই কিম্বা এমনি প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যের খাতিরে বা ওপরওলা চেয়ারম্যানের মন যোগাবার জন্য বা ছেলের সহপাঠীর প্রতি ভালোবাসা—যে কোনো কারণে মোবারক আলী এগিয়ে যায় উঠানে চাদরঘেরা জায়গায়। সেখানে তখন শাজাহানের লাশ ধোয়ানো হচ্ছে। কাবেজ খুব যত্ন করে সাবান মাখায় আর বিড়বিড়করে, 'ছোটো থাকতে বড়ো দীঘিত নিয়া কতো গোসল কর্যা দিব্বি কি দাপদাপি করিছে। এখন তাঁই একটা কথাও কচ্ছে না গো!'

নাঃ। শাজাহানের মৃতদেহে কোথাও গুলির চিহ্ন পর্যন্ত নাই। ব্যাপারটা মোবারক আলীর এতো স্পষ্ট করে মনে হয় নি। কিন্তু তার নিজের চোখ জোড়া বড্ডো পরিস্কার ঠেকে। বুলুকেও ভালোভাবে দ্যাখা যায়, শাজাহানকেও দ্যাখা যায়। বুলু এবং শাজাহান সম্পূর্ণ আদালা দু'জন যুবক। চোখের মাধ্যমে মাথার জট খুলতে থাকে এবং শাজাহানের শেষকৃত্যের দায়িত্ব এসে পড়ে প্রধানতঃ তার ওপরেই। চেয়ারম্যান তাকেই বলে যে একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার, ভোর হবার আগের স্কুল দালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। এতো চ্যাঁচামেচি কিসের? মিসক্রিয়েন্টরা কি তার বাড়ি এ্যাটাক করলো?—না, তার ছেলে মারা গেছে। তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারে, এই দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই যেন তার দাফন করা হয়। দরকার হলে তার ট্রুপ তাকে সাহায্য করবে, সাহায্য প্রস্তাব অনেক কষ্টে এড়ানো গেছে, এখন দেরি হলে আবার ট্রুপ যদি চলে আসে, বাড়িতে বৌ ঝিরা আছে। জুম্মাবারে জানজা হয়ে গেলো বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে। এদের পারিবারিক গোরস্থানটা বাড়ি থেকে একটু দুরে ৩০০/৩৫০ গজ পথ পার হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সামনে কয়েকজন সেপাই পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এতো লোক একসঙ্গে কোথায় যাচ্ছে?—চেয়ারম্যান ছিলো মোবারকের পাশে, মোবারকের ডান কাঁধে খাটিয়ার একটা কোণ। মোবারক গলা খাঁকরি দিয়ে বলে, লাশ হ্যায়, খান সাব। চেয়ারম্যান সাহেবের লড়কা।'

তাদের ক্যাম্পের সামনে গিয়ে এতোগুলো মানুষের একসঙ্গে যাওয়া নিষেধ। জুম্মাঘরের ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন মিনমিন করে, 'মুসলমান কা লাশ খান সাব। দাফন কা লিয়ে লে রহা। মেহেরবাণী করকে।' না সৈন্যরা কোনো ঝুঁকি নেবে না। মানুষ যদি মরে থাকে তো তাকে দাফন করতেই হবে। যেখানে ইচ্ছা দাফন করুক, এদিক দিয়ে শবযাত্রা যেতে দেওয়া যায় না। কানুন নাই। চেয়ারম্যান এবার নিজেই এগিয়ে আসে। ভয়, দ্বিধা ও সংকোচ

তার শোক প্রায় মুছে যায় যায়। বাঙলা উর্দু এবং ইংরেজি মিশিয়ে সে জানায় যে রাত্রি পোনে চারটায় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তাদের বাড়িতে কান্নাকাটির আওয়াজ পেয়ে স্কুলদালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে তলব করেছিলো। সব শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব আদেশ দিয়েছে যে যতো তাড়াতাড়ি পারে লাশ যেন দাফন করা হয়। তারই হুকুমে এরা এতো তাড়াতাড়ি এসেছে। এমন কি তাদের আত্মীয়স্বজন অনেকেই এখানে এসে পৌঁছে নি। মোবারক আলী তাড়াতাড়ি যোগ করে, 'উনার বেটিও আসতে পারে নি।' কিন্তু মেয়ের ব্যাপারটা জানাতে চেয়ারম্যানের সায় নাই। সে শুধু মিনতি করে যে তারা যদি মেহেরবাণী করে।—না অনুমতি দেওয়া যায় না। সৈন্যরা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিজেদের মধ্যে পা মেলাতে মেলাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের বারান্দায় গিয়ে উঠলো। শবযাত্রীরা কি করবে বুঝতে পারে না। ওদিকে সৈন্যদের দুজন বন্দুক তাগ করে রেখেছে এদের দিকে, এক পা বাড়ালেই সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। প্রায় ১০/১৫ মিনিট পর দুজন জওয়ান ফের এগিয়ে আসে, জিগ্যেস করে, 'লড়কা? জওয়ান লড়কা?' উমর কেতনা?' ইমাম কাম-মোয়াজ্জিন বলো, জী হাঁ হুজুর! আঠারো বয়স কা নওজোয়ান।' দুজন সৈন্যের একজন হাসে, অপরজন গম্ভীর মুখে যুবকের মৃত্যুর কারণ জানতে চায়। মোবারক শাহাজানের জ্বরের কথা বলে শেষ করতে না করতে সৈন্য ফের বলে, 'শালা মুক্তি থা? গোলি খাকে খত হুয়া' পেছন থেকে কাবেজউদ্দিন কি বোঝে সেই জানে, কেবল বিড়বিড় করে, তাহলে তো কামই হলোনি!' চেয়ারম্যানের ছোটো ভাই আস্তে করে তাকে ধমক দেয়, 'চুপ কর!' এবং একই সঙ্গে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সৈন্যের সন্দেহের প্রতিবাদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'নেহি হুজুর। বহুত আচ্ছা লড়কা থা।' সৈন্য দুজন তেতো হাসি ছোঁড়ে। চেয়ারম্যান একটু এগিয়ে ফের জানায় যে সকালবেলা ক্যাপ্টেন সাহেব নিজে তাকে অনুমতি দিয়েছে, এখন তারা যদি মেহেরবাণী করে তাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দ্যাখাটুকু করিয়ে দেয় তো বড়ো উপকার হতো। এবার দুজন সেপাই একসঙ্গে রাগ করে এবং দুজনের রাগ একজনের গলায় প্রকাশিত হয়ে দ্বিগুণ হয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন কি তাদের মতো জানোয়ার যে ইচ্ছা করলে আর দ্যাখা হয়ে গেলো? ক্যাপ্টেন কি তার বাবার চাকর যে এত্তেলা দিলেই চলে আসবে।

এদিকে লাশ কাঁধে করে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? কিছুক্ষণ পর পর শবযাত্রীরা খাটিয়ার নীচে ঘাড় বদল করে। হঠাৎ খুব গুমোট শুরু হওয়ায় সবাই ঘামতে শুরু করেছে, কেউ কেউ ভাবছে, এর চেয়ে রোদ ভালো। পাশের নিচু জমি থেকে পানি সরে যাচ্ছে, কিন্তু পচা ঘাসপাতা ও কাদার জমাট-বাধা গন্ধ বাতাসের এক একটি ঝাপটায় ভালোরকম জানান দিয়ে যায়। এর মধ্যে একজন সেপাই চেয়ারম্যানকে ডেকে নরম গলায় বলে যে এভাবে অপেক্ষা করে তাদের ফায়দা হবে না। যেখানে পারে তারা লাশ পুতে ফেলুক। চেয়ারম্যান রাজি হয় না। লোকটা তখন বিরক্ত হয়ে বলে, ঠিক আছে, তাহলে তার কিছু করার নাই। তবে এখানকার লোকদের তো হিন্দুদের সঙ্গেই আঁতাতটা বেশি এবং তারা একরকম হিন্দুই বলা চলে তখন ছেলের লাশ সে পুড়িয়ে ফেললেই পারে। সেনাবাহিনী দেশলাই সরবরাহ করতে প্রস্তুত।

চেয়ারম্যান কাঁদো কাঁদো মুখে শবযাত্রীদের কাছে আসে। কি করা যায়? শরৎকালের ফাজিল মেঘ থেকে এমন সময় ছর ছর করে বৃষ্টি শুরু হয়। চেয়ারম্যান বলে, 'চলো চলো বাড়ি চলো।' কিন্তু লাশ নিয়ে একবার বাড়ি থেকে বেরুলে আর ফেরা যায় না। সুতরাং মুশকিল হলো। ডানদিকে নিচু জমিতে কোন বড়ো গাছ নাই।

বাঁদিকের জমিও নিচু, তবে রাস্তার ঢালে একটা শ্যাওড়া গাছ। শ্যাওড়া গাছের নিচে তেমন আড়াল হবে না, তবে তার ওপর ঐ গাছে ভুতপেত্নীর আড্ডা, তারা আবার হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু আর কোনো উপায় না থাকায় ওখানেই খাটিয়া নামাতে হলো। চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই কোত্থেকে বাঁশের চাটাই এনে লাশের ওপর বিছিয়ে দেয়, কিন্তু তার আগেই শবযাত্রীদেরই কারো ছাতা নিয়ে লাশের শিয়রে তাই ধরে বসে পড়েছে কাবেজউদ্দীন। বৃষ্টি থেমে যায় এবং দেখতে দেখতে মেঘ ও গুমোট কেটে রোদ উঠলো। রোদও ভয়ানক চড়া। মোবারকের কানের কাছে মুখ নিয়ে কাবেজউদ্দিন বলে, 'শালা ওদের তেজ কি! ওদপানি সবই গেলো চ্যাংড়ার শরীলের ওপর দিয়া। কন তো গজব পড়িছে, কন তো বাপু!'

জ্যান্ত মানুষদের শরীরেও রোদপানির তেজ কম লাগে না। মোবারক আলীর পায়ের একজিমা টাটায়, সেখানে একটু চুলকে নিলে হতো। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেব তাকে একটু তফাতে নিয়ে ফিস ফিস করে নতুন প্রস্তাব দেয়। লাশ নিয়ে পেছনে হটে চেয়ারম্যানদের বাড়ির দক্ষিণে বড়োদীঘির উঁচু পাড় দিয়ে কিছুদূর হেঁটে তারপর নিচে জমির আল দিয়ে গোরস্তানে যাওয়া যায়। মোবারক একটু ভাবে। হ্যাঁ, তা যাওয়া যায় বটে, তবে জমিতে পা দেওয়ার দরকার কি? আল দিয়েই তো দিব্যি হাঁটা চলে। কিন্তু সদর রাস্তা ছেড়ে পেছন দিক দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার কথা চেয়ারম্যানকে বলা যায় কি করে?

মাথার ওপর রোদ গর্জায়। এবার আর ভ্যাপসা নয়, রোদের একটা শিখা শিকের মতো খুলিতে বেঁধে। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেব আর একজন শবযাত্রীকে ডেকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে বলে। মোবারক আলীর মুখে প্রস্তাবটা শুনে চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই মন্তব্য করে না। তবে তার সায় বোঝা যায়। জুম্মার নামাজের সময় হলে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেবকে চেয়ারম্যান তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু আজ কি করতে হবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে চেয়ারম্যান সুড়সুড় করে তার সঙ্গে চললো। এমন কি শবযাত্রীর প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সে ভুলে যায়, চেয়ারম্যানকে অনুসরণ করা মোবারক আলীর কর্তব্য।

জুম্মার ঘর একেবারে ভরে বারান্দায় পর্যন্ত মুসলিমদের ভীড়। গোলমাল শুরু হবার পর থেকে মানুষের নামাজ পড়া খুব বেড়ে গেছে। তার ওপর আজ জুম্মার নামাজ, জুম্মার নামাজের পর এখানে কতো কথাবার্তা হয়, কিন্তু আজ সবাই খুব চুপচাপ। মোবারক আলী নামাজে উপযুক্ত মনোনিবেশ করতে পারে না। নিরাকার আল্লার জায়গায় তার চোখ জুড়ে ঝাঁঝরা-বুক বুলুর চিৎ-হয়ে থাকা লাশ। বুলুর চুল ধুয়ে যাচ্ছে খালের পানি। তার শরীর বড়ো ক্লান্ত, দেখে মনে হয় সাংঘাতিক পরিশ্রম করে এসে ছেলেটা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো। ঘুমাক! নামাজের পর ছেলেটা ওর চোখ ছাড়া হয় না। তা থাক না! ওর জন্য মোবারক আলীর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্যাওড়াতলায় গিয়ে দ্যাখা যায় চেয়ারম্যানের ভাই আলিম আখন্দ মিলিটারির সঙ্গে কথা বলছে। শবযাত্রীর সংখ্যা খানিক কমে গেছে। যারা নামাজ পড়তে গিয়েছিলো তাদের অনেকেই বাড়ি গেছে খাওয়া-দাওয়া সারতে। আবার তারা নামাজ পড়তে গেলে এখানে থেকে কেউ কেউ কেটে পড়েছে। নাকি প্রথম থেকেই একটু একটু করে সরছে, মোবারক আলী হয়তো খেয়াল করে নি।

'না যাবার দিবার লয়।' লাশের মাথায় ছাতা ধরে বসে কাবেজ এখনো বিড় বিড় করেই চলেছে। এবার সবাই তার দিকে তাকায়। মানুষজন কমে যাওয়ায় কাবেজকে এমনিতেই চোখে পড়ছে। আপন মনে বিড় বিড়

করা তার এক মুহূর্তের জন্য থামে নি। চাবাভুষা না হলে তার ঠোঁট নাড়ানোকে কলেমাপাঠ বলে মনে হতো। একটু স্বর বাড়ায় কাবেজ, 'যি মিলিটারি হুকুম দিবি, তাই বলে কড়িতলাত গেছে। চ্যাড়াপ্যাংড়া কড়িতলায় থানা বলে খাম করিছে।'

'আস্তে।' চেয়ারম্যান তাকে ধমক দেয়, 'শালা বলদের বাচ্চা বলদ। চুপ কর।'

আলিম আখন্দ বলে যে ক্যাপ্টেন এখানে নাই। সকাল বেলাতেই তাকে যেতে সেখানে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। চেয়ারম্যানের ধমক খেয়ে কাবেজউদ্দিনের বিড়বিড় ধ্বনি ফের খাদে নেমে এসেছে। কাবেজ কি বলছে?—না, চেয়ারম্যান তখন যদি বুলুর সঙ্গে শাজাহানকে যেতে দেয় তো শাজাহানের এই পরিণতি হয় না। আজ সে ব্যস্ত থাকতো কড়িতলা থানা বিজয় অভিযানে। শাজাহান তখন সঙ্গে গেলে বুলু কি তাকে না নিয়ে কড়িতলায় আসে। বুলুর খবর তাহলে কাবেজ জানে না। মোবারক আলী তার বড়ো ছেলের খবরটা জানাবার জন্য ছটফট করে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দুই চারটাকে খতম করে বুলু কিভাবে মরলো—এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারলে তার জিভের সুড়সুড়িটা এখন সারে। তাই সবাই ফের যেরকম ব্যস্ত হয়ে উঠলো মোবারক আলীর এখন কথা বলার অবসর কৈ?

আবার ওঠো, খাটিয়া তোলো, ঘুরে দাঁড়াও, আখন্দ বাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে চলো গোরস্থানে। চেয়ারম্যানের বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড় পেরোবার সময় বাড়ির মেয়েদের কান্না নতুন করে চড়ে। তাদের শোককে পরিচর্যা করার সময় শবযাত্রীদের নাই। দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়েছে, তাড়াতাড়ি দাফন করা দরকার। মেয়েদের দিকে দেখতে দেখতে কাবেজউদ্দিন বিড় বিড় করা অব্যাহত রাখে, 'আম্মারা সব এখন কান্দিচ্ছেন? বুলুর সাথে তখন যাবার দিলেন না? তখন বার হয়া গেলে চ্যাড়টাকে এতো জুলুম সওয়া লাগে? বলতে বলতে শবযাত্রার সঙ্গে পা চালিয়ে কাবেজ বাঁশঝাড় পেরিয়ে উঠে পড়ে জোড়-পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর।

'পুকুরের পাড় আসলে একটা রাস্তার অংশ, এই রাস্তায় যেতে শবযাত্রীদের কোনো অসুবিধা হয় না। এমন কি সরু কাঁচা পথটি থেকে নিচে নামটাও স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়। জমিতে নামবার ঢালে পানি সরে গেছে, সেখানে শুকনা খটখটে, আশ্বিনের শুরুতেই লালমাটি শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে। নিচে জমিতে আমন ধান। ভালো করে দেখলে মনে হয় ধানের সবুজ শীষ বাতাসে ফুলে ওঠে, একবার বসে যায়। জমিতে এখনো ইঞ্চি দেড়েক পানি। ৮/১০ দিন আগে পানি ছিলো। আধ হাত, বর্ষা শেষ হয়ে গেলে সরতে সরতে এখন দেড় ইঞ্চিতে নেমেছে। কিন্তু এই দেড় ইঞ্চি পানি সরতে সরতে সপ্তাহের পুরোটাই লাগবে।

লাশের খাটিয়া যাদের ঘাড়ে তাদের একটি সারি যাচ্ছে জমির আলের ওপর দিয়ে, আরেকটি সারিকে হাঁটতে হয় ধানজমির ওপর, মোবারক আলীর কাঁধে খাটিয়ার ডান দিকের প্রথম কোণ। তার আগে আগে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেব। ঐ সারির শেষ কোণ আলিম আখন্দের ঘাড়ে। তার পেছনে চেয়ারম্যান। তারপর চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই। এদের পেছনে লম্বা সারিতে অন্য সবাই। আর ওদিকে পাশের পঙক্তিতে খাটিয়ার প্রথম কোণ বহন করছে কাবেজউদ্দিন। তার আগে আগে চলছে চেয়ারম্যানের সবচেয়ে বড়ো বর্গাচাষী বিটলুর বাপ ও তার ছেলে বিটলু, বিটলুর কোলে তার তিন বছর বয়সের ন্যাংটা শিশু। ঐ সারিতে খাটিয়ার পেছনের কোণ কাঁধে নিয়েছে গুণাহারের আয়জ আলী হেঁটে যায় আর আলীর ভাইপো, এই সারিতে সর্বশেষ ব্যক্তি হলো নিহত শকলু

পরামাণিকের ছেলে ওবায়েদ। এই সারিতে আর কেউ নাই। ধান জমিতে হাঁটা এখন রীতিমত একটি কঠিন কাজ। ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে খালি জায়গায় পা পড়লে ডুবে যায় কাদার মধ্যে। লালমাটির কাদা, এমনভাবে খামচে ধরে যে পা তুলতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এই সারির এরা মাঠে মাঠে কাজ করে বলে মাঠ ওদের বেশ পোষ্য, মাঠের নাড়িনক্ষত্র এদের মুখস্থ। ধানগাছের গোড়ার একটু উপড়ে এমন করে পা ফেলবে যে একটুখানি হেলে ধানগাছ অনেকটা পাপোষের কাজ করবে। কাদার কামড় থেকে একভাবে বাঁচতে হয়। আবার দেখতে হয় ধানগাছ যেন একেবারে চিরকালের মতো শুয়ে না পড়ে। অতো দ্যাখ্যাদেখির দরকার পড়ে না, তাদের পায়ে সঙ্গে মাঠ ও কাদার বোঝাপড়া ভালো, সহজে কেউ কাউকে ঘাটায় না।

সতর্ক পা ফেলতে হয় জমির আলের ওপর দিয়ে যারা চলছে তাদের—জমির আল মাত্রেই দিন দিন রোগা হয়ে আসছে, এর ওপর এতোদিন বর্ষার পানির নিচে থাকায় কোথাও কোথাও ক্ষয় হয়েছে। আলের ওপর তাই হাঁটতে হয় পা টিপে। আলিম আখন্দ মাঝে মাঝে উপদেশ দিচ্ছে, 'সাবোধান, খুব সাবোধান! দেখাশুনা কদম ফালাও। কাদার মধ্য পড়লে বিপদ হবি।' সবাইকে সাবধান করার দায়িত্ব পালনে মগ্ন হয়ে লোকটা নিজের বাত-চুম্বিত চরণযুগলের প্রতি অবহেলা করে। কয়েক গজ মাত্র চলার পর সাবধান বাণী সম্পূর্ণ নিঃসৃত হবার আগেই তার মোটসোটা ডান পা আল থেকে পড়ে যায় নিচে। খাটিয়ার ওপর শাজাহানের লাশ অনেকটা ডানদিকে গড়ায়। মোবারক আলীর বুকে ধড়াস করে আওয়াজ উঠে; লাশ কাদার মধ্যে পড়ে গেলো। তবে আলিম আখন্দের পায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের মতো সে-ও খাটিয়ার কোণ এবং পা দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলে। এইভাবে শাজাহানকে পতন থেকে উধ্বার করা হয়। আলিম আখন্দের পা পড়েছিলো একটি ধান গাছের গোড়ায়, তাই রক্ষা। তবু বেচারার পায়ের পাতায় শামুকের খোলা লেগেছে, একটু রক্তও বোধহয় বেরিয়েছে। কিন্তু খাটিয়া বহনের কাজ থেকে তাকে রেহাই দেওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়। কারণ জমির আলের সারির কারো পক্ষে কাউকে পেরিয়ে যাওয়া কঠিন, এরকম যেতে হলে তাকে আল থেকে নেমে কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে। যাক আলিম আখন্দ সামলে নিয়েছে, অন্যদের সাবধান করার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে সে, এখন সতর্ক পায়ে হাঁটছে। জমিতে খসখস শব্দ। মাঝে মাঝে পানির ওপরে পা পড়লে পানি ও ধানগাছের মিলিত আওয়াজ। আর আলের ওপর দিয়ে যারা চলছে তাদের পায়ের নিচে শব্দ একঘেয়ে। তবে এই সারির পুরোভাগে, ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেব অবিরাম কলেমা পড়ে চলেছে, ফলে আলের ওপরেও বৈচিত্র্য আছে বৈ কি! মোবারক আলীর ভয় হয় যে কলেমা-পাঠে ইমাম সাহেবের অখণ্ড মনোযোগ নিজের কদমের প্রতি তাকে অসতর্ক না করে। এই ভয় ভালো করে দানা বাঁধতে না বাঁধতে ঘাড়ের ওপর খাটিয়া কেঁপে ওঠে, মোবারক আলীর কাঁধ থেকে খাটিয়ার কোণ বলতে গেলে একটু সরেও যায় এবং সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁর বন্ধ চোখের ভেতরটা পর্দার মতো কাঁপে এবং মোবারক আলী দ্যাখে যে শাজাহানের লাশ ধানখেতের কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তে থাকে বুলুর মুখ। কোথায় কোন বৌডোবা খালের ধারে বুলুর লাশ পানিতে ভেজে। না বুলু ছিলো চিৎ হয়ে। তার বন্ধ চোখের মণি তাক করা ছিলো আকাশের দিকে। মিলিটারি জীপ উল্টিয়ে দিয়ে, দুই চারটা মিলিটারিকে খতম করে বুলুর তখন যা তেজ তাতে চোখের পাতাটাতা ভেদ করে সে সব দেখতে পাচ্ছিলো—এই দৃশ্যটি মোবারক আলী আগেই দ্যাখে এবং দেখতে দেখতে তার বাম পা হড়কে পড়ে যায় জমির কাদায়। আবার এও হতে পারে যে তার পা নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাজাহানের লাশের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং এই দৃশ্যটি দেখতে থাকে।

কাদা থেকে পা তুলতে মোবারক আলীকে একটু বেগ পেতে হয়। তার একজিমায় কাদাপানি লাগায় জায়গাটা বড়ো চুলকাচ্ছে। এখন সেখানে আর হাত লাগায় কি করে? কিন্তু চোখের পাতা ভেদ করে তাকানো বুলুর তেজি চোখজোড়া ঝেড়ে ফেলা দরকার, নইলে ফের পা হড়কাবার সম্ভাবনা আছে। আবার ওদিকে একজিমার যন্ত্রণা। সেটাও ভোলা দরকার। অস্থির হয়ে মোবারক, একটু জোরে পা চালাবার চেষ্টা করতেই কাবেজ ও আলিম আখন্দ একসঙ্গে চিৎকার করে, 'আস্তে আস্তে।' এবার মোবারকের পদস্খলন ঘটে না বটে, কিন্তু সে ধাক্কা খায় ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেবের পিঠে। সামনে জমির আল হঠাৎ খুব সরু হয়ে গেছে, ইমাম সাহেব সেজন্য প্রস্তুত ছিলো, কিন্তু মোবারকের ধাক্কার সময় প্রস্তুতি ভণ্ডুল হয়ে গেলো, আলের দুপাশে কাদায় তার পা গেঁথে যাওয়া লোকটির গতি একেবারে রুদ্ধ হয়। মনে হয় সাদা কাপড় জড়ানো ১ জোড়া খুঁটি পুঁতে তাকে স্থাপন করা হয়েছে। এখন কেবল তার মুণ্ডুতে-চাঁদ-তারা খচিত নিশান কোনোভাবে একটা ফিট করে দিলেই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেম সাহেব পত পত আওয়াজে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করবে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বমির মতো তোড়ে বেরিয়ে আসে, 'শালা জালেমের বাচ্চারা!'

বিটলুর বাপ এদিকে এসে আলের উপর বসে ইমাম সাহেবের চরণ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। এই জায়গায় কাদা বড় থকথকে। এক পা তুলতে গেলে শরীরে ভার পড়ে অন্য পায়ে এবং দ্বিতীয় পাটি কাদায় অনেক বেশি করে গেঁথে যায়। তার পেছনে লাশ ঘাড়ে নিয়ে এতোগুলো মানুষ অধীর আগ্রহের সঙ্গে বিটলুর বাপের প্রচেষ্টায় অগ্রগতি লক্ষ্য করে। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেম সকলের লক্ষ্যবস্তু হয়ে বিব্রত হয়। দিনে ৫ বার তাকে অবশ্য সকলের সামনে দাঁড়াতে হয়, তবে সে হলো দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ব্যাপার। আর সেখানে তার নিজের কিছুই করার নেই, মুসল্লিরা কাতার বেঁধে দাঁড়ালেই সে চাপ অনুভব করে এবং পেছনের ইঞ্জিনের ঠেলায় চলন্ত গাড়ির মতো একটির পর একটি সুরা আবৃত্তি করে চলে। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তা নয়। এখানে তার উপর দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো চাপ নাই, সারির সামনে থাকার ফলে সে অচল হয়ে পড়ায় সকলের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব তাই এই কাণ্ডটির উৎস জানাবার জন্য চিৎকার করে, 'কি জুলুম। মুসলমানদের মুর্দা দাফন পর্যন্ত করবার দিবার চায় না, এ্যাঁ! কাফেরের অধম!'

'কন তো, ইমাম সাহেব, আমার ব্যাটার সাথে অরা ইটা কি করিচ্ছে, কন তো!' চেয়ারম্যানের হঠাৎ বিলাপে সবাই ফিরে তার দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো গলা করে চেয়ারম্যান জানতে চায় তার নিরীহ নিষ্পাপ ছেলেটার ওপর এরকম গজব নামে কেন? এ ছেলেটি লেখাপড়ার বাইরে কিছুই জানে না, কোথাও কোনো ঝগড়া-ঝাটি দেখলেও সে সরে এসেছে। তার উপর এরকম জুলুম কেন? এর জবাব তো ইমাম সাহেবের জানা নাই, তবে চেয়ারম্যানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাকে সে জোর সমর্থন জানায়, 'আর ক্যাম্পের সামনে দিয়া মুর্দা লিবার দিবি না। মুর্দা কি হাতিয়ার লুকায়া নিবি? কাফনের মধ্যে বন্দুক রাখা যায়?

'তা'লে তো কামই হলোনি গো হুজুর!' জমির ওপর থেকে খাটিয়া কাঁধে জবাব দেয় কাবেজউদ্দিন, তার বিড়বিড় এতোক্ষণ ফের বাক্য হয়ে দাঁড়ায়, বন্দুক কি কচ্ছেন হুজুর হাতত পাল্টি দেখলে গোয়ার কাপড় তুল্যা দৌড় পারে—।

'কাবেজ, প্যাচাল পাড়িস না! শালার মুখ বন্ধ হয় না!' চেয়ারম্যানের ধমকে কাবেজ চুপ করে। কিন্তু ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেমের চরণ উদ্ধারের পর সবাই চলতে শুরু করলে তার বিড়বিড় ফের শুরু হয়। কলমা-পায়ের মতো

বুলুর সঙ্গে শাজাহান তখন যদি চলে যায় তাহলে আজ তার এই পরিণতি ঘটে? মোবারক অস্থির হয়, বুলুর কথাটা কাবেজকে জানানো দরকার। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে বুলু মারা গেছে। মৃত্যুর আগে সে একটা মিলিটারি জীপ এবং দুই চারটা মিলিটারিকে। বুলুর বুকে গুলি লাগবার পর সে পড়ে যায় বৌডোবা খালের ধারে। বৌডোবা খাল কোথায়?—পুবে, যমুনা থেকে অল্প পশ্চিমে। বর্ষার ফলে বুলুর লাশ ঠিক যমুনায় চলে গেছে। যমুনার স্রোতের কথা কাবেজ তো জানেন না, যমুনার একেকটা খোঁচায় গ্রাম, ঘর, বাড়ি, দালান-কোঠা এমন কি ইউনিয়ন কাউন্সিল, হাইস্কুল দালানের চেয়েও বড়ো বড়ো অট্টালিকা টুপ করে ধ্বসে পড়ে। চিহ্নমাত্র থাকে না। সেই স্রোতের ওপর সওয়ার হয়ে তার বুলু পৌঁছে গেছে কোথায়? পদ্মায় নিশ্চয়ই। পদ্মা গিয়ে মেশে কোথায়?—মেঘনা নদীর সঙ্গে?—তারপর?—তারপর?—তারপর মোবারক আলী অতো জানে না। নদী-উপনদীর পানি তার কালে কলকল করে উপচে পড়ে, এই বিপুল জলধারায় তার ঢ্যাঙা রোগা কালো ছেলেটার ঝাঁঝরা বুক ভরে গিয়েছে। মোবারক নিজের বুক ভরে একটা নিশ্বাস নেয়। এর বেশি ভাববার ক্ষমতা মোবারকের নাই। সময়ও হয় না। তাদের দেখে গোরস্থানের একটা শেয়াল সরে গেলো ঝোপের আড়ালে।

কবর দিয়ে ফেরার সময় চেয়ারম্যানের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসলো। চেয়ারম্যানের বাড়ির বাইরে দ্যাখা হয় কাবেজউদ্দিনের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বুলুর গল্প করলো। রাস্তায় বেরিয়ে দ্যাখে বিটলুর বাপ তাড়াতাড়ি করে বাড়ি যাচ্ছে। তাকে থামিয়ে মোবারক গল্প শুরু করে। বিটলুর বাপ উসখুস করে, 'ঘাটত মিলিটারি আছে ভাইজান আত হয়ে যাচ্ছে।

'আরে থোও। হামার বুলু এ্যাকো হাতের বাড়িত মিলিটারির দুইচারখানা গাড়ি খাম কর্যা নিছে। শোন। বিটলুর বাপকে বুলুর গল্প শেষ পর্যন্ত শুনতে হয়। এমনকি জুম্মাঘরের বারান্দায় বসে অজু করছিলো ইমাম-কাম-মোয়াজেন সাহেব। মোবারক আলী বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে বুলুর মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ দিলো।

ওদিকে বুলুর মা দাঁড়িয়েছিলো দরজার কপাট ধরে। গ্রামে মিলিটারি ক্যাম্প হবার পর মোবারক সন্ধ্যার আগেই ফেরে, মগরেবের নামাজ সে আজকাল ঘরেই পড়ে। আর এখন এশার আজান পর্যন্ত হয়ে গেলো। তাকে জলচৌকির ওপর গামছা ও বারান্দায় বদনা-ভরা পানি দিয়ে বুলুর মা বলে, 'দেরি হলে খবর পাঠাবার পারো না?' একটা মানুষ পাই না যে তোমার খবর পুস করি।'

তার জন্য স্ত্রীর এই দুশ্চিন্তা দেখে মোবারক আলী বিরক্ত হয়। এমন কি খাবার রুচিও হয় না। যার ছেলে মারা গেছে মাত্র মাস দেড়েকও হয় নি, সেই মায়ের অন্য কারণে উদ্বেগ হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এতো কষ্টের মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?

৯.১ লেখক পরিচিতি

৯.১ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস :

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪২ সালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বগুড়ায়। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ অনার্স ও একই বিষয়ে ১৯৬৪-তে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাহিত্য

কৃতির জন্য ১৯৮২-তে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৯৬-তে আনন্দবাজার পুরস্কার লাভ করেন। সমকালীন বাংলা উপন্যাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অত্যন্ত খ্যাতিমান ও বহুল আলোচিত নাম। বাংলাদেশে তো বটেই, এমনকি পশ্চিমবাংলায়ও তাঁর গল্প উপন্যাস বহু পাঠত ও সমাদৃত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল :

গল্প

১। অন্যঘরে অন্যস্বর

২। খোঁয়ারি

৩। দুধেভাতে-উৎপাত

৪। দোজখের ওম

উপন্যাস

১। চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়ার নামা।

৯.২ গল্পের আলোচনা : অপঘাত

মুক্তিযুধকে কেন্দ্র করে লেখা অপঘাত একটি অসাধারণ গল্প। গল্পের শুরুই হয়েছে মোবারক আলীর ছেলে বুলুর মৃত্যু দিয়ে। স্ত্রীর ডুকরে ওঠার শব্দে ঘুম ভাঙে মোবারক আলীর। সে ভাবে, বুলুর মায়ের কি এতটুকু বুধি নেই! ১৫০ গজও হবে না মিলিটারির ক্যাম্প অবস্থিত। এই অবস্থায় সে বিলাপ করছে? এক্ষুনি যদি সেপাই এসে জানতে চায় তার কান্নার কারণ কি? তখন কি জবাব দেবে মোবারক? 'যদি বলে তোমার ছেলেমেয়ে কী? কি জবাব দেবে সে? আসলে মোবারক আলী পাকিস্তান গভর্নমেন্টের চাকরি করে, তার বেতন আসে খোদ বগুড়া ট্রেজারি থেকে। এই অবস্থায় মিলিটারীরা যদি জানতে পারে তার ছেলে 'মিসক্রিয়ান্ট' ছিল তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। পাশের ঘর থেকে তার নাতিটা কেঁদে ওঠে, মোবারকের চিন্তার জালটা ছিঁড়ে যায়। সে বুঝতে পারে একটানা বিলাপের উৎসটা তার নিজের বাড়ি নয়, আওয়াজ আসছে দক্ষিণ দিক থেকে, হঠাৎ মোবারকের খেয়াল হয়, 'চেয়ারম্যানের ছেলেটা তাহলে মারা গেলো।'

বিকেলবেলা মোবারক চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়েছিলো, তখন শাজাহান একটু ভালো ছিল। তারা ভেবেছিলো একটু ভালো থাকলে তাকে নিয়ে বগুড়া যাবে। হোমিওপ্যাথিক মনসুর সরকারকে দেখাচ্ছিলো। তিনি টাইফয়েডের চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু দশ বারো দিনেই সব শেষ হয়ে গেল। এতক্ষণ সে শাজাহানের মা ও ঠাকুমার কান্নাকে তার স্ত্রীর কান্না বলে ভুল করেছিলো। এতক্ষণে তার ভুল ভেঙেছে। বিছানা থেকে নেমে মোবারক স্ত্রীর বিছানার দিকে এগোয়। তার পা লেগে হ্যারিকেনটা পড়ে গেলে মনে পড়ে যায় আজ কদিন হলো স্ত্রী নাতিকে নিয়ে বুলুর ঘরে শুচ্ছে। মোবারক আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। স্ত্রী বুঝতে পেরে সাবধান করতে থাকে। কিন্তু মোবারকের কাছে এ ঘরের ভুগোলটা যথেষ্ট পরিচিত। বুলু মারা যাওয়া থেকে প্রতিদিন রাতে মোবারক একবার করে এ ঘরে আসে। বুলু এঘরেই থাকত। মোবারক স্বাভাবিক গলায় শাজাহানের মৃত্যুর কথা বলে।

ফাঁপাতে শুরু করে। মোবারক বুঝতে পারে, বুলুর মা অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদছে। সে স্ত্রীকে
বলে 'আস্তে। আস্তে কান্দো। বিপদ বোঝো না?'

রতে গিয়ে বুলুর মা আরো জোরে কেঁদে ওঠে। মোবারকের ভয় হয়, পাছে কান্নার শব্দ শুনে
পাই এসে হাজির হয়। তখন তার পুত্র শোকের সে কি ব্যাখ্যা দেবে? কোনরকমে যদি টের পেয়ে
হলে তাকে তারা ধরে নিয়ে যাবে স্কুলের দালানে, হেডমাস্টারের ঘরে। এই ঘরেই এখন টর্চার সেল করছে
একথা মনে করে মোবারক আলীর মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। হয়ত তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে,
উ করে জ্বলবে চারিদিক। মাথা গরম হয়ে যায় মোবারকের। সে চিৎকার করে বকে স্ত্রীকে। বুলুর মা
র যায়। শাজাহানের জন্য দুঃখ করে মোবারক। বুলুর ক্লাসমেট ছিলো। তবে স্কুল জীবনে তেমন ঘনিষ্ঠ
ল না। শাজাহান ছাত্র ভালো, বুলু সাধারণ ছাত্র। এস.এস.সি'র পরে শাজাহান ঢাকায় ভর্তি হল, আর বুলু
এই সময় থেকেই দুজনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল। মোবারক বুলুর কথা ভুলতে শাজাহানের কণ্ঠস্বর মনে
ন্যদিকে বুলুর মা পিছন ফিরে একা একাই ছেলের জন্য অশ্রুপাত করে। মেয়েমানুষের দৌড় মোবারক
জানা আছে।' একটু পরেই স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরে বলবে কেন তাকে ধরে রাখতে পারো নি, ছেলে
ীতে যোগ দিয়ে কি করতে পারলো..... ইত্যাদি। মিলিটারী যখন আসে 'কলেরার মত আসে, ম্যালেরিয়ার
; গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে চলে যায়। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবার মালিয়ান ভাষায়
ীর ছেলেরা আশ্রয় নিয়েছিলো। একথা জানতে পেরে মিলিটারীরা এসে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল।
য়, সরকার বাড়ির ল্যাঙড়া জমির আলীর এক মেয়ে ও ভাইঝিকে তারা তুলে নিয়ে গেল। মেয়েরা
াহিনীর ইনফরমার। চেয়ারম্যান মানুষটি ভালো। তাই সে মোবারক কে বলে 'মোবারক মিয়া, ডাঙর
 বাড়িতে না রাখাই ভালো গো।' মোবারক কেন প্রশ্ন করাতে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'বোঝেন
ন কাউন্সিলের মধ্যে মিলিটারী ক্যাম্প করলো, একরকম ঘরের মধ্যেই ঢুকলো, না কি কন? চেয়ারম্যানের
বারক তার ছোটো মেয়েটিকে তার সম্বন্ধীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। চেয়ারম্যানও তার মেজো মেয়েকে
 মোবারক আলীর সম্বন্ধী খুব নামকরা মওলানা। সবাই তাকে চেনে। কুদ্দুস মওলানা মানুষ ভালো।
 সে ছুটে এসেছে বোন-ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করতে। তার এমন উপযুক্ত ভাগ্নে, তাকে বিনা গুলি
 হয়। মোবারক জানায়, এখানে এসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো, 'মিলিটারি খবর পেলে নির্বংশ
' তাই মওলানা সাহেব ঠিক করে বাড়ি গিয়ে সে বুলুর নামে কোরান পাঠ করাবে। এক কথায়
র ভাগ্নীকেও সঙ্গে নিলো, সঙ্গে নিতে চেয়েছিলো জোহরার দেড়বছরের ছেলেকেও। কিন্তু জোহরা
ায় তার কথা ভেবে বুলুর মা নাতিকে দিলো না।

মোবারক চেয়ারম্যানের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল। বুলুর মা আবার কাঁদতে শুরু করল। মোবারক
বুলুর মা বলে চলে 'দ্যাখো তো চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাই মরলো মায়ের সামনে, বাপের
তা তার ব্যাটাক মান ভর্যা দেখ্যা লিবার পারলো। আর হামার বুলু কেটে কার গুলি খাইয়া মুখ
লো গো, আমার বুলুর উপরে গজব পড়ে কিসে গো?' একথার জবাব মোবারক কি দেবে ভেবে
এই প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচতে সে বাইরে বেরতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফর্সা হতে তখনও বাকি

ছিলো, অন্ধকারে বেরলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। দিন কয়েক আগে সরকার বাড়ির বর্গাদার চাষা রাত্রে বড়
বাইরে করতে বসে ছিলো, পেটে গুলি লেগে মরে গেলো। হাইস্কুলের দপ্তরি নজীবুল্লা সের পাঁচেক মরিচ বেলকুচিতে
গিয়েছিল বিক্রি করতে। রাতে মিলিটারী ক্যাম্পের সামনে দিয়ে ফিরছিল পড়িমরি করে ছুটতে ছুটতে। সে সময়
তাকে থামতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ভয়ে সে না থামায় পিঠে গুলি খেয়ে মরতে হলো। এছাড়াও আরও কত
লোককে যে মারা হল, তার কোন হিসেব নেই। আমিনুদ্দিন সরকারের ভাইপো তারক, লাঠিভাঙ্গার আয়নুল,
হাশেম মন্ডল; হাইস্কুলের অঙ্কের স্যার নূর মোহম্মদ—এদের মারা হয়েছে লাইনে দাঁড় করিয়ে। স্কুল দালানের
পেছনে, যেখানে ছোট ছেলেরা হাডুডু খেলে সেখানে এদের পুঁতে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরো আছে।
লেখক লিখেছেন—'বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ'—সর্বত্র শুধু মৃতদেহের ছড়াছড়ি।
আমেনাবিবির দেওরের ছেলে আই.কমের ছাত্র আলী আকবরকে গুলি করে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। আলী
বংশের একমাত্র ছেলে। তাকে তারা অনেক কষ্ট দিয়ে মেরেছে। কিন্তু বুলুকে ওরা কষ্ট দিতে পারে নি। বুলু
কত লম্বা হয়েছিল, মোবারককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেই দিব্য ভালো ছেলেটা একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।
তারপর চারমাস পর খবর এলো সে মারা গেছে। খবরটা যখন মোবারক পেয়েছিল তখন সে প্রথমে ভেবেছিল
স্ত্রীকে জানাবে না। কিন্তু এখবর কি আর চাপা থাকে। মোবারকের পেটে একটা চিনচিনে ব্যথা দেখা দিয়েছিল,
বুলুর মৃত্যুর খবরের পর সেই ব্যাথাটাও আজ মাস তিনেক হল আর নেই। তাহলে কি বুলু পেটে গুলি খেয়ে
মারা গেছে? মোবারক নিজের পেটে হাত বোলায়, আর ভাবে বুলু তার পেটের ব্যথা চিরকালের জন্য নিয়ে
চলে গেছে। পরক্ষণেই মনে পড়ে সাইকেলওলা যে ছেলেটি বুলুর মৃত্যুর খবর দিতে এসেছিল সে তার পেটে
গুলি লাগার কথা কিন্তু বলে নি। না বললেও কিছু যায় আসে না, যায় আসে যাতে তা হল বুলুকে একবার
চোখের দ্যাখাটাও তারা দেখতে পায় নি। বুলুর মা তাই কেঁদে আকুল হয় আর বলে 'তুমি যায়া তার কবর
জিয়ারত কর‍্যা আসলা না কিসক? অপঘাতত মরছে, তো তাই কি তোমার ব্যাটা লয়?'

অতঃপর সকাল হয়, মোবারক চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে এগোয়। চেয়ারম্যানের বাড়িতে হাজির হলে তিনি
একটা জলচৌকিতে মোবারককে বসতে দেন, এবং চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, 'সাজু তামাম রাত খালি
বুলুর কথা বলছে।' শাজাহানের মৃতদেহ দেখে বুলুর মা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মারা যাবার পরেও শাজাহানের
কপালে একটা ভাঁজ ছিলো, সামনের দুটো দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরা ছিল। বৌডোবা খালের ব্রিজে
মিলিটারির গাড়িতে গ্রেনেড না মারতে পারার ক্ষোভ বোধহয় তার ছিল। তারই আভাস আছে তার মুখে। অবশ্য
বুলুর মুখে এধরনের কোন অসন্তুষ্টির ছাপ ছিলো না। সাইকেলওলা ছেলেটি তো এমন কথাই বলে গেছিলো।
বৃষ্টিতে আটকে না পড়লে হয়ত এসব জানাই যেত না। ছেলেটি কলেজে বুলুর থেকে এক ক্লাস ওপরে পড়ত।
সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিল বুলুর মৃত্যুর। যমুনা থেকে সোয়া দেড় মাইল দূরে বৌডোবা খাল। ধুনট বাজারে
মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে। ধুনট থেকে অনেকটা পুব দিকে গেলে দেবডাঙ্গা গ্রাম। এখানে এসে মুক্তিবাহিনীর দল
জমা হয়েছে। কিন্তু এই খবরটা মিলিটারি ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছে দেয় গ্রামের এক দালাল। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাও
খবর পায় যে তাদের সন্ধানে মিলিটারির জিপ এদিকে আসছে। ফলে কাছাকাছি বৌডোবা খালের ওপরে যে
ছোট ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজের নিচে বুলু ও তার দুই বন্ধু মিলে মাইন পোঁতার কাজ শুরু করতে যায়। এমন

সময় জীপের আওয়াজ ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই নেমে পড়ে রাস্তার ধারে, পাটক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তারা। জীপটা ব্রিজে উঠতেই বুলু পাটক্ষেত থেকে হঠাৎ গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল। তার অব্যর্থ লক্ষ্যে অফিসার সঙ্গে সঙ্গে নিচে পড়ে যায়, ড্রাইভার সামলাতে না পারায় গাড়ি সমেত সেও গড়িয়ে পড়ে ব্রিজের নিচে। বুলু এবং তার বন্ধু দৌড়ে জীপের দিকে যায়, রাস্তা ক্রস করার উদ্দেশ্যে। ওদের তখন অস্ত্র চাই, মাত্র কয়েকটা গ্রেনেড ও থানা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া থ্রি নট থ্রি ও গাদা বন্দুক ছাড়া তাদের অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তারা খেয়াল করেনি যে, একজন সেপাই জীপ থেকে আগেই লাফিয়ে পড়েছিল। বুলুদের ছুটতে দেখে সে রাস্তার ওপর উঠে গুলি ছুঁড়তে থাকে তাদের লক্ষ্য করে। বুলুর পায়ে গুলি লাগে, তারা পাটক্ষেতের দিকে দৌড়ে যায়। সেই সময় আবার মিলিটারি গাড়ির শব্দ শোনা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে ক্রস ফায়ারিং। তারপর অসীম নীরবতা। মিলিটারি চারিদিকে ঘিরে ফেলে। বুলুর বন্ধু দুজন সারা রাত পাটক্ষেতেই ছিল। বুলুর বুকে দুটো গুলি লেগেছিল।

শাজাহানের শরীরে কোথাও গুলির দাগ ছিল না। মোবারকের ওপর দায়িত্ব পড়ে শাজাহানের শেষ কৃত্যের। তাদের গোরস্থানটা বাড়ি থেকে ৩০০/৩৫০ গজ দূরে। শাজাহানকে নিয়ে গোরস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে কয়েকজন সেপাই তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। লাশ আছে বলাতেও তারা পথ ছাড়ে না। চেয়ারম্যান এগিয়ে আসে। উর্দু ও ইংরাজি মিশিয়ে সে জানায় রাত পৌনে চারটেয় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ক্যাপ্টেন সাহেব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাশ দাফন করতে বলেছেন। এরপর দুজন জওয়ান এগিয়ে আসে, বলে 'লড়কা? জওয়ান লড়কা?...শালা মুক্তি থা? গোলি খাকে খতম হুয়া।' ইমাম সৈন্যদের সন্দেহের প্রতিবাদ স্বরূপ বলতে থাকে 'নেই হুজুর। বহুত আচ্ছা লড়কা থা।' কিন্তু সৈন্যরা বিশ্বাস করে না তার কথা, হাসতে থাকে। চেয়ারম্যান পুনরায় এগিয়ে এসে জানায় সকালে ক্যাপ্টেন সাহেব লাশ দাফন করতে বলেছিলেন। কাবেজ লাশের মাথায় ছাতা ধরে বিড়বিড় করে চলেছে। ক্রমে শবযাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কাবেজউদ্দীন বিড়বিড় করে বলে চলেছে, সেদিন যদি তারা শাজাহানকে বুলুর সঙ্গে যেতে দিত। তাহলে আজ তার এ অবস্থা হত না। তারা ওঠে, খাটিয়া তুলে আখন্দ বাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে যায় গোরস্থানে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি দাফন করা দরকার। লাশ নিয়ে একদল চলেছে জমির আলের ওপর দিয়ে, আরেকটি দল চলেছে ধানজমির ওপর দিয়ে। পেছনে চেয়ারম্যান সাহেব। ধানজমিতে হাঁটা ভীষণ বিপদের। গাছ বাঁচাতে বাঁচাতে চলতে হয়, কাদার কামড় থেকে বাঁচতে হয়। আলিম আখন্দ মাঝে মাঝে 'সাবধান' করে দিচ্ছে। জমিতে খসখস শব্দ উঠছে। আর মোবারক আলির চোখের সামনে ভেসে উঠছে বুলুর ছোঁড়া বোমায় মিলিটারী জীপ উল্টে যাচ্ছে, দু'চারটে মিলিটারি ধরাশায়ী হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মোবারকের পা পিছলে যাচ্ছে। হঠাৎ চেয়ারম্যান কাঁদো কাঁদো গলায় বলে ওঠেন 'কন তো ইমাম সাহেব, আমার ব্যাটার সাথে অরা ইটা কি করিছে, কন তো।' একথায় জবাব ইমাম সাহেব কি দেবেন? এরা যখন এইসব কথা বলাবলি করছে তখন মোবারক আপন মনে ভেবে চলেছে বুলুর বুকে গুলি লাগার পরে সে বৌডোবা খালের ধারে পড়ে যায়। এই খাল পুবে, 'যমুনা থেকে অল্প পশ্চিমে।' অর্থাৎ বুলুর মৃতদেহ যমুনার জলে গিয়ে মিশেছে। তারপর?' 'সেই স্রোতের ওপর সওয়ার হয়ে তার বুলু পৌঁছে গেছে কোথায়? পদ্মায় নিশ্চয়ই। পদ্মা গিয়ে মেশে কোথায়? মেঘনা নদীর সঙ্গে? তারপর? তারপর মোবারক আলী অতো জানে না।' শুধু এইটুকু জানে—এই বিপুল জলরাশিতে ছেলেটার ঝাঁঝরা বুক ভরে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত শাজাহানকে কবর দেওয়া হল। তাকে কবর দিয়ে ফেরার সময় মোবারকরা চেয়ারম্যানের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে। তাঁর বাড়ির বাইরে দেখা হয় কাবেজউদ্দিনের সঙ্গে, দেখা হয় বিটলুর বাপের সঙ্গে। সবাইকার সঙ্গে সে তার বুলুর গল্প করে, তার মৃত্যুর বিবরণ দেয়। ওদিকে বুলুর মা দাঁড়িয়ে থাকে দরজা ধরে, চিন্তা করে মোবারকের জন্য। সে ফিরলে বিরক্ত হয়ে বলে ‘দেরি হলে খবর পাঠাবার পারো না? একটা মানুষ পাই না যে তোমার খবর পুস করি!’ কিন্তু তারজন্য এই দুশ্চিন্তা কেন একথা ভেবে মোবারক বিরক্ত হয়। খেতেও ইচ্ছে করে না তার। সে শুধু ভাবে, যার ছেলে মারা গেছে দেড়মাসও হয় নি ‘সেই মায়ের অন্য কারণে উদ্বেগ হয় কিভাবে?’ ছেলের জন্য মা যদি কেঁদে সারা গ্রাম মাথায় না তুললো ‘তো বুলু এতো কষ্টের মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?’ সত্যিই তো, বুলুর মৃত্যু তো আর পাঁচটা সাধারণ মৃত্যু ঘটনা নয়, এক অসাধারণ মৃত্যু। মুক্তিবাহিনীর সদস্য বুলু কায়েমি শাসকদলের সৈন্যকে মেরে বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছে। সেই ছেলের কথা ভুলে বুলুর মা যদি তার স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা করে তাহলে আর গৌরব কোথায়? শাজাহান খুব ভালো ছেলে ছিল। লেখাপড়া ছাড়া কিছু জানত না। কিন্তু মৃত্যুর পরে তাকে কম কষ্ট পেতে হল না এই পৃথিবী থেকে ছাড়পত্র পেতে। অথচ বুলু সাধারণ ছেলে হয়েও এক অসাধারণ মৃত্যুবরণ করায় তাকে কোন যন্ত্রণা পেতে হয় নি। বরং তার মৃতদেহ হয়ত যমুনার জলেই মিশেছে একথা ভেবেই পিতা হিসেবে মোবারক গৌরব বোধ করে।

মূলগল্প :

চোখের বাঁধন খুলে দেয়ার পর বোঝা গেল লোকটি খুবই নির্বোধ ধরনের। জগৎ সংসারের অনেক খবরই সে রাখে না। চেহারায় অলস আয়েশি ভাব। মাথার চুল কদম ছাঁট দেয়া, কিন্তু রুক্ষ নয়। তেল দিয়ে বেশ পরিপাটি করা। মুখের ঘন কালো দাড়ি গোঁফ যতনে ছাঁটা। চোখর কোণে বুঝি সুরমা ছিল, চেপে চোখ বাঁধার ফলে মুছে গেছে। পরনে হাতঅলা কোরা গেঞ্জি আর নীল ডোরাকাটা লুঙ্গি। গেঞ্জি-লুঙ্গি কোনটাই খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। হাত দুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা। এ অবস্থায়ও সে যে বেশ দশাসই এবং তাগড়া জোয়ান বুঝতে কারও অসুবিধা হচ্ছিল না।

লোকটির দুপাশে দুজন মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই অল্প বয়সী। বাইশ তেইশ বছর বয়স হবে। মাথার রুক্ষ চুল ঘাড় ছাপিয়ে নেমেছে তাদের। ভাঙাচোরা মুখ অতিরিক্ত পরিশ্রমে চোয়ারে হয়ে গেছে। ভাইরাস আক্রান্ত চোখ লাল টকটকে। সেই চোখের কোণে গাঢ় হয়ে জমেছে কালি। দেখে বোঝা যায় একটি রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোয় না তারা। দুজনেরই কাঁধে রাইফেল। রাইফেল এবং তাদের শরীরের কাঠামো প্রায় একই ধরনের একহারা ঋজু। যদিও লোকটির দুপাশে তাদের দুজনকে অতিরিক্ত রোগা এবং ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তবু কাঁধের রাইফেল এবং তাদের শরীর মিলেমিশে এমন একটা রূপ নিয়েছে কোনটি যে কখন গর্জে উঠবে বোঝা যাচ্ছিল না।

স্কুল ঘরটির ভেতর অদ্ভুত এক নির্জনতা। বাহিরে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে নভেম্বরের বিকেল। মৃদু শীত এবং অন্ধকার একাকার হয়ে এমন এক আবহ তৈরি করেছে ঘরের ভেতর যে আবহে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার কথা মানুষের। বিশেষ করে অপরাধীদের। কিন্তু লোকটি নির্বিকার। খানিক আগেও চোখ বাঁধা ছিল, হাতদুটো এখন বাঁধা। দুপাশে রাইফেল কাঁধে দুজন মুক্তিযোদ্ধা, সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসা একজন, টেবিলের ওপর, হাতের কাছে রাখা একটি স্টেনগান। এসব দেখে যতটা ভয় পাওয়ার কথা তার ততটা ভয় সে পেয়েছে কিংবা পাচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং তার চোখে মুখে চাপা একটা কৌতূহল। মুখ ঘুরিয়ে তিন মুক্তিযোদ্ধার দিকে তাকাচ্ছিল সে।

চেয়ারে বসা মুক্তিযোদ্ধার নাম রফিক। তার বয়স তিরিশের ওপর। রোদেপোড়া তামাটে মুখ। একদা যে সে বেশ ফরসা ছিল মুখ দেখে বোঝা যায়। তার চোখ এখন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি। অন্য দুজন মুক্তি যোদ্ধার সঙ্গে তার চোখের কোণেও গাঢ় হয়ে জমেছে কালি। তবে চোখের কালি ছাপিয়েও তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখে পড়ে। দৃষ্টিতে এক সঙ্গে অনেক কিছু খেলা করে তার।

অন্য দুজন মুক্তিযোদ্ধার মতে রফিকের মুখেও অনেকখানি দাড়ি গোঁফ এবং সে বেশ লম্বা। স্কুল ঘরের হাতঅলা চেয়ার ছাপিয়ে অনেকদুর উঠেছে তার দেহ। রফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটিকে দেখছিল। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাবে তার আগেই লোকটি খুব সরল গলায় বলল, আমারে বাইন্দা আনছেন কেন? আপনারা কারা?

রফিক গম্ভীর গলায় বলল, চোপ কোনও কথা বলবে না। যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার জবাব দেবে। অতিরিক্ত একটি কথা বললে গুলি করে দেব। এটা কি দেখেছ?

টেবিলে ওপর রাখা ষ্টেনগান দেখাল রফিক। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার লোকটি খুব একটা ভয় পেল বলে মনে হলো না। হাসি হাসি মুখ করে রফিকের দিকে তাকাল। আদুরে গলায় বলল, দেখছি। বন্দুক। কয়দিন পর আমিও এই রকম বন্দুক পামু। কমণ্ডর সাবে কইছে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রফিক। চোপ। তোমাকে না বলেছি অতিরিক্ত কথা বলবে না।

তা বলছেন?

তবে?

কিন্তু দুই-একখান কথা তো না জিগাইয়া পারতাছি না। আমারে এমনে বাইন্দা আনছেন কেন? আমার অপরাধ কি? আপনেরা কারা?

লোকটির দুপাশে দাঁড়ান দুজন মুক্তিযোদ্ধার একজনের নাম মজনু, আরেকজনের নাম বাচ্চু। বাচ্চু একটু আমুদে স্বভাবের। কথায় কথায় সুন্দর করে, শব্দ করে হাসে। লোকটির কথা শুনে হেসে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে শীতল চোখে তার দিকে তাকাল রফিক। গম্ভীর গলায় বলল, বাচ্চু।

বাচ্চু বুঝে গেল এরপর রফিক ভাইর অনুমতি ছাড়া শব্দ করা যাবে না। পাথর হয়ে থাকতে হবে।

বাচ্চু পাথর হয়ে গেল।

লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে রফিক বলল, তোমার নাম কী?

লোকটি আহ্লাদী শিশুর মতো ঠোঁট ফুলাল। কইতে পারুম না। হাত বান্দা মানুষ কথা কইতে পারে?

নিজে খুবই গম্ভীর স্বভাবের মানুষ রফিক। সহজে হাসে না। কিন্তু এ রকম কথা শুনলে কে না হেসে পারে। রফিকও হাসল। কিন্তু বাচ্চু কিংবা মজনু হাসল না। রফিকের আদেশ ছাড়া হাসা যাবে না। তবে তাদের দুজনেরই হাসির তোড়ে বুক ফেটে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা বুঝল রফিক। সে একটু নরম হলো। হাসিমুখে বাচ্চু এবং মজনুর দিকে তাকাল। হালকা কৌতুকের গলায় বলল, ভাল জিনিস ধরে এনেছিস। তাই নিয়ে খানিক মজা করা যাবে। যুদ্ধের ফাঁকে খানিকটা মজাও দরকার। তাতে এনার্জি বাড়ে। নসিরদের ডাক। মজাটা সবাই মিলে করি। তারপর খালপাড় নিয়ে যাব।

বাচ্চু উচ্ছ্বল গলায় বলল, ঠিক আছে।

তারপর বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে দশ-বারজন মুক্তিযোদ্ধা এসে ঢুকল ঘরে। লোকটির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল। রফিকের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় হবে এমন একজন, নাম আজমত, লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নিয়ে যাব?

রফিক হাসিমুখে বলল, একটু পরে। তোমাদের ডেকেছি জিনিসটি দেখাবার জন্য। নাম জিজ্ঞেস করেছি বলল কইতে পারুম না। হাত বান্দা মানুষ কথা কইতে পারে?

শুনে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। কিন্তু আজমত হাসল না। বলল, এভাবে কথা বল কিন্তু চালিয়াতিও হতে পারে। রাজাকারদের তো চেন না। শালাদের চালিয়াতির কিন্তু সীমা-পরিসীমা নেই।

রফিককথা বলবার আগেই লোকটি ভুরু কুঁচকে আজমতের দিকে তাকাল। খেঁকুড়ে গলায় বলল ও মিয়া শালা কারে কইলেন? আমারে?

আজমত একটু থতমত খেল। তারপর শীতল চোখে লোকটির দিকে তাকাল। হ্যাঁ। তবে ভুল বলেছি। তুমি কারও শালা হওয়ার উপযুক্ত নও। তুমি একটা শুয়োরের বাচ্চা।

পরিবেশ ভুলে ক্রোধে ফেটে পড়ল লোকটি। খবরদার গাইল দিবেন না। হাতটা বান্দা নাইলে আপনেরে দেইখা লইতাম গাইল কেমনে দেন। সাহস থাকলে হাত ছাইড়া দেন, লাগেন আমার লগে।

রফিকের দিকে তাকিয়ে হাসল আজমত। তোমার অনুমানই ঠিক। এ এক জিনিস।

রফিক বলল, তাহলে হাতের বাঁধনটা খুলে দাও। মজা করি।

লোকটির হাতের বাঁধন খুলে দিল আজমত।

রফিক বলল, পালাবার চেষ্টা কর না। তাহলে আর খালপাড় অব্দি নেয়া যাবে না। ডানহাত একবার বাঁ হাত ডলছে। আর মুখে চুক চুক শব্দ করছে। ইস মানুষ মানুষরে এমনে বাইন্দা আনে! দেহেন তো হাত দুইডার কি করছেন। ও মিয়ারা আমি কি চোর যে আমারে আপনেরা বাইন্দা আনছেন?

মজনু বলল, তুমি চোর না চোরের বাপ। রাজাকার।

রজাকার হইছি কি হইছে। মানুষ রজাকার হয় না?

শুনে হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

বাচ্চু বলল, শালা নিজেদের নামটা পর্যন্ত ঠিক মতো বলতে পারে না। রাজাকারকে বলছে রজাকার।

রফিক গম্ভীর গলায় বলল, আস্তে। এখন আর কোনও হাসিঠাট্টা নয়। আমি কথা বলব। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে রফিক বলল, নাম কী?

লোকটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। এইবার কওন যায়। তার আগে কন আপনেরা কারা? বেবাকতের লগে বন্দুক, ডাকাইতের লাহান চেহারা। ডাকাইত হইলে আমারে ধরেছেন কেন? মাইরা ফালাইলেও চাইর আনা পয়সা দিতে পারুম না। আমি পথের ফকির। ভাত জোটে না দেইখা রজাকার হইছি। সত্য কইরা কন আপনেরা কারা?

রফিক কথা বলল না। আস্তে করে চেয়ার ঠেলে উঠল। নরম ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়াল লোকটির সামনে। তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু হাতে প্রচণ্ড দুটো চড় মারল লোকটির দু গালে। আমরা তোর যম শুয়োরের বাচ্চা—মুক্তিযোদ্ধা।

হঠাৎ করে এমন দু খানা চড় খেয়ে খুবই দিশাহারা হয়ে গেল লোকটি। তবু মুক্তিযোদ্ধা কথাটা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে রফিকের মুখের দিকে তাকাল। অবাক গলায় বলল, আপনেরা মক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী। আমি মনে করেছিলাম মুক্তিবাহিনী না জানি কেমুন দেখতে।

এবার লোকটির তলপেট বরাবর প্রচণ্ড একটা লাথি মারল রফিক, আবার কথা।

লাথি খেয়ে বেশ কাবু হলো লোকটি। কাঁদো কাঁদো মুখ করে রফিকের দিকে তাকাল।

কিন্তু ভয়ে আর কথা বলল না।

চেয়ারে বসে রফিক বলল, নাম কী?

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, নিজাম।

কতদিন হলো রাজাকার হয়েছ?

এক মাস বারদিন।

কেন হয়েছ?

পেটের দায়ে।

পেটের দায়ে কথাটা শুনে ঘরের ভেতরকার প্রতিটি মুক্তিযোধা স্তব্ধ হয়ে গেল। দেশের গেরামে কোন কাম নাই। চাইর দিকে গণ্ডগোল।

রফিক বলল, আগে কী করতে?

কামলা দিতাম। মাইনষের খেলখোলায় ধান কাটিতাম, পাট কাটিতাম, খেত চষতাম। ফসলের মাস না হইলেও গেরস্ত বাড়িতে নানা পদের কাম আছিল। খাইয়া পইরা বাঁচতাম। অনেকদিন ধইরা দেশ গেরামে কোন কাম নাই পেট চলে না। খিদায় পোলাপানডি রাইত দিন কান্দে।

রাজাকার হওয়ার বুদ্ধি কে দিল তোমাকে?

চেরমেন সাবে।

তার কাছে গিয়েছিলে কেন?

কাম কাইজের আশায়। বিপদে পড়লে দেশ গেরামের মানুষ চেরমেনের কাছেই যায়। গিয়া কাম চাইলাম, কইল ভাল কাম আছে, কর। তারবাদের রজাকারিতে লাগাইয়া দিল। একাজে কি তোমার পেট চলছে?

হ্ তা চলতাছে। নাম লেখানোর লগে লগে একশো টেকা দিল কমণ্ডর সাবে। দিয়া কইল বাড়িতে বাজার কইরা দে। তারবাদে টেরনিং হইব।

ট্রেনিং হয়েছে?

না অহনতরি হয় নাই। লুঙ্গি, গেঞ্জি দিছে, শীতের কাপড় দিছে, জুতা দিয়ে হেইডি পিন্দা, বাঁশের একখানা লাডি হাতে লইয়া বাজারে ঘুইরা বেড়াই, গুদারা ঘাড়ে যাই, মুক্তিবাহিনী আছেনি, সম্বাত লই। তর মুক্তিবাহিনীর খালি নামই হুনছি, আইজ পয়লা চোখে দেখলাম।

মিলিটারি দেখেছ?

না। আমগ কমণ্ডর সাবে দেখছে। তার লগে মেলেটারিগ খুব খাতির। আমরা হইলাম ছোড রজাকার, আমরা তাগো দেখুম কইত্থিকা।

নিজামের কথা বলার ধরন বেশ আন্তরিক। প্রিয়জনদের কাছে সুখ-দুঃখের গল্প করার ভঙ্গিতে কথা বলছে সে। মুক্তিযোধারা স্তব্ধ হয়ে তার কথা শুনছে। তারা বুঝে গেছে এই সরল গ্রাম্য লোকটি একটিও মিথ্যে কথা বলছে না।

রফিক বলল, তোমাক রাইফেল দেয় নি কেন?

নিজাম বলল, কমণ্ডর সাবে কইছে আর কয়দিন পরে দিব। আমি আর একটু চালু হইলে। আবার নাও দিতে পারে। সব রজাকাররে রাইফেল বন্দুক দেয় না। কিছু ফালতু রজাকারও আছে। আমি হইলাম ফালতু। তয় রজাকার হইয়া আমি বেদম সুখে আছি সাব। চাইল-আটা পাই, টেকা-পয়সা পাই। পোলাপানডি অহন আর খিদায় কান্দে না। এক-দেড়মাস আমার চেহারা সুরত ভাল হইয়া গেছে।

একটু হেসে ভয়ে ভয়ে নিজাম বলল, আপনেগো কেউর কাছে বিড়ি হইব সাব! মাইর ধইর খাইয়া ভয়ে ভয়ে গলা শুকাইয়া গেছে। বিড়ি টানলে কথা কইতে সুবিধা।

রফিক তার বুক পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে। একটা সিগ্রেট ছুড়ে দিল নিজামের দিকে। ম্যাচ দিল। নিজাম সিগ্রেট ধরিয়ে ফুক ফুক করে দুটো টান দিল। তারপর মাটিতে আয়েশ করে বসল। একটু আরাম কইরা বহি সাব। বইয়া বিড়িডা খাই।

রফিক বলল, তাহলে তুমি পেটের দায়ে রাজাকার হয়েছ?

নিজাম সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্ সাব। আর কোনো কারণ নাই।

রাজাকার হওয়ার আর কী কী কারণ থাকতে পারে তুমি জান?

না সাব।

মিলিটারি কাকে বলে, মুক্তিযোদ্ধা কাকে বলে জান?

জানি। মেলেটারিরা হইল এই দেশের মালিক আর মুক্তিবাহিনীরা হইল.....

কথাটা শেষ না করে থেমে গেল নিজাম। ভয়ে ভয়ে রফিকের মুখের দিকে তাকাল। কমু না সাব। আপনেরা মুক্তিবাহিনী। কইলে আপনেরা আমারে মাইরা ফালাইবেন। তয় এত কিছু আমি বুজতাম না। আমি বুজতাম খালি পেডের খিদা। চেরমেন সাবে এইসব আমারে বুজাইছে।

তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে।

হইতে পারে। চেরমেন সাবে বহুত মিথ্যা কথা কয়। আমরা সাব গরিব মানুষ কিন্তু মিছা কথা কই না।

আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমাদেরকে দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?

আগেই তো কইলাম আমাগো দেশ রাজারামের পোলাপানের মতোনই মনে হইতাছে।

তার মানে কী! আমরা এদেশের মানুষ। বাংলার মানুষ। বাংলায় কথা বলি।

জে?

হ্যাঁ। তবে এসবের ভেতর অনেক কথা আছে, অনেক প্যাঁচ আছে। অতসব তুমি বুঝবে না। খুব সহজ কথায় তোমাকে দু-একটি ব্যাপার বোঝাই আমি। ধর তুমি একটা জমির মালিক। চাষবাস করে তুমি তাতে ফসল ফলাও। ফসল পাকলে অন্য গ্রামের কিছু লোক এসে ফসলটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তুমি তখন কী করবে?

নিজামের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল। জান থাকতে ফসল নিতে দিমু মনে করেন মইরা যামু, শহীদ হইয়া যামু তাও ফসল নিতে দিমু না।

মিলিটারিরা হচ্ছে ওইরকম কিছু শয়তান। অন্যদেশ থেকে এসে আমাদের দেশের সব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের লোকজন মেরে শেষ করে ফেলেছে। আমাদের মা বোনদের সর্বনাশ করছে। এ জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি আমরা। এদেশ থেকে শয়তানদের তাড়িয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করব।

চোখে পট পট করে কয়েকটি পলক ফেলল নিজাম। কন কী, মেলেটারিরা এই রকম?

চেরমেন শুয়োরের বাচ্চায় তো তাইলে আমারে উল্টোপাল্টা বুজাইছে।

হ্যাঁ। এখন রাজাকার জিনিসটি কি তোমাকে আমি বোঝাচ্ছি। এদেশের যেসব শয়তান টাকার লোভে, ক্ষমতা এবং সম্পদের লোভে মিলিটারিদের পক্ষে কাজ করছে তারা হল রাজাকার।

তাইলে তো রজাকারও দেশের শত্রু। বেইমান। বদ।

হ্যাঁ।

হায় হায় কিছু না বুইজা, পেটের দায়ে এইডা কী করছি আমি! রজাকার হইছি কেন?

আমার মতোন বেইমান তো তাইলে কেউ নাই!

তুমি ভুল করেছ।

এমুন ভুল তো মাইনষের করন উচিত না দেশের লগে বেইমানি করণ তো মানুষের কাম না।

বেইমানির শাস্তি কী হওয়া উচিত? রাজাকারদের শাস্তি কী হওয়া উচিত এখন তুমিই বল। তুমি মুক্তিযোদ্ধা হলে রাজাকারদের কী শাস্তি দিতে?

দাঁতে দাঁতে চেপে নিজাম বলল, মাইরা ফালাইতাম। একদম মাইরা ফালাইতাম। এক শালা রজাকাররেও বাঁচকে দিতাম না। দেশের মানুষ হইয়া দেশের লগে বেইমানি।

রফিক শীতল গম্ভীর গলায় বলল, তোমাকেও আমরা মেরে ফেলব। খালপাড় নিয়ে গুলি করে তোমার লাশ ফেলে দেব খালের জলে। তোমার লাশ দেখে রাজাকাররা যেন ভয় পায়। অন্য কেউ যেন রাজাকার হওয়ার সাহস না করে।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিজাম। দৃঢ় গলায় বলল, তয় আর দেরি কইরেন না। তাড়াতাড়ি আমারে খালপাড় নিয়া যান।

১০.১ লেখক পরিচিতি

১০.১ ইমাদাদুল হক মিলন :

১৯৫৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মেদিনী মণ্ডল ও লৌহজং বিক্রমপুরে ইমাদাদুল হক মিলন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গিয়াসুদ্দিন খান। ১৯৭২ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়া হাইস্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৯৭৯ সালে এই কলেজ থেকেই অর্থনীতিতে স্নাতক সম্মান লাভ করেন। পরবর্তীকালে লেখাকেই পেশা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, ব্যক্তিগত রচনা নানা ধরনের রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেন। যেমন ১৯৮৬ সালে বিশ্বজ্যোতিষ সমিতি পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ইকো সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে

হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার, ঐ বছরেই বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৯৩ নাট্যসভা পুরস্কার পূরবী পদক ১৯৯৪ সালে বিজয় পদক ১৯৯৫ সালে মজুন থিয়েটার পদক এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা যুব ফাউন্ডেশন পদক লাভ করেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল :

উপন্যাস

১। দুঃখ কষ্ট (১৯৮২)

২। ও রাধা ও কৃষ্ণ (১৯৮২)

৩। একদেশ (১৯৮৩)

৪। প্রিয় নারী জাতি (১৯৮৪)

৫। সুন্দরী কমলা (১৯৮৫)

৬। নদী উপাখ্যান (১৯৮৫)

৭। ভূমিপুত্র (১৯৮৫)

৮। যৌবনকাল (১৯৮৮)

৯। ভূমিকা (১৯৮৮)

১০। রূপনগর (১৯৮৮)

গল্প :

১। ভালোবাসার গল্প (১৯৭৭)

২। নিরন্নের কাল (১৯৭৯)

৩। প্রেমের গল্প (১৯৮৩)

৪। হে প্রেম (১৯৮৩)

৫। ফুলের বাগানে সাপ (১৯৮৩)

৬। আহারী (১৯৮৪)

৭। তোমাকে ভালোবাসি (১৯৮৫)

৮। নির্বাচিত প্রেমের গল্প (১৯৮৫)

৯। বাছাই গল্প (১৯৮৬৮)

১০। তাহারা (১৯৮৬)

১১। মর্মবেদনা (১৯৮৮)

১২। প্রেম নদী (১৯৮৮)

১৩। প্রেমিক-প্রেমিকা (১৯৮৮)

১৪। ভালোবাসার নির্বাচিত গল্প (১৮৮৯)

১৫। যদি জানতে (১৯৯০)

১৬। প্রেম ভালোবাসা (১৯৯০)

১৭। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯০)

ব্যক্তিগত রচনা :

১। যা কিছু (১৯৮৬)

২। স্ত্রী ও প্রেমিকা (১৯৮৯)

৩। বিনি সুতোর মালা (১৯৯১)

৪। শুভেচ্ছা নাও (১৯৯১)

১০.২ গল্পের আলোচনা : লোকটি রাজাকার ছিল

'লোকটি রাজাকার ছিল' মিতায়নে লেখা একটি অসামান্য ছোটগল্প। সমগ্র গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। গল্পের শুরুতেই আছে একটি নির্বোধ লোকের বর্ণনা যাকে মুক্তিযোদ্ধার দল ধরে এনেছে। চোখের বাঁধন খুলে ফেলতেই বোঝা গেল লোকটি শুধু নির্বোধ ধরনের নয়, সে এই জগৎ সংসারের অনেক খবরই জানে না। চেহারায় তার একটা অলস ভাব, কদমছাঁট তুল, তেল দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। দাড়ি গোঁফ যত্ন করে ছাঁটা; চোখে সুরমা, 'পরনে হাতঅলা কোরা গেঞ্জি আর নীল ডোরাকাটা লুঙ্গি।' তবে জামাকাপড় খুব বেশিদিনের পুরনো নয়। তাছাড়া দশাসই লোকটাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে এনেছে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন ছেলে।

দশাসই এই লোকটার দুপাশে পাহারা দিচ্ছে বাইশ-তেইশ বছরের দু'জন অল্প বয়সী ছেলে। মাথায় রুক্ষ চুল ঘাড় ছাপিয়ে নেমে এসেছে। তাদের ভাঙাচোরা মুখে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ছাপ। লাল টকটকে চোখের কোণে জমেছে গাঢ় কালির দাগ। একটি রাতও যে তারা নিশ্চিন্তে কাটায় না তা তাদের চোখ দেখলেই বোঝা যায়। দুজনেরই কাঁধে ধরা আছে রাইফেল। রাইফেলের মতই ঋজু তাদের কাঠামো, বিশেষ করে ঐ লোকটির পাশে তাদের আরো বেশি করে রোগা লাগছিল। কিন্তু রোগা ঐ যুবক দুটি বা গোরা ঐ বন্দুক কোনটি যে কখন গর্জে উঠবে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

সময়টা নভেম্বর মাস। বাইরে কখন যে বিকেলের আলোটা মুছে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে কেউ টের পায়নি। স্কুল বাড়িটা ভীষণ রকমের নির্জনতা বহন করে চলেছে। অল্প শীত ও অন্ধকার একাকার হয়ে গিয়ে একটা শ্বাসরুদ্ধ করা অবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই পরিবেশে লোকটি নির্বিকার চিত্তে বসে আছে। হাত দুটো এখনো বাঁধা। তার দুপাশে রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধা, সামনে চেয়ার টেবিলে বসা একজন মুক্তিযোদ্ধা, তার হাতের কাছে রাখা স্টেনগান। কিন্তু এসব দেখে লোকটি ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, বরং সে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিলো। চেয়ারে যে ছেলেটি বসে ছিল নাম তার রফিক। তিরিশ বছর বয়সী রফিকের রোদেপোড়া তামাটে মুখ দেখলে বোঝা যায় একসময় সে বেশ ফর্সা ছিল। চোখের কোণে একরাশ কালি, কিন্তু সে কালি ছাপিয়ে তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সবার আগে নজরে পড়ে। তার দৃষ্টিতে একসঙ্গে অনেক কিছু ধরা

পড়ে। দীর্ঘদেহী রফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটিকে দেখছিল। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাবে তার আগেই লোকটি খুব অমায়িক গলায় প্রশ্ন করে বসলো—'আমারে বাইন্দা আনছেন কেন? আপনেরা কারা?' তার প্রশ্ন শুনে রফিক গম্ভীর গলায় তাকে চুপ করতে বললো এবং অতিরিক্ত কথা বললে গুলি করবে জানালো। টেবিলের ওপরে রাখা স্টেনগান দেখিয়ে সে কথাই বোঝাতে চাইলো রফিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, লোকটি বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। হাসি হাসি মুখ করে সে দেখতে লাগলো শুধু নয়, আদুরে গলায় বলতে লাগলো—'কয়দিন পর আমিও এই রকম বন্দুক পামু। কমণ্ডর সাবে কইছে।' গর্জে উঠলো রফিক, অতিরিক্ত কথা বলতে নিষেধ করল তাকে। তথাপি সে চুপ করল না, বরং পুনরায় বললো—'কিন্তু দুই একখান কথা তো না জিগাইয়া পারতাছি না। আমারে এমনে বাইন্দা আনছেন কেন? আমার অপরাধ কি? আপনেরা কারা? লোকটির দুপাশে দাঁড়ানো মজনু এবং বাচ্চু দুই মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বাচ্চু একটু আমুদে স্বভাবের। লোকটির এহেন কথায় সে হেসে ফেললো। বাচ্চুর ঐ হাসিতে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো রফিক। বাচ্চু পাথর হয়ে গেল। অতঃপর লোকটিকে রফিক নাম জিজ্ঞেস করলে লোকটি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানালো—'কইতে পারুম না। হাত বান্দা মানুষ কথা কইতে পারে।' একথায় রফিকও না হেসে পারে না। মজনু এবং বাচ্চুরও হাসিতে বুক ফেটে যাচ্ছিলো কিন্তু রফিকের অনুমতি ছাড়া তারা হাসতে পারে না। রফিক ব্যাপারটা অনুভব করে কৌতুকের গলায় তাদের দিকে তাকিয়ে বললো—'ভালো জিনিস ধরে এনেছিস। এই নিয়ে খানিক মজাও দরকার। তাতে এনার্জি বাড়ে।' নাসিরদের ডেকে এই মজায় অংশ নিতে আদেশ করে সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দশ-বারোজন মুক্তিযোদ্ধা এসে ঘরে প্রবেশ করলো। লোকটিকে ঘিরে দাঁড়ালো তারা। সবাই তার কথায় হাসল, শুধু আজমত হাসল না। তার বক্তব্য হল, রাজাকারদের (শালাদের) চালিয়াতির সীমা-পরিসীমা নেই। লোকটি রেগে গিয়ে খেঁকুড়ে গলায় প্রতিবাদ করে উঠলো—'মিয়া শালা কারা কইলেন? আমারে? আজমত তার কথায় একটু থতমত খেয়ে গেল, তারপর পুনরায় বললো, 'তুমি কারও শালা হওয়ার উপযুক্ত নও। তুমি একটা শুয়োরের বাচ্চা।' লোকটি ক্রোধে ফেটে পড়ল, রাগত কণ্ঠে বললো, 'খবরদার গাইল দিবেন না। হাতটা বান্দা নাইলে আপনেরে দেইখা লইতাম গাইল কেমনে দেন। সাহস থাকলে হাত ছাইড়া দেন, লাগেন আমার লগে।' এতক্ষণে আজমত অনুভব করেছে এ লোকটা সত্যিই একটা বিস্ময়। রফিকের আদেশে তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে আজমত। রফিক তাকে একবার মনে করিয়ে দেয় যে পালাবার চেষ্টা করলে খালপাড় পর্যন্ত আর পৌঁছানো যাবে না। সে কিন্তু এসব কথার কোন গুরুত্ব দেয় না, বরং পালা করে দু'হাত ঘষতে থাকে আর বলতে থাকে—'ইস মানুষ মানুষরে এমনে বাইন্দা আনে। দেহেন তো হাত দুইডার কি করছেন। ও মিয়ারা আমি কি চোর যে আমারে আপনেরা বাইন্দা আনছেন? মজনু তখন তাকে জানালো যে, সে চোর নয় ঠিকই, কিন্তু চোরের বাপ, রাজাকার। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য হল 'মানুষ রজাকার হয় না?' সবাই তার একথায় না হেসে পারল না। বাচ্চু একটু তির্যকতা করে বললো, 'শালা নিজেদের নামটা পর্যন্ত ঠিক মতো বলতে পারে না। রাজাকারদের বলছে রজাকার।' বাচ্চুর কথায় কর্ণপাত না করে সে জানালা যে, 'রজাকার হইছি কি হইছে। মানুষ রজাকার হয় না?'

এইরূপ কথোপকথনের মাঝে রফিক হঠাৎ সকলকে চুপ করিয়ে দিয়ে লোকটাকে তার নাম জিজ্ঞেস করল। লোকটি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে উল্টে সেই জিজ্ঞাসা করে বসলো রফিকে যে 'তার আগে কন আপনেরা কারা? বেবাকতের লগে বন্দুক, ডাকাইতের লাহান চেহারা।'

আর নিজের পরিচয় দিল, 'আমি পথের ফকির। বলে। দুবেলা দুটো ভাত জোটে না বলে সে রাজাকার হয়েছে।' আর শেষ করেই পুনরায় সে প্রশ্ন করে বসলো 'সত্য কইরা কন আপনেরা কারা?' তার স্পর্ধা দেখে রফিক কোন কথা বলে না, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই, প্রচণ্ড দুটো চড় মারে তার গালে এবং বলে 'আমরা তোর যম শুয়োরের বাচ্চা। মুক্তিযোদ্ধা।' একথা শুনে লোকটি রফিকের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অবাক বিস্ময়ে বলে, আপনেরা মক্তিযোধা, মুক্তিবাহিনী। .....আমি তো মনে করেছিলাম মুক্তিবাহিনী না জানি কেমুন দেখতে।' তার কথা শুনে রফিক লোকটির তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল। মারটা খেয়ে লোকটি বেশ কাবু হল এবং কাঁদো কাঁদো মুখে রফিকের মুখের দিকে তাকাল। তারপর জানালো তার নাম নিজাম, পেটের দায়ে সে রাজাকার হয়েছে। 'পেটের দায়ে' এই কথাটা শুনে মুক্তিযোদ্ধার সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে আরও বললো, ছোট ছোট চারটে ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে দিন কাটাত। দেশে কোন কাজ ছিল না, চারিদিকে শুধু গণ্ডগোল। আগে সে মানুষের খেতখোলায় ধান কাটতো, পাট কাটতো, খেত চষতো। তখন সে খেয়ে পরে বাঁচতো। কিন্তু ক্রমশ গ্রামে কাজটাজ বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে কাঁদতো, তখন চেয়ারম্যান সাহেবের কথায় সে রাজাকারিতে যোগ দেয়। এখানে নাম লেখানোর জন্য কমাণ্ডার সাহেব তাকে একশো টাকা দিয়ে বাড়িতে বাজার করে দিতে বলেছে, এবং জানিয়েছে এরপর তার ট্রেনিং হবে। এখনো তার ট্রেনিং হয়নি। কিন্তু তারা তাকে লুঙ্গি, গেঞ্জি, শীতের কাপড়, জুতো দিয়েছে। এইসব পরে হাতে একটা লাঠি নিয়ে সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করে বেড়ায়। তাকে রফিক জিজ্ঞেস করলো সে মিলিটারি দেখেছে কিনা। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হল 'আমরা হইলাম ছোট রজাকার, আমরা তাগো দেখুম কইথিকা।' তার কথায় এটা অত্যন্ত আন্তরিক টান দিল, যেন সে নিজের লোকের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলছে। তার এই অকপট সারল্য দেখে মুক্তিযোদ্ধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার কথায় যে কোন মিথ্যাচার নেই একথাই প্রমাণ করে তার সারল্য। তাকে রাইফেল দেয় না, কিন্ত ফালতু রাজাকারও আছে, যেমন সে, তারপরই তার সত্য স্বীকারোক্তি— 'তয় রজাকার হইয়া আমি বেদম সুখে আছি সাব। চাইল-আটা পাই, টেকা-পয়সা পাই। পোলাপানডি অহন আর খিদায় কান্দে না। এক দেড়মাস আমার চেহারা সুরত ভাল হইয়া গেছে।' লোকটির কথায় জীবনের এক অমোঘ সত্য ধরা পড়ে।

অতঃপর নিজাম সভয়ে তাদের কাছে একটা বিড়ি চাইল, মার-ধর খেয়ে তার গলা শুকিয়ে গেছে, তাই দুটো টান দিতে চাইছে। রফিক তাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। এবার রফিক জানতে চাইল, 'মিলিটারি', 'মুক্তিযোদ্ধা' কাকে বলে সে জানে কিনা। এ সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা হল 'মিলিটারিরা দেশের মালিক আর মুক্তিবাহিনীরা হইল..... ।' কথাটা শেষ হল না, থেমে গেল নিজাম, ভীত চোখে তাকাল রফিকের দিকে। তারপর জানাল, সে এসব কিছুই বুঝত না, জানত শুধু পেটের খিদের কথা; কিন্তু এসব কথা চেয়ারম্যান সাহেব তাকে শিখিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রফিক বলে, তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। সেই স্বীকার করে চেয়ারম্যান 'বহুত মিথ্যা কথা কয়।' তারা গরিব হলেও মিথ্যা বলে না। মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে তার কি মনে হচ্ছে একথা জানতে চাইলে সে স্পষ্ট বলে 'আমাগো দেশ গেরামের পোলাপানের মতোনই মনে হইতাছে।' এইবার রফিক মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলে— 'আমরা এদেশের মানুষ। বাংলার মানুষ। বাংলায় কথা বলি।' আর মিলিটারিরা অন্য ভাষায় কথা বলে, তারা অন্যদেশের মানুষ। দূর দেশ থেকে এসে তারা এইদেশ দখল করতে চাইছে। রফিক উদাহরণ দিয়ে বলে যে—

জমিতে চাষবাস করে তুমি ফসল ফলালে, সেই ফসল যদি কেউ ছিনিয়ে নেয় তখন কি করবে তুমি? সহসা নিজামের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে এবং বলে 'শহীদ হইয়া যামু তাও ফসল নিতে দিমু না।' মিলিটারিরা এই ধরনের শয়তান, যারা 'আমাদের দেশের সব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। .....আমাদের মা বোনেদের সর্বনাশ করছে।' এই কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের সঙ্কল্প হল—এদেশ থেকে তারা এই শয়তানদের তাড়াবে, দেশ স্বাধীন করবে। এইসব শুনে চোখের পলক পড়ে না নিজামের, সে বলেই ফেলে 'কন কী, মেলেটারিরা এই রকম? চেরমেন শুয়োরের বাচ্চায় তো তাইলে আমারে উল্টোপাল্টা বুজাইছে।' এইবার তারা 'রাজাকার' সম্বন্ধে তাকে ব্যাখ্যা দিল এই বলে—'এ দেশের যেসব শয়তান টাকার লোভে ক্ষমতা এবং সম্পদের লোভে মিলিটারিদের পক্ষে কাজ করছে তারা হল রাজাকার।' সহজ সরল মানুষ নিজাম হায় হায় করতে লাগে; নিজের কাজের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে যেন নিজের মনেই বলতে থাকে 'পেটের দায়ে এইডা কী করছি আমি। রাজাকার হইছি কেন? আমার মতন বেইমান তো তাহলে কেউ নাই।' দেশের জন্য বেইমানি কোন মানুষের কাজ নয়। তখন রফিক তার কাছে এই প্রশ্ন তুলে ধরলো যে, তাহলে বেইমানির শাস্তি কি হওয়া উচিত? রাজাকারদের শাস্তি কি হওয়া উচিত তার কাছে জানতে চাইল তারা। সরল, গরিব এবং স্পষ্টভাষী নিজামের উত্তর—'মাইরা ফালাইতাম। একদম মাইরা ফালাইতাম।' একদম মাইরা ফালাইতাম।' রফিক ঠাণ্ডা গলায় জানাল 'তোমাকেও আমরা মেরে ফেলব। খালপারে নিয়ে গুলি করে তোমার লাশ ফেলে দেব খালের জলে। তোমার লাশ দেখে রাজাকাররা যেন ভয় পায়। অন্য কেউ যেন রাজাকার হওয়ার সাহস না করে।' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল নিজাম এবং দৃঢ় গলায় বললো—'তয় আর দেরি কইরেন না। তাড়াতাড়ি আমারে খাল পাড় নিয়া যান।'

স্বল্প পরিসরের এই গল্পটিতে এক অসামান্য মানুষের চরিত্র চিত্রনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে। গরীব নিরীহ বাংলাদেশের মানুষ পেটের দায়ে সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে রাজাকার হয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে 'রাজাকার' ও 'মুক্তিযোদ্ধা' সম্পর্কে সত্যজ্ঞান লাভ করেছে সেই মুহূর্তে তার কাজ তার কাছে 'বেইমানি' বলে মনে হয়েছে। এবং এই বেইমানির শাস্তি স্বরূপ সে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে। একটা নাটকীয় রীতিতে গল্পটি লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পের অসমাপ্তির ব্যাঞ্জনা গল্পটিকে একটি সার্থক ছোটগল্পের মর্যাদা দান করেছে। গল্পটি অবশ্যই একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। তথাপি রাজনীতিকে ছাড়িয়েও একটি দেশপ্রেমিক মানুষের দেশ সম্পর্কে অনুভূতির কথাই সত্য রূপ পাওয়ায় এ গল্প প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা পেয়ে যায়। এখানেই 'লোকটি রাজাকার ছিল' গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

❑ শকুন

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'শকুন' একটি সার্থক ছোটগল্প আলোচনা করুন।

২। 'শকুন' একটি প্রতীকধর্মী গল্প—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩। 'শকুন' গল্পে শকুন কিসের প্রতীক? সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে উত্তর দিন।

৪। 'শকুন' একটি সমাজ বাস্তবতার গল্প—গল্পটি বিশ্লেষণ করে সমালোচকদের এই উক্তির যাথার্থ প্রতিপন্ন করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'শকুন' গল্পে শকুনের কি পরিনতি হয়েছিল আলোচনা করুন।

২। 'শকুন' গল্পে যে সমাজপতিদের ছবি আছে তার পরিচয় দিন।

৩। 'শকুন' গল্প লেখার পিছনে হাসান আজিজুল হকের জীবনে কোন কোন ঘটনা প্রেরণা রূপে কাজ করেছে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। শকুনটা কোথায় এসে কিভাবে পড়েছিল? ছেলেরা তাকে নিয়ে কি করল?

২। শকুনটা 'মোল্লা না মোড়ল'—একথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩। 'এলো না শুধু কাজুশেখের বিধবা বোন। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মরা শকুনিটার মতই'—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'শকুন' গল্পের সঙ্গে রমেশ চন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা' গল্পের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—আলোচনা করুন।

❑ পরীবানুর কাহিনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'পরীবানুর কাহিনী' একটি সার্থক ছোটগল্প—আলোচনা করুন।

২। 'পরীবানুর কাহিনী' গল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামের ছবি আছে—তার বর্ণনা দিন।

৩। 'পরীবানুর কাহিনী' গল্পে রাজনীতির ছবি থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা একটি বিদ্রোহিনী সাহসী নারীর গল্প—আলোচনা করুন।

৪। হারুন কে? সে কি করত? গল্পে তার গুরুত্ব কতখানি।

৫। হালিমার পরিচয় দিন। হালিমা কেন পরীবানু হতে পারবে না বুঝিয়ে বলুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'পরীবানু' গল্পের নামকরণের সার্থকতা নিরূপন করুন।

২। 'এরা আলাদা জাতের মেয়ে। এদের চিনে ওঠা আমাদের সাধ্য নয়'—একথার তাৎপর্য নিরূপন করুন।

৩। 'একদিন একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম।'—কে চমকে উঠলেন? কেন চমকে উঠলেন—সবিস্তার বর্ণনা করুন।

৪। হারুন মাষ্টার কে?—তার পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। '.....আমরাও তো আন্দোলন করছি হে—সেই কথাটা মনে করে ভেতরে ভেতরে একটু লজ্জাবোধ করছিলাম—' একথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। 'পরীবানুর কাহিনী' গল্পে নারীদের যে প্রতিরোধের চিত্র আছে তা আলোচনা করুন।

৩। মুক্তিবাহিনীর পরিচয় দিন।

৪। 'আমাদের মেয়েদের নামগুলো কি শুধু সেন্সাস রিপোর্টের পাতা ভর্তি করে রাখবার জন্যই'—কে কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে আলোচনা করুন।

৫। 'আশ্চর্য মেয়ে, মনে মনে সেই কথাই ভাবছিলাম'—কার কথা কে কেন ভাবছিলেন—সবিস্তার ব্যাখ্যা করুন।

❑ একটি তুলসীগাছের কাহিনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' একটি সার্থক ছোটগল্প—আলোচনা করুন।

২। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' কি একটি ধর্মান্দোলনের গল্প?—গল্পটি ব্যাখ্যা করে প্রশ্নের উত্তর দিন।

৩। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা নির্দেশ করুন।

৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একদা জানিয়েছিলেন 'মুসলমান সমাজের অধঃপতনের' কাহিনী তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়—লেখকের একথা কতটা সত্য তা তাঁর 'একদা তুলসীগাছের কাহিনী' গল্প অবলম্বনে লিখুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'—গল্পে তুলসীগাছ কিসের প্রতীক? আলোচনা করুন।

২। আলোচ্য গল্পে কতগুলি চরিত্র আছে? চরিত্রগুলির পরিচয় দিন।

৩। আলোচ্য গল্পে যে বাড়িটির প্রসঙ্গ আছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।

৪। বাড়িতে হঠাৎ করে পুলিশের আগমন ঘটলো কেন?

৫। বাড়িতে গৃহকর্ত্রী উপস্থিত না থেকেও গল্পে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে—আলোচনা করুন।

❑ মাটির আদম

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'মাটির আদম' গল্পটির নামকরণ কতদুর সার্থক আলোচনা করুন।

২। 'মাটির আদম' গল্পে তালেব আলীর চরিত্রটি বর্ণনা করুন।

৩। 'মাটির আদম' একথার অর্থ কি? গল্পটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিন।

৪। 'ইয়া আল্লাহ! চাই না জমিনের বাদশাহী মাটির আদমরে খালি এক টুকরো কবরের মাটি দিও। খালি এক টুকরা জমিন।'—কে বলেছে এবং কখন বলেছে। কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে আলোচনা করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। তালেব আলী মানুষ হিসেবে কেমন ছিল?

২। আদম আলীর পরিচয় দিন।

৩। কিসে আদমের মৃত্যু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার সদগতি কিভাবে করা হয়?

৪। 'দাফন! শব্দটায় ভীষণভাবে চমকে উঠল তালেব।'—কখন, কে চমকে উঠল এবং কেন উঠল?

৫। 'ইয়া আল্লাহ! চাই না জমিনের বাদশাহী মাটির আদমরে খালি এক টুকরা কবরের মাটি দিও। খালি এক টুকরা জমিন।'—কে বলেছে, কখন বলেছে? একথার তাৎপর্য কি?

❑ পরজন্ম

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। গল্পের নামকরণ 'পরজন্ম' কতখানি সার্থক আলোচনা করুন।

২। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা 'পরজন্ম' একটি অসাধারণ গল্প—আলোচনা করুন।

৩। 'পরজন্ম' গল্পে কাজেম আলীর একাকীত্বের পরিচয় দিন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। কাজেম আলীর স্বপ্ন ছিল ছেলের বিয়ে দিয়ে ছয় পুরুষের পত্তন করবে—তার এই স্বপ্ন কী পূরণ হয়েছিল?

২। কাজেম আলীর শূন্যতা কিভাবে কাটলো আলোচনা করুন।

৩। কাজেম আলীর জীবনের একাকীত্ব দূর করার পিছনে সিকান্দার চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। কাজেম আলী কে? তার পরিচয় দিন।

২। 'ছেলেগুলো স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতো।'—কার ছেলে? তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতো কেন?

৩। সিকান্দার কে? কাজেম আলীর জীবনে তার অস্তিত্ব কতখানি?

৪। 'এখন কষ্ট হয় ভিটেয় বাতি জ্বালানোর কেউ থাকবে না বলে।' এখানে কার কষ্টের কথা বলা হয়েছে? একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

❑ একটি দিন

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক জীবনের যন্ত্রণার ছবিই 'একটি দিন' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য—আলোচনা করুন।

২। তারেক মনজুরের ব্যর্থ জীবনের যে ছবি আছে গল্পে তার বিশদ পরিচয় দিন।

৩। তারেক মনজুর ও হাসান মাহমুদের জীবনের ছবিটা প্রায় একইরকম—আর্শির এপিঠ-ওপিঠ—আলোচনা করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'অতো বউ ন্যাওটা হলে কোনো বউ স্বামীর ঘর করে না'—কে কাকে বলেছিলেন? কোন গল্পের থেকে নেওয়া হয়েছে? যিনি কথাটা বলেছেন তাঁর দিক থেকে একথা কতটা সত্য?

২। 'আমি মুখ লুকিয়ে হাসলাম আড়াল করে'—কে কেন মুখ লুকিয়ে হাসলেন—আলোচনা করুন।

৩। হাসান মাহমুদ ও তারেক মনজুরের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। তারেক মনজুরের পরিচয় দিন।

২। হাসান মাহমুদ কে? তার চরিত্র উদ্‌ঘাটন করুন।

৩। রিনার পরিচয় দিন।

৪। 'অনেক বছর প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম যাকে, একবছর না-পুরতেই আর একজনের হাত ধরে চলে গিয়েছিল। তারপর আর বিয়ে করার ইচ্ছেও হয়নি।'—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

❑ একটি দিন

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। গল্পের নামকরণ সার্থক হয়েছে কিনা আলোচনা করুন।

২। 'তাস' গল্পটি একজন নারীর স্ত্রী সত্তা থেকে মাতৃসত্তায় উত্তোরণের গল্প—আলোচনা করুন।

৩। 'তাস' একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প—ব্যাখ্যা করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। আলোচ্য গল্পে 'তাসের' ভূমিকা কতখানি আলোচনা করুন।

২। 'তাস' গল্পে ঘড়ির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—আলোচনা করুন।

৩। খোকনের চরিত্র বর্ণনা করুন।

৪। খোকনের তাস কে কেন্দ্র করে মায়ের মাতৃসত্তা কিভাবে জয়ী হল তার বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। 'তাঁর সারা অন্তর মথিত করে একটা কথা ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়লো—না, তিনি পারেন না, অসম্ভব।'—কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? কেন তিনি পারেন না—বুঝিয়ে বলুন।

২। ঘড়িটিকে কেন্দ্র করে খোকনের মায়ের যে প্রেমের স্মৃতি জড়িত আছে তা আলোচনা করুন।

৩। 'ক' দিন মাত্র ঘড়িটা বেতালা হয়েছে আর দেখ দিকি।'—কে বলেছে কার সম্বন্ধে? একথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'এমন ভুল মানুষের হয় কখনো'—কার সম্বন্ধে কে একথা বলেছেন? কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছেন আলোচনা করুন।

❑ সাদা কফিন

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'সাদা কফিন' একটি সার্থক ছোটগল্প—আলোচনা করুন।

২। 'সাদা কফিন' গল্পটি বাস্তব এবং কল্পনার মিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি অসামান্য গল্প—আলোচনা করুন।

৩। 'সাদা কফিন' গল্পটি রাজনৈতিক গল্প হয়েও একটি সার্থক সৃষ্টি—সমালোচকের এই মন্তব্যের যাথার্থ নির্ণয় করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আমি অবকাশহীন ভাবনায় ভাসছি—' যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচয় দিন।

২। 'সাদা কফিন' গল্পের নামকরণের সার্থকতা নিরূপন করুন।

৩। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি বাস্তব গল্প 'সাদা কফিন'—আলোচনা করুন।

৪। 'একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল নেই, মৃত্যুর ডাক এত পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে ও নিজের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো পর্যন্ত একান্ত আপন করে ধরা যায়—সেই এতটুকু আশ্রয়।'—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। মুক্তিযুদ্ধের যে ছবি এখানে আছে তার বর্ণনা দিন।

২। 'প্রভু আমাকে তুলে নাও।'—কে বলেছেন, কেন বলেছেন—আলোচনা করুন।

৩। 'শহরে সৈন্য নেমেছে সাব, সরে পড়ুন, এক্ষুনি এদিকে এসে পড়বে'—কে কাকে বলেছে? একথা বলার কারণ কি আলোচনা করুন।

❑ অপঘাত

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'মুক্তিযুদ্ধের' গল্প হিসেবে 'অপঘাত' গল্পের সার্থকতা নিরূপণ করুন।

২। বুলু কে? কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল—আলোচনা করুন।

৩। শাজাহানের মৃত্যুর বর্ণনা দিন।

৪। মোবারক চরিত্রের বর্ণনা দিন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। শাজাহান এবং বুলুর পরিচয় দিন।

২। 'দ্যাখো তো চেয়ারম্যানের ব্যাটা এ্যাঁ, তাই মরলো মায়ের সামনে বাপের সামনে.....'—কে বলেছেন একথা? তাঁর শোকগ্রস্ত অবস্থার সবিস্তার ব্যাখ্যা করুন।

৩। গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৪। 'অপঘাত' গল্প অবলম্বনে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। 'কলেরার মত আসে, ম্যালেরিয়ার মত আসে'—কাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে?

২। 'মিলিটারি খবর পেলে নির্বংশ করে ছাড়বে'—কে কাকে বলেছে? একথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩। 'বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ'—একথার মধ্য দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন আলোচনা করুন।

৪। 'বুলু এতো কষ্টের মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে'?—মোবারকের একথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

❑ লোকটি রাজাকার ছিল

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। 'লোকটি রাজাকার ছিল' একটি অসাধারণ রাজনৈতিক গল্প আলোচনা করুন।

২। 'লোকটি রাজাকার ছিল' গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্প—আলোচনা করুন।

৩। 'লোকটি রাজাকার ছিল' গল্পটি রাজনৈতিক গল্প হলেও প্রচারপত্র হয়নি—একটি সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে—সমালোচকের এই মন্তব্যের যথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৪। রাজাকার লোকটির চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১। রাজাকার লোকটির চরিত্র বর্ণনা করুন।

২। রফিক কে? গল্পে তার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন।

৩। 'লোকটি রাজাকার ছিল' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপাদন করুন।

৪। 'আমি পথের ফকির। ভাত জোটে না দেইখ্যা রাজাকার হইছি।'—একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৫। নিজামের পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। রফিক কে? তার পরিচয় দিন।

২। নিজাম সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৩। নিজাম এই গল্পের প্রাণকেন্দ্র বিরাজ করছে—আলোচনা করুন।

৪। 'আমি পথের ফকির। ভাত জোটে না দেইখা রাজাকার হইছি।' কে কোন প্রসঙ্গে কখন বলেছে?

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

–Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.